মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

প্রথম খণ্ড



পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

সম্পাদকমণ্ডলী

শ্রীঅলোক রায়
শ্রীঅরুণকুমার বসু
শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজ্যোতির্ময় ঘোষ
শ্রীসরোজমোহন মিত্র
শ্রীমতী মালিনী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী সুমিতা চক্রবর্তী
শ্রীসনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

শ্রীপৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

মূল্য : ১৬০ টাকা

ISBN 81-7751-039-8
ISBN 81-86908-66-8 (Set)

প্রকাশক

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
কলকাতা-৭০০ ০২০

মুদ্রাকর

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি
কলকাতা-৭০০ ০১২

সূচি : প্রথম খণ্ড

চিত্রপরিচয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রধান সচিব
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
সংস্কৃতি অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
শ্রীমতী কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী
শ্রীসুকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
শ্রীঅশোক উপাধ্যায়
শ্রীনিমাই ঘোষ
শ্রীঅংশু শূর

তথ্যসংগ্রহে সহায়তা

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
বয়েজ ওন লাইব্রেরি
রামমোহন লাইব্রেরি
বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরি
চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার

সম্পাদনা সহায়তা

শ্রীনৃপেন্দ্র সাহা — শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
শ্রীশ্যামল মৈত্র — শ্রীঅমলকুমার রায়
শ্রীমুক্তিরাম মাইতি — শ্রীনন্দদুলাল সেনগুপ্ত
শ্রীমতী অপর্ণা দাশ — শ্রীমতী ঈশানী মৈত্র

শ্রীপারিজাতবিকাশ মজুমদার

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র-র প্রথম খণ্ডের সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশের কিছুকাল পরেই এই খণ্ডটির পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজনীয়তা যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভূত সৃষ্টির জনপ্রিয়তার সুনিশ্চিত পরিচায়ক তা পুনরায় বলার অপেক্ষা রাখে না। কালজয়ী লেখকের রচনাবলি এতকাল ক্রেতা-পাঠকের কাছে সহজলভ্য ছিল না। প্রকাশের পর সেগুলির দ্রুত প্রচারে প্রকাশক হিসাবে বাংলা আকাদেমির উদ্যোগ কৃতার্থ হল।

বর্তমান মুদ্রণেও যথারীতি আকাদেমি-সম্মত বানানবিধি অনুসরণ করা হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে গ্রন্থগুলির পাঠকে অধিকতর নির্ভুল করার চেষ্টা হয়েছে। অতসী মামি গ্রন্থভুক্ত গল্প 'আগন্তুক'-এর পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য গ্রন্থপরিচয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হল। তাছাড়াও দিবারাত্রির কাব্য-র পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ ও গ্রন্থধৃত পাঠের তুলনামূলক বিচারও বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। পুতুলনাচের ইতিকথা-র প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগত পার্থক্যও প্রয়োজনীয় তথ্যসহ গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। এ সকল তথ্যাবলিসহ যথাসাধ্য গ্রন্থপরিচয় অংশটি সংশোধিত এবং পুনর্লিখিত হয়েছে। সেই সঙ্গে যথাযথ নিষ্ঠায় প্রকাশনার সৌষ্ঠব ও উন্নতমান অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হল।

আশা করা যায় বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগী জনসাধারণের কাছে অধিকতর সমাদর লাভ করবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রসঙ্গে

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্রের প্রথম খণ্ড মাত্র এক বৎসর পূর্বে কলিকাতা পুস্তকমেলা, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮-এ প্রকাশিত হয়েছিল। বৎসরকালের মধ্যেই প্রথম খণ্ডের পুনর্মুদ্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির জনপ্রিয়তা ও মহার্ঘতার সুনিশ্চিত পরিচায়ক। কালজয়ী লেখকের রচনাবলি এতকাল ক্রেতা-পাঠকের কাছে সহজলভ্য ছিল না। প্রকাশের পর সেগুলির দ্রুত প্রচারে প্রকাশক হিসাবে বাংলা আকাদেমির উদ্যোগ কৃতার্থ হল।

বর্তমান মুদ্রণে পূর্বতন মুদ্রণের কিছু অসংগতি ও ত্রুটি যথাসম্ভব দূরীভূত হয়েছে। মুদ্রিত গ্রন্থগুলির পাঠের ক্ষেত্রে বাংলা আকাদেমিসম্মত বানানবিধি অনুসরণ করে সেই পাঠ-কে অধিকতর নির্ভুল করার চেষ্টা হয়েছে। তিনটি গ্রন্থের প্রথম প্রকাশিত প্রচ্ছদচিত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে সেগুলি এই সংশোধিত মুদ্রণে গ্রন্থভুক্ত হল। গ্রন্থপরিচয় অংশ পরবর্তী খণ্ডগুলির গ্রন্থপরিচয়ের সঙ্গে সংগতি রেখে যথাসাধ্য সংশোধিত অথবা পুনর্লিখিত হয়েছে এবং সর্বতোভাবে প্রকাশনার সৌষ্ঠব ও উন্নতমান অপরিবর্তিত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

আশা করি বর্তমান সংশোধিত দ্বিতীয় মুদ্রণ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরাগী জনসাধারণের কাছে অনুরূপ সমাদর লাভ করবে।

সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়
সচিব

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

বাংলা সাহিত্যের এক অলোকসামান্য পুরুষ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। আটচল্লিশ বছরের অকাল-নিমীলিত জীবন ও আটাশ বছরের সৃষ্টিকালের মধ্যে তিনি রেখে গেছেন বিপুল দান হিসেবে ৩৯টি উপন্যাস, ২৬০-এর কিছুবেশি ছোটোগল্প এবং বেশকিছু কবিতা, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও ছোটোদের উপযোগী রচনা। মৃত্যুর চারদশক পরেও এই ব্যতিক্রমী ও বিস্ময়সৃষ্টিকারী লেখক আমাদের সাহিত্যে ও মননে অনিবার্যভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে আছেন। স্রষ্টা মাত্রেই কিছু পরিমাণে বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র। কিন্তু মানিকের স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতার রহস্যভেদ ও অনুসন্ধান আজও বোধ করি অসমাপ্ত। কল্লোলের কুলবর্ধন বলে তাঁকে দাবি করা হলেও তাঁর সাহিত্যে অতিরিক্ত যা ছিল তা হল অতিআধুনিকের প্রতিবাদ থেকে নাস্তিকোর বিদ্রোহে উত্তরণ। যুগ-ব্যাধি তাঁর সাহিত্য শরীরের আয়তক্ষেত্রে নির্মম নিরাভরণ অথচ বহুসামস রূপে ছড়িয়ে আছে। পারিবারিক আনুকূল্যের মসৃণজীবনের পথ ত্যাগ করে শুধুই সাহিত্যের জন্য যে অনিশ্চিত জীবন তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন, দুরারোগ্য ব্যাধি দারিদ্র্য সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সত্ত্বেও তার কক্ষপথের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের কেন্দ্রে ছিল সাহিত্যসাধনা। সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সংলগ্ন যে বাঙালি মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবন, তার ইতিবৃত্ত রচনায় মানিক-সাহিত্য অপরিহার্য।

এই ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধেই পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যসমগ্র প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছে। পাঠক-মনের সামনে থেকেও দৃষ্টির অগোচরে থেকে যাবে তাঁর রচনাবলি—এ কাম্য নয়। মানিক-সাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন আজও অসম্পূর্ণ। মানিক-সাহিত্যচর্চা, বিশ্ববিদ্যালয়স্তরে গবেষণা বেশকিছু হলেও মানিকের যাবতীয় রচনার সুসম্পাদিত পাঠ থেকে পাঠকসমাজ বঞ্চিতই রয়েছেন। এর আগে গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড সাধ্যমতো একগ্রন্থ রচনাবলি প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু দীর্ঘদিন তা বাজারলভ্য ছিল না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র এবং তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং লেখক-পরিবার ও গ্রন্থালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সমগ্র মানিক-রচনাবলি নতুন করে প্রকাশের পথে বাধা দূর হয়েছে। সকল পক্ষের ঐকমত্যে এই দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে বাংলা আকাদেমির উপর। কাজটি সহজসাধ্য নয়।

লেখকের ভগ্নস্বাস্থ্য, গৃহিণীপনার অভাব, বারবার বাসস্থান-পরিবর্তন, প্রথম যুগের প্রকাশকদের অন্যমনস্কতা ইত্যাদি কারণে যাবতীয় পাণ্ডুলিপি, প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম সংস্করণের প্রকাশ-সময় ইত্যাদি সংগ্রহ সহজ কাজ নয়। তবে শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তী 'অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডায়েরি ও চিঠিপত্র' গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রামাণ্য তথ্যসংগ্রহের কাজ অনেকটাই সহজ করে দিয়েছেন। লেখকের পরিবারের পক্ষ থেকে দুর্লভ কয়েকটি পাণ্ডুলিপি আকাদেমির অভিলেখাগারে প্রদান করার ফলেও কিছুকিছু পাঠনির্ণয়ে অভাবনীয় সুবিধা ঘটেছে। কাজে হাত দিয়ে দেখা যাচ্ছে কিছু রচনা এখনও অসংকলিত রয়েছে, বহু তথ্য সন্ধান করতে হচ্ছে, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ, বিভিন্ন সংস্করণের পাঠভেদ, গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখকের সংশোধন পরিমার্জন-পরিবর্তন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে কৌতূহল সৃষ্টিকারী বহু বিষয় পাওয়া যাচ্ছে। বাংলা আকাদেমি এই দুরূহ অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পাদনের জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করেছে এবং তাঁদের তত্ত্বাবধানে যথাসম্ভব প্রথম প্রকাশের ক্রম অনুসারে দশখণ্ডে এই রচনাসমগ্র প্রকাশে ব্রতী হয়েছে।

আশা করা যায় মানিক-পরিবারের সর্বাঙ্গীণ সহায়তা, সম্পাদকমণ্ডলীর শ্রম ও দক্ষতায় মানিক-সাহিত্যের এক আদর্শ-পাঠ পাঠকসমাজের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে। বহু নতুন তথ্য, দুষ্প্রাপ্য দলিল এবং লেখকের বিভিন্ন সময়ের স্বল্পপরিচিত ছবি, পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ রচনাসমগ্রের আকর্ষণ বৃদ্ধি করবে। গ্রন্থপরিচয় ও পরিশিষ্ট অংশ এই রচনাবলির অন্যতম সম্পদ বলে গণ্য হবে। বানানের সমতাবিধানের প্রয়োজনে বাংলা আকাদেমির বানানবিধি এবং যুক্তাক্ষরের স্বচ্ছতা-প্রয়াস অনুসৃত হয়েছে। প্রকাশনসৌষ্ঠব ও সম্পাদনার উন্নতমান অক্ষুণ্ণ রেখে দাম যথাসম্ভব পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের সহায়তার ফলেই এটা সম্ভব হল। এই প্রকল্প রূপায়ণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত রয়েছেন তাঁদের সকলের কাছেই বাংলা আকাদেমি কৃতজ্ঞ।

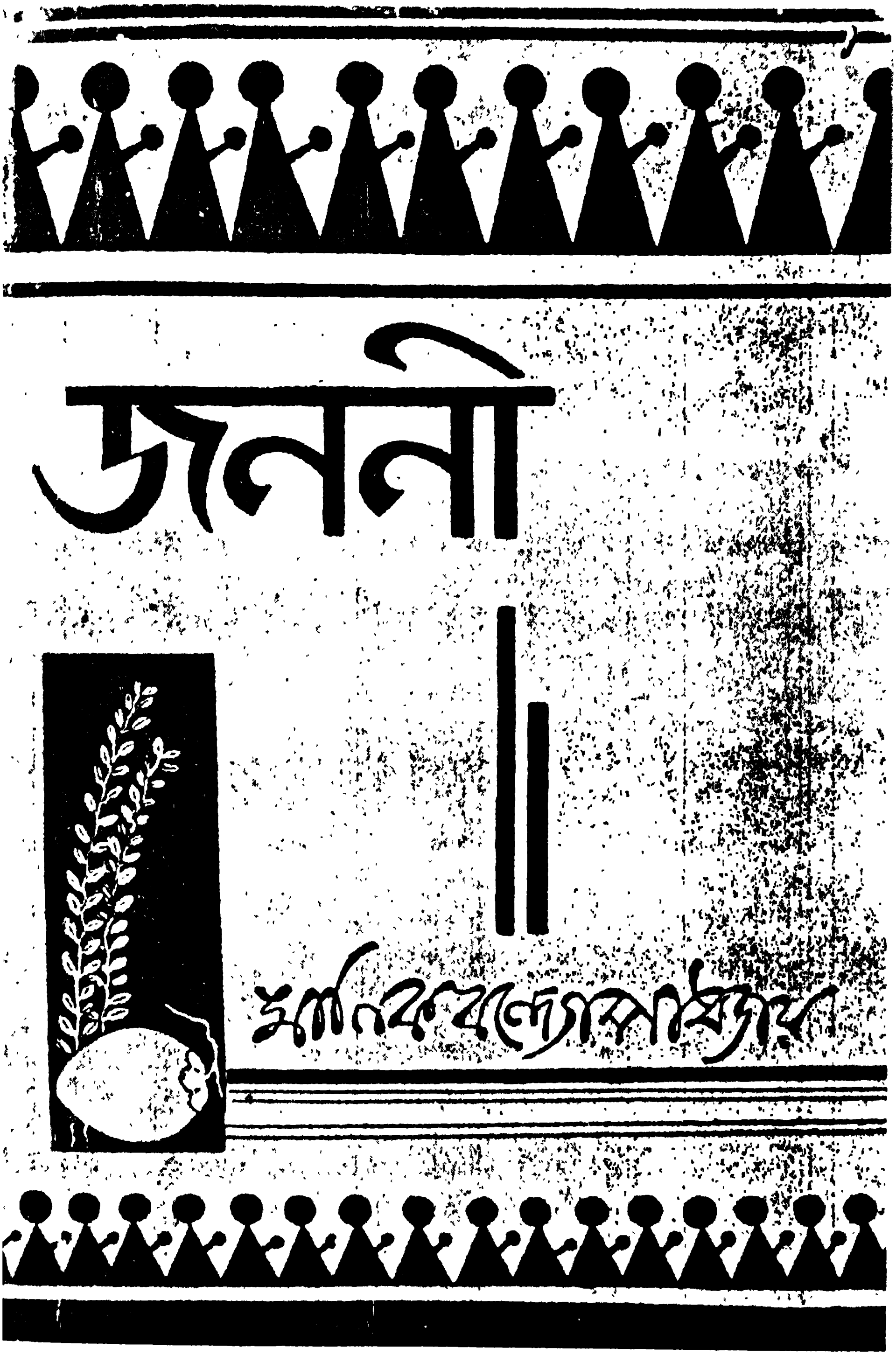
সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

সচিব



জন্ম ১৯ মে ১৯০৮   মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর ১৯৫৬

জননী



জননী প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

এক

সাত বছর বধূজীবন যাপন করিবার পর বাঁইশ বছর বয়সে শীতলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শ্যামা প্রথমবার মা হইল। এতকাল অনুর্বরা থাকিয়া সন্তানলাভের আশা সে একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিল। ব্যর্থ আশাকে মানুষ আর কতকাল পোষণ করিতে পারে। সাত বছর বন্ধ্যা হইয়া থাকা প্রায় বন্ধ্যাত্বের প্রমাণেরই শামিল। শ্যামাও তাই জানিয়া রাখিয়াছিল। সে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। একমাত্র সন্তান না হইয়া তার উপায় অবশ্য ছিল না, কারণ সে মাতৃগর্ভে থাকিতেই তার বাবা ব্রহ্মপুত্রে নৌকাডুবি হইয়া মারা যান। তারপর তার আর ভাইবোন হইলে সে বড়ো কলঙ্কের কথা হইত। শ্যামার যেন তাহা খেয়াল থাকে না। সে যেন ভুলিয়া যায় যে তার বাবা বাঁচিয়া থাকিলে সাতভাই চম্পার এক বোন পারুলই হয়তো সে হইত, বোনও যে তাহার দু-পাঁচটি থাকিত না তাই বা কে বলিতে পারে? তবু, একটা যুক্তিহীন ছেলেমানুষি ধারণা সে করিয়া রাখিয়াছিল যে সে নিজে যখন এক মা-র একমেয়ে, দুটি-একটির বেশি ছেলেমেয়ে তারও হইবে না। বড়ো জোর তিনটি। গোড়ার কয়েক বছরের মধ্যেই এরা আসিয়া পড়িবে এই ছিল শ্যামার বিশ্বাস। তৃতীয় বছরেও মাতৃত্বলাভ না করিয়া সে তাই ভীত হইয়া উঠিয়াছিল। তার পরের চারটা বছর সে পূজা মানত জলপড়া কবচ প্রভৃতি দৈব উপায়ে নিজেকে উর্বরা করিয়া তুলিতেই এক রকম ব্যয় করিয়াছে। শেষে, সময়মতো মা না হওয়ার জন্য এবং দৈব উপায়ে মা হইবার চেষ্টা করার জন্য নানাবিধ মানসিক বিপর্যয়ের পর তার যখন প্রায় হিস্টিরিয়া জন্মিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে তখন ফাল্গুনের এক দুপুরবেলা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শীতলপাটিতে গা ঢালিয়া ঘুমের আয়োজন করিবার সময় সহসা বিনা ভূমিকায় আকাশ হইতে নামিয়া আসিল সন্দেহ। বাড়িতে তখন কেহ ছিল না। দুপুরে বাড়িতে কেহ কোনোদিনই প্রায় থাকিত না, থাকিবার কেহ ছিল না—আত্মীয় অথবা বন্ধু। সন্দেহ করিয়াই শ্যামার এমন বুক ধড়ফড় করিতে লাগিল যে তার ভয় হইল হঠাৎ বুঝি তার ভয়ানক অসুখ করিয়াছে। সারাটা দুপুর সে ক্রমান্বয়ে শীত ও গ্রীষ্ম এবং রোমাঞ্চ অনুভব করিয়া কাটাইয়া দিল। সন্দেহ প্রত্যয় হইল একমাসে। কড়া শীতের সঙ্গে শ্যামার অজ্ঞাতে যাহার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সে জন্ম লইল শরৎকালে। জগজ্জননী শ্যামা জগতে আসিয়া মানবী শ্যামাকে একেবারে সাতদিনের পুরাতন জননী হিসাবে দেখিলেন।

শ্যামার বধূজীবনের সমস্ত বিস্ময় ও রহস্য, প্রত্যাশা ও উত্তেজনা তখন নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। নিঃশেষ হইবার আগে ও সব যে তাহার খুব বেশি পরিমাণে ছিল তা বলা যায় না। জীবনে শ্যামার যদি কোনোদিন কোনো অসাধারণত্ব থাকিয়া থাকে সে তাহার আত্মীয়স্বজনের একান্ত অভাব। জন্মের পর জগতে শ্যামার আপনার বলিতে ছিল মা আর এক মামা। এগারো বছর বয়সে সে মাকে হারায়। মামাকে হারায় বিবাহের এক বছরের মধ্যে। মামার কিছু সম্পত্তি ছিল। প্রকৃতপক্ষে, উত্তরাধিকারীবিহীন এই মামাটির কিছু সম্পত্তি না থাকিলে শীতল শ্যামাকে বিবাহ করিত কিনা সন্দেহ।

মৃত্যুর মধ্যে মামাকে হারাইলে সম্পত্তি শ্যামা পাইত সন্দেহ নাই। কিন্তু শ্যামার বিবাহের পর একা থাকিতে থাকিতে মামার মাথার কী যে গোলমাল হইয়া গেল, নিজের যা কিছু ছিল চুপিচুপি জলের দামে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিয়া একদিন তিনি উধাও হইয়া গেলেন। একা গেলেন না। শ্যামার

মামাবাড়ির গ্রামে আজীবন সন্ন্যাসীঘেঁষা প্রৌঢ়বয়সি ব্রহ্মচারী মামাটির কীর্তি এখনও প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। প্রসিদ্ধ হইয়া আছে এই জন্য যে শ্যামার মামা সামান্য লোক হইলেও আসল কলঙ্ক যাদের তাদের চেয়ে বনেদি ঘর আশেপাশে দশটা গ্রামে আর নাই। এই গেল শ্যামার দিকের হিসাব। স্বামীর দিকের হিসাব ধরিলে বিবাহের পর শ্যামা পাইয়াছিল শুধু একটি বিবাহিতা রুগ্ণা ননদকে।

সে মন্দাকিনী।

প্রথম বার স্বামীগৃহে আসিয়া শ্যামা কোনোদিকে তাকানোর অবসর পায় নাই। মন্দাকিনী তখন সুস্থ ছিল। নিজের নানাপ্রকার বিচিত্র অনুভূতি, প্রতিবেশিনীদের ভিড়, বউভাতের গোলমাল সব মিলিয়া তাহাকে একটু উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। মামার কাছে ফিরিয়া যাওয়ার সময় সে শুধু সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল কয়েকটা হইচই-ভরা দিনের স্মৃতি। ছমাস পরে এক আসন্ন সন্ধ্যায় আবার এ বাড়িতে পা দিয়া চোখে সে দেখিয়াছিল অন্ধকার। এ কী অবস্থা বাড়িঘরের? বাড়িতে মানুষ কই? লণ্ঠন দুটা ধোঁয়া ছাড়িতেছে, উঠানে পোড়াকয়লা ছাই ও হাজার রকম জঞ্জালের গাদা, দেয়ালে দেয়ালে ঝুল, পায়ের তলে ধুলাবালির স্তর। আর এক ঘরে মরমর একটা মানুষ।

সে মন্দাকিনী।

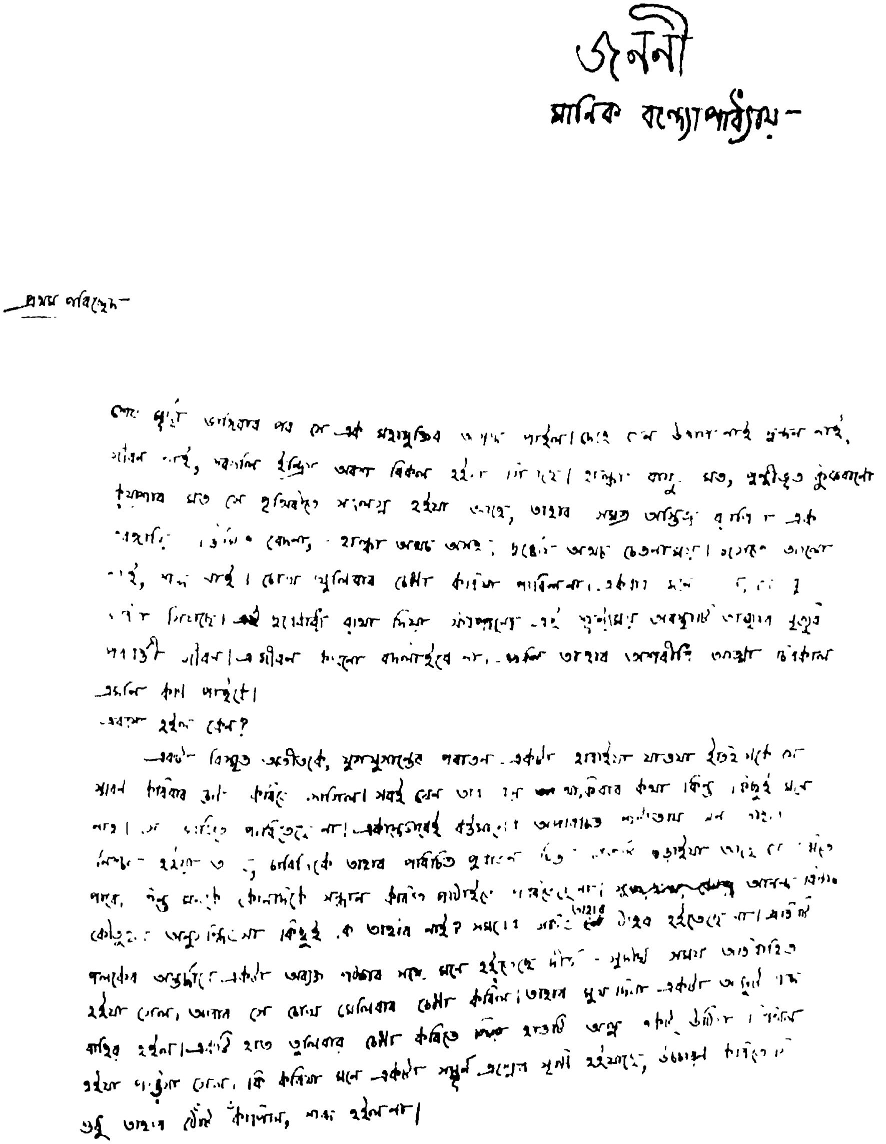
শীতল বলিয়াছিল, সব দেখে শুনে নাও। এবার থেকে সব ভার তোমার।

বলিয়া সে উধাও হইয়া গিয়াছিল। বোধ হয় খাবার কিনিতে, এ বাড়িতে রান্নার কোনো ব্যবস্থা আছে শ্যামা তাহা ভাবিতে পারে নাই। সেইখানে, ভিতরের রোয়াকে তাহার ট্রাঙ্কটার উপর বসিয়া, ভয়ে ও বিষাদে শ্যামার কান্না আসিতেছে, এমন সময় সদরের খোলা দরজা দিয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছিল লম্বাচওড়া জোয়ান একটা মানুষ।

সে রাখাল। মন্দাকিনীর স্বামী।

এই রাখালের সাহায্য না পাইলে শ্যামা তাহার নূতন জীবনের সঙ্গে নিজেকে কীভাবে খাপ খাওয়াইয়া লইত জানিবার উপায় নাই, কারণ রাখালের সাহায্য সে পাইয়াছিল; শুধু সাহায্য নয়, দরদ ও সহানুভূতি। এতদিন রাখাল যে সব ব্যবস্থা করিতে পারিত কিন্তু করে নাই, এবার শ্যামার সঙ্গে সমস্তই সে করিয়া ফেলিল। প্রথমেই বাড়িঘর সাফ হইল। তারপর আসিল কুকারের বদলে পাচক, ঠিকা ঝির বদলে দিবারাত্রির পরিচারিকা। হাটবাজার রান্নাখাওয়া সব অনেকটা নিয়মিত হইয়া আসিল।

মন্দার চিকিৎসার জন্য রাখাল আরও পাঁচ-ছয় মাস এখানে ছিল। সে সময়টা শ্যামার বড়ো সুখে কাটিয়াছিল। সে সময় মতো স্নানাহার করে কিনা রাখাল সেদিকে নজর রাখিত, হাসি-তামাশায় তাহার বিষণ্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিত, শ্যামার বয়সোচিত ছেলেমানুষিগুলি সমর্থন পাইত তারই কাছে। শীতলের মাথায় যে একটু ছিট আছে এটা শ্যামা গোড়াতেই টের পাইয়াছিল। শীতলকে সে বড়ো ভয় করিত, পুরানো হইয়া আসিলেও এখন পর্যন্ত সে ভয় তাহার রহিয়া গিয়াছে। শীতলের না ছিল নেশার সময় অসময়, না ছিল খেয়ালের অন্ত ও মেজাজের ঠিকঠিকানা। প্রথম ছেলেকে কোলে পাইয়া শ্যামা পূর্ববর্তী সাতটা বছরের ইতিহাস আঁতুড়েই অনেকবার স্মরণ করিয়াছে—যে সব দোষের জন্য শীতল তাহাকে শাস্তি দিয়াছিল তাহা মনে করিয়া জ্বলিবার জন্য নয়—শীতল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করিয়াছিল নিজের একটিমাত্র লঘু অপরাধের কথা যদি মনে পড়িয়া যায়, এই আশায়। শীতলের কাছে তাহার কোনো ত্রুটির মার্জনা না থাকাটা ছিল এতবড়ো নিরেট সত্য! কেবল রাখালের কাছেই শ্যামার অপরাধও ছিল না, ত্রুটিও ছিল না। রাখালের এই সহিষ্ণুতা শ্যামার কাছে আরও পূজ্য হইয়া উঠিবার অন্য একটি কারণ ছিল। সে মন্দার গালাগালি। মন্দার অসুখটা ছিল মারাত্মক। স্বভাবও তাহার হইয়া উঠিয়াছিল মারাত্মক। মন্দার পান হইতে চুনটি শ্যামা কখনও খসাইত না বটে—পান মন্দা খাইত না কারণ পান খাওয়ার ক্ষমতা তাহার ছিল না—অনুরূপ তুচ্ছ অপরাধে টি টি করিয়া সে এত এবং এমন



জননী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শেষ মুহূর্ত আসিবার পর সে এই মহামুক্তির [illegible] পাইল। দেহে [illegible] নাই, [illegible] নাই, জীবন নাই, সমস্ত ইন্দ্রিয় একেবারে বিকল হইয়া গিয়াছে। হাল্কা বায়ুর মত, পুঞ্জীভূত কুয়াশার মত সে [illegible] হইয়া আছে, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব [illegible] একটি [illegible] বেদনা, হাল্কা অথচ অসহ্য; [illegible] অথচ চেতনাময়। [illegible] আলো নাই, শব্দ নাই। চোখ খুলিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। [illegible] দিয়াছে। এই [illegible] ধারা দিয়া [illegible] এবং [illegible] তাহার মৃত্যুর পরবর্তী জীবন। এ জীবন [illegible] হইবে না। [illegible] তাহার অশরীরী আত্মা [illegible] এমনি [illegible] পাইছে।

এমন হইল কেন?

একটি বিস্মৃত অতীতকে, যুগযুগান্তের পুরাতন একটি হারাইয়া যাওয়া [illegible] স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সবই যেন তার মনে [illegible] ভাবিবার কথা কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। সে [illegible] পারিতেছে না। একমুহূর্তেই বর্তমানের [illegible] নিষ্ক্রিয় হইয়া [illegible] চারিদিকে তাহার পরিচিত পুরাতন [illegible] যেন [illegible] পারে, কিন্তু মনের কোনখানে সন্ধান করিয়া পাইবে না। [illegible] আনন্দ [illegible] কৌতূহল অনুভূতি কিছুই কি তাহার নাই? সময়ের [illegible] তাহার [illegible] উদ্ভব হইতেছে না। [illegible] পলকের [illegible] একটি অব্যক্ত [illegible] মনে হইয়াছে [illegible] সমস্ত [illegible] একটি [illegible] হইয়া গেল, আবার সে চোখ মেলিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখ দিয়া একটি [illegible] বাহির হইল। একটি হাত তুলিবার চেষ্টা করিতে [illegible] হাতটি [illegible] হইয়া পড়িয়া গেল। কি করিয়া মনে একটি সম্পূর্ণ [illegible] হইয়াছে, [illegible] শুধু তাহার ঠোঁট কাঁপিল, শব্দ হইল না।

জননী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠা

জননী উপন্যাসের লেখক পরিকল্পিত প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভূমিকা-কথা

সব খারাপ কথা বলিত যে শ্যামার মন তিক্ত হইয়া যাইত। শীতলের কোলে গরম চা ফেলিয়া (ভয়ে) গালে একটা চড় খাওয়ার পরক্ষণেই বার্লি দিতে পাঁচ মিনিট দেরি করার জন্য (গালে চড় খাইলে মিনিট পাঁচেক না কাঁদিয়া সে পারিত না) মন্দার গাল খাইয়া নিজেকে যখন শ্যামার বিনামূল্যে কেনা দাসীর চেয়ে কম দামি মনে হইত, রাখাল তখন তাহাকে কিনিয়া লইত দুটি মিষ্টিকথা দিয়া।

শুধু সান্ত্বনা ও সহানুভূতি নয়, রাখাল তাহার অনেক লাঞ্ছনাও বাঁচাইয়া চলিত। কতদিন গভীর রাত্রিতে শীতল বাড়ি ফিরিলে (বন্ধুরা ফিরাইয়া দিয়া যাইত) রাখাল তাহাকে বাহিরে আটকাইয়া রাখিয়াছে, শ্যামার কত অপরাধের শাস্তি দিতে আসিয়া শীতল দেখিয়াছে রাখাল সে অপরাধের অংশীদার, শ্যামাকে শাসন করিবার উপায় নাই। শীতলের কত অসম্ভব সেবার আদেশ রাখাল যাচিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে এ ভাবে স্ত্রীর পক্ষ অবলম্বন করা বিপজ্জনক, বিশেষ স্ত্রীটির যদি বয়স বেশি না হয়। স্বামী নানারকম সন্দেহ করিয়া বসে। কিন্তু রাখাল ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চালাকিতে সংসারে শ্যামা তার জুড়ি দ্যাখে নাই। যে সব আশ্চর্য কৌশলে শীতলকে সে সামলাইয়া চলিত, শ্যামাকে আড়াল করিয়া রাখিত, আজও মাঝে মাঝে অবাক হইয়া শ্যামা সে সব ভাবে। মন্দা সুস্থ হইয়া উঠিলে রাখাল তাহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছিল বনগাঁ। কলিকাতায় এত আপিস থাকিতে বনগাঁয়ে তাহার চাকরি করিতে যাওয়া শ্যামা পছন্দ করে নাই। একদিন, রাখালদের চলিয়া যাওয়ার আগের দিন, ওই কথা লইয়া রাগারাগিও সে করিয়াছিল। বয়স তো শ্যামার বেশি ছিল না। জগতে কারও স্নেহে যে কারও দাবি জন্মে না এটা সে জানিত না। আকুল আগ্রহে বিনা দাবিতেই স্বামীর চেয়ে আপনার লোকটিকে সে ধরিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল। রাখাল চলিয়া গেলে সে দু-চারদিন চোখের জল ফেলিয়াছিল কিনা, আজ, প্রথম সন্তানের মা হওয়ার পর, শ্যামার আর তাহা স্মরণ নাই। সমস্ত নালিশ সে ভুলিয়া গিয়াছে। সেই উদ্‌ভ্রান্ত দিনগুলোকে হয়তো সে রহস্যে ঢাকিয়া রাখিতে ভালোবাসে, কারণ তাহাই স্বাভাবিক। যতই আপনার হইয়া উঠুক, রাখালকে শ্যামা একফোঁটা বুঝিত না, লোকটার প্রকাণ্ড শরীরে যে মনটি ছিল তাহা শিশুর না শয়তানের কোনোদিন তাহা সঠিক জানিবার ভরসা শ্যামা রাখে না। তখন দ্বিপ্রহরে গৃহ থাকিত নির্জন, সন্ধ্যার পর দুটি ভাঙা লণ্ঠনের আলোয় বাড়ি অর্ধেকও আলো হইত না। শীতল যেদিন রাত্রে দেরি করিয়া বাড়ি ফিরিত, দাওয়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া তা:' প্রতীক্ষা করিতে করিতে নিয়মাধীন জীবনযাপন স্বভাবতই শ্যামার কাছে অবাস্তব হইয়া উঠিত,—বয়স তো তাহার বেশি ছিল না। সুতরাং রাখালকেও তাহার মনে হইত নির্মম, মনে হইত লোকটা স্নেহ করে কিন্তু স্নেহের প্রত্যাশা মিটায় না।

শীতলের তখন নিজের একটা প্রেস ছিল, মন্দ আয় হইত না। তবু, অভাব তাহার লাগিয়াই থাকিত। শীতলের মাথায় ছিট ছিল রকমারি, অর্থ সম্বন্ধে একটা বিকৃত উদাসীনতা ছিল তার মধ্যে সেরা। তাহার মনকে বিশ্লেষণ করিলে যোগাযোগ খুঁজিয়া পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কেবল, সে চেষ্টা করিবার মতো অসাধারণ মানসিক বৈশিষ্ট্য ইহা নয়। টাকার প্রতি মমতার অভাবটা অনেকেই নানা উপায়ে ঘোষণা করিয়া থাকে। শীতলের উপায়টা ছিল বিকারগ্রস্ত—তাহা ভীরুতা ও দুর্বলতার বিষে বিষাক্ত। যে সব বোকার দল চিরকাল বুদ্ধিমানদের ভোজ দিয়া আসিয়াছে, সে ছিল তাদের রাজা। বন্ধুরা পিঠ চাপড়াইয়া তাহার মনকে গড়ের মাঠের সঙ্গে তুলনা করিত, তাই পাছে কেহ টের পায় যে মন তাহার আসলে বড়োবাজারের গলি, এই ভয়ে সর্বদা সে সন্ত্রস্ত হইয়া থাকিত। ফেরত পাইবে না জানিয়া টাকা ধার দিত সে, চাঁদার খাতায় মোটা টাকা সই করিত সে, থিয়েটারের বক্স ভাড়া করিত সে, মদ ও আনুষঙ্গিকের টাকা আসিত তাহারই পকেট হইতে। বিকালের দিকে প্রেসের ছোটো আপিসটিতে হাসিমুখে সিগারেট টানিতে টানিতে দু-চারজন বন্ধুর আবির্ভাব হইলে ভয়ে তাহার মুখ

কালো হইয়া যাইত। পাগলামি ছিল তাহার এইখানে। সে জানিত বোকা পাইয়া সকলে তাহার ঘাড় ভাঙে, তবু ঘাড় ভাঙিতে না দিয়াও সে পারিত না।

শেষে, শ্যামার বিবাহের প্রায় চার বছর পরে শীতলের প্রেস বিক্রয় হইয়া গেল। আবোলতাবোল যেমনি খরচ করুক আয় ভালো থাকায় এতকাল মোটামুটি একরকম চলিয়া যাইত, প্রেস বিক্রয় হইয়া যাওয়ার পর তাহাদের কষ্টের সীমা ছিল না। বাড়িটা পৈতৃক না হইলে মাঝখানে কিছুদিনের জন্য হয়তো তাহাদের গাছতলাই সার করিতে হইত। এই অভাবের সময় শ্যামার মামার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হওয়ার শোক শীতলের উথলিয়া উঠিয়াছিল, সব সময় শ্যামাকে কথার খোঁচা দিয়াই তাহার সাধ মিটিত না। শ্যামার গায়ে তাহার প্রমাণ আছে। প্রথম মা হওয়ার সময় শ্যামার কোমরের কাছে যে মস্ত ক্ষতের দাগটা দেখিয়া বুড়ি দাই আপশোশ করিয়াছিল এবং শ্যামা বলিয়াছিল ওটা ফোড়ার দাগ, ছড়ির ডগাতেও সেটা সৃষ্টি হয় নাই, ছাতির ডগাতেও নয়। ওটা বঁটিতে কাটার দাগ। বঁটি দিয়া শীতল অবশ্য তাহাকে খোঁচায় নাই, পা দিয়া পিঠে একটা ঠেলা মারিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, শ্যামা তখন কুটিতেছিল তরকারি।

তরকারি সে আজও কোটে। সুখে দুঃখে জীবনটা অমনই হইয়া গিয়াছে, সিদ্ধ করিবার চাল ও কুটিবার তরকারি থাকার মতো চলনসই। অনেকদিন প্রেসের মালিক হইয়া থাকার গুণে একটা প্রেসের ম্যানেজারির চাকরি শীতল মাস ছয়েক চেষ্টা করিয়াই পাইয়াছিল। শ্যামা প্রথমবার মা হওয়ার সময় শীতল এই চাকরিই করিতেছিল।

বিবাহের সাত বছর পরে প্রথম ছেলে হওয়াটা খুব বেশি বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। অমন বিলম্বিত উর্বরতা বহু নারীর জীবনেই আসিয়া থাকে। শ্যামার যেন সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি। প্রথম ছেলেকে প্রসব করিতে সে সময় লইল দুদিনের বেশি এবং এই দুটি দিন ভরিয়া বারবার মূর্ছা গেল।

শেষ মূর্ছা ভাঙিবার পর শ্যামা এক মহামুক্তির স্বাদ পাইয়াছিল। দেহে যেন তাহার উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে সে বাতাসের মতো হালকা। শীতকালের পুঞ্জীভূত কুয়াশার মতো সে যেন আলগোছে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র বিস্ময়কর অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা, মৃদু অথচ অসহ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ চেতনাময়। একবার তাহার মনে হইল সে বুঝি মরিয়া গিয়াছে, ব্যথা দিয়া ফাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। ভোঁতা যাতনা তাহার অশরীরী আত্মার দুর্ভোগ।

তারপর চোখ মেলিয়া প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। চোখের সামনে সাদা দেয়ালে একটি শায়িত মানুষের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার হাতখানেক উপরে জানালার একটা পাট অল্প একটু ফাঁক করা। ফাঁক দিয়া খানিকটা কালো আকাশ ও কতগুলি তারা দেখা যাইতেছে। একটা গরম ধোঁয়াটে গন্ধ শ্যামার নাকে লাগিয়াছিল। কাছেই কাদের কথা বলিবার মৃদু শব্দ। খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর দেয়ালের ছায়াটা তাহার নিজের বলিয়া চিনিতে পারিয়া সে একটু আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। এমনভাবে সে শুইয়া আছে কেন? তাহার কী হইয়াছে? কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ কীসের? কথা বলিতেছে কারা?

হঠাৎ সব কথাই শ্যামার মনে পড়িয়া গিয়াছিল। পাশ ফিরিতে গিয়া সর্বাঙ্গে বিদ্যুতের মতো তীব্র একটা ব্যথা সঞ্চারিত হইয়া যাওয়ায় সে আবার দেহ শিথিল করিয়া দিয়াছিল। মনের প্রশ্নকে বিহ্বলের মতো উচ্চারণ করিয়াছিল এই অর্থহীন ভাষায় : কোথায় গেল, কই? কে যেন জবাব দিয়াছিল : এই যে বউ এই যে, মুখ ফিরিয়ে তাকা হতভাগি!

কাছে বসিয়াও অনেকদূর হইতে যে কথা বলিয়াছিল সেই বোধ হয় শ্যামার একখানা হাত তুলিয়া একটি কোমল স্পন্দনের উপর রাখিয়াছিল। জাগিয়া থাকিবার শক্তিটুকু শ্যামার তখন ঝিমাইয়া আসিয়াছে। সে অতিকষ্টে একটু পাশ ফিরিয়াছিল।

দেখবি বউ? এই দ্যাখ—

এবার স্বর চিনিতে পারিয়া কম্পিতকণ্ঠে শ্যামা বলিয়াছিল, ঠাকুরঝি?

মন্দাকিনী আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, আর ভাবনা কী বউ? ভালোয় ভালোয় সব উতরে গিয়েছে। খোকা লো, ঘর-আলো-করা খোকা হয়েছে তোর।

মাথা তুলিয়া একবার মাত্র খানিকটা রক্তিম আভা ও দুটি নিমীলিত চোখ দেখিয়া শ্যামা বালিশে মাথা নামাইয়া চোখ বুজিয়াছিল।

শ্যামার যে সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি ছিল তাহা নিঃসন্দেহ।

পরদিন সকালেই সে তাহার প্রথম ছেলেকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙিয়া নিজেকে শ্যামার অনেকটা সুস্থ মনে হইয়াছিল। ঘরে তখন কেহ ছিল না। কাত হইয়া শুইয়া পাশে শায়িত শিশুর মুখের দিকে এক মিনিট চাহিয়া থাকিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল ভিতরে একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া ঘটিয়া চলিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলের মুখখানা তাহার চোখে অভিনব হইয়া উঠিতেছে। কতটুকু মুখ, কী পেলবতা মুখের! মাথা ও ভুরুতে চুলের শুধু আভাস আছে। বেদানার জমানো রসের মতো টুলটুলে আশ্চর্য দুটি ঠোঁট। এ কী তার ছেলে? এই ছেলে তার? গভীর ঔৎসুক্যে সন্তর্পণে শ্যামা হাত বাড়াইয়া ছেলের চিবুক ও গাল ছুঁইয়াছিল, বুকের স্পন্দন অনুভব করিয়াছিল। এই বিচ্ছিন্ন ক্ষীণ প্রাণস্পন্দন কোথা হইতে আসিল? শ্যামা কাঁপিয়াছিল, শ্যামার হইয়াছিল রোমাঞ্চ। স্নেহ নয়, তাহার হৃদয় যেন ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া দিতে চাহিয়াছিল। প্রসবের পর নাড়িসংযোগ বিচ্ছিন্ন সন্তানের জন্য এ কী কাণ্ড ঘটিতে থাকে মানুষের মধ্যে? আশ্বিনের প্রভাতটি ছিল উজ্জ্বল। দুদিন দুরাত্রির মরণাধিক যন্ত্রণা শ্যামা দুঃস্বপ্নের মতো ভুলিয়া গিয়াছিল। আজ সকালে তাহার আনন্দের সীমা নাই।

তখন ঘটিয়াছিল এক কাণ্ড।

ঘুম ভাঙিয়া হঠাৎ শিশু যেন কীরকম করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। টানিয়া টানিয়া শ্বাস নেয়, চঞ্চলভাবে হাত পা নাড়ে, চোখ কপালে তুলিয়া দেয়। ভয়ে শ্যামা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাকিয়াছিল, ঠাকুরঝি গো, ও ঠাকুরঝি!

রান্না ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া ব্যাপার দেখিয়া মন্দা হইয়াছিল বাগি আগুন।

চোখ নেই বউ? সরো তুমি, সরো। গলা শুকিয়ে এমন করছে গো, আহা! মধুর বাটি গেল কোথা? মিছরির জল? দিয়েছ তো উলটে? আশ্চর্যি!

তাকের উপর শিশিতে মধু ছিল। ছোটো একটি বাটিতে মধু ঢালিয়া আঙুলে করিয়া ছেলের মুখ ভিজাইয়া চোখের পলকে মন্দা তাহাকে শান্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। বিড়বিড় করিয়া বলিয়াছিল, আনাড়ি বলে আনাড়ি, এমন আনাড়ি জন্মে চোখে দেখিনি মা! কচি ছেলে, পলকে পলকে গলা শুকোবে, তাও যদি না টের পাও তবে মা হওয়া কেন? দাই মাগিও মানুষ কেমন, তামাকপাতা আনতে গিয়ে বুড়ি হল।

এই তুচ্ছ ঘটনাটি শ্যামার মনে গাঁথা হইয়া আছে. প্রথম সন্তানকে সে যে বারোদিনের বেশি বাঁচাইতে পারে নাই তার সবটুকু অপরাধ চিরকাল শ্যামা নিজের বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে, সন্তান পরিচর্যার কিছুই সে যে তখন জানিত না এই ঘটনাটি শ্যামার কাছে হইয়া আছে তাহার আদিম প্রমাণের মতো। তখন অবশ্য সে জানিত না বারোদিন পরে পেট ফুলিয়া ছেলে তাহার মরিয়া যাইবে। মন্দা চলিয়া গেলে ছেলের দিকে চোখ রাখিয়া সে শান্তভাবেই শুইয়াছিল, গলা শুকানোর লক্ষণ দেখা গেলে মুখে মধু দিবে। অন্যমনে সে অনেক কথা ভাবিয়াছিল। দরজা দিয়া দুটি চড়াই পাখি ঘরে ঢুকিয়া খানিক এদিক ওদিক ফড়ফড় করিয়া উড়িয়া জানালা দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিল, জানালা দিয়াই রোদ

আসিয়া পড়িয়াছিল শ্যামার শিয়রে। জীবনমৃত্যুর কথা শ্যামার তখন মনে পড়ে নাই, ভগবানেব কাণ্ডকারখানা বুঝিতে না পারিয়া সে অবাক হইয়া গিয়াছিল। বুকে তাহার দুদিন দুধ আসিবে না। নবজাত শিশুর জন্য ভগবান দুদিনের উপবাস ব্যবস্থা করিয়াছেন। মন্দার হুকুম স্মরণ করিয়া মাঝে মাঝে ছেলের মুখে সে শুষ্ক স্তন দিয়াছিল। সন্তানের ক্ষুধার আকর্ষণ অনুভব করিয়া ভাবিয়াছিল, হয়তো এ ব্যবস্থা ভগবানের নয়। বুকে তাহাব যথেষ্ট মমতার সঞ্চার হয় নাই, তা হওয়ার আগে দুধ আসিবে না।

তবু, কোন মা সন্তানেব জীবনকে অস্থায়ী মনে না করিয়া পারে? বেলা বাড়িলে পাড়ার কয়েকবাড়ির মেয়েরা শ্যামার ছেলেকে দেখিতে আসিয়া যখন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিল, শ্যামার তখন যেমন গর্ব হইযাছিল তেমনি হইয়াছিল ভয়। ভয় হইয়াছিল এই জন্য : দেবতাবা গোপনে শোনেন। গোপনে শুনিয়া কোন দেবতার হাসিবার সাধ হয় কে বলিতে পারে? তাই বিনয় প্রকাশের জন্য নয়, দেবতার গোপন কানকে ফাঁকি দিবার জন্য শ্যামা বলিয়াছিল : কানা খোঁড়া যে হয়নি মাসিমা তাই ঢের। বলিয়া তাহার এমনই আবেগ আসিয়াছিল যে ঘর খালি হওয়া মাত্র ছেলেকে সে চুম্বনে চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল।

ছেলের গলা শুকানোব স্মৃতি মনে পুষিয়া রাখিবার আবেকটি কারণ ঘটিয়াছিল সেদিন রাত্রে, গভীর রাত্রে।

সারাদুপুর ঘুমানোর মতো স্বাভাবিক কারণেও নিশীথ জাগরণ মানুষের মনে অস্বাভাবিক উত্তেজনা আনিয়া দেয়। দূরে কোথায় পেটা ঘড়িতে তখন বারোটা বাজিয়াছে। শ্যামাব কল্পনা একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল। ঘরের একদিকে বুড়ি দাই অঘোরে ঘুমাইতেছিল। কোণে জ্বলিতেছিল প্রদীপ। এগারোটি দিবারাত্রি এই প্রদীপ অনির্বাণ জ্বলিবে, জাতকের এই প্রদীপ্ত প্রহরী। শিয়রের কাছে মেঝেতে খড়ি দিয়া মন্দা দুর্গানাম লিখিয়া বাখিয়াছে। সকালে আঁচল দিযা মুছিযা ফেলিবে, কেহ না মাড়াইয়া দেয়। সন্ধ্যায় আবার দুর্গানামের রক্ষাকবচ লিখিয়া রাখিবে। আঁতুড়ের রহস্য ভয়ে পরিপূর্ণ, এমনই কত তাহার প্রতিবিধান। হঠাৎ শ্যামার একটা অদ্ভুত অনুভূতি হইয়াছিল। একটা অদৃশ্য জনতা যেন তাহাকে ঘিরিয়া রহিয়াছে। চারিপাশে যেন তাহার অলক্ষ্য উপস্থিতি, অশ্রুত কলরব। সকলেই যেন খুশি, সকলের অনুচ্চাবিত আশীর্বাদে ঘর যেন ভবিয়া গিয়াছিল। শ্যামার বুঝিতে বাকি থাকে নাই এঁরা তাহাব সন্তানেরই পূর্বপুরুষ, ভিড় করিয়া সকলে বংশধরকে দেখিতে আসিয়াছেন। কিন্তু এ কী? বংশধরকে আশীর্বাদ করিয়া তাহাব দিকে এমন ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে সকলে চাহিতেছেন কেন? ভয়ে শ্যামার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। হাতজোড় করিয়া সে ক্ষমা চাহিয়াছিল সকলেব কাছে। মিনতি করিয়া বলিয়াছিল, আর কখনও সে মা হয় নাই, সকালে ছেলে যে তাহার গলা শুকাইয়া মরিতে বসিয়াছিল এ অপরাধ যেন তাহারা না নেন, আব কখনও এ রকম হইবে না। জননীর সমস্ত কর্তব্য সে তাড়াতাড়ি শিখিয়া ফেলিবে।

তারপর ছেলে মানুষ করার বিপুল কর্তব্য আঁতুড়েই নিখুঁতভাবে শুরু করিয়া দিতে শ্যামার আগ্রহের সীমা ছিল না। নিজে সে বড়ো দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, উঠিয়া বসিতে গেলে মাথা ঘুরিত। শুইয়া শুইয়া সে খুঁতখুঁত করিত, এটা হল না ওটা হল না,—মন্দা বিরক্ত হইত, মাঝে মাঝে রাগিয়াও উঠিত। কিন্তু শ্যামার সঙ্গে পারিয়া ওঠা দায়। ছেলের অফুরন্ত সেবার এতটুকু ত্রুটি ঘটিলে সে শুধু ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে বাকি রাখিত। ছেলেকে খাওয়ানো হাঙ্গামার ব্যাপার ছিল না, কাঁদিলে মুখে স্তন তুলিয়া দিলে চুকচুক করিয়া টানিয়া পেট ভরিয়া আসিলে সে আপনি ঘুমাইয়া পড়িত। খুঁটিনাটি সেবাই ছিল অনন্ত। স্নান করাইয়া চোখে কাজল দিলেই শুধু চলিত না, কী কারণে ছেলের চোখে বড়ো পিচুটি পড়িতেছিল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরিষ্কার ভিজা ন্যাকড়ায় তাহা মুছিয়া লইতে হইত। মিনিটে মিনিটে আবিষ্কার করিতে হইত কাঁথা বদলানোর প্রয়োজনকে। ছেলের বুকে একটু সর্দি বসিয়াছিল, ব্যাপারটা সামান্য বলিয়া কেহ তেমন গ্রাহ্য করে নাই. কেবল শ্যামার তাগিদে লণ্ঠনের উপর গরম তেলেব বাটি বসাইয়া

বারবার বুকে মালিশ করিয়া দিতে হইত। এমনই আরও কত কী। নাড়ি কাটিবার দোষেই সম্ভবত ছেলের নাভিমূল চার দিনের দিন পাকিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছিল। শ্যামা নিজে এবং মন্দা ও বুড়ি দাই এই তিনজনে ক্রমাগত ছেলের নাভিতে সেঁক দিয়াছিল।

দিনেব বেলাটা এক বকম কাটিয়া যাইত, শ্যামার ভয় করিত রাত্রে। পূর্বপুরুষদের আবির্ভাবের ভয় নয়, তাঁবা একদিনেব বেশি আসেন নাই,—অসম্ভব কাল্পনিক সব ভয়। শ্যামা যেন কার কাছে গল্প শুনিয়াছিল এক ঘুমকাতুবে মার, ঘুমের ঘোরে যে একদিন আঁতুড়ে নিজের ছেলেকে চাপা দিয়া মারিযা ফেলিয়াছিল। নিজেব ঘুমন্ত অবস্থাকে শ্যামা বিশ্বাস করিতে পারিত না। নাকে মুখে পাতলা কাপড় এক মুহূর্তের জন্য চাপা পড়িলে যে ক্ষীণ অসহায় প্রাণীটি দম আটকাইয়া মরিতে বসে, ঘুমের মধ্যে একখানা হাতও যদি সে তাহার উপরে তুলিয়া দেয় সে কি আর তবে বাঁচিবে? শ্যামা নিশ্চিন্ত হইযা ঘুমাইতে পাবিত না। পাশ ফিরিলেই ছেলেকে পিষিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া চমকিয়া জাগিয়া যাইত। কান পাতিয়া সে ছেলে নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে চেষ্টা করিত। মনে হইত, নিশ্বাস যেন পড়িতেছে। কানকে বিশ্বাস করিয়া তবু সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিত না। মাথা উঁচু করিয়া ছেলেকে দেখিত, নাকের নীচে গাল পাতিয়া নিশ্বাসের স্পর্শ অনুভব করিত। তারপর ছেলের বুকে হাত রাখিয়া স্পন্দন গুনিত—ধুক্‌ধুক্। হঠাৎ তাহার নিজেব হৃৎপিণ্ড সজোরে স্পন্দিত হইয়া উঠিত। এ কী! ছেলের হৃৎস্পন্দন যেন মৃদু হইয়া আসিয়াছে!

নিশীথ স্তব্ধতায় এই আশঙ্কা শ্যামাকে পাইয়া বসিত। সে যেন বিশ্বাস করিতে পারিত না যে এতটুকু একটা জীব নিজস্ব জীবনীশক্তির জোরে ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বাঁচিয়া থাকিতে পারে। শ্যামার কেবলই মনে হইত, এই বুঝি দুর্বল কলকবজাগুলো থামিয়া গেল। পৃথিবীব সমস্ত মানুষ একদিন এমনই ছিল দিনের বেলা এ যুক্তি শ্যামাব কাজে লাগিত, রাত্রে তাহার চিন্তাধারা কোনো যুক্তির বালাই মানিত না, ভয়ে ভাবনায় সে আকুল হইয়া থাকিত। সৃষ্টিব রহস্যময় স্রোতে যে ভাসিয়া আসিয়াছে নিঃশব্দ নির্বিকাব রাত্রিব অজানা বিপদেব কোলে সে মিশিয়া যাইবে, শ্যামার ইহা স্বতঃসিদ্ধের মতো মনে হইত। ছেলে কোলে সে জাগিযা বসিয়া থাকিত। দুর্বলতায় তাহার মাথা ঝিমঝিম করিত। প্রত্যাহত নিদ্রা চোখের সামনে নাচাইত ছাযা। প্রদীপের নিষ্কম্প শিখাটি তাহাকে আশা দিত, ভরসা দিত না।

এই আশঙ্কা ও দুর্ভাবনার ভাগ শ্যামা কাহাকেও দিত না।

ভাগ লইবার কেহ ছিলও না। এক ছিল শীতল, আঁতুড়ের ধারে কাছেও সে ভিড়িত না। ষষ্ঠীপূজার রাত্রে সে কেবল একবার নেশাব আবেশে কী মনে করিয়া আঁতুড়ে ঢুকিয়াছিল। ছেলের শিয়রের কাছে ধপাস কবিয়া বসিয়া পড়িযাছিল এবং অকারণে হাসিয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল, তুমি কী গো? বিছানা ছুঁয়ে দিলে?

শীতল বলিয়াছিল, খোকাকে একটু কোলে নিই! ...বলিয়া ছেলের বগলের নীচে হাত দিয়া তুলিতে গিয়াছিল। শ্যামা ঝটকা দিয়া তাহার হাত সরাইয়া দিয়া বলিয়াছিল কী কর? ঘাড় ভেঙে যাবে যে?

ঘাড় শক্ত হয়নি?

নাকে গন্ধ লাগায় এতক্ষণে শ্যামা টের পাইয়াছিল।

গিলেছ বুঝি? তুমি যাও বাবু এখান থেকে, যাও।

নেশা কবিলে শীতলের মেজাজ জল হইয়া করুণ রসে মন থমথম করে। সে ছলছল চোখে বলিয়াছিল, আর করব না শ্যামা। যদি করি তো খোকার মাথা খাই!

শ্যামা বলিয়াছিল, কথাব কী ছিরি। যাও না বাবু এখান থেকে?

শীতল বড়ো দমিয়া গিয়াছিল। যেন কাঁদিয়াই ফেলিবে। খানিক পরে শ্যামার বালিশটাকে শোনাইয়া বলিয়াছিল, একবার কোলে নেব না বুঝি!

শ্যামা বলিয়াছিল, কোলে নেবে তো আসনপিঁড়ি হয়ে বোসো। তুলবার চেষ্টা করলে কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।

শীতল আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলে শ্যামা সন্তর্পণে ছেলেকে তাহার কোলে শোয়াইয়া দিয়াছিল। লোকে যে ভাবে অচল দোয়ানি দ্যাখে ঝুঁকিয়া তেমনিভাবে ছেলের মুখ দেখিয়া শীতল বলিয়াছিল, যমজ নাকি, অ্যাঁ?

নেশার সময় মাঝে মাঝে শীতলের চোখের সামনে একটা জিনিস দুটা হইয়া যাইত।

শুধু সেই একদিন। ছেলে কোলে করার সাধ শীতলের আর কখনও আসে নাই। যে কদিন ছেলে বাঁচিয়াছিল আনন্দ ও ভয় উপভোগ করিয়াছিল শ্যামা একা। পাড়ায় শ্যামার সখী কেহ ছিল না। ছেলে হওয়ার খবর পাইয়া কয়েক বাড়ির কৌতূহলী মেয়েরা একবার দেখিয়া গিয়াছিল, এই পর্যন্ত। শ্যামা মন খুলিয়া কথা বলিতে পারে এমন কেহ আসে নাই। একজন, যে কখনও এ বাড়িতে পা দেয় নাই, শ্যামার সঙ্গে ভাব করিতে চাহিয়াছিল। সে পাড়ার মহিম তালুকদারের স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া। পাড়ায় মহিম তালুকদারের চেয়ে বড়োলোক কেহ ছিল না। ভাব করা দূরে থাক, শ্যামাকে দেখিতে আসাটাই বিষ্ণুপ্রিয়ার পক্ষে এমন অসাধারণ ব্যাপার যে শ্যামা শুধু বিনয় করিয়াছিল, ভাব করিতে পারে নাই।

তখন শীতল ছাপাখানায় গিয়াছে, মন্দা রান্না শেষ করিয়া শ্যামার ছেলেকে স্নান করানোর আয়োজন করিতেছে। কে জানিত এমন অসময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া বেড়াইতে আসিবে—গয়না-পরা দাসীকে সঙ্গে করিয়া?

শ্যামা বলিয়াছিল, ও ঠাকুরঝি, ও ঘর থেকে কার্পেটের আসনটা এনে বসতে দাও।

মন্দা বলিয়াছিল, কার্পেটের আসন তো বাইরে নেই বউ, তোরঙ্গে তোলা আছে।

মন্দার বুদ্ধির অভাবে শ্যামা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। একটা তুচ্ছ কার্পেটের আসন তাও যে তাহারা তোরঙ্গে তুলিয়া রাখে বিষ্ণুপ্রিয়াকে এ কথাটা কি না শোনাইলেই চলিত না!

খুলে আন না?

দাদা চাবি নিয়ে ছাপাখানায় চলে গেছে বউ।

অগত্যা একটা মাদুর পাতিয়াই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বসিতে দিতে হইয়াছিল। মাদুরে বসিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার কোনোই অসুবিধা হয় নাই, কেবল শ্যামার মনের মধ্যে এই কথাটা খচখচ করিয়া বিঁধিয়াছিল যে এত বড়োলোকের বউ যদিবা বাড়ি আসিল তাহাকে বসিতে দিতে হইল ছেঁড়া মাদুরে।

গরম জল কী হবে ঠাকুরঝি?—বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

ছেলেকে নাওয়াবো।

নাওয়ান, দেখি বসে বসে।

মন্দা হাসিয়া বলিয়াছিল, দেখাও হবে শেখাও হবে, না? আপনার দিনও তো ঘনিয়ে এল।—বলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার গলায় মুক্তার মালা আর কানে হিরার দুল চোখে পড়ায় অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া মন্দা আবার বলিয়াছিল, তবে আপনি কী আর নিজে ছেলে নাওয়াবেন, ছেলে নাওয়াবার কটা ধাত্রীই থাকবে আপনার।

বিষ্ণুপ্রিয়া এ ধরনের কত মন্তব্য শুনিয়াছে। সে মৃদু হাসিয়া বলিয়াছিল, আপনার ছেলেমেয়ে কটি ঠাকুরঝি?

মেয়ে নেই, ...তিনটি ছেলে, দুটি যমজ। কোলেরটিকে সঙ্গে এনেছি, বড়ো দুটি শাশুড়ির কাছে আছে।

স্নানের জলে পাঁচটি দূর্বা ছাড়িয়া মন্দা জানালা বন্ধ করিয়াছিল। শ্যামা উৎকণ্ঠিতা হইয়া বলিয়াছিল, জল বেশি গরম নয় তো ঠাকুরঝি?

মন্দা বলিয়াছিল, আমি কি পাগল বউ গরম জলে তোমার ছেলেকে পুড়িয়ে মারব?

শ্যামা বলিয়াছিল, নবম চামড়া যে ঠাকুরঝি, একটু গরম হলেই সইবে না।—জলে হাত দিয়া সে চমকাইয়া উঠিয়াছিল, জল যে দিব্যি গরম গো।

জল বুঝি ঠান্ডা হতে জানে না বউ?

ইহার পরেই বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবাব ভঙ্গি অত্যন্ত শিথিল হইয়া আসিয়াছিল। শ্যামার মধ্যে সে যেন হঠাৎ কী আবিষ্কার করিয়াছে। আব সে সহজে শ্যামাব সঙ্গ ছাড়িবে না। বাড়ি হইতে বারবার তাগিদ আসিয়াছিল। বিষ্ণুপ্রিয়া বাড়ি যায় নাই। বসিয়া বসিয়া শ্যামার সঙ্গে রাজ্যের গল্প করিয়াছিল।

কয়েকদিন পবে বিষ্ণুপ্রিয়া আবাব আসিয়াছিল। কেহ টেব পায় নাই যে সান্ত্বনা দিতে নয়, সে ছেলের জন্য শ্যামার শোক দেখিতে আসিয়াছিল। শ্যামার প্রথম সন্তান বাঁচিয়াছিল বারো দিন।

দুই

দুবছরেব মধ্যে শ্যামাব কোলে আবাব ছেলে আসিল। সেই বাড়িতে, সেই ছোটো ঘরে শরৎকালের তেমনি এক গভীর নিশীথে। কিন্তু মানুষের জীবনে অভাবের পূরণ আছে ক্ষতির পূবণ নাই বলিয়া প্রথম সন্তানকে শ্যামা ভুলিতে পারে না। ছেলে মরিয়া যাওয়ার পব কয়েকমাস সে মুহ্যমানা হইয়াছিল, এই অবস্থাটি অতিক্রম করিতে তাহার মধ্যে যে পবিবর্তন আসিযাছিল এখনও তাই স্থায়ী হইয়া আছে। সন্তানেব আবির্ভাবে এবাব আব তাহাব সেই অসংযত উল্লাস আসে নাই, উদ্দাম কল্পনা জাগে নাই। সে শান্ত হইয়া গিযাছে। সংসারধর্ম কবিলে ছেলেমেয়ে হয়, ছেলেমেয়ে হইলে মানুষ সুখী হয়, এবারের ছেলে হওযাটা তাহাব কাছে শুধু এই। এতে না আছে বিস্ময়, না আছে উন্মত্ততা ;—চোখের পলকে একটা বিবাট ভবিষ্যৎকে গড়িযা তুলিয়া বহিয়া বেড়ানো, ক্ষণে ক্ষণে নব নব কল্পনার তুলি দিযা এই ভবিষ্যতের গাযে বং মাখানো, আর সর্বদা ভয়ে ও আনন্দে মশগুল হইয়া থাকা, এ সব কিছুই নাই। এবারও আঁতুড়ে এগারোটি দিবাবাত্রি অনির্বাণ দীপ জ্বলিয়াছিল, কিন্তু শ্যামার এবার একেবারেই ভয় ছিল না, শুধু ছিল গভীব বিষণ্ণতা। এবার পূর্বপুরুষেরা গভীর রাত্রে শ্যামার ছেলেকে ভিড় করিয়া দেখিতে আসেন নাই। ছেলেব ক্ষীণ বক্ষস্পন্দন হঠাৎ একসময় থামিয়া যাইতে পা া শ্যামাব এ আশঙ্কা ছিল, কিন্তু আশঙ্কায ব্যাকুল হইযা সে জাগিযা রাত কাটায নাই। ও বিষয়ে তাহার কেমন একটা উদাসীনতা আসিয়াছে। ভাবিয়া লাভ নাই, উতলা হইযা লাভ নাই, ধরিয়া রাখিবাব চেষ্টা করিয়া কোনো ফল হইবে না। যিনি দেন, তিনিই নেন। তাঁব দেওযাকে যখন ঠেকানো যায না, নেওয়াকে ঠেকাইবে কে?

সে শীতলকে স্পষ্ট বলিয়াছে : এবার আব যত্নটত্ন করব না বাবু।

অযত্ন কবা কি ভালো হবে?

অযত্ন কবব না তো। নাওযাবো, খাওয়াবো, যেমন যেমন দরকার সব করব। তার বেশি কিছু নয। কী হবে কবে?

শীতল কিছু বলে নাই। কী বলিবে?

শ্যামা আবার বলিয়াছে, সেবার আমার দোষেঃ তো গেল।

শীতল একটু ভাবিয়া বলিয়াছে, এটার কিন্তু পয় আছে শ্যামা। হতে না হতে কমল প্রেসের চাকরিটা পেলাম।

বোলো না বাবু ও সব। পয না ছাই। আগে বাঁচুক।

কিন্তু কথাটা তুচ্ছ করিবার মতো নয়। পয়মন্ত ছেলে? হয়তো তাই। সব অকল্যাণ ও নিরানন্দের অন্ত করিতে আসিয়াছে হয়তো। শ্যামা হয়তো আর দুঃখ পাইবে না।

এরা সময় মতো মাইনে দেবে?

দেবে না? কমল প্রেস কত বড়ো প্রেস জানো!

এবার ছেলে তাহার বাঁচিবে শ্যামা যে এ আশা করে না এমন নয়। মানুষের আশা এমন ভঙ্গুর নয় যে একবার ঘা খাইলে চিরদিনের জন্য ভাঙিয়া পড়িবে। তবু আশাতেই আশঙ্কা বাড়ে। সব শিশুই যদি মরিয়া যাইত পৃথিবীতে এতদিনে তবে আর মানুষ থাকিত না, শ্যামার এই পুরানো যুক্তিটাও এবার হইয়া গিয়াছে বাতিল। সংসারে এমন কত নারী আছে যাদের সন্তান বাঁচে না। সেও যে তাদের মতো নয় কে তাহা বলিতে পারে? একে একে পৃথিবীতে আসিয়া তাহার ছেলেমেয়েরা কেউ বারোদিন কেউ ছ মাস বাঁচিয়া যদি মরিয়া যাইতে থাকে? বলা তো যায় না। এমনই যাদের অদৃষ্ট তাদের এক একটি সন্তান দশ-বারো বছর টিকিয়া থাকিয়া হঠাৎ একদিন মরিয়া যায়, এবকমও অনেক দেখা গিয়াছে। হালদার বাড়ির বড়ো বউ দুবার মৃতসন্তান প্রসব করিয়াছিল, তাবপরের সন্তান দুটি বাঁচিয়া ছিল বছরখানেক। শেষে যে মেয়েটা আসিয়াছিল তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছিল। কী আদরেই মেয়েটা বড়ো হইয়াছিল। তবু তো বাঁচিল না।

নৈসর্গিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা এবার কম করা হয় নাই। শ্যামা গোটা পাঁচেক মাদুলি ধারণ করিয়াছে, কালীঘাট ও তারকেশ্বরে মানত করিয়াছে পূজা। মাদুলিগুলির মধ্যে তিনটি বড়ো দুর্লভ মাদুলি। সংগ্রহ করিতে শ্যামাকে কম বেগ পাইতে হয় নাই। মাদুলি তিনটির একটিতে প্রসাদি ফুল, একটিতে সন্ন্যাসীপ্রদত্ত ভস্ম ও অপরটিতে স্বপ্নাদ্য শিকড় আছে। শ্যামাব নির্ভর এই তিনটি মাদুলিতেই বেশি। নিজে সে প্রত্যেক দিন মাদুলি-ধোয়া জল খায়, একটি একটি কবিয়া মাদুলিগুলি ছেলের কপালে ছোঁযায়। তারপর খানিকক্ষণ সে সত্যসত্যই নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে।

এবারও মন্দাকিনী আসিযাছে। সঙ্গে আনিয়াছে তিনটি ছেলেকেই। শ্যামার সেবা কবিতে আসিয়া নিজের ছেলের সেবা করিয়াই তাহার দিন কাটে। এমন আবদারে ছেলে শ্যামা আর দ্যাখে নাই। ঠাকুরমাব জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে যমজ ছেলে দুটি বাড়ি ঢুকিযাছিল, তারপর কতদিন কাটিয়া গিয়াছে, এখনও তাহারা এখানে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া লইতে পারে নাই। বায়না ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে না মিটিলে ঠাকুরমার জন্যই তাহাদের শোক উথলিয়া ওঠে। দিবারাত্রি বায়নারও তাহাদের শেষ নাই। অপরিচিত আবেষ্টনীতে কিছুই বোধ হয় তাহাদের ভালো লাগে না, সর্বদা খুঁতখুঁত করে। কাবণে অকাবণে রাগিয়া কাঁদিয়া সকলকে মারিয়া অনর্থ বাধাইয়া দেয়। মন্দা প্রাণপণে তাহাদেব তোয়াজ করিয়া চলে। সে যেন দাসী, রাজার ছেলে দুটি দুদিনের জন্য তাহার অতিথি হইয়া সৌভাগ্য ও সম্মানে তাহাকে পাগল করিয়া দিয়াছে, ওদের তুষ্টির জন্য প্রাণ না দিয়া সে ক্ষান্ত হইতে পারে না। শ্যামা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, পরে টের পাইয়াছে এমনিভাবে মাতিয়া থাকিবার জন্যই মন্দা এবার ছেলে দুটিকে সঙ্গে আনিয়াছে। সেখানে শাশুড়িকে অতিক্রম করিয়া ওদের সে নাগাল পায় না। সাধ মিটাইয়া ওদের ভালোবাসিবাব জন্য, আদবযত্ন করিবার জনা, সেই যে ওদের আসল মা এটুকু ওদের বুঝাইয়া দিবার জন্য, মন্দা এবার ওদের সঙ্গে আনিয়াছে।

আনিয়াছে চুরি করিয়া।

মন্দাই সবিস্তারে শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিয়াছে। কথা ছিল শুধু কোলের ছেলেটিকে সঙ্গে লইয়া মন্দা আসিবে, শাশুড়ির দুচোখেব দুটি মণি যমজ ছেলে দুটি, কানু আর কালু, শাশুড়ির কাছেই থাকিবে। কিন্তু এদিকে কাঁদাকাটা করিয়া স্বামীর সঙ্গে যে গভীর ও গোপন পরামর্শ মন্দা করিয়া রাখিয়াছে শাশুড়ি তার কী জানেন? মন্দাকে আনিতে গিয়াছিল শীতল, কানু ও কালু স্টেশনে আসিয়াছিল বেড়াইতে, রাখাল সঙ্গে আসিয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য। গাড়ি ছাড়িবার সময় রাখাল একাই নামিয়া গিয়াছিল। কানু ও কালু তখন নিশ্চিন্তে মনে রসগোল্লা খাইতেছে।

শীতল বলিয়াছিল, গাড়ি ছাড়ার সময় হল, ওদের নামিয়ে নাও হে রাখাল।

বাখাল বলিয়াছিল, যাক না যাক, মামা বাড়ি থেকে কদিন বেড়িয়ে আসুক।

মন্দা বলিয়াছিল, ওরাও যাবে যে দাদা। উনি টিকিট কেটেছেন, এই নাও।

শ্যামাকে ব্যাপারটা বলিবাব সময় মন্দা এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটুকু উদ্ধৃত করিতেও ছাড়ে নাই, বলিয়াছে, দাদা কিছু টের পায়নি বউ, ভেবেছিল শাশুড়ি বুঝি সত্যিসত্যি শেষে মত দিয়েছে। ফিরে গেলে যা কাণ্ডটা হবে! পেটেব ছেলে চুরি করার জন্যে আমায় না শেষে জেলে দেয়।

এদিক দিয়া শ্যামাব ববাবব সুবিধা ছিল, স্বামীর জননীর খেয়াল মতো কখনও তাহাকে পুতুলনাচ নাচিতে হয় নাই। তবু, মাঝে মাঝে শাশুড়িব অভাবে তাহার কী কম ক্ষোভ হইয়াছে! আর কিছু না হোক, বিপদে আপদে মুখ চাহিয়া ভবসা করিবাব সুযোগ তো সে পাইত। মন্দা কোনো দায়িত্ব গ্রহণ করে না, কেবল কাজ চালাইয়া দেয়। সেবাব যে শ্যামার ছেলে মরিয়া গেল সে যদি কাহারও দোষে গিয়া থাকে অপরাধিনী শ্যামা, মন্দার কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু শাশুড়ি থাকিলে তিনিই সকল দায়িত্ব গ্রহণ করিতেন, শুধু আঁতুড়ে তাহাকে এবং বাহিরে তাহাব সংসাবকে সাহায্য করিয়া ক্ষান্ত না থাকিয়া ছেলেকে বাঁচাইয়া বাখার ভারও থাকিত তাহারই। যে সব ব্যবস্থাব দোষে ছেলে তাহার মরিয়া গিয়াছিল সে তাহা বুঝিতে না পারুক শাশুড়ির অভিজ্ঞ দৃষ্টিতে অবশ্যই ধরা পড়িত। তা ছাড়া, স্বামীর মা তো পব নয় যে ছেলেকে সবদিক দিয়া ঘেবিয়া থাকিলে তাহাকে কোনো মায়ের হিংসা করা চলে! মন্দাকে শ্যামা সমর্থন করিতে পারে না।

বললে, ওদেব না আনলেই ভালো কবতে ঠাকুবঝি।

মন্দা বলে, ভালো দিয়ে আমাব কাজ নেই বাবু—সে ডাইনি মাগিব ভালো। আদব দিয়ে দিয়ে মাথা খাচ্ছেন আব দিনবাত জপাচ্ছেন আমাকে ঘেন্না কবতে,—বড়ো হলে ওরা কেউ আমাকে মানবে? এখনই কেমনধাবা কবে দ্যাখো না?

কিন্তু এ কটা দিনে ওদেব তুমি কী কবতে পাববে ঠাকুবঝি? ফিরে গেলেই তো যে কে সেই। মাঝ থেকে শাশুড়িব কতগুলো গালমন্দ খেয়ে মরবে।

মন্দাব এ সব হিসাব কবাই আছে।

একটু চেনা হয়ে বইল। একেবারে কাছে ঘেঁষত না, এবাব ডাকলে-টাকলে একবাব দুবাব আসবে।

একদিন বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়াছিল।

বিষ্ণুপ্রিয়াব একটি মেয়ে হইয়াছে। মেয়েব জন্মেব সময় সেও শ্যামার মতো কষ্ট পাইয়াছিল, শ্যামাব ভাগ্যেব সংগে তাহাব ভাগ্যের পার্থক্য কিন্তু সবদিক দিয়াই আকাশ-পাতাল, মেয়েটি তাহার মরে নাই, সোনার চামচে দুধ খাইয়া বড়ো হইতেছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীব খুব খারাপ হইয়া পড়িয়াছিল, কোথায় হাওয়া বদলাইতে গিয়া সারিয়া আসিয়াছে কিন্তু এখনও তাহার চোখ দেখিলে মনে হয় রোগযন্ত্রণাব মতোই কী একটা অস্থিরতা যেন সে ভিতরে চাপিয়া রাখিয়াছে। তা ছাড়া, তাহার সাজসজ্জার অভাবটা অবাক করিয়া দেয়। এমন একদিন ছিল সে যখন বসনভূষণে, কেশরচনা ও দেহমার্জনার অতুল উপাদানে নিজেকে সব সময় ঝকঝকে করিয়া রাখিত। ত্বকে থাকিত জ্যোতি, কেশে থাকিত পালিশ, বসনে থাকিত বর্ণ ও ভূষণে থাকিত হিরার চমক। এখন সে সব কিছুই তাহার নাই। অলংকার প্রায় সবই সে খুলিয়া ফেলিযাছে, বিন্যস্ত কেশরাজিতে ধরিয়াছে কতগুলি ফাটল, সে কাছে থাকিলে সাবান ছাড়া আর কোনো সুগন্ধির ইঙ্গিত মেলে না। তাও মাঝে মাঝে নিশ্বাসের দুর্গন্ধে চাপা পড়িয়া যায়।

ঘনিষ্ঠতার বালাই না থাকিলেও মন্দা চিরকাল ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করিয়া থাকে।

সাজগোজ একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন দেখছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাসিয়া বলে, এবাব মেয়ে ও সব করবে।

একটি মেয়ে বিঁইয়ে সন্নেসিনী হয়ে গেলেন?

একটি-দুটির কথা নয় ঠাকুরঝি। নিজে ছেলেমেয়ে মানুষ করতে গেলে ও একটিই থাক আর দুটিই থাক ফিটফাট থাকা আর পোষায় না। মেয়ে এই এটা করছে এই ওটা করছে—নোংরামির চূড়ান্ত, তার সঙ্গে কি এসেন্স মানায়? মেয়ে একটু বড়ো হলে হয়তো আবার শুরু করব। তা করব ঠাকুরঝি, এ বয়সে কি আর বুড়ি হয়ে থাকব সত্যিসত্যি!

শ্যামা বলে, মেয়ে বড়ো হতে হতে আর একটি আসবে যে!

বিষ্ণুপ্রিয়া জোর দিয়া বলে, না, আর আসবে না।

মন্দা খিলখিল কবিয়া হাসে : বললেন বটে একটা হাসির কথা! এখুনি রেহাই পাবেন? আরও কত আসবে, ভগবান দিলে কারও সাধ্যি আছে ঠেকিয়ে রাখে?

শ্যামা বলে, ঠাকুরঝি আপনাকে জব্দ করে দিলে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলে, আমাকে জব্দ করা আর শক্ত কী?

যে বিষ্ণুপ্রিয়ার এমনই পরিবর্তন হইয়াছে একদিন সকালে সে শ্যামাকে দেখিতে আসিল। মেয়েকে সে সঙ্গে আনিল না। মেয়েকে সঙ্গে করিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া কোথাও যায় না, কারও বাড়ি মেয়েকে যাইতেও দেয় না, ঘরের কোণে লুকাইয়া রাখে। বাড়ির পুরানো ঝি ছাড়া আর কারও কোলে সে মেয়েকে যাইতে দেয় না। মেয়ের সম্বন্ধে তাহার একটা সন্দেহজনক গোপনতা আছে, পাড়ার মেয়েরা এমনি একটা আভাস পাইয়া কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিল। তারপর সকলেই জানিয়াছে। জানিয়াছে যে বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ে পৃথিবীতে আসিয়াছে পাপের ছাপ লইয়া, মহিম তালুকদার ভীষণ পাপী।

এবার বিষ্ণুপ্রিয়াকে কার্পেটের আসনটাতেই বসিতে দেওয়া হইল। মন্দা ভদ্রতা করিয়া জিজ্ঞাসাও করিল, আপনাকে এক কাপ চা করে দি?

চা? বিষ্ণুপ্রিয়া চা খায় না।

খায় না? মন্দা সুন্দর অবাক হইতে জানে, কী আশ্চর্যি!—তা, চা আমার মেজো ননদও খায় না। তার বিয়ে হয়েছে চিলপাহাড়ির জমিদারবাড়ি, মস্ত বড়োলোক তারা, চালচলন সব সাহেবি। বিয়ের আগে আমার ননদ খুব চা খেত, বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ছেড়ে দিলে। বললে, চা খেলে গায়ের চামড়া কর্কশ হয়। আমার মেজো ননদ খুব সুন্দরী কিনা, রং প্রায় গিয়ে মেমদের মতো কটা, রং খারাপ হবার ভয়ে মরে থাকে। আমার কর্তাটিকে দেখেননি? ওদের হল ফরসার গুষ্টি, তাদের মধ্যে ওনার রং সবচেয়ে মাজা, তারপরেই আমার মেজো ননদ।

ছেলেদের জন্য বসিয়া কারও সঙ্গে কথা বলিবার অবসর মন্দা পায় না। উঠানে দুই ছেলে চৌবাচ্চার জল নষ্ট করিতেছে দেখিয়া সে উঠিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, আপনার ননদটি বেশ। খুব সরল।

মুখ্যু।

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রতিবাদ করিল না। আঁচলে মুখ মুছিয়া শ্যামার সঙ্গে চোখোচোখি হওয়ায় একটু হাসিল। বাহিরে ঝকঝকে রোদ উঠিয়াছিল। শহরতলির বাড়ি, জানালা দিয়ে পুকুরও চোখে পড়ে, গাছপালাও দেখা যায়। আর পাখি। শরৎকালে পথ ভুলিয়া কতগুলি পাখি শহরের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, তোমার ছেলের জন্যে দুটো একটা জামাটামা পাঠালে কিছু মনে করবে ভাই? মনে যদি কর তো স্পষ্ট বলো, মনে এক আর মুখে এক করো না।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বলার ভঙ্গিতে শ্যামা একটু অবাক হইয়া গেল। বলিল, জামার দরকার তো নেই।

দরকার নাই বা রইল, বেশিই না হয় হবে।—পাঠাব?

শ্যামা একটু ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা।

আনকেবা নতুন জামা, দর্জিবাড়ি থেকে সোজা তোমায় দিয়ে যাবে,—আমার মেয়ের জামাটামার সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি হবে না ভাই।

হলই বা ছোঁয়াছুঁয়ি?

বিকালে বিষ্ণুপ্রিয়ার উপহার আসিল। কচি ছেলের দরকারি কয়েকটা জিনিস। গালিচার মতো পুরু ও নবম ফ্ল্যানেলেব কয়েকটি কাঁথা, ছেলেকে জড়াইয়া পুঁটলি করিয়া কোলে নেওয়ার জন্য ধবধবে সাদা কোমল তিনটি তোয়ালে আর আধ ডজন শেমিজের মতো পাতলা লম্বা জামা। শেষোক্ত পদার্থগুলি মন্দাকে বিস্মিত করে।

এগুলো কী বউ? আলখাল্লা নাকি?

শ্যামা হাসে : ঠাকুবঝি যে কী! সাযেবদেব ছেলেরা পরে দ্যাখোনি?

তুমি যেন কত দেখেছ!

দেখিনি। গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায় কত দেখেছি!

ও, কত তুমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ গড়ের মাঠে চিড়িয়াখানায়!

না ঠাকুরঝি, ঠাট্টা নয়, আগে সত্যি নিয়ে যেত, চার-পাঁচবার গিয়েছি যে, সায়েবদের কচি কচি ছেলেদেব এমনি জামা পরিযে ঠেলাগাড়িতে করে আয়ারা বেড়াতে আনত। এমন সুন্দর ছেলেগুলি, চুবি করে আনতে সাধ হত আমার।

পুবানো কাঁথার উপর শ্যামা নূতন কাঁথা বিছায়, ছেলের গায়ের তৈলাক্ত পেনিটি খুলিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওযা আলখাল্লা পরায়, তারপব একখানা তোয়ালে জডাইয়া শোয়াইয়া দেয়। আনন্দে অভিভূতা হইয়া বলে, কী বকম দেখাচ্ছে দ্যাখো ঠাকুবঝি।

মন্দা হাসিমুখে সায দিযা বলে, খাসা দেখাচ্ছে বউ। ওমা, মুখ বাঁকায যে!

ছেলেকে শ্যামা সত্যসত্যই পুঁটুলি করিয়াছে। হাত পা নাড়িতে না পারিয়া সে হাঁপাইয়া কাঁদিয়া ওঠে। তোযালেটা শ্যামা তাডাতাড়ি খুলিয়া লয। মন্দা শিশুকে কোলে লইয়া বলিতে থাকে অ সোনা, অ মানিক,—তোমায বেঁধেছিল, শক্ত কবে বেঁধেছিল, মবে যাই! শ্যামার গাযে কাঁটা দেয়, মাথা দুলাইয়া ঝোঁক দিযা দিযা মন্দা বলিতে থাকে, মেবেছে? আমাব ধনকে মেরেছে' কে মেবেছে রে! আ লো আ লো—ন ন ন

শ্যামা উত্তেজিত হইযা বলে, ও ঠাকুরঝি, ও যে হাসল!

মন্দা দেখিতে পায নাই। তবু সে সায দিয়া বলে, পিসির আদরে হাসবে না?

কী আশ্চর্য কাণ্ড ঠাকুবঝি! ওইটুকু ছেলে হাসে!

এ রকম আশ্চর্য কাণ্ড দিবারাত্রিই ঘটিতে থাকে। খোকার সম্বন্ধে এবাব সে কিনা অনেক বিষয়েই উদাসীন থাকিবে ঠিক করিয়াছে, খোকার আশ্চর্য কাণ্ডগুলিতে অনেক সময় শ্যামা শুধু তাই মনে মনে আশ্চর্য হয়, বাহিবে কিছু প্রকাশ করে না। খোকার হাত পা নাড়িযা খেলা করা দেখিয়া মনে যখন তাহার দোলা লাগে, খেলার অর্থহীন হাত-নাড়া আর ক্ষুধার সময় স্তন খুঁজিয়া হাত-নাডার পার্থক্য লক্ষ করিয়া তাহাব যখন সকলকে ডাকিয়া এ ব্যাপা' দেখাইতে ইচ্ছা হয়, শ্যামা তখন নিজেকে সতর্ক করিয়া দেয়। স্মবণ করে যে সন্তানকে উপলক্ষ করিয়া জননীর অসংযত উল্লাস অমঙ্গলজনক। আনন্দের একটা সীমা ভগবান মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন মানুষ তাহা লঙ্ঘন করিলে তিনি রাগ করেন। তবু, সব সময় শ্যামা কি আর নিজেকে সামলাইয়া চলিতে পারে? অন্যমনস্ক অবস্থায় হঠাৎ একসময় ঝাঁ করিয়া খোকাকে সে কোলে তুলিয়া লয়। তাহার পাঁজরের একদিকে থাকে হৃৎপিণ্ড আরেক দিকে থাকে খোকা, খোকার লালিম পা দুটি হইতে কেশবিরল মাথাটি পর্যন্ত শ্যামা অসংখ্য চুম্বন করে, দীর্ঘনিশ্বাসে খোকার দেহের আঘ্রাণ লয়। তারপর সে অনুতাপ করে। বাড়াবাড়ি করিয়া একবার তাহার সর্বনাশ হইয়াছে, তবু কি শিক্ষা হইল না?

শীতলের মিশ্র খাপছাড়া প্রকৃতিতেও বাৎসল্যের আবির্ভাব হইযাছে। বাৎসল্যের বসে তাহাব ভীরু উগ্রতাও যেন একটু নরম হইয়া আসিয়াছে। পিতৃত্বের অধিকার খাটাইয়া ছেলের সঙ্গে সে একটু মাখামাখি করিতে চায়, শ্যামা সভয়ে বাধা দিলে রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণই যেন হয়—প্রকৃতপক্ষে, রাগ করার বদলে ক্ষুণ্ণ হয বলিয়াই তাহার বিপজ্জনক আদরের হাত হইতে ছেলেকে বাঁচাইয়া চলিবার সাহস শ্যামার হয়। সে উপস্থিত না থাকিলে ছেলেকে কোলে তুলিতে শীতলকে সে বারণ করিয়া দিয়াছে। মাঝে মাঝে দু-চার মিনিটের জন্য ছেলেকে স্বামীর কোলে সে দেয কিন্তু নিজে কাছে দাঁড়াইয়া থাকে, পুলিশের মতো সতর্ক পাহারা দেয়।

মাঝে মাঝে শীতল তাহাকে ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে। রাত্রে হয়তো সে জাগিয়া আছে, খোকা কাঁদিল। চুপিচুপি চৌকি হইতে নামিয়া মেঝেতে পাতা বিছানায় ঘুমন্ত শ্যামার পাশ হইতে খোকাকে সে সন্তর্পণে তুলিয়া লয—চোরের মতো। অনভ্যস্ত অপটু হাতে খোকাকে বুকেব কাছে ধরিযা রাখিযা নিজে সামনে পিছনে দুলিয়া তাহাকে সে দোলা দেয়, মৃদু গুনগুনানো সুরে ঘুমপাড়ানো ছড়া কাটে। বলে, আয় রে পাড়ার ছেলেরা মাছ ধরতে যাই, মাছের কাঁটা পায় ফুটেছে, দোলায় চড়ে যাই। রাতদুপুবে নিজের মুখে ঘুমপাডানো ছড়া শুনিয়া মুখখানা তাহার হাসিতে ভরিয়া যায়। এ ছেলে কার?—তাব! শ্যামা মানুষ করিতেছে করুক, ছেলে শ্যামার নয়, তার।

এদিকে শ্যামার ঘুম ভাঙে। কচি ছেলের বুড়ি মা কী আর ঘুমায়? লোক দেখানো চোখ বুজিয়া থাকে মাত্র। উঠিয়া বসিয়া শীতলের কাণ্ড চাহিয়া দেখিতে শ্যামার মন্দ লাগে না। কিন্তু মনকে সে অবিলম্বে শক্ত করিয়া ফেলে।

বলে, কী হচ্ছে?

শীতল চমকাইয়া খোকাকে প্রায় ফেলিয়া দেয়।

শ্যামা বলে, ঘাড়টা বেঁকে আছে। ওর কত লাগছে বুঝতে পারছ?

লাগলে কাঁদত।—শীতল বলে।

কাঁদবে কী? যে ঝাঁকানি ঝাঁকছ, আঁতকে ওর কান্না বন্ধ হয়েছে।—শ্যামা বলে।

শীতল প্রথমে ছেলে ফিরাইয়া দেয়। তারপর বলে, বেশ কবছি! অত তুমি লম্বা লম্বা কথা বলবে না বলে দিচ্ছি, খপর্দার! শীতল শুইয়া পড়ে। সে সত্যসত্যই রাগ করিয়াছে অথবা এটা তার ফাঁকা গর্জন শ্যামা ঠিক তাহা বুঝিতে পারে না। খানিক পরে সে বলে, আমি কি বারণ করেছি ছেলে দেব না! একটু বড়ো হোক, নিয়ো না তখন, যত খুশি নিয়ো। ওকে ধরতে বলে আমারই এখন ভয় করে! কত সাবধানে নাড়াচাড়া করি, তবু কালকে হাতটা মুচড়ে গেল—

শীতল বলে, আরে বাপরে বাপ! রাত দুপুরে বকরবকর করে এ যে দেখছি ঘুমোতেও দেবে না।

শীতলের মেজাজ ঠান্ডা হইয়া আসিয়াছে সন্দেহ নাই। রাগ সে করে না, বিরক্ত হয়। মন যে তাহার নরম হইয়া আসিয়াছে অনেক সময় এটুকু গোপন করিবার জন্যই সে যেন রাগের ভান করে, কিন্তু আগের মতো জমাইতে পারে না।

মন্দাকে নেওয়ার জন্য তাহার শাশুড়ি বারবার পত্র লিখিতেছিলেন, মন্দা বারবার জবাব লিখিতেছিল যে পড়িয়া গিয়া তাহার কোমরে ব্যথা হইয়াছে, উঠিতে পারে না, এখন যাওয়া অসম্ভব। শেষ পর্যন্ত শাশুড়ি বোধ হয় সন্দেহ করিলেন। এক শনিবার রাখালকে তিনি পাঠাইয়া দিলেন কলিকাতায়। রাখালের স্নেহ শ্যামা ভুলিতে পারে নাই, সে আসিয়াছে শুনিয়াই আনন্দে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আনন্দ তাহার টিকিল না। রাখালের ভাব দেখিয়া সে বড়ো দমিয়া গেল। এতকাল পরে তার দেখা পাইয়া রাখাল খুশি হইল মামুলি ধরনে, কথা বলিল অন্যমনে, সংক্ষেপে। শ্যামার ছেলের সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র কৌতূহল দেখা গেল না।

সারাদিন পরে বিকালে ব্যাপার বুঝিয়া মন্দা স্বামীকে বলিল, তুমি কী গো? বউ কতবার ছেলে কোলে কাছে এল, একবার তাকিয়ে দেখলে না?

রাখাল বলিল, দেখলাম না? ওই যে বললাম তুমি রোগা হয়ে গেছ বউঠান?

মন্দা বলিল, দাদার ছেলে হয়েছে জানো? জানো আমার মাথা! ছেলেকে একবার কোলে নিয়ে একটু আদর করতে পারলে না? দাদা কী ভাববে!

রাখাল বলিল, তোমায় আদর করে সময় পেলাম কই?

মন্দা রাগ করিয়া বলিল, না বাবু, তোমার কী যেন হয়েছে। তামাশাগুলি পর্যন্ত আজকাল রসালো হয় না।

তোমার কাছে হয় না। বউঠানকে ডেকে আনো তবে।

মন্দার অনুযোগের যে ফল ফলিল শ্যামার তাহাতে মনে হইল একটু গাল টিপিয়া আদর করিয়া রাখাল বুঝি ছেলেকে তাহার অপমান করিয়াছে। শ্যামার মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়া রহিল। জীবন-যুদ্ধে সন্তানের প্রত্যেকটি পরাজয়ে মার মনে যে ক্ষুব্ধ বেদনার সঞ্চার হয়, এ অসন্তোষ তাহারই অনুরূপ। শ্যামার ছেলে এই প্রথমবার হার মানিয়াছে।

পরদিন বিকালে রাখাল একাই ফিরিয়া গেল। মন্দা যাইতে রাজি হইল না, রাখালও বেশি পীড়াপীড়ি করিল না। যাওয়ার কথা মন্দাকে সে একবারের বেশি দুবার বলিল কিনা সন্দেহ। পথ ভুলিয়া আসার মতো যেমন অন্যমনে সে আসিয়াছিল, তেমনই অন্যমনে চলিয়া গেল।

কী জন্য আসিয়াছিল তাও যেন ভালোরকম বোঝা গেল না।

শীতল গোপনে শ্যামাকে বলিল, রাখাল আবার বিয়ে করেছে শ্যামা।

বলিল রাত্রে, শ্যামার যখন ঘুম আসিতেছে। শ্যামা সজাগ হইয়া বলিল, কেন ঠাট্টা করছ?

কীসের ঠাট্টা? ও মাসের সাতাশে বিয়ে হয়েছে। মন্দাকে এখন কিছু বোলো না। রাখাল বলে গেছে, সেই গিয়ে সব কথা খুলে ওকে চিঠি লিখবে। মুখে বলতে এসেছিল, পারল না। আমিও ভেবে দেখলাম, চিঠি লিখে জানানোই ভালো।

উত্তেজনার সময় শ্যামার মুখে কথা জোগায় না। রাখালের ভাবভঙ্গি মনে করিয়া সে আরও মূক হইয়া রহিল। একদিন যে তাহার পরমাত্মীয়ের চেয়ে আপন হইয়া উঠিয়াছিল, গভীর রাত্রে বারান্দায় টিমটিমে আলোয় যার কাছে বসিয়া দুঃখের কথা বলিতে বলিতে সে নিঃসংকোচে চোখ মুছিতে পারিত,—শুধু তাই নয়, যে চঞ্চল হইয়া উশখুশ করিতে আরম্ভ করিলেও যার কাছে তাহার ভয় ছিল না, এবার সে তাহার কাছে ঘেঁষিতে পারে না। একটা কিছু করিয়া না আসিলে কি মানুষ এমন হয়?

কোথায় বিয়ে হল কী বৃত্তান্ত বলো তো আমায়, গুছিয়ে বলো।—শ্যামা যখন এ অনুরোধ জানাইল, শীতলের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিয়াছে।

অঁ? বলিয়া সজাগ হইয়া সে যা জানিত গড়গড় করিয়া বলিয়া গেল। তারপর বলিল, বড়ো ঘুম পাচ্ছে গো। বাকি সব জিজ্ঞেস কোরো কাল।

জিজ্ঞাসা করিবার কিছু বাকি ছিল না, এবার শুধু আলোচনা। শ্যামার সে উৎসাহ ছিল না, সে জাগিয়া শুইয়া রহিল নীরবে। এ কী আশ্চর্য ব্যাপার যে রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে? স্ত্রী যে তাহার তিনটি সন্তানের জননী এ কি সে ভুলিয়া গিয়াছিল? অবস্থা বিশেষে পুরুষমানুষের দুবার বিবাহ করাটা শ্যামার কাছে অপরাধ নয়। ধরো, এখন পর্যন্ত তার যদি ছেলে না হইত, শীতল আবার বিবাহ করিলে তাহা একেবারেই অসংগত হইত না। কিন্তু এখন কি শীতল আর একটা বিবাহ করিতে পারে? কোন যুক্তিতে করিবে!—রাখাল এ কী কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে? মন্দার কাছে সে মুখ দেখাইবে কী করিয়া? রাখালকে শ্যামা চিরকাল শ্রদ্ধা করিয়াছে, কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই। এবারও রাখালের এই কীর্তির

কোনো অর্থ সে খুঁজিয়া পাইল না। এমন যদি হইত যে মন্দার স্বভাব ভালো নয়, সে দেখিতে কুৎসিত, তাহাকে লইয়া রাখাল সুখী হইতে পারে নাই,—আবার বিবাহ করিবার কারণটা তাহার শ্যামা বুঝিতে পারিত। মনের মিল তো দুজনের কম হয় নাই? এ বাড়িতে পা দিয়া অসুস্থা মন্দার যে সেবাটাই রাখালকে সে করিতে দেখিয়াছিল তাও শ্যামার মনে আছে।

এমন কাজ তবে সে কেন করিল? শ্যামা ভাবে, ঘুমাইতে পারে না। চৌকির উপর শীতল নাক ডাকায়, ঘুমন্ত সন্তানের মুখ হইতে স্তন আলগা হইয়া খসিয়া আসে, জননী শ্যামা আহত উত্তেজিত বিষণ্ণ মনে আর একটি জননীর দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিয়া যায়। রাখালের অপকার্যের একটা কারণ খুঁজিয়া পাইলে সে যেন স্বস্তি পাইত। কে বলিতে পারে এ রকম বিপদ তারও জীবনে ঘটিবে কিনা? শীতল তো রাখালের চেয়ে ভালো লোক নয়। কীসের যোগাযোগে স্ত্রী ও জননীর কপাল ভাঙে মন্দার দৃষ্টান্ত হইতে সেটুকু বোঝা গেলে মন্দ হইত না। তারপর একটা কথা ভাবিয়া হঠাৎ শ্যামার হাত-পা অবশ হইয়া আসে। মন্দা জননী বলিয়াই হয়তো রাখালের স্ত্রীর প্রয়োজন হইয়াছে? ছেলের জন্য মন্দা স্বামীকে অবহেলা করিয়াছিল, স্ত্রী-বর্তমানে রাখাল স্ত্রীর অভাব অনুভব করিয়াছিল, হয়তো তাই সে আবার বিবাহ করিয়াছে?

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিয়া শীতল দেখিল, বুকের উপব ঝুঁকিয়া মুখেব কাছে হাসিভরা মুখখানা আনিয়া শ্যামা তাহাকে ডাকিতেছে। শ্যামা যে রাত্রেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল ছেলের জন্য কখনও সে স্বামীকে তাহার প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবে না, শীতল তো তাহা জানিত না, এও জানিত না যে প্রতিজ্ঞা-পালনে স্বামীব ঘুম ভাঙিবার নিয়মিত সময় পর্যন্ত সবুর শ্যামার সহে নাই। শীতল তাহাকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিল। বলিল, হয়েছে কী?

বেলা হল উঠবে না?

শীতল পাশ ফিরিয়া শুইল। বিড়বিড় করিয়া সে যা বলিল তা গালাগালি।

তখন শ্যামা বুঝিতে পারিল সে ভুল করিয়াছে। ছেলের জন্য স্বামীকে অবহেলা না করিবার প্রক্রিয়া এটা নয়। স্বামী যতটুকু চাহিবে দিতে হইবে ততটুকু, গায়ে পড়িয়া সোহাগ করিতে গেলে জুটিবে গালাগালি।

মন্দার কোনো পরিবর্তন নাই। সে তো এখনও জানে না। ছেলেদের লইয়া সে ব্যস্ত ও বিব্রত হইয়া রহিল। আড়চোখে তাহার সানন্দ চলাফেরা দেখিতে শ্যামার বড়ো মমতা হইতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, অ পোড়াকপালি! বেশ হেসে খেলে সময় কাটাচ্ছ, ওদিকে তোমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে যখন জানবে তুমি করবে কী?—একটা বিড়ালছানাব জন্য মারামারি করিয়া কানু ও কালু কাঁদিতেছিল। দেখাদেখি কোলের ছেলেটিও কান্না জুড়িয়াছিল। শ্যামা সাহায্য করিতে গেলে মন্দা তাহাকে হটাইয়া দিল। তিনজনকে সে সামলাইল একা।

শ্যামার চোখ ছলছল করিতে লাগিল। সে মনে মনে বলিল, কার ছেলেদের এত ভালোবাসছ ঠাকুরঝি? সে তো তোমার মান রাখেনি।

মন্দার সমস্যা শ্যামাকে বড়ো বিচলিত করিয়াছে। রাখালের প্রতি সে যেন ক্রমে ক্রমে বিদ্বেষ বোধ করিতে আরম্ভ করে। সংসারে স্ত্রীলোকের অসহায় অবস্থা বুঝিতে পারিয়া নিজের কাছে সে অপদস্থ হইয়া যায়। যে আশ্রয় তাহাদের সবচেয়ে স্থায়ী কত সহজে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যে লোকটির উপর সবদিক দিয়া নির্ভর করিতে হয়, কত সহজে সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বসে?

মন্দা অবশ্যই এবার অনেক দিন এখানে থাকিবে। এ আরেক সমস্যার কথা। আর্থিক অবস্থা তাহাদের সচ্ছল নয়, নতুন চাকরিতে শীতল নিয়মিত মাহিনা পায় বটে, টাকার অঙ্কটা কিন্তু ছোটো। শীতলের কিছু ধার আছে, মাঝেমাঝে কিছুকিছু শুধিতে হয়, সুদও দিতে হয়। খরচ চলিতে চায় না।

তিনটি ছেলে লইয়া মন্দা বেশি দিন এখানে থাকিলে বড়োই তাহারা অসুবিধায় পড়িবে। শ্যামা অবশ্য এ সব অসুবিধার কথা ভাবিত না, অত ছোটো মন তাহার নয়,--যদি তাহার খোকাটি না আসিত। মন্দার জন্য তাহারা স্বামী-স্ত্রী না হয় কিছুদিন কষ্টই ভোগ করিল, কারও খাতিরে খোকাকে তো তাহারা কষ্ট দিতে পারিবে না! ওর যে ভালো জামাটি জুটিবে না, দুধ কম পড়িবে, অসুখে-বিসুখে উপযুক্ত চিকিৎসা হইবে না, শ্যামা তাহা সহিবে কী করিয়া? নিজের ছেলের কাছে নাকি ননদ ও তাহার ছেলেমেয়ে! যতদিন সম্ভব ঠিক ততদিনই মন্দাকে সে এখানে থাকিতে দিবে। তারপর মুখ ফুটিয়া বলিবে, আমাদের খরচ চলছে না ঠাকুরঝি। বলিবে, অভিমান চলবে কেন ভাই? মেয়েমানুষের এমনি কপাল। এবার তুমি ফিরে যাও ঠাকুরজামায়ের কাছে।

হিসাবে শ্যামার একটু ভুল হইয়াছিল। কয়েকদিন পরে রাখালের পত্র আসিবামাত্র বনগাঁ যাওয়ার জন্য মন্দা উতলা হইয়া উঠিল। সে কোনোমতেই বিশ্বাস করিতে চাহিল না, রাখাল আবার বিবাহ করিয়াছে। বারবার সে বলিতে লাগিল, সব মিছে কথা। সে বনগাঁ যায় নাই বলিয়া রাগিয়া রাখাল এ রকম চিঠি লিখিয়াছে। এ কথা কখনও সত্যি হয়? তবু, এ রকম অবস্থায় তাহার অবিলম্বে বনগাঁ যাওয়া দরকার। আমায় আজকেই রেখে এসো দাদা, পায়ে পড়ি তোমার।

এদিকে, সেদিন আরেক মুশকিল হইয়াছে। রাত্রে শ্যামার ছেলের হইয়াছিল জ্বর, সকালে থার্মোমিটার দিয়া দেখা গিয়াছে জ্বর একশো দুই-এর একটু নীচে। ছেলে কোলে করিয়া শেষরাত্রি হইতে শ্যামা ঠায় বসিয়া কাটাইয়াছে। ভাবিয়া ভাবিয়া সে বাহির করিয়াছে যে বারোকে চার দিয়া গুণ করিলে যত হয়, ছেলের বয়স এখন তাহার ঠিক ততদিন। আগের খোকাটি তাহার ঠিক বারোদিন বাঁচিয়াছিল। বনগাঁ অনেক দূর, শীতলকে শ্যামা ছাপাখানায় পর্যন্ত যাইতে দিতে রাজি নয়।

শীতল বলিল, দুদিন পরেই যাস মন্দা। চিঠিপত্র লেখা হোক, একটা খবর দিয়ে যাওয়াও তো দরকার। খোকার জ্বরটাও ইতিমধ্যে হয়তো কমবে।

মন্দা শুনিল না। বাড়িটা হঠাৎ তাহার কাছে জেলখানা হইয়া উঠিয়াছে। সে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল, আজ না পার, কাল আমাকে তুমি রেখে এসো দাদা। সকালে রওনা হলে বিকেলের গাড়িতে ফিরে আসতে পারবে তুমি।

শীতল বলিল, ব্যস্ত হোস কেন মন্দা, দেখাই যাক না কাল সকাল পর্যন্ত, খোকার জ্বর আজ দিনের মধ্যে কমে যেতেও পারে তো।

বিকালে খোকার জ্বর কমিল, শেষরাত্রে আবার বাড়িয়া গেল। সকালে মন্দা বলিল, আমার তবে কী উপায় হবে বউ? আমি তো থাকতে পারি না আর। দাদা যদি নাই যেতে পারে, আমায় গাড়িতে তুলে দিক, ওদের নিয়ে আমি একাই যেতে পারব।

শ্যামা রাত্রে ভাবিয়া দেখিয়াছিল, মন্দাকে আটকাইয়া রাখা সংগত নয়। উদ্‌বেগ ও আশঙ্কায় সে এখন বনগাঁ যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, পরে হয়তো মত পরিবর্তন করিয়া বসিবে, আর যাইতেই চাহিবে না। বলিবে, অমন স্বামীর মুখ দেখার চেয়ে ভাইয়ের বাড়ি পড়িয়া থাকাও ভালো। বোনকে পুষিবার ক্ষমতা যে শীতলের নাই এ তো আর সে হিসাব করিবে না। তার চেয়ে ও যখন যাইতে চায় ওকে যাইতে দেওয়াই ভালো। একদিনে তাহার খোকার কী হইবে? শীতল তো ফিরিয়া আসিবে রাত্রেই।

এই সব ভাবিয়া শ্যামা শীতলকে বনগাঁ যাইতে বাধা দিল না। জিনিসপত্র মন্দা আগের দিনই বাঁধিয়া-ছাঁদিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। একচড়া আলুভাতে ফুটাইয়া কালু ও কানুকে খাওয়াইয়া, কোলের ছেলেটির জন্য বোতলে দুধ ভরিয়া লইয়া শীতলের সঙ্গে সে রওনা হইয়া গেল। গাড়িতে ওঠার সময় মন্দা একটু কাঁদিল, শ্যামাও কয়েকবার চোখ মুছিল।

গাড়ি যেন চোখের আড়াল হইল না, শ্যামার ছেলের জ্বর বাড়িতে আরম্ভ করিল। ঝিকে দিয়া কই মাছ আনাইয়া শ্যামা এ বেলা শুধু ঝোল ভাত রাঁধিবার আয়োজন করিয়াছিল, সব ফেলিয়া রাখিয়া দুরুদুরু বুকে অবিচলিত মুখে সে ছেলেকে কোলে করিয়া বসিল। নিয়তির খেলা শ্যামা বোঝে বইকী! মন্দার ভার এড়াইবার লোভে শীতলকে যাইতে দেওয়ার দুর্মতি নতুবা তাহার হইবে কেন? স্বামী আবার বিবাহ করিয়াছে বলিয়া মন্দা চিরকাল ভাইয়ের সংসারে পড়িয়া থাকিত এ আশঙ্কা শ্যামার কাছে এখন অর্থহীন মনে হইল। কাঁধে শনি ভর না করিলে মানুষ ভবিষ্যতের একটা কাল্পনিক অসুবিধার কথা ভাবিয়া ছেলের রোগকে অগ্রাহ্য করে? ছেলে যত ছটফট করিয়া কাঁদিতে লাগিল অনুতাপে শ্যামার মন ততই পুড়িয়া যাইতে লাগিল। যেমন ছোটো তাহার মন, তেমনই তাহার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। তাহার মতো স্বার্থপর হীনচেতা স্ত্রীলোকের ছেলে যদি না মরে তো মরিবে কার?. একা সে এখন কী করে!

ঠিকা ঝি বাসন মাজিতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া শ্যামা বলিল, খোকার বড়ো জ্বর হয়েছে সত্যভামা, বাবু বর্মা গেলেন, কী হবে এখন?

ঝি শতমুখে আশ্বাস দিয়া বলিল, কমে যাবে মা, কমে যাবে।—ছেলেপিলের অমন জ্বর-জ্বালা কত হয়, ভেবোনি।

তুমি আজ কোথাও যেয়ো না সত্যভামা।

কিন্তু না গিয়া সত্যভামার উপায় নাই। সে ধবিতে গেলে স্বামীহীনা, কিন্তু তাহার চারটি ছেলে মেয়ে আছে। তিন বাড়ি কাজ করিয়া সে ইহাদের আহার জোগায়, শ্যামার কাছে বসিয়া থাকিলে তাহার চলিবে কেন? সত্যভামার বড়ো মেয়ে রাণীর বয়স দশ বছর, তাহাকে আনিয়া শ্যামার কাছে থাকিতে বলিয়া সে সরকারদের কাজ করিতে চলিয়া গেল। রাণীর একটা চোখে আঞ্জিনা হইয়াছিল, চোখ দিয়া তাহার এত জল পড়িতেছিল যেন কার জন্য শোক করিতেছে। শ্যামা এবার একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া গেল। এমন যোগাযোগ, এত সব অমঙ্গলের চিহ্ন, একি ব্যর্থ যায়? আজ দিনটা মেঘলা আছে। শীত পড়িয়াছে কনকনে। খোকার জ্বরে তাপে শ্যামার কোল যত গরম হইয়া ওঠে, হাতপা হইয়া আসে তেমনি ঠান্ডা। মাঝে মাঝে শ্যামার সর্বাঙ্গে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। বেলা বারোটার সময় খোকার ভাঙাভাঙা কান্না থামিল। ভয়ে-ভাবনায় শ্যামা আধমরা হইয়া গিয়াছিল, তবু তাহার প্রথম ছেলেকে হারানোর শিক্ষা সে ভোলে নাই,—তাড়াতাড়ি নয়, বাড়াবাড়ি নয়, এ রকম উত্তেজনার সময় ধীরতা বজায় রাখা অনভ্যস্ত অভিনয়ের শামিল, শ্যামার চিন্তা ও কার্য দুই অত্যন্ত শ্লথ হইয়া গিয়াছিল। তিনবার থার্মোমিটার দিয়া সে ছেলের সঠিক টেম্পারেচার ধরিতে পারিল। একশো তিন উঠিয়াছে। জ্বর এখনও বাড়িতেছে বুঝিতে পারিয়া রাণীকে সে ও পাড়ার হারাণ ডাক্তারকে ডাকিতে পাঠাইয়া দিল। এতক্ষণে সে টের পাইয়াছে জ্বরের বৃদ্ধি স্থগিত হওয়ার প্রতীক্ষায় এতক্ষণ ডাক্তার ডাকিতে না পাঠানো তাহার উচিত হয় না। হারাণ ডাক্তার যেমন গম্ভীর তেমনই মন্থর। আজ যদি রোগী দেখিয়া ফিরিতে তাহার বেলা হইয়া থাকে, স্নান করিয়া খাইয়া ব্যাপার দেখিতে আসিবে সে তিনঘণ্টা পরে। রাণী কি রোগীর অবস্থাটা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিবে? সামান্য জ্বর মনে করিয়া হারাণ ডাক্তার যদি বিকালে দেখিতে আসা স্থির করে? ছেলেকে ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা সদর দরজায় গিয়া পথের দিকে তাকায়। রাণীকে দেখিতে পাইলে ডাকিয়া ফিরাইয়া একটি কাগজে হারাণ ডাক্তারকে কয়েকটি কথা লিখিয়া দিবে। রাণীকে সে দেখিতে পায় না। শুধু পাড়ার ছেলে বিনু ছাড়া পথে কেহ নাই।

শ্যামা ডাকে, অ বিনু, অ ভাই বিনু, শুনছ?

কী?

খোকার বড্ড জ্বর হয়েছে ভাই, কেমন অজ্ঞানের মতো হয়ে গেছে, লক্ষ্মী দাদাটি, একবার ছুটে হারাণ ডাক্তারকে গিয়ে বলো গে—

আমি পারব না।—বিনু বলে।

শ্যামা বলে, ও ভাই বিনু শোনো, শোনো ভাই একবার—

বাড়াবাড়ি? সে উতলা হইয়াছে? ঘরে গিয়া শ্যামা কাঁদে। দ্যাখে ছেলে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলিতেছে। চোখ বুজিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। ও কি আর চোখ মেলিবে?

হারাণ ডাক্তার দেরি না করিয়াই আসিল। হারাণ যত মন্থর হোক, তার পুরানো নড়বড়ে ফোর্ড গাড়িটা এখনও ঘণ্টায় বিশ মাইল যাইতে পারে। ভাত খাইয়া সে ধীরে ধীরে পান চিবাইতেছিল, ঘরে ঢুকিয়া সে প্রথমে চিকিৎসা করিল শ্যামার। বলিল, কেঁদো না বাছা। রোগনির্ণয় হবে না।

কেমন তাহার রোগনির্ণয় কে জানে, খোকার গায়ে একবার হাত দিয়াই হুকুম দিল, এক গামলা ঠান্ডা জল, কলসি থেকে এনো।

শ্যামা গামলায় জল আনিলে হারাণ ডাক্তার ধীরে ধীরে খোকাকে তুলিয়া গলা পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া দিল, একহাতে সেই অবস্থায় তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া অন্য হাতে ভিজাইয়া দিতে লাগিল তাহার মাথা। খোকার মার অনুমতি চাহিল না, এ রকম বিপজ্জনক চিকিৎসার কোনো কৈফিয়তও দিল না।

শ্যামা বলিল, এ কী করলেন?

হারাণ ডাক্তার বলিল, শুকনো তোয়ালে থাকলে দাও, না থাকলে শুকনো কাপড়েও চলবে।

শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার দেওয়া একটি তোয়ালে আনিয়া দিলে জল হইতে তুলিয়া তোয়ালে জড়াইয়া খোকাকে হারাণ শোয়াইয়া দিল। নাড়ি দেখিয়া চৌকির পাশের দিকে সরিয়া গিয়া ঠেস দিল দেয়ালে। পান সে আজ আগাগোড়া জাবর কাটিতেছিল, এবার বুজিল চোখ।

শ্যামা বলিল, আমার কী হবে ডাক্তারবাবু?

হারাণ রাগ করিয়া বলিল, এই তো, এই তো তোমাদের দোষ! কাঁদবার কারণটা কী হল? ওর আরেকটা বাথ দিতে হবে বলে বসে আছি বাছা, তোমাদের দিয়ে তো কিছু হবার জো নেই, খালি কাঁদতে জানো।

হারাণ বুড়া হইয়াছে, তাহাকে ডাক্তারবাবু বলিতে শ্যামার কেমন বাধিতেছিল। রোগীর বাড়িতে ডাক্তারের চেয়ে পর কেহ নাই, সে মানুষ নয়, সে শুধু একটা প্রয়োজন, তিতো ওষুধের মতো সে একটা হিতৈষী বন্ধু। হারাণকে পর মনে করা কঠিন। তাহাকে দেখিয়া এতখানি আশ্বাস মেলে, অথচ এমনি সে অভদ্র যে আত্মীয় ভিন্ন তাহাকে আর কিছু মনে করিতে কষ্ট হয়।

শ্যামা তাই হঠাৎ বলিল, আপনি একটু শোবেন বাবা?—দেয়ালে ঠেস দিয়ে কষ্ট হচ্ছে আপনার।

কষ্ট? হাসিতে গিয়া হারাণ ডাক্তারের মুখের চামড়া অনভ্যস্ত ব্যায়ামে কুঁচকাইয়া গেল, এতক্ষণে শ্যামার দিকে সে যেন একটু বিশেষভাবে চাহিয়া দেখিল, না মা, কষ্ট নেই, শোব—একেবারে বাড়ি গিয়ে শোব। দুটো পান দিতে পার, বেশ করে দোক্তা দিয়ে?

শ্যামা পান সাজিয়া আনিয়া দিল। এটুকু সে বুঝিতে পারিয়াছিল যে খোকার অবস্থা বিপজ্জনক, নহিলে ডাক্তার মানুষ যাচিয়া বসিয়া থাকিবে কেন? এত জ্বরের উপর জলে ডুবাইয়া চিকিৎসাও কী মানুষ সহজে করে! তবু শ্যামা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে সে তো ডাক্তারি বিদ্যার পরিচয় রাখে না, সে জানে ডাক্তারকে। জীবনমরণের ভার যে ডাক্তার পান চিবাইতে চিবাইতে লইতে পারে, সেই তো ডাক্তার,—মরণাপন্ন ছেলেকে ফেলিয়া এমন ডাক্তারকে পান সাজিয়া দিতে শ্যামা খুশিই হয়। পান আর এক খাবলা দোক্তা মুখে দিয়া হারাণ শীতলের কথা জিজ্ঞাসা করিল। আধঘণ্টা পরে খোকার তাপ লইয়া বলিল, জ্বর বাড়েনি। তবু গাটা একবার মুছে দিই, কী বলো মা?

না, হারাণ ডাক্তার গম্ভীর নয়। রোগীর আত্মীয়স্বজনকে সে শুধু গ্রাহ্য করে না, ওর মধ্যে যে তার সঙ্গে ভাব জমাইতে পারে বুড়া তার সঙ্গে কথা বড়ো কম বলে না। বাবা বলিয়া ডাকিয়া শ্যামা

তাহাব মুখ খুলিয়া দিয়াছে, রাজ্যের কথার মধ্যে খোকার যে কত বড়ো ফাঁড়া কাটিয়াছে তাও সে শ্যামাকে শোনাইয়া দিল। বলিল বিকাল পর্যন্ত তাহাকে না ডাকিলে আর দেখিতে হইত না। জ্বর বাড়িতে বাড়িতে একসময়---

গিয়ে একটা ওষুদ পাঠিয়ে দিচ্ছি রাণীর হাতে, পাঁচ ফোঁটা করে খাইয়ে দিও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে চামচেয়,—গোরুর দুধ নয় মা, সে ভুল যেন করে বোসো না। আধঘণ্টা পরপর তাপ নিয়ে যদি দ্যাখো জ্বর কমছে না, গা মুছে দিয়ো।

সন্ধ্যাবেলা আপনি আর একবার আসবেন বাবা।

হারাণ দবজাব কাছে গিয়া একবার দাঁড়াইল। বলিল, ভয় পেযো না মা, এবার জ্বর কমতে আরম্ভ করবে।

শ্যামা ভাবিল সাহস দিবার জন্য নয়, হারাণ হয়তো ভিজিটেব টাকার জন্য দাঁড়াইয়াছে। কত টাকা দিবে, যাহাকে বাবা বলিয়া ডাকিয়াছে দুটো একটা টাকা কেমন করিয়া তাহার হাতে দিবে, শ্যামা ভাবিয়া পাইতেছিল না। অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে সে বলিল, উনি বাড়ি নেই---

এলে পাঠিয়ে দিও।—বলিয়া হারাণ চলিয়া গেল। স্বয়ং শীতলকে অথবা ভিজিটের টাকা কী যে সে পাঠাইতে বলিযা গেল কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

শীতলেব ফিরিবার কথা ছিল রাত্রি আটটায়। সে আসিল পরদিন বেলা বারোটার সময়। বিষ্ণুপ্রিয়া কার কাছে খবর পাইয়া এ বেলা শ্যামাকে ভাত পাঠাইয়া দিয়াছিল, শীতল যখন আসিয়া পৌঁছিল সে তখন অনেক ব্যঞ্জনেব মধ্যে শুধু মাছ দিয়া ভাত খাইয়া উঠিয়াছে এবং নিজেকে তাহাব মনে হইতেছে বোগমুক্তার মতো।

শীতল জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কেমন?

ভালো আছে।

কাল গাড়ি ফেল করে বসলাম, এমন ভাবনা হচ্ছিল তোমাদের জন্যে।

শ্যামার মুখে অনুযোগ নাই, সে গম্ভীর ও রহস্যময়ী। কাল বিপদে পড়িয়া কারও উপর নির্ভব কবিবার জন্য সে মরিয়া যাইতেছিল, আজ বিপদ কাটিয়া যাওয়ার পর কিছু আত্মমর্যাদাব প্রয়োজন হইয়াছে।

তিন

কয়েক বৎসর কাটিয়াছে।

শ্যামা এখন তিনটি সন্তানের জননী। বড়ো খোকার দুবছর বয়সের সময় তাহার একটি মেয়ে হইয়াছে, তাব তিনবছর পরে আর একটি ছেলে। নামকরণ হইয়াছে তিনজনেরই—বিধানচন্দ্র, বকুলমালা ও বিমানবিহারী। এগুলি পোশাকি নাম। এ ছাড়া তিনজনের তিনটি ডাকনামও আছে, খোকা, বুকু ও মণি।

ওদের মধ্যে বকুলের স্বাস্থ্যই আশ্চর্য রকমে ভালো। জন্মিয়া অবধি একদিনের জন্য সে অসুখে ভোগে নাই, মোটামোটা হাত-পা, ফোলাফোলা গাল,---দুরন্তের একশেষ। শ্যামা তাহার মাথার চুলগুলি বাবরি করিয়া দিয়াছে। খাটো জাঙিয়া-পরা মেয়েটি যখন একমুহূর্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ঝাঁকড়া চুলের ফাঁক দিয়া মিটমিট করিয়া তাকায়, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। বুকুর রংও হইয়াছে বেশ মাজা। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাতে তাহার মুখখানা জ্বলজ্বল করে, ধূসর সন্ধ্যায় স্তিমিত হইয়া আসে—সারাদিনের বিনিদ্র দুরন্তপনার পর নিদ্রাতুর চোখ দুটির সঙ্গে বেশ মানায়। কিন্তু দেখিবার কেহ থাকে না। শ্যামা রান্না করে, শ্যামার কোল জুড়িয়া থাকে ছোটো খোকা মণি। বুকু পিছন হইতে মার পিঠে বুকের ভর

দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। মার কাঁধের উপর দিয়া ডিবরির শিখাটির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার চোখ বুজিয়া যায়।

শ্যামা পিছনে হাত চালাইয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া ডাকে, খোকা, অ খোকা।

বিধান আসিলে বলে, ভাইকে কোলে নিয়ে বোসো তো বাবা, বুকুকে শুইয়ে দিয়ে আসি।

বিধানের হাতেখড়ি হইয়া গিয়াছে, এখন সে প্রথম ভাগের পাঠক। ছেলেবেলা হইতে লিভার খারাপ হইয়া শরীরটা তাহার শীর্ণ হইয়া গিয়াছে, মাঝে মাঝে অসুখে ভোগে। মুখখানি অপরিপুষ্ট ফুলের মতো কোমল। শরীর ভালো না হোক ছেলেটার মাথা হইয়াছে খুব সাফ। বুলি ফুটিবার পর হইতেই প্রশ্নে প্রশ্নে সকলকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, জগতের দিকে চোখ মেলিয়া চাহিয়া তাহার শিশু-চিত্তে যে সহস্র প্রশ্নের সৃষ্টি হয়, প্রত্যেকটির জবাব পাওয়া চাই। মনোজগতে সে দুর্জ্ঞেয় রহস্য থাকিতে দিবে না, তাহার জিজ্ঞাসার তাই সীমা নাই। সবজান্তা হইবার জন্য তাহার এই ব্যাকুল প্রয়াসে সবজান্তারা কখনও হাসে, কখনও বিরক্ত হয়। বিরক্ত বেশি হয় শীতল, বিধানের গোটা দশেক কেন-র জবাব দিয়া পরবর্তী পুনরাবৃত্তিতে সে ধমক লাগায়। শ্যামার ধৈর্য অনেকক্ষণ বজায় থাকে। অনেক সময় হাতের কাজ করিতে করিতে যা মনে আসে জবাব দিয়া যায়, সব সময় খেয়ালও থাকে না কী বলিতেছে। বিধানের চিন্তাজগৎ মিথ্যায় ভরিয়া ওঠে, মনে তাহার বহু অসত্যের ছাপ লাগে।

দিনের মধ্যে এমনি কতগুলি প্রহর আছে শ্যামাকে যখন যাচিয়া ছেলের মুখে মুখরতা আনিতে হয়। বিধান মাঝে মাঝে গম্ভীর হইয়া থাকে। গভীর অন্যমনস্কতায় ডুবিয়া গিয়া সে স্থির হইয়া বসিয়া থাকে, চোখ দুটি উদাসীন হইয়া যায়। স্প্রিং-এর মোটরটি পাশে পড়িয়া থাকে, ছবির বইটির পাতা বাতাসে উলটাইয়া যায়, সে চাহিয়া দেখে না। ছেলের মুখ দেখিয়া শ্যামার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠে। যেন ঘুমন্ত ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতেছে এমনি ভাবে সে ডাকে, খোকা, এই খোকা।

উঁ?

আয় তো আমার কাছে। দ্যাখ তোর জন্যে কেমন জামা করছি।

বিধান কাছেও আসে, জামাও দ্যাখে কিন্তু তাহার কোনো রকম উৎসাহ দেখা যায় না।

শ্যামা উদ্‌বিগ্ন হইয়া বলে, কী ভাবছিস রে তুই? কার কথা ভাবছিস?

কিচ্ছু ভাবছি না তো!

মোটরটা চালা না খোকা, মণি কেমন হাসবে দেখিস।

বিধান মোটরে চাবি দিয়া ছাড়িয়া দেয়। মোটরটা চক্রাকারে ঘুরিয়া ওদিকের দেয়ালে ঠোক্কর খায়। শ্যামা নিজেই উচ্ছ্বসিত হইয়া বলে, যাঃ, তোর মোটরের কলিশন হয়ে গেল! বিধান বসিয়া থাকে, খেলনাটিকে উঠাইয়া আনিবার স্পৃহা তাহার দেখা যায় না। সেলাই বন্ধ করিয়া শ্যামা ছুঁচটি কাপড়ে বিঁধাইয়া রাখে। বিধানের হঠাৎ এমন মনমরা হইয়া যাওয়ার কোনো কারণই সে খুঁজিয়া পায় না। বুড়ো মানুষের মতো এ কী উদাস গাম্ভীর্য অতটুকু ছেলের?

খিদে পেয়েছে তোর?

বিধান মাথা নাড়ে।

তবে তোর ঘুম পেয়েছে খোকা। আয় আমরা শুই।

ঘুম পায়নি তো!

ওরে দুর্জ্ঞেয়, তবে তোর হইয়াছে কী!

তবে চল, ছাদ থেকে কাপড় তুলে আনি।

সিঁড়িতে ছাদে শ্যামা অনর্গল কথা বলে। বিধানের জীবনে যত কিছু কাম্য আছে, জ্ঞানপিপাসার যত কিছু বিষয়বস্তু আছে, সব সে তাহার মনে পড়াইয়া দিতে চায়। ছেলের এই সাময়িক ও মানসিক

সন্ন্যাসে শচীমাতার মতোই তাহার ব্যাকুলতা জাগে। কাপড় তুলিয়া কুঁচাইয়া সে বিধানের হাতে দেয়। বিধান কাপড়গুলি নিজে দুই কাঁধে জমা করে। কাপড় তোলা শেষ হইলে শ্যামা আলিসায় ভর দিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া বলে, কুলপি বরফ খাবি খোকা?

এমনই ভাবে কথা দিয়া পূজা করিয়া, কুলপি বরফ ঘুষ দিয়া শ্যামা ছেলের নীরবতা ভঙ্গ করে।

বিধান জিজ্ঞাসা করে, কুলপি বরফ কী করে তৈরি করে মা?

শ্যামা বলে, হাতল ঘোরায় দেখিসনি? বরফ বেটে চিনি মিশিয়ে ওর ওই যন্ত্রটার মধ্যে রেখে হাতল ঘোরায়, তাইতে কুলপি বরফ হয়।

চিনি তো সাদা, রং কী করে হয়?

একটু রং মিশিয়ে দেয়!

কী রং দেয় মা? আলতার রং?

দুর! আলতার রং বুঝি খেতে আছে? অন্য রং দেয়।

কী রং?

গোলাপ ফুলের রং বার করে নেয়।

গোলাপ ফুলের রং কী করে বার করে মা?

শিউলি বোঁটার রং কী করে বার করে দেখিসনি?

সেদ্ধ করে, না?

হ্যাঁ।

তুমি আলতা পর কেন মা?

পরতে হয় রে, নইলে লোকে নিন্দে করে যে।

কেন?

এ কেন-র অন্ত থাকে না।

বিধানের প্রকৃতির আর একটা অদ্ভুত দিক আছে, পশুপাখির প্রতি তার মমতা ও নির্মমতার সমন্বয়। কুকুর বিড়াল আর পাখির ছানা পুষিতে সে যেমন ভালোবাসে, এক এক সময় পোষা জীবগুলিকে সে তেমনি অকথ্য যন্ত্রণা দেয়। একবার সন্ধ্যার সময় ঝড় উঠিলে একটি বাচ্চা শালিখপাখি বাড়ির বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল। বিধান ছানাটিকে কুড়াইয়া আনিয়াছিল, আঁচল দিয়া পালক মুছিয়া লণ্ঠনের তাপে সেঁক দিয়া তাহাকে বাঁচাইয়াছিল শ্যামা। পরদিন খাঁচা আসিল, বিধান নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া গেল। ক্ষুদ্র বন্দী জীবটি যেন তাহারই সম্মানিত অতিথি। হরদম ছাতু ও জল সরবরাহ করা হইতেছে, বিধানের দিন কাটিতেছে খাঁচার সামনে। কী তাহার গভীর মনোযোগ, কী ভালোবাসে। অথচ কয়েকদিন পরে, এক দুপুরবেলা পাখিটিকে সে ঘাড় মটকাইয়া মারিয়া রাখিল। শ্যামা আসিয়া দ্যাখে মরা পাখির ছানাটিকে আগলাইয়া বিধান যেন পুত্রশোকেই আকুল হইয়া কাঁদিতেছে।

ও খোকা, কী করে মরল বাবা, কে মারলে?

বিধান কথা বলে না, শুধু কাঁদে।

সত্যভামা আজও এ বাড়িতে কাজ করে, সে উঠানে বাসন মাজিতেছিল, বলিল, নিজে গলা টিপে মেরে ফেললে মা, এমন দুরন্ত ছেলে জন্মে দেখিনি,—সুন্দোর ছ্যানাটি গো!

তুই মেরেছিস! কেন মেরেছিস খোকা? শ্যামা বারবার জিজ্ঞাসা করিল, বিধান কথা বলিল না, আরও বেশি করিয়া কাঁদিতে লাগিল। শেষে শ্যামা রাগিয়া বলিল, কাঁদিসনে মুখপোড়া ছেলে, নিজে মেরে আবার কান্না কীসের?

মরা পাখিটাকে সে প্রাচীর ডিঙাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল।

রাত্রে শ্যামা শীতলকে ব্যাপারটা বলিল। বলিল এ সব দেখিয়া শুনিয়া তাহার বড়ো ভাবনা হয়। কেমন যেন মন ছেলেটার, এত মায়া ছিল পাখির বাচ্চাটার উপর! ছেলের এই দুর্বোধ্য কীর্তি লইয়া খানিকক্ষণ আলোচনা করিয়া তাহারা দুজনেই ছেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বিধান তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। এ রকম রহস্যময় প্রকৃতি ছেলেটা পাইল কোথা হইতে? ওর দেহমন তাদের দুজনের দেওয়া, তাদের চোখের সামনে হাসিয়া-কাঁদিয়া খেলা করিয়া ও বড়ো হইয়াছে, ওর মধ্যে এই দুর্বোধ্যতা কোথা হইতে আসিল?

শ্যামা বলে, তোমায় অ্যাদ্দিন বলিনি, মাঝে মাঝে গম্ভীর হয়ে ও কী যেন ভাবে, ডেকে সাড়া পাইনে।

শীতল গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, সাধারণ ছেলের মতো হয়নি।

শ্যামা সায় দেয়, কত বাড়ির কত ছেলে তো দেখি, আপনমনে খেলাধুলো করে খায়দায় ঘুমোয়, এ যে কী ছেলে হয়েছে, কারও সঙ্গে মিল নেই। কী বুদ্ধি দেখেছ?

শীতল বলে, কাল কী হয়েছে জান, জিজ্ঞেস করেছিলাম দশ টাকা মন হলে আড়াই সেরের দাম কত, সঙ্গে সঙ্গে বললে দশ আনা। কতদিন আগে বলে দিয়েছিলাম যত টাকা মন আড়াই সের তত আনা, ঠিক মনে রেখেছে।

বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল ছিল, রাণী। একদিন দুপুরবেলা গলায় দড়ি বাঁধিয়া জানালার শিকের সঙ্গে ঝুলাইয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিধান তাহার মৃত্যুযন্ত্রণা দেখিতেছিল। দেখিয়া শ্যামা সেদিন ভয়ানক রাগিয়া গেল। রাণীকে ছাড়িয়া দিয়া ছেলেকে সে বেদম মার মারিল। বিধানের স্বভাব কিন্তু বদলাইল না। পিঁপড়ে দেখিলে সে টিপিয়া মারে, ফড়িং ধরিয়া পাখা ছিঁড়িয়া দেয়, বিড়ালছানা কুকুরছানা পুষিয়া হঠাৎ একদিন যন্ত্রণা দিয়া মারিয়া ফেলে। বারো তেরো বছর বয়স হওয়ার আগে তাহার এ স্বভাব শোধরায় নাই।

এখন শীতলের আয় কিছু বাড়িয়াছে। পিতার আমল হইতে তাহাদের নিজেদের প্রেস ছিল, প্রেসের কাজ সে ভালো বোঝে, তার তত্ত্বাবধানে কমল প্রেসের অনেক উন্নতি হইয়াছে। প্রেসের সমস্ত ভার এখন তাহার, মাহিনার উপর সে লাভের কমিশন পায়, উপরি আয়ও কিছুকিছু হয়। সেটা এই রকম · ব্যবসায়ে অনেক কিছুই চলে; অনেক কোম্পানির যে কর্মচারীর উপর ছাপার কাজের ভার থাকে ফর্মা পিছু আট টাকা দিয়া সে প্রেসের দশ টাকার বিল দাবি করে, এ রকম বিল দিতে হয়, প্রেসের মালিক কমল ঘোষ তাহা জানে। তাই খাতাপত্রে দশ টাকা পাওনা লেখা থাকিলেও আট অথবা দশ কত টাকা ঘরে আসিয়াছে সব সময় জানিবার উপায় থাকে না। জানে শুধু সে, প্রেসের ভার থাকে যাহার উপর। শীতল অনায়াসে অনেক দশ টাকা পাওনাকে আট টাকায় দাঁড় করাইয়া দেয়। প্রেসের মালিক কমল ঘোষ হয়তো মাঝে মাঝে সন্দেহ করে কিন্তু প্রেসের ক্রমোন্নতি দেখিয়া কিছু বলে না।

শীতলের খুব পরিবর্তন হইয়াছে। কমল প্রেসে চাকরি পাওয়ার আগে সে দেড় বছর বেকার বসিয়াছিল, যেমন হয়, এই দুঃখের সময় সুসময়ের বন্ধুদের চিনিতে তাহার বাকি থাকে নাই, এবার তাদের সে আর আমল দেয় না, সোজাসুজি ওদের ত্যাগ করিবার সাহস তো তার নাই, এখন সে ওদের কাছে দারিদ্র্যের ভান করে, দেড় বছর গরিব হইয়া থাকিবার পর এটা সে সহজেই করিতে পারে। তার মধ্যে ভারী একটা অস্থিরতা আসিয়াছে, কিছুদিন খুব স্ফূর্তি করিয়া কাটানোর পর শ্রান্ত মানুষের যে রকম আসে, কিছু ভালো লাগে না, কী করিবে ঠিক পায় না। শ্যামার সঙ্গে গোড়া হইতে মনের মিল করিয়া রাখিলে এখন সে বাড়িতেই একটি সুখদুঃখের সঙ্গী পাইত, আর তাহা হইবার উপায় নাই—সাংসারিক ব্যাপারে ও ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে শ্যামার সঙ্গে তাহার কতগুলি মত ও

অনুভূতি খাপ খায় মাত্র, শ্যামার কাছে বেশি আর কিছু আশা করা যায় না। অথচ এদিকে বাহিরে মদ খাইয়া একা একা স্ফূর্তিও জমে না, সব কী রকম নিরানন্দ অসার মনে হয়। অনেক প্রত্যাশা করিয়া হয়তো সে তাহার পরিচিত কোনো মেয়ের বাড়ি যায়, কিন্তু নিজের মনে আনন্দ না থাকিলে পরে কেন আনন্দ দিতে পারিবে, তাও টাকার বিনিময়ে? আজকাল হাজার মদ গিলিযাও নেশা পর্যন্ত যেন জমিতে চায় না, কেবল কান্না আসে। কত কী দুঃখ উথলিয়া ওঠে।

এক একদিন সে করে কী, সকাল-সকাল প্রেস হইতে বাড়ি ফেরে। শ্যামার রান্নার সময় সে ছেলেমেয়েদের সামলায়, বারান্দায় পায়চারি করিয়া ছোটো খোকা মণিকে ঘুম পাড়ায়, মুখের কাছে বাটি ধরিয়া বুকুকে খাওয়ায় দুধ। বুকুকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতে হয় না, সে বিছানায় শুইযাই ঘুমায়, ঘুমাইয়া পড়িবার আগে একজনকে শুধু তাহার পিঠে আস্তে আস্তে চুলকাইয়া দিতে হয়। তারপর বাকি থাকে বিধান, সে খানিকক্ষণ পড়ে, তারপর তাহাকে গল্প বলিয়া রান্না শেষ হওয়া পর্যন্ত জাগাইয়া রাখিতে হয়। এ সব শীতল অনেকটা নিখুঁতভাবেই করে। সকলের খাওয়া শেষ হইলে গর্বিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে শ্যামার কী বলিবার আছে শুনিবার প্রতীক্ষা করে। শ্যামার কাছে সে কিছু প্রশংসার আশা করে বইকী! শ্যামা কিন্তু কিছু বলে না। তাহার ভাব দেখিযা মনে হয়, সে রান্না করিযাছে শীতল ছেলে রাখিয়াছে, কোনো পক্ষেরই এতে কিছু বাহাদুরি নাই।

শেষে শীতল বলে, কী দুষ্টুই যে ওরা হয়েছে শ্যামা, সামলাতে হয়রান হয়ে গেছি,— ওদের নিয়ে তুমি রান্না কর কী করে?

শ্যামা বলে, মণিকে ঘুম পাড়িয়েনি, বুকুকে খোকা রাখে।

এত সহজ? শীতল বড়ো দমিয়া যায়, সন্ধ্যা হইতে ওদের সামলাইতে সে হিমসিম খাইয়া গেল, শ্যামা এমন অবলীলাক্রমে তাহাদের ব্যবস্থা করে?

শ্যামা হাই তুলিয়া বলে, এক একদিন কিন্তু ভারী মুশকিলে পড়ি বাবু, মণি ঘুমোয় না, বুকুটা ঘ্যানঘ্যান করে, সবাই মিলে আমাকে ওরা খেয়ে ফেলতে চায়, মরেও তেমনি মার খেযে। তুমি বাড়ি থাকলে বাঁচি, ফিরো দিকি একটু সকাল-সকাল রোজ? শ্যামা আঁচল বিছাইয়া শ্রান্ত দেহ মেঝেতে এলাইয়া দেয়, বলে, তুমি থাকলে ওদের ভালো লাগে, সন্ধ্যাবেলা তোমায় দেখতে না পেলে বুকু তো আগে কেঁদেই অস্থির হত।

শীতল আগ্রহ গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করে, আজকাল কাঁদে না?

আজকাল ভুলে গেছে। হ্যাঁগো, মুদি দোকানে টাকা দাওনি?

দিয়েছি।

মুদি আজ সত্যভামাকে তাগিদ দিয়েছে। তামাক পুড়ে গেছে, এবার রাখো,—দেব আরেক ছিলিম সেজে?

শীতল বলে, না থাক।

আবোলতাবোল খরচ করে কেন যে টাকাগুলো নষ্ট কর, দোতলায় একখানা ঘর তুলতে পারলে একটা কাজের মতো কাজ হত, টাকা উড়িয়ে দিয়ে লাভ কী?

তারপর তাহারা ঘরে যায়, মণি আর বুকুর মাঝখানে শ্যামা শুইয়া পড়ে। বিধান একটা স্বতন্ত্র ছোটো চৌকিতে শোয়, শোয়ার আগে একটা বিড়ি খাইবার জন্য শীতল সে চৌকিতে বসিবামাত্র বিধান চিৎকার করিয়া জাগিয়া যায়। শীতল তাড়াতাড়ি বলে, আমি রে খোকা, আমি, ভয় কী?— বিধান কিন্তু শীতলকে চায় না, সে কাঁদিতে থাকে।

শ্যামা বলে, আয় খোকা, আমার কাছে আয়।

সে রাত্রে ব্যবস্থা উলটাইয়া যায়। শীতলের বিছানায় শোয় বিধান, বিধানের ছোট্ট চৌকিতে শীতল পা মেলিতে পারে না। একটা অদ্ভুত ঈর্ষার জ্বালা বোধ করিতে করিতে সে মা ও ছেলের আলাপ শোনে।

স্বপন দেখেছিলি, না রে খোকা?

হুঁ।

কীসের স্বপন রে?

ভুলে গেছি মা।

খুকির গায়ে তুমি যেন পা তুলে দিও না বাবা।

কী করে দেব? পাশবালিশ আছে যে?

তুই যে পাশবালিশ ডিঙিয়ে আসিস। বালিশের তলে কী হাতড়াচ্ছিস?

টর্চটা একটু দাও না মা।

কী করবি টর্চ দিয়ে রাত দুপুরে? এমনি জ্বেলে জ্বেলে খরচ করে ফ্যালো, শেষে দরকারের সময় মরব এখন অন্ধকারে।

একটু পরেই ঘরে টর্চের আলো বারকয়েক জ্বলিয়া নিভিয়া যায়, দেয়ালের গায়ে টিকটিকির ডাক শুনিয়া বিধান তাকে খুঁজিয়া বাহির করে।

নে হয়েছে, দে এবার।

জল খাব মা।

জল খাইয়া বিধান মত বদলায়।

আমি এখানে শোব না মা, যা গন্ধ!

শ্যামা হাসে, তোর বিছানায় বুঝি গন্ধ নেই খোকা? ভারী সাধু হয়েছিস, না?

বড়োদিনের সময় রাখালের সঙ্গে মন্দা কলিকাতায় বেড়াইতে আসিল, পরপর তাহার দুটি মেয়ে হইয়াছে, মেয়ে দুটিকে সে সঙ্গে আনিল, ছেলেরা রহিল বনগাঁয়ে। মন্দার বড়ো মেয়েটি একটি খোঁড়া পা লইয়া জন্মিয়াছিল, এখন প্রায় চার বছর বয়স হইয়াছে, কথা বলিতে শেখে নাই, মুখ দিয়া সর্বদা লালা পড়ে। মেয়েটাকে দেখিয়া শ্যামা বড়ো মমতা বোধ করিল। কত কষ্টই পাইবে জীবনে! এখন অবশ্য মমতা করিয়া সকলেই আহা বলিবে, বড়ো হইয়া ও যখন সকলের [illegible]গ্রহ হইয়া উঠিবে, ফেলাও চলিবে না, রাখিতেও গা জ্বালা করিবে, লাঞ্ছনা শুরু হইবে তখন। মন্দা মেয়ের নাম রাখিয়াছে শোভা। শুনিলে মনটা কেমন করিয়া ওঠে। এমন মেয়ের ও রকম নাম রাখা কেন?

মন্দা বলিল, ওকে ডাকি বাদু বলে।

শ্যামা ভাবিয়াছিল, সতিন আসিবার পর মন্দার জীবনের সুখ শান্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু মন্দাকে এতটুকু অসুখী মনে হইল না। সে খুব মোটা হইয়াছে, স্থানে-অস্থানে মাংস থলথল করে, চলাফেরা কথাবার্তায় কেমন থিয়েটারি ধরনের গিন্নিগিন্নি ভাব। স্বভাবে আর তাহার তেমন ঝাঁঝ নাই, সে বেশ অমায়িক ও মিশুক হইয়া উঠিয়াছে। আর বছর মন্দার শাশুড়ি মরিয়াছে, গৃহিণীর পদটা বোধ হয় পাইয়াছে সেই, শাশুড়ির অভাবে ননদদের সে হয়তো আর গ্রাহ্য করে না। রাখালের উপর তাহার অসীম প্রতিপত্তি দেখা গেল। কথা তো বলে না যেন হুকুম দেয়, [illegible]র যা সে বলে তাই রাখাল শোনে।

সতিন? হ্যাঁ, সে এখানেই থাকে বউ, বড্ড গরিবের মেয়ে, বাপের নেই চালচুলো, এখানে না থেকে আর কোথায় যাবে বল, যাবার জায়গা থাকলে তো যাবে,—বাপ-ব্যাটা ডেকেও জিজ্ঞেস করে না। চামারের হদ্দ সে মানুষটা, ওই করে তো মেয়ে গছালে, ছল করে বাড়ি ডেকে নিয়ে যেত, আজ নেমন্তন্ন, কাল মেয়ের অসুখ,—মন্দা হাসিল, পাড়ার মেয়ে ভাই, ছুঁড়িকে এইটুকু দেখেছি, হ্যাংলার মতো ঠিক খাবার সময়টিতে লোকের বাড়ি গিয়ে হাজির হত,—কে জানত বাবা ও শেষে বড়ো হয়ে আমারই ঘাড় ভাঙবে!

মন্দার মেয়ে দুটিকে শ্যামা খুব আদর করিল আর শ্যামার ছেলেকে আদর করিল মন্দা ; রেষারেষি করিয়া পরস্পরের সন্তানদের তাহারা আদর করিল। মন্দার মেয়েদের জন্য শ্যামা আনাইল খেলনা, শ্যামার ছেলেদেব মন্দা জামা কিনিয়া দিল। একদিন তাহারা দেখিতে গেল থিয়েটার, টিকিটের দাম দিল মন্দা, গাড়িভাড়া ও পান-লেমনেডের খরচ দিল শ্যামা। দুজনের এবার মনের মিলের অন্ত রহিল না, হাসিগল্প আমোদে-আহ্লাদে দশ-বারোটা দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। মন্দা আসলে লোক মন্দ নয়, শাশুডিব অতিবিক্ত শাসনে মেজাজটা আগে কেবল তাহার বিগড়াইয়া থাকিত। শ্যামা জীবনে কারও সঙ্গে এবকম আত্মীয়তা করার সুযোগ পায় নাই, মন্দার যাওয়ার দিন সে কাঁদিয়া ফেলিল, সারাদিন বাদুকে কোল হইতে নামাইল না, বাদুর লালায় তাহার গা ভিজিযা গেল। মন্দাও গাড়িতে উঠিল চোখ মুছিতে মুছিতে।

শুধু রাখালকে এবার শ্যামার ভালো লাগিল না। জেলে না গিয়াও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাব সময় মানুষের কয়েদির মতো স্বভাব হয়, সব সময় একটা গোপন-করা ছোটোলোকোমির আভাস পাওয়া যাইতে থাকে। রাখালেরও যেন তেমনই বিকার আসিয়াছে। যে কয়দিন এখানে ছিল সে যেন কেমন ভয়ে ভয়ে থাকিত, কেমন একটা অপরাধীর ভাব, লোকে যেন তাহার সম্বন্ধে কী জানিয়া ফেলিয়া মনে মনে তাহাকে অশ্রদ্ধা করিতেছে। সে যেন তাই জ্বালা বোধ করিত, প্রতিবাদ কবিতে চাহিত অথচ সব তাহার নিজেবই কল্পনা বলিয়া চোরের মতো, যে চোরকে কেহ চোর বলিয়া জানে না, সব সময় অত্যন্ত হীন একটা লজ্জা বোধ করিয়া সংকুচিত হইয়া থাকিত।

পরের মাসে শীতল মাহিনা ও কমিশনের টাকা আনিয়া দিল অর্ধেক, প্রথমে সে কিছু স্বীকাব করিতে চাহিল না, তাবপর কারণটা খুলিয়া বলিল। কমল ঘোষের কাছে শীতল সাতশো টাকা ধাব করিয়াছে, সুদ দিতে হইবে না কিন্তু ছ মাসের মধ্যে টাকাটা শোধ করিতে হইবে। সাতশো টাকা! এতটাকা শীতল ধার করিতে গেল কেন?

রাখালকে দিয়েছি।

ঠাকুরজামাইকে ধার করে সাতশো টাকা দিয়েছে? তোমার মাথাটাথা খাবাপ হয়ে গেছে কিনা বুঝিনে বাবু, কেন দিলে?

শীতল ভয়ে ভয়ে বলিল, ছ-সাত মাস রাখালের চাকরি ছিল না শ্যামা, আশ্বিন মাসে বোনেব বিয়েতে বড্ড দেনায় জড়িয়ে পড়েছে, হাত ধবে এমন করে টাকাটা চাইলে—

শ্যামার মাথা ঘুবিতেছিল। সাতশো টাকা! রাখাল যে এবার চোরের মতো বাস কবিয়া গিয়াছে তাহার কারণ তবে এই? সে সত্যই তাহাদেব টাকা চুবি করিয়া লইয়া গিয়াছে? টাকা সম্বন্ধে শীতলেব দুর্বলতা রাখালের অজানা নয়, এবার সে তাহা কাজে লাগাইয়াছে। মন্দাকেও শ্যামা এবার চিনিতে পারে, অত যে মেলামেশা আমোদ-আহ্লাদ সব তাহার ছল। ওদিকে রাখাল যখন শীতলকে টাকার জন্য ভজাইতেছিল, মন্দা এদিকে তাহাকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া রাখিয়াছিল সে যাহাতে টের পাইয়া বারণ করিতে না পারে। এ তো জানা কথা যে শীতল আর সে শীতল নাই, সে বারণ করিলে টাকা শীতল কখনও রাখালকে দিত না।

রাগে দুঃখে সারাদিন শ্যামা ছটফট করিল, যতবার রাখাল ও মন্দার হীন ষড়যন্ত্রের কথা আর টাকার অঙ্কটা সে মনে করিল গা যেন তাহার জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। কত কষ্টের টাকা তাহার, শীতল তো পাগল, কবে তাহার কমল প্রেসের চাকরি ঘুচিয়া যায় ঠিক নাই, দুটো টাকা জমানো না থাকিলে ছেলেদের লইয়া তখন সে করিবে কী? শীতলকে সে অনেক জেরা করিল,—কবে টাকা দিয়েছ? রাখাল কবে টাকা ফেরত দেবে বলেছে? টাকাব পরিমাণটা সত্যই সাতশো না আরও বেশি? এমনই সব অসংখ্য প্রশ্ন। শীতলও এখন অনুতাপ করিতেছিল, প্রত্যেকবার জেরা শেষ করিয়া শ্যামা যখন তাহাকে রাগের মাথায় যা মুখে আসিল বলিয়া গেল, সে কথাটি বলিল না।

শুধু যে কথা বলিল না তা নয়, তাহার বর্তমান বিষণ্ণ মানসিক অবস্থায় এ ব্যাপারটা এমন গুরুতর আকার ধারণ করিল যে সে আরও মনমরা হইয়া গেল, এবং কয়েকদিন পরেই শ্যামাকে শোনাইয়া আবোলতাবোল কী যে সব কৈফিয়ত দিতে লাগিল শ্যামা কিছুই বুঝিল না। শীতল ফাজলামি আরম্ভ করিয়াছে ভাবিয়া সে রাগিয়া গেল। শীতল অনুতপ্ত বিষণ্ণ ও নম্র হইয়া না থাকিলে এতটা বাড়াবাড়ি করিবার সাহস হয়তো শ্যামার হইত না, শীতলও রাগিয়া উঠিয়া অনেকদিন পরে শ্যামাকে একটা চড় বসাইয়া দিল, তারপর সেই যেন মার খাইয়াছে এমনি মুখ করিয়া শ্যামার আশেপাশে ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করিয়া বাহির হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিল একদিন পরে।

এতকাল পরে আবার মার খাইযা শ্যামাও নম্র হইয়া গিয়াছিল, শীতল বাড়ি ফিরিলে সে যেভাবে সবিনয় আনুগত্য জানাইল, প্রহৃতা স্ত্রীরাই শুধু তাহা জানে এবং পারে। তবু অশান্তির অন্ত হইল না। পরস্পরকে ভয় করিয়া চলার জন্য দারুণ অস্বস্তির মধ্যে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল।

শ্যামা বলে, বেশ ভদ্রতা করিয়াই বলে, তুমি এমন মন খারাপ করে আছ কেন?

শীতলও ভদ্রতা করিয়া বলে, টাকাটা যদ্দিন না শোধ হচ্ছে শ্যামা—

হঠাৎ মাসিক উপার্জন একেবারে অর্ধেক হইয়া গেলে চারিদিকে তাহার যে ফলাফল ফুটিয়া ওঠে, চোখ বুজিয়া থাকিলেও খেয়াল না করিয়া চলে না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যেন একটা শত্রুতার সৃষ্টি হইতে থাকে।

শেষে শ্যামা একদিন বুক বাঁধিয়া টাকা তুলিবার ফর্মে নাম সই করিয়া তাহার সেভিংস ব্যাংকের খাতাখানা শীতলের হাতে দিল। খাতায় শুধু জমার অঙ্ক পাত করা আছে, সত্যভামাকে দিয়া পাঁচটি সাতটি করিয়া টাকা জমা দিয়া শ্যামা শ-পাচেক টাকা করিয়াছে, একটি টাকা কোনোদিন তোলে নাই।

টাকাটা তুলে কমলবাবুকে দাও গে, ধারটা শোধ হয়ে যাক, টাকা থাকতে মনের শান্তি নষ্ট করে কী হবে? আস্তে আস্তে আবার জমবেখন।

খাতাখানা লইয়া শীতল সেই যে গেল, সাত দিনের মধ্যে আর সে বাড়ি ফিরিল না। শ্যামা যে বুঝিতে পারিল না তা নয়, তবু এ কি বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় যে তার অত কষ্টের জমানো টাকাগুলি লইয়া শীতল উধাও হইয়া গিযাছে? একদিন বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি গিয়া শ্যামা কমল প্রেসে লোক পাঠানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিল। সে আসিয়া খবর দিল প্রেসে শীতল যায় নাই। শীতল গাড়ি চাপা পড়িয়াছে অথবা তাহার কোনো বিপদ হইয়াছে একবারও তাহা ভাবে নাই, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া শীতলকে ভালোরকম চিনিত না বলিয়া হাসপাতালে থানায় আর খবরের কাগজের আপিসে খোঁজ করাইল। গাড়ি-টাড়ি চাপা পড়িয়া থাকিলে শীতলের একটা সংবাদ পাওয়া যাইত শ্যামাকে এই সান্ত্বনা দিতে আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক হইয়া বাড়ি গেল। শ্যামা যেভাবে তার কাছে স্বামীনিন্দা করিল ছোটোজাতের স্ত্রীলোকের মুখেও বিষ্ণুপ্রিয়া কোনোদিন সে সব কথা শোনে নাই।

বিধান জিজ্ঞাসা করে, বাবা কোথায় গেছে মা?

শ্যামা বলে, চুলোয়।

শ্যামা রাঁধে বাড়ে, ছেলেমেয়েদের খাওয়ায়, নিজেও খায়, কিন্তু বাঘিনির মতো সব সময় সে যেন কাহাকে খুন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া থাকে। জ্বালা তাহার কে বুঝিবে? তিনটি সন্তানের সে জননী, স্বামীর উপর তাহার নির্ভর অনিশ্চিত! একজন পরম বন্ধু তাহার ছিল,—রাখাল। সে তাহাকে ঠকাইয়া গিয়াছে, স্বামী আজ তাহার সঞ্চয় লইয়া পলাতক। বোকার মতো কেন যে সে সেভিংস ব্যাংকের খাতাখানা শীতলকে দিতে গিয়াছিল! রাত্রে শ্যামার ঘুম হয় না। শীতের রাত্রি, ঠান্ডা লাগিবার ভয়ে দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিতে হয়, শ্যামা একটা লণ্ঠন কমাইয়া রাখে, ঘরের বাতাস দূষিত

হইয়া ওঠে। শ্যামা বারবার মশারি ঝাড়ে, বিধানের গায়ে লেপ তুলিয়া দেয়, বুকুব কাঁথা বদলায়, মণিকে তুলিয়া ঘরের জল বাহির হওয়ার নালিটার কাছে বসায়, আরও কত কী করে। চোখে তাহার জলও আসে।

এমনি সাতটা রাত্রি কাটাইবার পর অষ্টম রাত্রে পাগলের মতো চেহারা লইয়া শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, খেয়ে এসেছ?

শীতল বলিল, না।

সেই রাত্রে শ্যামা কাঠেব উনানে ভাত চাপাইয়া দিল। রান্না শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল। শীতল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ডাকিয়া তুলিয়া তাহাকে খাইতে বসাইয়া শ্যামা ঘবে গিয়া শুইয়া পড়িল। কাছে বসিয়া শীতলকে খাওয়ানোর প্রবৃত্তি হইল না বলিযা শুধু নয়, ঘুমে তাহার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছিল।

পরদিন শীতল শ্যামাকে একশত টাকা ফেরত দিল।

আর কই? বাকি টাকা কী করেছ?

আর তুলিনি তো?

তোলোনি? খাতা কই আমার?

খাতাটা হাবিয়ে গেছে শ্যামা, কোনখানে যে ফেললাম-

শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, সব টাকা নষ্ট করে এসে আবাব তুমি মিছে কথা বলছ, আমি পাঁচশো টাকা সই কবে দিলাম একশো টাকা তুমি কী করে তুললে, মিছে কথাগুলো একটু আটকালো না তোমার মুখে,—দোতলায় ঘব তুলব বলে আমি যে টাকা জমাচ্ছিলাম গো।

শীতল আস্তে আস্তে সরিয়া গেল।

এ বছর প্রথম স্কুল খুলিলেই বিধানকে শ্যামা স্কুলে ভর্তি করিয়া দিবে ভাবিয়াছিল, কিন্তু এই সব টাকার গোলমালে ফাল্গুন মাস আসিয়া পড়িল বিধানকে স্কুলে দেওয়া হইল না। শহরতলিব এখানে কাছাকাছি স্কুল নাই, আনন্দমোহিনী মেমোরিয়েল হাইস্কুল কাশীপুরে, প্রায় একমাইল তফাতে। এতখানি পথ হাঁটিয়া বিধান প্রত্যহ স্কুল করিবে, শ্যামার তাহা পছন্দ হইতেছিল না। কলিকাতার স্কুলে ভর্তি করিলে বিধানকে ট্রামে-বাসে যাইতে হইবে, শ্যামাব সে সাহস নাই। প্রেসে যাওয়ার সময় শীতল যে বিধানকে স্কুলে পৌঁছাইয়া দিবে তাহাও সম্ভব নয়, শীতল কোনোদিন প্রেসে যায় দশটায়, কোনোদিন একটায়। শ্যামা মহাসমস্যায় পড়িয়া গিয়াছিল। অথচ ছেলেকে এবার স্কুলে না দিলেই নয়, বাড়িতে ওর পড়াশোনা হইতেছে না। শীতলকে বলিয়া লাভ হয় না, কথাগুলি সে গ্রাহ্য করে না। শ্যামা শেষে একদিন পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে গেল বিষ্ণুপ্রিয়ার বাড়ি।

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, এক কাজ কর না? আমাদের শঙ্কর যেখানে পড়ে তোমার ছেলেকে সেইখানে ভর্তি করে দাও, শঙ্কর তো গাড়িতে যায়, তোমার ছেলেও ওর সঙ্গে যাবে। তবে ওখানে মাইনে বেশি, ভদ্রলোকের ছেলেবাই বেশির ভাগ পড়ে ওখানে, আব,—ওখানে ভর্তি করলে ছেলেকে ভালো ভালো কাপড়জামা কিনে দিতে হবে,—একদিন যে একটু ময়লা একটা জামা পরিয়ে ছেলেকে স্কুলে পাঠাবে তা পারবে না। হেডমাস্টার সায়েব কিনা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভালোবাসে।

বিষ্ণুপ্রিয়া আজও শ্যামার উপকার করিতে ভালোবাসে কিন্তু আসিলে বসিতে বলে না, কথা বলে অনুগ্রহ করার সুরে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সেই মেয়েটির বয়স এখন প্রায় এগারো, বেণি দুলাইয়া সেও স্কুলে যায়, দেখিয়া এখন আর বুঝিবার উপায় নাই কদর্য পাপের ছাপ লইয়া সে জন্মিয়াছিল, শুধু মনে হয় মেয়েটা বড়ো রোগা। বিষ্ণুপ্রিয়ার আর একটি মেয়ে হইয়াছে, বছর তিনেক বয়স। বিষ্ণুপ্রিয়া এখন

আবার সাজগোজ করে, তবে আগের মতো দেহের চাকচিক্য তাহাব নাই, এখন চকচক করে শুধু গহনা,—অনেকগুলি।

ভাবিয়া চিন্তিয়া শ্যামা বিধানকে শঙ্করের স্কুলেই ভর্তি করিয়া দিল। শঙ্কর বিষ্ণুপ্রিয়ার খুড়তুতো বোনের ছেলে, এবাব সেকেন্ড ক্লাসে উঠিযাছে। বযসের আন্দাজে ছেলেটা বাড়ে নাই, বিধানের চেয়ে মাথায সে সামান্য একটু উঁচু, ভারী মুখচোবা লাজুক ছেলে, গায়ের রংটি টুকটুকে। যত ছোটো দেখাক সে সেকেন্ড ক্লাসে পড়ে, স্কুলের অভিজ্ঞতাও তাহার আছে, বিধানকে শ্যামা তাহার জিম্মা করিয়া দিল, চিবুক ধরিয়া চুমা খাইয়া ছেলেকে দেখাশোনা করার জন্য শ্যামা তাহাকে এমন করিয়াই বলিল যে লজ্জায শঙ্করেব মুখ রাঙা হইযা গেল।

সারাদিন শ্যামা অন্যমনস্ক হইযা বহিল। ভাবিবার চেষ্টা কবিল, বিধান স্কুলে কী করিতেছে। শ্যামাব একটা ভয ছিল স্কুলে বড়োলোকের ছেলেব সঙ্গে বিধান মানাইয়া চলিতে পারিবে কিনা, গবিবের ছেলে বলিযা ওকে সকলে তুচ্ছ করিবে না তো? একটা ভরসার কথা শঙ্করের সঙ্গে ওর ভাব হইযাছে, শঙ্করেব বন্ধু বলিয়া সকলে ওকে সমানভাবেই হয়তো গ্রহণ করিবে, হাসিতামাশা কবিবে না। ফাল্গুনেব দিনটি আজ শ্যামাব বড়ো দীর্ঘ মনে হয। একদিনের জন্য ছেলে তাহার বাড়ি ছাড়িযা কোথাও গিযা থাকে নাই, অপবিচিত স্থানে অচেনা ছেলেদের মধ্যে দশটা হইতে চারটে পর্যন্ত সে কী করিয়া কাটাইবে কে জানে।

বিকালে বিধান ফিবিযা আসিলে শ্যামা তাহার মুখখানা ভারী শুকনো দেখিল। টিফিনের সময় খাবার কিনিয়া খাওযাব জন্য শ্যামা তাহাকে চাব আনা পয়সা দিয়াছিল, বিধান লজ্জায় কিছু খাইতে পারে নাই ভাবিযা বলিল, ও খোকা, মুখ শুকিয়ে গেছে কেন রে? খাসনি কিছু কিনে টিফিনেব সময়?

বিধান বলিল, খেয়েছি তো, পেট ব্যথা কবছে মা।

শ্যামা বলিল, কেন খোকা, পেট ব্যথা কবছে কেন বাবা? কী খেয়েছিলি কিনে?

পেটেব ব্যথায বিধান নানারকম মুখভঙ্গি করে। চোখে জল দেখা দেয়।

শ্যামা ধমক দিযা বলে, কী খেয়েছিলি বল।

ফুলুবি।

আর কি?

আব ঝালবড়া।

তাহলে হবে না তোমার পেট ব্যথা, মুখপোড়া ছেলে! রাজ্যে এত ভালো ভালো খাবার থাকতে তুমি খেতে গেলে কিনা ফুলুরি আব ঝালবড়া! কেন খেতে গেলি ও সব—?

শঙ্কর খাওয়ালে মা। শঙ্কব বলে, বাড়িতে ও সব তো খেতে দেয় না, শুধু দুধ আর সন্দেশ খেয়ে মর, তাই—

শঙ্কব ছেলেটা তো তবে কম দুষ্টু নয়? বাড়িতে যা নিষেধ করিয়া দেয় চুরি করিয়া তাই করে? ওব সঙ্গে মেলামেশা কবিয়া বিধানের স্বভাব খারাপ হইয়া যাইবে না তো! শ্যামার প্রথমে ভাবী ভাবনা হয়, তাবপর সে ভাবিয়া দ্যাখে যে লুকাইয়া ফুলুবি আব ঝালবড়া খাওয়াটা খুব বেশি খারাপ অপরাধ নয়, এ রকম দুষ্টামি ছেলেরা করেই। তবু মনটা শ্যামার খুঁতখুঁত করে। ছেলেকে সে নানারকম উপদেশ দেয়, অসংখ্য নিষেধ জানায়। কাজ করিতে করিতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে কাছে ডাকিয়া বলে, এ যেন তুমি কখনও কোরো না বাবা, কখনও নয়।

কেন মা?—বিধান বলে। প্রত্যেকবাব।

একদিন মন্দার একখানা পত্র আসিল, খুব দরদ দিয়া অনেক মিষ্টি-মিষ্টি কথা লিখিয়াছে। চিঠি পড়িয়া শ্যামা মুখ বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল, বসে থাক তুমি জবাবের জন্যে হা-পিত্যেশ করে, তোমার

চিঠির জবাব আমি দিচ্ছিনে।—কদিন পরে শীতলের কাছে রাখালের একখানা পোস্টকার্ড আসিল, শ্যামা চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিল, শীতলকে কিছু বলিল না। জবাব না পাইয়া একটু অপমান বোধ করুক লোকটা। ফাঁকি দিয়া টাকা বাগাইয়া লওয়ার জন্য শীতল তাহাকে এমন ঘৃণাই করিতেছে যে চিঠির উত্তরও দেয় না।

ফাল্গুন মাস কাবার হইয়া আসিল। শীত একেবারে কমিয়া গিয়াছে। একদিন রোদ খাওযাইয়া লেপগুলি শ্যামা তুলিয়া রাখিল। শ্যামার শরীরটা আজকাল ভালো আছে, তিন ছেলের মার আবাব শরীব—তবু, সানন্দ মনে আরেকটি সন্তানেব শখ যেন উঁকি মারিয়া যায়, একা থাকিবার সময় অবাক হইযা শ্যামা হাসে, কী কাণ্ড মেয়েমানুষেব, মাগো! বিধান দশটার সময় ভাত খাইয়া জুতা মোজা হাফপ্যান্ট আর শার্ট পরিয়া স্কুলে যায়, শ্যামা তাহার চুল আঁচড়াইয়া দেয়, আঁচল দিয়া মুখ মুছিয়া দেয়,—প্রথম প্রথম ছেলের মুখ সে একটু পাউডার মাখাইয়াও দিত, বড়োলোকেব ছেলেদের মাঝখানে গিয়া বসিবে একটু পাউডার না মাখিলে কি চলে? স্কুলে ছেলেরা ঠাট্টা করায় বিধান এখন আর পাউডার মাখাইতে দেয় না। বলে, তুমি কিচ্ছু জানো না মা, পাউডার দেখলে ওবা সবাই হাসে, সার সুদ্ধ। কী বলে জান?—বলে চুন তো মেখেই এসেছিস এবার একটু কালি মাখ, বেশ মানাবে তোকে, মাইরি ভাই, মাইরি।

মাইবি বলে? বিধানেব স্কুলে বড়োলোকের সোনার চাঁদ অভিজাত ছেলেদেব মুখে এই কথাটির উচ্চারণ শ্যামার বড়ো খাপছাড়া মনে হয়। এমনই কত কথা বিধান শিখিয়া আসে, মাইরির চেয়েও ঢের বেশি খাবাপ কথা। অনেক বড়ো বড়ো শব্দও সে শিখিয়া আসে, আর সংকেত, শ্যামা যাব মানেও বুঝিতে পাবে না। তাহার অজানা এক জগতের সঙ্গে বিধান পরিচিত হইতেছে, অল্প-অল্প একটু যা আভাস পায় তাতেই শ্যামা অবাক হইয়া থাকে। সে একটা বিচিত্র গর্ব ও দুঃখ বোধ করে। বাড়িতে এখন বিধানেব জিজ্ঞাসা কমিয়া গিয়াছে, প্রশ্নে প্রশ্নে আর সে শ্যামাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে না। ছাদে উঠিযা, খানিকদূরে বাঁধের উপর দিয়া যে রেলগাড়ি চলিয়া যায়, ছেলেকে তাহা দেখানোব সাধ শ্যামার কিন্তু কমে নাই, জ্ঞান ও বুদ্ধিতে ছেলে তাহাকে ছাডাইয়া যাইতেছে বলিয়া গর্ব ও আনন্দের সঙ্গে শ্যামাব দুঃখ এইটুকু।

বকুল আছে।

সে কিন্তু মেয়ে। ছেলের মতো শ্যামার কাছে মেয়ের অত খাতির নাই। ছ বছরের মেয়ে, সে তো বুড়ি। শ্যামা তাহাকে দিয়া দুটি একটি সংসারের কাজ কবায, মণিকে খেলা দিতে বলে, সময় পাইলে প্রথম ভাগ খুলিয়া একটু একটু পড়ায়। মেয়েটা যেমন দুরন্ত হইয়াছে, সে রকম মাথা নাই, কিছু শিখিতে পারে না। তাহাকে অক্ষর চিনাইতেই শ্যামার একমাস সময় লাগিয়াছে, কতদিন কর খল শিখিবে কে জানে। মাঝে মাঝে রাগ করিয়া শ্যামা মেয়েব পিঠে একটা চড় বসাইয়া দেয়। বিধানও মারে। প্রথম ভাগের পড়া যে শিখিতে পারে না তার প্রতি বিধানের অবজ্ঞা অসীম। এক একদিন সকালবেলা হঠাৎ সে তাহার ক্লাস-মাস্টার অমূল্যবাবুর মতো গম্ভীর মুখ করিয়া হুকুম দেয়, এই বুকু, নিয়ে আয় তো বই তোব,—বুকু ভয়ে ভয়ে বই লইয়া আসে, তাহার ছেঁড়া ময়লা প্রথম ভাগখানি। ভয় পাইলে বোঝা যায় কী বড়ো বড়ো আশ্চর্য দুটি চোখ বকুলের। পড়া ধরিয়া বোনের অজ্ঞতায় বিধান খানিকক্ষণ শ্যামার সঙ্গে হাসাহাসি করে, তারপর কখন যে সে অমূল্যবাবুর মতো ধাঁ করিয়া চাঁটি মারিয়া বসে আগে কারও টের পাইবার জো থাকে না। শ্যামা শুধু বলে, আহা খোকা, মারিস নে বাবা।

বকুল বড়ো অভিমানী মেয়ে, কারও সামনে সে কখনও কাঁদে না ; ছাদে চিলেকুঠির দেয়াল আর আলিসার মাঝখানে তাহার একটি হাতখানেক ফাঁক গোসাঘর আছে, সেইখানে নিজেকে গুঁজিয়া দিয়া সে কাঁদে। তারপর গোসাঘরখানাকে পুতুলের ঘর বানাইয়া সে খেলা করে। যে পুতুলটি তাহার ছেলের

বউ তার সঙ্গে বকুলের বড়ো ভাব, দু জনে যেন সই। তাকে শোনাইয়া সে সব মনের কথা বলে। বলে, বাবাকে সব বলে দেব, বাবা দাদাকে মারবে, মাকেও মারবে, মারবে না ভাই বউমা? অ্যাঁ করে জিব বের করে দাদা মরে যাবে—মা কেঁদে মরবে, হুঁ।

শীতলের কী হইয়াছে শ্যামা বুঝিতে পারে না, লোকটা কেমন যেন ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, স্ফূর্তিও নাই দুঃখও নাই। সময় মতো আপিসে যায়, সময় মতো ফিরিয়া আসে, কোনোদিন পাড়ার অখিল দত্তের বাড়ি দাবা খেলিতে যায়, কোনোদিন বাড়িতেই থাকে। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে, রাগারাগিও করে না, দীনদুঃখীর মতো মুখের ভাবও করিয়া রাখে না, স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সঙ্গে তাহার কথা ও ও ব্যবহার সহজ ও স্বাভাবিক হয়, অথচ তার কাছে কারও যেন মূল্য নাই, কিছুই সে যেন গ্রাহ্য করে না। শ্যামার টাকা লইয়া পালানোর পর হইতে তাহার এই পাগলামি না-করার পাগলামি আরম্ভ হইয়াছে। ধার করিয়া রাখালকে টাকা দেওয়ার অপরাধ, শ্যামার জমানো টাকাগুলি নষ্ট করার অপরাধ, তাহার কাছে অবশ্যই পুরানো হইয়া গিয়াছে, মনে আছে কিনা তাও সন্দেহ। মাস গেলে আগের টাকার অর্ধেক পরিমাণ টাকা আনিয়া সে শ্যামাকে দেয়, আগে হইলে এই লইয়া কত কাণ্ড করিত, হয় অনুতাপে সারা হইত, না হয় নিজে নিজে কলহ বাধাইয়া শ্যামাকে গাল দিয়া বলিত, যা সে আনিয়া দেয় তাই যেন শ্যামা সোনামুখ করিয়া গ্রহণ করে, ঘরে বসিয়া গেলা যাহার একমাত্র কর্ম অত তাহার টাকার খাঁকতি কেন?—এখন টেরও পাওয়া যায় না কম টাকা আনিয়াছে এটা সে খেয়াল করিয়াছে। শ্যামা যদি নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কী করে যে মাস চালাব,—সে অমনই অমায়িক ভাবে বলিয়া বসে, ওতেই হবে গো, খুব চলে যাবে, বাড়ি ভাড়া দিতে হয় না, ইয়ে করতে হয় না, কী কর অত টাকা?

কমল ঘোষের টাকাটা মাসে মাসে কিছু কম করিয়া দিলে হয়তো চলে, শীতলকে এ কথা বলিতে শ্যামার বাধে। ঋণ যত শীঘ্র শোধ হইয়া যায় ততই ভালো। এদিকে খরচ চলিতে চাহে না। বিধানকে স্কুলে দেওয়ার পর খরচ বাড়িয়াছে, বইখাতা, স্কুলের মাহিনা, পোশাক, জলখাবারের পয়সা এ সব মিলিয়া অনেকগুলি টাকা বাহির হইয়া যায়। যেমন তেমন করিয়া ছেলেকে শ্যামা স্কুলে পাঠাইতে পারে না, ছেলের পরিচ্ছদ ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বিষ্ণুপ্রিয়া যে তাহাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল নিতান্ত অভাবের সময়েও শ্যামা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারে না। খরচ সে কমাইয়াছে অন্যদিকে। সত্যভামার এতকালের চাকরিটি গিয়াছে নিজের জন্য শেমিজ ও কাপড় কেনা শ্যামা বন্ধ করিয়াছে, এ সব বেশি পরিমাণে তাহার কোনোদিনই ছিল না, চিরকাল জোড়াতালি দিয়া কাজ চালাইয়া আসিয়াছে, এখন বড়ো অসুবিধা হয়। স্বামীপুত্র ছাড়া বাড়িতে কেহ থাকে না তাই রক্ষা, নতুবা লজ্জা বাঁচিত না। শীতল আর বিধান বাহিরে যায়, ওদের জামাকাপড় ছাড়া শ্যামা আর কিছু ধোপাবাড়ি পাঠায় না, বাড়িতে কাচিয়া লয়। ছেলেমেয়েদের দুধ সে কমাইতে পারে নাই, কমাইয়াছে মাছের পরিমাণ। মাঝে মাঝে ফল ও মিষ্টি আনাইয়া সকলকে খাওয়ানোর সাধ সে ত্যাগ করিয়াছে। এই ত্যাগটাই সবচেয়ে কষ্টকর। শ্যামার ছেলেমেয়েরা ভালো জিনিস খাইতে বড়ো ভালোবাসে।

তবু, এই সব অভাব-অনটনের মধ্যেও শ্যামার দিনগুলি সুখে কাটিয়া যায়। ছেলেমেয়েদের অসুখ-বিসুখ নাই। শীতলের যাহাই হইয়া থাক, তাহাকে সামলাইয়া চলা সহজ। নিজের শরীরটাও শ্যামার এত ভালো আছে যে একা সংসারের সমস্ত খাটুনি খাটিতে তাহার কিছুমাত্র কষ্ট হয় না, কাজ করিতে যেন ভালোই লাগে।

চৈত্র শেষ হইয়া আসিল। ছাদে দাঁড়াইলে বসাকদের বাড়ির পাশ দিয়া রেলের উঁচু বাঁধটার ধারে প্রকাণ্ড শিমুল গাছটা হইতে তুলা উড়িয়া যাইতে দেখা যায়। পুবে খানিকটা ফাঁকা মাঠের পরে টিনের বেড়ার ও পাশে ধানকলের প্রকাণ্ড পাকা অঙ্গন, কুলি মেয়েরা প্রত্যহ ধান মেলিয়া শুকাইতে দেয়, ধান খাইতে ঝাঁক বাঁধিয়া পায়রা নামিয়া আসে। পায়রার ঝাঁকের ওড়া দেখিতে শ্যামা বড়ো ভালোবাসে,

অতগুলি পাখি আকাশে বারবার দিক পরিবর্তন করে একসঙ্গে, সকাল ও বিকাল হইলে উড়িবার সময় একসঙ্গে সবগুলি পায়রার পাখার নীচে রোদ লাগিয়া ঝকঝক করিয়া ওঠে, শ্যামা অবাক হইয়া ভাবে, কখন কোনদিকে বাঁকিতে হইবে সবগুলি পাখি একসঙ্গে টের পায় কী করিয়া? ধানকলের এক কোনায় ছোটো একটি পুকুর, ইঞ্জিন ঘরের ওদিকে আরও একটা বড়ো পুকুর আছে, বয়লারের ছাই ফেলিয়া ছোটো পুকুরটির একটি তীরকে ওরা ধীরে ধীরে পুকুরের মধ্যে ঠেলিয়া আনিয়াছে, পুকুরটা বুজাইয়া ফেলিবে বোধ হয়। ছাই ফেলিবার সময় বাতাসে রাশি রাশি ছাই সাদা মেঘের মতো টিনের প্রাচীর ডিঙাইয়া, রেলের বাঁধ পার হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। আজকাল এ সব শ্যামা যেমন ভাবে চাহিয়া দ্যাখে কতকাল তেমনই ভাবে সে তা দ্যাখে নাই। বিকালে ছাদে গিয়া সে মণিকে ছাড়িয়া দেয়, মণি বকুলের সঙ্গে ছাদময় ছুটাছুটি করে। আলিসায় ভর দিয়া শ্যামা কাছে ও দূরে যেখানে যা কিছু দেখিবার আছে দেখিতে থাকে, বোধ করে কেমন একটা উদাস উদাস ভাব, একটা অজানা ঔৎসুক্য। পরপর অনেকগুলি গাড়ি রেললাইন দিয়া দুদিকে ছুটিয়া যায়, তিনটা সিগন্যালের পাখা বারবার ওঠে নামে। ধানকলের অঙ্গনে কুলিমেয়েরা ছড়ানো ধান জড়ো করিয়া নৈবেদ্যের মতো অনেকগুলি স্তূপ করে, তারপর হোগলার টুপি দিয়া ঢাকিয়া দেয়। ছোটো পুকুরটিতে ধানকলের বাবু জাল ফেলান, মাছ বেশি পড়ে না, এতটুকু পুকুরে মাছ কোথায়?—জাল ফেলাই সার। শ্যামার হাসি পায়। তাহার মামাবাড়ির পুকুরে ও জাল ফেলিলে আর দেখিতে হইত না, মাছের লেজের ঝাপটায় জাল খানখান হইয়া যাইত। পারিপার্শ্বিক জগতের দৃশ্য ও ঘটনা শ্যামা এমনই ভাবে খুঁটিয়া খুঁটিয়া উপভোগ করে, বাড়িঘর, ধানকল, রেললাইন, রাস্তার মানুষ, এ সব আর কবে তাহার এত ভালো লাগিয়াছিল?—অথচ মনে মনে অকারণ উদ্‌বেগ, দেহে যেন একটা শিথিল ভারবোধ,—হাইতোলা আলস্য। বিধান আজকাল বিকালের দিকে শঙ্করদের বাড়ি খেলিতে যায়, ছেলেকে না দেখিয়া তার কী ভাবনা হইয়াছে?

শীতল বলে, বুড়ো বয়সে তোমার যে চেহারার খোলতাই হচ্ছে গো, বয়েস কমছে নাকি দিনকে দিন?

শ্যামা বলে, দূর দূর। কী সব বলে ছেলের সামনে!

শীতলের নজর পড়িয়াছে, শ্যামার ছেঁড়া কাপড় দেখিয়া তাহার চোখ টাটায়, শ্যামার জন্য সে রঙিন কাপড় কিনিয়া আনে। শ্যামা প্রথমে জিজ্ঞাসা করে, ক টাকা নিলে? টাকা পেলে কোথা?

হুঁ, কটা টাকা আর পাইনে আমি,—উপরি পেয়েছি কাল। একটি পয়সা তো দেও না, আমার খরচ চলে কীসে উপরি না পেলে?

খরচ চলে? শীতল তাহা হইলে আরও উপরি টাকা পায়, খুশি মতো খরচ করে, তাহাকে যে টাকা আনিয়া দেয় তাই সব নয়? শ্যামা রাগিয়া বলে, কী রকম উপরি পাও শুনি?

দশ বিশ টাকা, আর কত?

নিশ্চয় আরও বেশি, মিথ্যে বলছ বাবু তুমি,—নিজে নিজে খরচ কর তো সব? আমার এদিকে খরচ চলে না, ছেঁড়া কাপড় পরে আমি দিন কাটাই।

আরে মুশকিল, তাই তো কাপড় কিনে আনলাম।—আচ্ছা তো নেমকহারাম তুমি।

শ্যামা রঙিন কাপড়খানা নাড়াচাড়া করে, মিষ্টি করিয়া বলে, কী টানাটানি চলেছে বোঝ না তো কিছু, কী কষ্টে যে মাস চালাই, ভাবনায় রাতে ঘুম হয় না,—দু-চারটে টাকা যদি পাও কেন নষ্ট কর?—এনে দিলে সংসার হয়। তোমার খরচ কী? বাজে খরচ করে নষ্ট কর বই তো নয়, যা স্বভাব তোমার জানি তো! হাতে টাকা এলে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে যায়। এবার থেকে আমায় এনে দিও, তোমার যা দরকার হবে চেয়ে নিয়ো,—আর কটা মাস মোটে, ধারটা শোধ হয়ে গেলে তখন কি আর টানাটানি থাকবে, না তুমি দশ-বিশ টাকা বাজে খরচ করলে এসে যাবে?

শ্যামা বলে, শীতল শোনে। শ্যামাকে বোধ হয় সে আর একজনের সঙ্গে মিলাইয়া দ্যাখে, যে এমনি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলিয়া বুঝাইয়া টাকা আদায় করিত, বলিত, আমায় দুখানা গয়না গড়িয়ে দে— টাকাটা তাহলে আটকা থাকবে, নইলে তুই তো সব খরচ করে ফেলবি!—দরকারের সময় তুই তোর গয়না বেচে নিস, আমি যদি একটি কথা কই—

সে এ সব বলিত মদের মুখে। শ্যামা কী?

তারপব শ্যামা বলে, এ কাপড তো পরতে পারব না আমি ছেলের সামনে,—ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে, আমাব লজ্জা করবে বাবু।

না পরতে পাব, ওই নর্দমা রয়েছে ওখানে ফেলে দাও।—শীতল বলে।

রাত্রে ছেলেমেযেবা সব ঘুমাইয়া পডিলে শ্যামা আস্তে আস্তে শীতলকে ডাকে, বলে, হ্যাঁগা, ঘুমুলে নাকি? ফুটফুটে জোছনা উঠেছে দিব্যি, ছাতে যাবে একবারটি?

শীতল বলে, আবাব ছাতে কী জন্যে?—কিন্তু সে বিছানা ছাড়িয়া ওঠে। শ্যামা বলে, গিয়ে একটা বিড়ি ধরাও, আমি আসছি।

রঙিন কাপডখানা পবিয়া শ্যামা ছাদে যায। বড়ো লজ্জা করে শ্যামার,—শীতলকে নয়, বিধানকে। ঘুম ভাঙিয়া রাত দুপুরে তার পরনে রঙিন কাপড় দেখিলে, ও যা ছেলে, ওর কী আর বুঝিতে বাকি থাকিবে শীতলের মন ভুলানোব জন্যে সে সাজগোজ করিয়াছে? অথচ শীতল শখ করিয়া কাপড়খানা আনিযা দিযাছে, একবাব না পবিলেই বা চলিবে কেন?

শ্যামা মাদুব লইযা যায়, মাদুর পাতিয়া দুজনে বসে। চাঁদের আলোয় বসিযা দুজনে দুটো-একটা সাংসারিক কথা বলে, বেশি সময থাকে চুপ করিযা। বলার কী আর কথা আছে ছাই এ বয়সে! হ্যাঁ, শীতল শ্যামাকে একটু আদব কবে, শীতলেব স্পর্শ আব তেমন মোলায়েম নয়, কখনও যেন স্ত্রীলোকের সঙ্গ পায নাই এমনই আনাড়ির মতো আদর করে। শ্যামা দোষ দিবে কাকে? সে ও তো কম মোটা হয় নাই!

তাবপর একদিন শ্যামা সলজ্জভাবে বলে, কী কাণ্ড হয়েছে জান?

শীতল শুনিযা বলে, বটে নাকি!

শ্যামা বলে, হ্যাঁ গো, চোখ নেই তোমার?—কী হবে বল তো এবার, ছেলে না মেয়ে?

মেয়ে।

উহুঁ, ছেলে।—বুকু বেঁচে থাক, আমার আর মেয়েতে কাজ নেই বাবু।

বলিযা শ্যামা হাসে। মধুব পরিপূর্ণ হাসি, দেখিয়া কে বলিবে শীতলেব মতো অপদার্থ মানুষ তাহার মুখে এ হাসি জোগাইয়াছে।

চার

মাঝখানে একটা শীত চলিয়া গেল, পরের শীতেব গোড়ার দিকে, শ্যামাব নূতন ছেলেটির বয়স যখন প্রায় আটমাস, হঠাৎ একদিন সকালবেলা মামা আসিযা হাজির।

শ্যামার সেই পলাতক মামা তারাশঙ্কর।

ছোটোখাটো বেঁটে লোকটা, হাত-পা মোটা, প্রকাণ্ড চওড়া বুক। একদিন ভয়ংকর বলবান ছিল, এখন মাংসপেশিগুলি শিথিল হইয়া আসিয়াছে। শেষবার শ্যামা যখন তাহাকে দেখিয়াছিল মাথার চুলে তাহার পাক ধরে নাই, এবার দেখা গেল প্রায় সব চুল পাকিয়া গিয়াছে। সে তো আজকের কথা নয়। শ্যামার বিবাহেব কিছুদিন পরে জমিজমা বেচিয়া গ্রামের সব চেয়ে বনেদি ঘরের বিধবা মেয়েটিকে

সাথি করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছিল,—শ্যামার বিবাহ হইয়াছে আজ একুশ বাইশ বছর। বিবাহের সাত বছর পরে তার সেই প্রথম ছেলেটি হইয়া মারা যায়, তার দুবছর পরে বিধানের জন্ম। গত আশ্বিনে বিধানের এগারো বছর বয়স পূর্ণ হইয়াছে।

মামার বয়স ষাট হইয়াছে বইকী! কিন্তু যে লোহার মতো শরীর তাহার ছিল, এতটা বয়সের ছাপ পড়ে নাই, শুধু চুলগুলি পাকিয়া গিয়াছে, দুটো একটা দাঁত বোধ হয় পড়িয়া গিয়াছিল মামা সোনা দিয়া বাঁধাইয়া লইয়াছে, কথা বলিবার সময় ঝিকমিক করে। এখনও সে আগের মতোই সোজা হইয়া দাঁড়ায়, মেরুদণ্ডটা আজও এতটুকু বাঁকে নাই। চোখ দুটা মনে হয় একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, তা সে চোখের দোষ অথবা মানসিক শ্রান্তি বুঝা যায় না। শ্যামার বিবাহের সময় মামা ছিল সন্ন্যাসী, গেরুয়া পরিত, লম্বা আলখাল্লা ঝুলাইয়া সযত্নে বাবরি আঁচড়াইয়া ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে দিয়া যখন গ্রামের পথে বেড়াইতে যাইত, মনে হইত মস্ত সাধু, বড়ো ভক্তি করিত গ্রামের লোক। এবার মামার পরনে সরু কালোপাড় ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে চকচকে জুতো,—একেবারে বাবুর বাবু!

শীতল চিনিতে পারে নাই। শ্যামা প্রণাম করিয়া বলিল, ও মাগো, কোথায় যাব, এ যে মামা! কোথা থেকে এলে মামা তুমি?

মামা হাসিয়া বলিল, এক জায়গা থেকে কী আর এসেছি মা যে নাম করব, চরকিবাজির মতো ঘুরতে ঘুরতে একবার তোকে দেখতে এলাম, আপনার জন কেউ তো আর নেই, বুড়ো হয়েছি কোনদিন চোখ বুজি তার আগে ভাগনিটাকে একবার দেখে যাই, এই সব ভাবলাম আর কী,—এরা তোর ছেলেমেয়ে না? কটি রে?

শ্যামাকে মামা বড়ো ভালোবাসিত, সে তো জানিত মামা করে কোন বিদেশে দেহ রাখিয়াছে, এতকাল পরে মামাকে পাইয়া শ্যামার আনন্দের সীমা রহিল না। কী দিয়া সে যে মামার অভ্যর্থনা করিবে! বাইশ বছর পরে যে আত্মীয় ফিরিয়া আসে তাকে কী বলিতে হয়, কী করিতে হয় তার জন্য? মামাকে সে নানারকম খাবার করিয়া দিল, বাজার হইতে ভালো মাছ তরকারি আনিয়া রান্না করিল, বেশি দুধ আনাইয়া তৈরি করিল পায়েস। মামা বড়ো ভালোবাসিত পায়েস। এখনও তেমনই ভালোবাসে কিনা কে জানে?

মামার সঙ্গে একটু ভদ্রতা করিয়া শীতল কোথায় পলাইয়াছিল, মামা ইতিমধ্যে শ্যামার ছেলেদের সঙ্গে ভাব জমাইয়া ফেলিয়াছে,—ভারী মজার লোক, এমন আর শ্যামার ছেলেরা দ্যাখে নাই। রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা হাসিমুখে কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, বলে, আর তোমাকে পালিয়ে যেতে দেব না মামা, এবার থেকে আমার কাছে থাকবে। তোমার জিনিসপত্তর কই?

মামা বলে, সে এক হোটেলে রেখে এসেছি, কে জানত বাবু তোরা আছিস এখানে?

শ্যামা বলে, ও বেলা গিয়ে তবে জিনিসপত্তর সব নিয়ে এসো,—কলকাতা এসেছ করে?

মামা বলে, এই তো এলাম কাল না পরশু,—পরশু বিকেলে।

বিধান আজ স্কুলে গেল না। মামা আসিয়াছে বলিয়া শুধু নয়, বাড়িতে আজ নানারকম রান্না হইতেছে, মামা কী একাই সব খাইবে? এগারোটা পর্যন্ত কোথায় আড্ডা দিয়া আসিয়া তাড়াহুড়া করিয়া স্নানাহার সারিয়া শীতল প্রেসে চলিয়া গেল, মামার সঙ্গে একদণ্ড বসিয়া কথা বলারও সময় পাইল না। আজ তাহার এত তাড়াতাড়ি কীসের সেই জানে, বাড়িতে একটা মানুষ আসিলে শীতল যেন কী রকম করে, সে যেন চোর—পুলিশ তাহার খোঁজ করিতে আসিয়াছে।

রাঁধিতে রাঁধিতে শ্যামা কত কী যে ভাবিতে লাগিল। মামার সঙ্গিনীটির কী হইয়াছে? হয়তো মরিয়া গিয়াছে, নয়তো মামার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হইয়াছে অনেকদিন আগেই। ও সব সম্পর্ক আর কতকাল টেঁকে? মরুক, ও সব দিয়া তার কী দরকার? কেলেঙ্কারি ব্যাপার চুকাইয়া দিয়া মামা ফিরিয়া আসিয়াছে

এই তার ঢের। আচ্ছা, এতকাল মামা কী করিতেছিল? টাকাপয়সা কিছু সঞ্চয় করিয়াছে নাকি? তা যদি করিয়া আসিয়া থাকে তবে মন্দ হয় না। মামার সম্পত্তি হাতছাড়া হইয়া যাওয়ায় শীতলের মনে বড়ো লাগিয়াছিল, মামা হয়তো এবার সুদে-আসলে সে পাওনা মিটাইয়া দিবে? পুরুষমানুষের ভাগ্য,— বিদেশে ধূলিমুঠা ধরিয়া মামার হয়তো সোনামুঠা হইয়াছে, মামার কাপড়জামা দেখিলেও তাই মনে হয়। মামার তো আর কেউ নাই, যদি কিছু সঞ্চয় করিয়া থাকে শ্যামাই তাহা পাইবে। এই বয়সে আর একজন সঙ্গিনী জুটাইয়া মামা আর তাহার দেশান্তরী হইতে যাইবে না!

মামাকে সে ঘরবাড়ি দেখায়। পিছনে খিড়কির দিকে খানিকটা খালি জায়গা আছে, কয়েক হাজার ইট কিনিয়া শ্যামা সেখানে জমা করিয়া রাখিয়াছে, রান্নাঘরের পাশে সিঁড়ির নীচে চুন আর সুরকি রাখিয়াছে,— আর বছর শ্যামা যে টাকা জমাইয়াছিল এ সব কিনিতেই তা খরচ হইয়া গিয়াছিল, এ বছর কিছু টাকা জমিয়াছে, ভগবানের ইচ্ছা থাকিলে আগামী মাঘে দোতলায় শ্যামা একখানা ঘর তুলিবে।

এইটুকু বাড়ি, দুখানা মোটে শোবার ঘর, কেউ এলে কোথায় থাকতে দেব ভেবে পাইনে মামা, দোতলায় ঘরটা তুলতে পারলে বাঁচি, ও আমার অনেকদিনের সাধ। খোকার বিয়ে দিয়ে ছেলে-বউকে ও ঘরে শুতে দেব। পাশ দিতে খোকার আর চার বছর বাকি, পোষ মাসে কেলাসে উঠলে তিন বছর, নারে খোকা?

মামা গম্ভীর হইয়া বলে, বড়ো বুদ্ধি তোর ছেলের শ্যামা, মস্ত বিদ্বান হবে বড়ো হয়ে। তামাকের ব্যবস্থা বুঝি রাখিস না, অ্যাঁ? খায় না, শীতল খায় না তামাক?

আগে খেত, কিন্তু কে অত দেবে মিনিটে মিনিটে তামাক সেজে? যা ঝি আমার, বাসন মাজতেই বেলা কাবার—আর আমার তো দেখছই মামা, নিশ্বাস ফেলবার সময় পাইনে সারাদিন—খেটে খেটে হাড় কালি হয়ে গেল। এদিকে বাবু তো কম নন, নিজে তামাক সেজে খাবার মুরোদ নেই, এখন বিড়িটিড়ি খায়। মরেও তেমনি খুকুরখুকুর কেশে।

দে তবে আমাকে দুটো বিড়িটিড়িই আনিয়ে দে বাবু।

শ্যামা উৎসাহিতা হইয়া বলে, দেব মামা, হুঁকো তামাক-টামাক সব আনিয়ে দেব? এই তো কাছে বাজার, যাবে আর নিয়ে আসবে। বাণী, একবার শোন দিকি মা।

শ্যামার ঝি সত্যভামা শ্যামার ছোটো ছেলেটার জন্মের কয়েক ঘণ্টা আগে মরিয়া গিয়াছিল, ছেলে যদি শ্যামার না হইত, হইত মেয়ে, কারও তবে আর বুঝিতে বাকি থাকিত না যে বাড়ির ঝি পেটের ঝি হইয়া আসিয়াছে। সত্যভামার মেয়ে বাণী এখন শ্যামার বাড়িতে কাজ করে। বাণীর বিবাহ হইয়াছে, জামাই ভূষণ থাকে শ্বশুরবাড়িতেই, শীতল তাহাকে কমল প্রেসে একটা চাকরি জুটাইয়া দিয়াছে। বাণী বাজার হইতে তামাক খাওয়ার সরঞ্জাম আনিয়া তামাক সাজিয়া হুঁকায় জল ভরিয়া দিল, মামা আরামের সঙ্গে তামাক টানিতে টানিতে বলিল, তোর ঝিটা তো বড়ো ছেলেমানুষ শ্যামা, কাজকর্ম পারে?

ছাই পারে, আলসের একশেষ, আবার বাবুয়ানির সীমে নেই, ছুঁড়ির চলন দেখছ না মামা? ওর মা আমার কাছে অনেকদিন কাজ করেছিল তাই রাখা, নইলে মাইনে দিয়ে অমন ঝি কে রাখে?

খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে দুটা বাজিল। শ্যামা সবে পান সাজিয়া মুখে দিয়াছে, শীতল ফিরিয়া আসিল। শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এত শিগগির ফিরলে যে?

মামার সঙ্গে একটু কথাবার্তা বলব, প্রেসে কাজকর্মও নেই—

বেশ করেছ। যেমন করে আপিসে চলে গেলে মামা না জানি কী ভেবেছিল!

শীতল ইতস্তত করে, কী যেন সে বলিবে মনে করিয়াছে। সে একটা পান খায়। শ্যামার মুখের দিকে চাহিয়া মনে মনে কী সব হিসাব করে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, মামা কদিন থাকবেন এখন, না?

শ্যামা বলিল, কদিন কেন? বরাবর থাকবেন,—আমরা থাকতে বুড়ো বয়সে হোটেলের ভাত খেয়ে মরবেন কী জন্যে?

আমিও তাই বলছিলাম।—পয়সাকড়ি কিছু করেছেন মনে হয়, অ্যাঁ?

মনে তো হয়, এখন আমাদের অদেষ্ট!

মামা একটা ঘুম দিয়া উঠিলে বিকালে তাহারা চারিদিকে ঘেরিয়া বসিয়া গল্প শুনিতে লাগিল, শহর-গ্রাম-অরণ্য-পর্বতের গল্প, রাজামহারাজা সাধুসন্ন্যাসী চোরডাকাতের গল্প, রোমাঞ্চকর বিপদ-আপদের গল্প। মামা কি কম দেশ ঘুরিয়াছে, কম মানুষের সঙ্গে মিশিয়াছে! সুদূর একটা তীর্থের নাম কর, যার নামটি মাত্র শ্যামা ও শীতল শুনিয়াছে, যেমন রামেশ্বর সেতুবন্ধ, নাসিক, বদরিনাথ—মামা সঙ্গে সঙ্গে পথের বর্ণনা দেয়, তীর্থের বর্ণনা দেয়, সব যেন রূপ ধরিয়া চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। সেই বিধবা সঙ্গিনীটি কতকাল মামার সঙ্গে ছিল কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, মামার যাযাবর জীবনের ইতিবৃত্ত শুনিয়া কিন্তু মনে হয় চিরকাল সে দেশে দেশে ঘুরিয়াছে একা, সাথি যদি কখনও পাওয়া গিয়া থাকে সে পথের সাথি, পুরুষ। শ্যামা একবার সুকৌশলে জিজ্ঞাসা করে গ্রাম হইতে বাহির হইয়া প্রথমে মামা কোথায় গিয়াছিল, মামা সোজাসুজি জবাব দেয়, কাশী,—কাশীতে ছিলাম পাঁচ-ছটা মাস, ভুলেটুলে গিয়েছি সে সব বাপু, সে কী আজকের কথা!

শ্যামা বলে, একা একা ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগত মামা?

মামা বলে, একা ঘুরেই তো সুখ রে, ভাবনা নেই চিন্তা নেই যখন যেখানে খুশি পড়ে থাক, যেখানে খুশি চলে যাও, কারও তোয়াক্কা নেই, জুটল খেলে, না জুটল উপোস করলে—চিরকাল ঘরের কোণে কাটালি, সে আনন্দ তোরা কী বুঝবি? একবার কী হল,—নীলগিরি পাহাড়ের গোড়ায় একটা গ্রামে গিয়েছি এক সাধুর সঙ্গে, গ্রামটার নাম বুঝি তুড়িগোড়িয়া, পাহাড়ের সার চলে গিয়েছে গ্রামের ধার দিয়ে। পাহাড়ে উঠে দেখতে ইচ্ছা হল। গাঁ থেকে উড়িয়া মেয়েরা পাহাড়ের বনে কাঠ কাটতে যায়, তাদের সঙ্গে গেলাম। সে কী জঙ্গল রে শ্যামা, এইটুকু সরু পথ দুপাশে এক পা সরবার জো নেই, যেন গাছপালার দেয়াল গাঁথা। ফিরবার সময় পথে হাতির পাল পড়ল, আর নামবার জো নেই। চারদিন হাতির পাল পথ আটকে রইল, চারদিন আমরা নামতে পারলাম না। কী সাহস সেই মেয়েগুলোর বলিহারি যাই, চারদিন টুঁ শব্দটি করলে না, রাত্রে আমাকে বলত ঘুমোতে আর নিজেরা কাঠকাটা দা বাগিয়ে ধরে পাহারা দিয়ে জেগে থাকত। আর একদিন—

সেদিন আর মামার জিনিসপত্র আনা হইল না, পরদিন গিয়া লইয়া আসিল।

শ্যামা ভাবিয়াছিল মামা কত জিনিস না জানি আনিবে, হয়তো আঁটিবেই না ঘরে! মামা কিন্তু আনিল ক্যাম্বিসের একটা ব্যাগ আর কম্বলে জড়ানো একটা বিছানা,—লেপতোশক নয়, দুটো র‍্যাগ, খান তিনেক সুতির চাদর আর এই এতটুকু একটা বালিশ।

শ্যামা অবাক হইয়া বলিল, এই নাকি তোমার সব জিনিস মামা?

মামা একগাল হাসিল, ভবঘুরের কী আর রাশ রাশ জিনিস থাকে মা? ব্যাগটা হাতে করি, বিছানা বগলে নিই, চলো এবার কোথায় যাবে দিল্লি না বোম্বাই।—ব্যাগটা হাতে তুলিয়া বিছানা বগলে করিয়া মামা যাওয়ার অভিনয় করিয়া দেখাইল।

তাই হইবে বোধ হয়। আজ এখানে কাল সেখানে করিয়া যে বেড়ায় বাক্সো-প্যাঁটরার হাঙ্গামা থাকিলে তাহার চলিবে কেন? কিন্তু এমন ভবঘুরেই যদি মামা হইয়া থাকে তবে তো টাকাকড়ি কিছুই সে করিতে পারে নাই? শ্যামা ভাবিতে ভাবিতে কাজ করে। প্রথমে সে যে ভাবিয়াছিল বিদেশে মামা অর্থোপার্জন করিয়াছে, বেড়াইয়া বেড়াইয়াছে শুধু ছুটিছাটা সুযোগসুবিধা মতো, হয়তো তা সত্য নয়। মামার হয়তো কিছুই নাই। দেশেদেশে সম্পদ কুড়াইয়া বেড়ানোর বদলে হয়তো শুধু বাউল সন্ন্যাসীর

মতো উদ্দেশ্যহীন ভাবেই সে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু এমন সে দুঃসাহসী, কত রাজা রাজ-রাজড়ার সঙ্গে যে খাতির জমাইয়াছে, পার্থিব সম্পদলাভের সুযোগ কি সে কখনও পায় নাই? পথেঘাটে লোকে তো হিরাও কুড়াইয়া পায়! বিষ্ণুপ্রিয়ার বাবা পশ্চিমে গিয়াছিলেন কপর্দকহীন অবস্থায়, কোথাকার রাজার সুনজরে পড়িয়া বিশ বছর দেওয়ানি করিলেন, দেশে ফিরিয়া দশ বছর ধরিয়া পেনশন পাইলেন বছরে দশ হাজার টাকার। মামার জীবনে ও রকম কিছুই কি ঘটে নাই? কোনো দেশের রাজার ছেলের প্রাণ-টান বাঁচাইয়া লাখ টাকা দামের পান্না-মরকত একটা-কিছু উপহার?

মামা নিঃস্ব অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়াছে শ্যামার ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। একবার তাহাদের গ্রামে এক সন্ন্যাসী গাছতলায় মরিয়া পড়িয়া ছিল, সন্ন্যাসীর সঙ্গে ছিল পুরু কাঠের ছোট্ট একটি জলচৌকি; তার ভিতরটা ছিল ফাঁপা, পুলিশ নাকি স্ক্রুর মতো ঘুরাইয়া ছোটোছোটো পায়া চারটি খুলিয়া তক্তার ভিতরে একগাদা নোট পাইয়াছিল। মামার ব্যাগের মধ্যে, কোমরের থলিতে হয়তো তেমনি কিছু আছে? নোট না হোক, দামি কোনো পাথর-টাথর?

মামা স্থায়ীভাবে রহিয়া গেল। ভারী আমুদে মিশুক লোক, কদিনের মধ্যে পাড়ার ছেলেবুড়োর সঙ্গে পর্যন্ত তাহার খাতির জমিয়া গেল, এ বাড়িতে দাবার আড্ডায় ও বাড়িতে তাসের আড্ডায় মামার পশারের অন্ত রহিল না। মামার প্রতি এখন শীতলের ভক্তি অসীম, মামার মুখে দেশবিদেশের কথা শুনিতে তাহার আগ্রহ যেন দিনদিন বাড়িয়া চলে, মামাকে সে চুপ করিতে দেয় না। মামা আসিবার পর হইতে সে কেমন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে, চোখে কেমন উদাস উদাস চাউনি। শ্যামা একটু ভয় পায়। ভাবে, এবার আবার মাথায় কী গোলমাল হয় দ্যাখো!

ঠিক শীতলের জন্য যে শ্যামার ভাবনা হয় তা নয়, শীতলের সম্বন্ধে ভাবিবার তাহার সময় নাই। তার গুছানো সংসারে শীতল কবে কী বিপর্যয় আনে এই তার আশঙ্কা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একটা অদ্ভুত সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে তাহাদের। সংসার শ্যামার, ছেলেমেয়ে শ্যামার—ওর মধ্যে শীতলের স্থান নাই,—নিজের গৃহে নিজের সংসারের সঙ্গে শীতলের সম্পর্ক শ্যামার মধ্যস্থতায়, গৃহে শীতল শ্যামার আড়ালে পড়িয়া থাকে, স্বাধীনতাবিহীন স্বাতন্ত্র্যবিহীন জড় পদার্থের মতো। এতদিন শীতল মদ খাইত, শ্যামাকে মারিত, কিন্তু শীতল ছাড়া শ্যামার তখন কেহ ছিল না। আজ শীতলের মদ খাইতে ভালো লাগে না, শ্যামাকে মারা দূরে থাক ধমক দিতেও তাহার ভয় করে। শ্যামা আজ কত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে। কোনোদিকে কোনো বিষয়ে খুঁত নাই শ্যামার, সেবায়-যত্নে, বিধি-ব্যবস্থায়, বুদ্ধি-বিবেচনায়, ত্যাগে, কর্তব্য-পালনে সে কলের মতো নিখুঁত—শ্যামার সঙ্গে তুলনা করিয়া সবসময় শীতলের যেন নিজেকে ছোটোলোক বলিয়া মনে হয়, এবং সে যে অপদার্থ ছিটগ্রস্ত মানুষ এ তো জানে সকলেই, অন্তত শ্যামা যে জানে শীতলের তাহাতে সন্দেহ নাই। সবসময় শীতলের মনে হয় শ্যামা মনে মনে তাহার সমালোচনা করিতেছে, তাহাকে ছোটো ভাবিতেছে, ঘৃণা করিতেছে—কেবল মাস গেলে সে টাকা আনিয়া দেয় বলিয়া মনের ভাব রাখিয়াছে চাপিয়া, বাহিরে প্রকাশ করিতেছে না। বাহিরের জীবনে বিতৃষ্ণা আসিলে শীতলের মন নীড়ের দিকে ফিরিয়াছিল, চাহিয়াছিল শ্যামাকে—কিন্তু সাত বৎসরের বন্ধ্যাজীবন-যাপিনী লাঞ্ছিতা পত্নী যখন জননী হয় তখন কে কবে তাহাকে ফিরিয়া পাইয়াছে? বউয়ের বয়স যখন কাঁচা থাকে তখন তাহার সহিত না মিলিলে আর তো মিলন হয় না। মন পাকিবার পর কোনো নারীর হয় না নূতন বন্ধু, নূতন প্রেমিক। দুঃখ মুছিয়া লইবার, আনন্দ দিবার, শান্তি আনিবার ভার শ্যামাকে শীতল কোনোদিন দেয় নাই, শীতলের মনে দুঃখ নিরানন্দ ও অশান্তি আছে কিনা শ্যামা তাহা বুঝিতেও জানে না। শীতল ছিল রুক্ষ উদ্ধত কঠোর, শ্যামাকে সে কবে জানিতে দিয়াছিল যে তার মধ্যেও এমন কোমল একটা অংশ আছে যেখানে প্রত্যহ প্রেম ও সহানুভূতির প্রলেপ না পড়িলে যন্ত্রণা হয়? শ্যামা জানে, ও সব প্রয়োজন শীতলের নাই, ও সব শীতল বোঝেও না। তাই ছেলেমেয়েদের

লইয়া নিজের জন্য যে জীবন শ্যামা রচনা করিয়াছে, তার মধ্যে শীতল আশ্রয়ের মতো, জীবিকার উপায়ের মতো তুচ্ছ একটা পার্থিব প্রয়োজন মাত্র। আপনার প্রতিভায় সৃজিত সংসারে শ্যামা ডুবিয়া গিয়াছে। শীতল সেখানে ঢুকিবার রাস্তা না খুঁজিলেই সে বাঁচে।

মামা বলে, শীতলের ভাব যেন কেমন-কেমন দেখি শ্যামা?

শ্যামা বলে, ওমনি মানুষ মামা—ওমনি গা-ছাড়া গা-ছাড়া ভাব। কী এল কী গেল, কোথায় কী হচ্ছে কিচ্ছু তাকিয়ে দ্যাখে না,—খেয়াল নিয়েই আছে নিজের। ভগ্নীপতি চাইলে, দিয়ে দিলে তাকে হাজারখানেক টাকা ধার করে—না একবার জিজ্ঞেস করা, না একটা পরামর্শ চাওযা! তাও মেনে নিলাম মামা, ভাবলাম দিয়ে যখন ফেলেছে আর তো উপায় নেই—যে মানুষ ওব ভগ্নীপতি ও টাকা ফিবে পাওয়ার আশা নাই!—কী আর হবে? এই সব ভেবে জমানো যে কটা টাকা ছিল,—কী কষ্টে যে টাকা কটা জমিয়েছিলাম মামা ভাবলে গা এলিয়ে আসে—দিলাম একদিন সবগুলি টাকা হাতে তুলে, বললাম, যাও ধার শুধে এসো, ঋণী হয়ে থেকে কেন ভেবে ভেবে গায়ের রক্ত জল করা? টাকা নিয়ে সেই যে গেল, ফিরে এল সাদ্দিন পবে। ধারের মতো ধার রইল, টাকাগুলো দিয়ে বাবু সাদ্দিন ফূর্তি করে এলেন। সেই থেকে কেমন যেন দমে গেছি মামা, কোনোদিকে উৎসাহ পাইনে। ভাবি, এই মানুষকে নিয়ে তো সংসার, এত যে কবি আমি কী দাম তার, কেন মিথ্যে মরছি খেটে খেটে,—সুখ কোথা অদেষ্টে?

মামা সান্ত্বনা দিযা বলে, পুরুষমানুষ অমন একটু আধটু করে শ্যামা—নিজেই আবাব সব ঠিক কবে আনে। আনছে তো বাবু রোজগার করে, বসে তো নেই।

শ্যামা বলে, আমি আছি বলে, আব কেউ হলে এ সংসাব কবে ভেসে যেত মামা।

মামা একদিন কোথা হইতে শ্যামাকে কুড়িটা টাকা আনিযা দেয়। শ্যামা বলে, এ কী মামা?

মামা বলে, বাখ না, রাখ—খরচ করিস। টাকাটা পেলাম, আমি আব কী করব ও দিয়ে?

সত্যই তো, টাকা দিয়া মামা কী কবিবে? শ্যামা সুখী হইল। মামা যদি মাঝে মাঝে এ রকম দশবিশটা টাকা আনিয়া দেয় তবে মন্দ হয় না। মামাকে শ্যামা ভক্তি কবে, কাছে বাখিয়া শেষ বয়সে তাহার সেবাযত্ন কবার ইচ্ছাটাও শ্যামার আন্তরিক। তবে, তাহাব কিনা, টানাটানির সংসাব, ইটসুরকি কিনিয়া রাখিয়া টাকার অভাবে সে কিনা দোতলায় ঘর তোলা আরম্ভ করিতে পারে নাই, মেয়ে কি না তাহার বড়ো হইতেছে, টাকার কথাটা সে তাই আগে ভাবে। কী করিবে সে? তাব তো জমিদাবি নাই। মামা থাক, হাজাব দশহাজাব যদি নাই পাওযা যায়, মামাব জন্য যে বাড়তি খবচ হইবে অন্তত সেটা আসুক, শ্যামা আব কিছু চায় না।

দিন পনেরো পরে মামা একদিন বর্ধমানে গেল, সেখানে তাহার পবিচিত কোনো সাধুব আশ্রম আছে, তার সঙ্গে দেখা কবিবে। বলিয়া গেল দিন তিনেক পরে ফিবিযা আসিবে। শ্যামা ভাবিল, মামা বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিবে না, এমনিভাবে ফাঁকি দিয়া বিদায় লইয়াছে। শীতল ক্ষুণ্ণ হইল সবচেয়ে বেশি। বন্ধনহীন নির্বান্ধব ভ্রাম্যমাণ লোকটির প্রতি সে প্রবল একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছিল। মামা যখন যায়, শীতল বাড়ি ছিল না। মামা চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সে বাববার বলিতে লাগিল, কেন যেতে দিলে? তোমার ঘটে একফোঁটা বুদ্ধি নেই, মামার স্বভাব জানো ভালো করে, আটকাতে পারলে না? বোকা হাঁদাবাম তুমি—মুখ্যুর একশেষ।

কচি খোকা নাকি ধরে বাখব?

ধরে আবার রাখতে হয় নাকি মানুষকে? কী বলেছ কী করেছ তুমিই জান, যা ছোটো মন তোমার, আত্মীয়স্বজন দুদিন এসে থাকলে খরচের ভয়ে মাথার তোমার টনক নড়ে যায়,—ছেলেমেয়ে ছাড়া জগতে যেন পোষ্য থাকে না মানুষের। —ছেলে তোমার কী করে দেখো, তোমার কাছেই তো সব শিখছে, তোমার কপালে ঢের দুঃখ আছে।

পাগল হলে নাকি তুমি? কী বকছ?

শীতল যেন কেমন করিয়া শ্যামার দিকে তাকায়। খুব রাগিলে আগে যেমন করিয়া তাকাইত সে রকম নয়। —পাগল আমি হইনি শ্যামা, হয়েছ তুমি। ছেলে-ছেলে করে তুমি এমন হয়ে গেছ, তোমার সঙ্গে মানুষে বাস করতে পারে না,—ছেলে না কচু, সব তোমার টাকার খাঁকতি, কী করে বড়োলোক হবে দিনরাত শুধু তাই ভাবছ, কারও দিকে তাকাবার তোমার সময় নেই। জন্তুর মতো হয়েছ তুমি, তোমার সঙ্গে একদণ্ড কথা কইলে মানুষের ঘেন্না জন্মে যায় এমনি বিশ্রী স্বভাব হয়েছে তোমার, লোকে মরুক বাঁচুক তোমার কী? সময়ে মানুষ টাকাপয়সার কথা ভাবে আবার সময়ে দশজনের দিকে তাকায়, তোমার তা নেই,—আমি বুঝিনে কিছু! টাকার কথা ছাড়া এক মিনিট আমার সঙ্গে অন্য কথা কইতে তোমার গায়ে জ্বর আসে, মন খুলে স্বামীর সঙ্গে মেশার স্বভাব পর্যন্ত তোমার ঘুচে গেছে, বসে বসে খালি মতলব আঁটছ কী করে টাকা জমাবে, বাড়ি তুলবে, ঘর তুলবে, টাকার গদিতে শুয়ে থাকবে; বাজারের বেশ্যা মাগিগুলো তোমার চেয়ে ভালো, তারা হাসিখুশি জানে, ফুর্তি করতে জানে। রক্তমাংসের মানুষ তুমি নও, লোভ করার যন্তর!

বাস রে! —শীতল এমন করিয়া বলিতে পারে? সমালোচনা করার পাগলামি এবার তাহার আসিয়াছে নাকি? এ সব সে বলিতেছে কী? শ্যামার সঙ্গে মানুষ বাস করিতে পারে না? মানুষের সঙ্গে অনুভূতির আদানপ্রদান সে ভুলিয়া গিয়াছে—একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে?

সে জন্তু, যন্ত্র, বেশ্যার চেয়ে অধম? কেন, টাকাপয়সা বাড়িঘর সে নিজের জন্য চায় নাকি! শীতল দেখিতে পায় না নিজে কত কষ্ট করিয়া থাকে, ভালো কাপড়টি পরে না, ভালো জিনিসটি খায় না? শ্যামা শীতলকে এই সব বলে, বুঝাইয়া বলে।

শীতল বলে, ভালো খাবে পরবে কী, মানুষ ভালো খায় ভালো পরে—ভালো মানুষ। তুমি তো টাকা-জমানো যন্তর!

ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হয়। —শ্যামা বলে।

শীতল বলে, তাই তো বলছি, টাকা আর ভবিষ্যৎ হয়েছে তোমার সব, ভবিষ্যৎ করে করে জন্ম কেটে গেল, —অত ভবিষ্যৎ কারও সয় না। ভবিষ্যতের ভাবনা মানুষের থাকে, অল্প-বিস্তর থাকে, তোমার ও ছাড়া কিছু নেই, ওই তোমার সর্বস্ব—বড়ো বেখাপ্পা মানুষ তুমি, মহাপাপী!

শোনো একবার শীতলের কথা! কীসে মহাপাপী শ্যামা? কোনোদিন চোখ তুলিয়া পরপুরুষের দিকে চাহিয়াছে? অসৎ চিন্তা করিয়াছে? দেবদ্বিজে ভক্তি রাখে নাই? শ্যামা আহত, উত্তেজিত ও বিস্মিত হইয়া থাকে। শীতল তাহাকে বকে? যার সংসার সে মাথায় করিয়া রাখিয়াছে? যার ছেলেমেয়ের সেবা করিয়া তাহার হাতে কড়া পড়িয়া গেল, মেরুদণ্ড বাঁকিয়া গেল ভারবহা বাঁকের মতো? ধন্য সংসার! ধন্য মানুষের কৃতজ্ঞতা।

মামা কিন্তু ফিরিয়া আসিল,—সাতদিন পরে।

সাতদিন পরে মামা ফিরিয়া আসিল, আরও দিন দশেক পরে শ্যামা দোতলায় ঘর-তোলা আরম্ভ করিল, বলিল, জানো মামা উনি বলেন আমি নাকি কেপ্পনের একশেষ, নিজে তো ডাইনে-বাঁয়ে টাকা ছড়ান,—আমি মরে-বেঁচে কটা টাকা রেখেছি বলে না ঘরখানা উঠছে? সংসারে ওনার মন নেই, উড়ু উড়ু কচ্ছেন। আমিও যদি তেমনি হই সব ভেসে যাবে না, ছারখার হয়ে যাবে না সব? টাকা রাখব আমি, ইটসুরকি কিনব আমি, মিস্ত্রি ডাকব আমি,—তারপর ঘর হলে শোবেন কে? উনি তো? আমি তাই জন্তুজানোয়ার,—যন্তর! কথা কইনে সাধে? কইতে ঘেন্না হয়!

মামা বলিল, সে কী মা, কথা বলিসনে কী?

শ্যামা বলিল, বলি, দরকার মতো বলি।—পঁয়ত্রিশ বচ্ছর বয়স হল আজেবাজে কথা আর মুখে আসে না,—দোষ বল দোষ, গুণ বল গুণ, যা পারিনে তা পারিই নে।

ঘর তুলিবার হিড়িকে শ্যামা, আমাদের ছেলে-পাগলা শ্যামা, ছেলেমেয়েদের যেন ভুলিয়া গিয়াছে। কত আর পারে মানুষ? সংসারে উদয়াস্ত খাটিয়া আগেই তাহার অবসর থাকিত না, এখন মিস্ত্রির কাজ দেখিতে হয়, এটা-ওটা আনাইয়া দিতে হয়, ঘর তোলার হাঙ্গামা কি কম! শ্যামা পারেও বটে! একহাতে ছোটো ছেলেটাকে বুকেব কাছে ধরিয়া রাখে, সে ঝুলিতে ঝুলিতে প্রাণপণে স্তন চোষে, শ্যামা সেই অবস্থাতে চরকির মতো ঘুরিয়া বেড়ায়, ভাতেব হাঁড়ি নামায়, তরকারি চড়ায়, ছাদে গিয়া মিস্ত্রির দেয়াল গাঁথা দেখিয়া আসে, ভাঙা কড়াইয়ে করিয়া চুন নেওয়ার সময় উঠানে এক খাবলা ফেলিয়া দেওয়ার জন্য কুলিকে বকে, শীতলকে আপিসের ও বিধানকে স্কুলের ভাত দেয়, মাসকাবারি কয়লা আসিলে আড়তদারের বিলে নাম সই করে, খরচের হিসাব লেখে, ছোটো খোকার কাঁথা কাচে (রাণী এ কাজটা করে না, তাব বয়স অল্প এবং সে একটু শৌখিন) আবার মামার সঙ্গে, প্রতিবেশী নকুড়বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে গল্পও করে। চোখের দিকে তাকাও, বাৎসল্য নাই, স্নেহমমতা নাই, শ্রান্তি নাই—কিছুই নাই! শ্যামা সত্যই যন্ত্র নাকি?

মামা বলে, খেটে খেটে মরবি নাকি শ্যামা? যা যা তুই যা, মিস্ত্রির কাজ আমি দেখবখন।

শ্যামা বলে, না মামা, তুমি বুড়ো মানুষ, তোমার কেন এ সব ঝঞ্ঝাট পোয়াবে? যা সব বজ্জাত মিস্ত্রি, বজ্জাতি করে মালমশলা নষ্ট করবে, তুমি ওদের সঙ্গে পারবে কেন? তাছাড়া, নিজের চোখে না দেখে আমাব স্বস্তি নেই কাজ কতদূর এগুল,—ঘর তোলার সাধ কী আমার আজকের! তুমি ঘরে গিয়ে বোসো মামা—পিঠে কোথায় ব্যথা বলছিলে না? রাণী বরং একটু তেল মালিশ করে দিক।

শীতল কোনোদিকে নজর দেয় না, কেবল সে যে পুরুষ মানুষ এবং বাড়ির কর্তা এটুকু দেখাইবার জন্য বলা নাই কওয়া নাই মাঝে মাঝে কর্তৃত্ব ফলাইতে যায়। গম্ভীর মুখে বলে, এখানে জানালা হবে বুঝি, দেয়ালের যেখানে ফাঁক রাখছ?

মিস্ত্রিরা মুখ টিপিয়া হাসে। শ্যামা বলে, জানালা হবে না তো কি দেয়ালে ফাঁক থাকবে?

তাই বলছি—শীতল বলে,—জানালা হবে কটা? তিনটে মোটে? না না, তিনটে জানালায় আলো বাতাস খেলবে না ভালো,—ওহে মিস্ত্রি এইখানে আরেকটা জানালা ফুটিয়ে দাও,—এদিকে একটাও জানালা কবনি দেখছি।

শ্যামা বলে, ওদিকে জানালা হবে না, ওদিকে নকুড়বাবুর বাড়ি দেখছ না? আর বছর ওরাও দোতলায় ঘর তুলবে, আমাদেব ঘেঁষে ওদের দেয়াল উঠবে,—জানালা দিয়ে তখন করবে কী? জান না বোঝ না ফোঁপবদালালি কোরো না বাবু তুমি।

শীতল অপমান বোধ করে কিন্তু যেন অপমান বোধ করে নাই এমনিভাবে বলে, তা কে জানে ওরা আবার ঘর তুলবে!—হাঁ হাঁ, ওখানে আস্ত ইট দিও না মিস্ত্রি, দেখছ না বসছে না কতখানি ফাঁক রয়ে গেল ভেতরে? দুখানা আদ্ধেক ইট দাও, দিয়ে মাঝখানে একটা সিকি ইট দাও।

মিস্ত্রিরা কথা বলে না, মাঝখানেব ফাঁকটাতে কয়েকটা ইটের কুঁচি দিয়া মশলা ঢালিয়া দেয়, শীতল আড়চোখে চাহিয়া দ্যাখে শ্যামা ক্রুর চোখে চাহিয়া আছে। শীতল এদিকে ওদিকে তাকায়, হঠাৎ শ্যামার দিকে চাহিয়া একটু হাসে, পরক্ষণে গম্ভীর হইয়া নীচে নামিয়া আসে। দাঁড়াইয়া বিধানের একটু পড়া দ্যাখে,—পড়িবার জন্য ছেলেকে শ্যামা গত বৈশাখ মাসে নূতন টেবিল-চেয়ার কিনিয়া দিয়াছে,—পড়া দেখিতে দেখিতে শীতল টের পায় শ্যামা ঘরে আসিয়াছে। তখন সে বিধানের বই-

এর পাতায় একস্থানে আঙুল দিয়া বলে, এখানটা ভালো করে বুঝে পড়িস খোকা, পরীক্ষায় মাঝে মাঝে দেয়। তারপব বিধান জিজ্ঞাসা করে, circumlocutory মানে কি বাবা? শীতল বলে, দ্যাখ না, দ্যাখ, মানের বই দ্যাখ। বিধান তখন খিলখিল করিয়া হাসে। শ্যামা বলে, পড়ার সময় কেন ওকে বিরক্ত করছ বলো তো?

শীতল বলে, হাসলি যে খোকা?—শীতলের মুখ মেঘের মতো অন্ধকার হইয়া আসে, বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে? হারামজাদা ছেলে কোথাকার! বলিয়া ছেলেকে সে আথালিপাথালি মারিতে আরম্ভ করে। বিধান চেঁচায়, বুকু চেঁচায়, শ্যামা চেঁচায়, বাড়িতে একেবারে হইচই বাঁধিয়া যায়। শ্যামা দুই হাতে বিধানকে বুকেব মধ্যে আড়াল কবে, শীতল গায়ের ঝাল ঝাড়িতেই শ্যামার গায়ে দু-চারটা মার বসাইয়া দেয় অথবা সেগুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া শ্যামার গায়ে লাগে বুঝিবার উপায় থাকে না। শ্যামা তো আজ গৃহিণী, মোটাসোটা বাজরানির মতো তাহার চেহাবা, শীতল কি এখন তাহাকে ইচ্ছা কবিয়া মারিবে?

এমনিভাবে দিন যায়, ঠান্ডায় শীতের দিনগুলো হ্রস্ব হইয়া আসে। মামা সেই যে একবার শ্যামাকে কুড়িটা টাকা দিয়াছিল আজ পর্যন্ত সে আর একটি পয়সাও আনিয়া দেয় নাই, শ্যামা তবু শীতলের চেয়ে মামাকেই খাতিব করে বেশি। মামার সঙ্গে শ্যামার বনে, শ্যামার ছেলেদের মামা বড়ো ভালোবাসে, শীতলেব চেয়েও বুঝি বেশি, নিজের বাড়িতে শীতল কেমন পরের মতো থাকে, যে সব খাপছাড়া তাহাব কাণ্ড, কে তাহার সঙ্গে আত্মীয়তা করিবে? শীতলকে ভালোবাসে শুধু বকুল। মেয়েটার মন বড়ো বিচিত্র, যা কিছু খাপছাড়া যা কিছু অসাধারণ তাই সে ভালোবাসে। শীতলও বোধ হয় খোঁড়া কুকুব, লোম-ওঠা ঘা-ওলা বিড়াল, ভাঙা পুতুল এই সবের পর্যায়ে পড়ে, বকুল তাই শ্যামার ভাষায় বাবা বলিতে অজ্ঞান। ছেলেবেলা হইতে বকুলের স্বাস্থ্যটি বড়ো ভালো, চলাফেবা হাসি খেলা স্বাভাবিক নিয়মে সবই তার সুন্দব, কত প্রাণ, কত ভঙ্গি। সকলে তাহাকে ভালোবাসে, তার সঙ্গে কথা বলিতে সকলেই উৎসুক, সে কিন্তু যাকে তাকে ধরা দেয না, নির্মমভাবে উপেক্ষা করিয়া চলে। খেলনা ও খাবাব দিয়া, তোষামোদের কথা বলিয়া তাহাকে জয় করা যায় না। মামা কত চেষ্টা করিয়াছে, পারে নাই। শ্যামাব তিন ছেলেই মামার ভক্ত, বকুল কিন্তু তাহার ধারে-কাছেও ঘেঁষে না। শ্যামার সঙ্গেও বকুলেব তেমন ভাব নাই, শ্যামাকে সে স্পষ্টই অবহেলা করে। বাড়িতে সে ভালোবাসে শুধু বাবাকে, শীতল যতক্ষণ বাড়ি থাকে পায়ে পায়ে ঘুরিয়া বেড়ায়, শীতলের চুল তোলে, ঘামাচি মাবে, মুখে বিড়ি দিয়া দেশলাই ধরাইয়া দেয়, আর অনর্গল কথা বলে। শীতল বাড়ি না থাকিলে ছাদে গিয়া তাহার গোসাঘরে পুতুল খেলে, মিস্ত্রিদের কাজ দ্যাখে। আর শ্যামাব ফবমাশ খাটে। শীতল না থাকিলে মেয়েটাব মুখের কথা যেন ফুরাইয়া যায়।

একদিন শ্যামা নতুন গুড়ের পায়েস করিয়াছে, সকলে পবিতোষ করিয়া খাইল, বকুল কিছুতে খাইবে না, কেবলি বলিতে লাগিল, দাঁড়াও আসুক, বাবাকে দাও।

শ্যামা বলিল, সে তো আসবে বাত্তিরে, ওই দ্যাখ বড়ো জামবাটিতে তাব জন্যে তুলে বেখেছি, এসে খাবে। তোরটা তুই খা।

বকুল বলিল, বাবা পায়েস খেতে আসবে দুটোর সময।

শ্যামা বলিল, কী করে জানলি তুই আসবে?

বকুল বলিল, আমি বললাম যে আসতে? বাবা বললে দুটোর সময় ঠিক আসবে,—আমি বাবার সঙ্গে খাব।

শ্যামা বলিল, দেখলে মামা মেয়ের আবদার? বুড়ো ঢেঁকি মেয়ে বাবাকে পায়েস খাবার নেমন্তন্ন করেছেন, আপিস থেকে তিনি পায়েস খেতে বাড়ি আসবেন। ...খা খুকু, খেয়ে বাটি খালি করে দে।

তিনি যখন আসবেন খাবেন এখন, তুই বরং আদর করে খাইয়ে দিস, এখন নিজে খেয়ে আমায় রেহাই দে তো।

বকুল কিছুতে খাইবে না, শ্যামারও জিদ চাপিয়া গেল সেও খাওয়াবেই। পিঠে জোরে দুটা চড় মারিয়া কোনো ফল হইল না, বকুল একটু কাঁদিল না পর্যন্ত। আরও জোরে মারিলে কী হইত বলা যায় না, কিন্তু যতই হোক শ্যামার তো মায়ের মন, কতবার কত জোরে আর মায়ের মন লইয়া মেয়েকে মারা যায়? এক খাবলা পায়েস তুলিয়া শ্যামা মেয়ের মুখে গুঁজিয়া দিতে গেল, বকুল দাঁত কামড়াইয়া রহিল, তার মুখ শুধু মাখা হইয়া গেল পায়েসে।

হার মানিয়া শ্যামা অভিমানাহত কণ্ঠে বলিল, উঃ কী জিদ মেয়ের! কিছুতে পারলাম না খাওয়াতে?

দুটোর আগে শীতল সত্যসত্যই ফিরিয়া আসিল। শ্যামা আসন পাতিয়া গেলাসে জল ভরিয়া দিল। ভাবিল শীতল খাইতে বসিলে সবিস্তারে বকুলের জিদের গল্প করিবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাপ-বেটিতে কী পরামর্শই যে দুজনে তাহারা করিল, খানিক পরে মেয়ের হাত ধরিয়া শীতল বাড়ির বাহির হইয়া গেল। যাওযার আগে শ্যামার সঙ্গে তাহাদের যে কথা হইল তাহা এই

শ্যামা বলিল, কোথায় যাচ্ছ শুনি?

শীতল বলিল, চুলোয়।

শ্যামা বলিল, পায়েস খেয়ে যাও।

বকুল বলিল, তোমার পায়েস আমরা খাইনে।

শ্যামা বলিল, দ্যাখো, ভালো করছ না কিন্তু তুমি। আদর দিয়ে দিয়ে মেয়ের তো মাথা খেলে।

এর জবাবে শীতল বা বকুল কেহই কিছু বলিল না। পা দিয়া পায়েসের বাটি উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়া শ্যামা ফেলিল কাঁদিয়া।

রাত প্রায় নটার সময় দুজনে ফিরিয়া আসিল। বকুলের গায়ে নতুন জামা, পরনে নতুন কাপড় দু হাত বোঝাই খেলনা, আনন্দে বকুল প্রায় পাগল। আজ কিছুক্ষণের জন্য সকলের সঙ্গেই সে ভাব করিল, শ্যামার অপরাধও মনে রাখিল না, মহোৎসাহে সকলকে সে তাহার সম্পত্তি দেখাইল, বাবার সঙ্গে কোথায় কোথায় গিয়াছিল গলগল করিয়া বলিয়া গেল।

শীতল উৎসাহ দিয়া বলিল, কী খেয়েছিস বললি না বুকু?

পরদিন রাত্রে প্রেস হইতে ফিরিয়া বকুলকে শীতল দেখিতে পাইল না। শ্যামা বলিল, মামার সঙ্গে সে বনগাঁয়ে পিসির কাছে বেড়াইতে গিয়াছে।

আমায় না বলে পাঠালে কেন?

বললে কি আর তুমি যেতে দিতে? যাবার জন্য কাঁদাকাটা করতে লাগল, তাই পাঠিয়ে দিলাম।

হঠাৎ বনগাঁ যাবার জন্য ও কাঁদাকাটা করল কেন?

কাল-পরশু ফিরে আসবে।

ঝোঁকের মাথায় কাজটা করিয়া ফেলিয়া শ্যামার বড়ো ভয় আর অনুতাপ হইতেছিল, সে আবার বলিল, পাঠিয়ে অন্যায় করেছি। আর করব না।

শীতলের কাছে ত্রুটি স্বীকার করিতে আজকাল শ্যামার এমন বাধোবাধো ঠেকে! নিজে চারিদিকে সব ব্যবস্থা করিয়া করিয়া স্বভাবটা কেমন বিগড়াইয়া গিয়াছে, কোনো বিষয়ে কারও কাছে যেন আর নত হওয়া যায় না। আর বকুলকে এমনভাবে হঠাৎ বনগাঁয়ে পাঠাইয়াও দিয়াছে তো এই কারণে, মেয়ের উপর অধিকার জাহির করিতে। কাজটা যে বাড়াবাড়ি হইয়া গিয়াছে ওরা রওনা হইয়া যাওয়ার পরেই শ্যামার তাহা খেয়াল হইয়াছে।

শীতল কিন্তু আজ চেঁচামেচি গালাগালি করিল না, করিলে ভালো হইত, ছড়ি দিয়া শ্যামাকে অমন করিয়া হয়তো সে তাহা হইলে মারিত না। মাথায় ছিটওলা মানুষ, যখন যা করে একেবারে চরম করিয়া ছাড়ে। শ্যামার গায়ে ছড়ির দাগ কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গেল।

মারিয়া শীতল বলিল, বজ্জাত মাগি, তোকে আমি কী শাস্তি দিই দ্যাখ। এই গেল এক নম্বর। দু নম্বর শাস্তি তুই জন্মে ভুলবি না।

শাস্তি? আবার কী শাস্তি শীতল তাহাকে দিবে? তাহার স্বামী?

বিবাহের পরেই শ্যামা টের পাইয়াছিল শীতলের মাথায় ছিট আছে। পাগলের কাণ্ডকারখানা কিছু বুঝিবার উপায় নাই। পরদিন দশটার সময় নিয়মিতভাবে স্নানাহার শেষ করিয়া শীতল আপিসে গেল। বারোটা-একটার সময় ফিরিয়া আসিল। শ্যামাকে আড়ালে ডাকিয়া তাহার হাতে দিল একতাড়া নোট। শ্যামা গুনিয়া দেখিল, এক হাজার টাকা। এ কেমন শাস্তি? শীতল কী করিয়াছে, কী করিতে চায়?

এ কীসের টাকা?—শ্যামা রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল।

শীতল বলিল, বাবু বোনাস দিয়েছেন। পরশু লাভের হিসাব হল কিনা, ঢের টাকা লাভ হয়েছে এ বছর,—আমার জন্যেই তো সব? তাই আমাকে এটা বোনাস দিয়েছেন।

এত টাকা! হাজার! আনন্দে শ্যামার নাচিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে বলিল, বাবু তো লোক বড়ো ভালো! ২,..., কাল বড্ড রেগেছিলে না? বড়ো মেরেছিলে বাবু কাল—পাষাণের মতো। ভাগ্যে কেউ টের পায়নি, নইলে কী ভাবত?—আপিস যাবে নাকি আবার?

যাই, কাজ পড়ে আছে। সাবধানে রেখো টাকা।

এই বলিয়া সেই যে শীতল গেল, আর আসিল না। দুদিন পরে মামা বনগাঁ হইতে একা ফিরিয়া আসিল।

বুকু কই মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

মামা বলিল, কেন, শীতলের সঙ্গে আসেনি? শীতল যে তাকে নিয়ে এল?

তখন সমস্ত বুঝিতে পারিয়া শ্যামা কপাল চাপড়াইয়া বলিল, আমার সর্বনাশ হয়েছে মামা।

কে জানিত পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে চারটি সন্তানের জননী শ্যামার জীবনে এমন নাটকীয় ব্যাপার ঘটিবে?

পাঁচ

বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে।

ফিরিয়া যদি সে না আসে, এ শাস্তি শ্যামা সত্যই জীবনে কখনও ভুলিবে না।

মামা বলিল, অত ভাবছিস কেন বল দিকি শ্যামা, রাগের মাথায় গেছে, রাগ পড়লে ফিরে আসবে। সংসারী মানুষ চাকরি-বাকরি ছেড়ে যাবে কোথা? আর ও-মেয়ে সামলানো কি তার কম্মো? দুদিনে হয়রান হয়ে ফিরতে পথ পাবে না।

শ্যামা বলিল, কী কাণ্ড সে করে গেছে মা, সেই জানে। কাল অসময়ে আপিস থেকে ফিরে আমায় হাজার টাকার নোট দিয়ে গেল। বললে, আপিস থেকে বোনাস দিয়েছে। কাল তো বুঝতে পারিনি মামা, হঠাৎ অত টাকা বোনাস দিতে যাবে কেন,—লাভের যা কমিশন পাবার সে তো ও পায়?

শ্যামার কিছু ভালো লাগে না, বুকের মধ্যে কী রকম করিতে থাকে, কীসে যেন চাপিয়া ধরিয়াছে বুকটা। কাজ করিয়া করিয়া এমন অভ্যাস হইয়া গিয়াছে যে অন্যমনে কলের মতো তাহা করিয়া ফেলা যায় তাই, না হইলে শ্যামা আজ শুইয়া থাকিত, সংসার হইত অচল। নটার সময় মিস্ত্রিরা কাজ করিতে আসিল, ঘর প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর সাত দিনের মধ্যে ঘর ব্যবহার করা চলিবে।

বিধান খাইয়া স্কুলে গেল। মামাও সকাল সকাল খাইয়া, দেখি একটু খোঁজ করে, বলিয়া চলিয়া গেল। বাড়িতে রহিল শুধু শ্যামা আর তাহার দুই শিশুপুত্র, মণি ও ছোটোখোকা,—যার নাম ফণীন্দ্র রাখা ঠিক হইয়াছে।

দুপুরবেলা প্রেসের একজন কর্মচারীর সঙ্গে শীতলের মনিব কমলবাবু আসিলেন। বাণীকে দিয়া পরিচয় পাঠাইয়া শ্যামার সঙ্গে দরকারি কয়েকটা কথা বলার ইচ্ছা জানাইলেন। তারপর নিজেই হাঁকিয়া শ্যামাকে শুনাইয়া বলিলেন তিনি বুড়ো মানুষ, শীতলকে ছেলের মতো মনে করিতেন, তার সঙ্গে কথা কহিতে শ্যামার কোনো লজ্জা নাই। লজ্জা শ্যামা এমনিই করিত না, ঘোমটা টানিয়া সে বাহিরের ঘরে গেল। রাণী সঙ্গে গিয়াছিল, কমলবাবু বলিলেন, তোমার ঝিকে যেতে বলো মা।

রাণী চলিয়া গেলে বলিলেন, শীতল কদিন বাড়ি আসেনি মা?

শ্যামা বলিল, বুধবার আপিসে গেলেন, তারপর আর ফেরেননি।

ওইদিন একটার সময় শীতল যে বাড়ি ফিরিয়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছিল। শ্যামা সে কথা গোপন করিল।

একবারও আসেনি, দু-এক ঘণ্টার জন্য?

না।

তোমায় টাকাকড়ি কিছু দিয়ে যায়নি?

না।

কমলবাবুর গলাটি বড়ো মিষ্টি, ঘোমটার ভিতর হইতে আড়চোখে চাহিয়া শ্যামা দেখিল মুখের ভাবও তাহার শান্ত, নিস্পৃহ। শ্যামা সাহস পাইয়া বলিল, কোনো খবর না পেয়ে আমরা বড়ো ভাবনায় পড়েছি, আপনি যদি কিছু জানেন—

কমলবাবু বলিলেন, না বাছা, আমরা কিছুই জানিনে। জানলে তোমায় শুধোতে আসব কেন?

মনে হয় আর কিছু বুঝি তাহার বলিবার নাই, এইবার বিদায় লইবেন কিন্তু কমলবাবু লোক বড়ো পাকা, কলিকাতায় ব্যাবসা করিয়া খান। কথা না বলিয়া খানিকক্ষণ শ্যামাকে তিনি দ্যাখেন, মনে যাদের পাপ থাকে এমনিভাবে দেখিলে তারা বড়ো অস্বস্তি বোধ করে, কাবু হইয়া আসে। তারপর তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অকস্মাৎ ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, এটি শীতলের ছেলে বুঝি? বেশ ছেলেটি, কী বল বীরেন?—এসো তো বাবা আমার কাছে, এসো।—নাম বলো তো বাবা? বলো ভয় কী?—মণি? সোনামণি তুমি, না?—মণিকে এই সব বলেন আর আড় চোখে চোখে কমলবাবু শ্যামার দিকে তাকান। শ্যামা কাবু হইয়া আসে। ভাবে, হাজার টাকার কথাটা স্বীকার করিয়া কমলবাবুর পা জড়াইয়া ধরিবে নাকি?

কমলবাবু বলেন, বাবা কোথায় গেছে মণি? আপিস গেছে? বাবা খালি আপিস যায়, ভারী দুষ্টু তো তোমার বাবা,—কাল বাড়ি আসেনি বাবা? আসেনি! বড়ো পাজি বাবাটা, এলে মেরে দিয়ো। —বাবা তবে তোমার বাড়ি এসেছিল কবে? আসেনি? একদিনও আসেনি? দিদিকে নিয়ে বাবা পালিয়ে গেছে?

শ্যামা বলে, মেয়েকে নিয়ে বনগাঁয় বোনের বাড়ি যাবেন বলছিলেন, বোধ হয় তাই গেছেন।

কমলবাবু বনগাঁয়ে রাখালের ঠিকানাটা লিখিয়া লইলেন, মণির সম্বন্ধে আর তাহার কোনোরূপ মোহ দেখা গেল না। এবার কড়া সুরেই কথা বলিলেন। বলিলেন, স্বামী তোমার লোক ভালো নয় মা, সব জেনে শুনে তুমি ভান করছ কিনা আমরা জানিনে, তোমার স্বামী চোর,—সংসারে মানুষকে বিশ্বাস করে বরাবর ঠকেছি তবু যে কেন তাকে বিশ্বাস করলাম! আমারই বোকামি, ভাবলাম মাইনেতে কমিশনে মাসে দুশো আড়াইশো টাকা রোজগার করছে, সে কি আর সামান্য ক হাজার টাকার জন্যে

এমন কাজ করবে, মেশিন কেনার টাকাগুলো তাই দিলাম বিশ্বাস করে,—তেমনি শিক্ষা আমায় দিয়েছে, চোরের স্বভাব যাবে কোথা? তোমায় বলে যাই বাছা, এ ইংরেজ রাজত্ব, কদিন লুকিয়ে থাকবে? পুলিশে এখনও খবর দিইনি, বোলো তোমার স্বামীকে, কালকের মধ্যে টাকাটা যদি ফিরিয়ে দেয় এবারের মতো ক্ষমা করব,—লোভে পড়ে কত ভালো লোক হঠাৎ অমন কাজ করে বসে, তাছাড়া এতকাল কাজ করে প্রেসের উন্নতি করেছে, পুলিশে-টুলিশে দেবার আমার ইচ্ছা নেই,—বোলো এই কথা। কালকের দিনটা দেখে পরশু বাধ্য হয়েই পুলিশে খবর দিতে হবে।—কমলবাবু আবার শ্রান্তির একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সহসা ভগবানের নামোচ্চারণ করেন, বলেন, টাকাটা যদি তোমার কাছে দিয়ে গিয়ে থাকে?

শ্যামা নীরবে মাথা নাড়ে।

বিকালে মামা বাড়ি ফিরিলে শ্যামা তাহাকে সব কথা খুলিয়া বলিল, বাইশ বছর আগেকার কথা তুলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, খুঁজে পেতে এক পাগলের হাতে আমায় সঁপে দিয়েছিলে মামা, সারাটা জীবন আমি জ্বলে-পুড়ে মরেছি, কত দুঃখ কষ্ট সয়ে কত চেষ্টায় সুখের সংসার গড়ে তুলেছিলাম, এবার তাও সে ভেঙে খানখান করে দিয়ে গেল, যন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে মেয়েটাকে তো মারছেই, আমাদেরও উপায় নেই, না খেয়ে মরতে হবে এবার, ছেলে নিয়ে কী করব আমি এখন, কী করে ওদের মানুষ করব?

বলিল, পালিয়ে পালিয়ে আর বেড়াবে কদিন, ধরা পড়বেই। মেয়েটার তখন কী উপায় হবে মামা, সঙ্গে থাকার জন্য ওকেও দেবে না তো জেলটেল?

মামা বলিল, পাগল, ওইটুকু মেয়ের কখনও জেল হয়? শীতলকে যদি পুলিশে ধরেই, বকুলকে তারাই বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে যাবে।

সমস্ত বাড়িতে বিপদের ছায়া পড়িয়াছে, বিধান সব বুঝিতে পারে মুখখানা তাহার শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মণি কিছু বোঝে না, সেও অজানা ভয়ে স্তব্ধ হইয়া আছে। মিস্ত্রিরা বিদায় হইয়া যাওয়ার পর সকলের কাছে চারিদিক যেন থমথম করিতে লাগিল। ছেলেদের খাইতে দেওয়া হইল না, উনানে আঁচ পড়িল না, সন্ধ্যার সময় একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া দিয়া বাণী বাড়ি চলিয়া গেল। লণ্ঠনের সামনে বিপন্ন পরিবারটি ম্লানমুখে বসিয়া রহিল নীরবে, ছেলেরা ক্ষুধায় কাতর হইলে শ্যামা বাটিতে করিয়া তাহাদের সামনে কতগুলি মুড়ি দিয়া মুখ ঘুরাইয়া বসিল। তাহার সমস্ত সাধ-আহ্লাদ আশা-আনন্দ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, কত বড়ো ভবিষ্যৎকে সে মনে মনে গড়িয়া রাখিয়াছিল শ্যামা ভিন্ন কে তাহার খবর রাখে? পাগলের মতো উদয়াস্ত সে খাটিয়া গিয়াছে, শীতল তো শুধু টাকা আনিয়া দিয়া খালাস, কোনোদিন একটি পরামর্শ দেয় নাই, এতটুকু সাহায্য করিতে আসে নাই,—সংসার চালাইয়াছে সে, ছেলেমেয়ে মানুষ করিয়াছে সে, বাড়িতে ঘর তুলিতেছে সে, বিপদে-আপদে বুক দিয়া পড়িয়া তাহার বুকের নীড়কে বাঁচাইয়াছে সে। এবার কী হইবে? বিধবা হইলে বুঝিতে পারিত ভগবান মারিয়াছেন, উপায় নাই। বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো অকারণে এ কী হইয়া গেল? একটু কলহের জন্য মারিয়া সর্বাঙ্গে কালশিরা ফেলিয়া ও শীতলের সাধ মিটিল না, সুখের সংসারে আগুন ধরাইয়া দিয়া গেল?

মামা ঘনঘন তামাক টানে। ঘনঘন বলে, এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? মামা বড়ো উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্যামা ও তাহার ছেলেদের ভারটা এবার মামার উপরেই পড়িল বইকী? হায় সে সন্ন্যাসী বিবাগি মানুষ বাইশ বছর সংসারের সঙ্গে তাহার সম্পর্ক নাই, হতভাগাটা তাহাকে এ কী দুরবস্থায় ফেলিয়া গেল? বুড়া বয়সে এই সবই তাহার অদৃষ্টে ছিল নাকি? মামা এই সব ভাবে, অরণ্যে প্রান্তরে জনপদে তাহার দীর্ঘ যাযাবর জীবনের স্মৃতি মনে আসে, একটা গেরুয়া কাপড় পরো, গায়ে

একটা গেরুয়া আলখাল্লা চাপাও, গলায় ঝুলাইয়া দাও কতগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, তারপর যেখানে খুশি যাও, আতিথ্য মিলিবে,অর্থ মিলিবে, ভক্তি মিলিবে, কত নারী দেহ দিয়া সেবা করিয়া পুণ্য অর্জন করিবে। ধার্মিকের অভাব কীসের? আজ ধনীর অতিথিশালায় শ্বেতপাথরের মেঝেতে খড়ম খটাখট করিয়া হাঁটা, কাল সম্মুখে অফুরন্ত পথ, ভুট্টাক্ষেতের পাশ দিয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া, বনের নিবিড় ছায়া ভেদ করিয়া, পাহাড় ডিঙাইয়া মরুভূমির নিশ্চিহ্নতায় ; সন্ধ্যায় গভীর ইঁদাবার শীতল জল, সদ্য-দোয়া ঈষদুষ্ণ দুধ, ঘিয়ে-ভিজানো চাপাটি, আর ভীরু সলজ্জা গ্রাম্য কন্যাদের প্রণাম—একজনকে বাছিয়া বেশি কথা বলা বেশি অনুগ্রহ দেখানো,—কে বলিতে পারে? মামা ভাবে, বুড়ো বয়সে দেশে ফিরিবার বাসনা তাহার কেন হইয়াছিল? আসিতে না আসিতে কী বিপদেই জড়াইয়া পড়িল। মুখে কিন্তু মামা অন্য কথা বলে, বলে, এমন উন্মাদ সংসারে থাকে? আমি এসেছিলাম বলে তো, নইলে তুই স্ত্রীপুত্রকে কার কাছে ফেলে যেতি রে হতভাগা? একেবারে কাণ্ডজ্ঞান নেই? স্ত্রীপুত্রকে পরের ঘাড়ে ফেলে আপিসের টাকা চুরি করে মেয়ে নিয়ে তুই পালিয়ে গেলি?

শ্যামাই শেষে বিরক্ত হইয়া বলে, এখন আর ও কথা বলে লাভ কী হবে মামা? কী করতে হবে না হবে পরামর্শ করি এসো।

অনেক রকম পরামর্শই তাহারা করে। মামা একবার প্রস্তাব করে যে শ্যামার কাছে কিছু যদি টাকা থাকে, হাজার দুই তিন, ওই টাকাটা কমলবাবুকে দিয়া এখনকার মতো ঠান্ডা করা যাক, পরে শীতল ফিরিয়া আসিলে যাহা হয় হইবে। শ্যামা বলে তাহার টাকা নাই, টাকা সে কোথায় পাইবে? তা ছাড়া শীতল যে ফিরিয়া আসিবে তার কী মানে আছে? তখন মামা বলে, বাড়িটা বিক্রি করিয়া কমলবাবুকে টাকাটা দিয়া দিলে কেমন হয়? শীতল তাহা হইলে পুলিশের হাত হইতে বাঁচে। শ্যামা বলে যে শীতল যদি ফাঁসিও যায় বাড়ি সে বিক্রয় করিতে দিবে না। এই কথা বলিয়া তাহার খেয়াল হয় যে ইচ্ছা থাকিলেও বাড়ি সে বিক্রয় করিতে পারিবে না, বাড়ি শীতলের নামে। শুনিয়া মামা একেবারে হতাশ হইয়া বলে যে তা হলেই সর্বনাশ, টাকাগুলি খরচ করিয়া শীতল ফিরিয়া আসিয়াই বাড়িটা বিক্রয় করিয়া নিশ্চয় কমলবাবুর টাকাটা দিয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবে। শ্যামার মুখ শুকাইয়া যায়, সে কাঁদিতে থাকে।

পরামর্শ করিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারা যায় না, বেশির ভাগ আরও বেশি বেশি বিপদের সম্ভাবনাগুলি আবিষ্কৃত হইতে থাকে।

শেষে মামা একসময় বলে, শ্যামা, সর্বনাশ করেছিস!—আপিসের টাকা থেকে শীতল তোকে দিয়ে যায়নি হাজার টাকা?

শ্যামা বলে, এ কথা জিজ্ঞেস করছ কেন মামা?

মামা বলে, কেন করছি তুই তার কী বুঝবি, পুলিশে বাড়ি সার্চ করবে না? নোট টোট যদি দিয়ে গিয়ে থাকে তা বেরিয়ে পড়বে না? তোকে ধরে তখন যে টানাটানি করবে রে?

শুনিয়া শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া যায়, বলে, কী হবে মামা তবে?

এবার মামা সুপরামর্শ দেয়, বলে, দে দে, আমায় এনে দে টাকাগুলো, দ্যাখ দিকি কী সর্বনাশ করেছিলি? ওরে নোটের যে নম্বর থাকে, দেখামাত্র ধরা পড়বে ও টাকা কমলবাবুর! ছি ছি, তোর একেবারে বুদ্ধি নেই শ্যামা, দে নোটগুলো আমি নিয়ে যাই, কলকাতায় মেসে হোটেলে কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকিগে। আস্তে আস্তে পারি তো নোটগুলো বদলে ফেলব, নয়ত দু-একবছর এখন লুকোনো থাক, পরে একটি দুটি করে বার করলেই হবে।

সেই রাত্রেই নোটের তাড়া লইয়া মামা চলিয়া গেল। শ্যামা বলিল, মাঝে মাঝে তুমি এলে কী ক্ষতি হবে মামা, পুলিশ তোমায় সন্দেহ করবে?

মামা বলিল, আমায় কেন সন্দেহ করবে?—আসব শ্যামা, মাঝে মাঝে আমি আসব।

রাত্রি প্রভাত হইল, শ্যামার ঘরের ছাদ পিটানোর শব্দে দিনটা মুখর হইয়া রহিল, দুদিন দুরাত্রি গেল পার হইয়া, না আসিল পুলিশ, না আসিল মামা, না আসিল শীতল। শ্যামার চোখে জল পুরিয়া আসিতে লাগিল। কতকাল আগে তাহার বারো দিনের ছেলেটি মরিয়া গিয়াছিল তারপর আর তো কোনোদিন সে ভয়ংকর দুঃখ পায় নাই, ছোটোখাটো দুঃখদুর্দশা যা আসিয়াছে স্মৃতিতে এতটুকু দাগ পর্যন্ত রাখিয়া যায় নাই, সুখ ও আনন্দের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গিয়াছে। জীবনে তাহার গতি ছিল, কোলাহল ছিল, আজ কী স্তব্ধতার মধ্যে সেই গতি রুদ্ধ হইয়া গেল দ্যাখো। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ভাবে। বকুল? কোথায় কী অবস্থায় মেয়েটা কী করিতেছে কে জানে! শীতলের সঙ্গে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, সময়ে হয়তো খাইতে পায় না, নরম বালিশ ছাড়া মেয়ে তাহার মাথায় দিতে পারিত না, কোথায় কীভাবে পড়িয়া হয়তো এখন সে ঘুমায়, শীতল হয়তো বকে, চুপিচুপি অভিমানিনী লুকাইয়া কাঁদে? বিষ্ণুপ্রিয়ার মেয়ের দেখাদেখি বকুলের কত বাবুয়ানি ছিল, ময়লা ফ্রকটি গায়ে দিত না, মুখে সর মাখিত, লাল ফিতা দিয়া তাহার চুল বাঁধিয়া দিতে হইত, আঁচলে এক ফোঁটা অগুরু দিবার জন্য মার পিছনে পিছনে আবদার করিয়া ঘুরিত। কে এখন জামায় তাহার সাবান দিয়া দেয়? কে চুলের বিনুনি করে? বকুলের মুখে কত ধুলা না জানি লাগে, আঁচল দিয়া সে শুধু মুখটি মুছিয়া ফেলে, কে দিবে [illegible] [illegible]ফেদা, কে দিবে দুধের সব।

দিন তিনেক পরে মামা আসিল। বলিল, সার্চ করে গেছে? করেনি? ব্যাপার তবে কিছু বোঝা গেল না শ্যামা, কী মতলব যেন করেছে কমলবাবু, আঁচ করে উঠতে পারছি না।

শ্যামা বলিল, টাকাটার কোনো ব্যবস্থা করে তুমি এসে থাকতে পার না মামা এখানে? এই পুলিশ আসে, এই পুলিশ আসে করে ভয়েভয়ে থাকি, এলে তারা কী করবে কী বলবে কে জানে, মারধোর করে যদি, জিনিসপত্র যদি নিয়ে চলে যায়?

মামা একগাল হাসিয়া বলিল, থাকব বলেই তো টাকার ব্যবস্থা করে এলাম রে।

কোথায় রেখেছ?

তুই চিনবিনে, মস্ত জমিদার। নতুন কাপড়ের পুলিন্দে করে সিল মোহর এঁটে জমা দিয়েছি, বলেছি গাঁয়ে আমার বাড়ি-ঘর আছে না, তার দলিলপত্র,—ঘুরেঘুরে বেড়াই হারিয়ে-টারিয়ে ফেলব, তোমার সিন্দুকে যদি রেখে দাও বাবা? বড়ো ভক্তি করে আমায়, বলে, যোগতপস্যা সব ছেড়ে দিলেন নইলে আপনি তো মহাপুরুষ ছিলেন, দীক্ষা নেব ভেবেছিলাম আপনার কাছে।..জানিস মা, পিঠের ব্যথাটা আবার চাগিয়েছে, ব্যথায় কাল ঘুম হয়নি।

রাণী একটু মালিশ করে দিক?—শ্যামা বলিল।

দশ বারো দিন কাটিয়া গেল। বিষ্ণুপ্রিয়া একদিন শ্যামাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, রাগাবাগি করিয়া মেয়ে লইয়া শীতল চলিয়া গিয়াছে এই পর্যন্ত শ্যামা তাহাকে বলিয়াছে, টাকাচুরির কথাটা উল্লেখ করে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া সমবেদনা দেখাইয়াছে খুব, বলিয়াছে, ভেবে ভেবে রোগা হয়ে গেলে যে, ভেবো না, ফিরে আসবে। বাড়িঘর ছেড়ে কদিন আর থাকবে পালিয়ে? তারপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া বলিয়াছে, সংসার-খরচের টাকাকড়ি রেখে গেছে তো? শ্যামা জবাবে বলিয়াছে, কী কুক্ষণে যে দোতলায় ঘরতোলা আরম্ভ করেছিলাম দিদি, যেখানে যা ছিল কুড়িয়ে পেতে সব ওতেই ঢেলেছি, কাল কুলি-মিস্ত্রির মজুরি দেব কী করে ভগবান জানেন।—বলিয়া সজল চোখে সে নিশ্বাস ফেলিয়াছে। তারপর বিষ্ণুপ্রিয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়াছে, ভ্রু কুঁচকাইয়া একটু যেন বিরক্ত এবং রুষ্টও হইয়াছে, শেষে উঠিয়া গিয়া হাতের মুঠায় কী যেন আনিয়া শ্যামার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়াছে। কী লজ্জা তখন এ দুটি জননীর। চোখ তুলিয়া কেহ আর কারও মুখের দিকে চাহিতে পারে নাই।

বেশি কিছু নয়, পঁচিশটা টাকা। বাড়ি গিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে, এ টাকা সে লইল কেমন করিয়া? কেন লইল? এখনই এমন কী অভাব তাহার হইয়াছে? ভবিষ্যতে আর কি তাহার সাহায্য দরকার হইবে না যে এখনি মাত্র পঁচিশটা টাকা লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিরক্ত করিয়া রাখিল? তারপর শ্যামার মনে পড়িয়াছে টাকাটা সে নিজে চাহে নাই, বিষ্ণুপ্রিয়া যাচিয়া দিয়াছে। নেওয়াটা তবে বোধ হয় দোষের হয় নাই বেশি। বনগাঁয়ে মন্দাকে শ্যামা একদিন একখানা চিঠি লিখিল, সেই যে রাখাল সাতশো টাকা লইয়াছিল তার জন্য তাগিদ দিয়া। সে যে কত বড়ো বিপদে পড়িয়াছে এক পাতায় তা লিখিয়া, আরেকটা পাতা সে ভরিয়া দিল টাকা পাঠাইবার অনুরোধে। সব না পারুক, কিছু টাকা অন্তত রাখাল যেন ফেরত দেয়।—আমি কী যন্ত্রণায় আছি বুঝতে পারছ তো ঠাকুরঝি ভাই? আমার যখন ছিল তোমাদের দিইছি, এখন তোমরা আমায় না দিলে হাত পাতব কার কাছে? দিন সাতেক পরে মন্দার চিঠি আসিল, অশ্রুসজল এত কথা সে চিঠিতে ছিল যে চাপ দিলে বুঝি ফোঁটাফোঁটা ঝরিয়া পড়িত। দাদা কোথায় গেল, কেন গেল, শ্যামা কেন আগে লেখে নাই, কাগজে-কাগজে বিজ্ঞাপন কেন দেয় নাই, দেশে দেশে খোঁজ করিতে কেন লোক ছুটায় নাই, এমন করিয়া চলিয়া যাওয়ার সময় ছোটো বোনটির কথা দাদার কি একবারও মনে পড়িল না? যাই হোক, সামনের রবিবার রাখাল কলিকাতা আসিতেছে, দাদাকে খোঁজ করার যা যা ব্যবস্থা দরকার সেই করিবে, শ্যামার কোনো চিন্তা নাই। টাকার কথা মন্দা কিছু লেখে নাই।

রবিবার সকালে রাখাল ভারী ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় আসিয়া পড়িল, যেন শীতলের পালানোর পর প্রায় একমাস কাটিয়া যায় নাই, যা কিছু ব্যবস্থা সে করিতে আসিয়াছে একঘণ্টার মধ্যে সে সব না করিলেই নয়। বাড়িতে পা দিয়াই বলিল, কী বৃত্তান্ত সব বলো তো বউঠান।

শ্যামা বলিল, বসুন, জিরোন, সব বলছি।

জিরোব?—জিরোবার কী সময় আছে!

মন্দার কাছে চিঠিতে শ্যামা শীতলের তহবিল-তছরুপের বিষয়ে কিছু লেখে নাই, রাখালকে বলিতে হইল। রাখাল বলিল, শীতলবাবু এমন কাজ করবেন, এ যে বিশ্বাস হতে চায় না বউঠান! রাগ করে চলে-যাওয়া,—হ্যাঁ সেটা সম্ভব, মানুষটা রাগী, কিন্তু—

অনেক কথাই হইল, কতক অর্থহীন কতক অবান্তর, কতক নিছক ব্যক্তিগত সমালোচনা ও মন্তব্য। আসল কথাটা আর ওঠেই না। শ্যামা রাখালের কথা তুলিবার অপেক্ষা করে, রাখাল ভাবে শ্যামাই কথাটা পাড়ুক ; সারাটা সকাল তাহারা ঝোপের এদিক-ওদিক লাঠি পিটাইল, ঝোপ হইতে বাঘ বাহির হইবে না পেখম-তোলা ময়ূর বাহির হইবে সকালবেলা সেটা আর ঠাহর করা গেল না। বাড়িতে অতিথি আসিয়াছে, শ্যামা রাঁধিতে গেল ; রাখাল গল্প জুড়িল মামার সঙ্গে। শ্যামা ভাবিল, কী আশ্চর্য পরিবর্তন আসে মানুষের জীবনে? খোলা মাঠে কী ভাবে হিংস্র শ্বাপদ-ভরা জঙ্গল গড়িয়া ওঠে কয়েকটা বছরে? মুখোমুখি বসিয়া আজ রাখালের মন ও তাহার মনের মুখ দেখাদেখি নাই। দুজনের খোলা মনে যে জঙ্গল গিজগিজ করিতেছে তারি মধ্যে দুজনে লুকোচুরি খেলিতেছে। না, ঠিক এ ভাবে শ্যামা ভাবে নাই, অমন কল্পনা তাহার কোথায়? সে সোজাসুজি সাধারণভাবেই ভাবিল যে রাখাল কী স্বার্থপর হইয়া উঠিয়াছে। জঙ্গলের রূপকটা তাহার অনুভূতি।

হ্যাঁ, মানুষ বদলায়। বদলায় না বাড়িঘর, বদলায় না জগৎ। এমনই শীতকালে একদিন রাত্রে বারান্দায় শীতলের বাড়ি ফেরার অপেক্ষায় শীতে তাহাকে কাঁপিতে দেখিয়া রাখাল নিজের গায়ের আলোয়ান গায়ে জড়াইয়া দিয়াছিল, হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া বলিয়াছিল, বউঠান তুমি শোও, আমি দরজা খুলে দেব। শ্যামার সব মনে আছে, সে সব ভুলিবার কথা নয়। রাখাল তাকে যেন দামি পুতুল মনে করিত, এতটুকু আঘাত লাগিলে সে যেন ভাঙিয়া যাইবে এমনই যত্ন ছিল রাখালের, অসুখ হইলে কপালে হাত বুলানোর আর তো কেহ ছিল না তাহার রাখাল ছাড়া!

টাকার কথাটা দুপুরে উঠিয়া পড়িল, রাখাল মাথা নিচু করিয়া বলিল, জানো তো বউঠান আমার রোজগার? পঁচানব্বই টাকা মাইনে পাই, দুটো সংসার, ছেলেমেয়ে, কোনো মাসে খরচ চলে কোনো মাসে ধার হয়। একটা বোনের বিয়ে দিয়েছি, এখনও একটা বাকি তারও বয়স হল, দু-এক বছরের মধ্যে তার বিয়ে না দিলেও চলবে না,—এখন কী করে তোমার টাকা দিই বউঠান?—তোমার অবস্থা বুঝি, আমার অবস্থা বুঝে দ্যাখো।

সুতরাং তাহাদের কলহ বাধিয়া গেল খানিক পরেই; এমন শীতের দিনে জলে হাত ভিজাইয়া ঠান্ডা করিয়া হঠাৎ পরস্পরের গায়ে দিয়া একদিন যাহারা হাসাহাসি করিত টাকার জন্য তাহাদের কলহ? এ কী আশ্চর্য কথা যে সেদিনের স্মৃতি তাহারা ভুলিয়া গেল, সংসারের বূঢ় বাস্তবতার মধ্যে যে ইতিহাস স্মরণ করা মাত্র দুদিন আগেও যাহারা অবাস্তব স্বপ্ন দেখিতে পারিত? শ্যামা কড়া কড়া অপমানজনক কথা বলিল, সেই সাতশত টাকার উল্লেখ করিয়া রাখালকে সে একরকম জুয়াচোর প্রতিপন্ন করিয়া দিল। রাখাল জবাবে বলিল, শ্যামা যদি মনে করিয়া থাকে নিজের হকের ধন ছাড়া শীতলের কাছে কোনোদিন সে একটি পয়সা নিয়াছে, শীতল জেল হইতে ফিরিলে শ্যামা যেন আর একবার তাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দ্যাখে। শ্যামা বলিল, হকের ধন কীসে? রাখাল বলিল, শ্যামা তার কী জানিবে? মন্দার বিবাহ দিবার সময় শীতল যে জুয়াচুরি করিয়াছিল, রাখাল বলিয়াই সেদিন তাহার জাত বাঁচাইয়াছিল, আর কেহ হইলে বিবাহসভা হইতে উঠিয়া যাইত। শীতল অর্ধেক গয়না দেয় নাই, পণের টাকা দেয় নাই একটি পয়সা। তারপর সেই গোড়ার দিকে প্রেসের কী সব কিনিবার জন্য ভুলাইয়া-ভালাইয়া সে যে রাখালের পাঁচশত টাকা লইয়া এক পয়সা কোনোদিন ফেরত দেয় নাই শ্যামা কি তা জানে? সংসারে কে কেমন লোক জানিতে রাখালের আর বাকি নাই।

এই সব কথার আদান প্রদান করিবার পর দুজনে বড়ো বিষণ্ণ হইয়া রহিল। রাখাল বিদায় হইল বিকালে।

শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই! ভাবনায়-চিন্তায় মাথা আমার খারাপ হয়ে গেছে, রাগের সময় দুটো মন্দ কথা বলেছি বলে আপনিও আমায় এই বিপদের মধ্যে ফেলে চললেন?

রাখাল বলিল, না না, সে কী কথা বউঠান, রাগ কেন করব? তুমিও দুটো কথা বলেছ, আমিও দুটো কথা বলেছি, ওইখানেই তা মিটে গেছে—রাগারাগির কী আছে?

শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আপনারাই এখন আমার বল-ভরসা, আপনারা না দেখলে কে আমায় দেখবে? ছেলেমেয়ে নিয়ে আমি ভেসে যাব ঠাকুরজামাই।

বড়োদিনের ছুটিতে আবার আসব বউঠান।—রাখাল বলিল।

গতবার বড়োদিনের ছুটিতে সে আসিয়াছিল—এবারও আসিবে বলিয়া গেল। রাখাল? সেই রাখাল? একদিন যে ছিল তাহার বন্ধুর চেয়েও বড়ো?

শীতের হ্রস্ব দিনগুলি শ্যামার কাছে দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ রাত্রিগুলি হইয়াছে অন্তহীন। শীতলের বিছানা খালি, বকুলের বিছানা খালি। কী ভঙ্গি করিয়া মেয়েটা শুইত, ফুলের মতো দেখাইত না তাহাকে? গায়ে লেপ থাকিত না, শীতে মেয়েটা কুণ্ডলী পাকাইয়া যাইত, শুইতে আসিয়া রোজ শ্যামা তাহার গায়ে লেপ তুলিয়া দিত। গভীর রাত্রে শূন্যদৃষ্টিতে শূন্যশয্যার দিকে চাহিয়া শ্যামা জাগিয়া থাকে, চোখ দিয়া জল পড়ে। আর তো মেয়ে নাই শ্যামার, ওই একটি মেয়ে ছিল। আর কী সে মেয়ে! শ্যামার এই ছোটো বাড়িতে অতটুকু মেয়ের প্রাণ যেন আঁটিত না, ও যেন ছিল আলো, ঘরের চারিদিক উজ্জ্বল করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ছড়াইয়া পড়িত। সে অত প্রচুর ছিল বলিয়া শ্যামা বুঝি তাকে তেমন আদর করিত না? বকুল, ও বকুল, কোথায় গেলি তুই বকুল?

একদিন রাত্রে কে যেন পথের দিকের জানালায় টোকা দিতে লাগিল। শ্যামা জানালার খড়খড়ি ফাঁক করিয়া বলিল, কে?

মৃদুস্বরে উত্তর আসিল, আমি শ্যামা আমি, দরজা খোলো।

জানালা খুলিয়া শ্যামা দেখিল, শীতল একা নয়, সঙ্গে বকুল আছে। দরজা খুলিয়া ওদের সে ভিতরে আনিল, বকুলকে আনিল কোলে করিয়া। বকুলের গায়ে একটা আলোয়ান জড়ানো, এই শীতে কি আলোয়ানে কিছু হয়, শ্যামার কোলে বকুল থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। শ্যামার মনে হইল মেয়ে যেন তাহাব হালকা হইয়া গিয়াছে। ঘরে আসিয়া আলোতে বকুলের মুখ দেখিয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল, ঠোঁট ফাটিয়া, গাল ফাটিয়া, মরা চামড়া উঠিয়া কী হইযা গিয়াছে বকুলের মুখ? শ্যামা কথা কহিল না, লেপকাঁথা যা হাতের কাছে পাইল তাই দিয়া জড়াইয়া মেয়েকে কোলে করিয়া বসিল, গায়ের গরমে একটু তো গরম পাইবে?

বকুল তো এমন হইয়াছে, শীতল? মাথায় মুখে সে কম্ফটার জড়াইয়া আসিয়াছিল, সেটা খুলিয়া ফেলিতে শ্যামা দেখিল তার চেহাবা তেমনি আছে, পুলিশের তাড়ায় পথে-বিপথে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গায়ে তাহার দামি নূতন গরম কোট, চাদরটাও নূতন। না, শীতলেব কিছু হয় নাই। মেয়েটাব অদৃষ্টে দুঃখ ছিল, সেই শুধু আধ-মরা হইযা আসিয়াছে।

ওর জ্বর হয়েছিল।—শীতল বলিল।

জ্বর? তাই বটে, অসুখ না হইলে মেয়ে কেন এত রোগা হইয়া যাইবে? শ্যামা শীতলেব মুখেব দিকে চাহিল, চোখ দিয়া তাহাব জল গড়াইয়া পড়িল, ধরা গলায বলিল, জন্মে থেকে ওর একদিনেব জন্যে গা গরম হয়নি।

শীতল কি তাহা জানে না? এ তাহাকে অনর্থক লজ্জা দেওযা। শ্যামা এবার তাহাব প্রতিকারহীন অপকীর্তিব কথা তুলুক, তাহা হইলেই গৃহে প্রত্যাবর্তন তাহার সফল হয়। পরস্পরেব দিকে চাহিয়া তাহাবা যেন শত্রুতাব পবিমাপ করিতে লাগিল! শ্যামাব কী কবিযাছে শীতল? প্রেসেব টাকা যদি সে চুবি কবিয়া থাকে, সে জন্য জেলে যাইবে সে। সে স্বাধীন মানুষ নয়? শ্যামাব তো সে কোনো ক্ষতি করে নাই! ববং বাইশ বছব মাসে মাসে ওকে সে টাকা আনিয়া দিয়াছে। এবার যদি সে ছুটিই নেয়, কী বলিবার আছে শ্যামার? এমনি সব কথা ভাবিতে গিয়া শীতলের বুঝি চোখ পড়িল ঘুমন্ত ছেলে দুটির দিকে, মণি আব ছোটো খোকা, যার নাম ফণীন্দ্র, বকুলেব গায়ে জড়ানোর জন্য ওদের গা হইতে লেপটা শ্যামা ছিনাইয়া লইয়াছে। ওদের দেখিয়া শুধু নয়, কবে শীতল ভুলিতে পারিয়াছিল তার চেযে পরাধীন কেহ নাই, সৃষ্টিতত্ত্বের সে গোলাম, জেলে যাওয়াব, মরিয়া যাওয়ার অধিকার তাহার নাই? সে পাগল বলিয়াই না এ কথা ভুলিয়া গিয়াছিল? জানালা বন্ধ ঘরে শীতেব স্তব্ধ রাত্রি, এই ঘরে দায়ে-পড়া স্নেহমমতার সঙ্গে সুখশান্তির বিরাট সমন্বয়টা দিনে আসিলে বোঝা যাইত না। এই ঘবে এমনি শীতের বাত্রে লেপ মুড়ি দিয়া সে কতকাল ঘুমাইয়াছে! তুচ্ছ তুলার তোশকে, তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম! তেমনিভাবে আব সে কোনোদিন এখানে ঘুমাইতে পারিবে না। তুচ্ছ তুলাব তোশকে তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘুম আজ কত দুর্লভ!

ধীরে ধীরে তাহাবা কথা বলিতে লাগিল, দুজনের মাঝে যেন দুস্তর ব্যবধান, একজন কথা বলিলে এতটা দূরত্ব অতিক্রম করিয়া আরেকজনের কাছে পৌঁছিতে যেন সময় লাগে।

শ্যামা বলিল, টাকা কি সব খরচ করে ফেলেছ?

শীতল বলিল, না, দুচার শো বোধ হয় গেছে মোটে।

শ্যামা বলিল, তাহলে কালকেই তুমি যাও, কমলবাবুর হাতে পায়ে ধরে পড়ো গিয়ে, টাকা ফিরে পেলে তিনি বোধ হয় আর গোলমাল করবেন না।

শীতল বলিল, যদি করেন গোলমাল? তা হলে টাকাও যাবে, জেলও খাটব। তার চেয়ে আমার পালানোই ভালো। তোমায় যে টাকা দিয়ে গেছি তাইতেই এখন চলবে, আমি পশ্চিমে চলে যাই, সেখানে দোকান-টোকান দিয়ে যা করে হোক রোজগারের একটা পথ করে নিতে পারব, মাঝে মাঝে দেশে এসে এমনি রাতদুপুরে তোমার সঙ্গে দেখা করে টাকাপয়সা দিয়ে যাব। তারপর দু-চার বছর কেটে গেলে বাড়িটা বিক্রি করে তোমরা এদিক-ওদিক কিছুদিন ঘুরে ফিরে আমি যেখানে থাকব সেইখানে চলে যাবে। ছ হাজার টাকার তো মামলা, কে আর অতদিন মনে রাখবে, কমলবাবুও ভুলে যাবে, পুলিশেও খোঁজটোজ আর নেবে না।

শ্যামা বলিল, বাড়ি বিক্রি করব কী করে? বাড়ি তো তোমার নামে।

এতক্ষণে শীতল একটু হাসিল, বলিল, সে আমি তোমায় কবে দান করে দিয়েছি, খুকি হবার সময় আমার একবার অসুখ হয়েছিল না? —সেইবার। আমার বাড়ি হলে কমলবাবু এতক্ষণ বাড়ি বিক্রি করে টাকা আদায় করে নিত।

শ্যামার মনে হয় শীতলকে সে চিনিতে পারে নাই। মাথায় একটু ছিট আছে, ঝোঁকের মাথায় হঠাৎ যা তা করিয়া বসে, কিন্তু বুকখানা স্নেহমমতায় ভরপুর।

ঘণ্টা দুই পরে সাব-ইন্সপেক্টর রজনী ধর আসিলেন। ভারী অমায়িক লোক। হাসিয়া বলিলেন, না মশাই না, দেশে দেশে আপনাকে আমরা খুঁজে বেড়াইনি, যত বোকা ভাবেন আমাদের অত বোকা আমরা নই, বি এ এম এ-টা আমরাও তো পাশ করি? আপনার বাড়িটাতে শুধু একটু নজর রেখেছিলাম, —আমি নই, আমি মশায় থানায় ঘুমোচ্ছিলাম—অন্য লোক। আপনি একদিন আসবেন তা জানতাম,—সবাই আসে, স্ত্রী-পরিবারের মায়া বড়ো মায়া মশায়। টাকাগুলো আছে নাকি পকেটে? দেখি একবার হাতড়ে। না থাকে তো নেই, টাকার চেয়ে আপনাকেই আমাদের দরকার বেশি, আপনাকে পাওয়া আর দুশোটি টাকা পাওয়া সমান কি না। জানেন না বুঝি? আপনার জন্যে কমলবাবু যে দুশো টাকা পুরস্কার জমা দিয়েছেন।—নইলে এই শীতের রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেও আপনার সঙ্গে এমন মিষ্টিমিষ্টি কথা কই?

শ্যামার কান্না, ছেলেমেয়ের কান্না, সর্বসমেত পাঁচটি প্রাণীর কান্নার মধ্যে শীতলকে লইয়া সাব-ইন্সপেক্টর চলিয়া গেল।

মামা বলিল, কাঁদিসনে শ্যামা, কাল জামিনে খালাস করে আনব। তারপর চুপিচুপি বলিল, কী মুখ্যু দেখলি? টাকাগুলো পকেটে করে নিয়ে এসেছে! নিজেও গেলি টাকাও গেল, —গেল তো?

ছয়

শীতলের জেল হইয়াছে দু বছর।

শ্যামা একজন ভালো উকিল দিয়াছিল। শীতলের এই প্রথম অপরাধ। টাকাও কমলবাবু প্রায় সব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন,—শ্যামা যে হাজার টাকা লুকাইয়া ফেলিয়াছিল আর শীতল যে শ-তিনেক খরচ করিয়াছিল, সেটা ছাড়া। জেল শীতলের ছমাস হইতে পারিত, এক বছর হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু শীতলের কিনা মাথায় ছিট আছে, বিচারের সময় হাকিমকে সে যেন একদিন কী সব বলিয়াছিল,—যে সব কথা মানুষকে খুশি করে না। তাই শীতলকে হাকিম কারাবাস দিয়াছিলেন আঠারো মাস আর জরিমানা করিয়াছিলেন দুহাজার টাকা, —অনাদায়ে আরও দশ মাস কারাবাস। জরিমানা দিলে কমলবাবু অর্ধেক পাইতেন, অর্ধেক যাইত সরকারি তহবিলে। এই জরিমানার ব্যাপারটা শ্যামাকে কদিন বড়ো ভাবনায় ফেলিয়াছিল। মামা না থাকিলে সে কী করিত বলা যায় না, বকুলকে শীতল যেদিন গভীর

রাত্রে ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল সেদিন দুটি ঘণ্টা সময়ের মধ্যে তাদের যেন একটা অভূতপূর্ব ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছিল, দুই যুগ একত্র বাস করিয়াও তাহাদের যাহা আসে নাই। স্বামীর জন্য সে রাত্রে বড়ো মমতা হইযাছিল শ্যামার। কিন্তু মামা তাহাকে বুঝাইযা দিয়াছিল, জরিমানার টাকা দেওয়াটা বড়ো বোকামির কাজ হইবে, বিশেষত বাড়ি বাঁধা না দিয়া যখন পুরা টাকাটা জোগাড় হইবে না—টাকা কই শ্যামার? হাজার টাকার নম্বর দেওয়া নোটগুলি তো এখন বাহির করা চলিবে না। বাহির করা চলিলেও আরেক হাজার টাকা?—কাজ নাই ও সব দুর্বুদ্ধি করিয়া। আঠারো মাস যাকে কয়েদ খাটিতে হইবে, সে আর দশমাস বেশি কাটাইতে পারিবে না জেলে! দশ মাসই বা কেন? বছরে কমাস জেল যে মুকুব হয়। তারপর, শেষের চার-ছমাস জেলে থাকিতে কয়েদির কী আব কষ্ট হয়? তখন নামেমাত্র কয়েদি, সকালে বিকালে একবার নাম ডাকে, বাস, তারপর কয়েদিরা যেখানে খুশি যায় যা খুশি করে,-রাজার হালে থাকে।

বাড়িতেও তো আসতে পারে তবে, এক-আধ ঘণ্টার জন্যে?

না, তা পারে না,—জেলের বাইরে যেতে-আসতে দেয়, দু দণ্ড দাঁড়িয়ে এর-ওর সঙ্গে কথা বলতে দেয়, তাই বলে নজর কি রাখে না একেবারে? তাছাড়া কয়েদির পোশাক পরে কোথায যাবে?—কেউ ধরে এনে দিলে তো শেষ পর্যন্ত দাঁড়াবে পালিয়ে যাচ্ছিল!—আবার দেবে ছমাস ঠুকে! জেলের কাণ্ডকারখানার কথা আর বলিসনে শ্যামা, মজার জায়গা জেল,—শীতল যত কষ্ট পাবে ভাবছিস তা সে পাবে না, ওই প্রথম দিকে একটু যা মনের কষ্ট।

উৎসাহের সঙ্গে গডগড় করিযা মামা বলিযা যায়, অবাধ অকুণ্ঠ! কত অভিজ্ঞতাই জীবনে মামা সংগ্রহ করিয়াছে!

শ্যামা সজল চোখে বলিয়াছিল, এত খবরও তুমি জান মামা! তুমি না থাকলে কী যে করতাম আমি,—ভেবে ভেবে পাগল হয়ে যেতাম।—বছরে কমাস কয়েদ মুকুব করে মামা? ভালো হয়ে থাকলে বোধ হয় শিগগির ছেড়ে দেয়—একদিন গিয়ে দেখা করে বলে আসব ভালো হযেই যেন থাকে।

পাড়ায় ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া গিয়াছে। পাড়ার যে সব বাড়ির মেয়েদেব সঙ্গে শ্যামাব জানাশোনা ছিল শ্যামার সঙ্গে তাহাদের ব্যবহারও গিয়াছে সঙ্গে সঙ্গে বদলাইয়া। কেহ সহানুভূতি দেখায়, নীরবে ও সরবে : কেহ কোনোরকম অনুভূতিই দেখায় না, বিস্ময়, সমবেদনা অবহেলা কিছুই নয়। পাড়ার নকুড়বাবুব পবিবারের সঙ্গে শ্যামার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশি, এখন ওদের বাড়ি গেলে ওবা বসিতে বলিতে ভুলিযা যায়, সংসারেব কাজের চেয়ে শ্যামার দিকে নজর একটু বেশি দিতে মনে থাকে না, কথা বলিতে বলিতে ওদের কেমন উদাস বৈরাগ্য আসে, কত যেন শ্রান্ত ওবা, চোয়াল ভাঙিয়া এখুনি হাই উঠিবে। শ্যামার বাড়িতে যারা বেড়াইতে আসিত তাদের মধ্যে তারাই শুধু আসা-যাওয়া সমানভাবে বজায় রাখিয়াছে, এমনকী বাড়াইয়া দিয়াছে, যারা আসিলে শ্যামার সম্মান নাই, না আসিলে নাই অপমান।

বিধান এতকাল শঙ্করের সঙ্গে বাড়ির গাড়িতে স্কুলে গিয়াছে, একদিন দশটার সময় বই-খাতা লইয়া বাহির হইয়া গিয়া খানিক পরে সে আবার ফিরিয়া আসিল। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, স্কুলে গেলি নে?

শঙ্করকে নিয়ে গাড়ি চলে গেছে মা।

তোকে না নিয়েই চলে গেল? কেন রে খোকা, দেরি করে তো যাসনি তুই?

পরদিন আরও সকাল সকাল বিধান বাহির হইয়া গেল, আজও সে ফিরিয়া আসিল খানিক পরেই, মুখখানা শুকনো করিয়া। শ্যামা তখন বকুলকে ভাত দিতেছিল। সে বলিল, আজকেও গাড়ি চলে গেছে নাকি খোকা?

বিধান বলিল, ড্রাইভার আমাকে গাড়িতে উঠতে দিলে না মা, বললে, মাসিমা বারণ করে দিয়েছে·—

এমন টনটনে অপমানজ্ঞান বিধানেব? থামেব আড়ালে সে লুকাইয়া দাঁড়াইয়া থাকে, সে যেন অপবাধ কবিয়া কার কাছে মাব খাইয়া আসিয়াছে। শ্যামা বকুলকে ভাত দিয়া রান্নাঘবে পলাইয়া যায়, অতবড়ো ছেলে তাহার অপমানিত হইযা ঘা খাইয়া আসিল, ওকে সে মুখ দেখাইবে কী করিয়া?

দুপুরবেলা শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়াব বাড়িতে গেল। দোতলায় বিষ্ণুপ্রিযার নিভৃত শযনকক্ষ, সিঁড়ি দিযা শ্যামা উপরে উঠিতে যাইতেছিল, রান্নাঘরের দাওয়া হইতে বিষ্ণুপ্রিযার ঝি বলিল,কোথা যাচ্ছ মা হনহন করে?—যেওনি, গিন্নিমা ঘুমোচ্ছে,—এমনিধারা সময় কারও বাড়ি কি আসতে আছে? যাও মা একন, বিকেলে এসো।

শ্যামা বলিল, দিদিব হাসি শুনলাম যে ঝি? জেগেই আছেন।

ঝি বলিল, হাসি শুনবেনি তো কী কান্না শুনবে মা? ওপরে এখন যেতে মানা, যেওনি।

শ্যামা অগত্যা বাড়ি ফিরিযা গেল। ভাবিল, পাঁচটাব সময় আব একবার আসিয়া বলিয়া দেখিবে, উপায কী, বিধানের তো স্কুলে না গেলে চলিবে না? বাড়ি ফিরিতেই বিধান বলিল, কোথা গিযেছিলে মা?

ওই ওদেব বাড়ি।

কাদের বাড়ি বিধান জিজ্ঞাসা কবিল না। ছেলেবেলা হইতে শ্যামা এই ছেলেটিকে অদ্ভুত বলিয়া জানে, বহস্যময বলিয়া জানে, ছমাস বয়সে এই ছেলে তাহার উদাস নযনে দুর্বোধ্য স্বপ্ন দেখিত, ডাকিলে সাড়া মিলিত না, কথা কহিযা, খেলা দিযা না যাইত হাসানো, না চলিত ভোলানো। আর নিষ্ঠুব? সময সময় শ্যামাব মনে হইত ছেলে যেন পাষাণ,—বক্তমাংসে তৈবি বুক ওর নাই। তারপর ওব প্রকৃতির কত বিচিত্র দিক স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া আবাব ওব মধ্যেই কোথায় লুকাইয়া গিয়াছে,—একটিব পর একটি দুর্বোধ্যতা, রাশি রাশি মুখোশ পরিয়া সে যেন জন্মিয়াছিল একে একে খুলিয়া চলিয়াছে, ওব আসল পরিচয় আজও শ্যামা চিনিল না। কত সময় সে ভয় পাইয়া ভাবিয়াছে, বাপের পাগলামিই কি ছেলের মধ্যে প্রবলতর হইযা দেখা দিতেছে, ও কি একদিন পাগল হইয়া যাইবে? অত কী ভাবে ও? সমযসময জননীর উন্মাদ ভালোবাসাকে কেমন করিয়া দুপায়ে মাড়াইয়া চলে অতটুকু ছেলে! বিধানকে মনে মনে শ্যামা ভয় কবে। বিষ্ণুপ্রিযাব বাডি যাওয়ার কথা ওকে সে বলিতে পাবিল না।

বিধান বলিল, ওদের গাডিতে আমি আব স্কুলে যাব না মা, ককখনো কোনোদিন যাব না।

ওবা যদি আদব কবে ডাকতে আসে?

ডাকতে এলে মেবে তাড়িয়ে দেব।

শুনিয়া শ্যামাবও মনে হইল এই তো ঠিক, অত অপমান তাহারা সহিবে কেন? যাদের মোটর নাই ছেলে কি তাদের স্কুলে যায় না? সহসা উদ্ধত আত্মসম্মান জ্ঞানে শ্যামাব হৃদয ভবিয়া গেল। না শঙ্করের সঙ্গে গাড়িতে তাহার ছেলেকে স্কুলে যাইতে দেওয়ার জন্য বিষ্ণুপ্রিযার তোষামোদ সে করিবে না।

পরদিন মামার সঙ্গে ছেলেকে সে স্কুলে পাঠাইয়া দিল। বলিল, এ মাসের কটা দিন মোটে বাকি আছে, একটা দিন ট্রামে নগদ টিকিট কিনে ওকে স্কুলে দিয়ে এসো নিয়ে এসো মামা, একদিন তোমাব সঙ্গে এলে গেলে তারপর ও নিজেই যাতাযাত করতে পারবে, মাস-কাবারে কিনে দেব একটা মাসিক টিকিট।

বিধান অবজ্ঞার সুরে বলিল, তুমি খালি ভাব!—আমার চেয়ে কত ছোটো ছেলে একলা ট্রামে চেপে স্কুলে যায়। আমি যেখানে খুশি যেতে পারি মা,—যাইনি ভাবছ? ট্রামে করে কদ্দিন গেছি চিড়িয়াখানায় চলে।

শ্যামা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, স্কুল পালিয়ে একলাটি তুই চিড়িয়াখানায় যাস খোকা!

বিধান বলিল, রোজ নাকি? একদিন দুদিন গেছি মোটে—স্কুল পালাইনি তো। প্রথম ঘণ্টা ক্লাস হয়ে কদ্দিন আমাদের ছুটি হয়ে যায়, ক্লাসের একটা ছেলে মরে গেলে আমরা বুঝি স্কুল করি? এমনি হইচই করি যে হেডমাস্টার ছুটি দিয়ে দেয়।

প্রথম প্রথম শীতলের জন্য বকুল কাঁদিত। দোতলার ঘরখানা শ্যামা তাহাদের শয়নকক্ষ করিয়াছে, দামি জিনিসপত্রের বাক্সো-প্যাঁটরা, বাড়তি বাসন-কোসনও ওই ঘরে থাকে, সকালে বিকালে ও ঘরে কেহ থাকে না, শুধু বকুল আপন মনে পুতুলখেলা করে। পুতুল খেলিতে খেলিতে বাবার জন্য নিঃশব্দে সে কাঁদিত, মনের মানুষকে না দেখাইয়া অতটুকু মেয়ের গোপন কান্না স্বাভাবিক নয়, কী মন বকুলের কে জানে। কোনো কাজে উপরে গিয়া শ্যামা দেখিত মুখ বাঁকাইয়া চোখের জলে ভাসিতে ভাসিতে বকুল তাহার পুতুল-পরিবারটিকে খাওয়াইতে বসাইয়াছে। মেয়ে কার জন্য কাঁদে শ্যামা বুঝিতে পারিত, এ বাড়িতে সেই জেলের কয়েদিটাকে ও ছাড়া আর তো কেহ কোনোদিন ভালোবাসে নাই। মেয়েকে ভুলাইতে গিয়া শ্যামারও কান্না আসিত।

মেয়েকে কোলে করিয়া পুরানো বাড়ির ছাদে নূতন ঘরে ঝকঝকে দেয়ালে ঠেস দিয়া শ্যামা বসিত, বুজিত চোখ। শ্যামার কি শ্রান্তি আসিয়াছে? আগের চেয়ে খাটুনি এখন কত কম, তাই সম্পন্ন করিতে সে কি অবসন্ন হইয়া পড়ে?

শীতলের জেলে যাইতে যাইতে শীত কমিয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শীতলের জেলে যাওয়াটা অভ্যাস হইয়া আসিতে আসিতে শহরতলি যেন বসন্তের সাড়া পাইয়াছে। ধানকলের চোঙাটার কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া উত্তরে উড়িয়া যায়, মধ্যাহ্নে যে মৃদু উষ্ণতা অনুভূত হয় তাহা যেন যৌবনের স্মৃতি। শ্যামার কি কোনোদিন যৌবন ছিল? কী করিয়া সে চারটি সন্তানের জননী হইয়াছে, শ্যামার তো তা মনে নাই! আজ সে দারুণ বিপন্ন, স্বামী তার জেল খাটিতেছে, উপার্জনশীল পুরুষের আশ্রয় তাহার নাই, ভবিষ্যৎ তাহার অন্ধকার, শহরতলিতে বন-উপবনের বসন্ত আসিলেও জীবনে কবে তাহার যৌবন ছিল তা কি শ্যামার মনে পড়া উচিত? কী অবান্তর তার বর্তমান জীবনে এই বিচিত্র চিন্তা? মুমূর্ষুর কাছে যে নামকীর্তন হয় এ যেন তারই মধ্যে সুর-তাল-লয় মান খুঁজিয়া বেড়ানো।

জেলের কয়েদি বাপের জন্য যে মেয়ের চোখে জল তাকে কোলে করিয়া স্বামীর বিরহে সকাতর হওয়া কর্তব্য কাজ, কিন্তু জননী শ্যামা, তুমি আবার ছেলে চাও শুনিলে দেবতারা হাসিবেন যে, মানুষ যে ছিছি করিবে।

মামা বলে, এইবার উপার্জনের চেষ্টা শুরু করি শ্যামা, কী বলিস?

শ্যামা বলে, কী চেষ্টা করবে?

মামা রহস্যময় হাসি হাসিয়া বলে, দ্যাখ না কী করি। কলকাতায় উপার্জনের ভাবনা! পথেঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে, কুড়িয়ে নিলেই হল।

একটা দুটো করে নোটগুলো বদলানো আরম্ভ করলে হয় না?

তুই ভারী ব্যস্তবাগীশ শ্যামা! থাক না, নোট কি পালাচ্ছে? সংসার তোর অচলও তো হয়নি বাবু এখনও!

হয়নি, হতে আর দেরি কত?

সে যখন হবে, দেখা যাবে তখন,—এখন থেকে ভেবে মরিস কেন?

মামাব সম্বন্ধে শ্যামা একটু হতাশ হইযাছে। মামার অভিজ্ঞতা প্রচুর, বুদ্ধিও চোখা, কিন্তু স্বভাবটি ফাঁকিবাজ। মুখে মামা যত বলে কাজে হয়তো তার খানিকটা করিতে পারে কিন্তু কিছু না করাই তাহার অভ্যাস। কোনো বিষয়ে মামার নিয়ম নাই, শৃঙখলা নাই। পদ্ধতির মধ্যে মামা হাঁপাইয়া ওঠে। গা লাগাইয়া কোনো কাজ করা মামার অসাধ্য, আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দেয়। নকুড়বাবু ইনশিয়োরেন্স বেচিয়া খান, তাকে বলিয়া কহিয়া শ্যামা মামাকে একটা এজেন্সি দিয়াছিল, মামারও প্রথমটা খুব উৎসাহ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু দুদিন দুএকজন লোকের কাছে যাতায়াত করিযাই মামার ধৈর্য ভাঙিয়া গেল, বলিল, এতে কিছু হবে না শ্যামা, আমাদের সঙ্গে সঙ্গে টাকাব দরকার, লোককে ভজিয়ে-ভাজিয়ে ইনশিয়োর কবিয়ে পয়সাব মুখ দেখা দুদিনের কম্ম নয বাবু, আমার ও সব পোষাবে না। দোকান দেব একটা।

শ্যামা বলিল, দোকান দেবার টাকা কই মামা?

মামা বহস্যময় হাসি হাসিয়া বলিল, থাম না তুই, দ্যাখ না আমি কী করি।

শ্যামা সন্দিগ্ধ হইয়া বলিল, আমার সে হাজার টাকায় যেন হাত দিও না মামা।

মামা বলিল, খেপেছিস শ্যামা, তোর সে টাকা তেমনি পুলিন্দে করা আছে।

সকালে উঠিয়া মামা কোথায় চলিয়া যায়, শ্যামা ভাবে রোজগারের সন্ধানে বাহির হইয়াছে শহরে গিয়া মামা এদিকে ওদিক ঘোরে, কোথাও ভিড দেখিলে দাঁড়ায়, সং-এর মতো বেশ করিয়া আধঘণ্টা ধবিযা দুটি-একটি সহজ ম্যাজিক দেখাইয়া যাহারা অষ্টধাতুব মাদুলি, বিষ-তাড়ানো-ভূত ছাড়ানো শিকড় বিক্রয় কবে, ধৈর্যসহকারে মামা গোড়া হইতে শেষ পর্যন্ত তাহাদের লক্ষ করে। ফুটপাতে যে সব জ্যোতিষী বসিয়া থাকে তাদেব সঙ্গে মামা আলাপ কবে। কোনোদিন সে স্টেশনে যায়, কোনোদিন গঙ্গাব ঘাটে কোনোদিন কালীঘাটে। যে সব ছন্নছাড়া ভবঘুরে মানুষ মানুষকে ফাঁকি দিয়া জীবিকা অর্জন করিযা বেড়ায়, দেখিতে দেখিতে তাদের সঙ্গে মামা ভাব জমাইয়া ফ্যালে, সুখ-দুঃখেব কত কথা হয। সাধু নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, শহরে যেমন জাঁকজমক, রোজগারের সুবিধা তেমন নয, বড়ো বেয়াড়া শহরের লোকগুলি, মফস্বলের যাহাবা শহরে আসে শহরে পা দিয়া তারাও যেন চালাক হইযা ওঠে,—নাঃ, শহরে সুখ নাই। মামা বলে, গাঁট হয়ে বসে থাকলে কি শহরে সাধুর পয়সা আসে দাদা, যাও না শিশিতে জল পুরে ধাতুদৌর্বল্যের ওষুধ বেচো ন' গিয়ে, যত ফেনা কাটবে মুখে তত বিক্রি। পথ মামা বোজই হারায়, সে আরেক উপভোগ্য ব্যাপার। পথ জিজ্ঞাসা করিলে কলিকাতার মানুষ এমন মজা করে! কেউ বিনাবাক্যে গটগট করিয়া চলিয়া যায়, কেউ জলের মতো করিয়া পথের নির্দেশটা বুঝাইযা দিতে চাহিয়া উত্তেজিত অস্থির হইয়া ওঠে। মন্দ লাগে না মামার। শহরের পথও অন্তহীন, শহরেব পথেও অফুরন্ত বৈচিত্র্য ছড়ানো, ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্তি আসিবে এতবড়ো ভবঘুরে কে আছে? প্রত্যহ মামা শহবেই কাবও বাড়িতে অতিথি হইয়া দুপুরের খাওয়াটা জোগাড় করিবার চেষ্টা করে, কোনোদিন সুবিধা হয় কোনোদিন হয় না। বাড়িতে আজকাল খাওয়া-দাওয়া তেমন ভালো হয় না, শ্যামা বড়ো কৃপণ হইয়া পড়িয়াছে।

কিছু হল মামা?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করে।

মামা বলে, হচ্ছে রে হচ্ছে, বলতে বলতে ` আর কিছু হয়?

এদিকে শ্যামার টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। নগদ যা কিছু সে জমাইয়াছিল, ঘর তুলিতে শীতলের জন্য উকিলের খরচ দিতেই তাহা প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল, বাকি টাকায় ফাল্গুন মাস পর্যন্ত খরচ চলিল, তারপর আর কিছুই রহিল না। বড়োদিনের সময় রাখাল আসিয়াছিল, টাকা আসে নাই। ইতিমধ্যে শ্যামা তাহাকে দুখানা চিঠি দিয়াছে, দশবিশ করিয়াও শ্যামার পাওনাটা সে কী শোধ করিতে পারে না? জবাব দিয়াছে মন্দা, লিখিয়াছে, পাওনার কথা কী লিখেছ বউ, উনি যা পেতেন তার চেয়েও কম টাকা নিয়েছিলেন দাদার কাছ থেকে, যাই হোক, তুমি যখন দুরবস্থায় পড়েছ বউ, তোমাকে

যথাসাধ্য সাহায্য করা আমাদের উচিত বইকী, এ মাসে পারব না, সামনের মাসে কিছু টাকা তোমায় পাঠিয়ে দেব।

কিছু টাকা কত টাকা? কুড়ি।

সেদিন বোধ হয় চৈত্র মাসের সাত তারিখ। বাড়িতে মেছুনি আসিয়াছিল। একপোয়া মাছ রাখিয়া পয়সা আনিতে গিয়া শ্যামা দেখিল দুটি পয়সা মোটে তাহার আছে। বাক্সো-প্যাঁটরা হাতড়াইয়া কদিন অপ্রত্যাশিতভাবে টাকাটা সিকিটা পাওয়া যাইতেছিল, আজও তেমনি কিছু পাওয়া যাইবে শ্যামা করিয়াছিল এই আশা,—কিন্তু দুটি তামার পয়সা ছাড়া আর কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

মাছের দু আনা দাম মামাই দিল।

শ্যামা বলিল, এমন করে আ! একটা দিনও তো চলবে না মামা। একটা কিছু উপায় কর? দুচারখানা নোট তুমি নিয়ে এসো সেই টাকা থেকে, তারপর যা কপালে থাকে হবে।

মামা বলিল, টাকা চাই?—নে না বাবু দু-পাঁচ টাকা আমারই কাছ থেকে, আমি তো কাঙাল নই? বলিয়া মামা দশটা টাকা শ্যামাকে দিল।

মামার তবে টাকা আছে নাকি? লুকাইয়া রাখিয়াছে? শ্যামা বলিল, দশ টাকায় কী হবে মামা? চাদ্দিকে অভাব খাঁখাঁ করছে, কোথায় ঢালব এ টাকা?

এখনকার মতো চালিয়ে নে মা, ফুরিয়ে গেলে বলিস।

আর কটা দাও। খোকার মাইনে, দুধের দাম—

মামা হাসিয়া বলিল, আর কোথায় পাব?

কিন্তু শ্যামার মনে সন্দেহ ঢুকিয়াছে, কিছু টাকা মামা নিশ্চয় লুকাইয়া রাখিয়াছে, এমনি চুপ করিয়া থাকে, অচল হইলে পাঁচ টাকা দশ টাকা বাহির করে। অবিলম্বে আরও বেশি টাকার প্রয়োজন শ্যামার ছিল না, তবু মামার সংগতি আঁচ করিবার জন্য সে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। মামা শেষে রাগ করিয়া বলিল, বললাম নেই, বিশ্বাস হল না, বুঝি? দ্যাখগে আমার ব্যাগ খুঁজে।

ব্যাগ মামার শ্যামা আগেই খুঁজিয়াছে। দুখানা গেরুয়া বসন, একটা গেরুয়া আলখাল্লা, কতগুলি রুদ্রাক্ষ ও স্ফটিকের মালা, কতগুলো কালো কালো শিকড়, কাঠের একটা কাঁকুই, টিনের ছোটো একটি আরশি আর এমনি দুটো চারটে জিনিস মামার সম্বল। পয়সাকড়ি ব্যাগে কিছুই নাই। তবু মামার যে টাকা নাই শ্যামা তাহা পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারিল না।

দশটা টাকা যে কোথা দিয়া শেষ হইয়া গেল শ্যামা টেরও পাইল না। মামার কাছে হাত পাতিলে এবার মামা সঙ্গে সঙ্গে টাকা বাহির করিয়া দিল না, বকিতে বকিতে বাহির হইয়া গিয়া একবেলা পরে আবার দশ টাকার একটা নোট আনিয়া দিল। শ্যামার প্রশ্নের জবাবে বলিল, শিষ্য দিয়াছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি ইংরাজি মাস কাবার হইলে একদিন সকালে শ্যামা রাণীকে জবাব দিল। রাণীকে সে দুমাস আগেই ছাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল, ঝি রাখিবার সামর্থ্য তাহার কোথায়?—মামার জন্য পারে নাই। মামা বলিয়াছিল, বড়ো তুই ব্যস্তবাগীশ শ্যামা, এত খরচের মধ্যে একটা ঝির মাইনে তুই দিতে পারবি নে, কত আর মাইনে ওর? আগে অচল হোক তখন ছাড়াস, একা-একা তুই খেটে-খেটে মরবি আমি তা দেখতে পারব না শ্যামা। এবার মামাকে জিজ্ঞাসা না করিয়াই রাণীকে শ্যামা বিদায় করিয়া দিল। সারাদিন টহল দিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া মামা খবরটা শুনিয়া বলিল, তাই কি হয় মা! এতগুলো ছেলেমেয়ে, একা তুই পারবি কেন? ও সব বুদ্ধি করিসনে, এমনি যদি খরচ চলে একটা ঝির খরচও চলবে। আমি ওর মাইনে দেবখন যা।

সকালে মামা নিজে গিয়া রাণীকে ডাকিয়া আনিল। বলিল, এমনি তো কাজের অন্ত নেই, বাসন-মাজা ঘর-ধোয়ার কাজও যদি তোকে করতে হয় শ্যামা, ছেলেমেয়ের মুখের দিকে কে তাকাবে লো,

ভেসে যাবে না ওরা? এ বুড়ো যদ্দিন আছে, সংসার তোর একভাবে চলে যাবে শ্যামা, কেন তুই ভেবে ভেবে উতলা হয়ে উঠিস?

শ্যামার চোখে জল আসে। কলতলায় রাণী বাসন মাজিতেছে,—এতক্ষণ ও কাজ তাকেই করিতে হইত, নিজের মামা ছাড়া তাহা অসহ্য হইত কার? সংসারে আত্মীয়ের চেয়ে আপনার কেহ নাই। মানুষ করিয়া বিবাহ দিয়াছিল, তারপর কুড়ি বছর দেশবিদেশে ঘুরিয়া আসিয়া আত্মীয় ছাড়া কে মমতা ভুলিয়া যায় না?

শ্যামাকে উপার্জনের অনেক পন্থার কথা শুনাইবার পর যে পন্থাটি অবলম্বন করা চৈত্র মাসের মধ্যেই মামা স্থির করিয়া ফেলিল শ্যামাকে একদিন তাহার আভাসটুকু আগেই সে দিয়া রাখিয়াছিল। শুভ পয়লা বৈশাখ তারিখে মামা দোকান খুলিল।

বড়ো রাস্তায় গলির মোড়ের কাছাকাছি ছোটো একটি দোকানঘর খালি হইয়াছিল, বারো টাকা ভাড়া। গলি দিয়া বারতিনেক পাক খাইয়া শ্যামার বাড়ি পৌঁছিতে হয়, একদিন বাড়ি ফিরিবার সময় 'এই দোকান ভাড়া দেওয়া যাইবে' খড়ি দিয়া আঁকাবাঁকা অক্ষরে এই বিজ্ঞাপনটি পাঠ করিবামাত্র মামার মতলব স্থির হইয়া গেল। ঘরটি ভাড়া লইয়া মামা মনোহারি দোকান খুলিয়া বসিল। ছোটো দোকান, পুতুল খাতা পেন্সিল চা বিস্কুট লজেনচুস হ্যারিকেনের ফিতা মাথার কাঁটা সিঁদুর এই সব অল্প দামি জিনিসের, দুবোতল সুবাসিত পরিশোধিত নারিকেল তৈলের বোতলের চেয়ে দামি জিনিস মামার দোকানে রহিল কিনা সন্দেহ। কাচের কেস আলমারি প্রভৃতি কিনিয়া দোকান দিয়া বসিতে দুশো টাকার বেশি লাগিল না। মামা দোকানের নাম রাখিল শ্যামা স্টোরস।

দুশো টাকা মামা পাইল কোথায়? জিজ্ঞাসা করিলে মামা বলে, শিষ্য দিয়েছে। কেমন শিষ্য জানিস শ্যামা, বোম্বাই শহরের মার্চেন্ট জুয়েলার,—লাখোপতি মানুষ। প্রয়াগে কুম্ভমেলায় গিয়ে হাজার হাজার ছাইমাখা সন্ন্যাসীর মধ্যে গেরুয়া কাপড়টি শুধু পরে গায় একটা কুর্তা চাপিয়ে একধারে বসে আছি, না একরতি ভস্ম না একটা রুদ্রাক্ষ, জটাফটা তো কস্মিনকালে রাখিনে,—ওই অত সাধুর মধ্যে লাখোপতি মানুষটা করলে কী, অবাক হয়ে খানিক আমায় দেখলে, দেখে সটান এ . লুটিয়ে পড়ল পায়ে। বলল, বাবা এত ঝুটা মালের মধ্যে তুমি সাচ্চা সাধু, তোমার ভড়ং নেই, অনুমতি দাও সাধু সেবা করি।— মামা অকৃত্রিম আত্মপ্রসাদে চোখ বুজিয়া মৃদুমৃদু হাসে।

শ্যামা বলে, তা যদি বল মামা, এখনও তোমার মুখে চোখে যেন জ্যোতি ফোটে মাঝে মাঝে। কিছু পেয়েছিলে মামা, সাধনার গোড়ার দিকে সাধুরা যা পায়টায়, ক্ষেমতা না কী বলে কে জানে বাবু---তাই কিছু?

মামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, পাইনি?—ছেড়েছুড়ে দিলাম বলে, লেগে যদি থাকতাম শ্যামা—।

দোকান করার টাকাটা তবে ভক্তই দিয়াছে? শ্যামার সেই ... টাকায় হাত পড়ে নাই? শ্যামার মন খুঁতখুঁত করে। কুড়ি বছর অদৃশ্য থাকিবার রহস্য-আবরণটি একসঙ্গে বাস করিতে করিতে মামার চারিদিক হইতে খসিয়া পড়িতেছিল, শ্যামা যেন টের ..ইতেছিল দীর্ঘকাল দেশবিদেশে ঘুরিলেই মানুষের কতগুলি অপার্থিব গুণের সঞ্চার হয় না, একটু হয়তো খাপছাড়া স্বভাব হইয়া যায় তার বেশি আর কিছু নয়, বিনা সঞ্চয়ে ঘুরিয়া বেড়ানো ছাড়া হয়তো এ সব লোকের দ্বারা আর কোনো কাজ হয় না। মামা যে এমন একটি ভক্তকে বাগাইয়া রাখিয়াছে চাহিলেই যে দু-চারশো টাকা দান করিয়া বসে, শ্যামার তাহা বিশ্বাস করিতে অসুবিধা হয়। তেমন জবরদস্ত লোক তো মামা নয়?

একদিন সন্ধ্যার পর চাদরে গা ঢাকিয়া শ্যামা দোকান দেখিয়া আসিল। দোকান চলিবে ভরসা হইল না। শ্যামা স্টোরস-এর সামনে রাস্তার ওপারে মস্ত মনোহারি দোকান, চারপাঁচটা বিদ্যুতের আলো,

টিমটিমে কেরোসিনের আলো জ্বালা মামার অতটুকু দোকানে কে জিনিস কিনিতে আসিবে? মামার যেমন কাণ্ড, দোকান দিবার আর জায়গা পাইল না।

মামার উৎসাহের অন্ত নাই, বিধান ও খুকি দোকান-দোকান করিয়া পাগল, মণিরও দুবেলা দোকানে যাওয়া চাই। মামা ওদের বিস্কুট ও লজেনচুস দেয়, দোকানের আকর্ষণ ওদের কাছে তাহাতে আরও বাড়িয়া গিয়াছে। জিনিস বিক্রয় করিবার শখ বিধানের প্রচণ্ড। বলে, এবার যে খদ্দের আসবে তাকে আমি জিনিস দেব দাদু, অ্যাঁ? মামা বলে, পারবি কী খোকা, খদ্দের বিগড়ে দিবি শেষে। কিন্তু অনুমতি মামা দেয়। বিধান ছোটো শো-কেসটির পিছনে টুলটার উপরে গম্ভীর মুখে বসে, মামা কোণের বেঞ্চিটার উপর বসিয়া চশমা চোখে দিয়া বিড়ি টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়ে। ক্রেতা যে আসে হয়তো সে পাড়ার ছেলে, ঈর্ষার দৃষ্টিতে বিধানের দিকে চাহিয়া বলে, কী রে বিধু!—বিধান বলে, কী চাই? সে পাকা দোকানি, কেনাবেচার সময় তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অচল, খোশগল্প করিবাব তার সময় কই? চশমার ফাঁক দিয়া মামা সহকারীর কার্যকলাপ চাহিয়া দ্যাখে, বলে, কালি? ওই ও কোনার টিনের কৌটোতে--দু বড়ি এক পয়সায়, কাগজে মুড়ে দে বোকা!

এদিকে দোকান চলে ওদিকে মামা আজ দশটাকা কাল পাঁচটাকা সংসার খরচ আনিয়া দেয়। মামার চারিদিকে রহস্যের ভাঙা আবরণটি আবার যেন গড়িয়া উঠিতে থাকে। পাড়ার লোকে এতকাল মামাকে অতিথি বলিয়া খাতির করিত, এখন প্রতিবেশী গৃহস্থেব প্রাপ্য সহজ সমাদর দেয়, তবে অতটুকু দোকান দেওয়ার জন্য পাড়ার অনেক চাকুরে বাবুর কাছে মামার আসন নামিয়া গিয়াছে, খুব যারা বাবু, দুএক পয়সার জিনিস কিনিতে মামাকে তাদের কেহ তুমি পর্যন্ত বলিয়া বসে।

মামা বলে, কী চাই বললে? পরিমল নস্যি? ওই ও দোকানে যাও!

অপমান করিয়া মামার কাছে কারও পার পাওয়ার জো নাই।

বৈশাখ মাস শেষ হইলে শ্যামা একদিন বলিল, দোকানের হিসাবপত্র করলে মামা, লাভটাভ হল?

মামা বলিল, লাভ কিরে শ্যামা, বসতে না বসতে কি লাভ হয়? খরচ উঠুক আগে।

শ্যামা বলিল, নতুন দোকান দিয়ে বসার খরচ দুএক মাসে উঠবে না তা জানি মামা, তা বলিনি, বিক্রির ওপোর লাভটাভ কী রকম হল হিসাব করনি?—কত বেচলে, কেনা দাম ধরে কত লাভ রইল, করনি সে হিসাব?

মামা বলিল, তুই আমাকে দোকান-করা শেখাতে আসিসনে শ্যামা!

এবার গ্রীষ্মের ছুটি হওয়ার আগে ক্লাসের ছেলেদের অনেকেই নানা স্থানে বেড়াইতে যাইবে শুনিয়া শুনিয়া বিধানের ইচ্ছা হইয়াছিল সেও কোথাও যায়,—কোথায় যাইবে? কোথায় তাহার কে আছে, কার কাছে সে গিয়া কিছুদিন থাকিয়া আসিতে পারে? বনগাঁ গেলে হইত,—মন্দাকে শ্যামা চিঠি লিখিয়াছিল, মন্দা জবাব দিয়াছে এখন সেখানে চারিদিকে বড়ো কলেরা বসন্ত হইতেছে,—এখন না গিয়া বিধান যেন পূজার সময় যায়।

বিষ্ণুপ্রিয়ারা এবার দার্জিলিং গিয়াছে। তখনও স্কুলের ছুটি হয় নাই, শঙ্কর সঙ্গে যাইতে পারে নাই। বিষ্ণুপ্রিয়া এখানে থাকিবার সময় শঙ্কর বোধ হয় সাহস পাইত না, বিষ্ণুপ্রিয়া দার্জিলিং চলিয়া গেলে একদিন বিকালে সে এ বাড়িতে আসিল।

শ্যামা বারান্দায় তরকারি কুটিতেছিল, বিধান কাছেই দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া ছেলেদের একটা ইংরাজি গল্পের বই পড়িতেছিল, মুখ তুলিয়া শঙ্করকে দেখিয়া সে আবার পড়ায় মন দিল।

শঙ্করকে বসিতে দিয়া শ্যামা বলিল, কে এসেছে দ্যাখ খোকা।

বিধান শুধু বলিল, দেখেছি।

বিধান কি আজও সে অপমান ভোলে নাই, বন্ধু বাড়ি আসিয়াছে তার সঙ্গে সে কথা বলিবে না? লাজুক শঙ্করের মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল, শ্যামা টান দিয়া বিধানের বই কাড়িয়া লইল, বলিল, নে, ঢের বিদ্যে হয়েছে, যা দিকি দুজনে দোতলায়, বাতাস লাগবে একটু,—যা গরম এখানে!

বিধান আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে গিয়া বসিল। শ্যামা বলিল, তোমাদের ঝগড়া হয়েছে নাকি শঙ্কর?—ও বুঝি কথা বলে না তোমার সঙ্গে? কী পাগল ছেলে!—না বাবা, যেও না তুমি, পাগলটাকে আমি ঠিক করে দিচ্ছি।

ঘরে গিয়া শ্যামা ছেলেকে বোঝায়। বলে যে শঙ্করের কী দোষ? শঙ্কর তো তাদের অপমান করে নাই, যে বাড়ি বহিয়া ভাব করিতে আসে তার সঙ্গে কি এমন ব্যবহার করিতে হয়? ছি! কিন্তু এ তো বোঝানোর ব্যাপার নয়, অন্ধ অভিমানকে যুক্তি দিয়া কে দমাইতে পাবে? ছেলেকে শ্যামা বাহিরে টানিয়া আনে, সে মুখ গোঁজ করিয়া থাকে। শঙ্কর বলে, আমি যাই মাসিমা।

আহা বেচারির মুখখানা ম্লান হইয়া গিয়াছে!

শ্যামা রাগিয়া বলে, ছি খোকা ছি, এ কী ছোটো মন তোর, এ কী ছোটোলোকর মতো ব্যবহার? যা তুই আমার সামনে থেকে সরে!—বোসো বাবা তুমি, কটা কথা শুধোই,—দিদি পত্র দিয়েছে? সেখানে ভালো আছে সব? তুমি যাবে না দার্জিলিং স্কুল বন্ধ হলে?

শ্যামা শঙ্করের সঙ্গে গল্প করে, হাঁটুতে মুখ গুঁজিয়া বিধান বসিয়া থাকে, কী ভয়ানক কথা ছেলেকে সে বলিয়াছে শ্যামার তা খেয়ালও থাকে না। তারপর বিধান হঠাৎ কাঁদিয়া ছুটিয়া দোতলায় চলিয়া যায়, লাজুক শঙ্কর বিব্রত হইয়া বলে, কেন বকলেন ওকে?—বলিয়া উশখুশ করিতে থাকে।

তারপর সেও উপরে যায়। খানিক পরে শ্যামা গিয়া দেখিয়া আসে, দুজনে গল্প করিতেছে।

সেই যে তাহাদের ভাব হইয়াছিল, তারপর শঙ্কর প্রায়ই আসিত। শঙ্করের ক্যারাম বোর্ডটি পড়িয়া থাকিত ও বাড়িতেই।

উপরে খোলা ছাদে বসিয়া সারা বিকাল তাহারা ক্যারাম খেলিত। বন্ধে তাহার সহিত বিধানের দার্জিলিং যাওয়ার কথাটা শঙ্করই তুলিয়াছিল, বিষ্ণুপ্রিয়া ইহা পছন্দ করিবে না জানিয়াও শ্যামা আপত্তি করে নাই, তেমন আদরযত্ন বিধান না হয় নাই পাইবে, সেখানে অতিথি ছেলেটিকে পেট ভরিয়া খাইতে তো বিষ্ণুপ্রিয়া দিবেই? কিন্তু রাজি হইল না বিধান। একসঙ্গে দার্জিলিং গিয়া থাকার কত লোভনীয় চিত্রই যে শঙ্কর তার সামনে আঁকিয়া ধরিল, বিধানকে বাঁকানো গেল না। যথাসময়ে শঙ্কর চলিয়া গেল সেই শীতল পাহাড়ি দেশে, এখানে বিধানের দেহ গরমে ঘামাচিতে ভরিয়া গেল।

মনে মনে শ্যামা বড়ো কষ্ট পাইল, অভাব-অনটনের অভিজ্ঞতা জীবনে তাহার পুরানো হইয়া আসিয়াছে, এমন দিনও তো গিয়াছে যখন সে ভালো করিয়া দেহের লজ্জাও আবরণ করিতে পারে নাই কিন্তু আজ পর্যন্ত চারটি সন্তানের কোনো বড়ো সাধ শ্যামা অপূর্ণ রাখে নাই,—আকাশের চাঁদ চাহিবার সাধ নয়, শ্যামার ছেলেমেয়ে অসম্ভব আশা রাখে না; শ্যামার মতো গরিবের পক্ষে পূরণ করা হয়তো কিছু কঠিন এমনি সব সাধারণ শখ, সাধারণ আবদার। বিধান একবার সাহেবি পোশাক চাহিয়াছিল, তাদের ক্লাসের পাঁচছটি ছেলে যে রকম বেশ ধরিয়া স্কুলে আসে, দোতলায় ঘরের জন্য ইটসুরকি কিনিয়া শ্যামা তখন ফতুর হইয়া গিয়াছে। তবু ছেলেকে পোশাক তো সে কিনিয়া দিয়াছিল।

শ্যামার চোখে আজকাল সবসময় একটা ভীরুতার আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। শীতলের উপরেও কোনোদিন সে নিশ্চিন্ত নির্ভর রাখিতে পারে নাই, কমল প্রেসের চাকরিতে শীতল যখন ক্রমে ক্রমে উন্নতি করিতেছিল তখনও নয়, তবু তখন মনে যেন তাহার একটা জোর ছিল। আজ সে জোর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। চোরের বউ? জীবনে এ ছাপ তাহার ঘুচিবে না, স্বামীর অপরাধে মানুষ তাহাকে

অপরাধী করিয়াছে, কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেহ সাহায্য দিবে না, সকলেই তাহাকে পরিহার করিয়া চলিবে। যদি প্রয়োজনও হয় ছেলেমেয়েদের দুবেলার আহার সংগ্রহ করিবার সংগত উপায় খুঁজিয়া পাইবে না, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলে যাহাকে এড়াইয়া চলিতে চায় নিজের পায়ে ভব দিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা সে করিবে কীসের ভরসায়? বিধবা হইলেও সে বোধ হয় এতদুর নিরুপায় হইত না। দুবছর পরে শীতল হয়তো ফিরিয়া আসিবে, হয়তো আসিবে না। আসিলেও শ্যামার দুঃখ সে কি লাঘব করিতে পারিবে? নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া কতকাল শীতল অলস অকর্মণ্য হইয়া বাড়ি বসিয়াছিল, সে ইতিহাস শ্যামা ভোলে নাই। তবু, তখন শীতলেব বয়স কম ছিল, মন তাজা ছিল। এই বয়সে দুবছব জেল খাটিয়া আসিযা আর কি সে এত বড়ো সংসারের ভার গ্রহণ কবিতে পারিবে? নিজেই হয়তো সে ভাব হইয়া থাকিবে শ্যামার।

এক আছে মামা। সেও আবার খাঁটি একটি রহস্য, ধরাছোঁয়া দেয় না। কখনও শ্যামার আশা হয মামা বুঝি লাখপতিই হইতে চলিয়াছে, কখনও ভয় হয় মামা সর্বনাশ কবিয়া ছাড়িবে। সংসারে শ্যামা মানুষ দেখিয়াছে অনেক, এ রকম খাপছাড়া অসাধারণ মানুষ একজনকেও তো সে স্থায়ী কিছু করিতে দেখে নাই। সংসারে সেটা যেন নিয়ম নয়। সাধারণ মোটা-বুদ্ধি সাবধানি লোকগুলিই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে, শীতলেব মতো যারা পাগলা, মামার মতো যারা খেয়ালি, হঠাৎ একদিন দেখা যায় তারাই ফাঁকিতে পড়িয়াছে। জীবন তো জুয়াখেলা নয়।

স্কুল খুলিবাব কয়েকদিন পবে শঙ্কর দার্জিলিং হইতে ফিবিয়া আসিল। শ্যামার সাদব অভ্যর্থনা বোধ হয তাহার ভালো লাগিত, একদিন সে দেখা করিতে আসিল শ্যামাব সঙ্গে। শ্যামা দেখিয়া অবাক, পকেটে ভবিয়া সে দার্জিলিং-এর কয়েক বকম তরকাবি লইযা আসিয়াছে। বিধান তখন দোকানে গিয়াছিল, হাতের কাজ ফেলিয়া বাখিয়া শ্যামা শঙ্করেব সঙ্গে আলাপ কবিল। বকুল নামিয়া আসিল নীচে, মাব গা ঘেঁষিয়া বসিয়া বড়ো বড়ো চোখ মেলিয়া সে সবিস্ময়ে শঙ্করেব দার্জিলিং বেড়ানোব গল্প শুনিল। শুধু বিধানকে নয়, শঙ্কর বকুলকেও ভালোবাসে। কেবল সে বড়ো লাজুক বলিয়া বিধানেব কাছে যেমন বকুলের কাছে তেমনি ভালোবাসা কোথায় লুকাইবে ভাবিয়া পায় না। পকেটে ভবিয়া সে কি শ্যামার জন্য শুধু তরকারিই আনিয়াছে? মুখ লাল কবিযা বকুলেব জিনিসও সে বাহির করিয়া দেয়। কে জানিত দার্জিলিং গিযা বকুলের কথা সে মনে রাখিবে?

শ্যামা বড়ো খুশি হয়। সোনার ছেলে, মানিক ছেলে। কী মিষ্টি স্বভাব? আম কাটিযা শ্যামা তাহাকে খাইতে দেয়, তারপর বঙিন স্ফটিকেব মালা গলায় দিযা বকুল গলগল করিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে দেখিয়া হাসিমুখে কাজ করিতে যায়, পাঁচ মিনিট পরে দেখিতে পায় দুজনে দোতলায় গিয়াছে। রাণীকে শোনাইযা শ্যামা বলে, বড়ো ভালো ছেলে রাণী, একটু অহংকার নেই। তারপর দোতলায় দুমদাম করিয়া ওদের ছুটাছুটির শব্দ ওঠে, বকুলের অজস্র হাসি ঝরনার মতো নীচে ঝরিয়া পড়ে, এ ওর পিছনে ছুটিতে-ছুটিতে একবার তাহাবা একতলাটা পাক দিয়া যায়, দুরন্ত মেয়েটাব পাল্লায় পড়িযা লাজুক শঙ্করও যেন দুরন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন বিধান স্কুলে চলিয়া গেলে শ্যামা বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে দেখা কবিতে গেল। দাসী তখন স্নানের আগে বিষ্ণুপ্রিয়ার চুলে গন্ধ তেল দিতেছিল, চওড়া-পাড় কোমল শাড়িখানি লুটাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া আনমনে বসিযাছিল শ্বেতপাথরেব মেঝেতে, কে বলিবে সেও জননী। এত বয়সে ওর ঢং দেখিয়া মনে মনে শ্যামার হাসি আসে,—প্রথম কন্যার জন্মের পর ও আবার সন্ন্যাসিনী সাজিয়াছিল! আজ প্রতিদিন তিনটি দাসী মিলিয়া ওই স্থূল দেহটাকে ঘষিযা মাজিযা ঝকঝকে করিবাব চেষ্টায় হয়রান হয়। গালে রংটং দেয নাকি বিষ্ণুপ্রিয়া?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল, বসো।

শ্যামা মেঝোতেই বসিয়া বলিল, কবে ফিরলেন দিদি? দিব্যি সেরেছে শরীর, রাজরানির মতো রূপ করে এসেছেন, রং যেন আপনার দিদি ফেটে পড়ছে।.. অসুখ শরীর নিয়ে হাওয়া বদলাতে গেলেন, আমরা এদিকে ভেবে মরি কবে দিদি আসবেন, খবর পেয়ে ছুটে এসেছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া হাই তুলিল, উদাস ব্যথিত হাসির সঙ্গে বলিল, এসেই আবার গরমে শরীরটা কেমন কেমন করছে, উঠতে বসতে বল পাইনে, বেশ ছিলাম সেখানে,—খুকি তো কিছুতে আসবে না, কিন্তু ইস্কুল-টিস্কুল সব খুলে গেল, কত আর কামাই করবে? তাই সকলকে নিয়ে চলেই এলাম।

দার্জিলিং-এ শুনেছি খুব শীত?—শ্যামা বলিল।

শীত নয়? শীতের সময় বরফ পড়ে!—বিষ্ণুপ্রিয়া বলিল।

এ কথা-সে কথা হয়, ভাঙা-ভাঙা ছাড়া-ছাড়া আলাপ। শ্যামার খবর বিষ্ণুপ্রিয়া কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। শ্যামার ছেলেমেয়েরা সকলে কুশলে আছে কিনা, শ্যামার দিন কেমন করিয়া চলে জানিবার জন্য বিষ্ণুপ্রিয়ার এতটুকু কৌতূহল দেখা যায় না। শ্যামার বড়ো আপশোশ হয়। কে না জানে বিষ্ণুপ্রিয়া যে একদিন তাহাকে খাতির করিত সেটা ছিল শুধু খেয়াল, শ্যামার নিজের কোনো গুণের জন্য নয়! বড়োলোকের অমন কত খেয়াল থাকে। শ্যামাকে একটু সাহায্য করিতে পারিলে বিষ্ণুপ্রিয়া যেন কৃতার্থ হইয়া যাইত। না মিটাইতে পারিলে বড়োলোকের খেয়াল নাকি প্রবল হইয়া ওঠে শ্যামা শুনিয়াছে, আজ দুঃসময়ে [illegible] শ্যামার জন্য কিছু করিবার শখ বিষ্ণুপ্রিয়ার কোথায় গেল? তারপর হঠাৎ একসময় শ্যামার একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়, মনে হয় বিষ্ণুপ্রিয়া যেন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। কিছু কিছু সাহায্য বিষ্ণুপ্রিয়া তাহাকে করিবে, কিন্তু আজ নয়,—শ্যামা যেদিন ভাঙিয়া পড়িবে, কাঁদিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া ভিক্ষা চাহিবে, এমন সব তোষামোদের কথা বলিবে ভিখারির মুখে শুনিতেও মানুষ যাহাতে লজ্জা বোধ করে,—সেইদিন।

বাড়ি ফিরিয়া শ্যামা বড়ো অপমান বোধ করিতে লাগিল, মনে মনে বিষ্ণুপ্রিয়াকে দুটি-একটি শাপান্তও করিল। তবু, একদিক দিয়া সে যেন খুশিই হয়, একটু যেন আরাম বোধ করে। অন্ধকার ভবিষ্যতে এ যেন ক্ষীণ একটি আলোক, বিষ্ণুপ্রিয়ার এই অপমানকর নিষ্ঠুর প্রত্যাশা। একান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িলে বিষ্ণুপ্রিয়ার হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদাকাটা করিয়া সাহায্য আদায় করা চলিবে এ চিন্তা আঘাত করিয়াও শ্যামাকে যেন সান্ত্বনা দেয়।

দিনগুলি এমনিভাবে কাটিতে লাগিল। আকাশে ঘনাইয়া আসিল বর্ষার মেঘ, মানুষের মনে আসিল সজল বিষণ্ণতা। কদিন ভিজিতে ভিজিতে স্কুল হইতে বাড়ি ফিরিয়া বিধান জ্বরে পড়িল, হারাণ ডাক্তার দেখিতে আসিয়া বলিল ইনফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে। রোজ একবার করিয়া বিধানকে সে দেখিয়া গেল। আজ পর্যন্ত শ্যামার ছেলেমেয়ের অসুখে-বিসুখে অনেকবার হারাণ ডাক্তার এ বাড়ি আসিয়াছে, শ্যামা কখনও টাকা দিয়াছে কখনও দেয় নাই। এবার ছেলে ভালো হইয়া উঠিলে একদিন সে হারাণ ডাক্তারের কাছে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, বাবা, এবার তো কিছুই দিতে পারলাম না আপনাকে?

হারাণ বলিল, তোমার মেয়েকে দিয়ে দাও, আমাদের বকুলরাণীকে?

কান্নার মধ্যে হাসিয়া শ্যামা বলিল, তা নিন, এখুনি নিয়ে যান।

শ্যামার জীবনে এই আরেকটি রহস্যময় মানুষ। শীর্ণকায় তিরিক্ষে মেজাজের লোকটির মুখের চামড়া যেন পিছন হইতে কীসে টান করিয়া রাখিয়াছে, মনে হয় মুখে যেন চকচকে পালিশ করা গাম্ভীর্য। সর্বদা কী যেন সে ভাবে, বাস যেন সে করে একটা গোপন সুরক্ষিত জগতে,—সংসারে মানুষের মধ্যে চলাফেরা কথাবার্তা যেন তাহার কলের মতো, আন্তরিকতা নাই অথচ কৃত্রিমও নয়। শ্যামার কাছে সে যে টাকা নেয় না এর মধ্যে দয়ামায়ার প্রশ্ন নাই, মহত্ত্বের কথা নাই, টাকা শ্যামা দেয় না বলিয়াই সে যেন নেয় না অন্য কোনো কারণে নয়। শ্যামা দুরবস্থায় পড়িয়াছে এ কথা কখনও সে কি ভাবে?

মনে হয় বকুলকে বুঝি হারাণ ডাক্তার ভালোবাসে। শ্যামা জানে তা সত্য নয়। এ বাড়িতে আসিয়া হারাণের বুঝি অন্য এক বাড়ির কথা মনে পড়ে, শ্যামা আর বকুল বুঝি তাহাকে কাদের কথা মনে পড়াইয়া দেয়। বকুলকে কাছে টানিয়া হারাণ যখন তাহার মুখের দিকে তাকায় শ্যামাও যেন তখন আর একজনকে দেখিতে পায়, গায়ে শ্যামার কাঁটা দিয়া ওঠে। এ বাড়িতে রোগী দেখিতে আসিবার জন্য হারাণ তাই লোলুপ, একবার ডাকিলে দশবার আসে, না ডাকিলেও আসে। মানুষকে অপমান না কবিয়া যে কথা বলিতে পারে না, বোগীব অবস্থা সম্বন্ধে আত্মীয়ের ব্যাকুল প্রশ্নে পর্যন্ত যে সময় সময় আগুনের মতো জ্বলিয়া ওঠে, বহুদিন আগে শ্যামার কাছে সে পোষ মানিয়াছিল। শ্যামা তখন হইতে সব জানে। একটা হাবানো জীবনের পুনরাবৃত্তি এইখানে হারাণেব আরম্ভ হইযাছিল, একান্ত পৃথক, একান্ত অমিল পুনরাবৃত্তি, তা হোক, তাও হারাণের কাছে দামি। শ্যামা ছিল হারাণেব মেয়ে সুখময়ীর ছায়া, সুখময়ীর কথা শ্যামা শুনিয়াছে। এই ছায়াকে ধরিয়া হারাণ শ্যামার সমান বযসের সময় হইতে সুখময়ীর জীবনস্মৃতির বাস্তব অভিনয় আবিষ্কাব করিয়াছে,—বকুলের মতো একটি মেয়েও নাকি সুখময়ীর ছিল। শ্যামার ছেলেরা তাই হারাণের কাছে মূল্যহীন, ওদের দিকে সে চাহিয়াও দ্যাখে না। এ বাড়িতে আসিয়া শ্যামা ও বকুলকে দেখিবার জন্য সে ছটফট কবে।

অথচ শ্যামা ও বকুলকে সে স্নেহ কবে কিনা সন্দেহ। ওরা তুচ্ছ, ওরা হারাণের কেউ নয়, হাবাণ পুলকিত হয় শ্যামার কণ্ঠ ও কথা বলার ভঙ্গিতে,—শ্যামার চলন দেখিয়া, বকুলের দুরন্তপনা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া তাহার মোহের সীমা থাকে না। মমতা যদি হারাণের থাকে তাহা অবাস্তবতার প্রতি,—শ্যামাব উচ্চারিত শব্দ ও কয়েকটি ভঙ্গিমায় এবং বকুলের প্রাণেব প্রাচুর্যে,—মানুষ দুটিকে হারাণ কখনও ভালোবাসে নাই, শোকে যে এমন জীর্ণ হইয়াছে সে কবে রক্তমাংসেব মানুষকে ভালোবাসিতে পারিয়াছে?

শ্যামা তাই হারাণেব সঙ্গে আত্মীযতা করিতে পারে নাই, হাবাণেব কাছে অনুগ্রহ দাবি করিতে আজও তাহাব লজ্জা কবে। বিধানের চিকিৎসা ও ওষুধের বিনিময়ে কাঞ্চনমুদ্রা দিবাব অক্ষমতা জানাইবাব সময হারাণ ডাক্তাবের কাছে শ্যামা তাই কাঁদিয়া ফেলিল।

বিধানেব পব অসুখে পড়িল বকুল। বকুলেব অসুখ? বকুলেব অসুখ এ বাড়িতে আশ্চর্য ঘটনা। মেয়েকে লইয়া পালাইয়া গিয়া সেই যে শীতল তাহার জ্বর করিযা আনিয়াছিল সে ছাড়া জীবনে বকুলের কখনও সামান্য কাশিটুকু পর্যন্ত হয় নাই, রোগ যেন পৃথিবীতে ওর অস্তিত্বেব সংবাদই রাখিত না। সেই বকুলের কী অসুখ হইল এবার? ছোটোখাটো অসুখ তো ওব শরীবে আমল পাইবে না। প্রথম কদিন দেখিতে আসিয়া হারাণ ডাক্তাব কিছু বলিল না, তারপর বোগেব নামটা শুনাইয়া শ্যামাকে সে আধমরা করিয়া দিল। বকুলেব টাইফয়েড হইয়াছে।

জান মা, এই যে কলকেতা শহর এ হল টাইফয়েডেব ডিপো, এবার যা শুরু হয়েছে চাদ্দিকে জীবনে এমন আর দেখিনি, তিরিশ বছর ডাক্তারি করছি সাতটি টাইফয়েডের রোগীর চিকিচ্ছে কখনও আর করিনি একসঙ্গে,—এই প্রথম।

এমনি, ছেলেদেব চেয়ে বকুলের সম্বন্ধে শ্যামা ঢের বেশি উদাসীন হইযা থাকে, সেবাযত্নের প্রয়োজন মেয়েটার এত কম, নিজের অস্তিত্বের আনন্দেই মেয়েটা সর্বদা এমন মশগুল যে ওর দিকে তাকানোর দরকাব শ্যামার হয় না। কিন্তু বকুলের কিছু হইলে শ্যামা সুদসমেত তাহাকে তাহার প্রাপ্য ফিরাইয়া দেয়, কী যে সে উতলা হইয়া ওঠে বলিবার নয়। বকুলের অসুখে সংসার তাহার ভাসিয়া গেল, কে রাঁধে কে খায, কোথা দিয়া কী ব্যবস্থা হয় কোনোদিকে আর নজর রহিল না, অনাহারে অনিদ্রায় সে মেয়েকে লইয়া পড়িয়া রহিল। এদিকে রাণীও বকুলের প্রায় তিনদিন পরে একই রোগে শয্যা লইল। মামা কোথা হইতে একটা খোট্টা চাকর আর উড়িয়া বামুন জোগাড় করিয়া আনিল, পোড়া ভাত আর অপক্ক ব্যঞ্জন খাইয়া মামা বিধান আর মণির দশা হইল রোগীর মতো, শ্যামার কোলের

ছেলেটি অনাদরে অনাদরে মরিতে বসিল। বালক ও শিশুদের চেয়ে কষ্ট বোধ হয় হইল মামারই বেশি। দায়িত্ব, কর্তব্য আর পরিশ্রম, মামার কাছে এই তিনটিই ছিল বিষের মতো কটু, মামা একেবারে হাঁপাইয়া উঠিল। এতকাল শ্যামার সচল সংসারকে এখানে ওখানে সময়-সময় একটু ঠেলা দিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, এবার অচল বিপর্যস্ত সংসারটি মামাকে যেন গ্রাস করিয়া ফেলিতে চাহিল, তারপর রহিল অসুখের হাঙ্গামা, ছুটাছুটি, রাতজাগা, দুর্ভাবনা এবং আরও কত কিছু। ওদিকে রাণীর খবরটাও মাঝে মাঝে মামাকে লইতে হয়, ন-দিনের দিন মামা লুকাইয়া কলিকাতা হইতে একজন ডাক্তার আনিয়াছিল, রাণীর কতগুলি খারাপ উপসর্গ দেখা দিয়াছে, সে বাঁচিবে কিনা সন্দেহ। দীর্ঘ যাযাবর জীবনে ভদ্র-অভদ্র মানুষের ভেদাভেদ মামার কাছে ঘুচিয়া গিয়াছিল, কত অস্পৃশ্য পরিবারের সঙ্গে মামা সপ্তাহ মাস পরমানন্দে যাপন করিয়াছে,—যেটুকু ভাসাভাসা স্নেহ করিবার ক্ষমতা মামার আছে রাণী কেন তাহা পাইবে না? রাণী মরিবে জানিয়া মামার ভালো লাগে না, বহুকাল আগে শ্যামার বিবাহ দিয়া শূন্য ঘরে যে বেদনা ঘনাইয়া আসিয়া মামাকে গৃহছাড়া করিয়াছিল যেন তারই আভাস মেলে। আর বকুল? শ্যামার মেয়েটাকে নিস্পৃহ সন্ন্যাসী মামা কী এত ভালোবাসিয়াছে যে ওর রোগ-কাতর মুখখানি দেখিলে সে পীড়া বোধ করে, তাহার ছুটিয়া পালাইতে ইচ্ছা হয় অরণ্যে প্রান্তরে, দূরতম জনপদে,—মানুষের হৃদয় যেখানে স্বাধীন, শোক-দুঃখ-স্নেহ-ভালোবাসার সঙ্গে মানুষের যেখানে সম্পর্ক নাই? মামার মু[illegible] শ্যামা সময়-সময় ভয় পাইয়া যায়। বকুলের অসুখের কদিনেই মামা যেন আরও বুড়া হইয়া পড়িয়াছে। মিনতি করিয়া মামাকে সে বিশ্রাম করিতে বলে, যুক্তি দেখাইয়া বলে যে মামার যদি কিছু হয় তবে আর উপায় থাকিবে না। কিন্তু মামা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে সে বিশ্রাম
যদি কিছু হয় তবে আর উপায় থাকিবে না। কিন্তু মামা যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গিয়াছে সে বিশ্রাম
করিতে পারে না, প্রয়োজনের খাটুনি খাটিয়া তো মারা হয়ই, বিনা প্রয়োজনেও খাটিয়া মরে।

রাণী যথা সময়ে মারা গেল, বকুলের সেদিন জ্বর ছাড়িয়াছে। বর্ষার সেটা খাপছাড়া দিন,—কী রোদ বাহিরে, মেঘশূন্য কী নির্মল আকাশ! কেবল শ্যামার নিদ্রাতুর আরক্ত চোখে জল আসে। একদিন শ্যামা যেন ছিল একটা কামনার রূপক, সন্তানকে সুস্থ করার একটি জ্বলন্ত ইচ্ছা-শিখা,—আজ তাহাকে চেনা যায় না। চোদ্দোদিনে বকুলের জ্বর ছাড়িয়াছে? কী[illegible] চোদ্দোদিন,—চোদ্দোযুগ!

শ্রাবণের শেষে মামা একদিন দোকানটা বেচিয়া দিল। দোকান-করা মামার পোষাইল না। ভদ্রলোকে দোকান করিতে পারে? শ্যামা হাসিয়া বলিল, তখনি বলেছিলাম মামা, দিও না দোকান, তুমি কেন দোকান চালাতে পারবে?—কত টাকা লোকসান দিলে?

মামা বলিল, লোকসান দেব আমি? কী যে তুই বলিস শ্যামা!

তা হলে কত টাকা লাভ হল তাই বল?

না লাভ হয়নি, টায়টায় দেনাপাওনায় মিল খেয়েছে, বাস্। যে দিনকাল পড়েছে শ্যামা, আমি বলে তাই, আর কেউ হলে ঘর থেকে টাকা ঢেলে খালি হাতে ফিরে আসত, কত কোম্পানি এবার লালবাতি জ্বেলেছে জানিস?

দোকান বেচিয়া মামা এবার করিবে কী? যে দুর্নির্ণেয় উৎস হইতে দরকার হইলেই দশ বিশটা টাকা উঠিয়া আসে, চিরকাল তাহা টিকিবে তো? মামা কিছু বলে না। করুণভাবে মামা শুধু একটু হাসে, উৎসুক চোখে আকাশের দিকে তাকায়। শরৎ মানুষকে ঘরের বাহির করে, বর্ষান্তে নবযৌবনা ধরণীর সঙ্গে মানুষের পরিচয় কাম্য, কিন্তু বর্ষা তো এখনও শেষ হয় নাই মামা, ওই দ্যাখো আকাশে নিবিড় কালো সজল মেঘ, শরৎ কোথায় যে তুমি দেশে দেশে নিজের মনের মৃগয়ায় যাইতে চাও? মামার বিষণ্ন হাসি, উৎসুক চোখ, শ্যামাকে ব্যথা দেয়। শ্যামা ভাবে, কিছু করিতে না পারিয়া হার মানার দুঃখে মামা ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে, ভাগনির ভার লইবে বলিয়া অনেক আস্ফালন করিয়াছিল

কিনা এখন তাহার লজ্জা আসিযাছে। চোরের মতো মামা তাই অস্বস্তিতে উশখুশ করে। আহা বুড়া মানুষ, সারাটা জীবন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাটাইয়া আসিয়া সংসারের পাকা, উপার্জনে অভ্যস্ত লোকগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেন পারিয়া উঠিবে? টাকা তো পথে ছড়ানো নাই। ঘরে ঘরে যুবক বেকার হাহাকার করিতেছে। যাট বছরের ঘরছাড়া বিবাগি এতগুলো প্রাণীর জীবিকা অর্জনের পথ খুঁজিয়া পাইবে কোথায়? শ্যামা বড়ো মমতা বোধ করে। বলে, অত ভেবো না মামা, ভগবান যাহোক একটা উপায় করবেন।

ভগবান? মামার বোধ হয় ভগবানের কথা মনে ছিল না। ভগবান যে মানুষের যাহোক একটা উপায় করেন এও বোধ হয় এতদিন তাহার খেয়াল থাকে নাই। শ্যামা মনে পড়াইয়া দিলে মামা বোধ হয় নিশ্চিন্ত মনেই শ্যামা ও তাহার চারটি সন্তানকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করিয়া ভাদ্রের তিন তারিখে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। যাওয়ার আগে শুধু বলিয়া গেল, কিছু মনে করিস নে শ্যামা, তোর সেই হাজার টাকাটা খরচ করে ফেলেছি,—শ দেড়েক মোটে আছে, নে। বুড়ো মামাকে শাপ দিসনে মা, একটি টাকা মোটে আমি সঙ্গে নিলাম।

শাপ শ্যামা দেয় নাই, পাগলের মতো কী যেন সব বলিয়াছিল। কথাগুলি মিষ্টি নয়, কোনো ভাগনিই সাধারণত মামাকে ও সব কথা বলে না। ক্যাম্বিসের ব্যাগটি হাতে করিয়া কম্বলের গুটানো বিছানাটি বগলে করিয়া মামা যখন চলিয়া গেল, শ্যামা তখনও পাগলের মতো কী সব যেন বলিতেছে।

সাত

পরের বছর শরৎকালে,—শ্যামা প্রথম সন্তানের জননী হওয়ার সময় পৃথিবীতে শরৎকালটা যেমন ছিল এখনও তেমনি থাকার মতো আশ্চর্য শরৎকাল,—ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া শ্যামা বনগাঁ গেল। বলিল, ঠাকুরঝি, আমার আর তো কোথাও আশ্রয় নেই, খেতে না পেয়ে আমার ছেলেমেয়ে মরে যাবে, ওদের তুমি দুটি দুটি খেতে দাও, আমি তোমার বাড়ি দাসী হয়ে থাকব।

মন্দা মুখভার করিয়া বলিল, এসেছ থাকো, ও সব বোলো না বউ। তোমাদের কথা আমি ভালোবাসিনে।

শ্যামা বনগাঁয়ে রহিয়া গেল।

শ্যামার গত বছরের ইতিহাস বিস্তারিত লিখিলে সুখপাঠ্য হইত না বলিয়া ডিঙাইয়া আসিয়াছি! এ তো দারিদ্র্যের কাহিনি নয়। শ্যামা যে একবার দুদিন উপবাস করিয়াছিল সে কথা লিখিয়া কী হইবে? ব্রতপূজা করিয়া কত জননী অমন অনেক উপবাস করে, শ্যামা খাদ্যের অভাবে করিয়াছিল বলিয়া তো উপবাসের সঙ্গে উপবাসের পার্থক্য জন্মিয়া যাইবে না? শ্যামার গহনাগুলি গিয়াছে, বিবাহের সময় মামা শ্যামাকে প্রায় হাজার টাকার গহনাই দিয়াছিল, নিজের প্রেস বিক্রয় করিয়া শীতলের দীর্ঘকাল বেকার বসিয়া থাকার সময় চুড়ি হার বালা আর নাক ও কানের দুটি একটি ছুটকো গহনা ছাড়া বাকি সব গিয়াছিল, কমল প্রেসের চাকরির সময় দোতলায় ঘর তুলিবার ঝোঁকে শ্যামা টাকা জমাইয়াছে, হাঙরমুখো পুরানো প্যাটার্নের বালা ভাঙিয়া আর একটু ভারী তারের বালা গড়ানো ছাড়া নতুন কোনো গহনা সে কখনও করে নাই। এক বছরেই তাই ঘরের বিক্রয়যোগ্য আসবাবের সঙ্গে শ্যামার গহনাগুলিও গিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে একটি আংটি আর দুহাতে দুগাছি চুড়ি।

বিধানকে বড়োলোকের স্কুল হইতে ছাড়াইয়া কাশীপুরের সাধারণ স্কুলটিতে ভর্তি করিয়া দিয়াছিল, বিধান হাঁটিয়াই স্কুলে যাইত। ধোপার সঙ্গে শ্যামা কোনো সম্পর্ক রাখিত না, বাড়িতে সিদ্ধ করিয়া কাপড়জামা সাফ করিত,—কাপড়জামা দুই সে কিনিত কমদামি মোটা, টিকিত অনেকদিন। খোকার জন্য দুধ কিনিত এক পোয়া, দুবছর বয়সের আগেই খোকা দিব্যি ভাত খাইতে শিখিয়াছিল,

পেট ভরিয়া খাইয়া টিংটিংয়ে পেটটি দুলাইয়া দুলাইয়া শ্যামার পিছুপিছু সে হাঁটিয়া বেড়াইত,—শ্যামা তাহাকে স্তন দিত সেই অপরাহ্নে, সারাদিন বুকে যে দুধটুকু জমিত বিকালে তাহাতেই খোকার পেট ভরিয়া যাইত। কত হিসাব ছিল শ্যামার, ব্যাপক ও বিস্ময়কর! ভাতের ফেনটুকু রাখিলে যে ভাতের পুষ্টি বাড়ে এটুকু পর্যন্ত সে খেয়াল রাখিত। তাহার এই আশ্চর্য হিসাবের জন্য ছোটো খোকার পেটটা একটু বড়ো হওয়া ছাড়া ছেলেমেয়েদের কারও শরীর তেমন খারাপ হয় নাই। রোগা হইয়াছে শুধু শ্যামা। শেষের দিকে শ্যামার যে মখমলের মতো মসৃণ উজ্জ্বল চামড়াটি দেখা দিয়াছিল তাহা মলিন বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক বছরে কারও বয়স এক বছরের বেশি বাড়ে না, শ্যামারও বাড়ে নাই, কিন্তু তাহাকে দেখিয়া কে তাহা ভাবিতে পারিবে। গত যে বসন্ত ব্যর্থ গিয়াছে তার আগেরটি উতলা করিয়াছিল কোন শ্যামাকে? বনগাঁয়ে এই যে শীর্ণা নিষ্প্রভজ্যোতি শ্রান্ত নারীটি আসিয়াছে, শহরতলির সেই বাড়িটির দোতলায় সমাপ্তপ্রায় নতুন ঘরটির ছায়ায় দাঁড়াইয়া বসন্তের বাতাসে ধানকলের ছাই উড়িতে দেখিয়া জেলের কয়েদি স্বামীর জন্য এরই যৌবন কি ক্ষোভ করিয়াছিল?

শেষের দিকে হারাণ ডাক্তার বারো টাকা ভাড়ায় একতলাতে একটি ভাড়াটে জুটাইয়া দিয়াছিল, সরকারি আপিসের এক কেরানি, সম্প্রতি স্ত্রী ও শিশুপুত্র লইয়া দাদার সঙ্গে পৃথক হইয়া আসিয়াছে। কেরানি বটে কিন্তু বড়োই তাহারা বিলাসী। হাঁড়িকলসি, পুরানো লেপ-তোশক, ভাঙা রংচটা বাক্সো প্রভৃতিতে শ্যা... ঘর ভরা থাকিত, ওরা আসিয়া ঝকঝকে সংসার পাতিয়া বসিল, জিনিসপত্র তাহাদের বেশি ছিল না কিন্তু যা ছিল সব দামি ও সুদৃশ্য। বউটি শ্যামা শুনিল বড়োলোকের মেয়ে, স্কুলেও নাকি পড়িয়াছিল, স্বাধীনভাবে একটু ফিটফাট থাকিতে ভালোবাসে—বড়ো ভাইয়ের সঙ্গে ওদের পৃথক হওয়ার কারণটাও তাই। পৃথক হইয়া বউটি যেন বাঁচিয়াছে। নিজের সংসার পাতিতে কী তাহার উৎসাহ! পথের দিকে যে ঘরে শ্যামা আগে শুইত তার জানালায় জানালায় সে নতুন পর্দা দিল, চিকন কাজ করা দামি খাটটি, বোধ হয় বিবাহের সময় পাইয়াছিল, দক্ষিণের জানালা ঘেঁষিয়া পাতিল, আয়না-বসানো টেবিলটি রাখিল ঘরে ঢুকিবার দরজার সোজা অপর দিকের দেয়ালের কাছে। খাট টেবিল আর কাঠের একটি চেয়ার তাহার সমগ্র আসবাব, তাই যেন তার ঢের। ভাঁড়ারে তাকের উপর মশলাপাতি রাখিবার কয়েকটি নতুন চকচকে টিন কাচের জার, স্টোভ, চায়ের বাসন আর দুটি-একটি টুকিটাকি জিনিস রাখিয়া, রাখিবার আর কিছুই তাহার রহিল না, সমস্ত ঘরে একটি রিক্ত পরিচ্ছন্নতা ঝকঝক করিতে লাগিল। সংসার করিতে করিতে একদিন হয়তো সে শ্যামার মতোই ঘরবাড়ি জঞ্জালে ভরিয়া ফেলিবে, শুরুতে আজ সবই তাহার আনকোরা ও সংক্ষিপ্ত। বাড়াবাড়ি ছিল শুধু তাহাদের প্রেমের। এমন নির্লজ্জ নিবিড় প্রেম শ্যামা জীবনে আর দ্যাখে নাই। বিবাহ তাহাদের হইয়াছিল চার-পাঁচ বছর আগে। এতকাল কে যেন তাহাদের প্রেমের উৎসমুখটিতে ছিপি আঁটিয়া রাখিয়াছিল, এখানে মুক্তি পাইয়া তাহা উথলিয়া উঠিয়াছে। ভালো শ্যামার লাগিত না। নিরানন্দ বিমর্ষ তাহার জীবন, সন্তানের তাহার অন্নবস্ত্রের অভাব, তারই পায়ের তলে তারই বাড়ির একতলায় এ কী বিসদৃশ প্রণয়রসরঙ্গ? কই, বয়সকালে শ্যামা তো ওরকম ছিল না? স্বামীর সঙ্গে মেয়েমানুষের এত কী ছেলেমানুষি, হাসাহাসি, খেলা ও ছলকরা কলহ? একটি ছেলে হইয়াছে, সম্মুখে অন্ধকার ভবিষ্যৎ, কত দুশ্চিন্তা কত দায়িত্ব ওদের, এমন হালকা ফাজলামিতে দিন কাটাইলে চলিবে কেন?

বউটির নাম কনকলতা। শ্যামা জিজ্ঞাসা করিত, তোমার স্বামী কত মাইনে পান?

কনক বলিত, কত আর পাবে, মাছিমারা কেরানি তো, বেড়ে-বেড়ে নব্বই-এর মতো হয়েছে—খরচ চলে না দিদি! একটা ছেলে পড়ালে আরও কিছু আসে, আমি বারণ করি,—সারাদিন আপিস করে আবার ছেলে পড়াবে ন কচু,—কী হবে বেশি টাকা দিয়ে? যা আসে তাই ঢের,—নয়? মাসের শেষে বড্ড টানাটানি পড়ে দিদি, খরচ চলে না।

কনক এমনিভাবে কথা বলিত, উলটাপালটা, পুবপশ্চিম। বলিত, একা স্বাধীনভাবে সে মহা স্ফূর্তিতে আছে, আবার বলিত একা একা থাকতে ভালো লাগে না দিদি, আত্মীয়স্বজন দু-চারটি কাছে না থাকলে বড্ড যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে,—নয়? শ্যামা বুঝিত, আনন্দে আহ্লাদে সোহাগে সে ডগমগ, কথা সে বলে না শুধু বকবক করে, ওর কথার কোনো অর্থ নাই। কনকের বয়স বোধ হয় ছিল কুড়ি-বাইশ বছর, শ্যামা যে বয়সে প্রথম মা হইয়াছিল,—এই বয়সে বউটির অবিশ্বাস্য খুকি-ভাবে শ্যামা থ বনিয়া যাইত, কেমন রাগ হইত শ্যামার। মেয়েমানুষ এমন নির্ভয়, এমন নিশ্চিন্ত, এমন আহ্লাদি? এই বুদ্ধি-বিবেচনা লইয়া সংসারে ও টিকিবে কী করিয়া? বড়োলোকের মেয়ে বুঝি এমনি অসার হয়?

তবু, বিরুদ্ধ সমালোচনা-ভরা শ্যামার মন, কী দিয়া কনক যেন আকর্ষণ করিত। চৌবাচ্চার ধারে ওরা যখন পরস্পরের গায়ে জল ছিটাইয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িত, কনকের স্বামী যখন তাহাকে শূন্যে তুলিয়া চৌবাচ্চায় একটা চুবানি দিয়া আবার বুকে করিয়া ঘরে লইয়া যাইত, খানিকপরে শুকনো কাপড় পরিয়া আসিয়া কনকের কাজের ছন্দে আবার অকাজের ছন্দ মিশিতে থাকিত তখন শ্যামার—কে জানে কী হইত শ্যামার, চোখের জল গাল বাহিয়া তাহার মুখের হাসিতে গড়াইয়া আসিত।

কনকের স্বামী আপিস গেলে সে নীচে নামিয়া বলিত, সব দেখে ফেলেছি কনক।

কনকের লজ্জা নাই, সে হাসিয়া ফেলিত,—জ্বালিয়ে মারে দিদি, আপিস গেলে যেন বাঁচি।

দোতলার ঘরখানা আর ছাদটুকু ছিল শ্যামার গৃহ, জিনিসপত্র-সহ সে বাস করিত ঘরে, রাঁধিত ছাদে, একখানা করোগেটেড টিনের নীচে। পাশে শুধু নকুড়বাবুর ছাদ নয়, আশেপাশের আরও কয়েক বাড়ির ছাদ হইতে উদয়াস্ত শ্যামার সংসারের গতিবিধি দেখা যাইত। প্রথম প্রথম অনেকগুলি কৌতূহলী চোখ দেখিতেও ছাড়িত না, যখন তখন ছাদে উঠিয়া নকুড়বাবুর বউ জিজ্ঞাসা করিত, কী করছ বকুলের মা? শ্যামা বলিত, রাঁধছি দিদি,—বলিত, সংসারের কাজকর্ম করছি দিদি,—কী রাঁধলেন এ বেলা? রাঁধিত এবং সংসারের কাজকর্ম করিত, শ্যামা আর কিছু করিত না? ধানকলের ধূমোদ্গারী চোঙটার দিকে চাহিয়া থাকিত না? রাত্রে ছেলেমেয়েরা ঘুমাইয়া পড়িলে জাগিয়া বসিয়া থাকিত না, হিসাব করিত না দিন-মাস-সপ্তাহের, টাকা-আনা-পয়সার?

উদভ্রান্ত চিন্তাও শ্যামা করিত, নিশ্বাসও ফেলিত। জননীত্ব কেমন যেন নীরস অর্থহীন মনে হইত শ্যামার কাছে। কোথায় ছিল এই চারটি জীব, কী সম্পর্ক ওদের সঙ্গে তাহার, অসহায়া স্ত্রীলোক সে, মেরুদণ্ড-বাঁকানো এ ভার তার ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে কেন? কীসের এই অন্ধ মায়া? জগজ্জননী মহামায়া কীসের ধাঁধায় ফেলিয়া তাহাকে দিয়া এত দুঃখ বরণ করাইতেছেন? সুখ কাকে বলে একদিনের জন্য সে তাহা জানিতে পারিল না, তাহার একটা প্রাণ নিঙড়াইয়া চারটি প্রাণীকে সে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে,—কেন? কী লাভ তাহার? চোখ বুজিয়া সে যদি আজ কোথাও চলিয়া যাইতে পারিত।—ওরা দুঃখ পাইবে, না খাইয়া হয়তো মরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহাতে কী আসিয়া যায় তার? সে তো দেখিতে আসিবে না। পেটের সন্তানগুলির প্রতি শ্যামা যেন বিদ্বেষ অনুভব করিত,—সব তাহার শত্রু, জন্মজন্মান্তরের পাপ। কী দশা তাহার হইয়াছে ওদের জন্য।

শেষের দিকে শ্যামা আর চালাইতে পারিত না, মাসিক বারো টাকায় এতগুলি মানুষের চলে না। তাই কুড়ি টাকা ভাড়ায় সমস্ত বাড়িটা কনকলতাকে ছাড়িয়া দিয়া সে বনগাঁয় রাখালের আশ্রয়ে চলিয়া আসিয়াছে।

বড়ো রাস্তা ছাড়িয়া ছোটো রাস্তা, পুকুরের ধারে বিঘাপরিমাণ ছোটো একটি মাঠ, লাল ইটের একতলা একটি বাড়ি ও কলাবাগানের বেড়ার মধ্যবর্তী দুহাত চওড়া পথ, তারপর রাখালের পাকা ভিত টিনের দেয়াল ও শনের ছাউনির বৈঠকখানা। তিনখানা তক্তপোশ একত্র করিয়া তার উপরে শতরঞ্চি বিছানো আছে। তিন জাতের মানুষের জন্য হুঁকা আছে তিনটি। কাঠের একটা আলমারিতে পুরাতন

বিবর্ণ দপ্তর, কাঠের একটি বাক্সের সামনে শীর্ণকায় টিকিসমেত একজন মুহুরি। রাখালের মুহুরি? নিজে সে সামান্য চাকরি করে, মুহুরি দিয়া তাহার কীসের প্রয়োজন? বাহিরের ঘরখানা দেখিলেই সন্দেহ হয় রাখালের অবস্থা বুঝি খারাপ নয়, অনেকটা উকিল-মোক্তারের কাছারি ঘরের মতো তাহার বৈঠকখানা। বৈঠকখানার পরেই বহিরঙ্গন, সেখানে দুটা বড়ো বড়ো ধানের মরাই। তারপর রাখালের বাসগৃহ, আট-দশটি ছোটোবড়ো টিনের ঘরের সমষ্টি, অধিবাসীদের সংখ্যাও বড়ো কম নয়।

কদিন এখানে বাস করিয়াই শ্যামা বুঝিতে পারিল রাখাল তাহাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, সে দরিদ্র নয়। মধ্যবিত্তও নয়। সে ধনী। চাকরি রাখাল সামান্য মাহিনাতেই করে কিন্তু সে অনেক জমিজমা করিয়াছে, বহু টাকা তাহার সুদে খাটে। রাখালের সম্পত্তি ও নগদ টাকার পরিমাণটা অনুমান করা সম্ভব নয় তবু সে যে উঁচুদরের বড়োলোক চোখ কান বুজিয়া থাকিলেও তাহা বোঝা যায়। মোটর-গাড়ি, দামি আসবাব, গৃহের রমণীবৃন্দের বিলাসিতার উপকরণ গ্রাম্য গৃহস্থের ধনবত্তার পরিচয় নয়, তাহাদের অবস্থাকে ঘোষণা করে পোষ্যের সংখ্যা, ধান মরাই, খাতকের ভিড়। রাখালের তিনটি জোড়া তক্তপোশ সকালবেলা খাতকের ভিড়ে ভরিয়া যায়।

দেখিয়া শুনিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফেলিল। রাগ ও বিদ্বেষ এবার যেন তাহাদের হইল না, অনেক অভিজ্ঞতা দিয়া শ্যামা এখন বুঝিতে পারিয়াছে রাখাল একা নয়, এমনই জগৎ। এমন করিয়া মিথ্যা বলিতে না জানিলে ছল ও প্রবঞ্চনায় এমন দক্ষতা না জন্মিলে, সকালে উঠিয়া দশ-বিশটি খাতকের মুখ দেখিবার সৌভাগ্য মানুষের হয় না। রাখালের দোষ নাই। মানুষের মাঝে মানুষের মতো মাথা উঁচু করিবার একটিমাত্র যে পন্থা আছে তাই সে বাছিয়া নিয়াছে। রাখাল তো ধর্মযাজক নয়, বিবাগি সন্ন্যাসী নয়, সে সংসারী মানুষ, সংসারে দশজনে যে ভাবে আত্মোন্নতি করে সেও তেমনিভাবে অর্থ সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছে।

শ্যামা সব জানে। বড়োলোক হইবার সমস্ত কলাকৌশল। কেবল স্ত্রীলোক করিয়া ভগবান তাহাকে মারিয়া রাখিয়াছেন!

রাখালের দ্বিতীয় পক্ষের বউ সুপ্রভাকে দেখিয়া প্রথমে শ্যামা চোখ ফিরাইতে পারে নাই। রাখালের দু বার বিবাহ করার কারণটাও তখন সে বুঝিতে পারিয়াছিল। এত রূপ দেখিলে মাথার ঠিক থাকে পুরুষ মানুষের! একটি ছেলে আর একটি মেয়ে হইয়াছে সুপ্রভার, শ্যামা আসিবার আগে সে নাকি অনেকদিন অসুখেও ভুগিয়াছিল, তবু এখনও সে ছবির মতো, প্রতিমার মতো সুন্দরী। এমন সতিন থাকিতে মন্দা যে কেমন করিয়া এখানে গৃহিণীর পদটি অধিকার করিয়া আছে, চারিদিকে সকলকে হুকুম দিয়া বেড়াইতেছে—সুপ্রভাকে পর্যন্ত, ভাবিয়া প্রথমটা শ্যামা আশ্চর্য হইয়া গিয়াছিল। তারপর সে টের পাইয়াছে যতই রূপ থাক সুপ্রভার বুদ্ধি নাই, বড়ো সে বোকা। পুতুলের মতো সে পরের হাতে নড়ে-চড়ে, সাহস করিয়া যে তাহার উপর কর্তৃত্ব করিতে যায় তারই কর্তৃত্ব স্বীকার করে, একেবারে সে মাটির মানুষ, ঘোরপ্যাঁচ বোঝে না, নিজের পাওনাগন্ডা বুঝিয়া লইতে জানে না। তবু রাখাল কিনা আজও ছোটোবউ বলিতে অজ্ঞান, মনে মনে সকলেই সুপ্রভাকে ভয় করে, এ বাড়িতে আদরের তাহার সীমা নাই। সুপ্রভা প্রভুত্ব করার চেয়ে নির্ভর করিতেই ভালোবাসে বেশি, আদর-পাওয়াটাই তার জীবনে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্য। মন্দার গৃহিণীপনার ভিত্তিও ওইখানেই,—সুপ্রভাকে সে নয়নের মণি করিয়া রাখিয়াছে। কে বলিবে সুপ্রভা তাহার সতিন? স্নেহে যত্নে সুপ্রভার দিনগুলিকে সে ভরাট করিয়া রাখে, নিজের হাতে সে সুপ্রভাকে সাজায়, সুপ্রভার শয্যা রচনা করিয়া দেয়, সতিনের প্রতি স্বামীর গভীর ভালোবাসাকে হাসিমুখে গ্রহণ করে।

সতিনের সংসারেও তাই এখানে কলহ বিবাদ মান অভিমান মন কষাকষি নাই। মন্দা ভুলিয়া গিয়াছে সে বধূ। এই মূল্য দিয়া সে হইয়াছে গৃহিণী।

কলিকাতার চেয়ে ঢের বেশি সুখেই শ্যামা এখানে বাস করিতে লাগিল। পরের বাড়ি পরের আশ্রয়ে থাকিবার একটু যা লজ্জা। এখানে আসিবার আগে শ্যামা ভাবিয়াছিল এমন নিরুপায় হইয়া আত্মীয়ের বাড়ি যাইতেছে, পদে পদে কত অপমান সেখানে না জানি তাহার জুটিবে, এখানে কিছুদিন ভয়ে ভয়ে থাকিবার পর দেখিল গায়ে পড়িয়া অপমান কেহ করে না, সে যে এখানে আশ্রিতা, সময়ে-অসময়ে সেটা মনে করাইয়া দিবারও কেহ এখানে নাই, মানাইয়া চলিতে পারিলে এখানে বাস করা কঠিন নয়।

এখানকার গ্রাম্য আবহাওয়াটিও শ্যামার বেশ লাগিল। শহরতলির যে বাড়িতে বিবাহের পর হইতে এতকাল সে বাস করিয়াছিল সেখানটা শহরের মতো ঘিঞ্জি নয়, তবু সেখানে তাহারা যেন বন্দীজীবন যাপন করিত, ইটের অরণ্যের মধ্যে প্রকৃতির যেটুকু প্রকাশ ছিল তা যেন শহরের পার্কের মতো ছেলে-ভুলানো ব্যাপার। তাছাড়া, সেখানে তাহারা ছিল কুনো, ঘরের কোণে নিজেদের লইয়া থাকিত, প্রতিবেশী থাকিয়াও ছিল না। এখানে জীবনের সঙ্গে জীবনের বড়ো নিবিড় মেশামেশি। মিতালি যেখানে নাই সেখানেও অজস্র মেলামেশা আছে, সহজ বাস্তব মেলামেশা, শহরের মেলামেশার মতো কোমল ও কৃত্রিম নয়, খাঁটি জিনিস। শ্যামার ছেলেমেয়েরা যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। এখানে তাহারা প্রকাণ্ড অঙ্গন পাইয়াছে, বাগানপুকুর পাইয়াছে, ধুলামাটিতে খেলা করার সুযোগ পাইয়াছে, আর পাইয়াছে সঙ্গী। বাড়িতেই শ্যামার প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের সাথি আছে, বিধানের জন্মের সময় মন্দা যে কোলের ছেলেটিকে লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল তার নাম অজয়, সকলে অজু বলিয়া ডাকে, বিধানের সঙ্গে তাহার খুব ভাব হইয়া গেল। অজয় এক ক্লাস নীচে পড়ে। পড়াশোনায় বিধান বড়ো ভালো, মন্দার ছেলেদের মাস্টার একদিন বিধানকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া এই রায় দিয়াছেন। মন্দা জানিয়া খুশি হইয়াছে, বিধান কলিকাতার ছেলে বলিয়া অজয়ের সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতায় মন্দার যেটুকু ভয় ছিল মাস্টারের মন্তব্য শোনার পর আর তাহা নাই।

সুপ্রভা বকুলকে ভালোবাসিয়া ফেলিয়াছে।

বলে, কী মেয়ে আপনার বউদিদি, দিয়ে দিন মেয়েটা আমাকে, দেবেন?

বলে, মেয়ে বলে ওকে কিছু শেখাচ্ছেন না, এ তো ভালো কথা নয়? আজকালকার দিনে লেখাপড়া গানটান না জানলে কে নেবে মেয়েকে? একটু একটু সবই শেখাতে হবে ঠাকুরঝি।

সুপ্রভাই উদ্যোগ করিয়া বকুলকে মেয়েস্কুলে ভর্তি করিয়া দিল, বলিল, স্কুলের মাহিনা সেই দিবে। গানটান শিখাইবার যখন উপায় নাই, লেখাপড়াই একটু শিখুক। বকুলকে সে যত্ন করে, লুকাইয়া ভালো জিনিস খাইতে দেয়, যে সব জিনিস শুধু মন্দা ও তার ছেলেমেয়ের জন্য বরাদ্দ। কিন্তু একা বকুল ও সব খাইতে চায় না, বলে দাদাকে দাও, ভাইকে দাও। সুপ্রভা তাতে বড়ো খুশি হয়। কী নিঃস্বার্থ মেয়েটার মন? যেমন দেখিতে সুন্দর, তেমনি মিষ্টি স্বভাব, ও যেন রাজরানি হয় ভগবান।

রাজরানি? এতবার সুপ্রভা এই আশীর্বাদের পুনরাবৃত্তি করে কেন, বকুলকে রাজরানি করিতে এত তাহার উৎসাহ কীসের? রাজরানি হওয়ার শখ ছিল নাকি সুপ্রভার, মনে সেই ক্ষোভ রহিয়া গিয়াছে? কিছু বুঝিবার উপায় নাই। সুপ্রভাকে অসুখী মনে হয় কদাচিৎ। চুপচাপ বসিয়া সে অনেক সময়ই থাকে, সেটা তার স্বভাব, মুখ তাহার সব সময় বিমর্ষ দেখায় না, চোখে তাহার সব সময় ঘনাইয়া আসে না উৎসুক দিবা-স্বপ্নাতুরার দৃষ্টি. তবু শ্যামা মাঝে মাঝে সন্দেহ করে। অত যার রূপ সে কি একেবারেই নিজের মূল্য জানে না, কুমারী জীবনে আশা কি সে করে নাই, কল্পনা কি তার ছিল না? বুড়া বয়সে রাখাল যখন তাহাকে বিবাহ করিয়া তিন পুত্রের জননী সতিনের সংসারে আনিয়াছিল গোপনে সে কি দু একবিন্দু অশ্রুপাত করে নাই?

বাড়ি ভাড়ার কুড়িটা টাকা নিয়মিত আসে। দুমাস টাকা পাঠাইয়া কনক একবার শ্যামাকে একখানা পত্র লিখিল। পাশে কোনো বাড়িতে বিদ্যুতের আলো নেওয়া হইতেছে, দেখিয়া কনকের শখ জাগিয়াছে

তারও বিদ্যুতের আলো চাই। বাড়িটা তাদের পছন্দ হইয়াছে, স্থায়ীভাবে তারা ওখানে রহিয়া গেল, এক কাজ করিলে হয় না দিদি? খরচপত্র করিয়া তারা বিদ্যুৎ আনাক, মাসে মাসে বাড়িভাড়ার টাকায় সেটা শোধ হইবে? এই পত্র পাইয়া শ্যামা বড়ো চিন্তায় পড়িয়া গেল। এখানে তাহার নানা রকম খরচ আছে, স্কুলের মাহিনা, জামাকাপড় এ সব তাহাকেই দিতে হয়, এটা-ওটা খুচরা খরচও আছে অনেক, বাড়িভাড়ার টাকা না আসিলে সে করিবে কী? অথচ বিদ্যুৎ আনিতে না দিলে ওরা যদি অন্য বাড়িতে উঠিয়া যায়? সঙ্গে সঙ্গে আবার কি ভাড়াটে মিলিবে? শেষে শ্যামা মিনতি করিয়া কনককে চিঠি লিখিল। লিখিল ওই কুড়িটি টাকা তাহার সম্বল, ওই টাকা কটির জোরে সে পরের বাড়ি পড়িয়া আছে, বাড়িতে বিদ্যুৎ আনিবার তার ক্ষমতা কই? শ্যামা যে কী দুঃখে পড়িয়াছে কনক যদি তাহা জানিত—

এ চিঠি ডাকে দিবারও প্রয়োজন হইল না, কনকলতার স্বামীর নিকট হইতে সবিনয় নিবেদন ভণিতার আর একখানা পত্র আসিল. শ্যামার বাড়ি হইতে আপিসে যাতায়াত করা বড়োই অসুবিধা, একটি ভালো বাড়ি পাওয়া গিয়াছে শহরের মধ্যে, ইংরাজি মাসটার কাবার হইলে তাহারা উঠিয়া যাইবে। কলিকাতার কেরানি-ভাড়াটের বাসা বদলানো রোগের খবর তো শ্যামা জানিত না, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল। কনকলতার উপর রাগ ও অভিমানের তাহার সীমা রহিল না। শ্যামার সঙ্গে না তাহার অত ভাব হইয়াছিল, দুঃখের কথা বলিতে বলিতে শ্যামার চোখে জল আসিলে সে না সান্ত্বনা দিয়া বলিত, ভেবো না দিদি, ভগবান মুখ তুলে চাইবেন? শ্যামা কত নিরুপায় সে তাহা জানে, কলিকাতায় বাড়ি ভাড়া করিয়াই সে থাকিবে তবু শ্যামার বাড়িতে থাকিবে না। এতকাল অসুবিধা ছিল না, আজ হঠাৎ অসুবিধা হইয়া গেল?

রাখালকে চিঠিখানা দেখাইয়া শ্যামা বলিল, ঠাকুরজামাই, এবার কী হবে? কুড়িটে করে টাকা পাচ্ছিলাম, ভগবান তাতেও বাদ সাধলেন।

রাখাল বলিল, আহা, কলকাতায় কি আর ভাড়াটে নেই। যাক না ওরা, ফের ভাড়াটে আসবে,— ওপরে একখানা নীচে তিনখানা ঘর, কুড়ি টাকায় ও বাড়ি লুপে নেবে না? পাড়ার কাউকে চিঠি দাও না?

হারাণ ডাক্তারকে শ্যামা একখানা পত্র লিখিয়া দিল। হারাণ জবাব দিল, ভয় নাই, বাড়ি শ্যামার খালি থাকিবে না, দু-একমাসের মধ্যে আবার অবশ্যই ভাড়াটে জুটিবে।

ইংরাজি মাসের পাঁচ ছয় তারিখে শ্যামা ভাড়ার টাকার মনিঅর্ডার পাইত, এবার দশ তারিখ হইয়া গেল টাকা আসিল না। কনকলতারা কোথায় উঠিয়া গিয়াছে শ্যামা জানিত না, নিজের বাড়ির ঠিকানাতেই সে তাগিদ দিয়া চিঠি লিখিল, ভাবিল, পোস্টাপিসে ওরা কি আর ঠিকানা রাখিয়া যায় নাই? এ পত্রের কোনো জবাব শ্যামা পাইল না।

মন্দা বলিল, দিচ্ছে ভাড়া! এতকাল যে দিয়েছিল তাই ভাগ্যি বলে জেনো বউ! কলকাতার লোকে বাড়িভাড়া দেয় নাকি? একমাস দুমাস দেয়, তারপর য দিন পারে থেকে অন্য বাড়িতে উঠে যায়,— করো ভাড়া আদায় মকদ্দমা করে!

শ্যামা বিবর্ণ মুখে বলিল, আমার যে একটি পয়সা নেই ঠাকুরঝি? আমি যে ওই কটা টাকার ভরসা করছিলাম?

মন্দা বলিল, জলে তো পড়নি?

তারপর বলিল, বাড়িটা বেচে দিলেই তো পার বউ? এত কষ্ট সয়ে ও বাড়ি রেখে করবে কী? থাকতেও তো পারছ না নিজে? টাকাটা হাতে এলে বরং লাগবে কাজে,—তারপর কপালে থাকে বাড়ি আবার হবে, না থাকে হবে না! দাদা বেরিয়ে এসে কিছু একটা করবে নিশ্চয়। নাও যদি করে

বউ, ছেলে তো উপযুক্ত হয়ে উঠবে তোমার বাড়ির টাকা শেষ হতে হতে,—তখন আর তোমার দুঃখ কীসের?

মুখখানা মন্দা ম্লান করিয়া আনিল, দুঃখের সঙ্গে বলিল, ও বাড়ি বেচতে বলতে আমার ভালো লাগছে ভেবো না বউ,—আমার বাপের ভিটে তো। কিন্তু কী করবে বল? নিরুপায় হলে মানুষকে সব করতে হয়।

বাড়িটা বিক্রয় করিয়া ফেলার কথা শ্যামা ভাবিতেও পারে না। একটা বাড়ি না থাকিলে মানুষের থাকিল কী? দেশে একটা ভিটা থাকিলেও শহরতলির ওই বাড়িটা সে বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু দেশ পর্যন্ত কি শ্যামার আছে! যে গ্রামে সে জন্মিয়াছিল তার কথা ভালো করিয়া মনেও নাই। মামার ভিটেখানা নিজের মনে করিয়'ছিল, বেচিয়া দিয়া মামা নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। স্বামীর ওই একরত্তি বাড়িটুকু সে পাইয়াছে, বুকের রক্ত জল-করা টাকায় বাড়ির সংস্কার করিয়াছে, আজ তাও সে বিক্রি করিয়া দিবে? ও বাড়ির ঘরে ঘরে জমা হইয়া আছে তাহার বাইশ বছরের জীবন, ওইখানে সে ছিল বধূ, ছিল জননী, চারটি সন্তানকে প্রসব করিয়া ওইখানে সে বড়ো করিয়াছে, ও বাড়ির প্রত্যেকটি ইট যে তার চেনা, দেয়ালের কোথায় কোন পেরেকের গর্তে কবে সে চুন লেপিয়া দিয়াছিল তাও যে তার স্মরণ আছে. পরেব হাতে বাড়ি ছাড়িয়া দিয়া আসিতে তার মন যে কেমন করিয়াছিল জগতে কে তা জানিবে। হায়, ও বাড়ির প্রত্যেকটি ইটের জন্য শ্যামার যে অপত্য স্নেহ।

অথচ এদিকেও আর চলে না। নাই বলিয়া শ্যামার হাতে কিছুই যে নাই অপবে তাহা বিশ্বাস করে না, শ্যামাও মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না বকুলের জমানো একটি চকচকে আধুলি ছাড়া আর একটি তামার পয়সাও তাহার নাই। মাসকাবারে সুপ্রভা গোপনে বিধানের স্কুলেব মাহিনাটা দিয়া দিল, চাহিলে সুপ্রভার কাছে আরও কিছু হয়তো পাওয়া যাইত, শ্যামার চাহিতে লজ্জা করিল। এবার বড়ো শীত পড়িয়াছে। বিধানের গরমজামা গতবার ছোটো হইয়া গিয়াছিল, ছেলেটা হু হু করিয়া বড়ো হইয়া উঠিতেছে, এবছর নূতন একটা জামা কিনিয়া দিতে পারিলে ভালো হইত। আলোয়ানটাও তাহার ছিঁড়িযা গিযাছে। ওদের বেশভূষা চাহিয়া দেখিতে শ্যামার চোখে জল আসে। বাড়িবার মুখে বছর বছর ওদেব পোশাক বদলানো দরকাব, পুরানো সেলাইকরা আঁটো জামা পরিয়া ওদের ভিখারির সন্তানের মতো দেখায়, শুধু সাবান দিয়া জামা কাপড়গুলি আর যেন সাফ হইতে চায় না, কেমন লালচে রং ধরিয়া যায। পূজাব সময বাখাল ওদের একখানি করিয়া তাঁতের কাপড় দিয়াছিল, মানাইয়া পরা চলে এমন জামা নাই বলিয়া বিধান লজ্জায় সে কাপড় একদিনও পরে নাই।

মনটা শ্যামা ঠিক করিতে পারে না। মন্দার কথাগুলি মনের মধ্যে ঘুরিতে থাকে। রাখালের সঙ্গে একদিন সে এ বিষয়ে পরামর্শ করিল। রাখালও বাড়িটা বিক্রি করার পরামর্শই দিল। বলিল বাড়িভাড়া দিবার হাঙ্গামা কী সহজ। অর্ধেক বছর বাডি হয়তো খালিই পড়িয়া থাকিবে, ভাড়াটে জুটিলেও ভাড়া যে নিয়মিত পাওয়া যাইবে তারও কোনো মানে নাই, একেবারে না পাওয়াও অসম্ভব নয়। তারপর বাড়ির পিছনে খরচ নাই? পুবানো বাড়ি, মাঝে মাঝে মেরামত করিতে হইবে, বছর-বছর চুনকাম করিয়া না দিলে ভাড়াটে থাকিবে না,—ড্রেন নেওয়া হইয়াছে শ্যামার বাড়িতে? এবার হয়তো ড্রেন না লইলে কর্পোরেশন ছাড়িবে না, সে অনেক খরচের কথা, শ্যামা কোথা হইতে খরচ করিবে?

বাড়ি-পোষা হাতি-পোষার সমান বউঠান, বাড়ি তুমি ছেড়ে দাও।

বিধান রাত প্রায় এগারোটা অবধি পড়ে, বকুল মণি ওরা ঘুমাইয়া পড়ে অনেক আগে। সেদিন রাত্রে শ্যামা বিধানকে বলিল, খোকা, সবাই যে বাড়ি বিক্রি করে দিতে বলছে বাবা?

বিধানের সঙ্গে শ্যামা আজকাল নানা বিষয়ে পরামর্শ করে, ভবিষ্যতের কত জল্পনা-কল্পনা যে তাদের চলে তাহার অন্ত নাই। বিধান বলে, বড়ো হইয়া সে মস্ত চাকরি করিবে, তারপর শঙ্করের

মতো একটা মোটর কিনবে। শঙ্করের মতো মোটর? শীতলের জেল হইবার পর শঙ্করের মোটরে তার যে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইয়াছিল সে অপমান বিধান কি মনে করিয়া রাখিয়াছে? রাত জাগিয়া তাই এত ওর পড়াশোনা? শীতলের কথা বিধান কখনও বলে না। পড়া শেষ করিয়া ছেলে শুইতে আসিলে শ্যামা কতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছে, চুপিচুপি বিধান হয়তো জিজ্ঞাসা করিবে, বাবা কবে ছাড়া পাবে মা? কিন্তু কোনোদিন বিধান এ প্রশ্ন করে না। যে তীব্র অভিমান ওর, হয়তো বাপের জেল হওয়ার লজ্জা ওকে মূক করিয়া রাখে, পরের বাড়ি তারা যে এভাবে পড়িয়া আছে এ জন্য বাপকে দোষী করিয়া মনে হয়তো ও নালিশ পুরিয়া রাখিয়াছে!

আলোটা নিভাইয়া শ্যামা বিধানের মাথার কাছে লেপের মধ্যে পা ঢুকাইয়া বসে। একপাশে ঘুমাইয়া আছে বকুল, মণি ও ফণী, এপাশে অবোধ বালক বুকে ক্ষোভ ও লজ্জা পুরিয়া এত রাত্রে জাগিয়া আছে। শ্যামা ছেলের বুকে একখানা হাত রাখে। বেড়ার ফুটা দিয়া জ্যোৎস্নার কতকগুলি রেখা ঘরের ভিতরে আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানে শিয়ালগুলি ডাক দিয়া নীরব হইল। বেড়ার ব্যবধান পার হইয়া পাশের ঘরে রাখালের মামাতো বোন রাজবালার স্বামীর সঙ্গে ফিসিফিস কথা শোনা যায়, রাজবালার স্বামী আদালতে পঁচিশ টাকার চাকরি করে। পঁচিশ টাকায় অত ফিসফিস কথা? শ্যামার স্বামী মাসে তিনশো টাকাও রোজগার করিয়াছে, নিজের বাড়িতে নিজের পাকা শয়নঘরে স্বামীর সঙ্গে অত কথা শ্যামা বলে নাই।- -আর ওই চাপা হাসি? শ্যামা শিহরিয়া ওঠে।

কদিন পরে শ্যামার বাড়িবিক্রয় সমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল। হারাণ ডাক্তার মনিঅর্ডারে পঁচিশটা টাকা পাঠাইয়া লিখিলেন বাড়িতে তিনি নূতন ভাড়াটে আনিয়াছেন, তার পরিচিত লোক। ভাড়া আদায় করিয়া মাসে মাসে তিনিই শ্যামাকে পাঠাইয়া দিবেন।

শ্যামার মুখে হাসি ফুটিল। পঁচিশ টাকা? পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়িয়াছে? এখন তাহার রাজবালার স্বামীর সমান উপার্জন। কপাল হইতে কয়েকটা দুশ্চিন্তার চিহ্ন এবার মুছিয়া ফেলা চলে।

মাসখানেক পরে একদিন সকালে কোথা হইতে শঙ্কর আসিয়া হাজির। গায়ে ব্লেজারের কোট, তলায় স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট, পরনে শান্তিপুরে ধুতি, পায়ে মোজা,—কলিকাতায় বোঝা যাইত না, এখানে তাহাকে শ্যামার ভাবী বাবু মনে হইল, রাখালের এই বাড়িতে। শ্যামা ধাঁধতেছিল, পরনের কাপড়খানা তাহার ছেঁড়া হলুদমাখা, হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া কিছু নাই। কলিকাতা হইতে কে একটি ছেলে তার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে শুনিয়া সে কি ভাবিতে পারিয়াছিল সে শঙ্কর! শঙ্কর কেন বনগাঁ আসিবে?

শ্যামাকে শঙ্কর প্রণাম করিল। শ্যামার গর্বের সীমা রহিল না। মোটা হলুদ-মাখা ছেঁড়া কাপড় পরনে? কী হইয়াছে তাতে! সুপ্রভা, মন্দা, রাজবালা সকলের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে রাজপুত্র প্রণাম তো করিল তাহাকে! খুশি হইয়া শ্যামা বলিল, ষাট ষাট, বেঁচে থাকো বাবা, বিদ্যাদিগ্‌গজ হও! কী আবেগ শ্যামার আশীর্বচনে! শঙ্করের মুখ লজ্জায় রাঙা হইয়া গেল।

তারপর শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল, বনগাঁ এসেছ কেন শঙ্কর?

শঙ্কর বলিল, ক্রিকেট খেলতে এসেছি মাসিমা, এখানকার স্কুলের সঙ্গে আমাদের স্কুলের ম্যাচ।

শ্যামা, বিধান, মণি সকলেই শঙ্করকে দেখিয়া খুশি হইয়াছে। অভিমান করিয়াছে বকুল। পুজোর সময় আসব বলে এখন বাবু এলেন, বলিয়া সে মুখ ভার করিয়া আছে। কবে শঙ্কর বকুলের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল পূজার সময় সে বনগাঁ আসিবে সে খবর কেহ রাখিত না, বকুলের কথায় বড়োরা হাসে, শঙ্কর শ্যামার দিকে চাহিয়া সলজ্জভাবে কৈফিয়ত দিয়া বলে, পুজোর সময় মধুপুর গেলাম যে আমরা!—তোকে চিঠি লিখিনি বিধান সেখান থেকে?

বকুল অর্ধেক ক্ষমা করিয়া বলে, তোমার জিনিসপত্র কই?

শঙ্কর বলে, বোর্ডিং-এ আমাদের থাকতে দিয়েছে, সেখানে রেখেছি।

বকুল বলে, বোর্ডিং কী জন্যে, আমাদের বাড়ি থাক না?

শঙ্কর মুখ নিচু করিয়া একটু হাসে। শ্যামা তাকায় মন্দার দিকে। শঙ্করকে এখানে থাকার নিমন্ত্রণ জানায় কিন্তু সুপ্রভা! প্রথমে শঙ্কব রাজি হয় না, ভদ্রতার ফাঁকা ওজোর করে। কলিকাতার ছেলে সে, ও সব কায়দা তার দুরস্ত। শেষে সুপ্রভার হাসি ও মিষ্টি কথার কাছে পরাজয় মানিয়া সে আতিথ্য স্বীকার করে। লজ্জার যে আবরণটি লইয়া সে এ বাড়িতে ঢুকিয়াছিল ক্রমে ক্রমে তাহা খসিয়া যায়, কানু ও কালুর সঙ্গে তাহার ভাব হয়, বিধানের পড়ার ঘরে খানিক হইচই করিয়া উঠানে তাহারা মার্বেল খেলে, তারপর স্কুলেব বেলা হইলে সকলে স্নান করিতে যায় পুকুরে। শ্যামা বারণ করিয়া বলে, সাঁতার জান না, তুমি পুকুরে যেও না শঙ্কর। জল তুলে এনে দিক, তুমি ঘরে স্নান কর।

শঙ্কর বলিয়া যায়, বেশি জলে যাব না মাসিমা।

তবু শ্যামার বড়ো ভয় করে। বিধান বকুল মণি এরা সাঁতার শিখিয়াছে, কালু ও কানু তো পাকা সাঁতারু, পুকুরের জল তোলপাড় করিয়া ওরা স্নান করিবে; উৎসাহের মাথায় শঙ্করের কি খেয়াল থাকিবে সে সাঁতার জানে না? বাড়ির একজন চাকরকে সে পুকুরে পাঠাইয়া দেয়। খানিক পরে হইচই করিতে করিতে সকলে ফিরিয়া আসে, শঙ্কর আসে বিধান ও চাকরটার গায়ে ভর দিয়া এক পায়ে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে। শামুকে না কীসে শঙ্করের পা কাটিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

বকুল দুরন্ত দুঃসাহসী মেয়ে, বকিলে, মারিলে, ব্যথা পাইলে সে কাঁদে না কিন্তু রক্ত দেখিলে সে ভয় পায়, ধুলা-কাদা ধুইয়া শ্যামা যতক্ষণ শঙ্করের পা বাঁধিয়া দেয় সে হাউহাউ কবিয়া কাঁদিতে থাকে।

মন্দা ধমক দিয়া বলে, তোব পা কেটেছে নাকি, তুই অত কাঁদছিস কী জন্যে? কেঁদে মেয়ে একেবারে ভাসিয়ে দিলেন!

শঙ্কর বলে, কেঁদো না বুকু, বেশি কাটেনি তো!

আগে বিধান হয়তো শঙ্করের জন্য অনায়াসে সাতদিন স্কুল কামাই করিত, এখন পড়াশোনাব চেয়ে বড়ো তাহার কাছে কিছু নাই, সে স্কুলে চলিয়া গেল। কানু ও কালু কোনো উপলক্ষে স্কুল কামাই করিতে পারিলে বাঁচে, অতিথির তদ্‌বিরের জন্য বাড়িতে থাকিতে তারা রাজি ছিল, মন্দার জন্য পারিল না। স্কুলে গেল না শুধু বকুল। সারা দুপুর এক মুহূর্তের জন্য সে শঙ্করের সঙ্গ ছাড়িল না। এ যেন তার বাড়িঘর, শঙ্কর যেন তারই অতিথি, সে ছাড়া আব কে শঙ্করকে আপ্যায়িত করিবে? ফণীকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার অবিশ্রাম বকুনি শুনিতে শুনিতে শ্যামার চোখও ঘুমে জড়াইয়া আসে,---বকুলের মুখে যেন ঘুমপাড়ানি গান। বাড়ির কারও সঙ্গে ও মেয়েটার স্নেহের আদান-প্রদান নাই, কারও সোহাগ-মমতায় ও ধরা-ছোঁয়া দেয় না, অনুগ্রহের মতো করিয়া সুপ্রভার ভালোবাসাকে একটু যা গ্রহণ করে, শঙ্করের সঙ্গে এত ওর ভাব হইল কীসে, পরের ছেলে শঙ্কর? এক তার পাগল ছেলে বিধান, আর এক পাগলি মেয়ে বকুল,—মন ওদের বুঝিবার জো নাই। শ্যামা যে এত করে মেয়েটার জন্য, দু মিনিট ওর অদ্ভুত অনর্গল বাণী শুনিবার জন্য লুব্ধ হইয়া থাকে, কই শ্যামার সঙ্গে কথা তো বকুল বলে না? কাছে টানিয়া আদর করিতে গেলে মেয়ে ছটফট করে, জননীর দুটি স্নেহব্যাকুল বাহু যেন ওকে দড়ি দিয়া বাঁধে। জগতে কে কবে এমন মেয়ে দেখিয়াছে?

শ্যামা একটা হাই তোলে। জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁ শঙ্কর, আমাদের বাড়ির দিকে কখনও যাও-টাও বাবা? হারাণ ডাক্তার ভাড়াটে এনে দিলেন, তার নামটাও জানিনে!

শঙ্কর বলে, ভাড়াটে কই, কেউ আসেনি তো? সদর দরজায় তালাবন্ধ।

শ্যামা হাসিল, তুমি জান না শঙ্কর—এক মাসের ওপর ভাড়াটে এসেছে, পঁচিশ টাকা ভাড়া দিয়েছে,—ওদিকে তুমি যাওনি কখনও।

শঙ্কর বলে, না মাসিমা, আপনাদের বাড়ি খালি পড়ে আছে, কেউ নেই বাড়িতে। জানালা কপাট বন্ধ, সামনে বাড়িভাড়ার নোটিশ ঝুলছে,—আমি কদ্দিন দেখেছি।

শ্যামা অবাক হইয়া বলে, তবে কি ভাড়াটে উঠে গেল?

আপনি যাদের ভাড়া দিয়েছিলেন তারা যাবার পর কেউ আসেনি মাসিমা। আমি যাই যে মাঝে মাঝে নকুড়বাবুর বাড়ি, আমি জানিনে?—শঙ্কর হাসে, ভাড়াটে এলে কি বাইরে তালা দিয়ে লুকিয়ে থাকত?

হারাণ তবে ছুতা করিয়া তাহাকে অর্থ-সাহায্য করিতেছে? হারাণের কাছে কোনোদিন টাকা সে চাহে নাই, কেবল ভাড়াটে উঠিয়া যাওয়া উপলক্ষে হারাণকে সেই যে সে চিঠি লিখিয়াছিল, সেই চিঠিতে দুঃখের কাঁদুনি গাহিয়াছিল অনেক। তাই পড়িয়া হারাণ তাহাকে পঁচিশ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছে, যতদিন বাড়িতে তাহার ভাড়াটে না আসে মাসে মাসে নিজেই তাহাকে এই টাকাটা দেওয়া ঠিক করিয়াছে হারাণ? সংসারে আত্মীয়-পর সত্যই চেনা যায় না। শ্যামা কে হারাণের? শ্যামার মতো দুঃখিনীর সংস্রবে হারাণকে সর্বদা আসিতে হয়, শ্যামার জন্য এত তার মমতা হইল কেন?

তিনদিন পরে শঙ্কর কলিকাতা চলিয়া গেল। এই তিনদিন সে ভালো করিয়া হাঁটিতে পারে নাই, ঘরের মধ্যে সে বন্দী হইয়া থাকিয়াছে। মজা হইয়াছে বকুলের। বাড়ির ছেলেরা বাহিরে চলিয়া গেলে একা সে শঙ্করকে দখল করিতে পারিয়াছে শঙ্কর চলিয়া গেলে কদিন বকুল মনমরা হইয়া রহিল।

তিন-চারদিন পরে হারাণের মনিঅর্ডার আসিল। সই করিয়া টাকা নেওয়ার সময় শ্যামার মনে হইল গভীর ও গোপন একটি মমতা দূর হইতে তাহার মঙ্গল কামনা করিতেছে, স্বার্থ ও বিদ্বেষ-ভরা এই জগতে যার তুলনা নাই। দুঃখের দিনে কোথায় রহিল সেই বিষ্ণুপ্রিয়া, স্বামীর পাপের ছাপ-মারা সন্তান গর্ভে লইয়া একদিন যে ভিখারিনির মতো জননী শ্যামার সখ্য চাহিয়াছিল? যার এক মাসের পেট্রল খরচ পাইলে সন্তানসহ শ্যামা দুমাস বাঁচিয়া থাকিতে পারিত?

টাকার প্রাপ্তিসংবাদ দিয়া হারাণকে সে একখানা পত্র লিখিল। হারাণের ছল যে সে ধরিতে পারিয়াছে সে সব কিছু লিখিল না, লিখিল আর জন্মে সে বোধ হয় হারাণের মেয়ে ছিল, হারাণ তার জন্য যা করিয়াছে এবং করিতেছে জীবনে কখনও কী শ্যামা তাহা ভুলিবে। এমনই আবেগপূর্ণ অনেক কথাই শ্যামা লিখিল।

হারাণ জবাবও দিল না।

না দিক। শ্যামা তো তাহাকে চিনিয়াছে! শ্যামার দুঃখ নাই।

শীতলের সঙ্গে শ্যামার যোগসূত্র শীতলের কয়েদ হওয়ার গোড়াতেই ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, জেলে গিয়া কখনও সে শীতলের সঙ্গে দেখা করে নাই। চিঠিপত্রও লেখে নাই। কোথায় কোন জেলে শীতল আছে তাও শ্যামা জানে না। আগে জানিবার ইচ্ছাও হইত না। এখন শীতলের ছাড়া পাওয়ার সময় হইয়া আসিয়াছে। সে কোথায় আছে, কবে খালাস পাইবে মাঝে মাঝে শ্যামার জানিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু জানিবার চেষ্টা সে করে না। শীতলকে কাছে পাইবার বিশেষ আগ্রহ শ্যামার নাই। সব সময় সে যে স্বামীর উপর রাগ ও বিদ্বেষ অনুভব করে তাহা নয়, বরং কোথায় লোহার শিকের অন্তরালে পাথর ভাঙিয়া সে মরিতেছে ভাবিয়া সময় সময় মমতাই সে বোধ করে, তবু মনে তাহার কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গিয়াছে শীতল ফিরিয়া আসিলে আবার সে দারুণ কোনো বিপদে পড়িবে। তাছাড়া ব্যস্ত হইয়া লাভ কী? ছাড়া পাইলে স্ত্রীপুত্রকে শীতল খুঁজিয়া লইবে না কী?

বেশ শান্তিতে আছে সে। নাইবা রহিল তাহার নিজের বাড়িতে থাকিবার আনন্দ, আর্থিক সচ্ছলতার সুখ? এখানে ছেলেমেয়েদের শরীর ভালো আছে, বিধানের অদ্ভুত পড়াশোনার ফল ফলিতেছে, স্কুলের

হেডমাস্টার নিজে রাখালকে বলিয়াছেন বিধানের মতো ছেলে ক্লাসে দুটি নাই। শ্যামা আবার আশা করিতে পারে, ধূসর ভবিষ্যতে আবার রঙের ছাপ লাগিতে থাকে। নাইবা রহিল তাহার স্বামীর নিকট আশাভরসা, একদিন ছেলে তাহাকে সুখী করিবে।

কেবল, পড়িয়া পড়িয়া বিধান রোগা হইয়া যাইতেছে, এত রাত জাগিয়াও পড়ে! যেমন পরিশ্রম করে তেমন খাওয়া ছেলেটা পায় না। পরের বাড়িতে কেইবা হিসাব করে যে একটা ছেলে দিবারাত্রি খাটিতেছে একটু ওর ভালোমতো খাওয়া-পাওয়া দরকার, দুধঘি-র প্রয়োজন ওর সবচেয়ে বেশি? শ্যামা কী করিবে? চাহিয়া-চিন্তিয়া চুরি করিয়া যতটা পারে ভালো জিনিস বিধানকে খাওয়ায় কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করিতে সাহস পায় না। এ আশ্রয় ঘুচিয়া গেলে তার তো উপায় থাকিবে না।

মন্দা যখন চেঁচামেচি করিতে থাকে : এ কী কাণ্ড বাবা এ বাড়ির, ভূতের বাড়ি নাকি এটা, সন্দেশ করে পাথরের বাটি ভরে রাখলাম বাটি অর্ধেক হল কী করে? এ কাজ মানুষের, বড়ো মানুষের, বিড়েলেও নেয়নি, ছেলেপিলেও খায়নি—নিয়ে দিব্যি আবার থাপরে থুপরে সমান করে রাখার বুদ্ধি ছেলেপিলের হবে না!—শ্যামার বুকের মধ্যে তখন টিপটিপ করে। অর্ধেক? অর্ধেক তো সে নেয় নাই! যৎসামান্য নিয়াছে। মন্দা টের পাইল কেমন করিয়া?

সুপ্রভা বলে, অমন করে বোলো না দিদি, লক্ষ্মী,—যে নিয়েছে, খাবার জিনিস নিয়েছে তো, বড়ো লজ্জা পাবে দিদি।

মন্দা বলে, তুই অবাক করলি বোন, চোর লজ্জা পাবে বলে বলতে পারব না চুরির কথা?

সুপ্রভা মিনতি করিয়া বলে, বলে আর লাভ কী দিদি? এবার থেকে সাবধানে রেখো।

তবু শ্যামা পরিশ্রমী সন্তানের খাদ্য চুরি করে। দুধ জ্বাল দিতে গিয়া সুযোগ পাইলেই দুধে সরে খানিকটা লুকাইয়া ফ্যালে, দুধ গরম করিলে সর তো যায় গলিয়া টের পাইবে কে? বাঁধিতে বাঁধিতে দুখানা মাছভাজা শ্যামা শালপাতায় জড়াইয়া কাপড়ের আড়ালে গোপন করে, ঘরে গিয়া কখন সে তাহা লুকাইয়া আনে কে জানিবে? এমনি সব ছোটোখাটো চুরি শ্যামা করে, গোপনে চুরি-করা খাবার বিধানকে খাওয়ায়। একবার খানিকটা গাওয়া ঘি জোগাড় করিয়া সে বড়ো মুশকিলে পড়িয়াছিল। রাখালের ছেলেমেয়ে ছাড়া আর সকলকে একসঙ্গে বসিয়া খাইতে হয়, আগে অথবা পরে। একা খাইলেও রান্নাঘরে খাইতে হয় ভাত, দাওয়ায় খাইতে হয় জলখাবার, সকলের চোখের সামনে। কেমন করিয়া ঘিটুকু ছেলেকে খাওয়াইবে শ্যামা ভাবিয়া পায় নাই। বলিয়াছিল, এমনি একটু-একটু খেয়ে ফ্যাল না খোকা, পেটে গেলেই পুষ্টি হবে।

তাই কি মানুষ পারে, কাঁচা ঘি শুধু খাইতে?

শেষে মুড়ির সঙ্গে মাখিয়া দিয়া একটু একটু করিয়া শ্যামা ঘিটুকুর সদ্গতি করিয়াছিল।

খোকার তখন বাৎসরিক পরীক্ষা চলিতেছে, একদিন সকালে শ্যামাকে ডাকিয়া রাখাল বলিল, জান বউঠান, শীতলবাবু তো খালাস পেয়েছেন আটদশ দিন হল। নকুড়বাবু পত্র লিখেছেন। তোমাদের কলকাতার বাড়িতে এসেই নাকি আছে, দিনরাত ঘরে বসে থাকে, কোথাও যায়-টায় না—

পত্রখানা দেখি ঠাকুরজামাই?

নকুড়বাবু লিখিয়াছেন, শীতলের চেহারা কেমন পাগলের মতো হইয়া গিয়াছে, বোধ হয় সে কোনো অসুখে ভুগিতেছে, এতদিন হইয়া গেল কেহ তাহার খোঁজ-খবর লইতে আসিল না দেখিয়া জ্ঞাতার্থে এই পত্র লিখিলেন।

রাখাল বলিল, তোমাদের বাড়িতে না ভাড়াটে আছে বউঠান? শীতলবাবু ওখানে আছেন কী করে?

কী জানি ঠাকুরজামাই, কিছু বুঝতে পারছি না। আপনি একবার যান না কলকাতা?

কথাটা এখানে প্রকাশ করিতে শ্যামা রাখালকে বারণ করিয়া দিল। বিধান পরীক্ষা দিতেছে, এখন এ সংবাদ পাইলে হয়তো সে উত্তেজিত হইয়া উঠিবে, ভালো লিখিতে পারিবে না।—বছরকার পরীক্ষা সহজ তো নয় ঠাকুরজামাই, এখন কি ওকে ব্যস্ত করা উচিত?

পাগলের মতো চেহারা হইয়া গিয়াছে? অসুখে ভুগিতেছে? বিধানের পরীক্ষা না থাকিলে শ্যামা নিজে দেখিতে যাইত। কিন্তু এখানে শীতল আসিল না কেন? লজ্জায়? কী অদৃষ্ট মানুষটার! দুবছর জেল খাটিয়া বাহির হইয়া আসিল, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিবে, স্ত্রীর সেবা পাইবে, তার বদলে খালি বাড়িতে মুখ লুকাইয়া একা অসুখে ভুগিতেছে। এত লজ্জাই বা কীসের? আত্মীয়স্বজনকে মুখ কি দেখাইতে হইবে না?

শনিবারের আগে রাখালের কলিকাতা যাওয়ার উপায় ছিল না। দুদিন ধরিয়া শ্যামা তাহার দুর্ভাগা স্বামীর কথা ভাবিল। ভাবিতে ভাবিতে আসিল মমতা।

শ্যামা কি জানিত নকুড়বাবুর চিঠির কথাগুলি যে ছবি তাহার মনে আঁকিয়া দিয়াছিল পরীক্ষায় ব্যস্ত সন্তানের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবার সময়ও তাহা সে ভুলিতে পারিবে না, এত সে গভীর বিষাদ বোধ করিবে? শনিবার রাখালের সঙ্গে সে কলিকাতা রওনা হইল। সঙ্গে লইল শুধু ফণীকে। বিধানকে বলিয়া গেল সে বাড়িটা দেখিয়া আসিতে যাইতেছে, কলি ফেরানোর ব্যবস্থা করিয়া আসিবে, যদি কোনো মেরামতের দরকার থাকে তাও করিয়া আসিবে।

—আমার কথা ভেবো না বাবা, ভালো করে পরীক্ষা দিও, কেমন? ছোটো পিসির কাছে খাবার চেয়ে খেও? আর বকুলকে যেন মেরো না খোকা।

বাড়ি পৌঁছিতে সন্ধ্যা পার হইয়া গেল। সদর দরজা বন্ধ, ভিতরে আলো জ্বলিতেছে কিনা বোঝা যায় না, শীতের রাত্রে সমস্ত পাড়াটাই স্তব্ধ হইয়া আছে, তার মধ্যে শ্যামার বাড়িটা যেন আরও নিঝুম। অনেকক্ষণ দরজা ঠেলাঠেলির পর শীতল আসিয়া দরজা খুলিল। রাস্তার আলোতে তাকে দেখিয়া শ্যামা কাঁদিয়া ফেলিল। চোখ মুছিয়া ভিতরে ঢুকিয়া সে দেখিল চারিদিক অন্ধকার, একটা আলোও কি শীতল জ্বালায় না সন্ধ্যার পর? ফণী ভয়ে তাহাকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল, অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াইয়া শ্যামা শিহরিয়া উঠিল। এমনই সন্ধ্যাবেলা একদিন সে এখানে প্রথম স্বামীর ঘর করিতে আসিয়াছিল, সেদিনও এমনি সারা বাড়ির আবহাওয়া তাহার নিশ্বাস রোধ করিয়া দিতেছিল, সেদিনও তাহার কান্না আসিতেছিল এমনিভাবে। শুধু, সেদিন বারান্দায় জ্বালানো ছিল টিম-টিমে একটা লণ্ঠন।

শীতল বিড়বিড় করিয়া বলিল, মোমবাতি ছিল, সব খরচ হয়ে গেছে।

রাখাল গিয়া মোড়ের দোকান হইতে কতগুলি মোমবাতি কিনিয়া আনিল। এই অবসরে শ্যামা হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া ঘরে গিয়া বসিয়াছে, বাহিরে বড়ো ঠান্ডা শীতলকে দুটো একটা কথাও সে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, প্রায় অবান্তর কথা, জ্ঞাতব্য প্রশ্ন করিতে কী জানি শ্যামার কেন ভয় করিতেছিল। ভিতরে ঢুকিবার আগে রাস্তার আলোতে শীতলের পাগলের মতো মূর্তি দেখিয়া শ্যামা তো কাঁদিয়াছিল, অন্ধকার ঘরে সে বেদনা কি ভয়ে পরিণত হইয়াছে?

রাখাল ফিরিয়া আসিয়া একটা মোমবাতি জ্বালিয়া জানালায় বসাইয়া দিল। ঘরে কিছু নাই, তক্তপোশের উপর শুধু একটা মাদুর পাতা, আর ময়লা একটা বালিশ। মেঝেতে একরাশি পোড়া বিড়ি আর কতগুলি শালপাতা ছড়ানো। যে জামাকাপড়ে দুবছর আগে শীতল রাতদুপুরে পুলিশের সঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল তাই সে পরিয়া আছে। কাপড় বোধ হয় তাহার ওই একখানা, কী যে ময়লা হইয়াছে বলিবার নয়, রাত্রে বোধ হয় সে শুধু আলোয়ানটা মুড়ি দিয়া পড়িয়া থাকে, চৌকির বাহিরে অর্ধেকটা এখন মাটিতে লুটাইতেছে। এ সব তবু যেন চাহিয়া দেখা যায়, তাকানো যায় না শীতলের

মুখের দিকে। চোখ উঠিয়া, মুখ ফুলিয়া বীভৎস দেখাইতেছে তাহাকে, হাড় কখানা ছাড়া শরীরে বোধ হয় কিছু নাই।

শীতল দাঁড়াইয়া থাকে, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে কাঁপে। তারপর সহসা শ্যামার কী হয় কে জানে, ফণীকে জোর করিয়া নামাইয়া দিয়া জননীর মতো ব্যাকুল আবেগে শীতলকে জড়াইয়া ধরিয়া টানিয়া আনে, শিশুর মতো আলগোছে শোয়াইয়া দেয় মাদুরে, বলে, এমন করে ভুগছ, আমাকে একটা খপরও তুমি দিলে না গো।

পরদিন সকালে সে হারাণ ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইল। হারাণকে খবর দিলে পঁচিশ টাকা বাড়িভাড়া পাঠানোর ছলনাটুকু যে ঘুচিয়া যাইবে শ্যামা কি তা ভাবিয়া দেখিল না। ভাবিল বইকী। রাত্রে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করিয়া সে দেখিয়াছে, হারাণের মহৎ ছলনাকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য হারাণকে তার ছলনা করা উচিত নয়। সে যে এখানে আসিয়া জানিতে পারিয়াছে বাড়িতে তাহার ভাড়াটে আসে নাই, হারাণ দয়া করিয়া মাসে মাসে তাকে টাকা পাঠায়—এটা হারাণকে জানিতে দেওয়াই ভালো। পরে যদি হারাণ জানিতে পারে শ্যামা কলিকাতা আসিয়াছিল? তখন কী হইবে? হারাণ কি তখন মনে করিবে না যে সব জানিয়াও টাকার লোভে শ্যামা চুপ করিয়া আছে?

হারাণ আসিলে শ্যামা তাহাকে প্রণাম করিল। বলিল, ভালো আছেন বাবা আপনি? কাল সন্ধেবেলা এসে পৌঁছেচি আমি, আগে তো জানতে পারিনি কবে খালাস পেয়ে এখানে এসে পড়ে রয়েছে,—বিপদের ওপর কী যে আমার বিপদ আসছে বাবা, কোনোদিকে কূলকিনারা দেখতে পাইনে। সমস্ত মুখ ফুলে গিয়াছে, শরীরে দারুণ জ্বর, ডাকলে-ডুকলে সাড়াও ভালো করে দেয় না বাবা। শ্যামা চোখ মুছিতে লাগিল।

হারাণ যেন অপরিবর্তনীয়, মাথার চুলে পাক ধরিবে দেহে বার্ধক্য আসিবে তবু সে কণামাত্র বদলাইবে না, বিধানের প্রথম অসুখের সময় দেখিতে আসিয়া যেমন নির্মমভাবে শ্যামাকে সে কাঁদিতে বারণ করিয়াছিল, আজও তেমনিভাবে বারণ করিল। শ্যামার জীবনে রহস্যময়, দুর্বোধ্য মানুষের পদার্পণ আরও ঘটিয়াছে বইকী, গোড়ায় ছিল রাখাল, তারপর আসিয়াছিল মামা তারাশঙ্কর, কিন্তু এই লোকটির সঙ্গে তাদের কারও তুলনা হয় না, একে একে তাদের রহস্যের আবরণ খসিয়া গিয়াছে, হারাণ শুধু চিরকাল যবনিকার আড়ালে রহিয়া গেল। শ্যামাকে যদি সে স্নেহ করে, স্নেহের পাত্রীকে দেখিয়া একবিন্দু খুশি কি তাহার হইতে নাই? আজও হারাণ ডাক্তার শুধু রোগী দেখিতে আসার মতো শ্যামার বাড়ি আসিবে, আত্মীয় বলিয়া ধরা দিবে না?

শীতলকে হারাণ অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিল।

বাহিরে আসিয়া রাখাল ও শ্যামাকে বলিল, কদ্দিন জ্বরে ভুগছে জানিনে বাপু আমি, জিজ্ঞাসা করলে বলতে চায় না। অনেকদিন থেকে না খেয়ে শুকোচ্ছে সেটা বুঝতে পারি। তারপর লাগিয়েছে ঠান্ডা। সব জড়িয়ে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে সারতে সময় নেবে,—বড়ো ডাক্তার ডাকতে চাও ডাকো আমি বারণ করিনে, কিন্তু ডাক্তারফাক্তার ডাকা মিছে তাও বলে রাখছি,—ওর সবচেয়ে দরকার বেশি সেবাযত্নের।

বড়ো ডাক্তার? হারাণের চেয়ে বড়ো ডাক্তার কে আছে শ্যামা তো জানে না! শুনিয়া হারাণ খুশি হয়। বলে, দাও দিকি কাগজকলম, ওষুধ লিখি। আর মন দিয়ে শোনো যা যা বলে যাই, এতটুকু এদিক-ওদিক হলে চলবে না—টুকেই নাও না কথাগুলো আমার? মনে যা থাকবে আমার জানা আছে।

একে একে হারাণ বলিয়া যায়—ওষুদ, পথ্য, সেবার নির্দেশ। ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া সময় বাঁধিয়া দেয়। বারবার সাবধান করে, এতটুকু এদিক-ওদিক নয়, আটটায় যে ওষুদ দেওয়ার কথা, দিতে যেন আটটা বাজিয়া পাঁচমিনিটও না হয়, যখন দুচামচ ফুড দেওয়ার কথা তিন চামচ যেন তখন না পড়ে।

শ্যামা ভয়ে ভয়ে বলে, কোনো ব্যবস্থাই তো নেই এখেনে, খালি বাড়িতে এসে উঠেছি আমরা, বনগাঁ কি নিয়ে যাওয়া যাবে না?

হারাণ যেন আনমনেই বলে, বনগাঁ? তা চল, বনগাঁতেই নিয়ে যাই,—একটা দিন আমার নষ্ট হবে, হলে আর উপায় কী? জ্বর করে, না খেয়ে, ঠান্ডা লাগিয়ে কী কাণ্ডই বাধিয়ে রেখেছে হতভাগা। কটায় গাড়ি? দেড়টায়? তবে সময় আছে ঢের, যাও দিকি তুমি রাখাল ওষুধপত্রগুলি নিয়ে এসো কিনে আমি কটা রোগী দেখে আসছি ঘুরে এগারোটার মধ্যে—দুটো পান আমায় দিতে পার ছেঁচে? দোক্তা থাকে তো দিও খানিকটা।

হারাণ বুড়া হইয়া গিয়াছে, পান চিবাইতে পারে না, ছেঁচা পান খায়। কিন্তু হারাণ বদলায় নাই। বুড়া হইতে হইতে সে মরিয়া যাইবে, তবু বোধ হয় বদলাইবে না। শ্যামা কি জানে না আত্মীয়তা করিয়া শীতলকে সে বনগাঁ পৌঁছাইয়া দিতে যাইতেছে না, যাইতেছে ডাক্তার হইয়া রোগীর সঙ্গে? শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। তা সে কোনোদিনই রাখে না। সেই প্রথমবার বিধানের অসুখের সময় জ্বরতপ্ত শিশুটিকে সে যে গামলার ঠান্ডা জলে ডুবাইয়াছিল সেদিনও সে শ্যামার বলার অপেক্ষা রাখে নাই। যা করা উচিত হারাণ তাই করে। হারাণের স্নেহ নাই, আত্মীয়তা নাই, কোমলতা নাই, কতবার ভুল করিয়া শ্যামা ভাবিয়াছে হারাণ তাহাকে মেয়ের মতো ভালোবাসে। তাই যদি সে বাসিবে তবে বাড়িভাড়ার নাম করিয়া টাকা শ্যামাকে সে পাঠাইবে কেন? সোজাসুজি পাঠাইতে কে তাকে বারণ করিয়াছিল? পরের দান গ্রহণ করিতে অন্য সকলের কাছে শ্যামা লজ্জা পাইবে, এই জন্য? হারাণের মধ্যে ও সব দুর্বলতা নাই। কে কোথায় কী কারণে লজ্জা পাইবে হারাণ কি কখনও তা ভাবে? স্নেহ মনে করিয়া শ্যামা পাছে কাছে ঘেঁষিতে চায়, শ্যামা পাছে মনে করে অযাচিত দানের পিছনে হারাণের মমতার উৎস লুকাইয়া আছে, আত্মীয়তা দাবি করার সুযোগ পাছে শ্যামাকে দেওয়া হয়, তাই না হারাণ তাহার দানকে শ্যামার প্রাপ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল!

অভিমানে শ্যামার কান্না আসে। অভিমানে কান্না আসিবার বয়স তাহার নয়, তবু মনের মধ্যে আজও যে অবুঝ কাঁচা মেয়েটা লুকাইয়া আছে যে বাপের স্নেহ জানে নাই, অসময়ে মাকে হারাইয়াছে, ষোলো বছর বয়স হইতে জগতে একমাত্র আপনার জন মামাকে খুঁজিয়া পায় নাই, স্বামীর ভয়ে দিশেহারা হইয়া থাকিয়াছে, সে যদি আজ কাঁদিতে চায় পৌঢ়া শ্যামা তাহাকে বারণ করিতে পারিবে কেন?

তাহারা বনগাঁ পৌঁছিলে মন্দা শীতলকে দেখিয়া একটু কাঁদিল, তারপর তাড়াতাড়ি তার জন্য বিছানা পাতিয়া দিল, এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করিয়া ভারী ব্যস্ত হইয়া পড়িল সে, সেবাযত্নের ব্যবস্থা করিল, ছেলেমেয়েদের সরাইয়া দিল, শ্যামাকে বলিতে লাগিল, ভেবো না তুমি বউ, ভেবো না,—ফিরে যখন পেয়েছি দাদাকে ভালো করে আমি তুলবই।

বকুল বিস্ফারিত চোখে শীতলকে খানিকক্ষণ চাহিয়া দেখিল, তারপর সে যে কোথায় গেল কেহ আর তাহাকে খুঁজিয়া পায় না। হারাণ ডাক্তারকেও না। কোথায় গেল দুজনে? শেষে সুপ্রভাই তাদের আবিষ্কার করিল বাড়ির পিছনে ঢেঁকিঘরে। ও ঘরে বকুল খেলাঘর পাতিয়াছে। ঢেঁকিটার উপরে পাশাপাশি বসিয়া গম্ভীরমুখে কী যে তাহারা আলোচনা করিতেছিল তারাই জানে, সুপ্রভা দেখিয়া হাসিয়া বাঁচে না। ডাক্তার নাকি বুড়া? জগতে এত জায়গা থাকিতে, কথা বলিবার এত লোক থাকিতে, বুড়া ঢেঁকিঘরে বসিয়া আলাপ করিতেছে বকুলের সঙ্গে!

যা তো খোকা ডেকে আন ওদের। বুড়োকে বল মুখ হাত ধুয়ে নিতে,—খেতে টেতে দি। তোর বাবা কী খাবে তাও তো বলে দিলে না, ঢেঁকিঘরে গিয়ে বসে রয়েছে?

হারাণ আসে, মুখহাত ধোয়, সুপ্রভা ঘোমটা টানিয়া তাহাকে জলখাবার দেয়। বকুল কিন্তু ঢেঁকিঘরেই বসিয়া থাকে। সুপ্রভা গিয়া বলে, ও বুকু, খাবিনে তুই? তোর বাবা এল তুই এখেনে বসে আছিস?

—ও আমার বাবা নয়।

শোন কথা মেয়ের!—সুপ্রভা হাসে, আয়, চলে আয় আমার সঙ্গে, একলাটি এখানে তোকে বসে থাকতে হবে না।

রাত্রিটা এখানে থাকিয়া পরদিন সকালে হারাণ কলিকাতা চলিয়া গেল। শ্যামা সাবধান হইয়া গিয়াছিল, হারাণকে অতিরিক্ত আত্মীয়তা জানাইবার কোনো চেষ্টাই সে করিল না। যাওয়ার সময় শুধু ঘটা করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, মেয়েকে ভুলবেন না বাবা।

খুব ধীরে ধীরে শীতল আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। সে নিঝুম নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছে। আপনা হইতে কথা সে একেবারেই বলে না, অপরে বলিলে কখনও দু-এক কথায় জবাব দেয়, কখনও কিছু বলে না। কেহ কথা বলিলে বুঝিতে যেন তাহার দেরি হয়। ক্ষুধাতৃষ্ণা বোধও যেন তাহার নাই, খাইতে দিলে খায়, না দিলে কখনও চায় না। চুপচাপ বিছানায় পড়িয়া থাকিয়া সে যে ভাবে তা তো নয়। এখানে আসিয়া কদিনের মধ্যে চোখ-ওঠা তাহার সারিয়া গিয়াছে, সবসময় সে শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। দু বছর জেল খাটিলে মানুষ কি এমনি হইয়া যায়? কবে ছাড়া পাইয়াছিল শীতল। কলিকাতার বাড়িতে আসিয়াই সে তো ছিল দশ বারোদিন, তার আগে? প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া কিছু জানা যায় নাই। পরে অল্পে অল্পে জানা গিয়াছে, পনেরো কুড়িদিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়া শীতল কলিকাতার বাড়িটাতে আশ্রয় লইয়াছিল। জানিয়া শ্যামার বড়ো অনুতাপ হইয়াছে। এই দারুণ শীতে একখানা আলোয়ান মাত্র সম্বল করিয়া স্বামী তাহার এক মাসের উপর কপর্দকহীন অবস্থায় যেখানে-সেখানে কাটাইয়াছে! জেলে থাকিবার সময় শীতলের সঙ্গে সে যোগসূত্র রাখে নাই কেন? তবে তো সময় মতো খবর পাইয়া ওকে সে জেলের দেউড়ি হইতে সোজা বাড়ি লইয়া আসিতে পারিত?

প্রাণ দিয়া শ্যামা শীতলের সেবা করে। শ্রান্তি নাই, শৈথিল্য নাই, অবহেলা নাই। চারটি সন্তান শ্যামার? আর একটি বাড়িয়াছে। শীতল তো এখন শিশু।

পরীক্ষার ফল বাহির হইলে জানা গিয়াছে বিধান ক্লাসে উঠিয়াছে প্রথম হইয়া।

আট

বনগাঁয়ে শ্যামার একে একে আরও চার বছর কাটিয়া গেল।

কলিকাতার বাড়িটা তাহাকে বিক্রয় করিয়া দিতে হইয়াছে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া বিধান যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল তখন,—শীতলের প্রত্যাবর্তনের এক বছর পরে। শীতলের অসুখের জন্য অনেক টাকা খরচ করিতে না হইলে রাখাল হয়তো শেষ পর্যন্ত বিধানের পড়ার খরচ দিতে রাজি হইত। বড়ো খারাপ অসুখ হইয়াছিল শীতলের। বেশি জ্বর, অনাহার, দারুণ শীতে উপযুক্ত আবরণের অভাব, মানসিক পীড়া, এই সব মিলিয়া শীতলের স্নায়ুরোগ জন্মাইয়া দিয়াছিল, দেহের সমস্ত স্নায়ু তাহার উঠিয়াছিল ফুলিয়া। চিকিৎসার জন্য তাহাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে হইয়াছিল। তিনমাস সে পড়িয়া ছিল হাসপাতালে। তারপর শ্যামার কাঁদাকাটায় রাখাল আরও তিনমাস তাহার বৈদ্যুতিক চিকিৎসা চালাইয়াছিল। তার ফলে যতদূর সুস্থ হওয়া সম্ভব শীতল তা হইয়াছে। কিন্তু জীবনে সে যে কাজ-কর্ম কিছু করিতে পারিবে সে ভরসা আর নাই। যতখানি তাহার অক্ষমতা নয়, ভান করে সে তার চেয়ে বেশি। শুইয়া বসিয়া অলস অকর্মণ্য দায়িত্বহীন জীবনযাপনের সুখটা টের পাইয়া হয়তো সে মুগ্ধ হইয়াছে। হয়তো সে সত্যই বিশ্বাস করে দারুণ সে অসুস্থ, কর্ম-জীবনের তাহার অবসান

হইয়াছে। হয়তো সে হিস্টিরিয়াগ্রস্ত, অসুখের অজুহাতে সকলের দয়া ও সহানুভূতি, মমতা ও সেবা লাভ করার চেয়ে বড়ো আর তার কাছে কিছুই নাই। তবে সবটা শীতলের ফাঁকি নয়, শরীরে তাহার গোলমাল আছে, মাথাটা ভোঁতা হইয়া যাওয়াও কাল্পনিক নয়, অসুখের যে বাড়াবাড়ি ভানটুকু সে করে তাব ভিত্তিও তো মানসিক রোগ।

তবু ছেলেব পড়া চালানোর জন্য বাড়িটা শ্যামার হয়তো বিক্রয় করিতে হইত না, যদি বাঁচিয়া থাকিত হারাণ ডাক্তার। বিধানকে হারাণের বাড়ি পাঠাইয়া সে লিখিত, বাবা, জীবনপাত করে ওর স্কুলের পড়া সাঙ্গ করেছি, আর তো আমার সাধ্য নেই, এবার দিন বাবা ওর আপনি কলেজে পড়ার একটা ব্যবস্থা করে। হারাণ তা দিত। শ্যামার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু হারাণের অনেক বয়স হইয়াছিল, বিধানের স্কুলের পড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত সে বাঁচিয়া থাকিতে পারিল কই?

হারাণ মরিয়াছে। মরিবে না? কপাল যে শ্যামার মন্দ! হারাণ বাঁচিয়া থাকিলে শ্যামাব ভাবনা কী ছিল? বাড়িতে শ্যামার ভাড়াটে আসিয়াছিল, তারা কুড়ি টাকা পাঠাইত শ্যামাকে, আর হারাণ পাঠাইত পঁচিশ। হাবাণেব মনি অর্ডারের কুপনে কোনো অজুহাতের কথা লেখা থাকিত না, শুধু অপাঠ্য হাতের লেখায় স্বাক্ষব থাকিত হারাণচন্দ্র দে। শ্যামা তো তখন ছিল বড়োলোক। কয়েক মাসে শদেড়েক টাকাও সে জমাইয়া ফেলিয়াছিল। কেন মরিল হারাণ? কত মানুষ সত্তর-আশি বছব বাঁচিয়া থাকে, পঁযষট্টি পার হইতে না হইতে হারাণের মবিবার কী হইয়াছিল?

শ্যামা কী কবিবে? ভগবান যার প্রতি এমন বিবূপ বাড়ি বিক্রি করিয়া না দিয়া তার উপায় কী। শহরতলির বাড়ি, তাও বডো বাস্তার উপবে নয়, দক্ষিণ-খোলা নয়। একতলাটা পুরানো। বাড়ি বেচিয়া শ্যামা হাজাব পাচেক টাকা পাইয়াছিল।

টাকা থাকিলে খরচ কেন বাড়িয়া যায় কে জানে। আগে ছোটো-বড়ো অনেক খরচ মন্দার উপর দিয়া চালানো যাইত, কিন্তু পুঁজি যার পাঁচ হাজার টাকা সে কেন তা পারিবে? মন্দাই বা দিবে কেন? দুধের কথাটা ধরা যাক। দুধ অবশ্য কেনা হয় না, বাড়িতে পাঁচছটা গোরু আছে। কিন্তু গোরুর পিছনে খরচ তো আছে? শ্যামার ছেলেমেয়েরা দুধ তো খায়? শ্যামা পাঁচ হাজার টাকা পাওযার মাসখানেক পরে মন্দা বলে, পয়সাকড়ি হাতে নেই বউ, এ মাসেব খোলকুঁড়োব দামটা দিয়ে দাও না,—সামনের মাসে আনাবোখন আমি।

কুঁড়ো কেনা হইবে কেন? সেদিন যে দুমন চাল করা হইল তার কুঁড়ো গেল কোথায়? এবার মন্দা ধানভানার মজুরি নগদ দেয় নাই : ধান যে ভানিয়াছে কুঁড়ো পাইয়াছে সে। মন্দা তাহা হইলে শ্যামার টাকাগুলি খরচ করাইয়া দিবার মতলব করিয়াছে? ঘরের ধানের কুঁড়ো পরকে দিয়া শ্যামাকে দিয়া সে কুঁড়ো কিনাইবে!

মাসের শেষে মুদি তাহার সাঁইত্রিশ টাকা পাওনা লইতে আসিয়াছে, মন্দা তিনখানা দশ টাকার নোট গুনিয়া দেয়, একটু ইতস্তত কবিয়া নগদ টাকাও দেয় একটা, তারপব শ্যামাকে বলে, ছটা টাকা কম পড়ল, দাও না বউ টাকাটা দিয়ে?

বর্ষাকালে জল পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে শ্যামার ঘর দিয়া দুখানা টিন বদলানো দরকার,—কে বদলাইবে টিন? বাড়ি মন্দার, ঘরখানা মন্দার, শ্যামা তো শুধু আশ্রিতা অতিথি,—মন্দারই তো উচিত ঘরখানা সরাইয়া দেওয়া। বলিলে মন্দা চুপ করিয়া থাকে। একটু পরেই সংসার-খরচের দুটি-একটি টাকা বাহির করিয়া দিবার সময় মন্দা এমন করিয়া বলিতে থাকে যে আর সে পারিয়া উঠিল না, এ যেন রাজাব বাড়ি ঠাওরাইয়াছে সকলে, খরচ খবচ খরচ, চারদিকে শুধু খরচ, খরচ ছাড়া আর কথা নাই—যে মনে হয় সে বুঝি শ্যামার ঘর সারাইয়া দিবার অনুরোধেরই জবাব দিতেছে এতক্ষণ পরে।

বাড়ি বেচিয়া এমনি কত খরচ যে শ্যামার বাড়িয়াছে বলিবার না।

বিধানের কলিকাতার খরচ, মণি স্কুলে যাইতেছে তার খরচ, শীতলের জন্য খরচ, অসুখবিসুখের খরচ,—শ্যামার তো মনে হইত মন্দার নয়, খরচ খরচ খরচ, চারিদিকে শুধু খরচ, তার।

আর বকুল? বকুলের জন্য শ্যামার খরচ হয় নাই?

গত বৈশাখে তেরশো টাকা খরচ করিয়া বকুলের শ্যামা বিবাহ দিয়াছে। কমিতে কমিতে পাঁচ হাজারের যা অবশিষ্ট ছিল, বকুল একাই প্রায় তা শেষ করিয়া দিয়াছে।

বকুলের বিবাহ হইয়াছে, আমাদের সেই বকুলের? কার সঙ্গে বিবাহ হইয়াছে বকুলের, শঙ্করের সঙ্গে নাকি? পাগল! শঙ্করের সঙ্গে বকুলের বিবাহ হয় না।

যে বৈশাখে আমাদের বকুলের বিবাহ হইল, তাহার আগের ফাল্গুনে বিবাহ হইযাছিল সুপ্রভার মেয়েটির, বিবাহের তিন-চার দিন আগে কলিকাতা হইতে বিধানের সঙ্গে শঙ্করও আসিয়াছিল। বয়সের আন্দাজে বকুল মস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শঙ্কর ভাবিতে পারে নাই বকুল এতবড়ো হইয়াছে, আর এত লজ্জা হইয়াছে বকুলের, আর এত সুন্দর হইয়াছে সে। মেয়ের সম্বন্ধে শ্যামা যে এত সাবধান হইয়াছে তাও কি শঙ্কর জানিত? বিবাহের পরদিন দুপুরবেলা বকুলকে আর শ্যামা দেখিতে পায না। কোথায় গেল বকুল? বাড়িতে পুরুষ গিজগিজ করিতেছে, যেখানে যেখানে মেয়েরা একত্র হইয়াছে বকুল তো সেখানে নাই? হাতের কাজ ফেলিয়া রাখিয়া শ্যামা এখানে খোঁজে ওখানে খোঁজে, একে তাকে জিজ্ঞাসা করে। একজন বলিল, এই তো দেখলাম এখানে খানিক আগে, দ্যাখ না কলাবাগানে গেছে নাকি?

বাড়ি পিছনে কলাবাগান, কলাবাগানে সেই ঢেঁকিঘর। তাই বটে, ঢেঁকিঘর ঢেঁকিটার উপর বসিয়া শঙ্কর আব বকুল কথা বলিতেছে বটে। ঘরের কোণে এখানে বকুল আর এখন পুতুলখেলা করে না, খেলাঘর তার ভাঙিয়া গেছে, শুধু আছে চিহ্ন, কতবার ঘর লেপা হইয়াছে আজও চারিদিকে উঁচু আলের চিহ্ন, পুকুরের গর্ত, উনানের গর্ত মিলাইয়া যায় নাই, বেড়ায় যে শিউলিবোঁটার বঙে ছোপানো ন্যাকড়াটি গোঁজা আছে সে তো বকুলের পুতুলেরই জামা। পুতুলখেলার ঘবে কী ছেলেখেলা আজ করিতেছে বকুল? একটু বাড়াবাড়ি রকম কাছাকাছি বসিয়া আছে ওরা, আর কিছু নয়। না, বকুলের হাতটিও শঙ্করের হাতে ধরা নাই। শ্যামা বলিয়াছিল, ও বকুল, এখানে বসে আছিস তুই? মেয়েজামাই যাবে যে এখন, আয় চলে আয়।

বকুল তো আসিল, কিন্তু মেয়ের মুখ রাঙা কেন, চোখ কেন ছলোছলো?—শঙ্কর আসিয়াছে চার-পাঁচদিন, সকলেব সামনে শঙ্কবেব সঙ্গে কত কথা বকুল বলিয়াছে, দুচার মিনিট একা কথা বলিবার সময়ও কতবার শ্যামা হঠাৎ আসিয়া ওদের দেখিয়াছে, শ্যামাকে দেখিয়াও কথা শঙ্কর বন্ধ করে নাই, বকুল হাসি থামায় নাই। ঢেঁকিঘরে আজ ওরা কোন নিষিদ্ধ বাণীর আদান-প্রদান করিতেছিল, বকুলের মুখে যা রং আনিয়াছে, চোখে আনিয়াছে জল? কী বলিতেছিল শঙ্কর বকুলকে?

শ্যামা একবার ভাবিয়াছিল বকুলকে জিজ্ঞাসা করিবে। শেষে কিছু না বলাই ভালো মনে করিয়াছিল। কিছুই হয়তো নয়। হয়তো নির্জন ঢেঁকিঘরে শঙ্করের কাছে বসিয়া থাকার জন্যই বকুল লজ্জা পাইয়াছিল, ওখানে ও ভাবে বসিয়া থাকা যে তার উচিত হয় নাই বকুল কি আর তা বোঝে না।

তারপর যে কদিন শঙ্কব এখানে ছিল, আর তিনটি দিন মাত্র, বকুলকে শ্যামা একদণ্ডের জন্য চোখের আড়াল করে নাই।

বকুল রাগ করিয়া বলিয়াছিল, সারাদিন পেছন-পেছন ঘুরছ কেন বলো তো?

বকুলের বোধ হয় অপমান বোধ হইয়াছিল।

শ্যামা বলিয়াছিল, পেছন-পেছন আবার তোর ঘুরলাম কখন?

তারপর বকুল কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, গিয়া বসিয়াছিল শীতলের কাছে, সারাটা দিন।

দুমাস পরে বৈশাখ মাসে বকুলের বিবাহ হইয়াছিল। ছেলের নাম মোহিনী, ছেলের বাপের নাম বিভূতি, নিবাস কৃষ্ণনগর। বিভূতি ছিল পোস্টমাস্টার, এখন অবসর লইয়াছে। মোহিনী পঞ্চাশ টাকায় ঢুকিয়াছে পোস্টাপিসে, আশা আছে বাপের মতো সেও পোস্টমাস্টার হইয়া অবসর লইতে পারিবে। মোহিনী কাজ করে কলিকাতায়, থাকে কাকার বাড়ি, যার নাম শ্রীপতি এবং যিনি মার্চেন্ট আপিসের কেরানি।

ছেলেটি ভালো, আমাদের বকুলের বর মোহিনী। শান্ত নম্র স্বভাব, পঞ্চাশ টাকার চাকরি করে বলিয়া এতটুকু গর্ব নাই, প্রায় শঙ্করের মতোই লাজুক। দেখিতে মন্দ নয়, রং একটু ময়লা কিন্তু কী চোখ!—বকুলের চোখের মতোই বড়ো হইবে।

জামাই দেখিয়া শ্যামা খুশি হইয়াছে, সকলেই হইয়াছে। জামাইয়ের বাপখুড়ার ব্যবহারেও কারও অখুশি হওয়ার কারণ ঘটে নাই, শ্বশুরবাড়ি হইতে বকুল ফিরিয়া আসিলে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া জানা গিয়াছে শাশুড়ি-ননদেরাও বকুলের মন্দ নয়, বকুলকে তারা পছন্দও করিয়াছে, আদরযত্ন মিষ্টি কথাবও কমতি রাখে নাই, কেবল এক পিসশাশুড়ি আছে বকুলের সেই যা রূঢ় কথা বলিয়াছে দুএকটা—বলিয়াছে, ধেড়ে মাগি, বলিয়াছে তালগাছ! ধোয়া পাকা মেঝেতে পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া বকুল যখন ডানহাতের শাঁখাটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছিল বিশেষ কিছু কেহ তখন তাহাকে বলে নাই, কেবল ওই পিসশাশুড়ি অনেকক্ষণ বকাবকি করিয়াছিল, বলিয়াছিল অলক্ষ্মী, বলিয়াছিল বজ্জাত।

বলুক, পিসশাশুড়ি কে? শাশুড়ি ননদই আসল, তারা ভালো হইলেই হইল।

বকুল বলিয়াছিল, না মা, পিসশাশুড়ির প্রতাপ ওখানে সবার চেয়ে বেশি, সবাই তার কথায় ওঠে বসে। ঘরদোর তার কিনা সব, নগদ টাকা আর সম্পত্তিও নাকি অনেক আছে শুনলাম, তাইতে সবাই তাকে মেনে চলে। বুড়ির ভয়ে কেউ জোরে কথাটি কয় না মা।

তাহা হইলে ভাবনার কথা বটে। শ্যামা অসন্তুষ্ট হইয়া বলিয়াছিল, কদিন ছিলি তার মধ্যে শাঁখা ভেঙে বুড়ির বিষনজরে পড়লি! বউ-মানুষ তুই সেখানে, একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হয়।

বকুল বলিয়াছিল, পা পিছলে গেল, আমি কী করব? আমি তো ইচ্ছে করে পড়িনি!

সুপ্রভা বলিয়াছিল, মরুক পিসশাশুড়ি, জামাই ভালো হলেই হল। সব তো আর মনের মতো হয় না।

তা বটে। স্বামীই তো স্ত্রীলোকের সব। স্বামী যদি ভালো হয়, স্বামী যদি ভালোবাসে, হাজার দজ্জাল পিসশাশুড়ি থাক, কী আসিয়া যায় মেয়েমানুষের?

মোহিনী ভালোবাসে না বকুলকে?

মোটা মোটা চিঠি তো আসে সপ্তাহে দুখানা! ভালোবাসার কথা ছাড়া কী আর লেখে মোহিনী অত সব? আর কী লিখিবার আছে তাহার?

সুপ্রভার মেয়েকে বকুল বরের চিঠি পড়িতে দেয়। শ্যামা, সুপ্রভা, মন্দা সকলে আগ্রহের সঙ্গে একবার তাকে প্রশ্ন করিয়াছিল, সে হাসিয়া বলিয়াছিল, ভেবো না মামি ভেবো না, যা কবিত্ব করে চিঠিতে, জামাই তোমার ভেড়া বনে গেছে।

তবু, লুকাইয়া মেয়ের একখানা চিঠিতে শ্যামা চোখ বুলাইতে ছাড়ে নাই, টাঙানো লেপের বস্তার কোথায় কোন ফাঁকে চিঠিখানা আপাতত গোপন করিয়া বকুল স্নান করিতে গিয়াছিল, শ্যামার কি তা নজর এড়াইয়াছে! চোরের মতো চিঠিখানা পড়িয়া শ্যামা তো অবাক। এ সব কী লিখিয়াছে মোহিনী? সব কথার মানেও যে শ্যামা বুঝিতে পারিল না?

কে জানে, হয়তো ভালোবাসার চিঠি এমনি হয়। শীতল তো কোনোদিন তাকে প্রেমপত্র লেখে নাই, সে কী জানে প্রেমপত্রের?

না জানুক, জামাই যে মেয়েকে পছন্দ করিয়াছে তাই শ্যামার ঢের। একটি শুধু ভাবনা তাহার আছে। বকুল তো পছন্দ করিয়াছে মোহিনীকে? কে জানে কী পোড়া মন তাহার, ঢেঁকিঘরে সেই যে বকুল আর শঙ্করকে সে একসঙ্গে দেখিয়াছিল বারবার সে কথা তাহার মনে পড়িয়া যায়। বকুলের সেই রাঙা মুখ আর ছলছল চোখ সর্বদা চোখের সামনে ভাসিয়া আসে।

পূজার সময় বকুলকে নেওয়ার কথা ছিল। পূজার ছুটির সঙ্গে আরও কয়েকদিনের ছুটি লইয়া মোহিনী ষষ্ঠীর দিন বনগাঁ আসিল। বিধানের কলেজ অনেক আগে বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সে শঙ্করের সঙ্গে কাশী গিয়াছে। শঙ্করের কে এক আত্মীয় থাকেন কাশীতে, সেখানে পূজা কাটাইয়া বিধান বাড়ি আসিবে।

মোহিনী থাকিতে চায় না। অষ্টমীর দিনই বকুলকে লইয়া বাড়ি যাইবে বলে। সকলে যত বলে, তা কি হয়? এসেছ, পুজোর কদিন থাকবে না?—লাজুক মোহিনী ততই সলজ্জভাবে একটু হাসিয়া বলে, না, তার যাওয়াই চাই।

কেন, যাওয়াই চাই কেন? সকলে জিজ্ঞাসা করে। পনেরো দিনের ছুটি তো তুমি নিয়েছ, দুদিন এখানে থেকে গেলে ছুটি তো তোমার ফুরিয়ে যাবে না?

শেষে মোহিনী স্বীকার করে, এটা তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ব্যাপার নয়, পিসিমার হুকুম অষ্টমীর দিন রওনা হওয়াই চাই।

সুপ্রভা অসন্তুষ্ট হইয়া বলে, এ কী রকম হুকুম বাছা তোমার পিসির? বেয়াই বর্তমানে পিসিই বা হুকুম দেবার কে? বেয়াইকে টেলিগ্রাম করে আমরা অনুমতি আনিয়ে নিচ্ছি, লক্ষ্মীপুজো পর্যন্ত তুমি থাকবে এখানে।

মোহিনী ভয় পাইয়া বলে,টেলিগ্রাম যদি করতে হয় পিসিকে করুন। কিন্তু তাতে কিছু লাভ হবে না, অনুমতি পিসি দেবে না, মাঝ থেকে শুধু চটবে।

কেহ আর কিছু বলে না, মনে মনে সকলে অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে। বুঝিতে পারিয়া মোহিনী বড়ো অস্বস্তি বোধ করে। সুপ্রভার মেয়েকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করে যে এ ব্যাপারে তার কোনো দোষ নাই, পিসি তিনখানা চিঠিতে লিখিয়াছে অষ্টমীর দিন সে যেন অবশ্য অবশ্য রওনা হয়, কোনো কারণে যেন অন্যথা না ঘটে, কথা না শুনিলে পিসি বড়ো রাগ করে। সুপ্রভার মেয়ে শুনিয়া বলে, বোঝো তো ভাই, আসার মতো আসা এই তো তোমার প্রথম, দুদিন না থাকলে কেমন লাগে আমাদের?

মোহিনী কয়েক ঘণ্টা ভাবে, তারপর সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া বলে, আচ্ছা দশমী পর্যন্ত থাকব।

শুনিয়া শ্যামা আসিয়া বলে, থাকলে পিসি রাগ করবে বলছিলে?

গিয়ে বুঝিয়ে বলবখন।—মোহিনী বলে।

শ্যামা তবু ইতস্তত করে : জোর করে ধরে রেখেছি বলে পিসি তো শেষে—?

মনটা শ্যামার খুঁতখুঁত করে। কী যে জবরদস্তি সকলের! যাইতে দিলেই হইত অষ্টমীর দিন। তার মেয়ে-জামাই, পিসির নাম শুনিয়া সে চুপ করিয়া গেল, সকলের এত মাথাব্যথা কেন? ওরা কি যাইবে পিসির রাগের ফল ভোগ করিতে? ভুগিবে তার মেয়ে। সুপ্রভার মেয়ে একসময় তাহাকে একটা খবর দিয়া যায়। বলে, জানো মামি, জামাই তোমার তার পাঠালে পিসির কাছে। কী লিখেছে জানো, এখানে এক গণৎকার বলেছে পুজোর কদিন ওর যাত্রা নিষেধ।

শ্যামা নিশ্বাস ফেলিয়া বলে, কী সব কাণ্ড মা, আমার ভালো লাগছে না খুকি, এমন করে কাউকে রাখতে আছে!

আমরা রেখেছি নাকি? জামাই নিজেই তো বললে থাকবে।

তখন শ্যামা হাসিয়া সুপ্রভার মেয়ের চিবুক ধরিয়া বলে, আরেকটি জামাই তো আমার এল না মা?

সে লক্ষ্মীপূজার পরেই আসিবে, শ্যামা তাই হাসিয়া এ কথা বলে, ব্যথার সঙ্গে বলিবার প্রয়োজন হয় না।

পূজা উপলক্ষে মন্দা সাধারণভাবে খাওয়া-দাওয়ার ভালো ব্যবস্থা করিয়াছে, শ্যামা খরচপত্র করিয়া আরও বেশি আয়োজন করিল, আসার মতো আসা এই তো জামাইয়ের প্রথম। মোহিনীকে সে একপ্রস্থ ধুতিচাদর জামা জুতা কিনিয়া দিল, দিল দামি জিনিস, জামাই যে পঞ্চাশ টাকার চাকরে। শ্যামার টাকা ফুরাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু কী করিবে, এ সব তো না করিলে নয়।

কাজ করিতে করিতে শ্যামা বকুলের ভাবভঙ্গি লক্ষ করে। মোহিনী আসিয়াছে বলিয়া খুশি হয় নাই বকুল। এমন চাপা মেয়েটা তার, মুখ দেখিয়া কিছু কী বুঝিবার জো আছে! খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে অনেক রাত্রি হয়, বকুল আসিয়া শ্যামার বিছানায় শুইয়া পড়ে, শ্যামা বলে, রাত অনেক হল, আর এখানে কেন মা? ঘরে যাও।

এখানেই শুই না আমি?—বকুল বলে।

শ্যামা ভয় পাইয়া সুপ্রভার মেয়েকে ডাকিয়া আনে। সে টানাটানি করে, বকুল যাইতে চায় না, শ্যামার বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে। শেষে ধৈর্য হারাইয়া শ্যামা দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলে, পোড়ারমুখি, কেলেঙ্কারি করে সকলের মুখে তুই চুনকালি দিবি? যা বলছি যা, মেরে ছেঁচে ফেলব তোকে আমি।

সুপ্রভার মেয়ে বলে, আহা মামি, বকো না গো, যাচ্ছে।

তারপর বকুল উঠিয়া যায়। শ্যামা চুপ করিয়া তক্তপোশে বসিয়া ভাবে। নানা কারণে সে বড়ো বিষাদ বোধ করে। কে জানে কী আছে মেয়েটার মনে। পূজার সময়, চারিদিকে আনন্দ উৎসব, বিধানও কাছে নাই যে ছেলের মুখ দেখিয়া মনটা একটু শান্ত হয়। ছেলে বড়ো হইয়াছে তাই আর কলেজ ছুটি হইলে ছুটিয়া মার কাছে আসে না, বন্ধুর সঙ্গে বেড়াইতে যায়।

শীতল বোধ হয় বাহিরে তাসের আড্ডায় বসিয়া আছে, শ্যামার বারণ না মানিয়া সে আজ সিদ্ধি গিলিয়াছে একরাশি। কে আছে শ্যামার? সারাদিনের খাটুনির পর শরীর শ্রান্ত অবসন্ন হইয়া আসিয়াছে, মনের মধ্যে একটা দুঃসহ ভার চাপিয়া আছে, কত যে একা আর অসহায় মনে হইতেছে নিজেকে সেই শুধু তা জানে, এতটুকু সান্ত্বনা দিবারও কেহ নাই।

ভালো করিয়া আলো হওয়ার আগে উঠিয়া শ্যামা বকুলের ঘরের দরজায় চোখ পাতিয়া দাওয়ায় বসিয়া রহিল। বকুল বাহির হইলে একবার সে তাহার মুখখানা দেখিবে। খানিক বসিয়া থাকিয়া শ্যামার লজ্জা করিতে লাগিল, এদিক ওদিক সে একটু ঘুরিয়া আসিল, পুকুরঘাটে গিয়া মুখে চোখে জল দিল। এও এক শরৎকাল, শ্যামার জীবনে এমন কত শরৎ আসিয়া গিয়াছে. পুকুরের শীতল জল, ঘাসের কোমল শিশির শ্যামার মুখে আর চরণে কত কী নিবেদন জানায়। সে কী একদিন বকুলের মতো ছিল? কবে?

তারপর ভিতরে গিয়া শ্যামা দেখিল, বকুলের ঘরের দরজা খোলা। কিন্তু বকুল কোথায়? শ্যামা এদিক ওদিক তাকায়, সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় ভিতরে চাহিয়া দ্যাখে মশারি তোলা, বিছানা খালি, বকুল বা মোহিনী কেউ ঘরে নাই। এত ভোরে কোথায় গেল ওরা? শ্যামা গালে হাত দিয়া সিঁড়িতে বসিয়া রহিল।

রান্নাঘরের পাশ দিয়া চোরের মতো বাড়িতে ঢুকিয়া শ্যামাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া দুজনেই তাহারা লজ্জা পাইল। মোহিনী ঘরে চলিয়া গেল। বকুল শ্লথ পদে মার কাছে আসিল।

কোথা গিয়েছিলি বকুল?

বকুল কথা বলে না। পাশে বসাইয়া শ্যামা একটা হাতে তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। তাই বটে, তেমনি রাঙা বটে বকুলের মুখ, ঢেঁকিঘরে সেদিন শ্যামা যেমন দেখিয়াছিল। শুধু আজ ওর চোখ দুটি ছলছল নয়।

দশমীর দিন বেলা দশটার সময় অপ্রত্যাশিতভাবে বিধান আসিল। শ্যামা আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, তুই যে চলে এলি খোকা? মন টিকল না বুঝি সেখানে তোর?

হঠাৎ শ্যামার মন হালকা হইয়া গিয়াছে। সেদিন ভোরে মোহিনীর সঙ্গে বেড়াইয়া আসিয়া বকুলের মুখ যে রাঙা হইয়াছিল তা দেখিবার পরেও শ্যামার মন কি ভার হইয়া ছিল? ছিল বইকী! শ্যামার ভাবনা কি শুধু বকুলের জন্য। এমনই শরৎকালে যাকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল, সোনার টুকরার সঙ্গে লোকে যাকে তুলনা করে, তাকে না দেখিলে শ্যামার ভালো লাগে না। মোহিনীর জন্য মাছ মাংস রাঁধিতে রাঁধিতে উন্মনা হইয়া চোখের জল সে ফেলিয়াছিল কার জন্য?

বিধান আসিয়াছে। আর শ্যামার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে শরৎ আসিয়াছে হাসির মতো, এতদিন শ্যামা হাসিতে পারে নাই। এবার শ্যামার মুখেও হাস ফুটিযাছে।

পরদিন বকুলকে বিদায় দিয়াও শ্যামার মুখ তাই বেশিক্ষণ ম্লান রহিল না। রান্নাঘরে গিয়া তার কাছে পিঁড়ি পাতিয়া বিধান বসিতে না বসিতে কখন যে সে ভুলিযা গেল মেয়ের বিরহ!

নয়

শ্যামার মনে আবার নিবিড় হইয়া আর্থিক দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এবার আর কোনোদিকে সে উপায় দেখিতে পায় না। আগে দুরবস্থায় পড়িয়া একটা ভরসা সে করিতে পারিত, বাড়িটা বিক্রয় করিয়া দিলে মোটা কিছু টাকা পাওয়া যাইবে। এখন সে ভরসাও নাই। বাড়ি বিক্রির অতগুলি টাকা কেমন করিযা নিঃশেষ হইয়া গেল? অপচয় করিয়াছে নাকি সে? হয়তো আরও হিসাব করিয়া খরচ করা উচিত ছিল। এক সঙ্গে অনেকগুলি টাকা হাতে পাইয়া নিজেকে হয়তো সে বড়োলোক ঠাওরাইয়াই বসিযাছিল।

তবে এ কথা সত্য যে এ কবছর একটি পয়সাও ঘরে আসে নাই। ফোঁটা-ফোঁটা করিয়া ঢালিলেও কলসির জল একদিন শেষ হইয়া যায়। বিধানের পড়ার খরচও কী সহজ! বকুলের বিবাহেও ঢের টাকা লাগিয়াছে।

কিন্তু এখন উপায়?

শ্যামা এবার একটু মন দিযা শীতলের ভাবভঙ্গি লক্ষ করিতে লাগিল। খায়দায় তামাক টানিয়া তাসপাশা খেলিয়া দিন কাটায়, হাঁটে একটু খোঁড়াইয়া, বদহজমে ভোগে, রাত্রে ভালো ঘুম হয় না। তবু কিছু কি শীতল করিতে পারে না? ঘরে বসিয়া থাকিয়াই হযতো সে একেবারে সারিয়া উঠিতে পারিতেছে না, কাজেকর্মে মন দিলে হয়তো সুস্থ হইবে!

চুলে শীতলের পাক ধরিয়াছে। বিবর্ণ কপোলের ঠিক উপরে একগোছা চুল একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। না, বয়স শীতলের কম হয় নাই। বিবাহ সে বেশি বয়সেই করিয়াছিল, বয়স এখন ওর পঞ্চাশের কাছে গিয়াছে বইকী। তবু, পঞ্চাশ বছর বয়সে পুরুষ মানুষ কি রোজগার করে না? হারাণ পঁয়ষট্টি বছর পর্যন্ত কত টাকা উপার্জন করিয়াছে, শীতল কি কিছু ঘরে আনিতে পারে না, যৎসামান্য? পঞ্চাশটা টাকা অন্তত? আর কিছু হোক বা না হোক, বিধানের পড়ার খরচ তো দিতে হইবে।

মৃদুমৃদু শীত পড়িয়াছে। কোঁচার খুট গায়ে জড়াইয়া বাহিরের অঙ্গনের জামগাছটার গোড়ায় বেতের মোড়াতে বসিয়া শীতল তামাক টানে। বাড়ির পোষা কুকুরটা পায়ের কাছে মুখ গুঁজিয়া

চুপচাপ শুইয়া থাকে, মাঝে মাঝে শীতলের পা চাটিয়া দেয়। কুকুরটাব সঙ্গে শীতলের বড়ো ভাব। কুকুরটাও তার বড়ো বাধ্য। শ্যামা কাছে আসিয়া মানুষ ও পশুর চোখ-বোজা নিবিড় তৃপ্তির আলস্য চাহিয়া দ্যাখে।

কিন্তু উপায় কী? শ্যামার আর কে আছে, কে তার জন্য বাহির হইবে উপার্জন করিতে?

ধীরে ধীরে মিষ্টি করিযাই কথাগুলো সে বলে, ভীত বিস্মিত চোখে তার মুখের দিকে চাহিয়া শীতল শুনিয়া যায়। কিছু সে যেন বুঝিতে পারে না, সংসার, কর্তব্য, টাকার অভাব, খোকাব পড়া সব জড়াইয়া শ্যামা যেন তাকে ভয়াবহ শাসনের ভয দেখাইতেছে।

শীতল মাথা নাড়ে, সন্দিগ্ধভাবে। সে কী করিবে? কী করিবার ক্ষমতা তার আছে? শিশুর মতো আহত কণ্ঠে সে বলে, আমার যে অসুখ গো?

অসুখ তা জানি, সেরে তো উঠেছ খানিকটা, ঠাকুরজামাইকে বলে কম-খাটুনির একটা কাজ-টাজ তুমি করতে পারবে। আমি আর কতকাল চালাব?

বাড়ির টাকা পেলে, বাড়িটা কার?—শীতল বলে।

বটে! তাই তবে শীতল মনে করিযাছে, তার বাড়িব টাকায এতকাল চলিয়াছে আর তাহাব কিছু করিবার প্রয়োজন নাই? এতকাল সেই সংসার চালাইয়াছে, এই কথা ভাবিযা বাখিয়াছে শীতল? এবাব তাই তাহাব বসিযা থাকার অধিকাব জন্মিয়াছে!

এ সব জ্ঞান তো টনটনে আছে দেখি বেশ?—শ্যামা বলে।

কুকুবটা উঠিযা যায়। শীতলেব দৃষ্টি তাহাকে অনুসরণ করে। তাবপব আবাব কাতরকণ্ঠে সে বলে, আমাব অসুখ যে গো?

একদিনে হাল ছাড়িবাব পাত্রী শ্যামা নয়। বারবার শীতলকে সে তাহাদের অবস্থাটা বুঝাইবাব চেষ্টা করে। কড়া কথা সে বলে না, লজ্জা দেয় না, অপমান করে না। আবার বাহির হইয়া ঘরে টাকা আনা শীতলের পক্ষে এখন কত কঠিন সে তা বোঝে, পাবুক না পারুক গা-ঝাড়া দিযা উঠিয়া শীতল একবার চেষ্টা করুক এইটুকু শুধু তার ইচ্ছা।

বাখালকে শ্যামা একদিন বলিয়াছিল, ঠাকুরজামাই, আবার তো আমি নিবুপায় হলাম?

কেন? অত টাকা কী করলে বউঠান? তখনি বলেছিলাম টাকা তুমি রাখতে পারবে না—

ঠাকুরজামাই, ছেলেকে আমার বি এ টা আপনি পাশ করিয়ে দিন।

পড়ার খরচ দেবার কথা বলছ বউঠান?

হ্যাঁ, রাখাল এবাব রাগ করিযাছিল। সে কি রাজা না জমিদার? কতটাকা মাহিনা পায় সে শ্যামা জানে না? এ কী অন্যায কথা যে শ্যামা ভুলিয়া যায় ক্ষমতার মানুষের একটা সীমা আছে, আজ কত বছর শ্যামা সকলকে লইয়া এখানে আছে, কত অসুবিধা হইয়াছে রাখালের, কত টানাটানি গিয়াছে তাহার কিন্তু কিছু সে বলে নাই, বলে নাই এই ভাবিয়া যে যতদিন তার দুমুঠা ভাত জুটিবে শ্যামার ছেলেমেয়েকে একমুঠা তাকে দিতে হইবে, সেটা তার কর্তব্য। তাই কি শ্যামা যথেষ্ট মনে করে না একটা ছাপোষা মানুষের পক্ষে?

ঠাকুরজামাই, একবছর আমিও তো কিছুকিছু সংসার খরচ দিয়েছি?

বলিয়া শ্যামা সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপ করে। অনুগ্রহ চাহিতে আসিয়া এমন কথা বলিতে আছে! মুখখানা তাহার শুকাইয়া যায়! রাখাল বলে, তা জানি বউঠান, আজ বলে নয় গোড়া থেকে জানি কৃতজ্ঞতা বলে তোমার কিছু নেই। যাক, আমার কর্তব্য আমি করেছি, নিন্দাপ্রশংসার কথা তো আর ভাবিনি, এখানে থাকতেও তোমাদের আমি বারণ করিনে, তার বেশি আমি কিছু পারব না বউঠান, আমায় মাপ করো—এই হাত জোড় করলাম তোমার কাছে।

শীতলের একটা ব্যবস্থা? বিধানের পড়ার খরচ না দিক শীতলের জন্য রাখাল কিছু করিতে পারে না?

শীতল? রাখাল অবাক হইয়া থাকে। শীতল চাকরি করিবে, ওই অসুস্থ আধপাগলা মানুষটা! কী বলছ বউঠান তুমি, তোমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে?

আমার যে উপায় নেই ঠাকুরজামাই?

শেষে রাখাল বলে, আচ্ছা দেখি।

রাখাল সত্যই চেষ্টা করিল। শীতল বহুকাল কলিকাতার প্রেসে বড়ো চাকরি করিয়াছে, এই সব বলিয়া কহিয়া বোধ হয় স্থানীয় একটা ক্ষুদ্র ছাপাখানায় একটা কাজ সে জোগাড়ও করিয়া ফেলিল শীতলের জন্য। বেতন পনেরো টাকা। কাজকর্ম দেখিবে, খাতাপত্র লিখিবে, মফস্বলের ছোটো ছাপাখানা, কাজ সামান্যই হয়, শীতল পারিবে হয়তো।

খবর শুনিয়া শীতল বিবর্ণ হইয়া বলিল, অসুখ যে আমার, আমি পারব কেন? কলম ধরলে আমার যে হাত কাঁপে, আমি যে লিখতে পারিনে রাখাল?

শ্যামা বলিল, আগে থেকে ভড়কাচ্ছ কেন বল তো? গিয়েই দ্যাখো না পার কিনা, দুদিন যেতে আরম্ভ করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোথায় পঞ্চাশ, কোথায় পনেরো। পঞ্চাশই বা কেন? ছাপাখানায় কাজ করিয়া তিনশো টাকাও তো শীতল একদিন মাসে মাসে ঘর আনিয়াছে। তবে আজ সে কথা ভাবা মিছে। সেদিন আর ফিরিবে না, সে শীতল নাই, সে শ্যামাও নাই। পঞ্চাশ টাকার আশা করিয়া পনেরো টাকাতেই শ্যামা এখন খুশি হইতে জানে।

শীতল আপিসে যায়। ছাপাখানা প্রায় আধ মাইল দূরে। স্নান করিয়া খাইয়া শীতল ছেঁড়া কোটটি গায়ে চাপায়, বিষণ্ণ সকাতর মুখে হুঁকায় কয়েকটা শেষটান দিয়া মোটা লাঠিটি বাগাইয়া ধরে। বড়ো দুর্বল পা দুটি শীতলের, লাঠিতে ভর দিয়া সে গুটিগুটি হাঁটিতে আরম্ভ করে। পোষা কুকুরটি তখন উঠিয়া দাঁড়ায়, লেজ নাড়িতে নাড়িতে সে শীতলের সঙ্গে যায়। পুকুর ঘুরিয়া গলি পথ পার হইয়া বড়ো সদর রাস্তা পর্যন্ত শীতলকে আগাইয়া দিয়া আসে।

বকুল চিঠি লিখিয়াছে, সে ভালো আছে। বিধান চিঠি লিখিয়াছে, সেও ভালো আছে। সকলে ভালো আছে।

শরীরটা শ্যামারও বহুকাল ভালোই আছে। দুবেলা রাঁধে, সংসারের কাজকর্ম করে, অবিশ্রাম খাটুনি শ্যামার, শক্ত সবল দেহ না থাকিলে কবে শ্যামা ক্ষয় হইয়া যাইত। এত খাটিতে হয় কেন শ্যামাকে? আশ্রিতার সমস্ত অবসর মুহূর্তগুলো কেমন করিয়া কর্তব্যে ভরিয়া ওঠে কেহ টেরও পায় না। একদিন দেখা যায় ভোর পাঁচটা হইতে রাত এগারোটা অবধি যত কাজ তার পক্ষে করা সম্ভব সব সে করিতেছে একা।

কস্তাপাড় মোটা একখানা শাড়ি পরিয়া শ্যামা কাজ করে, দেখিয়া কে বলিবে সে এ বাড়ির দাসী নয়। হাতের চামড়া তাহার কর্কশ হইয়াছে, থাবা হইয়াছে বড়ো, আধমন জলের বালতি সে অবলীলাক্রমে তুলিয়া নেয়, গায়ে এত জোর। ছেলেমেয়েরা বড়ো হইয়াছে, রাত্রে তাহাকে বারবার উঠিতে হয় না, বিধানও এখানে নাই যে জাগিয়া বসিয়া সে তাহার পাঠরত পুত্রের দিকে চাহিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিবে, কাজকর্ম শেষ করিয়া শোয়া-মাত্র শ্যামা ঘুমাইয়া পড়ে, কোথা দিয়া রাত কাটিয়া যায় সে টেরও পায় না। টাকার চিন্তা করে না শ্যামা? শীতলের পনেরো টাকার চাকরিতেই সে নির্ভাবনা হইয়া গিয়াছে নাকি! চিন্তার তাহার শেষ নাই। তবে রাত জাগিয়া কোনো ভাবনাই সে ভাবিতে পারে না। সারাদিন সহস্র কাজের সঙ্গে ভাবনার কাজটাও সে করিয়া যায়, অনেকটা কলের মতো, পাঠাভ্যাসের মতো।

এমনই হইয়াছে আজকাল। আজীবন শ্যামা যে একা, কারও সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ভাবিবার সুযোগ সে যে কোনোদিন পায় নাই, অতীতের স্মৃতিতে, বর্তমানের সম্পদে-বিপদে, ভবিষ্যতের জল্পনাকল্পনায় চিত্ত তাহার নিঃসঙ্গ, নির্ভরহীন।

ফণী একবার নিউমোনিয়ায় মরমর হইয়া বাঁচিয়া উঠিল, মন্দার যমজ ছেলে দুটির একজন, সে কালু, মরিল জ্বরবিকারে। পড়াশোনা ভাই দুটি বেশি দূর করে না, পাটের ব্যাবসা আরম্ভ করিয়াছিল। গতবছর একদিনে একলগ্নে দুভাইয়ের বিবাহ দিয়া মন্দা আনিয়াছিল দুটি বউ! শ্যামার জীবনে ওদের বিশেষ কোনো স্থান ছিল না, কালুর মরণ শ্যামার কাছে বিশেষ কিছু শোচনীয় ব্যাপার নয়, তবু সেও বিশেষ যেন গভীর শোক পাইল। মন খারাপ হইয়া যাওয়া আশ্চর্য ছিল না। মামি বলিয়া কোনোদিন খাতির না করুক, আশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে অপমানজনক ব্যবহার করুক, যত্ন করিয়া ওকে তো দুবেলা সে ভাত বাড়িয়া দিয়াছে। কিন্তু এমন শোক কেন, পুত্রশোকের মতো? কালুকে মনে করিয়া, কচি বউটাব বিধবার বেশ দেখিয়া, শ্যামার বুকের ভিতরটা পাক দিয়া যেন ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, উন্মাদিনী মন্দাকে দুটি সবল বাহু দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিয়া অসহ্য বেদনায় শ্যামাও অজস্র চোখের জল ফেলিল। কেন তার এই অস্বাভাবিক ব্যথা?

পরে, মন্দার শোকও যখন শান্ত হইয়া আসিয়াছে, তখনও শ্যামা যেন অশান্ত হইয়া রহিল মনে মনে। রহস্যময় মনোবেদনা নয়, সাময়িক মনোবিকার নয়, একটা দিনও যে হাসিয়া কথা বলে নাই সেই কালুর জন্য স্পষ্ট দুরন্ত জ্বালা! শ্যামার মতো কালুর বউও অল্প বয়সে বাপ-মাকে হারাইয়াছিল, হঠাৎ শ্যামা যেন তাব জন্য পাগল হইয়া উঠিল, নিজের মেয়েকেও সে বুঝি এত ভালো কখনও বাসে নাই। বউয়ের বিধবা বেশ মন্দা দেখিতে পারে না, নিজের শোক লইয়াই সে বিব্রত, বউ সামনে গেলে কখনও সে শাপিতে আরম্ভ করে, বউকে বলে মানুষখেকো রাক্ষুসি, আবার কখনও বুকে জড়াইয়া হাহা করিয়া কাঁদে, তারপরেই দূরদূর করিয়া তাড়াইয়া দেয়, চোখেব সামনে থেকে সরে যা তুই, সরে যা অলক্ষ্মী। শ্যামার মমতায় কালুর বউ বড়ো একটি আশ্রয় পাইল। শ্যামার প্রশস্ত বুকে মাথা রাখিয়া সজল চোখে সে ঘুমায়, জাগিয়া ওঠে শ্যামারই বুকে, সারারাত ঠায় একভাবে কাটাইয়া শ্যামার পিঠের মাংসপেশি খিঁচিয়া ধরিয়াছে তবু সে নড়ে নাই, কর্ণ যে ভাবে বজ্রকীটের কামড় সহিয়াছিল তেমনিভাবে দেহের যাতনা সহিয়াছে,—নড়িতে গেলে ঘুম ভাঙিয়া বউ যদি আবার কাঁদে?

কালুর জন্য শ্যামার শোক কেন বুঝিতে না পারা যাক, কালুর বউয়ের জন্য তার ভালোবাসা নিশ্চয় বকুলের বিরহ? কিন্তু তা যদি হয় তবে কালুর জন্য শ্যামার এই শোক বিধানের বিরহ হইতে পারে তো!

ও সব নয়। আসলে শ্যামার মনটাই আলগা হইয়া আসিতেছে, পচিয়া যাইতেছে। গোড়াতে সাত বছর একদিকে পাগলা শীতলের সঙ্গে বাস করিতে কাঁচা বয়সের মনটা তাহার কুঁকড়াইয়া গিয়াছিল অন্যদিকে ছিল মাতৃত্বলাভের প্রাণপণ প্রয়াসের ব্যর্থতা—দুটি একটি সঙ্গী অথবা আত্মীয়স্বজন থাকিলে যাহা তাহার এতটুকু ক্ষতি করিতে পারিত না কিন্তু একা পাইয়া সাত বছরে যাহা তাহাকে প্রায় কাবু করিয়া আনিয়াছিল,—এতকাল পরে এখন, জীবন-যুদ্ধে পরিশ্রান্ত মনটাতে যখন তাহার আর তেমন তেজ নাই, সেই অস্বাভাবিকতা, সেই বিকার ও পর অধিকার বিস্তার করিতেছে।

মানুষ নয় শ্যামা? জীবনের তিনভাগ কাটিয়া গেল, এর মধ্যে একদিন সে বিশ্রাম পাইয়াছে? দেহের বিশ্রাম নয়। দেহ তার ভালোই আছে, গর্ভের নবাগত সন্তানকে বহিয়া সে কাতর নয়। বিশ্রাম পায় নাই তার মন। এখন তাহার একটু সুখ শান্তি ও স্বাধীনতার প্রয়োজন আছে বইকী। প্রসবের তিনদিন আগেও শ্যামা একা একশোজনের ভোজ রাঁধিয়া দিবে, শুধু পরের আশ্রয় হইতে এবার তাকে লইয়া চল, ভবিষ্যৎকে একটু নিরাপদ করিয়া দাও, আর ওষুধের মতো পথ্যের মতো একটু স্নেহ দাও শ্যামাকে। একটু নিঃস্বার্থ অকারণ মমতা।

স্বামী আর আত্মীয়স্বজন শ্যামার সেবা লইয়াছে। সন্তান লইয়াছে সেবা ও স্নেহ। প্রতিদানে সেবা শ্যামা চায় না। আজ শ্যামাকে কেহ একটু স্নেহ দাও?

বড়োদিনের সময় বিধান আসিলে সুপ্রভা বলিল, বড়ো হয়েছ তুমি তোমার সব বোঝা উচিত বাবা, বাপ তো তোমার সাতেও নেই পাঁচেও নেই—মার দিকে একটু তাকাও? কী রকম হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাও না? চাউনি দেখলে বুকের মধ্যে কেমন করতে থাকে, সেদিন দেখি বিড়বিড় করে কী সব বকছে আপন মনে, আমার তো ভালো মনে হয় না।

বিধানের দুচোখ ভরা রোষ, বলিল, তবু তো খাটিয়ে মারছেন।

সুপ্রভা আহত হইয়া বলিল, আমাকে তুমি এমন কথা বললে বিধান, কত বলেছি আমি তুমি তার কী জানবে? মাকে তোমার একদণ্ড বসিয়ে রাখার সাধ্যি আছে কারও? নইলে এতলোক বাড়িতে, তোমার মা কিছু না করলে কাজ কি এ বাড়ির আটকে থাকবে?—সুপ্রভা অভিমান করিল, বেশ, আমরা না হয় পর, তুমি তো এসেছ এবার, পার যদি রাখ না মাকে তোমার বসিয়ে?

বিধান কারও অভিমানকে গ্রাহ্য করে না, বলিল, না ছোটোপিসি, মাকে আর এখানে আমি রাখব না, আমি নিতে এসেছি মাকে।

ওমা, কোথায়? কোথায় নিয়ে যাবে?

খবর রটিবামাত্র সুপ্রভার মুখের এই প্রশ্ন সকলের মুখে গুঞ্জরিত হইতে থাকে। বিধান শ্যামাকে লইতে আসিয়াছে? মাকে আর এখানে সে রাখিবে না? কোথায় লইবে? কার কাছে? অতটুকু ছেলে, এখনো বি এ-টা পর্যন্ত পাশ দেয় নাই, এ সব কী মতলব সে করিয়াছে?

পড়া ছেড়ে দিয়েছিস খোকা? চাকরি নিয়েছিস? আমাকে না বলে এমন কাজ কেন করতে গেলি বাবা—বলিয়া শ্যামা কাঁদিতে আরম্ভ করে।

বিধান বলে, কাঁদছ কেন, অ্যাঁ? ভালো খবর আনলাম কোথায় আহ্লাদ করবে তা নয় তুমি কান্না জুড়ে দিলে? পাশ তো দিতাম চাকরির জন্যে? ভালো চাকরি পেয়ে গেলাম আর পাশ দিয়ে কী করব? ব্যাংকে লোক নেবার জন্যে পরীক্ষা হল, শঙ্কর আমাকে পরীক্ষা দিতে বললে, পাশটাশ করব ভাবিনি মা, তিনশো ছেলের মধ্যে থার্ড হয়ে গেলাম। প্রথম সাতজনকে নিলে—নব্বই টাকায় শুরু।

নব্বই? বিশ-পঁচিশ টাকার কেরানি বিধান তবে হয় নাই? শ্যামা একটু শান্ত হয়, বলে, আমায় কিছু লিখিসনি যে?

এটা বোঝানো একটু কঠিন শ্যামাকে। পড়াশোনা করিয়া বিধান একদিন বড়ো হইবে, এত বড়ো হইবে যে চারিদিকে রব উঠিবে ধন্য ধন্য—শ্যামার এ স্বপ্নের খবর বিধানের চেয়ে কে ভালো করিয়া রাখে? তাই পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইয়াছে চিঠিতে শ্যামাকে এ কথা লিখিতে বিধানের ভয় হইয়াছিল। শুধু তাই নয়। বিধান ভাবিয়াছিল সে দুশো-চারশো টাকার চাকরি করিবে এই প্রত্যাশায় শ্যামা দিন গুনিতেছে, নব্বই টাকার চাকরি শুনিয়া সে যদি খেপিয়া যায়?

পরীক্ষা পর্যন্ত আরও একটা বছর ছেলের পড়ার খরচ দিতে পারিবে না ভাবিয়াই শ্যামা যে খেপিয়া যাইতে বসিয়াছিল বিধান তো তাহা জানিত না, চাকরিটা তাহার নব্বই টাকার শুনিয়াই শ্যামা এমনভাবে কৃতার্থ হইয়া গেল যে বিধান অবাক হইয়া রহিল। সন্দিগ্ধভাবে সে জিজ্ঞাসা করিল, খুশি হওনি মা তুমি?

খুশি হয় নাই!—খুশিতে শ্যামা আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করে, এতকাল শ্যামাকে যারা অবহেলা অপমান করিয়াছে তাদের টিটকারি দেয়, কলিকাতার মস্ত বাড়ি ভাড়া নেয়, বকুলকে আনে। বিধানের বিবাহ দেয়, দাসদাসীতে ঘর-বাড়ি ভরিয়া তোলে। তারপর হাসিমুখে সকলকে ডাকিয়া বিধানের চাকরির কথা শোনায়, তার দুধের ছেলে নব্বই টাকার চাকরি জোগাড় করিয়াছে, কারও সাহায্য চায়

নাই, কারও তোষামোদ করে নাই,—বল তো বাছা এবার তাদের মুখ রইল কোথায় ছেলেকে আমার পড়ার খরচটুকু পর্যন্ত যারা দিতে চায়নি? কথাবার্তা শুনিয়া মনে হয় শ্যামা সত্যই বড়ো অকৃতজ্ঞ! এতগুলো বছর যার আশ্রয়ে সে থাকিয়াছে এখন ছেলের চাকরি হওয়ামাত্র নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে তার। এরা যে কত করিয়াছে তার জন্য সব সে ভুলিয়া গিয়াছে, মনে রাখিয়াছে শুধু ত্রুটিবিচ্যুতি, অপমান-অবহেলা। মন্দা রাগিয়া বলে, ধন্যি তুমি বউ, এতও ছিল তোমার পেটে-পেটে! এত যদি কষ্ট পেয়েছ তুমি এখেনে থেকে, থাকলে কেন? নিজের রাজ্যপাটে গিয়ে বসলে না কেন রাজরানি হয়ে? আজ পাঁচ বছর তোমাদের পাঁচটি প্রাণীকে আমি পুষলাম, ছেলে পড়ালাম, মেয়ে বিয়ে দিলাম তোমার, আজ দিন পেয়ে আমাদের তুমি শাপছ!

অবাক হইয়া শুনিয়া শ্যামা কাঁদিতে কাঁদিতে বলে, না ঠাকুরঝি, তোমাদের কিছু বলিনি তো আমি, কেন বলব তোমাদের? কম করেছ আমার তোমরা! আমাকে কিনে রেখেছ ঠাকুরঝি, তোমাদের ঋণ আমি সাতজন্মে শোধ দিতে পারব না। তোমাদের নিন্দে করে একটি কথা কইলে মুখ আমার খসে যাবে না, কুষ্ঠ হবে না আমার জিভে!—বলে আর হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া শ্যামা ভাসাইয়া দেয়।

শ্যামা কী পাগল হইয়া গিয়াছে? এতদিনে তার আবার সুখের দিন শুরু হইল, এমন সময় মাথাটা গেল তার খারাপ হইয়া? অনেক বলিয়া বিধান তাহাকে শোয়াইয়া রাখিল, বারবার জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কী হয়েছে মা?—তারপর শ্যামা অসময়ে আজ ঘুমাইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া সে যখন জাগিল আর তাকে অশান্ত মনে হইল না। সে শান্ত নীরব হইয়া রহিল।

কত কথা শ্যামার বলিবার ছিল, কত হিসাব কত পরামর্শ, কিন্তু এক অসাধারণ নীরবতায় সব চাপা পড়িয়া রহিল। বিধান বলিল, কলিকাতায় সে বাড়ি ভাড়া করিয়া আসিয়াছে, শ্যামা জিজ্ঞাসাও করিল না কেমন বাড়ি, কখানা ঘর, কত ভাড়া। এতকাল এখানে থাকিয়া তার চাকরি হওয়ামাত্র একটা মাসও অপেক্ষা না করিয়া সকলের চলিয়া যাওয়াটা বোধ হয় ভালো দেখাইবে না, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা সায় দিয়া গেল। কিন্তু ঝোকের মাথায় বাড়ি-টাড়ি যখন সে ঠিক করিয়াই আসিয়াছে দু-চারদিন পরে চলিয়া তাদের যাইতে হইবে, বিধান এই কথা বলিলে শ্যামা তাতেও সায় দিল। ছেলের সব কথাতেই সে সায় দিয়া গেল।

শেষে বিধান বলিল, পড়া ছেড়েছি বলে তুমি নিশ্চয় রাগ করেছ মা!

শ্যামা একটু হাসিল, না খোকা রাগ করিনি, বড়ো হয়েছ এখন তুমি বুঝেশুনে যা করবে তাই হবে বাবা, তোমার চেয়ে আমি তো ভালো বুঝিনে, আমার বুদ্ধি কতটুকু?

কাজে যোগ দিতে বিধানের দিন দশেক দেরি ছিল, যাই-যাই করিয়াও দিন সাতেক এখানে তাহারা রহিয়া গেল। শীতল চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে জামগাছের তলে বসিয়া তামাক টানিতে লাগিল, পোষা কুকুরটি শুইয়া রহিল তাহার পায়ের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া। শীতলের ইচ্ছা আছে কুকুরটিকেও সঙ্গে লইয়া যাইবে কলিকাতায়, কিন্তু মনের ইচ্ছা প্রকাশ করিতে তার সাহস হইল না।

পাগল হওয়ার আর কোনো লক্ষণ শ্যামার দেখা গেল না, সেদিন ঘুমাইয়া উঠিয়া তার যে অসাধারণ নীরবতা আসিয়াছিল তাই শুধু কায়েমি হইয়া রহিল। আর যেন তাহার কোনো বিষয়ে দায়িত্ব নাই, মতামত নাই, সে মুক্তি পাইয়াছে। জীবন-যুদ্ধ তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার বিধান লড়াই চালাক, বিধান সব ব্যবস্থা করুক, সংসারের ভালোমন্দের দায়িত্ব থাক বিধানের, শ্যামা কিছু জানে না, জানিতে চাহে না,—ঘরের মধ্যে অন্তঃপুরের গোপনতায় তার যা কাজ এবার তাই শুধু সে করিবে। উপকরণ থাকিলে রাঁধিয়া দিবে পোলাউ, না থাকিলে দিবে শাকভাত। বিধান তাহাকে এখানে রাখিলে এখানেই সে থাকিবে, কলিকাতা লইয়া গেলে কলিকাতা যাইবে, সব সমান শ্যামার কাছে। বিধানের

চাকুরি-লাভও শ্যামার কাছে যেন আর উল্লাসের ব্যাপার নয়, খুব সাধারণ ঘটনা। এই তো নিয়ম সংসারের? স্বামী-পুত্র উপার্জন করে, স্ত্রী ও জননী ভাত বাঁধে। আর ভালোবাসে। আর সেবাযত্ন করে। আর নির্ভয় নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে অক্ষয় অমর একটি নির্ভরে।

শহবতলিতে নয়, এবার খাস কলিকাতায় নূতন বাড়িতে শ্যামা নূতন সংসাব পাতিল। বাড়িটা নূতন সন্দেহ নাই, এখনও রঙের গন্ধ মেলে। দোতলা বাড়ি, একতলাতে বাড়িওলা থাকে। দোতলার মাঝামাঝি কাঠের ব্যবধান, প্রত্যেক ভাগে দুখানা ঘব। রান্নার জন্য ছাদে দুটি ছোটোছোটো-টিনের চালা। শ্যামারা থাকে দোতলাব সামনের অংশটিতে, রাস্তার উপরে ছোটো একটু বারান্দা আছে। একটি স্বামী ও দুটি কন্যাসহ অপর অংশে বাস করে শ্রীমতী সরযূবালা দে, পাশ-করা ধাত্রী।

সরযূ যেমন বেঁটে তেমনি মোটা, ফুটবলের মতো দেখিতে। দেহের ভারেই সে যেন সব সময় হাঁপায়। কাজে যাওয়াব সময় সে যখন সাদা কাপড়-ঢাকা রিকশয় চাপে আর শীর্ণকায় কুলিটি রিকশ টানিয়া লইয়া যায়, উপর হইতে দেখিয়া শ্যামা হাসি চাপিতে পারে না।

সরযূব মেয়ে দুটি সুন্দরী। বড়ো মেয়েটির নাম বিভা, বিধানের সে সমবয়সিই হইবে, মেয়ে স্কুলে গান শেখায়। ছোটো মেয়েটির নাম শামু, বিধানের বউ হইলে মানায় এমনি বয়স, পড়ে স্কুলে। সবযূর সাধ শামুকে মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ কবাইয়া একেবারে ডাক্তার করিয়া ছাড়িবে—পাশ-করা ধাত্রী নয়, লেডি ডাক্তার। লেডি ডাক্তাররা বড়ো অবজ্ঞার চোখে দ্যাখে সরযূকে, এতটুকু নিজেব বুদ্ধি খাটাইতে গেলেই বকে। মেয়েকে এম বি করিতে পারিলে গায়ের জ্বালা সবযূব হয়তো একটু কমিবে—অন্তত তাই আশা।

ওমা, সে কী, মেয়েদের বিয়ে দেবেন না দিদি?—শ্যামা বলে।

করুক না বিয়ে? আমি কি ধরে রেখেছি? —বলিয়া সরযূ হাসে।

ওদেব ব্যাপারটা শ্যামা ভালো বুঝিতে পারে না। সরযূর স্বামী নৃত্যলাল কিছু করে না, বসিয়া বসিয়া খায় শীতলেব মতো, তবু গরিব ওবা নয়। সরযূ নিজে মন্দ রোজগার করে না, বিভাও পঞ্চাশ টাকা করিয়া পায়। কানা খোঁড়া কুৎসিতও নয় মেয়ে দুটি সবযূর। বিবাহ দেয় না কেন ওদেব? বাধা কীসের? বিভাব মতো বয়স পর্যন্ত বকুলকে অবিবাহিতা রাখিলে শ্যামা তো খেপিয়াই যাইত! ভাবনা হয় না সরযূব?

কী আনন্দেই ওবা দিন কাটায়! সাজিয়া-গুজিয়া ফিটফাট হইয়া থাকে, গান করে, গ্রামোফোন বাজায়, দিবারাত্রি শ্যামার কানে ভাসিয়া আসে ওদের হাসির শব্দ। মেয়ে দুটি শুধু নয়, মোটা সবযূ পর্যন্ত যেন উল্লাসের একটা হালকা হিল্লোলে ভাসিয়া বেড়ায়। বাপ মা আর মেয়েরা যেন বন্ধু, সমানভাবে তাহারা হাসিতামাশা করে, তাস খেলে চারজনে মিলিয়া, একসঙ্গে সিনেমা দেখিতে যায়। বাড়িতে লোকজনও কি আসে কম! সকলে তাহারা ধাত্রী ডাকিতে আসে না। অনেক বন্ধুবান্ধব আছে ওদের,—স্ত্রী ও পুরুষ। তাদেব মধ্যে কয়েকটি যুবক যে প্রায়ই কেন আসে শ্যামা তাহা বেশ বুঝিতে পাবে। কাঠের বেড়াব একটি ফোকরে চোখ রাখিয়া ও বাড়িতে পুরুষ ও নারীর নিঃসংকোচ মেলামেশা দেখিয়া শ্যামা থ বানিয়া যায়, গান শুনিতে শুনিতে তাহার ভাত পোড়া লাগে।

বিভা এ বাড়িতে বেশি আসে না, সে একটু অহংকারী। শামু হরদম আসাযাওয়া করে। শামুর প্রকৃতিটা শ্যামার একটু অদ্ভুত মনে হয়, একদিকে যেমন সে সরল অন্যদিকে আবার তেমনি পাকা। পোকায় কাটা ফুলেব মতো সে, খানিক অসাধারণ ভালো খানিক অসাধারণ মন্দ। এমনি বয়সে বিবাহ হইয়া বকুল শ্বশুরবাড়ি গিয়াছে, মেয়েটাকে শ্যামার একটু ভালোবাসিতে ইচ্ছা হয়, শিশুর মতো সরল আগ্রহের সঙ্গে শামু তাহার ভালোবাসাকে গ্রহণ করে, শ্যামা হয় খুশি। বিধানের সঙ্গে শামুর আলাপ করিবার ভঙ্গিটা শ্যামার ভালো লাগে না। কেমন সব হেঁয়ালি-ভরা ঠাট্টা শামু করে,

কেমন দুষ্ট-দুষ্ট মুচকি হাসি হাসে, আড়চোখে কেমন করিয়া সে যেন বিধানের দিকে তাকায়,—সকলের সামনে কী একটা অদ্ভুত কৌশলে সে যেন গোপন একটা ভাবতরঙ্গ তার আর বিধানের মধ্যে প্রবাহিত করিয়া রাখে। অতিশয় দুর্বোধ্য, সূক্ষ্ম ও গভীর একটা লুকোচুরি খেলা। শ্যামা কিছু বুঝিতে পারে না, তবু ভালোও তাহার লাগে না। একটু সে সতর্ক হইয়া থাকে। শামু বিধানের ঘরে গেলে মাঝে মাঝে নানা ছলে দেখিয়া আসে ওরা কী করিতেছে। কোনোদিন শামুকে বিধান পড়া বলিয়া দেয়, সেদিন শামুর শ্রদ্ধাপূর্ণ নিরীহ ভাবটি শ্যামার ভালো লাগে। কোনোদিন বিধান জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা বলে, বুঝিতে না পারিয়া শামু ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকায়, আর থাকিয়া-থাকিয়া ঢোঁক গেলে, সেদিনও শ্যামার মন্দ লাগে না। সে অসন্তুষ্ট হয় সেদিন, যেদিন শামু করে দুষ্টামি। দরজার বাহিরে শ্যামা থমকিয়া দাঁড়ায়। চোখ ঘুরাইয়া মুখভঙ্গি করিয়া শামু কথা বলে, বিধানের মুখের কাছে তর্জনী তুলিয়া শাসায়, তারপর হাসিয়া যেন গলিয়া পড়ে—দেখিয়া রাগে শ্যামার গা রিরি করিতে থাকে। এ কী নির্লজ্জ ব্যবহার অতবড়ো আইবুড়ো মেয়ের! এত কীসের অন্তরঙ্গতা? বিধান ওকে এত প্রশ্রয় দেয় কেন?

ঘরে ঢুকিয়া শ্যামা বলে, কী হচ্ছে তোদের! খুব সাবধানে বলে। বিধান না টের পায় সে অসন্তুষ্ট হইয়াছে।

শামু বলে, মাসিমা, আপনার ছেলে বাজি হেরে দিচ্ছে না—দিন তো শাসন করে?

কীসের বাজি বাছা? —শ্যামা বলে।

বললে জিভ দিয়ে আমি নাক ছুঁতে পারি দু টাকার সন্দেশ খাওয়াবে। নাক ছুঁলাম, এখন দিচ্ছে না টাকা।

জিভ দিয়া নাক-ছোঁয়া? এই ছেলেমানুষি ব্যাপার লইয়া ওদের হাসাহাসি? ছি, কী সব ভাবিতেছিল সে! তার সোনার টুকরো ছেলে, তার সম্বন্ধে ও কথা মনে আনাও উচিত হয় নাই। শ্যামা অপ্রতিভ হইয়া যায়।

বিভা আসিলে বসে না, দাঁড়াইয়া দুচারটি কথা বলিয়া চলিয়া যায়। আঁচল-লুটানো শিথিল-কবরী বিলাসী বাবু মেয়ে সে, উদাসী আনমনা তার ভাব, এ বাড়ির সকলের কত গভীর অপরাধ সে যেন ক্ষমা করিয়াছে এমনি উদার ও নম্র তাহার গর্ব। রাজরানি যেন শখ করিয়া দরিদ্র প্রজার গৃহে আসিয়াছে, স্মিত একটু হাসি, ছেঁড়া লেপতোশক ভাঙা বাক্‌সো-প্যাঁটরা ময়লা জামা-কাপড় দেখিয়াও নাক-না সিঁটকানোর মহৎ উদারতা, এই সব উপহার দিয়া সে চলিয়া যায়। বসিতে বলিলে বলে, এই যে বসি, বসার জন্য কী, বসেই তো আছি সারাদিন! এদিক-ওদিক তাকায় বিভা, শ্যামার হাঁড়ি-কলসি, লোহার চায়ের কাপ, ছেঁড়া চটের আসন, গোবর-লেপা ন্যাতা সব লক্ষ করে,—কিন্তু না, বিভার স্বপন-লাগা চোখে সমালোচনা নাই। কৃত্রিম না-থাকা নয়, সত্যই নাই। শ্যামা গামছা পরিয়া গা ধোয় বলিয়া বিভা তাকে অসভ্য মনে করে না, হাসে না মনে মনে। সে শুধু দুঃখ পায়। তার দয়া হয়। খাঁটি সমবেদনার সঙ্গেই সে মনে করে যে, আহা, একটু শিক্ষাদীক্ষা পাইলে এমনটা হইত না সকলের সামনে গামছা পরিতে শ্যামা লজ্জা পাইত।

হাসি যদি কখনও পায় বিভার, সে বিধানের জন্য। হঠাৎ ঘর হইতে বাহির হইয়া বিভাকে দেখিলে আবার সে ঘরে ঢুকিয়া যায়, বিভা যেন অসূর্যম্পশ্যা অন্তঃপুরচারিণী, নীচের বাড়িওয়ালার মেয়ে-বউ-এর মতো লজ্জাশীলা। বিধান নিজে লজ্জা পাইয়া সরিয়া গেলে কথা ছিল না, বিভার লজ্জা বাঁচানোর জন্য ভদ্রতা করিয়া সে সরিয়া যায় বলিয়াই বিভার হাসি পায়।

আপনার বড়ো ছেলে বুঝি? —সে জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ।

এত অল্পবয়সে পড়া ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছেন?

দুঃখের সংসার মা, উপায় কী! নইলে ছেলে আমার বড়ো ভালো ছিল পড়াশোনায়, ওর কি এ সামান্য চাকরি করার কথা? —বলিয়া শ্যামা নিশ্বাস ফ্যালে, কী পরীক্ষা দিয়ে ডেপুটি হয় না, তাই দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল, ভগবান বিরূপ হলেন।

বিভা বলে, ও।

শ্যামার একদিকের প্রতিবেশীরা এমনি। নীচের তলার বাড়িওলা তাদের মতোই ঘরোয়া গৃহস্থ মানুষ, সরযূদের মতো উড়ুউড়ু পাখি নয়। শ্যামার মতো তাদেরও ছোটো-ছেলের গন্ধ ভরা ছেঁড়া লেপতোশক! কর্তা ছিলেন আদালতের পেশকার, পেনশন লইয়া এখন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। প্রতি মাসেই দুই তারিখে সকালবেলা ভাড়ার রসিদ হাতে সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠিয়া ডাকেন, বিধানবাবু! নেত্যবাবু! আছেন না কি?

বাড়িওলার ছেলেমেয়ে বউ নাতিনাতনিতে একতলাটা বোঝাই হইয়া থাকে, —কখানা মাত্র ঘর, কী করিয়া ওদের কুলায় কে জানে! তিনটি বিবাহিত পুত্রকে তিনখানা ঘর ছাড়িয়া দিলে বাকি সকলে থাকে কোথায়? বাকি ঘর তো থাকে মোটে একখানি। কর্তাগিন্নি, একটি বিধবা মেয়ে, ছোটো মেয়ে আর মেয়ের জামাইও এখানে থাকে তারা, পেটেন্ট ওষুধের ক্যানভাসার ভাইপোটি, সকলে ওই একখানা ঘরে থাকে নাকি? প্রথম শ্যামার বড়ো দুর্ভাবনা হইত। তারপর একদিন রাত্রে বাঁধিয়া বাড়িয়া বাড়িওলা গিন্নিব সঙ্গে খানিক আলাপ করিতে গিয়া সে ব্যাপার বুঝিয়া আসিয়াছে। বড়ো দুখানা ঘরের প্রত্যেকটির মাঝামাঝি এ দেয়াল হইতে ও দেযাল পর্যন্ত তার টাঙানো আছে, তাতে ঝুলানো আছে ছিটের পর্দা। দিনের বেলা পর্দা গুটানো থাকে, রাত্রে পর্দা টানিয়া দুখানা ঘরকে চাবখানা করিয়া তিন ছেলে আব মেয়েজামাই শয়ন করে। পর্দার উপরে একটি বিদ্যুতের বাতি জ্বালিয়া দুদিকের দম্পতিকে আলো দেয়।

সিঁড়ির নীচে যে স্থানটুকু আছে ক্যানভাসাব ভাইপোটি সেখানে থাকে। নাম তাহার বনবিহারী। সিঁড়ির উপরে রেলিং ঘেঁষিয়া দাঁড়াইলে নীচে বনবিহারীকে দেখিতে পাওয়া যায়। সারাদিন বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়া রাত্রি আটটা-নটার সময় সে ফিরিয়া আসে। ওষুধের সুটকেসটি চৌকির নীচে ঢুকাইয়া জামাটি খুলিয়া সে পেরেকে টাঙাইয়া দেয়, কাপড় গায়ে দিয়া চৌকিতে বসিয়া জুতার ফিতা খোলে। তারপর চৌকিতে পা তুলিয়া নিজের পা টিপিতে আরম্ভ করে নিজেই। হঠাৎ বাড়িওলা গিন্নি ডাক দেয়, বনু এলি, বনু? পাঁউরুটি আনা হয়নি, ভোলা ভুলে এসেছে, যা তো বাবা মোড়ের দোকান থেকে চট করে একটা রুটি নিয়ে আয়,—সকালে উঠে খাইখাই করে সবাই তো খাবে আমায়। কোনোদিন বড়োবউ কোলেব ছেলেটিকে দিয়া যায়, বলে দ্যাখো তো ভাই পার নাকি ঘুম পাড়াতে হেঁটে-হেঁটে। ডানা আমার ছিঁড়ে গেল। কোনোদিন বাড়িওলা স্বয়ং আসেন দাবার ছক লইয়া, বলেন, আয় বনু বসি একদান। —বনুর ভাত ঢাকা দিয়ে রাখো বউ, দুধ থাকে তো দিও দিকি বনুকে একটু, দু হাতাই দিও,—ক্ষীর করে রাখো বাকিটা। কালের মতো ঘন কোরো না বাছা ক্ষীর, ঘন ক্ষীর খেয়ে আজ পেট কামড়েছে,—পাতলাই রেখো আর চিনি দিও একটু। ভানু, ও ভানু, তামাক দে দিকি মা—বড়ো কলকেতে দিস বেশি তামাক দিয়ে।

এ সব দেখিয়া শুনিয়া শ্যামার চোখে যদি জল আসিত, সে জল সোজা গিয়া পড়িত বনবিহারীর মাথায় পথের ধুলায় ধূসর রুক্ষ চুলে। এক একদিন বিভা আসিয়া দাঁড়ায়। ঝুঁকিয়া দেখিয়া ফিসফিস করিয়া বলে, অনেক মানুষ দেখেছি, এমন বোকা কখনও দেখিনি মাসিমা। এমন করে এখানে তোর পড়ে থাকা কেন? মেসে গিয়ে থাকলেই হয়!

রোজগারপাতি বুঝি নেই।—শ্যামা বলে।

কুড়ি-পঁচিশ ও যা পায় মাসিমা, একজনের পক্ষে তাই ঢের। তাছাড়া এমন করে থাকার চেয়ে না খেয়ে মরাও ভালো। —পুরুষমানুষ নয় ও!

রাগে বিভা গরগর করে। শ্যামা একটু অবাক হয়, এত রাগ কেন বিভার? কোথায় কোনো কাপুরুষ যুবক ক্রীতদাসের জীবনযাপন করে খেয়াল করিয়া বিচলিত হওয়ার স্বভাব তো বিভার নয়! হঠাৎ বিভা করে কী, ঝুঁকিয়া ডাক দেয়, বনুবাবু, মা আপনাকে ডাকছেন, উপরে আসবেন একবার?

বনবিহারী মুখ তুলিয়া তাকায়, বলে, যাই।

সে উঠিয়া আসিলে শ্যামাকে অবাক করিয়া দিয়া বিভা তাহাকে বকে। রীতিমতো ধমকায়। বলে, কী যে প্রবৃত্তি আপনাব বুঝিনে কিছু, একেবারে আপনার ব্যাকবোন নেই, সারাদিন ঘুরে এত রাত্রে ফিরে এলেন এখনও আপনাকে সংসারের কাজ করতে হবে? কেন করেন আপনি? আমি হলে তো সবাইকে চুলোয় যেতে বলে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তাম, এত কী আহ্লাদ সকলের! বিনে মাইনের চাকর নাকি আপনি! —এমনিভাবে কত কথাই যে বিভা তাহাকে বলে। বলে সংসাবে এমন নিরীহ হইয়া থাকিলে চলে না। একটু শক্ত হইতে হয়। অপদার্থ জেলিফিশ তো নয় বনবিহারী!

বলিতে বলিতে এত রাগিয়া ওঠে বিভা যে হঠাৎ মুখ ঘুরাইয়া গটগট করিয়া সে ভিতরে চলিয়া যায়। মুখ নিচু করিয়া বনবিহারী নামে নীচে। শ্যামা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে থাকে যে বিভা অনেকদিন এখানে আছে, বনবিহারীর সঙ্গে পরিচয়ও তাহার অনেকদিনের, বিভার গায়ে পড়িয়া বকাবকি করাটা যেমন বিসদৃশ শোনাইল আসলে হয়তো তা তেমন খাপছাড়া নয়।

এখানে আসিয়া অল্পে অল্পে শ্যামার মন কিছু সুস্থ হইযাছে।

তবে শ্যামা আব সে শ্যামা নাই। বনগাঁয়ে হঠাৎ সে যে রকম শান্ত ও নির্বাক হইয়া গিযাছিল, এখানেও সে প্রায় তেমনি হইয়া আছে, শুধু তার এই পরিবর্তন এখন আর অস্বাভাবিক মনে হয় না। আসন্ন সন্তানসম্ভাবনার সঙ্গে পরিবর্তনটুকু খাপ খাইয়া গিয়াছে। চলাফেরা কাজকর্ম সমস্তই তার ধীবমন্থর, সংসারটাকে ঠেলিয়া তুলিবার জন্য তার ধৈর্যহীন উৎসাহ আর নাই, নিজের সংসারে থাকিবার সময় সে একদিন ছেলেমেয়ের জামার ছাঁটটি পর্যন্ত ক্রমাগত উন্নততর করিতে না পারিলে স্বস্তি পাইত না, সংসাবেব তুচ্ছতম খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলো পর্যন্ত তার কাছে ছিল গুরুতব, এখন সে শুধু মোটামুটি সংসাবটা চালাইয়া যায়, ছোটোখাটো ত্রুটি ও ফাঁকি সে অবহেলা করে। সংসারের যেখানে বোতাম ছিঁড়িয়া ফাঁক বাহির হয় সেখানে সেফটিপিন গুঁজিয়া কাজ চালাইতে তাহার বাধে না। ছেলেদেব জীবনের প্রত্যেকটি মিনিটের হিসাব রাখা আব হইয়া ওঠে না, বিধান দেবি করিয়া বাড়ি ফিরিলে কারণ জিজ্ঞাসা করিতে সে ভুলিয়া যায়, শীতের সন্ধ্যায় ফণীর পায়ে মোজা না উঠিলেও তার চলে। ঘরের আনাচে-কানাচে ধুলাবালি, জামাকাপড়ে ময়লা, চৌবাচ্চায় শ্যাওলা জমিতে পায়।

নূতন যারা শ্যামাকে দেখিল তারা কিছু বুঝিতে পারে না, আগে যারা তাহাকে দেখিয়াছে তারাই শুধু টের পায় বনগাঁ তাহাকে কী ভাবে বদলাইয়া দিয়াছে।

আবার শীত শেষ হইয়া আসিল। ফাল্গুনমাসে একটি কন্যা জন্মিল শ্যামার। বকুল বুঝি আবার শুরু হইল গোড়া হইতে। কিন্তু বকুলের কী দুটি ডাগর চোখ ছিল। এ মেয়ের চোখ কোথায়? হায়, শ্যামার মেয়ে জন্মিযাছে অন্ধ হইয়া। গর্ভের অনাদিকালের অন্ধকার তাকে ঘিরিয়া রহিল, এ জগতের আলো সে চিনিবে না কোনোদিন।

জন্মান্ধ? কার পাপের ফল ভোগ করিতে তুই পৃথিবীতে আসিলি খুকি! দৃষ্টি তোর হরণ করিল কে? ভাবিতে ভাবিতে শ্যামা স্মরণ করে, বনগাঁয় একদিন সন্ধ্যার সময় কলাবাগানে

ছায়ার মতো কী যেন দেখিয়া তার গা ছমছম করিয়াছিল, স্নানের আগে এলোচুলে তেল মাখিবার সময় আর একদিন পাগলা হাবুর বুড়ি দিদিমা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল, অজ্ঞাতসারে আরও কবে কী ঘটিয়াছিল কে জানে!

কী আর করা যায়, অন্ধ মেয়েকে শ্যামা সমান আদরেই মানুষ করে, যেমন সে করিয়াছিল বকুলকে, যার ডাগর দুটি চোখ শ্যামাকে অবিরত অবাক করিয়া রাখিত। দুমাস বয়স হইতে না হইতে শীতল মেয়েকে বড়ো ভালোবাসিল। বিধান একটা ঠাকুর আনিয়াছিল, তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়া শ্যামা আবার রান্না আরম্ভ করিলে মেয়ে কোলে করিয়া বসিয়া থাকার কাজটা পাইয়া শীতল ভারী খুশি। এখানে আসিয়া বনগাঁর পোষা কুকুরটির জন্য শীতলের মন-কেমন করিত, খুকিকে কোলে পাইয়া কুকুরের শোক সে ভুলিয়া গেল। শীতলের বাঁ-পায়ের বেদনাটা আবার চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। এ জন্য দোষী করে সে শ্যামাকে। শ্যামার জন্যই তো চাকরি করিতে দুর্বল পা লইয়া দুবেলা তাহাকে হাঁটাহাঁটি করিতে হইত বনগাঁয়!

অবসর সময়টা শ্যামা তার পায়ে তার্পিন তেল মালিশ করিয়া দেয়। অসুস্থ স্বামীকে চাকরি করিতে পাঠাইয়া অপরাধ যদি তার হইয়া থাকে, এ তার অযোগ্য প্রায়শ্চিত্ত নয়।

মোহিনী কলিকাতায় চাকরি করে কিন্তু শ্বশুরবাড়ি বেশি সে আসে না, বোধ হয় পিসির বারণ আছে। শ্যামা তাকে দুদিন নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, দুদিন আসিয়া সে খাইয়া গিযাছে, নিজে হইতে একদিনও খোঁজখবর নেয় নাই। বিধান প্রথম-প্রথম কাকার বাড়ি গিয়া মোহিনীর সঙ্গে সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ করিত, এখন সেও আর যায় না। রাগ করিয়া শ্যামাকে সে বলে, এমনি লাজুক হলে কী হবে, মোহিনী বড়ো অহংকারী মা,—কতবার গিয়েছি আমি, কত বলেছি আসতে, এল একবার? নেমন্তন্ন না করলে বাবুর আসা হয় না, ভারী জামাই আমার! —এদিকে তো মাছিমারা কেবানি পোস্টাপিসের!

কিন্তু মোহিনী একদিন বিনা আহ্বানেই আসিল। লজ্জায় মুখ রাঙা করিয়া বিধানের কাছে সে স্বীকার করিল যে বকুলের চিঠি পাইয়া সে আসিয়াছে। বকুলকে এখন একবাব আনা দরকাব। পনেরো দিনের ছুটি লইয়া সে বাড়ি যাইতেছে, ইতিমধ্যে শ্যামা যদি তাহার পিসিকে একখানা চিঠি লিখিয়া দেয় আর চিঠির জবাব আসাব আগেই বিধান যদি সেখানে গিয়া পড়ে, বকুলকে পাঠানোর একটা ব্যবস্থা মোহিনী তবে করিতে পারে।

মোহিনীর কথাবার্তা বিধানের কাছে হেঁয়ালির মতো লাগে, সে বলে বোসো তুমি, মাকে বলি।

মোহিনী বলে, না না, আমি গেলে বলবেন।

কিন্তু তা হয় না, শ্যামাকে না বলিলে এ সব সাংসারিক ঘোর-প্যাঁচ কে বুঝিতে পারিবে?

বিধান শ্যামাকে সব শোনায়। শুনিবামাত্র ব্যাপার আঁচ করিয়া শান্ত নির্বাক শ্যামার সহসা আজ দেখা দেয় অসাধারণ ব্যস্ততা।

কই মোহিনী? ডাক খোকা, মোহিনীকে ডাক।

শ্যামার চোখ ছলছল করে। আনিবার জন্য তাই বকুল ইদানীং এত করিয়া লিখিতেছিল! তারা আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারে নাই বলিয়া মেয়ে তার জামাইকে এমন চিঠি লিখিয়াছে যে, বিনা নিমন্ত্রণে যে কখনও আসে না সে যাচিয়া আসিয়াছে বকুলকে আনানোর যড়যন্ত্র করিতে, ছুটি লইয়া যাইতেছে বাড়ি! মোহিনীকে কত জেরাই যে শ্যামা করে! সজল চোখে কতবার যে সে মোহিনীকে মনে করাইয়া দেয় তার হাতে যেদিন মেয়েকে সঁপিয়া দিয়াছিল সেইদিন হইতে শ্যামার ছেলের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নাই, বিধান যেমন মোহিনীও তেমনি শ্যামার কাছে। অনুযোগ দিয়া বলে, তোমারি বাড়ির কারুর কি উচিত ছিল না বাবা এ কথাটা আমায় লিখে জানায়!

আমি তার মা, আমি জানতেও পেলাম না ক মাস কী বৃত্তান্ত? পিসি না বুঝুক, তুমি তো বোঝ বাবা-মার দুঃখু?

মোহিনীকে সে বেলা এখানেই খাইয়া যাইতে হয়। জামাই কোনোদিন পর নয়, তবু আজ মোহিনী যেন বিশেষ করিয়া আপন হইয়া যায়। মনটা ভালো মোহিনীর, বকুলের জন্য টান আছে মোহিনীর, না আসুক সে নিমন্ত্রণ না কবিলে, অবুঝ গোঁয়ার সে নয়, মধুর স্বভাব তার।

চার-পাঁচদিন পরে বিধান গিয়া বকুলকে লইয়া আসিল। বলিল, উঃ মাগো, কী গালটা পিসি আমাকে দিলে! বাড়িতে পা-দেওয়া থেকে সেই যে বুড়ি মুখ ছুটাল মা, থামল গিয়ে একেবারে বিদায় দেবার সময়, অমঙ্গল হবে ভেবে তখন বোধ হয় কিছু বলতে সাহস হল না, মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি আর যাচ্ছিনে বাবু খুকির শ্বশুরবাড়ি এ জন্মে।

বকুল তো আসিল, এ কোন বকুল? এ কী রোগা শরীর বকুলের, নিষ্প্রভ কপোল, ভীরু চোখ, কান্তিবিহীন মুখ, লাবণ্যহীন বর্ণ? মেয়েকে তার এমন করিয়া দিয়াছে ওরা!—পেট ভরে খেতেও ওরা তোকে দিত না বুঝি খুকি? খাটিয়ে মারত বুঝি তোকে দিনরাত? আমি কি জানতাম মা এত তোকে কষ্ট দিচ্ছে! আনবার জন্যে লিখতিস, ভাবতাম আসবার জন্যে মন কেমন করছে তাই ব্যাকুল হয়েছিস,—পোড়া কপাল আমার!

শ্যামার মনে হঠাৎ যে খিল পড়িয়াছিল, বকুল আসিয়া যেন তা খুলিয়া দিয়াছে। সেটা আশ্চর্য নয। মনের অবস্থা অস্বাভাবিক হইয়া আসিলে এই তো তার সবার বড়ো চিকিৎসা, এমনিভাবে মশগুল হইতে পারা জীবনেব স্বাভাবিক বিপদে-সম্পদে, যার মহাসমন্বয় সংসারধর্ম। বহুদিনের দুর্ভাবনায়, বনগাঁর পরাশ্রিত জীবনযাপনে শ্যামার মনে যদি বৈকল্য আসিযা তাকে, ছেলের চাকরি, অন্ধ মেয়ের জন্ম, বকুলের এ ভাবে আসিযা পড়া, এততেও সেটুকু কী শোধরাইবে না? আগের মতো হওয়া শ্যামার পক্ষে আর সম্ভব নয়, তবু পবিবর্তিত পরিশ্রান্ত ক্ষয়-পাওয়া শ্যামার মধ্যে একটু শক্তি ও উৎসাহ, একটু চাঞ্চল্য ও মুখবতা এখন আসিতে পারে, আসিতে পারে জীবনের হাসি-কান্নার আরও তেজি মোহ, সুখের নিবিড়তর স্বাদ।

মহোৎসাহে শ্যামা বকুলের সেবা আরম্ভ করিল।

বনগাঁয়ে চুবি করিয়া বিধানকে সে ভালো জিনিস খাওয়াইত, এখানে নিজের মুখের খাবারটুকু সে মেয়ের মুখে তুলিয়া দিতে লাগিল। নব্বই টাকা আয়ে তো কলিকাতা শহরে রাজার হালে থাকা যায় না, নিজেকে বঞ্চিত না করিয়া মেয়েকে দিবার দুধটুকু ঘিটুকু ফলটুকু কোথায় পাইবে সে? কচি মেয়ে মাই খায়, শ্যামার নিজেরও দারুণ ক্ষুধা, পাতের মাছটি তবু সে বকুলের থালায় তুলিয়া দেয়, মণিকে দিয়া চিনিপাতা দই আনায় দুপয়সার, বলে, দই মুখে রুচবে লো, ভাতকটা সব মেখে খেয়ে নে চেঁছেপুছে, লক্ষ্মী খা। দই খেলে আমার বমি আসে, তুই খা তো। ও মণি, দে বাবা, একটু আচার এনে দে দিদিকে।

বকুলকে সে বসাইয়া রাখে, কাজ করিতে দেয় না।

দেখিতে দেখিতে বকুলের চেহারার উন্নতি হয়।

কিন্তু মুশকিল বাধায় সরযূ। বলে, মেয়েকে কাজকর্ম করতে দিচ্ছ না, এ কিন্তু ভালো নয় ভাই।

শ্যামা বলে, খেটে-খেটে সারা হয়ে এল, ওকে আর কাজ করতে দিতে মন সরে দিদি? অল্পবিস্তর কাজ ধরতে গেলে করে বইকী মেয়ে, বিছানা-টিছানা পাতে। বিকেলে খানিকক্ষণ হেঁটেও বেড়ায় ছাতে, তা তো দেখতেই পাও?

মনে হয় সরযূর অনধিকারচর্চায় শ্যামা রাগ করে। পাশকরা ধাত্রী! পাঁচটি সন্তানের জননী সে, মেয়ের কীসে ভালো কীসে মন্দ সে তা বোঝে না, পাশকরা ধাত্রী তাকে শিখাইতে আসিয়াছে!

শ্যামা প্রাণপণে মেয়েকে এটাওটা খাওয়াইবার চেষ্টা করে, বকুলের কিন্তু অত খাওয়ার শখ নাই, তার সবচেয়ে জোরালো শখটি দেখা যায়, বিধানের বিবাহ সম্বন্ধে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে। বলে, কী করছ মা তুমি? চাকরিবাকরি করছে, এবার দাদার বিয়ে দাও? শামুর সঙ্গে দাদার অত মাখামাখি দেখে ভয়ও কি হয় না তোমার?

কীসের মাখামাখি লো? —শ্যামা সভয়ে বলে।

নয়? বিয়ের যুগ্যি মেয়ে, ও কেন রোজ পড়া জানতে আসবে দাদার কাছে? পড়া জানবার দরকার হয় মাস্টার রাখুক না! না মা, দাদার তুমি বিয়ে দাও এবার।

শামুর আসাযাওয়া শ্যামার চেয়েও বকুল বেশি অপছন্দ করে। কী পাকা গিন্নিই বকুল হইয়াছে! সাংসারিক জ্ঞানবুদ্ধিতে কচি মনটি যেন তার টইটম্বুর, আঁটিতে চায় না। শামুর কাপড়পরা, বেনিপাকানো, পাউডার মাখার ঢং দেখিয়া গা যে তার জ্বলিয়া যায় শ্যামা ভিন্ন কার সাধ্য আছে তা টের পাইবে, মনে হয় শামুর সঙ্গে সখীত্ব বুঝি তার গড়িয়া উঠিল। বনগাঁর সেই ঢেঁকিঘরখানার চালায় ইতিমধ্যে বুঝি নূতন খড়ও ওঠে নাই এক আঁটি, শঙ্করের গায়ের সেই জামাটি বুঝি আজও ছেঁড়ে নাই, অশ্রুমুখী সেই অবোধ বালিকা বকুল আজ এই বকুল হইয়াছে, দুটি ছেলেমানুষ ছেলেমেয়ের সহজ বন্ধুত্বে সে আঁশটে গন্ধ পায় এবং বেমালুম তাহা গোপন রাখিয়া ওদের দেখায় হাসিমুখ, নাক সিঁটকায় মার কাছে আর করে ষড়যন্ত্র। শ্বশুরবাড়ির লোকেরা গড়িয়া-পিটিয়া বকুলকে মানুষ করিয়া দিযাছে সন্দেহ নাই।

ষড়যন্ত্রে শ্যামার সায় আছে। মিথ্যা নয়, বিধানের এবার বিবাহ দেওযা দবকার বটে।

বিধান শুনিয়া হাসে। বলে, পিসির গাল সয়ে নিয়ে এলাম কি না, মাকে বুঝি তাই এ সব কুপরামর্শ দিচ্ছিস খুকি? তারপর গম্ভীর হইয়া বলে, এদিকে খরচ চলে না সে খবর রাখিস তুই? ট্রামের টিকিট না কিনে মণির স্কুলের মাইনে দিয়েছি এবার, তুই আছিস কোন তালে।

বকুল বলে, আমাকে এনে তোমার খরচ বাড়ল দাদা।

তবু তো আছিস আমায় ডুবিয়ে যাবার ফিকিরে।

বকুল অভিমান কবে। সে আসিয়া খরচ বাড়াইয়াছে বিধান এ কথাব প্রতিবাদ করিলে সে খুশি হইত। কারও মন বুঝিয়া একটা কথা যদি বিধান কোনোদিন বলিতে পারে। খানিকপরে আবার উলটা কথা ভাবিয়া বকুলের অভিমান কমিয়া যায়। তাই বটে। দাদা কী পর যে তোষামোদ করিয়া কথা করিবে তার সঙ্গে? আবার সে প্যানপ্যান শুরু করিয়া দেয়। যুক্তি দেখায় যে ও সব বাজে ওজোর বিধানের, এই যে সে আসিয়াছে, সংসার অচল হইয়াছে কি? একটা বউ আসিলেও স্বচ্ছন্দে সংসার চলিবে। তার চেয়ে বেশি ভাত বউ খাইবে না নিশ্চয়।

সংসারের ভার গ্রহণ করার আনন্দ বিধানের এদিকে কয়েক মাসের মধ্যেই তিতো হইয়া গিয়াছিল। এই বয়সে ভাইয়ের স্কুলের মাহিনা দিতে রোজ হাঁটিয়া আপিস-করা যদি সহ্য হয়, একেবারে নব্বই-নব্বইটা টাকাতেও যে মাসের খরচ কুলায় না এটুকু মাথা গরম করিয়া দেয় তরুণ মানুষের। বকুলকে একদিন বিধান ভয়ানক ধমকাইয়া দিল। বলিল, বিয়ে! বিয়ে! একটা ট্যুশনি খুঁজে পাচ্ছি না, বিয়ে বিয়ে করে পাগল করে দিল আমায়। ফের ও কথা বললে চড় খাবি খুকি।

বলিয়া সে আপিস গেল। বকুল নাইল না, খাইল না, গোঁসা করিয়া শুইয়া রহিল। বিকালে বাড়ি ফিরিয়া বিধান শুনিল শ্যামার বকুনি, তারপর সে বকুলকে তুলিয়া খাওয়াইতে গেল।

আজ বিভা বসিয়াছিল বকুলের কাছে।

বিধানের সঙ্গে আগে সে কোনোদিন কথা বলে নাই, আজ দয়া করিয়া বলিল, পালাচ্ছেন কেন, আসুন না? কী বলেছেন বোনকে, বোন আজ রাগ করে সারাদিন খায়নি?

তারপর বিভা বলিল, শামু খুব প্রশংসা করে বিধানের। জগতে নাকি এমন বিষয় নাই বিধান যা জানে না? পড়াটড়া জানিতে আসিয়া শামু বোধ হয় খুব বিরক্ত করে বিধানকে? আশ্চর্য মেয়ে, মানুষকে এমন জ্বালাতন করিতে পারে ও! বিভা এই সব বলে, বিধান মুখ লাল করিয়া আড়ষ্টভাবে শোনে। শ্যামাও তো পিছুপিছু আসিয়াছিল বিধানের, সে আর বকুল ভাবে শামুর কথা ওঠায় বিধানের মুখ লাল হইয়াছে। তারা তো বুঝিতে পারে না জীবনে যে কখনও মেয়েদের ধারে-কাছে ঘেঁষে নাই, বিভার মতো গান-জানা মন-টানা আধুনিক মেয়ের কাছে কী তার দারুণ অস্বস্তি।

গভীর বিষাদে শ্যামার মন ভরিয়া যায়। এইবার বুঝি তার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিবার দিন আসিয়াছে। অন্ধ মেয়ে দিয়া ভগবানের সাধ মিটিল না, ছেলে কাড়িয়া নেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবার। বিধানের স্নেহের স্রোত আর কি তার দিকে বহিবে? তার কড়া হাতের সেবা আর কি ভালো লাগিবে বিধানের? জননীকে আর তো বিধানের প্রয়োজন নাই। নিজের জীবন এবার নিজেই সে গড়িয়া তুলিবে, যে অধিকার এতদিন শ্যামার ছিল নিজস্ব। শ্যামা বুঝিতে পারে, জগতে এই পুরস্কার মা পায়। বকুলকে বড়ো করিয়া দান করিয়াছে পরের বাড়ি, তার চোখের সামনে বিধানের নিজের স্বতন্ত্র জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে, যেখানে তার ঠাঁই নাই এতটুকু। মণির বেলা ফণীর বেলাও হইবে এমনি। আপন হইয়া কেহ যদি চিরদিন থাকে শ্যামার, থাকিবে ওই অন্ধ শিশুটি, যার নিমীলিত আঁখিদুটির জন্য শ্যামার আঁখি সজল হইয়া থাকিবে আজীবন।

এক বাড়িতে বাস করিলে পরের জীবনের গোপন ও গভীর জটিলতাগুলো, কেহ বলিয়া না দিলেও, ক্রমে ক্রমে সকলেই টের পাইয়া যায়। বিভা ও বনবিহারীর ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া শ্যামা ও বকুল হাসাহাসি করে নিজেদের মধ্যে। বিভার জন্য ভেড়া বনিয়া এখানে পড়িয়া আছে বনবিহারী, একটু চোখের দেখা, একটু গান-শোনা, বিভার যদি দয়া হয় কখনও দুটি কথা-বলা এইটুকু সম্বল বনবিহারীর, মাগো মা, কী অপদার্থ পুরুষ! না জানিস ভালোরকম লেখাপড়া, করিস ক্যানভাসারি, থাকিস পরের বাড়ি দাস হইয়া, তোর এ কী দুরাশা! সিঁড়ির নিচে ভাঙা চৌকিতে যার বাস তার কেন আকাশের চাঁদ ধরার সাধ? বনবিহারীর পাগলামি বিশেষ অস্পষ্ট নয়, সকলেই জানে, সে নিজেই শুধু তা জানে না, ভাবে গোপন কথাটি তার গোপন হইয়াই আছে, ছড়াইয়া পড়ে নাই বাহিরে। টের পাওয়া অবশ্য কারও উচিত হয় নাই, কারণ বনবিহারী কিছুই করে না প্রেমিকের মতো, বিভা সিঁড়ি দিয়া নামিলে শুধু চাহিয়া থাকে, বিভা গান ধরিলে যদি আশেপাশে কেহ না থাকে তবেই সে সিঁড়ি দিয়া গুটিগুটি উপরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, আর যা কিছু সে করে সব চুরি করিয়া—কারও তা দেখিবার কথা নয়। ক্যানভাস করিতে বাহির হইয়া বিভার স্কুলের কাছাকাছি কোথাও সে রোজই দাঁড়াইয়া থাকে ছুটির সময়, কোনোদিন সাহস করিয়া সামনে গিয়া বলে, ছুটি হয়ে গেল আপনার?—কোনোদিন দূর হইতেই সরিয়া পড়ে। এইটুকু যে সকলে জানিয়া ফেলিয়াছে টের পাইলে লজ্জায় বনবিহারী মরিয়া যাইবে। তারপর বিভার কাজ করিয়া দিতেও সে ভালোবাসে বটে। লন্ড্রিতে কাপড় দিয়া লইয়া আসে, ফর্দমাফিক মার্কেট হইতে জিনিসপত্র কিনিয়া আনে, যে-দুটি ছোটো-ছোটো মেয়ে সকালবেলা গান শিখিতে আসে বিভার কাছে, দরকার হইলে তাদের বাড়ি পৌঁছাইয়া দেয়। এখন, এ সব ছোটোখাটো উপকার কে না কার করে জগতে? বাড়ির কাজও তো সে কম করে না। বিভার দুটি-একটি কাজ করিয়া দেওয়ার মধ্যে তার গোপন মনের প্রতিচ্ছবি যে সকলে দেখিয়া ফেলিবে কেমন করিয়া সেটুকু অনুমান করিবে বনবিহারী? বিভার যে ফটোখানা সে চুরি করিয়াছে সেখানা সে লুকাইয়া রাখিয়াছে ক্যানভাসিং-এ যাওয়ার সুটকেসটির মধ্যে, আর পুরানো ব্লাউজটি রাখিয়াছে তার ট্রাংকে তালাচাবি দিয়া। চুপিচুপি লুকাইয়া এগুলো সকলে যে আবিষ্কার করিয়াছে তাই বা সে জানিবে কীরূপে?

বিভা বিব্রত হইয়া থাকে। বনবিহারী এমন নিরীহ, যত স্পষ্টই হোক এমন মূক ও নিষ্ক্রিয় তার প্রেম, তার বিরুদ্ধে নালিশ খাড়া করিবার তুচ্ছতম প্রমাণটিরও এমন অভাব যে এ বিষয়ে সকলের যেমন তারও তেমনি কিছু বলিবার অথবা করিবার উপায় নাই। মনে মনে সে কখনও রাগে কখনও বোধ করে মমতা; সিঁড়ি দিয়া নামার সময় কোনোদিন তাকায় ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনার চোখে কোনোদিন দুটি-একটি স্নিগ্ধ কথা বলে। ভালো যে লাগে না একেবারে তা নয়। একটা কুকুরও কুকুরের মতো পোষ মানিলে মানুষের তাতে কত গর্ব কত আনন্দ, এ তো একটা মানুষ অথচ এ রকম পূজা গ্রহণ করিবার উপায় না থাকিলে কী বিশ্রীই যে লাগে মানুষের, মনে যার একফোঁটা দয়ামায়া থাকে।

বকুলের সঙ্গে হাসাহাসি করে বটে, মনে মনে শ্যামা কিন্তু ব্যথা পায়। শক্তসমর্থ যুবক, এ কী ব্যাধি তার মনের! মেরুদণ্ডটা পর্যন্ত যে ওর গলিয়া গেল, সুযোগ পাইয়া কী ব্যবহারটাই বাড়ির লোকে করে ওর সঙ্গে, নিজের মনুষ্যত্ব যে বিসর্জন দিয়াছে কে তাকে মানুষ জ্ঞান করিবে, দোষ কারও নাই।

আচ্ছা, শামুর জন্য বিধানও যদি অমনি হইয়া যায়? অমনি উন্মাদ? ও ভগবান, শ্যামা তবে নিজেই পাগল হইয়া যাইবে!

অনেক ভাবিয়া শ্যামা শেষে একদিন বকুলকে বলে, শোন খুকি বলি, দ্যাখ শামুকে যদি খোকার পছন্দ হয়ে থাকে, ওর সঙ্গেই না হয় দিই খোকার বিয়ে? স্বঘর তো, দোষ কী!

বকুল স্তম্ভিত হইয়া যায়, বলে খেপেছ নাকি তুমি মা, কী বলছ তার ঠিকঠিকানা নেই, ওই মেয়ের সঙ্গে তুমি বিয়ে দিতে চাও দাদার! শামু ভালো নয় মা—শয়তানের একশেষ। এমন কথা মনেও ঠাঁই দিও না।

কী হইবে তবে? একদিন শামু না আসিলে বিধান যে উশখুশ করিতে থাকে। শামুর হাসির হিল্লোলে সংসার যে শ্যামার ভাসিয়া যাইতে বসিয়াছে!

ভগবান মুখ তুলিলেন।

অনেক দুঃখ শ্যামা পাইয়াছে, আর কী তিনি তাকে কষ্ট দিতে পারেন। একদিন বিধান বলিল, শঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম মা, আমাদের বাড়িটা দেখে আসতে ইচ্ছে হল, গিয়ে দেখি ভাড়ার নোটিশ ঝুলছে। যাবে ও বাড়িতে?

আমাদের বাড়ি! আজও সে বাড়ির কথা বলিতে ইহারা বলে আমাদের বাড়ি!

শ্যামা সাগ্রহে বলিল, সত্যি খোকা?—যাব, চল সামনের মাসেই আমরা চলে যাই, পয়লা তারিখে।

সামনের মাসে পয়লা তারিখে ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করিয়া তাহারা বাড়ি বদলাইয়া ফেলিল। বিধান ছুটি লইল একদিনের। সকালে একা গিয়া জিনিসপত্র রাখিয়া আসিতে বেলা তার বারোটা বাজিয়া গেল। শামু আর বিভা দুজনেই তখন স্কুলে গিয়াছে, বাড়িওলার ছেলেরা গিয়াছে আপিস, বনবিহারী গিয়াছে ওষুধ ক্যানভাস করিতে। দুপুরে এখানেই পাতা পাতিয়া তাহারা ভাত খাইল। তারপর বাকি জিনিসপত্র সমেত রওনা হইয়া গেল শহরতলির সেই বাড়ির উদ্দেশে, শ্যামার জীবনের দুটি যুগ যেখানে কাটিয়াছিল।

তেমনি আছে ঘরবাড়ি শ্যামার। শেষবার এ বাড়ি হইতে সে যখন বিদায় লইয়াছিল তখন বাড়িটা শুধু ছিল একটু বিবর্ণ, বাড়ির মালিক এখন আগাগোড়া চুনকাম করিয়াছে, রং দিয়াছে। শ্যামা সোজা উঠিয়া গেল উপরে। উপরের ঘরখানাকে আর নূতন বলিয়া চেনা যায় না, বাড়ির বাকি অংশের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে। নকুড়বাবু দোতলায় ঘর তুলিয়াছে একখানা। রেলের বাঁধটার খানিকটা আড়াল পড়িয়া গিয়াছে। আর কিছুই বদলায় নাই। ধানকলের বিস্তৃত অঙ্গনে তেমনি ধান মেলা আছে, পায়রার ঝাঁক তেমনি খাইতেছে ধান, উঁচু চোঙাটা দিয়া তেমনি অল্প অল্প ধোঁয়া বাহির হইয়া উড়িয়া যাইতেছে বাতাসে।

দশ

বকুলের একটি মেয়ে হইয়াছে।

প্রথমবারেই মেয়ে? তা হোক! শ্যামার শেষবারের মেয়েব মতো ও তো অন্ধ হইয়া জন্মায় নাই, বকুলের চেয়েও ওর বুঝি চোখদুটি ডাগর! কাজল দিতে দিতে ওই চোখ যখন গভীব কালো হইয়া আসিবে দেখিয়া অবাক মানিবে মানুষ। কী আসিয়া যায় প্রথমবার মেয়ে হইলে, মেয়ে যদি এমন ফুটফুটে হয়, এমন অপরূপ চোখ যদি তার থাকে?

শ্যামাব একটু ঈর্ষা হইয়াছিল বইকী! বকুলের মেয়ের চোখ আশ্চর্য সুন্দব হোক শ্যামাব তাতে আনন্দ, আহা তাব মেয়েটির চোখ দুটি যদি অন্ধ না হইত!

বকুলের মেয়ে মানুষ কবে শ্যামা, প্রসবের পর বকুলের শবীরটা ভালো যাইতেছে না, তা ছাড়া সন্তানপরিচর্যাব সে কী জানে? নিজেব মেয়ে, বকুল আব বকুলের মেয়ে, শ্যামা তিনজনেরই সেবা করে। বকুলেব মেয়ে আব নিজের মেয়েকে হয়তো সে কোনোদিন কাছাকাছি শোয়াইয়া রাখে, বকুলের মেয়ে তাকায় বড়ো-বড়ো চোখ মেলিয়া, শ্যামার মেয়ের অন্ধ আঁখিদুটিতে পলকও পড়ে না, —পলক পড়িবে কীসে, চোখের পাতা যে মেয়েটোব জড়ানো। শ্যামার মনে পড়ে বাদুব কথা—মন্দার সেই হাবা মেয়েটা, দিনবাত যে শুধু লালা ফেলিত। এমন সন্তান কেন হয় মানুষেব,—অন্ধ, বোবা, অঙ্গহীন, বিকল? কেন এই অভিশাপ মানুষেব? এক একবার শ্যামাব মনে হয়, হয়তো বকুলেব মেয়ে তাব মেয়েব চোখ দুটি হরণ কবিয়াছিল তাই ওব ডবল চোখের মতো অতবড়ো চোখ হইয়াছে! তারপর সবিষাদে শ্যামা মাথা নাড়ে। না, এ সব অন্যায় কথা মনে আনা উচিত নয়। কীসে কী হইয়াছে কে তা জানে, সত্যমিথ্যা কিছু তো জানিবাব উপায় নাই, আবোলতাবোল যা তা ভাবিলে বকুলেব মেয়েব চোখ দুটিব যদি কিছু হয়! প্রথম সন্তান বকুলের, বড়ো সে আঘাত পাইবে।

মেয়েব দু-মাস বয়স কবিয়া বকুল শ্বশুববাড়ি গেল। যাওয়াব আগে কী কান্নাই যে বকুল কাঁদিল। বলিল, চেহাবা তোমাব বড্ড খারাপ হয়েছে মা, এবার তাকাও একটু শবীরের দিকে, এখনও এত খাটুনি তোমাব সইবে কেন এ শরীরে? বিয়ে দিয়ে বউ আনো এখন দাদাব, সাবাজীবন তো প্রাণ দিয়ে কবলে সকলেব জন্যে এবার যদি না একটু সুখ কবে নেবে—

বলিল, আমাব যেমন কপাল! সেবা নিয়েই চললাম, তোমার কাছে থেকে একটু যে যত্ন করব তা কপালে নেই!

কী গিন্নিই বকুল হইয়াছে! ছাঁচে-ঢালা হইয়া আসিতেছে তাহার চালচলন, কথাব ধবন। যেন দ্বিতীয় শ্যামা।

শীতকাল। বকুল শ্বশুববাড়ি গেল শীতকালে। শীতে সংসারের কাজ কবিতে এ বছব শ্যামার সত্যই যেন কষ্ট হইতে লাগিল। ছেলেকে আপিসেব ভাত দিতে হয়, শীতেব সকাল দেখিতে দেখিতে বেলা হইয়া যায়, খুব ভোবে উঠিতে হয় শ্যামার। আগুনের আঁচে রান্না কবিয়া আসিয়া রাত্রে লেপের নীচে গা যেন শ্যামার গরম হইতে চায় না, যত সে জড়সড় হইয়া শোয় হাতে পায়ে কেমন একটা মোচড় দেওয়া ব্যথা জাগে, কেমন একটা কষ্ট হয় তাহার। ভোরে এই কষ্ট দেহে লইয়া সে লেপের বাহিরে আসে, আঁচল গায়ে জড়াইয়া হিহি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে যায়, ঠিকা ঝি আসিবে বেলায়, তার আগে কিছু কিছু কাজ শ্যামাকে আগাইয়া রাখিতে হয়। বিধান বাহিরেব ঘরে শোয়। ঝি আসিয়া ডাকাডাকি করিলে তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়—শ্যামা তাই আগে সন্তর্পণে সদর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসে। ঘুম সে ভাঙায় মণির। মণির পরীক্ষা আসিতেছে, নীচের যে ঘরে আগে শ্যামা সকলকে লইয়া থাকিত, সেই ঘরে মণি একা থাকে—পড়াশোনা করে, ঘুমায়। ভোরভোর

ছেলেকে ডাকিয়া তুলিতে বড়ো মমতা হয় শ্যামার কিন্তু আজও তো তার কাছে ভবিষ্যতের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, জোর করিয়া মণিকে সে তুলিয়া দেয়। বলে, ওঠ বাবা ওঠ, না পড়লে পরীক্ষায় যে ভালো নম্বর পাবিনে?

মণি কাতরকণ্ঠে বলে, আর একটু ঘুমোই মা, কত রাত পর্যন্ত পড়েছি জানো?

জানে না! শ্যামা জানে না তার ছেলে কত রাত অবধি পড়িয়াছে! দোতলা-একতলার ব্যবধান কী ফাঁকি দিতে পারে শ্যামাকে! —কতবার উঠিয়া আসিয়া সে উঁকি দিয়া গিয়াছে মণি তার কী জানে!

একটু চা বরঞ্চ তোকে করে দি চুপিচুপি, খেয়ে চাঙা হয়ে পড়তে শুরু কর। পড়ে-শুনে মানুষ হয়ে কত ঘুমোবি তখন—ঘুম কী পালিয়ে যাবে!

কনকনে হাঁড়-কাঁপানো শীত, বকুলকে সঙ্গে করিয়া শীতল যেবার পালাইয়া গিয়াছিল সেবার ছাড়া শীত শ্যামাকে কোনো বার এমন কাবু করিতে পারে নাই। উনানে আঁচ দিয়া ডালের হাঁড়িটা মাজিতে বসিয়া হাতপা শ্যামার যেন অবশ হইয়া আসে। কী হইয়াছে দেহটার? এই ভালো থাকে এই আবার খারাপ হইয়া যায়? মাঝে মাঝে এক একদিন তো শীত লাগে না, ঝরঝরে হালকা মনে হয় শরীরটা, আবছা ভোরে ঘুমন্ত-পুরীতে মনের আনন্দে কাজে হাত দেয়? কোনোদিন মনে হয় বয়সটা আজও পঁচিশের কোঠায় আছে, কোনোদিন মনে হয় একশো বছরের সে বুড়ি! এমন অদ্ভুত অবস্থা হইল কেন তাহার?

রোদের সঙ্গে বিধান ওঠে। এখুনি সে ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া যাইবে কিন্তু তাহার হইচই হাঁকডাক নাই। নিঃশব্দে মুখহাত ধুইয়া জামা গায়ে দেয়, নীরবে গিয়া রান্নাঘরে বসে, শ্যামা যদি বলে, ডালটা হয়ে এল, নামিয়ে রুটি সেঁকে দি? —সে বলে না দেরি হইয়া যাইবে, আগে রুটি চাই। দুটো-একটা কথা সে বলে, বেশির ভাগ সময় চুপ করিয়া ভোরবেলাই শ্যামার শ্রান্ত মুখখানার দিকে চাহিয়া থাকে। সে বুঝিতে পারে শ্যামার শরীর ভালো নয়, ভোরে উঠিয়া সংসারের কাজ করিতে শ্যামার কষ্ট হয়, কিন্তু কিছুই সে বলে না। মুখের কথায় যার প্রতিকার নাই সে বিষয়ে কথা বলিতে বিধানের ভালো লাগে না। ভোরে উঠিতে বারণ করিলে শ্যামা কি শুনিবে?

বিধান চলিয়া গেলে খানিক পরে শ্যামা দোতলায় যায়, এতক্ষণে ছাদে রোদ আসিয়াছে। জানালা খুলিয়া দিতে শীতলের গায়ে রোদ আসিয়া পড়ে। শীতল ক্ষীণকণ্ঠে বলে, কটা বাজল গা?

শ্যামা বলে, আটটা বাজে। —শীতলকে শ্যামা ধরিয়া তোলে, জানালার কাছে বালিশ সাজাইয়া তাহাকে রোদে ঠেস দিয়া বসায়, লেপ দিয়া ঢাকিয়াও দেয় গলা পর্যন্ত। শরীরটা শীতলের ভাঙিয়া গিয়াছে। দুর্বল পা-টি তাহার ক্রমে ক্রমে একেবারে অবশ হইয়া গিয়াছে, আর সারিবে না। দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও দুর্বল হইয়া আসিতেছে, ক্রমে ক্রমে তারাও নাকি অবশ হইয়া যাইবে,-যাইবেই। কে জানে সে কতদিনে? শ্যামা ভাবিবারও চেষ্টা করে না। জীবনের অধিকাংশ পথ সেও তো অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে, ভাবিবার বিষয়বস্তু খানিক-খানিক বাছিয়া লইবার শক্তি তাহার জন্মিয়াছে—কত অভিজ্ঞতা শ্যামার, কত জ্ঞান! সধবা থাকিবার জন্য এ বয়সে আর নিরর্থক লড়াই করিতে নাই। এ তো নিয়মের মতো অপরিহার্য। আশা যদি থাকিত, শ্যামা কোমর বাঁধিয়া লাগিত শীতলের পিছনে, অবশ পা-টিকে সবল করিয়া তাহাকে খাড়া করিয়া দিত।

মিছামিছি হল্লা শ্যামা আর করিতে চায় না। ক্ষমতাও নাই শ্যামার—অর্থহীন উদ্‌বেগ, ব্যর্থ প্রয়াসে ব্যয় করিবার মতো জীবনীশক্তি আর কই? কতকাল পরে সে সুখের মুখ দেখিয়াছে। এবার সংসারের বাঁধা নিয়মে যতখানি আনন্দ ও শান্তি তাহার পাওয়ার কথা সে শুধু তাই খুঁজিবে, যেদিকে দুঃখ ও পীড়ন চোখ বুজিয়া সেদিকটাকে করিবে অস্বীকার।

ভালো কথা। শ্যামার এতটুকু প্রার্থনা অননুমোদন করিবে কে? স্বামীর আগামী মৃত্যুকে শ্যামা অগ্রাহ্য করুক, ক্ষমা সে পাইবে সকলের। কিন্তু সন্তানের কথা এত সে ভাবিবে কেন? ঝড়-ঝাপটা আসিলে ওদের আড়াল করিবার জন্য আজও সে থাকিবে কেন উদ্যত হইয়া? পঙ্গু স্বামীর কাছে বসিয়া খুকির অন্ধ চোখদুটি দেখিতে দেখিতে কেন সে হিংসা করিবে বকুলের মেয়ের পদ্মপলাশ আঁখি দুটিকে? এ কী অন্যায় শ্যামার! জননী হিসাবে শ্যামা তো দেবীর চেয়েও বড়ো, এত সে মন্দ স্ত্রী কেন? শ্যামার এ পক্ষপাতিত্ব সমর্থনের যোগ্য নয়।

শীতলের অবস্থার জন্য শ্যামার মনে সর্বদা আকুল বেদনা না থাকাটা হয়তো দোষের, তবে সেবা-যত্নে শীতলকে সে খুব আরামে রাখে, শীতলের কাছে থাকিবার সময় এত সে শান্ত এত তার সন্তোষ যে রোগযন্ত্রণার মধ্যে শীতল একটু শান্তি পায়। আদর্শ পত্নীর মতো স্বামীর অসুখে শ্যামা যে উতলা নয়, এইটুকু তার সম্বল।

খুকিকে দুধ দিয়া শ্যামা নীচে যায়। পথ্য আনে শীতলের। ঘটিভরা জল দেয়, গামলা আগাইয়া ধরে, বিছানায় বসিয়া মুখ ধোয় শীতল। মুখ মোছে শ্যামার আঁচলে। কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফে শীতলের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছে, ঋষির মতো দেখায় তাহাকে। দীর্ঘ তপস্যা যেন সাঙ্গ হইয়াছে, এবার মহামৃত্যুর সমাধি আসিবে।

কখন? কেহ জানে না। শ্যামা কাজের ফাঁকেফাঁকে শতবার উপরে আসে, ডাক্তার বলিয়াছে শেষ মুহূর্ত আসিবে হঠাৎ, সে সময়টা কাছে থাকিবার ইচ্ছা শ্যামার।

মোহিনী মাঝে মাঝে আসে।

ওরা ভালো আছে বাবা? বকুল আর খুকি?

চিঠি পাননি মা? —মোহিনী জিজ্ঞাসা করে।

শ্যামা একগাল হাসিয়া বলে, হ্যাঁ বাবা, চিঠি তো পেয়েছি—পরশু পেয়েছি যে চিঠি। লিখেছে বটে ভালোই আছে—এমনি দশা হয়েছে বাবা আমার, সব ভুলে যাই। কখন কোথায় কী রাখি আর খুঁজে পাইনে, খুঁজে খুঁজে মরি সারা বাড়িতে।

বিধানবাবুর বিয়ে দেবেন মা?—মোহিনী এক সময় জিজ্ঞাসা করে। বকুল বুঝি চিঠি লিখিয়াছে তাগিদ দিতে। এই কথা বলিতেই হয়তো আসিয়াছে মোহিনী।

শ্যামা বলে, ছেলে যে বিয়ের কথা কানে তোলে না বাবা? বলে মাইনে বাড়ুক। ছেলের মত নেই, বিয়ে দেব কার?

এ বাড়িতে আসিয়া বিবাহের জন্য ছেলেকে শ্যামা যে পীড়াপীড়ি করিয়াছে তা নয়, ভয়ে সে চুপ করিয়া আছে, ধরিয়া লইয়াছে বিবাহ বিধান এখন করিবে না। এর মধ্যে শামুকে বিধান কি আর ভুলিতে পারিয়াছে? যে মায়াজাল ছেলের চারিদিকে কুহকী মেয়েটা বিস্তার করিয়াছিল কয়েক মাসে তাহা ছিন্ন হইবার নয়। শামুর অজস্র হাসি আজও শ্যামার কানে লাগিয়া আছে। এখন ছেলেকে বিবাহের কথা বলিতে গিয়া কি হিতে বিপরীত হইবে? যে রহস্যময় প্রকৃতি তাহার পাগল ছেলের, কিছুদিন এখন চুপচাপ থাকাই ভালো।

মোহিনী বলে, বিধানবাবুর অমত হবে না মা, আপনি মেয়ে দেখুন।

মোহিনীর বলার ভঙ্গিতে শ্যামা অবাক হইয়া যায়। এত জোর গলায় মোহিনী কী করিয়া ঘোষণা করিতেছে বিধানের অমত হইবে না? বিধানের মন সে জানিল কীসে?

তারপর মোহিনী কথাটা পরিষ্কার করিয়া দেয়। বলে যে কদিন আগে বিধান গিয়াছিল তাহার কাছে, বিবাহের ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছে।

যেচে বিয়ে করতে চান শুনে প্রথমটা অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মা, তারপর ভেবে দেখলাম কি জানেন,—আপনার শরীর ভালো নয়, কাজকর্ম করতে কষ্ট হয় আপনার, ভেবেচিন্তে তাই সম্মত হয়েছেন। ও সব কিছু বললেন না অবিশ্যি, বলবার মানুষ তো নন,—

শ্যামা জানে না! পড়া ছাড়িয়া বিধান একদিন হঠাৎ চাকুরি গ্রহণ করিয়াছিল, আজ বিবাহে মত দিয়াছে। সেদিন অভাবে-অনটনে শ্যামা পাগল হইতে বসিয়াছিল, আজ সংসারের কাজ করিতে তাহার কষ্ট হইতেছে। সেবার বিধান ত্যাগ করিয়াছিল বড়ো হওয়ার কামনা, এবার ত্যাগ করিয়াছে মত। শুধু মত হয়তো নয়। মত আর শামুর স্মৃতি হয়তো আজও একাকার হইয়া আছে ছেলের মনে।

তা হোক, ছেলেরা এমনি ভাবেই বিবাহে মত দিয়া থাকে, মায়ের জন্য। নহিলে স্বপন দেখিবার বয়সে কেহ কী সাধ করিয়া বিবাহের ফাঁদে পড়িতে চায়। তারপর সব ঠিক হইয়া যায়। বউয়ের দিকে টান পড়িলে তখন আর মনেও থাকে না কীসের উপলক্ষে বউ আসিয়াছে, কার জন্য। চোখের জলের মধ্যে শ্যামা হাসে। খুঁজিয়া-পাতিয়া ছেলের জন্য বউ সে আনিবে পরির মতো রূপসি, যার জন্য বিবাহ করিতে হইয়াছিল বলিয়া দুদিন পরে আর আপশোশ থাকিবে না ছেলের—মনে থাকিবে না শামুকে।

শ্যামার মনে আবার উৎসাহ ভরিয়া আসিল। জীবনে কাজ তো এখনও তার কম নয়! আনন্দ উৎসবের পথ তো খোলা কম নয়! এত সে শ্রান্ত হইয়া গিয়াছিল কেন? কত বড়ো সংসার গড়িয়া উঠিবে তাহার, এখনি হইয়াছে কী! বিধানের বউ আসিবে, মণির বউ আসিবে, ফণীর বউ আসিবে, - যে ঘরে ওদের সে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে এক-একটি শুভদিনে আসিতে থাকিবে নাতিনাতনির দল। দোতলায় সে আরও ঘর তুলিবে, পিছনদিকের উঠানে দালান তুলিয়া আরও বড়ো করিবে বাড়ি। অত বড়ো বাড়ি তাহার ভরিয়া যাইবে নবীন নবনারীতে—ও বাড়ির নকুড়বাবুর শাশুড়ির মতো মাথায় শনের নুড়ি ঝুলাইয়া কুঁজো হইয়া সে দাঁড়াইয়া থাকিবে জীবনের সেই বিচিত্র উজ্জ্বল আবর্তের মাঝখানে!

সবই তো এখনও তাহার বাকি?

কেবল একটা দুঃখ তাহাকে আজীবন দহন করিবে। তার অন্ধ মেয়েটা। ওর জন্য অনেক চোখের জল ফেলিতে হইবে তাহাকে।

শ্যামা মেয়ে খুঁজিতে লাগিল। সুন্দরী, সদ্‌বংশজাতা, স্বাস্থ্যবতী, গৃহকর্মনিপুণা, কিছু-কিছু গানবাজনা লেখাপড়া সেলাই-এর কাজজানা, চোদ্দো-পনেরো বছর বয়সের একটি মেয়ে। খানিকটা শামুর মতো, খানিকটা শ্যামার ভাড়াটে সেই কনকের মতো আর খানিকটা শ্যামার কল্পনার মতো হইলেই ভালো হয়। টাকা শ্যামা বেশি চায় না, অসম্ভব দাবি তার নাই।

কয়েকটি মেয়ে দেখা হইল, পছন্দ হইল না। তারপর পাড়ার একবাড়ির গৃহিণী, শ্যামার সঙ্গে তার মোটামুটি আলাপ ছিল, একটি খুব ভালো মেয়ের সন্ধান দিলেন। শহরের অপরপ্রান্তে গিয়া মেয়েটিকে দেখিবামাত্র শ্যামা পছন্দ করিয়া ফেলিল। বড়ো সুন্দরী মেয়েটি, যেমন রং তেমনি নিখুঁত মুখচোখ। আর কোমল আর ক্ষীণ আর ভীরু। শ্যামাকে যখন সে প্রণাম করিল মনে হইল দেহের ভার তুলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, এমন নরম সে মেয়ে, এত তার কোমলতা।

মেয়ে পছন্দ করিয়া শ্যামা বাড়ি ফিরিল। সে বড়ো খুশি হইয়াছে। এমন মেয়ে যে খুঁজিলেও মেলে না! কী রূপ, কী নম্রতা! ওর কাছে কোথায় লাগে শামু?

মোহিনীর সঙ্গে বিধানকে সে একদিন জোর করিয়া মেয়ে দেখিতে পাঠাইয়া দিল। ফিরিয়া আসিয়া মোহিনী বলিল, না মা, পছন্দ হল না মেয়ে।

শ্যামা যেন আকাশ হইতে পড়িল।

কার পছন্দ হল না, তোমার?

আমাব পছন্দ হয়েছে। বিধানবাবুর পছন্দ নয়।

পছন্দ নয়? ওই মেয়ে পছন্দ নয় বিধানের? বাংলাদেশ খুঁজিলে আর অমন মেয়ে পাওয়া যাইবে? বিধান বলে কী!

কেন পছন্দ হল না খোকা?

বিধান বলিল, দূর, ওটা মানুষ নাকি? ফুঁ দিলে মটকে যাবে।

না, শামুকে ছেলে আজও ভোলে নাই। শামুর নিটোল গড়ন, শামুর চপল চঞ্চল চলাফেরা, শামুব নির্লজ্জ দুবন্তপনা আজও ছেলের দৃষ্টিকে ঘেরিয়া রহিয়াছে, আর কোনো মেয়েকে তার পছন্দ হইবে না। শ্যামার মুখে বিষাদ নামিয়া আসে। ফুঁ দিলে মটকাইয়া যাইবে? মেয়েমানুষ আবার ফুঁ দিলে মটকায় নাকি। শামুর মতো সবল দেহ থাকে কটা মেয়ের? থাকা ভালোও নয়। কাঠকাঠ দেখায়, পাকাপাকা দেখায়, অসময়ে সর্বাঙ্গে যৌবন আসিলে কী বিসদৃশ দেখায় মেয়েমানুষকে বিধান তার কী জানে? ও যে ধ্যান করিতেছে শামুর, শামুর পুরন্ত সুঠাম দেহটা যে চোখের সামনে ভাসিয়া বেড়াইতেছে ওর।

লজ্জায় দুঃখে ছেলের মুখের দিকে শ্যামা চাহিতে পারে না। রূপ ও সুষমাই যথেষ্ট নয়, ছেলে তাব যৌবন চায়। দেহ অপরিপুষ্ট হইলে ছবির মতো সুন্দরী মেয়েও ওর পছন্দ হইবে না। ছি, এ কী বুচি বিধানের?

ও বকম বউ আসিলে শ্যামা তো তাকে ভালোবাসিতে পারিবে না!

আবাব মেয়ে খোজা হইতে লাগিল। মেয়ে খুঁজিতে খুঁজিতে কাবার হইয়া গেল মাঘ মাস।

ফাল্গুনেব গোড়ায শীত কমিযা গেল। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামা সতেজে সুস্থ হইয়া উঠিল।

ফাল্গুনের শেযের দিকে বাগবাজারের উকিল হারাধনবাবুর মা-হাবা মেয়েটাব সঙ্গে বিধানেব বিবাহ হইয়া গেল। মেয়েব নাম সুবর্ণলতা।

শ্যামা যা ভাবিয়াছিল তাই। মস্ত ধাড়ি মেয়ে, যৌবনের জোয়ার [illegible] একেবারে বান ডাকিযাছে। বং মন্দ নয, মুখচোখ মন্দ নয় কিন্তু শ্যামার চোখে ও সব পড়িল না, [illegible] সভয়ে শুধু বউয়ের সুস্থ ও সুন্দর শরীরটি দেখিযা মনে মনে সকাতর হইয়া রহিল।

বাড়ন্ত বউ এনেছ [illegible] গো? —বলিল সকলে।

হ্যাঁ বাছা, [illegible] নই এনেছি, ছোটো মেয়ে ছেলেরও পছন্দ নয, আমারও নয়। একা আব পেরে [illegible] না সংসারের ঘানি টানতে, বড়োসড়ো বউটি এল শেখাতে হবে না কিছু, নিজেই সব পারবে।— বলিযা শ্যামা কষ্টে একটু হাসিল।

তা, মন্দ কী হয়েছে বউ? প্রিতিমের মতো মুখখানা। —সকলে বলিল।

তাই নাকি? শ্যামা ভালো করিয়া সুবর্ণের মুখের দিকে চাহিল। তা হইবে!

বিবাহ উপলক্ষে বকুল আসিয়াছিল, রাখালের সঙ্গে মন্দাও আসিয়াছিল। বকুল আসিয়াছিল তিন দিনের জন্য, বিবাহের হইচই থামিবার আগেই সে চলিয়া গেল। বউকে ভালো লাগিয়াছে বকুলের। যাওয়ার সময় এই কথা সে শ্যামাকে বলিয়া গেল।

শ্যামা বলিল, তোর কী পছন্দ বুঝিনে বাবু, এত কী ভালো যে একেবারে গদগদ হয়ে গেলি?

বকুল বলিল, দেখো, ও বউ যদি ভালো না হয় কান কেটে নিও আমার, মা-মরা মেয়ে একটু আদরযত্ন পাবে যার কাছে প্রাণ দেবে তার জন্যে। কী বলছিল জানো? বলছিল তুমি নাকি ওর মার মতো।

তাই নাকি? তা হইবে!

বকুল চলিয়া গেল, বউ চলিয়া গেল, বিবাহ বাড়ি নিঝুম হইয়া আসিল, রহিয়া গেল মন্দা। এই তো সেদিন শ্যামা মন্দার আশ্রয় ছাড়িয়া আসিয়াছে, দাসীর মতো খাটিয়াছে মন্দার সংসারে, অহোরাত্র মন জুগাইয়া চলিয়াছে, সে স্মৃতি ভুলিবার নয়। একবিন্দু কৃতজ্ঞতা নাই শ্যামার, মন্দা রহিয়া গেল বলিয়া সে এতটুকু কৃতার্থ হইয়া গেল না। কয়েক বছর আশ্রয় দিয়াছিল বলিয়া শ্যামার কাছে কী সমাদর মন্দা আশা কবিযাছিল সেই জানে, বোধ হয় ভাবিয়াছিল আজও শ্যামার উঁপর কর্তৃত্ব করিতে পারিবে। কিন্তু সে না পাইল মনের মতো সমাদর, না পারিল কোনোদিকে কর্তৃত্ব করিতে। শ্যামার সংসারে কী কর্তৃত্ব আব সে করিতে চাহিবে, ভালো করিয়া আবার শীতলের চিকিৎসা করানোর জন্যই তাহার উৎসাহ দেখা গেল সব চেয়ে বেশি। বলিল, রয়ে কী গেলাম সাধে? কী করে রেখেছ তোমবা দাদাকে। দাদাকে ভালো না করে আমি এখান থেকে নড়ছিনে বউ!

কত সে দবদি বোন, কত তাব ভাবনা। কে জানে, হইতেও পারে। আজ তো সপুত্র সকন্যা শ্যামাব ভবিষ্যৎ অন্ধকার নয়, কিছুই তো ওদের জন্য আর তাহাকে কবিতে হইবে না, শীতলের জন্য হয়তো তাই আন্তরিক ব্যাকুলতাই মন্দার জাগিয়াছে। শ্যামাকে সে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

শ্যামা বলিল, ওর আব চিকিচ্ছে নেই ঠাকুরঝি, ওর চিকিচ্ছে এখন সেবাযত্ন।

মন্দা স্তম্ভিত হইয়া বলিল, মুখ ফুটে এমন কথা তুমি বলতে পারলে বউ! তুমি কী গো, অ্যাঁ?

শ্যামা বলিল, কী বলতে হবে তুমিই না হয় তবে বলে দাও?

মন্দা রাগিয়া উঠিল, কাঁদিয়াও ফেলিল। কে জানে অকৃত্রিম বেদনায় মন্দা কাতর হইযাছে কিনা। এ তো অর্থসাহায্যের কথা নয়, ভারবহনের কথা নয়, ভাইয়ের জীবন তাহার। চিকিৎসা নাই, ভাই তাহার বাঁচিবে না? মন্দার হয়তো ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। শীতলের অসংখ্য পাগলামি আর অজস্র স্নেহ,—বড়ো ভালোবাসিত শীতল তাহাকে। সেই দিনগুলি কোথায় হারাইয়া গিযাছে, কিন্তু এই বাড়িতেই সে সব ঘটিয়াছিল। এখানে বসিয়া অনায়াসে কল্পনা করা চলে সে সব ইতিহাস। হয় তো তাই মন্দার কান্না আসে।

বলে দাদাব জন্যে কিছুই করবে না তুমি? ডাক্তার-কবরেজ দেখাবে না?

শ্যামা বলে, ডাক্তাব কি দেখানো হয়নি ঠাকুরঝি? ডাক্তার না দেখিয়ে চুপ করে বসে আছি আমি? ষোলো টাকা ভিজিট দিয়ে ডাক্তার এনেছি, কলকাতার সেরা কবরেজকে দেখিয়েছি—জবাব দিয়েছে সবাই। আমি আর কী করব?

তবে আর কী, কর্তব্য করেছ এবার টান দিয়ে ফেলে দাও দাদাকে রাস্তায়! আজ বুঝতে পারছি বউ দাদা কেন বিবাগি হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

এতকাল পরে মন্দা তবে শ্যামাকে চিনিতে পারিয়াছে?

শীতলেব পায়েব কাছে বসিয়া মন্দা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। চমকাইয়া উঠিয়া বড়ো ভয় পায় শীতল। দাড়ির ফাঁকে একটু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে, আমার সেই কুকুরটা আছে মন্দা?

দাদা গো! বলিয়া মন্দা হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে।

শীতল থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে। মনে হয় আর কিছুদিন যদি বা সে বাঁচিত মন্দার বুকফাটা কান্নায় এখুনি মরিয়া যাইবে। বড়ো কষ্ট হয় শীতলের, বড়ো ভয় করে। বড়ো বড়ো কালো লোমশ পা ফেলিয়া নিজের মরণকে সে যেন আগাইয়া আসিতে দেখিতে পায়। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে চাহিয়া থাকে মন্দার দিকে।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া শ্যামা বলে, ঠাকুরঝি, শোনো, বাইরে এসো একবার—

সকলেই বুঝিতে পারে মরণাপন্ন মানুষের কাছে এ ভাবে কাঁদিতে নাই এই কথা বলিতে চায় শ্যামা। মন্দা চোখ মুছিয়া উদ্ধত ভঙ্গিতে সোজা হইয়া বসে। বেশ করিয়াছে কাঁদিয়া। শীতলও বুঝি তাই মনে করে। মন্দার আকস্মিক কান্নায় আঁতকাইয়া উঠিয়া তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, তবু শ্যামার বুদ্ধি-বিবেচনার চেয়ে যে মন্দার কান্না মারিয়া ফেলার উপক্রম করে তাই বুঝি ভালো শীতলের কাছে। কী উৎসুক চোখেই সে মন্দার অশ্রুসিক্ত মুখের দিকে চাহিয়া থাকে। ছেলেবেলায় বকুল আর বনগাঁয় মন্দার সেই কুকুরটা ছাড়া এ জগতে সকলে ফাঁকি দিয়াছে শীতলকে।

দিন কুড়ি থাকিয়া মন্দা চলিয়া গেল। আসিল নববর্ষ আর গ্রীষ্ম। শীতের শেষে শ্যামার শরীরটা ভালো হইয়াছিল, গরমে আবার যেন সে দুর্বল হইয়া পড়িল। কাজ করিতে শ্রান্তি বোধ হয়, সন্ধ্যার সময় হাত-পা চিবাইতে থাকে। কিন্তু কাহাকেও সে তাহা বুঝিতে দেয় না, চুপ করিয়া থাকে। কেন, দুর্বল শরীরে খাটিয়া মরে কেন শ্যামা? তার সেবা করার জন্য ছেলে না তার বিবাহ করিয়াছে? বউকে আনাইয়া লইলেই তো এবার সে অনায়াসে বসিয়া বসিয়া আয়াস করিতে পারে! কিন্তু কেন যেন বউকে আনিবার ইচ্ছা শ্যামার হয় না। না আনিলে অবশ্য চলিবে না, ছেলের বউকে কি বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখা যায় চিরদিন? যাক, দুদিন যাক।

একদিন বিধান আপিস গিয়াছে, কোথা হইতে রঙিন খাম আসিল একখানা, আকাশের মতো নীল রঙের। শ্যামা অবাক হইয়া গেল। এর মধ্যে চিঠি লিখিতে শুরু করিয়াছে বউ? ওদের ভাব হইল কবে? কদিনের বা দেখা-শোনা! বিধান লুকাইয়া লুকাইয়া যায় না শ্বশুরবাড়ি? নিজের মনে শ্যামা হাসে। লুকাইয়া শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ছেলেই বটে তার। কী লিখিয়াছে বউ? চিঠিখানা সে বিধানের মশারির উপর রাখিয়া দিল।

বিধান আসিলে বলিল, তোর একখানা চিঠি এসেছে খোকা, রেখে দিয়েছি মশারির ওপোর।

বিধান চিঠি পড়িয়া পকেটে রাখিয়া দিল।

বাগবাজারের চিঠি বুঝি? ওরা ভালো আছে?—শ্যামা জিজ্ঞাসা করিল।

বিধান বলিল, আছে।

ছেলের সংক্ষিপ্ত জবাবে শ্যামা যেন একটু রাগ করিয়াই সরিয়া গেল।

কয়েকদিন পরে একটা ছুটির দিনে শ্যামা একটু বিশেষ আয়োজন করিয়াছিল রান্নার। রাঁধিতে বাঁধিতে অনেক বেলা হইয়া গেল। রান্নাঘরের ভিতরটা অসহ্য গরম, শ্যামা যেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে অমনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। সামান্য ব্যাপার, মূর্ছাও নয়, সন্ন্যাসরোগও নয়, মাথায় একটু জলটল দিতেই শ্যামা সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিল। বিধান কিন্তু তাহাকে সেদিন আর উঠিতে দিল না, শোয়াইয়া রাখিল। বিকালে বিধান বাহির হইয়া গেল। রাত্রি আটটার সময় ফিরিয়া আসিল সুবর্ণকে সঙ্গে করিয়া।

বিধানের নিষেধ অমান্য করিয়া শ্যামা তখন রাঁধিতে গিয়াছে। সুবর্ণ প্রণাম করিতে সে একেবারে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

এ কী রে খোকা? বলা কওয়া নেই বউমাকে নিয়ে এলি যে তুই? জিজ্ঞেস করা দরকার মনে করলিনে বুঝি একবার?

এ রকম অভ্যর্থনার জন্য বিধান প্রস্তুত ছিল না। সে চুপ করিয়া রহিল। সুবর্ণকে দেখিয়া শ্যামা খুশি হয় নাই? তার সেবা করার জন্য সে যে হঠাৎ বউকে লইয়া আসিয়াছে এটা সে খেয়াল করিল না? বিধান দুঃখিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সুবর্ণের কী হইল বোঝা গেল না।

শ্যামা মণিকে বলিল, যা তো মণি, তোর বউদিকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা গে।......কী সব কাণ্ড বাবা এদের! রাতদুপুরে হুট করে নতুন বউকে এনে হাজির—কীসে কী ব্যবস্থা হবে এখন?

বিধান ভয়ে বলিল, বাইরে তোমার বেয়াই বসে আছেন মা।

তাকেও এনেছিস? আমি পাবব না বাবু রাতদুপুরে রাজ্যের লোকের আদর-আপ্যেন করতে, মাথা বলে ছিঁড়ে যাচ্ছে আমার, গা-হাত যা চিবুচ্ছে যেন মুচড়ে যাচ্ছে, —কী বলে ওদের তুই নিয়ে এলি খোকা? একফোঁটা বুদ্ধি কি তোর নেই?

কী রাগ শ্যামার! ছেলেবেলা যাকে সে ধমক দিতে ভয় পাইত সেই ছেলেকে কী তার শাসন! বেশ গা-ঝাড়া দিয়া উঠিযাই সে রাঁধিতে আসিয়াছিল। সুবর্ণকে দেখিয়াই তার মাথা ধরিয়া গেল, গা-হাত চিবাইতে আরম্ভ করিল, শ্যামার অন্ত পাওয়া ভার। কী শোচনীয়ভাবে তার মনের জোর কমিয়া গিযাছে! তারই সেবার্থে পরিণীতা পত্নীকে তারই সেবার জন্য অসময়ে বিধান টানিয়া লইয়া আসিয়াছে—শুধু অনুমতি নেয নাই, আগে ছেলের এই কাণ্ডে শ্যামা কত কৌতুক বোধ করিত, কত খুশি হইত, আজ শুধু বিরক্ত হওযা নয়, বিরক্তিটুকু চাপিয়া পর্যন্ত রাখিতে পারিতেছে না। এ আবার কী রোগ ধরিল শ্যামাকে? ছেলে একটি যৌবনোচ্ছলা মেয়েকে বাছিয়া বিবাহ করিয়াছে বলিয়া জননীর কী এমন অবুঝ হওযা সাজে।

ছেলে তো এখনও পর হইযা যায় নাই? মেনকা-উর্বশী-তিলোত্তমার মোহিনী মায়াতেও পর হইযা যাওয়ার ছেলে তো সে নয়? শ্যামা কি তা জানে না? এমন অন্ধ জ্বালাবোধ কেন তার?

বোধ হয় হঠাৎ বলিয়া, ওরা খবর দিযা আসিলে এতটা হয়তো হইত না। ক্রমে ক্রমে শ্যামা শান্ত হইল। একবার পরনের কাপড়খানার দিকে চাহিল, —না, হলুদ-কালি-মাখা এ কাপড়ে কুটুমের সামনে যাওযা যায না। —যা তো খোকা, চট করে ওপোর থেকে একটা সাফ কাপড় এনে দে তো আমায। কাপড় বদলাইয়া শ্যামা বাহিরের ঘরে গেল। হারাধন বিধানের বিছানায বসিয়াছিল, শীর্ণদেহ লম্বাকৃতি লোক, হাতের ছাতিটার মতো জরাজীর্ণ, দেখিতে অনেকটা সেই হারাণ ডাক্তারের মতো।

শ্যামাকে দেখিয়া হারাধন বুঝি একটু অবাক হইল। বলিল, আহা, আপনি কেন উঠে এলেন? কেমন আছেন এখন?

শ্যামা বলিল, খোকা বুঝি বলেছে আমার খুব অসুখ?

হারাধন বলিল, তাই তো বললে, গিয়ে একদণ্ড বসলে না, তাড়াহুড়ো করে সবাইকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল,—কাপড় কখানা গুছিয়ে আনার সময়ও মেয়েটা পায়নি। মেয়ের মাসি কেঁদে মরছে, অমন করে কেউ মেয়ে পাঠাতে পারে বেয়ান?

বোঝা গেল, শ্যামাকে সুস্থ দেখিয়া হারাধন অসন্তুষ্ট হইয়াছে। হারাধনের অসন্তোষে শ্যামা কিন্তু খুশি হইল। মধুর কণ্ঠে বলিল, ওমনি পাগল ছেলে আমার বেয়াই, আমার একটু কিছু হলে কী করবে দিশে পায না। সকালে উনুনের ধার থেকে বাইরে এসে মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল, পড়ে গেলাম উঠানে, তাইতে ভড়কে গেছে ছেলে। —বড়ো তো কষ্ট হল আপনাদের?

শ্যামা মিষ্টি আনাইল, খাইতে পীড়াপীড়ি করিল, হারাধন কিছু খাইল না। খাইতে নাই। বলিয়া গেল, নাতি হইলে যাচিয়া পাত পাড়িবে। হারাধনকে বিদায় করিয়া শ্যামা সুবর্ণের খোঁজে গেল।

কোথায় গেল সুবর্ণ? সে তো একতলায় নাই।

সিঁড়ি ভাঙিয়া শ্যামা উপরে গেল। শীতলের পায়ের কাছে মাথা নত করিয়া সুবর্ণ বসিয়া আছে, তার কোলে শ্যামার অন্ধ মেয়েটি। থাবা পাতিয়া বসিয়া ফণী হাঁ করিয়া বউদিদির মুখখানা

দেখিতেছে, আহ্লাদে গদগদ হইয়া মণি কথা কহিতে গিয়া ঢোক গিলিতেছে। ধীরে ধীরে শীতল কী যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে সুবর্ণকে। সুবর্ণের মুখখানা ঈষৎ আরক্ত, কপালে বিন্দুবিন্দু ঘাম, চন্দনের স্বচ্ছ ফোঁটার মতো।

ঘরের মেয়ে? তাই তো বটে! তার স্বামী-পুত্রের মাঝখানে ওকে তো অনভ্যস্ত, আকস্মিক আগন্তুক মনে হয় না। ঘরের মেয়ের মতোই যে দেখাইতেছে সুবর্ণকে?

শ্যামা আগাইয়া গেল, বলিল বউমা, কিছু খাওনি বিকেলে, এসো তোমায় খেতে দি।

নতুন বউয়ের আব ভালো মন্দ কী, সে তো শুধু একতাল লজ্জা-ভয়-নম্রতা, তবু ওর মধ্যেই মনটা বোঝা যায়, সরল না কুটিল, কুঁড়ে না কাজের লোক। মা-হারা মেয়ে? কথাটা শ্যামার মনে থাকে না, —তুমিই আমার হারানো মা, বলিয়া শ্যামার স্নেহের ভান্ডারে ডাকাতি করিবার মেয়েও সুবর্ণ নয়, সে সবল কিন্তু বুদ্ধিমতী, কাজের মানুষ কিন্তু কুলিরমণী নয়। দরকার মতো একখানা-দুখানা বাসন সে বাসন-মাজাব মতোই মাজিয়া আনে, কাজটুকু করিতে পাইয়া এমন উৎফুল্ল হইয়া ওঠে না যে মনে হইবে পুষ্পচয়ন করিতে পাইয়াছে। শাশুড়ির হাতের কাজ কাড়িয়া যে বউ কাজ করে কোনো শাশুড়িই তাকে দেখিতে পাবে না, সুবর্ণ সে চেষ্টা করে না, স্বাভাবিক নিয়মে যে সব কাজ শ্যামার হাত হইতে খসিয়া তাহার হাতে আসে মন দিয়া সেইগুলিই সে করিয়া যায়, আর একটি সজাগ দৃষ্টি পাতিয়া রাখে শ্যামার মুখে, কালো নিভিয়া মেঘ ঘনাইয়া আসিবার উপক্রমেই চালাক মেয়েটা ত্রুটি সংশোধন করিয়া ফেলে।

নেহাত দোষ করিয়া ফেলিলে প্রয়োগ করে একেবারে চরম অস্ত্র! —চোখ দুটা জলে টাবুটুবু ভর্তি করিয়া শ্যামার সামনে তুলিয়া ধরে। ভালো করিয়া শুরু করার আগেই শ্যামার মুখের কথাগুলি জমিয়া যায়।

শ্যামা হঠাৎ সুব বদলাইয়া সস্নেহে হাসিয়া বলে, আ আবাগের বেটি, এই কথাতে চোখে জল এল! কী আর বলেছি মা তোকে অ্যাঁ?

চোখ! অশ্রুসজল চোখকে শ্যামা বড়ো ডরায়। মানুষের চোখের সম্বন্ধে সে বড়ো সচেতন। চোখ ছিল তার বকুলের আর চোখ হইয়াছে বকুলেব মেয়েটার! শ্যামার মেয়েটি অন্ধ, এত যে আলো জগতে একটি বেখাও তার খুকির চেতনায় পৌঁছায় না। সজল চোখে চাহিয়া যে-কোনো দৃষ্টিষ্মতী শ্যামাকে সম্মোহন কবিতে পারে।

বড়ো দোটানায় পড়িয়াছে শ্যামা।

ছেলের বউটাকে ভালোবাসিবে কি বাসিবে না।

এমনি মন্দ লাগে না, মায়া করিতে ইচ্ছা হয়, বকুল যে ফাঁকটা রাখিয়া গিয়াছে সুবর্ণকে দিয়া তাহা ভরিয়া তুলিবার কল্পনা প্রায়ই মনে হয় শ্যামার। কিন্তু হঠাৎ তাহার চমক ভাঙে, উঃ এ কী হিল্লোল তুলিয়া সামনে দিয়া হাঁটিয়া গেল বউ, এ কী আগুন ওর দেহময়? এমন করিয়া কে ওকে গড়িয়াছিল, রক্তমাংসের এই মোহিনীকে? সুবর্ণ স্নান করে চাহিয়া দেখিয়া শ্যামার বুকের রক্ত যেন শুকাইয়া যায়। বড়ো ভয় করে শ্যামার। কে জানে ওর ওই ভয়ানক সুন্দর দেহের আকর্ষণে কোথা দিয়া অমঙ্গল ঢুকিবে সংসারে।

কড়া শীতে যেমন হইয়াছিল, চড়া গরম পড়িতে শ্যামার শরীর আবার তেমনি খারাপ হইয়া গেল। এবার একটা অতিরিক্ত উপসর্গ দেখা দিল—তিরিক্ষে মেজাজ। অল্পে অল্পে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠর শেষে বকুনি ছাড়া কথা বলাই যেন সে বন্ধ করিয়া দিল। থাকে-থাকে, তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া ওঠে, যাকে পায় তাকেই যত পারে বকে, তারপর অদৃষ্টের নিন্দা করিতে করিতে কাঁদিয়া ফেলে। শ্যামার ভয়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের মুখ সর্বদা শুকনো দেখায়। সবচেয়ে মুশকিল হয় সুবর্ণের। অন্য সকলে শ্যামার

সম্মুখ হইতে পালাইয়া বাঁচে, তার পালানোর উপায় নাই। তার উপর বিধান আবার তাহাকে হুকুম দিয়া রাখিয়াছে, সব সময় কাছেকাছে থাকবে মার, যা বলেন শুনবে, আগুনের আঁচে বেশি যেতে দেবে না, ওপোর-নীচ করতে দেবে না, সেবাযত্ন করবে---মার শরীর ভালো নয় জানো তো? বিধান বলিয়া খালাস, সকালে উঠিয়া ছেলে পড়াইতে যায়, বাড়ি ফিরিয়াই ছোটে আপিসে, ফেরে সন্ধ্যার পর, সারাদিন শ্যামা কী কাণ্ড করে সে তো দেখিতে আসে না, সুবর্ণের অবস্থা সে কী বুঝিবে। কিছু বলিবার উপায়ও সুবর্ণের নাই। কী বলিবে? যদি বলিতে যায়, বিধান যে ভাবিয়া বসিবে, দ্যাখো এর মধ্যে নালিশ করা শুরু হইয়াছে।

কিন্তু বিধান সব বোঝে। চিরকাল বুঝিয়া আসিয়াছে। সুবর্ণ এখনও জানে না যে বুঝিয়াও বিধান কোনোদিন কিছু বলে না, চুপচাপ নিজের কাজ করিয়া যায়, চুপচাপ উপায় ঠাওরায়। বনগাঁয় শ্যামা একবার পাগল হইতে বসিয়াছিল এবারও সেই রকম আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া বিধান কম ভয় পায় নাই, প্রতিবিধানের কোনো উপায় শুধু সে খুঁজিয়া পাইতেছে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যঘটিত, শ্যামাকে লইয়া কোথাও চেঞ্জে যাইতে পারিলে ভালো হইত, কোনো ঠান্ডা দেশে, দার্জিলিং অথবা সিমলা। সে অনেক টাকার কথা। অত টাকা কোথায় পাইবে সে?

সংসার চালানোর ভাবনাতেই এই বয়সে সে বুড়া হইয়া গেল। এ বাড়িতে সে ছাড়া সকলেই বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে বাড়িটা পর্যন্ত তাদের নয়, মাসে মাসে ভাড়া গুনিতে হয় বিধানকে।

সত্যই কি শ্যামার আবার সেই রকম হইতেছে, বনগাঁয়ে যেমন হইয়াছিল, যে জন্য পড়া ছাড়িয়া চাকরি লইতে হইয়াছিল বিধানকে? শ্যামার চোখের দিকে তাকাও, বাহিরে দুরন্ত রোদের যেমন তেজ তেমনি জ্বালা শ্যামার চোখে। এ বুঝি জীবনব্যাপী দুঃখের অভিশাপ। আজীবন শান্ত আবেষ্টনীর মধ্যে সুরক্ষিত আশ্রয়ের আড়ালে বাস করিতে না পারিলে এমনি বুঝি হইয়া যায় অসহায়া নারী, আজীবন দুঃখদুর্দশার পীড়ন সহিয়া শেষে যখন সুখী হওয়ার সময় আসে তখন তুচ্ছ আবহাওয়ার উত্তাপেই গলিয়া যায়। আঁচল গায়ে জড়াইয়া শ্যামা কত শীত কাটাইয়া দিয়াছে, তিনটি উনানের আঁচে বসিয়া পার করিয়া দিয়াছে কত গ্রীষ্ম। এবার সে এত কাবু হইয়া গেল!

তারপর একদিন আকাশে ঘনঘটা আসিল। মাটি জুড়াইল, জুড়াইল মানুষ। বিকালের শেষের দিকে ধীরে ধীরে চুপ করিয়া মানুষ যেভাবে ঘুমাইয়া পড়ে শ্যামাও তেমনি ভাবে ক্রমে ক্রমে শান্ত ও বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

সকলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তবু, সুবর্ণকে শ্যামা পুরাপুরি সুনজরে দেখিতে পারিল না। একটা বিদ্বেষের ভাব রহিয়াই গেল। বিধান কত আদরের ছেলে শ্যামার, সাত বছর বন্ধ্যা থাকিয়া, প্রথম সন্তানকে বিসর্জন দিয়া ওকে শ্যামা কোলে পাইয়াছিল,---সুবর্ণ তার বউ। তবু সুবর্ণকে বুকের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না কী দুর্ভাগ্য শ্যামার!

শীতল তেমনি অবস্থায় এখনও বাঁচিয়া আছে, ডাক্তারের ভবিষ্যদ্‌বাণী বুঝি ব্যর্থ হইয়া যায়! এতদিনে তার মরিয়া যাওয়ার কথা। মৃত্যু কিন্তু দুটি একটি অঙ্গ গ্রাস করিয়া, সর্বাঙ্গের প্রায় সবটুকু শক্তি শুষিয়া তৃপ্ত হইয়া আছে, হঠাৎ কবে আবার ক্ষুধা জাগিবে এখনও কেহ তাহা বলিতে পারে না।

শ্যামা বলে, হ্যাঁ গা, বড়ো কি কষ্ট হচ্ছে? কী করব বল দেখি? বউমা বসবে একটু কাছে? গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে? কোনখানে কষ্ট তোমার? ও মণি ডাক তো তোর বউদিকে, ওষুদ মালিশ করে

দিয়ে যাক।—কোথায় যে যায়, ফাঁক পেয়েছে কী ছেলের সঙ্গে ফুসফাস গুজগাজ করতে চলল—কী মন্ত্র দিচ্ছে কানে কে জানে।

সুবর্ণ ওষুধ মালিশ করিতে বসে।

শ্যামা বলে, দ্যাখ তো মণি ও বাড়ির ছাদে কে? নকুড়বাবুর বাঁশিবাজানে ভাইটে বুঝি? দে তো দরজাটা ভেজিয়ে,—বউমা, আরেকটু সামলে-সুমলেই না হয় বসতে বাছা, একটু বেশি লজ্জা থাকলে ক্ষতি নেই কারও।

সুবর্ণ জড়সড় হইয়া যায়। রাঙা মুখ নত করে। শ্যামা যখন এমনিভাবে বলে কোনো উপায়ে মিশাইয়া যাওয়া যায় না শূন্যে?

ভালো লাগে না বলিয়া শ্যামারও ভালো লাগে না! সুবর্ণের ম্লান মুখখানা দেখিয়া কত কী সে ভাবে। ভাবে, সে যদি আজ অমনি বউ হইত এবং আর কেহ যদি অমনি করিয়া তাকে বলিত, কেমন লাগিত তার? বিধানের কানে গেলে কত ব্যথা পাইবে সে! মণি বড়ো হইতেছে, কথাগুলি তার মনে না-জানি কীভাবে কাজ করে! এ কী স্বভাব, এ কী জিহ্বা হইয়াছে তার? কেন সে না বলিয়া থাকিতে পারে না? শ্যামা বাহিরে যায়। বর্ষার মেঘলা দিন। ধানকলের অঙ্গনে আর ধান মেলিয়া দেয় না, অতবড়ো অঙ্গনটা জনহীন, কুলিরমণী নাই, পায়রার ঝাঁক নাই। খুকিকে শ্যামা বুকের কাছে আরও উঁচুতে তুলি[illegible] ধরে। বিধানের বউকে কী কটু কথা শ্যামা বলিযাছে, কী বিষাদ শ্যামার মনে—দিগদিগন্ত চোখের জলে ঝাপসা হইয়া গেল।

আশ্বিনের গোড়ায় হারাধন মেয়েকে লইয়া গেল।

যাওযার সময় সুবর্ণ অবিকল মা-হারা মেয়ের মতোই ব্যবহার করিয়া গেল। শ্যামা ভালোবাসে না, শ্যামা কটু কথা বলে, তবু মনে হইল সুবর্ণ যাইতে চায় না, এখানে থাকিতে পারিলেই খুশি হইত। শ্যামা নির্বিবাদে ভাবিয়া বসিল, এ টান বিধানের জন্য—সে যা ব্যবহার করিয়াছে তার জন্য সুবর্ণের কীসের মাথা ব্যথা?

পূজার পরেই আমায় আনবেন মা।—সুবর্ণ সজল চোখে বলিয়া গেল।

শ্যামা শুধু বলিল, আনব।

বিধানের বউ! সে বাপের বাড়ি যাইতেছে। বুকে জড়াইয়া এব[illegible] তো শ্যামা কাঁদিতে পারিত? কিন্তু কী করিবে শ্যামা, যাওয়ার জন্য সুবর্ণ তখন সাজগোজ করিয়াছে, বউয়ের সে চোখ-ঝলসানো মূর্তির দিকে শ্যামা চাহিতে পারিতেছিল না, মনে হইতেছিল, যাক, ও চলিযা যাক, দুদিন চোখদুটা একটু জুড়াক শ্যামার।

পূজার সময় মন্দা আসিয়া কয়েকদিন রহিল। শীতলকে দেখিতে আসিয়াছে। মন্দার জন্য সুবর্ণকেও দুদিন আনিয়া রাখা হইল। সুবর্ণ ফিরিয়া গেলে একদিন মন্দা বলিল, হ্যাঁ বউ, একটা কথা বলি তোমায়, ভালো করে তাকিয়ে দেখেছ বউমার দিকে? আমার যেন সন্দেহ হল বউ।

শ্যামা চমকাইয়া উঠিল। তারপর হাসিয়া বলিল, না ঠাকুরঝি, ও তোমার চোখের ভুল।

মন্দার চোখের ভুলকে শ্যামা কিন্তু ভুলিতে পারিল না, দিবারাত্রি মনে পড়িতে লাগিল সুবর্ণকে আর মন্দার ইঙ্গিত। কী বলিয়া গেল মন্দা? সত্য হইলে শ্যামা কী অন্ধ, তার চোখে পড়িত না? শ্যামা বড়ো অন্যমনস্ক হইয়া গেল। সংসারের কাজে বড়ো ভুল হইতে লাগিল শ্যামার। কী মন্ত্র মন্দা বলিয়া গিয়াছে, সুবর্ণকে দেখিবার জন্য শ্যামার মন ছটফট করে, সে ধৈর্য ধরিয়া থাকিতে পারে না। একদিন মণিকে সঙ্গে করিয়া সে চলিয়া গেল বাগবাজারে। মন্দার মন্ত্র কী শ্যামার চোখে অঞ্জনও পরাইয়া দিয়াছে? কই, সুবর্ণের দিকে চাহিয়া এবার তো শ্যামার চোখ পীড়িত হইয়া উঠিল না?

শ্যামা বলিয়া আসিল, সামনের রবিবার দিন ভালো আছে, ওইদিন আসিয়া সুবর্ণকে লইয়া যাইবে। না, তাকে বলা মিছে, বউকে সে আর বাপের বাড়ি ফেলিয়া রাখিতে পারিবে না।

সুবর্ণের মাসি বলিল, এই তো সেদিন এল, এর মধ্যে এত তাড়া কেন? আরেকটা মাস থেকে যাক।

শ্যামা বলিল, না বাছা না, তুমি বোঝ না, —যার ছেলের বউ সে ছাড়া কারও বুঝবার কথা নয়,—ঘর আমাব আঁধাব হয়ে আছে।

একে একে দিন গেল। ঋতু পরিবর্তন হইল জগতে। শীত আসিল, শীতল পরলোক গেল, শ্যামা ধরিল বিধবার বেশ, তারপর শীতও আর রহিল না। সুবর্ণকে শ্যামা যেন বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া একটি দিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কোথায় গেল ক্ষুদ্র বিদ্বেষ, তুচ্ছ শত্রুতা! সুবর্ণের জীবন লইয়া শ্যামা যেন বাঁচিয়া রহিল। তারপর এক চৈত্র নিশায় এ বাড়ির যে ঘরে শ্যামা একদিন বিধানকে প্রসব করিয়াছিল সেই ঘরে সুবর্ণ অচৈতন্য হইয়া গেল, ঘরে রহিল কাঠকয়লা পুড়িবার গন্ধ, দেয়ালে রহিল শায়িত মানুষের ছায়া, জানালার অল্প একটু ফাঁক দিয়া আকাশের কয়েকটা তারা দেখা গেল আর শ্যামার কোলে স্পন্দিত হইতে লাগিল জীবন।

অতসী মামি

রচনাকাল অনুসারে গল্পগুলি সাজানো হয়েছে। অতসী মামি আমার প্রথম রচনা। তারপর লেখার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেটা স্পষ্ট বোঝা যাবে।



অতসী মামি প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদচিত্র

অতসী মামি

যে শোনে সেই বলে, হ্যাঁ, শোনবার মতো বটে!

বিশেষ করে আমাব মেজমামা। তাঁর মুখে কোনো কিছুর এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা খুব কম শুনেছি।

শুনে শুনে ভারী কৌতূহল হল। কী এমন বাঁশি বাজায় লোকটা যে সবাই এমনভাবে প্রশংসা করে? একদিন শুনতে গেলাম। মামার কাছ থেকে একটা পরিচয়পত্র সঙ্গে নিলাম।

আমি থাকি বালিগঞ্জে, আর যাঁর বাঁশি বাজানোব ওস্তাদির কথা বললাম তিনি থাকেন ভবানীপুর অঞ্চলে। মামার কাছে নাম শুনেছিলাম, যতীন। উপাধিটা শোনা হয়নি। আজ পবিচয়পত্রের উপরে পুরো নাম দেখলাম, যতীন্দ্রনাথ রায়।

বাড়িটা খুঁজে বার করে আমার তো চক্ষুস্থির! মামার কাছে যতীনবাবুর এবং তাঁর বাঁশি বাজানোর যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড়ো আব ভদ্রচেহারা একটা বাড়িতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা। কিন্তু বাড়িটা যে গলিতে সেটার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এ যে ইট-বার করা তিনকালের বুড়োর মতো নড়বড়ে একটা ইটের খাঁচা! সামনেটার চেহারাই যদি এ রকম, ভেতরটা না জানি কী রকম হবে।

উইয়ে ধবা দরজাব কড়া নাড়লাম।

একটু পরেই দরজা খুলে যে লোকটি সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁকে দেখে মনে হল ছাইগাদা নাড়তেই যেন একটা আগুন বার হয়ে পড়ল!

খুব রোগা। গায়ের রঙও অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবু একদিন চেহারাখানা কী রকম ছিল অনুমান করা শক্ত নয়। এখনও যা আছে, অপূর্ব!

বছর ত্রিশেক বয়স, কী কিছু কম? মলিন হয়ে আসা গায়ের রং অপূর্ব, শরীরের গড়ন অপূর্ব; মুখের চেহারা অপূর্ব। আর সব মিলিয়ে যে রূপ তাও অপূর্ব। সব চেয়ে অপূর্ব চোখ দুটি। চোখে চোখে চাইলে যেন নেশা লেগে যায়।

পুরুষেরও তা হলে সৌন্দর্য থাকে! ইট-বার-করা নোনা-ধরা দেয়াল আর উইয়ে-ধবা দরজা, তার মাঝখানে লোকটিকে দেখে আমার মনে হল ভারী সুন্দর একটা ছবিকে কে যেন অতি বিশ্রী একটা ফ্রেমে বাঁধিয়েছে।

বললেন, আমি ছাড়া তো বাড়িতে কেউ নেই, সুতরাং আমাকেই চান। কিন্তু কী চান?

আমার মুগ্ধ চিত্তে কে যেন একটা ঘা দিল। কী বিশ্রী গলার স্বর! কর্কশ! কথাগুলি মোলায়েম কিন্তু লোকটির গলার স্বর শুনে মনে হল যেন আমায় গালাগালি দিচ্ছেন! ভাবলাম, নির্দোষ সৃষ্টি বিধাতার কুষ্ঠিতে লেখে না। এমন চেহারায় ওই গলা! সৃষ্টিকর্তা যত বড়ো কারিগর হোন, কোথায় কী মানায় সে জ্ঞানটা তাঁর একদম নেই।

বললাম, আপনার নাম তো যতীন্দ্রনাথ রায়? আমি হরেনবাবুর ভাগনে।

পরিচয়পত্রখানা বাড়িয়ে দিলাম।

এক নিশ্বাসে পড়ে বললেন, ইস! আবার পরিচয়পত্র কেন হে? হরেন যদি তোমার মামা, আমিও তোমার মামা। হরেন যে আমায় দাদা বলে ডাকে! এসো, এসো, ভেতরে এসো।

আমি ভেতরে ঢুকতে তিনি দরজা বন্ধ করলেন।

সদর দরজা থেকে দু-ধারের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে হাত পাঁচেক এসে একটা হাত তিনেক চওড়া বারান্দায় পড়ে ডান দিকে বাঁকতে হল। বাঁদিকে বাঁকবার জো নেই, কারণ দেখা গেল সেদিকটা প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা।

ছোট্ট একটু উঠান, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেক উঠানের চারটে করে পাশ থাকে, এটারও তাই আছে দেখলাম। দুপাশে দুখানা ঘর, এ বাড়িরই অঙ্গ। একটা দিক প্রাচীর দিয়ে বন্ধ করা, অপর দিকে অন্য এক বাড়ির একটা ঘরের পেছন দিক, জানালা দরজার চিহ্নমাত্র নেই, প্রাচীরেরই শামিল।

আমার নবলব্ধ মামা ডাকলেন, অতসী, আমার ভাগনে এসেছে, এ ঘরে একটা মাদুর বিছিয়ে দিয়ে যাও। ও ঘরটা বড়ো অন্ধকার।

এ-ঘর মানে আমরা যে ঘরের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ও-ঘর মানে ওদিককার ঘরটা। সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এক তরুণী, মস্ত ঘোমটায় মুখ ঢেকে।

যতীন মামা বললেন, এ কী! ঘোমটা কেন? আরে, এ যে ভাগনে!

মামির ঘোমটা ঘুচবার লক্ষণ নেই দেখে আবার বললেন, ছি ছি, মামি হয়ে ভাগনের কাছে ঘোমটা টেনে কলাবউ সাজবে?

এবার মামির ঘোমটা উঠল। দেখলাম, আমার নতুন পাওয়া মামিটি মামারই উপযুক্ত স্ত্রী বটে।

মামি এ-ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিলেন। ঘরে তক্তপোশ, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদির বালাই নেই। একপাশে একটা রং-চটা ট্রাঙ্ক আর একটা কাঠের বাক্সো। দেয়ালে এক কোণ থেকে আর এক কোণ পর্যন্ত একটা দড়ি টাঙানো, তাতে একটি মাত্র ধুতি ঝুলছে। একটা পেরেকে একটা আধ ময়লা খদ্দরের পাঞ্জাবি লটকানো, যতীন মামার সম্পত্তি। গোটা দুই দু-বছর আগেকার ক্যালেন্ডারের ছবি। একটাতে এখনও চৈত্রমাসের তারিখ লেখা কাগজটা লাগানো রয়েছে, ছিঁড়ে ফেলতে বোধ হয় কারও খেয়াল হয়নি।

যতীন মামা বললেন, একটু সুজিটুজি থাকে তো ভাগনেকে করে দাও। না থাকে এক কাপ চাই খাবেখন।

বললাম, কিচ্ছু দরকার নেই যতীন মামা। আপনার বাঁশি শুনতে এসেছি, বাঁশির সুরেই খিদে মিটবে এখন। যদিও খিদে পায়নি মোটেই, বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি।

যতীন মামা বললেন, বাঁশি? বাঁশি তো এখন আমি বাজাই না।

বললাম, সে হবে না, আপনাকে শোনাতেই হবে।

বললেন, তা হলে বসো, রাত্রি হোক। সন্ধ্যার পর ছাড়া আমি বাঁশি ছুঁই না।

বললাম, কেন?

যতীন মামা মাথা নেড়ে বললেন, কেন জানি না ভাগনে, দিনের বেলা বাঁশি বাজাতে পারি না আজ পর্যন্ত কোনোদিন বাজাইনি। হ্যাঁ গা অতসী, বাজিয়েছি?

অতসী মামি মৃদু হেসে বললেন, না।

যেন প্রকাণ্ড একটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেল এমনিভাবে যতীন মামা বললেন, তবে?

বললাম, মোটে পাঁচটা বেজেছে, সন্ধ্যা হবে সাতটায়। এতক্ষণ বসে থেকে কেন আপনাদের অসুবিধা করব, ঘুরে-টুরে সন্ধ্যার পর আসব এখন।

যতীন মামা ইংরেজিতে বললেন, Tut ! Tut ! তারপর বাংলায় যোগ দিলেন, কী যে বল ভাগনে! অসুবিধেটা কী হে অ্যাঁ! পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে অপবাদ দিয়ে, তুমি থাকলে তবু কথা কয়ে বাঁচব।

আমি বললাম, পাড়ার লোকে কী অপবাদ দিয়েছে মামা?

অতসী মামির দিকে চেয়ে যতীন মামা হাসলেন, বলব নাকি ভাগনেকে কথাটা অতসী? পাড়ার লোকে কী বলে জানো ভাগনে? বলে অতসী আমার বিয়ে করা বউ নয় !—চোখের পলকে হাসি মুছে রাগে যতীন মামা গরগর করতে লাগলেন, লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত লোক পাড়ার, ভাগনে! রীতিমতো দলিল আছে বিয়ের, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? যত স—

ত্রস্তভাবে অতসী মামি বললে, কী যা-তা বলছ?

যতীন মামা বললেন, ঠিক ঠিক, ভাগনে নতুন লোক, তাকে এ সব বলা ঠিক হচ্ছে না বটে। ভারী রাগ হয় কিনা! বলে হাসলেন। হঠাৎ বললেন, তোমরা যে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলছ না গো!

মামি মৃদু হেসে বললে, কী কথা বলব?

যতীন মামা বললেন, এই নাও! কী কথা বলবে তাও কি আমায় বলে দিতে হবে নাকি? যা হোক কিছু বলে শুরু কর, গড়গড় করে কথা আপনি এসে যাবে।

মামি বললে, তোমার নামটি কী ভাগনে?

যতীন মামা সশব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামিয়ে বললেন, এইবার ভাগনে, পালটা প্রশ্ন কর, আজ কী রাঁধবে মামি? ব্যস, খাসা আলাপ জমে যাবে। তোমাব আরম্ভটি কিন্তু বেশ অতসী।

মামির মখ লাল হয়ে উঠল।

আমি বললাম, অমন বিশ্রী প্রশ্ন আমি কক্‌খনো করব না মামি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমার নাম সুরেশ।

সতীন মামা বললেন, সুরেশ কিনা সুরের বাজা, তাই সুর শুনতে এত আগ্রহ। নয় ভাগনে?

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইস! ভুবনবাবু যে টাকা দুটো ফেরত দেবে বলেছিল আজ! নিয়ে আসি, দুদিন বাজাব হয়নি। বসো ভাগনে, মামির সঙ্গে গল্প করো, দশ মিনিটেব ভেতর আসছি।

ঘরের বাইবে গিয়ে বললেন, দোবটা দিয়ে যাও অতসী। ভাগনে ছেলেমানুষ, কেউ তোমার লোভে ঘরে ঢুকলে ঠেকাতে পারবে না।

মামিব মুখ আবক্ত হয়ে উঠল এবং সেটা গোপন কবতে চট করে উঠে গেল। বাইরে তার চাপা গলা শুনলাম, কী যে বসিকতা কব, ছি! মামা কী জবাব দিলেন শোনা গেল না।

মামি ঘরে ঢুকে বললে, ওই রকম স্বভাব ওঁব। বাক্‌সে দুটি মোটে টাকা, তাই নিয়ে সেদিন বাজার গেলেন। বললাম, একটা থাক। জবাব দিলেন, কেন? রাস্তায় ভুবনবাবু চাইতে টাকা দুটি তাকে দিয়ে খালি হাতে ঘবে ঢুকলেন।

আমি বললাম, আশ্চর্য লোক তো!

মামি বললে, ওই রকমই। আর দ্যাখো ভাই—

বললাম, ভাই নয়, ভাগনে।

মামি বললে, তাও তো বটে! আগে থাকতেই যে সম্বন্ধটা পাতিয়ে বসে আছ! ওঁব ভাগনে না হয়ে আমার ভাই হলেই বেশ হত কিন্তু। সম্পর্কটা নতুন করে পাতো না? এখনও এক ঘণ্টাও হয়নি, জমাট বাঁধেনি।

আমি বললাম, কেন? মামি-ভাগনে বেশ তো সম্পর্ক!

মামি বললে, আচ্ছা তবে তাই। কিন্তু আমার একটা কথা তোমায় রাখতে হবে ভাগনে। তুমি ওঁর বাঁশি শুনতে চেয়ো না।

বললাম, তার মানে? বাঁশি শুনতেই তো এলাম!

মামির মুখ গম্ভীর হল, বললে, কেন এলে? আমি ডেকেছিলাম? তোমাদের জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেব?

আমি অবাক হয়ে মামির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। কথা জোগায় না।

মামি বললে, তোমাদের একটু শখ মেটাবার জন্য উনি আত্মহত্যা করছেন দেখতে পাও না? রোজ তোমরা একজন না একজন এসে বাঁশি শুনতে চাইবে। রোজ গলা দিয়ে রক্ত পড়লে মানুষ কদিন বাঁচে!

রক্ত!

রক্ত নয়? দেখবে? বলে মামি চলে গেল। ফিরে এল একটা গামলা হাতে করে। গামলার ভেতরে জমাট-বাঁধা খানিকটা রক্ত।

মামি বললে, কাল উঠেছিল, ফেলতে মায়া হচ্ছিল তাই রেখে দিয়েছি। রেখে কোনো লাভ নেই জানি, তবু—

আমি অনুতপ্ত হয়ে বললাম, জানতাম না মামি। জানলে কক্‌খনো শুনতে চাইতাম না। ইস, এই জন্যেই মামার শরীর এত খারাপ?

মামি বললে, কিছু মনে করো না ভাগনে। অন্য কারও সঙ্গে তো কথা কই না, তাই তোমাকেই গায়ের ঝাল মিটিয়ে বলে নিলাম। তোমার আর কী দোষ, আমার অদৃষ্ট!

আমি বললাম, এত রক্ত পড়ে, তবু মামা বাঁশি বাজান?

মামি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ, পৃথিবীর কোনো বাধাই ওঁর বাঁশি বাজানো বন্ধ করতে পারবে না। কত বলেছি, কত কেঁদেছি, শোনেন না।

আমি চুপ করে রইলাম।

মামি বলে চলল, কতদিন ভেবেছি বাঁশি ভেঙে ফেলি, কিন্তু সাহস হয়নি। বাঁশির বদলে মদ খেয়েই নিজেকে শেষ করে ফেলবেন, নয়তো যেখানে যা আছে সব বিক্রি করে বাঁশি কিনে না খেয়ে মরবেন।

মামির শেষ কথাগুলি যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ঘরেব চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমি কথা বলতে গেলাম, কিন্তু ফুটল না।

মামি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, অথচ ওই একটা ছাড়া আমার কোনো কথাই ফেলেন না। আগে আকণ্ঠ মদ খেতেন, বিয়ের পর যেদিন মিনতি করে মদ ছাড়তে বললাম সেইদিন থেকে ও জিনিস ছোঁয়াই ছেড়ে দিলেন। কিন্তু বাঁশির বিষয়ে কোনো কথাই শোনেন না।

আমি বলতে গেলাম, মামি—

মামি বোধ হয় শুনতেই পেল না, বলে চলল, একবার বাঁশি লুকিয়ে রেখেছিলাম, সে কী ছটফট করতে লাগলেন' যেন ওঁর সর্বস্ব হারিয়ে গেছে।

বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। মামি দরজা খুলতে উঠে গেল।

যতীন মামা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, দিলে না টাকা অতসী, বললে পরশু যেতে।

পিছন থেকে মামি বললে, সে আমি আগেই জানি।

যতীন মামা বললেন, দোকানদারটাই বা কী পাজি, একপো সুজি চাইলাম, দিল না। মামার বাড়ি এসে ভাগনেকে দেখছি খালি পেটে ফিরতে হবে।

মামি ম্লান মুখে বললে, সুজি দেয়নি ভালোই করেছে। শুধু জল দিয়ে তো আর সুজি হয় না।

ঘি নেই?

কবে আবার ঘি আনলে তুমি?

তাও তো বটে! বলে যতীন মামা আমার দিকে চেয়ে হাসলেন। দিব্য সপ্রতিভ হাসি।

আমি বললাম, কেন ব্যস্ত হচ্ছেন মামা, খাবারের কিছু দরকার নেই। ভাগনের সঙ্গে অত ভদ্রতা করতে নেই।

মামি বললে, বসো তোমরা, আমি আসছি। বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মামা হেঁকে বললেন, কোথায় গো?

বারান্দা থেকে জবাব এল, আসছি।

মিনিট পনেরো পরে মামি ফিরল। দু হাতে দুখানা রেকাবিতে গোটা চারেক করে রসগোল্লা, আর গোটা দুই সন্দেশ।

যতীন মামা বললেন, কোত্থেকে জোগাড় করলে গো? বলে, একটা রেকাবি টেনে নিয়ে একটা রসগোল্লা মুখে তুললেন।

অন্য রেকাবিটা আমার সামনে রাখতে রাখতে মামি বললে, তা দিয়ে তোমার দরকার কী?

যতীন মামা নিশ্চিন্তভাবে বললেন, কিছু না! যা খিদেটা পেয়েছে; ডাকাতি করেও যদি এনে থাক কিছু দোষ হয়নি। স্বামীর প্রাণ বাঁচাতে সাধ্বী অনেক কিছুই করে।

আমি কুণ্ঠিত হয়ে বলতে গেলাম, কেন মিথ্যে—

বাধা দিয়ে মামি বললে, আবার যদি ওই সব শুরু কর ভাগনে, আমি কেঁদে ফেলব।

আমি নিঃশব্দে খেতে আরম্ভ করলাম।

মামি ও ঘর থেকে দুটো এনামেলের গ্লাসে জল এনে দিলেন।

প্রথম রসগোল্লাটা গিলেই মামা বললেন, ওয়াক্! কী বিশ্রী রসগোল্লা! রইল পড়ে, খেয়ো তুমি, নয় তো ফেলে দিয়ো। দেখি সন্দেশটা কেমন!

সন্দেশ মুখে দিয়ে বললেন, হ্যাঁ এ জিনিসটা ভালো, এটা খাব। বলে সন্দেশ দুটো তুলে নিয়ে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বললেন, যাও তোমার সুজির ঢিপি ফেলে দিয়োখন নর্দমায়।

অতসী মামির চোখ ছলছল করে এল। মামার ছলটুকু আমাদের কারুর কাছেই গোপন রইল না। কেন যে এমন খাসা রসগোল্লাও মামার কাছে সুজির ঢিপি হয়ে গেল বুঝে আমার চোখে প্রায় জল আসবার উপক্রম হল।

মাথা নিচু করে রেকাবিটা শেষ করলাম। মাঝখানে একবার চোখ তুলতেই নজরে পড়ল মামি মামার রেকাবিটা দরজার ওপরে তাকে তুলে রাখছে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলে মামি ঘরে ঘরে প্রদীপ দেখাল, ধুনো দিল। আমাদের ঘরে একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে মামি চুপ করে দাঁড়িয়ে কী যেন ভাবতে লাগল।

যতীন মামা হেসে বললেন, আরে লজ্জা কীসের! নিত্যকার অভ্যাস, বাদ পড়লে রাতে ঘুম হবে না। ভাগনের কাছে লজ্জা করতে নেই।

আমি বললাম, আমি·না হয়—

মামি বললে, বসো, উঠতে হবে না, অত লজ্জা নেই আমার। বলে, গলায় আঁচল দিয়ে মামার পায়ের কাছে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল।

লজ্জায় সুখে তৃপ্তিতে আরক্ত মুখখানি নিয়ে অতসী মামি যখন উঠে দাঁড়াল, আমি বললাম, দাঁড়াও মামি, একটা প্রণাম করে নিই।

মামি বললে, না না ছি ছি—

বললাম, ছি ছি নয় মামি! আমার নিত্যকার অভ্যাস না হতে পারে, কিন্তু তোমায় প্রণাম না করে যদি আজ বাড়ি ফিরি রাত্রে আমার ঘুম হবে না ঠিক। বলে মামির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম।

যতীন মামা হো হো করে হেসে উঠলেন।

মামি বললে, দ্যাখো তো ভাগনের কাণ্ড!

যতীন মামা বললেন, ভক্তি হয়েছে গো! সকালসন্ধ্যা স্বামীকে প্রণাম করো জেনে শ্রদ্ধা হয়েছে ভাগনের।

কী যে বল!—বলে মামি পলায়ন করল। বারান্দা থেকে বলে গেল, আমি রান্না করতে গেলাম।

যতীন মামা বললেন, এইবার বাঁশি শোনো।

আমি বললাম, থাকগে, কাজ নেই মামা। শেষে আবার রক্ত পড়তে আরম্ভ করবে।

যতীন মামা বললেন, তুমিও শেষে ঘ্যানঘ্যান প্যানপ্যান আরম্ভ করলে ভাগনে? রক্ত পড়বে তো হয়েছে কী? তুমি শুনলেও আমি বাজ'ব, না শুনলেও বাজাব। খুশি হয় রান্নাঘরে মামির কাছে বসে কানে আঙুল দিয়ে থাকো গে।

কাঠের বাক্‌সোটা খুলে বাঁশির কাঠের কেসটা বার করলেন। বললেন, বারান্দায় চলো, ঘরে বড়ো শব্দ হয়।

নিজেই বারান্দায় মাদুরটা তুলে এনে বিছিয়ে নিলেন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে বাঁশিটা মুখে তুললেন।

হঠাৎ আমার মনে হল আমার ভেতরে যেন একটা উন্মাদ একটা খ্যাপা উদাসীন ঘুমিয়ে ছিল আজ বাঁশির সুরের নাড়া জেগে উঠল। বাঁশির সুর এসে লাগে কানে কিন্তু আমার মনে হল বুকের তলেও যেন সাড়া পৌঁছেছে। অতি তীব্র বেদনার মধুরতম আত্মপ্রকাশ কেবল বুকের মাঝে গিয়ে পৌঁছায়নি, বাইরের এই ঘরদোরকেও যেন স্পর্শ দিয়ে জীবন্ত করে তুলেছে, আর আকাশকে বাতাসকে মৃদুভাবে স্পর্শ করতে করতে যেন দূরে, বহুদূরে, যেখানে গোটা কয়েক তারা ফুটে উঠেছে দেখতে পাচ্ছি, সেইখানে স্বপ্নের মায়ার মধ্যে লয় পাচ্ছে। অন্তরে ব্যথা বোধ করে আনন্দ পাবাব যতগুলি অনুভূতি আছে বাঁশির সুর যেন তাদের সঙ্গে কোলাকুলি আরম্ভ করেছে।

বাঁশি শুনেছি ঢের। বিশ্বাস হয়নি এই বাঁশি বাজিয়ে একজন একদিন এক কিশোরীর কুল মান লজ্জা ভয় সব ভুলিয়ে দিয়েছিল, যমুনাতে উজান বইয়েছিল। আজ মনে হল, আমার যতীন মামার বাঁশিতে সমগ্র প্রাণ যদি আচমকা জেগে উঠে নিরর্থক এমন ব্যাকুল হয়ে ওঠে, তবে সেই বিশ্ববাঁশির বাদকের পক্ষে ওই দুটি কাজ আর এমন কী কঠিন!

দেখি, মামি কখন এসে নিঃশব্দে ওদিকের বারান্দায় বসে পড়েছে। খুব সম্ভব ওই ঘরটাই রান্নাঘর, কিংবা রান্নাঘরে যাবার পথ ওই ঘরের ভেতব দিয়ে।

যতীন মামাব দিকে চেয়ে দেখলাম, খুব সম্ভব সংজ্ঞা নেই। এ যেন সুরের আত্মভোলা সাধক, সমাধি পেয়ে গেছে।

কতক্ষণ বাঁশি চলেছিল ঠিক মনে নেই, বোধ হয় ঘণ্টা দেড়েক হবে। হঠাৎ এক সময়ে বাঁশি থামিয়ে যতীন মামা ভয়ানক কাশতে আরম্ভ করলেন। বারান্দার ক্ষীণ আলোতেও বুঝতে পারলাম, মামার মুখ চোখ অস্বাভাবিক রকম লাল হয়ে উঠেছে।

অতসী মামি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল, জল আর পাখা নিয়ে ছুটে এল। খানিকটা রক্ত তুলে মামির শুশ্রূষায় যতীন মামা অনেকটা সুস্থ হলেন। মাদুরের ওপর একটা বালিশ পেতে মামি তাঁকে শুইয়ে দিল। পাখা নেড়ে নীরবে হাওয়া করতে লাগল।

তারপর এক সময় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আজ আসি যতীন মামা।

মামা কিছু বলবার আগেই মামি বললে, তুমি এখন কথা কয়ো না। ভাগনের বাড়িতে ভাববে, আজ থাক, আর একদিন এসে খেয়ে যাবে এখন। চলো আমি দরজা দিয়ে আসছি।

সদরের দরজা খুলে বাইরে যাব, মামি আমার একটা হাত চেপে ধরে বললে, একটু দাঁড়াও ভাগনে, সামলে নিই।

প্রদীপের আলোতে দেখলাম, মামির সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। একটু সুস্থ হয়ে বললে, ওঁর রক্ত পড়া দেখলেই আমার এরকম হয়। বাঁশি শুনেও হতে পারে। আচ্ছা এবার এসো ভাগনে, শিগগিব আর একদিন আসবে কিন্তু।

বললাম, মামার বাঁশি ছাড়াতে পাবি কি না একবার চেষ্টা করে দেখব মামি?

মামি ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, পাববে' পারবে তুমি? যদি পাব ভাগনে, শুধু তোমার যতীন মামাকে নয়, আমাকেও প্রাণ দেবে।

অতসী মামি ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

বাস্তায় নেমে বললাম, খিলটা লাগিয়ে দাও মামি।

কেবলই মনে হয়, নেশাকে মানুষ এত বড়ো দাম দেয় কেন। লাভ কী? এই যে যতীন মামা পলে পলে জীবন উৎসর্গ করে সুরের জাল বুনবার নেশায় মেতে যান, মানি তাতে আনন্দ আছে। যে সৃষ্টি করে তাবও, যে শোনে তাবও। কিন্তু এত চড়া মূল্য দিয়ে কী সেই আনন্দ কিনতে হবে? এই যে স্বপ্ন সৃষ্টি, এ তো ক্ষণিকের। যতক্ষণ সৃষ্টি করা যায় শুধু ততক্ষণ এব স্থিতি। তাবপর বাস্তবেব কঠোরতার মাঝে এ স্বপ্নেব চিহ্নও তো খুঁজে পাওয়া যায় না। এ নিরর্থক মায়া সৃষ্টি করে নিজেকে ভোলাবার প্রয়াস কেন? মানুষের মন কী বিচিত্র! আমাবও ইচ্ছে করে যতীন মামাব মতো সুরের আলোয় ভুবন ছেয়ে ফেলে, সুবেব আগুন গগনে বেয়ে তুলে পলে পলে নিজেকে শেষ করে আনি! লাভ নেই? নাই বা বইল।

এতদিন জানতাম, আমিও বাঁশি বাজাতে জানি। বন্ধুরা শুনে প্রশংসাও করে এসেছে। বাঁশি বাজিয়ে আনন্দও যে না পাই তা নয়। কিন্তু যতীন মামার বাঁশি শুনে এসে মনে হল, বাঁশি বাজানো আমার জন্যে নয়। এক একটা কাজ করতে এক একজন লোক জন্মায়, আমি বাঁশি বাজাতে জন্মাইনি। যতীন মামা ছাড়া বাঁশি বাজাবার অধিকাব কারও নেই।

থাকতে পাবে কারও অধিকার। কারও কারও বাঁশি হয়তো যতীন মামার বাঁশিব চেয়েও মনকে উতলা কবে তোলে, আমি তাদের চিনি না।

একদিন বললাম, বাঁশি শিখিয়ে দেবে মামা?

যতীন মামা হেসে বললে, বাঁশি কি শেখাবার জিনিস ভাগনে? ও শিখতে হয়।

তা ঠিক। আর শিখতেও হয় মন দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, সমগ্র সত্তা দিয়ে। নইলে আমার বাঁশি শেখার মতোই সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়ে যায়।

অতসী মামিকে সেদিন বিদায় নেবার সময় যে কথা বলেছিলাম সে কথা ভুলিনি। কিন্তু কী করে যে যতীন মামার বাঁশি ছাড়াব ভেবে পেলাম না। অথচ দিনের পর দিন যতীন মামা যে এই সর্বনাশা নেশায় পলে পলে মরণের দিকে এগিয়ে যাবেন এ কথা ভাবতেও কষ্ট হল। কিন্তু করা যায় কী? মামির প্রতি যতীন মামার যে ভালোবাসা তার বোধ হয় তল নেই, মামির কান্নাই যখন ঠেলেছেন তখন আমার সাধ্য কী তাকে ঠেকিয়ে রাখি!

একদিন বললাম, মামা, আর বাঁশি বাজাবেন না।

যতীন মামা চোখ বড়ো বড়ো করে বললেন, বাঁশি বাজাব না? বল কী ভাগনে? তাহলে বাঁচব কী করে?

বললাম, গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, মামি কত কাঁদে।

তা আমি কি করব? একটু-আধটু কাঁদা ভালো। বলে হাঁকলেন, অতসী! অতসী!

মামি এল।

মামা বললেন, কান্না কী জন্যে শুনি? বাঁশি ছেড়ে দিয়ে আমায় মরতে বল নাকি? তাতে কান্না বাড়বে, কমবে না।

মামি ম্লানমুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

মামা বললেন, জানো ভাগনে, এই অতসীর জ্বালায় আমার বেঁচে থাকা ভার হয়ে উঠেছে। কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলেন, নড়বার নাম নেই। ওর ভার ঘাড়ে না থাকলে বাঁশি বগলে মনের আনন্দে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াতাম। বেড়ানো-টেড়ানো সব মাথায় উঠেছে।

মামি বললে, যাও না বেড়াতে, আমি ধরে রেখেছি?

রাখোনি? বলে মামা এমনিভাবে চাইলেন যেন নিজের চোখে তিনি অতসী মামিকে খুন করতে দেখেছেন আর মামি এখন তাঁর সমুখেই সে কথা অস্বীকার করছে।

মামির চোখে জল এল। অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বললে, অমন কর তো আমি একদিন—

মামা একেবারে জল হয়ে গেলেন। আমার সামনেই মামির হাত ধরে কোঁচার কাপড় দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বললেন, ঠাট্টা করছিলাম, সত্যি বলছি অতসী,—

চট করে হাত ছাড়িয়ে মামি চলে গেল!

আমি বললাম, কেন মিথ্যে চটালেন মামিকে?

যতীন মামা বললেন, চটেনি। লজ্জায় পালাল।

কিন্তু একদিন যতীন মামাকে বাঁশি ছাড়তে হল। মামিই ছাড়াল।

মামির একদিন হঠাৎ টাইফয়েড জ্বর হল।

সেদিন বুঝি জ্বরের সতেরো দিন। সকাল নটা বাজে। মামি ঘুমুচ্ছে, আমি তার মাথায় আইসব্যাগটা চেপে ধরে আছি। যতীন মামা একটু টুলে বসে ম্লানমুখে চেয়ে আছেন। রাত্রি জেগে তাঁর শরীর আরও শীর্ণ হয়ে গেছে, চোখ দুটি লাল হয়ে উঠেছে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চুল উশকোখুশকো।

হঠাৎ টুল ছেড়ে উঠে মামা ট্রাঙ্কটা খুলে বাঁশিটা বার করলেন। আজ সতেরো দিন এটা বাক্সেই বন্ধ ছিল।

সবিস্ময়ে বললাম, বাঁশি কী হবে মামা?

ছেঁড়া পাম্পশুতে পা ঢুকোতে ঢুকোতে মামা বললেন, বেচে দিয়ে আসব।

তার মানে?

যতীন মামা ম্লান হাসি হেসে বললেন, তার মানে ডাক্তার বোসকে আর একটা কল দিতে হবে।

বললাম, বাঁশি থাক, আমার কাছে টাকা আছে।

প্রত্যুত্তরে শুধু একটু হেসে যতীন মামা পেরেকে টাঙানো জামাটা টেনে নিলেন।

যদি দরকার পড়ে ভেবে পকেটে কিছু টাকা এনেছিলাম। মিথ্যা চেষ্টা। আমার মেজো মামা কতবার কত বিপদে যতীন মামাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছেন, যতীন মামা একটি পয়সা নেননি। বললাম, কোথাও যেতে হবে না মামা, আমি কিনব বাঁশি।

মামা ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, তুমি কিনবে ভাগনে? বেশ তো!

বললাম, কত দাম?

বললেন, একশো পঁয়ত্রিশে কিনেছি, একশো টাকায় দেব। বাঁশি ঠিক আছে, কেবল সেকেন্ড হ্যান্ড এই যা।

বললাম, আপনি না সেদিন বলছিলেন মামা, এ রকম বাঁশি খুঁজে পাওয়া দায়, অনেক বেছে আপনি কিনেছেন? আমি একশো পঁয়ত্রিশ দিয়েই ওটা কিনব।

যতীন মামা বললেন, তা কি হয়! পুরনো জিনিস—

বললাম, আমাকে কি জোচ্চোর পেলেন মামা? আপনাকে ঠকিয়ে কম দামে বাঁশি কিনব?

পকেটে দশ টাকার তিনটে নোট ছিল, বার করে মামার হাতে দিয়ে বললাম, ত্রিশ টাকা আগাম নিন, বাকি টাকাটা বিকেলে নিয়ে আসব।

যতীন মামা কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে নোটগুলিব দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, আচ্ছা!

আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যতীন মামার মুখের ভাবটা দেখবার সাধ্য হল না।

যতীন মামা ডাকলেন, ভাগনে—

ফিরে তাকালাম।

যতীন মামা হাসবার চেষ্টা কবে বললেন, খুব বেশি কষ্ট হচ্ছে ভেব না, বুঝলে ভাগনে?

আমার চোখে জল এল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে মামির শিয়বে গিয়ে বসলাম।

মামির ঘুম ভাঙেনি, জানতেও পারল না যে রক্তপিপাসু বাঁশিটা ঝলকে ঝলকে মামার রক্ত পান করেছে, আমি আজ সেই বাঁশিটা কিনে নিলাম।

মনে মনে বললাম, মিথ্যে আশা। এ যে বালির বাঁধ! একটা বাঁশি গেল, আর একটা কিনতে কতক্ষণ? লাভের মধ্যে যতীন মামা একান্ত প্রিয়বস্তু হাতছাড়া হয়ে যাবার বেদনাটাই পেলেন।

বিকালে বাকি টাকা এনে দিতেই যতীন মামা বললেন, বাড়ি যাবার সময় বাঁশিটা নিয়ে যেও।

আমি ঘবে ঢুকতে ঢুকতে বললাম, থাক না এখন কদিন, এত তাড়াতাড়ি কীসের?

যতীন মামা বললেন, না। পরের জিনিস আমি বাড়িতে বাখি না। বুঝলাম, পরের হাতে চলে যাওয়া বাঁশিটা চোখেব ওপরে থাকা তাঁর সহ্য হবে না।

বললাম, বেশ মামা, তাই নিয়ে যাবখন।

মামা ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ, নিয়েই যেও। তোমাব জিনিস এখানে কেন ফেলে রাখবে। বুঝলে না?

উনিশ দিনেব দিন মামির অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল।

যতীন মামা টুলটা বিছানাব কাছে টেনে টেনে মামির একটা হাত মুঠো করে ধরে নীরবে তার বোগশীর্ণ ঝরা ফুলের মতো ম্লান মুখের দিকে চেয়েছিলেন. হঠাৎ অতসী মামি বললে, ওগো আমি বোধ হয় আর বাঁচব না।

যতীন মামা বললেন, তা কি হয় অতসী, তোমায বাঁচতে হবেই। তুমি না বাঁচলে আমিও যে বাঁচব না?

মামি বললে, বালাই, বাঁচবে বইকী। দ্যাখো, আমি যদি নাই বাঁচি, আমার একটা কথা রাখবে?

যতীন মামা নত হয়ে বললেন, রাখব। বলো।

বাঁশি বাজানো ছেড়ে দিয়ো। তিলতিল করে তোমার শরীর ক্ষয় হচ্ছে দেখে ওপারে গিয়েও আমার শান্তি থাকবে না। রাখবে আমার কথা?

মামা বললেন, তাই হবে অতসী। তুমি ভালো হয়ে ওঠো। আমি আর বাঁশি ছোঁব না।

মামির শীর্ণ ঠোঁটে সুখের হাসি ফুটে উঠল। মামার একটা হাত বুকের ওপর টেনে শ্রান্তভাবে মামি চোখ বুজল।

আমি বুঝলাম যতীন মামা আজ তাঁর রোগশয্যাগতা অতসীর জন্য কত বড়ো একটা ত্যাগ করলেন। অতি মৃদুস্বরে উচ্চারিত ওই কটি কথা, তুমি ভালো হয়ে ওঠো, আমি আর বাঁশি ছোঁব না,

অন্যে না বুঝুক আমি তো যতীন মামাকে চিনি, আমি জানি, অতসী মামিও জানে ওই কথা কটির পেছনে কতখানি জোর আছে! বাঁশি বাজাবার জন্য মন উন্মাদ হয়ে উঠলেও যতীন মামা আর বাঁশি ছোঁবেন না।

শেষ পর্যন্ত মামি ভালো হয়ে উঠল। যতীন মামার মুখে হাসি ফুটল। মামি যেদিন পথ্য পেল সেদিন হেসে মামা বললেন, কী গো, বাঁচবে না বলে? অমনি মুখের কথা কি না! যে চাঁড়াল খুড়োব কাছ থেকেই তোমায় ছিনিয়ে এনেছি, যম ব্যাটা তো ভালোমানুষ।

আমি বললাম, চাঁড়াল খুড়ো আবার কী মামা?

মামা বললেন, তুমি জান না বুঝি? সে এক দ্বিতীয় মহাভারত।

মামি বললে, গুরুনিন্দা কোরো না।

মামা বললেন, গুরুনিন্দা কী? গুরুতর নিন্দা করব। ভাগনেকে দেখাও না। অতসী তোমার পিঠের দাগটা।

মামির বাধা দেওয়া সত্ত্বেও মামা ইতিহাসটা শুনিয়ে দিলেন। নিজের খুড়ো নয়, বাপের পিসতুতো ভাই। মা বাবাকে হারিয়ে সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত ওই খুড়োর কাছেই অতসী মামি ছিল। অত বড়ো মেয়ে, তাকে কিলচড় লাগাতে খুড়োটির বাধত না, আনুষঙ্গিক অন্য সব তো ছিলই। খুড়োর মেজাজের একটি অক্ষয় চিহ্ন আজ পর্যন্ত মামির পিঠে আছে। পাশের বাড়িতেই যতীন মামা বাঁশি বাজাতেন আর আকণ্ঠ মদ খেতেন। প্রায়ই খুড়োর গর্জন আর অনেক রাতে মামির চাপা কান্নার শব্দে তাঁর নেশা ছুটে যেত। নিতান্ত চটে একদিন মেয়েটাকে নিয়ে পলায়ন করলেন এবং বিয়ে করে ফেললেন।

মামার ইতিহাস বলা শেষ হলে অতসী মামি ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, তখন কি জানি মদ খায়! তাহলে কক্‌খনো আসতাম না।

মামা বললেন, তখন কী জানি তুমি মাথার রতন হয়ে আঠার মতো লেপটে থাকবে! তাহলে কক্‌খনো উদ্ধার করতাম না। আর মদ না খেলে কি এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে মেয়ে চুরি করার মতো বিশ্রী কাজটা করতে পারতাম গো! আমি ভেবেছিলাম, বছরখানেক—

মামি বললে, যাও, চুপ করো। ভাগনের সামনে যা তা বকো না।

মামা হেসে চুপ করলেন।

মাস দুই পরের কথা।

কলেজ থেকে সটান যতীন মামার ওখানে হাজির হলাম। দেখি, জিনিসপত্র যা ছিল বাঁধাছাঁদা হয়ে পড়ে আছে।

অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম, এ সব কী মামা?

যতীন মামা সংক্ষেপে বললেন, দেশে যাচ্ছি।

দেশে? দেশ আবার আপনার কোথায়?

যতীন মামা বললেন, আমার কী একটা দেশও নেই ভাগনে? পাঁচশো টাকা আয়ের জমিদারি আছে দেশে, খবর রাখ?

অতসী মামি বললে, হয়তো জন্মের মতোই তোমাদের ছেড়ে চললাম ভাগনে। আমার অসুখের জন্যই এটা হল।

বললাম, তোমার অসুখের জন্য? তার মানে?

মামা বললেন, তার মানে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছি। যিনি কিনেছেন পাশের বাড়িতেই থাকেন, মাঝখানের প্রাচীরটা ভেঙে দুটো বাড়ি এক করে নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

আমি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম, এত কাণ্ড করলে মামা, আমাকে একবার জানালে না পর্যন্ত! কবে যাওয়া ঠিক হল?

বাঁধা বিছানা আর তালাবন্ধ বাক্‌সের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামা বললেন, আজ। রাত্রে ঢাকা মেলে রওনা হব। আমরা বাঙাল হে ভাগনে, জানো না বুঝি? বলে মামা হাসলেন। অবাক মানুষ! এমন অবস্থায় হাসিও আসে!

গম্ভীরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা, আসি যতীন মামা, আসি মামি। বলে দরজার দিকে অগ্রসর হলাম।

অতসী মামি উঠে এসে আমার হাতটা চেপে ধরে বললে, লক্ষ্মী ভাগনে, রাগ কোরো না। আগে থাকতে তোমায় খবর দিয়ে লাভ তো কিছু ছিল না, কেবল মনে ব্যথা পেতে। যে ভাগনে তুমি, কত কী হাঙ্গামা বাধিয়ে তুলতে ঠিক আছে কিছু?

আমি ফিরে গিয়ে বাঁধা বিছানাটার ওপর বসে বললাম, আজ যদি না আসতাম, একটা খবরও তো পেতাম না। কাল এসে দেখতাম, বাড়িঘর খাঁখাঁ করছে।

যতীন মামা বললেন, আরে রামঃ! তোমায় না বলে কি যেতে পারি? দুপুরবেলা সেনের ডাক্তারখানা থেকে ফোন করে দিয়েছিলাম তোমাদের বাড়িতে। কলেজ থেকে বাড়ি ফিরলেই খবর পেতে।

বাড়ি আর গেলাম না। শিয়ালদহ স্টেশনে মামা-মামিকে উঠিয়ে দিতে গেলাম। গাড়ি ছাড়ার আগে কতক্ষণ সময় যে কী করেই কাটল! কারও মুখেই কথা নেই। যতীন মামা কেবল মাঝে মাঝে দু-একটা হাসির কথা বলছিলেন এবং হাসাচ্ছিলেনও। কিন্তু তাঁর বুকের ভেতর যে কী করছিল সে খবর আমার অজ্ঞাত থাকেনি।

গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা বাজলে যতীন মামা আর অতসী মামিকে প্রণাম করে গাড়ি থেকে নামলাম। এইবার যতীন মামা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আর বোধ হয় মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না।

জানালা দিয়ে মুখ বার করে মামি ডাকলে, শোনো। কাছে গেলাম। মামি বললে, তোমাকে ভাগনে বলি আর যাই বলি, মনে মনে জানি তুমি আমার ছোটো ভাই। পার তো একবার বেড়াতে গিয়ে দেখা দিয়ে এসো। আমাদের হয়তো আর কলকাতা আসা হবে না, জমির ভাবী ক্ষতি হয়ে গেছে। যেও, কেমন ভাগনে?

মামির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ল। ঘাড় নেড়ে জানালাম, যাব।

বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। যতক্ষণ গাড়ি দেখা গেল অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দূরের লাল সবুজ আলোকবিন্দুর ওপারে যখন একটি চলন্ত লাল বিন্দু অদৃশ্য হয়ে গেল তখন ফিরলাম। চোখের জলে দৃষ্টি তখন ঝাপসা হয়ে গেছে।

মানুষের স্বভাবই এই যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সকলের বড়ো করে দেখে। নইলে কে ভেবেছিল, যে যতীন মামা আর অতসী মামির বিচ্ছেদে একুশ বছর বয়সে আমার দুচোখ জলে ভরে গিয়েছিল সেই যতীন মামা আর অতসী মামি একদিন আমার মনের এক কোণে সংসারের সহস্র আবর্জনার তলে চাপা পড়ে যাবেন।

জীবনে অনেকগুলি ওলট-পালট হয়ে গেল। যথাসময়ে ভাগ্য আমার ঘাড় ধরে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। নানা কারণে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল। বালিগঞ্জের বাড়িটা পর্যন্ত বিক্রি করে ঋণ শোধ দিয়ে আশি টাকা মাইনের একটা চাকরি

নিয়ে শ্যামবাজার অঞ্চলে ছোটো একটা বাড়ি ভাড়া করে উঠে গেলাম। মার কাঁদাকাটায় গলে একটা বিয়েও করে ফেললাম।

প্রথম সমস্ত পৃথিবীটাই যেন তেতো লাগতে লাগল, জীবনটা বিস্বাদ হয়ে গেল, আশা-আনন্দের এতটুকু আলোড়নও ভেতরে খুঁজে পেলাম না।

তারপর ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে গেল। নতুন জীবনে রসের খোঁজ পেলাম। জীবনের জুয়াখেলায় হারজিতের কথা কদিন আর মানুষ বুকে পুষে রাখতে পারে?

জীবনে যখন এই সব বড়ো বড়ো ঘটনা ঘটছে তখন নিজেকে নিয়ে আমি এমনি ব্যাপৃত হয়ে পড়লাম যে কবে এক যতীন মামা আর অতসী মামির স্নেহ পরমসম্পদ বলে গ্রহণ করেছিলাম সে কথা মনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে গেল। সাত বছর পরে আজ ক্কচিৎ কখনও হয়তো একটা অস্পষ্ট স্মৃতির মতো তাদের কথা মনে পড়ে।

মাঝে একবার মনে পড়েছিল, যতীন মামাদের দেশে চলে যাওয়ার বছব তিনেক পরে। সেইবাব ঢাকা মেলে কলিশন হয়। মৃতদের নামের মাঝে যতীন্দ্রনাথ রায় নামটা দেখে যে খুব একটা ঘা লেগেছিল সে কথা আজও মনে আছে। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব, কিন্তু হয়নি। সেদিন আপিস থেকে ফিরে দেখি আমার স্ত্রীর কঠিন অসুখ। মনে পড়ে যতীন মামার দেশের ঠিকানায় একটা পত্র লিখে দিয়ে এই ভেবে মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম, ও নিশ্চয় আমার যতীন মামা নয়। পৃথিবীতে যতীন্দ্রনাথ রায়ের অভাব তো নেই। সে চিঠির কোনো জবাব আসেনি। স্ত্রীর অসুখের হিড়িকে কথাটাও আমার মন থেকে মুছে গিয়েছিল।

তারপর গড়িয়ে গড়িয়ে আরও চারটে বছব কেটে গেছে।

আমার ছোটো বোন বীণাব বিয়ে হয়েছিল ঢাকায়।

পুজোর সময় বীণাকে তারা পাঠালে না। অগ্রহায়ণ মাসে বীণাকে আনতে ঢাকা গেলাম। কিন্তু আনা হল না। গিয়েই দেখি বীণার শাশুড়ির খুব অসুখ। আমি যাবার আগের দিন হু হু করে জ্বর এসেছে। ডাক্তার আশঙ্কা করছেন নিউমোনিয়া।

ছুটি ছিল না, ক্ষুণ্ণ হয়ে একাই ফিরলাম। গোয়ালন্দে স্টিমার থেকে নেমে ট্রেনের একটা ইন্টারে ভিড় কম দেখে উঠে পড়লাম। দুটি মাত্র ভদ্রলোক, এক-কোণে র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া একটি স্ত্রীলোক, খুব সম্ভব এঁদের একজনের স্ত্রী, জিনিসপত্রের একান্ত অভাব। খুশি হয়ে একটা বেঞ্চিতে কম্বলের ওপর চাদর বিছিয়ে বিছানা করলাম। বালিশ ঠেসান দিয়ে আরাম করে বসে, পা দুটো কম্বল দিয়ে ঢেকে একটা ইংরেজি মাসিকপত্র বার করে ওপেনহেমের ডিটেকটিভ গল্পে মনঃসংযোগ করলাম।

যথাসময়ে গাড়ি ছাড়ল এবং পরের স্টেশনে থামল। আবার চলল। এটা ঢাকা মেল বটে, কিন্তু পোড়াদ পর্যন্ত প্রত্যেক স্টেশনে থেমে থেমে প্যাসেঞ্জার হিসাবেই চলে। পোড়াদ-র পর ছোটোখাটো স্টেশনগুলি বাদ দেয় এবং গতিও কিছু বাড়ায়।

গোয়ালন্দের পর গোটা তিনেক স্টেশন পার হয়ে একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতে ভদ্রলোক দুটি জিনিসপত্র নিয়ে নেমে গেলেন। স্ত্রীলোকটি কিন্তু তেমনিভাবে বসে রইলেন।

ব্যাপার কী? একে ফেলেই দেখছি সব নেমে গেলেন। এমন অন্যমনস্কও তো কখনও দেখিনি! ছোটোখাটো জিনিসই মানুষের ভুল হয়, একটা আস্ত মানুষ, তাও আবার একজনের অর্ধাঙ্গ, তাকে আবার কেউ ভুল করে ফেলে যায় নাকি?

জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম পিছনে দৃক্‌পাত-মাত্র না করে তাঁরা স্টেশনের গেট পার হচ্ছেন। হয়তো ভেবেছেন, চিরদিনের মতো আজও স্ত্রীটি তার পিছু পিছু চলেছে।

চেঁচিয়ে ডাকলাম ও মশায়—মশায় শুনছেন?

গেটের ওপারে ভদ্রলোক দুটি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাঁশি বাজিয়ে গাড়িও ছাড়ল।

অগত্যা নিজের জায়গায় বসে পড়ে ভাবলাম, তবে কি ইনি একাই চলেছেন নাকি? বাঙালির মেয়ে নিশ্চয়ই, র‍্যাপার দিয়ে নিজেকে ঢাকবার কায়দা দেখেই সেটা বোঝা যায়। বাঙালির মেয়ে, এই রাত্রিবেলা নিঃসঙ্গ যাচ্ছে, তাও আবার পুরুষদের গাড়িতে!

একটু ভেবে বললাম, দেখুন, শুনছেন?

সাড়া নেই।

বললাম, আপনার সঙ্গীরা সব নেমে গেছে, শুনছেন?

এইবার আলোয়ানের পোঁটলা নড়ল, এবং আলোয়ান ও ঘোমটা সরে গিয়ে যে মুখখানা বার হল দেখেই আমি চমকে উঠলাম।

কিছু নেই, সে মুখের কিছুই এতে নেই। আমার অতসী মামির মুখের সঙ্গে এ মুখের অনেক তফাত। কিন্তু তবু আমার মনে হল, এ আমার অতসী মামিই!

মৃদু হেসে বললে, গলা শুনেই মনে হয়েছিল এ আমার ভাগনের গলা। কিন্তু অতটা আশা করতে পারিনি। মুখ বার করতে ভয় হচ্ছিল, পাছে আশা ভেঙে যায়।

আমি সবিস্ময়ে বলে উঠলাম, অতসী মামি!

মামি বললে, খুব বদলে গেছি, না?

মামির সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কাপড়ে পাড়ের চিহ্নও খুঁজে পেলাম না।

চার বছর আগে ঢাকা-মেল কলিশনে মৃতদের তালিকায় একটা অতি পরিচিত নামের কথা মনে পড়ল। যতীন মামা তবে সত্যিই নেই।

আস্তে আস্তে বললাম, খবরের কাগজে মামার নাম দেখেছিলাম মামি, বিশ্বাস হয়নি সে আমার যতীন মামা। একটা চিঠি লিখেছিলাম, পাওনি?

মামি বললে, না। তারপরেই আমি ওখান থেকে দু-তিন মাসের জন্য চলে যাই।

বললাম, কোথায়?

আমার এক দিদির কাছে। দূর সম্পর্কের অবশ্য।

আমায় কেন একটা খবর দিলে না মামি?

মামি চুপ করে রইল।

ভাগনের কথা বুঝি মনে ছিল না?

মামি বললে, তা নয়, কিন্তু খবর দিয়ে আর কী হত! যা হবার তা তো হয়েই গেল। বাঁশিকে ঠেকিয়ে রাখলাম, কিন্তু নিয়তিকে তো ঠেকাতে পারলাম না। তোমার মেজোমামার কাছে তোমার কথাও সব শুনলাম, আমার দুর্ভাগ্য নিয়ে তোমায় আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে হল না। জানি তো, একটা খবর দিলেই তুমি ছুটে আসবে!

চুপ করে রইলাম। বলবার কী আছে। কী নিয়েই বা অভিমান করব? খবরের কাগজে যতীন মামার নাম পড়ে একটা চিঠি লিখেই তো আমার কর্তব্য শেষ করেছিলাম।

মামি বললে, কী করছ এখন ভাগনে?

চাকরি। এখন তুমি যাচ্ছ কোথায়?

মামি বললে, একটু পরেই বুঝবে। ছেলেপিলে কটি?

আশ্চর্য! জগতে এত প্রশ্ন থাকতে এই প্রশ্নটাই সকলের আগে মামির মনে জেগে উঠল!

বললাম, একটি ছেলে।

ভারী ইচ্ছে করছে আমার ভাগনের খোকাকে দেখে আসতে। দেখাবে একবার? কার মতো হয়েছে? তোমার মতো, না তার মার মতো? কত বড়ো হয়েছে?

বললাম, তিন বছর চলছে। চলো না আমাদের বাড়ি মামি, বাকি প্রশ্নগুলির জবাব নিজের চোখেই দেখে আসবে?

মামি হেসে বললে, গিয়ে যদি আর না নড়ি?

বললাম, তেমন ভাগ্য কি হবে! কিন্তু সত্যি কোথায় চলেছ মামি? এখন থাক কোথায়?

মামি বললে, থাকি দেশেই। কোথায় যাচ্ছি, একটু পরে বুঝবে। ভালো কথা, সেই বাঁশিটা কী হল ভাগনে?

এইখানে আছে।

এইখানে? এই গাড়িতে?

বললাম, হুঁ। আমার ছোটো বোন বীণাকে আনতে গিয়েছিলাম, সে লিখেছিল বাঁশিটা নিয়ে যেতে। সবাই নাকি শুনতে চেয়েছিল।

মামি বললে, তুমি বাজাতে জান নাকি? বার করো না বাঁশিটা?—

ওপর থেকে বাঁশির কেসটা পাড়লাম। বাঁশিটা বার করতেই মামি ব্যগ্র হাতে টেনে নিয়ে এক দৃষ্টিতে সেটার দিকে চেয়ে রইল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, বিয়ের পর এটাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলাম, মাঝখানে এর চেয়ে বড়ো শত্রু আমার ছিল না, আজ আবার এটাকে বন্ধু মনে হচ্ছে। শেষ তিনটা বছর বাঁশিটার জন্য ছটফট করে কাটিয়েছিলেন। আজ মনে হচ্ছে বাঁশি বাজানো ছাড়তে না বললেই হয়তো ভালো হত। বাঁশির ভেতর দিয়ে মরণকে বরণ করলে তবু শান্তিতে যেতে পারতেন। শেষ কটা বছর এত মনঃকষ্ট ভোগ করতে হত না।

বাঁশির অংশগুলি লাগিয়ে মামি মুখে তুলল। পরক্ষণে ট্রেনের ঝমঝমানি ছাপিয়ে চমৎকার বাঁশি বেজে উঠল। পাকা গুণীর হাতের স্পর্শ পেয়ে বাঁশি যেন প্রাণ পেয়ে অপূর্ব বেদনাময় সুরের জাল বুনে চলল।

আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ তো অল্প সাধনার কাজ নয়। যার তার হাতে বাঁশি তো এমন অপূর্ব কান্না কাঁদে না। মামির চক্ষু ধীরে ধীরে নিমীলিত হয়ে গেল। তার দিকে চেয়ে ভবানীপুরের একটা অতি ক্ষুদ্র বাড়ির প্রদীপের স্বল্পালোকে বারান্দার দেয়ালে ঠেস দেওয়া এক সুর-সাধকের মূর্তি আমার মনে জেগে উঠল।

মাঝে সাতটা বছর কেটে গেছে। যতীন মামার যে অপূর্ব বাঁশির সুর একদিন শুনেছিলাম, সে সুর মনের তলে কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ অতসী মামির বাঁশি শুনে মনে হতে লাগল সেই হারিয়ে-যাওয়া সুরগুলি যেন ফিরে এসে আমার প্রাণে মৃদুগুঞ্জন শুরু করে দিয়েছে।

এক সময়ে বাঁশি থেমে গেল। মামির একটা দীর্ঘনিশ্বাস ঝরে পড়ল। আমারও।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললাম, এ কথাটাও তো গোপন রেখেছিলে!

মামি বললে, বিয়ের পর শিখিয়েছিলেন। বাঁশি শিখবার কী আগ্রহই তখন আমার ছিল! তারপর যেদিন বুঝলাম বাঁশি আমার শত্রু সেইদিন থেকে আর ছুঁইনি। আজ কতকাল পরে বাজালাম। মনে হয়েছিল, বুঝি ভুলে গেছি!

ট্রেন এসে একটা স্টেশনে দাঁড়াল। মামি জানালা দিয়ে মুখ বার করে আলোর গায়ে লেখা স্টেশনের নামটা পড়ে ভেতরে মুখ ঢুকিয়ে বললে, পরের স্টেশনে আমি নেমে যাব ভাগনে।

পরের স্টেশনে! কেন?

মামি বললে, আজ কত তারিখ, জান?

বললাম, সতেরোই অঘ্রান।

মামি বললে, চার বছর আগে আজকের দিনে—বুঝতে পারছ না তুমি?

মুহূর্তে সব দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে গেল। ঠিক! চার বছর আগে এই সতেরোই অঘ্রান ঢাকা মেলে কলিশন হয়েছিল। সেদিনও এমনি সময়ে এই ঢাকা মেলটির মতো সেই গাড়িটা শত শত নিশ্চিন্ত আরোহীকে পলে পলে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।

বলে উঠলাম, মামি!

মামি স্থিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললে, সামনের স্টেশনের অল্প ওদিকে লাইনেব ধারে কঠিন মাটির ওপর তিনি মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করেছিলেন। প্রত্যেক বছর আজকের দিনটিতে আমি ওই তীর্থদর্শন করতে যাই। আমার কাছে আর কোনো তীর্থের এতটুকু মূল্য নেই।

হঠাৎ জানালার কাছে সরে গিয়ে বাইরের দিকে আঙুল বাড়িয়ে মামি বলে উঠল, ওই ওই ওইখানে! দেখতে পাচ্ছ না? আমি তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তিনি যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে একটু স্নেহশীতল স্পর্শের জন্য ব্যগ্র হয়ে রয়েছেন। একটু জল, একটু জলের জন্যেই হয় তো!—উঃ মাগো, আমি তখন কোথায়!

দু-হাতে মুখ ঢেকে মামি ভেতরে এসে বসে পড়ল।

ধীরে ধীরে গাড়িখানা স্টেশনের ভেতর ঢুকল।

বিছানাটা গুটিয়ে নিয়ে আমি বললাম, চলো মামি, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মামি বললে, না।

বললাম, এই রাত্রে তোমাকে একলা যেতে দিতে পারব না মামি।

মামির চোখ জ্বলে উঠল, ছিঃ! তোমার তো বুদ্ধির অভাব নেই ভাগনে। আমি কি সঙ্গী নিয়ে সেখানে যেতে পারি? সেই নির্জন মাঠে সমস্ত রাত আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি, সেখানে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়! ওইখানের বাতাসে যে তাঁর শেষ নিশ্বাস রয়েছে! অবুঝ হয়ো না—

গাড়ি দাঁড়াল।

বাঁশিটা তুলে নিয়ে মামি বললে, এটা নিয়ে গেলাম ভাগনে! এটার ওপর তোমার চেয়ে আমার দাবি বেশি।

দরজা খুলে অতসী মামি নেমে গেলেন। আমি নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলাম।

আবার বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি ছাড়ল। খোলা দরজাটা একটা করুণ শব্দ করে আছড়ে বন্ধ হয়ে গেল।

নেকি

পূর্ববঙ্গের মহকুমা শহর।

শহর সন্দেহ নেই, তবে বিশুদ্ধ নয়। গ্রামের খাদ আছে। চারিদিক ঘুরে এলে মনে হয় এ যেন শহর আর গ্রামেব আলিঙ্গনবদ্ধ মূর্তি।

বাজার আর আপিস অঞ্চলটুকু দিব্যি শহর। আপটুডেট বাজার,—কলকাতার কোনো নতুন ফ্যান্সি জিনিস উঠলে এক মাসের ভেতরে স্থানীয় মনিহারি দোকানগুলিতে আত্মপ্রকাশ করে। একটি মাত্র বাঁধানো রাস্তা, মাইলখানেক লম্বা,—বাজারের বুক ভেদ করে, আদালতের গা ঘেঁষে গিয়ে মাটির রাস্তায় আত্মগোপন করেছে। বাজারের কাছে ছোটো ছোটো কয়েকটা শাখাও আছে।

বাজারেব কিছু দূরে পাকা রাস্তার ধারে একটি হাইস্কুল। কাছাকাছি পাবলিক লাইব্রেরি, টাউন হল, অফিসারদের ক্লাব, ক্লাব সংলগ্ন টেনিসকোর্ট ইত্যাদি। অভাব নেই কিছুরই। শহর যেমন হয় আর কি।

বাকিটুকু কিন্তু গ্রামছাড়া কিছু নয়। বাড়িঘর সবই প্রায় চাঁচের বেড়া এবং টিনের ছাদ দেওয়া। কোনো কোনোটার ভিটেটুকু মাত্র পাকা বাঁধানো। শুধু তাই নয়, গ্রামের যা প্রধান প্রধান লক্ষণ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আমকাঁঠালের বাগান পুকুর-ডোবা ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল বেতবন থেকে আরম্ভ করে সাপ, ব্যাঙ, শিয়াল, বেজি এবং টিকটিকির রাজসংস্করণ গোসাপ পর্যন্ত সমস্তই আছে।

শহরের পশ্চিমপ্রান্তে আগাগোড়া চুনকাম-করা একটি পাকা বাড়ি। বাড়িটা বরাবব স্থানীয় প্রথম মুনসেফ দখল করে থাকেন। এখন আছেন হেমন্ত মুখার্জি।

বাড়িটির পিছনে প্রকাণ্ড এক আমবাগান, তারই একদিকে ডোবাসংস্করণ একটি পুকুব। এ গল্পের আরম্ভ ওইখানে, একদিন বেলা প্রায় দশটার সময়।

ষোলো-সতেরো বছরের একটি মেয়ে স্নান করছিল। পুকুরের চারিদিকে প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া গাছপালার প্রাচীর। এত ঘন যে আট-দশহাতের ভেতরে এলেও বুঝতে পাবা যায় না এখানে পুকুর আছে। আশেপাশে বাড়িঘরও বেশি নেই,—একান্ত নির্জন। মেয়েটির শঙ্কা ছিল না, নিত্যকার মতো সমস্ত পুকুরটা সাঁতরে এসে নিশ্চিন্তচিত্তে অঙ্গমার্জনা করছিল। হঠাৎ ওপারে নজর পড়তে দেখল, বছর বাইশ তেইশের একটি ছেলে, চোখে সোনার চশমা, একটা আমগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে।

ত্রস্তভাবে নিজেকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে দিয়ে মেয়েটি সংযত হয়ে নিল। জড়োসড়ো হয়ে তেমনিভাবে গলা পর্যন্ত জলে ডুবে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, ভদ্রলোকের ছেলে, সরে যাবে।

ছেলেটির কিন্তু নড়বার লক্ষণ দেখা গেল না। তেমনিভাবেই দাঁড়িয়ে রইল।

রাগে বিরক্তিতে মেয়েটি ঠোঁট কামড়ে ধরল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে জল থেকে উঠে এল। তাবপর ধীরেপদে ছেলেটির কাছে এগিয়ে গেল।

ছেলেটি নিবিষ্টচিত্তে গাছের উপর কী দেখছিল, যেন পৃথিবীর আর কোনো দিকে তার লক্ষ নেই!

রাগে গা জ্বলে গেল। তিক্তস্বরে মেয়েটি বললে, দেখুন—

ছেলেটি চমকে তার দিকে তাকাল।

মেয়েটি বললে, এত দূর থেকে দেখতে আপনার বোধ হয় অসুবিধা হচ্ছে, ঘাটের পাড়েই চলুন না? আমার স্নানের এখনও বাকি আছে।

আমায় বলছেন?

দ্বিতীয় ব্যক্তি তো কাবুকে দেখছি না এখানে। আপনি ভদ্রলোকেব ছেলে, আপনাব যদি এ রকম প্রবৃত্তি—রাগে দুঃখে মেয়েটির কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে গেল।

ছেলেটি অকৃত্রিম বিস্ময়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

মেয়েটি আবাব বললে, আর একদিন আপনি উঁকি মারছিলেন, কিছু বলিনি, কিন্তু এ আপনার কোন দেশি ভদ্রতা? আপনার বাধে না, কিন্তু আমরা লজ্জায় মরে যাই। মানুষকে এত নীচ ভাবতেও যে কষ্ট হয়!

বিবর্ণ মুখে ছেলেটি বললে, এ সব আপনি কী বলছেন? আমি—

ন্যাকামি! ছেলেটিব মুখ দেখে মন একটু নরম হয়েছিল, এই ন্যাকামিতে আবার কঠিন হযে গেল। কটুকণ্ঠে বললে, অন্যায় বলেছি। দুচোখ বড়ো বড়ো করে দেখুন, আপনাকে আমি লজ্জা করব না। স্নানের সময় গোরু মহিষও তো মাঝে মাঝে জল খেতে আসে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল। পেছনে ব্যাকুল কণ্ঠ শোনা গেল, দাঁড়ান।

মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল।

আমায় বিশ্বাস করুন, আপনি স্নান করছিলেন আমি তো দেখিনি। আর একদিনেব কথা বললেন, কিন্তু আমি কাল মোটে কলকাতা থেকে এখানে এসেছি। আশেপাশে যদি দু-একটা পাখি মেলে এই আশায় সকালে বন্দুকটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। একটা ঘুঘু এই দিকে উড়ে এসেছিল, কোথায বসল তাই দেখছিলাম, আপনাকে নয়।

হাতের বন্দুকটা দেখিয়ে বললে, এটা দেখে আপনার বিশ্বাস হওয়া উচিত।

পিছন ফিরে ঘাটের দিকে চলতে চলতে মেযেটি বললে, ন্যাকামি করবেন না, আমি কচি খুকি নই।

ছেলেটিব মুখ কালো হয়ে গেল। সকালবেলার উজ্জ্বল আলো পর্যন্ত যেন এক সুন্দবী তবুণীর দেওয়া কুৎসিত অপবাদেব ছাপে মলিন হয়ে উঠল।

ছেলেটি নিশ্বাস ফেলে সরে গেল। পলাতক ঘুঘুটা চোখের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে কাছেই একটা ডালে বসল, বন্দুক তুলতে ইচ্ছা হল না। আঁকাবাঁকা সরু পথটি ধবে বাগান পার হয়ে খিড়কির দবজা দিয়ে সাদা বাড়িটায় ঢুকল। বন্দুকটা বড়ো ঘরেব কোণে ঠেস দিয়ে রেখে বিরস মুখে খাটেব একধারে বসে পড়ল।

মা বললেন, কী শিকার করলি বে অশোক?

অপবাদ।

অপবাদ?

হুঁঃ, বলে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অশোক বললে গাঁয়ের মেয়েগুলি ভারী ঝগড়াটে হয়, না মা?

কারু সঙ্গে ঝগড়া করে এলি নাকি?

অশোক বললে, আমায় করতে হয়নি, একাই করেছে। বাবু স্নান কবছিলেন, ঘুঘু খুঁজতে যেই পুকুরপাড়ে গেছি, জল থেকে উঠে এসে যা মুখে এল শুনিয়ে দিল। ওত পেতে ছিল বোধ হয়। বাপ্, থাকো তোমরা এখানে, কাল আমি কলকাতা চম্পট দিচ্ছি।

মা বললেন, কোন পুকুর? বাগানের ভেতরেরটা?

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

তবে বোধ হয় হৃদয় মোক্তারের ভাগনি। খুব সুন্দর দেখলি?

দেখলাম? না দেখতেই যা শোনাল, দেখলে বোধ হয় খেয়েই ফেলত।

অশোকের ক্রুদ্ধ মুখের দিকে চেয়ে মা হেসে ফেললেন, না রে, ও খুব ভালো মেয়ে। দোষেব ভেতর একটু তেজি আর ঠোঁটকাটা।

অশোক বললে, হুঁঃ!

মা বললেন, মেয়েদের একটু তেজ থাকা ভালো রে, কাজ দেয়। অন্যায় ও মোটে সহ্য করতে পারে না।

অশোক বললে, জানি। খুব ন্যায়বান ও! কাল এলাম আমি এই জঙ্গলে, আর বলে কিনা আরেকদিন উঁকি মারছিলেন!

চিনতে পারেনি। নেকি তো প্রায়ই আসে আমার কাছে, চিনলেই দেখিস ক্ষমা চেয়ে নেবে।

নেকি? ওর নাম নেকি না কি?

হ্যাঁ, ছেলেবেলা নাকে কাঁদত বলে ওর পিসি ওই নাম রেখেছিল। মা হেসে ফেললেন।

অশোক বললে, নাকে কাঁদত? যে রকম বলছিল মা, আমি আব একটু হলে কেঁদে ফেলতাম!

আজও যে সন্ধ্যার পর কালবৈশাখী দেখা দেবে দুপুববেলার প্রচণ্ড গুমোট সে সত্যটা নিঃসংশয়েই জানিয়ে দিচ্ছিল। কাল বৃষ্টি হয়ে গেছে, আজ ভাপসা গবমে যেন সিদ্ধ করে দিচ্ছে। শুকনো খটখটে গরম বরং সহ্য হয়, এই ভিজে গরম এমন উৎকট লাগে।

বিছানায় শীতলপাটি বিছিয়েও অত্যধিক উত্তপ্ত হয়ে অশোক ঘামছিল। মা বাড়ি নেই, কাছেই এক মুনসেফের বাড়ি বেড়াতে গেছেন। রোদবৃষ্টিতে আর যা কিছু আটকাক মেয়েদেব বেড়ানোটা আটকায় না। ছোটো ভাই পুলকের সকালে স্কুল, আমবাগানে তার খোঁজ মিলতে পারে।

হাতের বইটা টেবিল লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিয়ে অশোক উঠে বসল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে সর্বাঙ্গের ঘাম মুছে অর্ধোন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাইরের গুমোট স্তব্ধ পৃথিবীর ওপর সূর্যালোকের নিষ্ঠুব অত্যাচারেব দিকে চেয়ে রইল।

দুপুরবেলা,—কিন্তু চারিদিকে গভীর রজনীর স্তব্ধতা ব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য যেন স্পর্শ করা যায়, অনুভূতির সীমার মাঝে যেন আপনি হাত বাড়িয়ে ধরা দিতে চায়। রাতদুপুরের যা নিজস্ব, আজ দিনদুপুরে চমৎকার মানিয়ে গেছে।

হঠাৎ চাপা দীর্ঘশ্বাসের মতো সামান্য একটু বাতাস বয়ে যেতেই ভেজানো দরজাটা মৃদু শব্দ করে খুলে গেল। মুখ ফিরিয়ে চাইতেই অশোক অবাক হয়ে দেখল খানদুই বই হাতে করে নেকি উঠান দিয়ে আসছে। ভিজে চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে, রোদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য শাড়ির আঁচলটুকু মাথায় তুলে দিয়েছে।

বড়ো ঘরে উঁকি মেরে অশোকের মাকে না দেখে মাসিমা বলে ডাক দিয়ে নেকি অশোকের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। বিছানার উপরের লোকটির দিকে নজর পড়তেই সে রীতিমতো চমকে উঠল।

আপনি! ও হ্যাঁ। ঠিক।

অশোক গম্ভীরভাবে বললে, মা বাড়ি নেই।

বাড়ি নেই? বই দুখানা ফেরত দিতে এসেছিলাম।

জানালা দিয়ে বাইরের দিকে দৃষ্টি রেখে অশোক বললে, ও ঘরের টেবিলের ওপব রেখে যান।

নেকির যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। সেইখানে দাঁড়িয়ে সপ্রতিভভাবে প্রশ্ন করলে, আপনি অশোকবাবু,—না?

হুঁ।

তাহলে কালকের ঘুঘুর কথাটা বিশ্বাস করতে হল।

নেকির মুখেব দিকে চেয়ে অশোক বললে, আমার সৌভাগ্য। বিশ্বাসটা হল কীসে? আমি অশোকবাবু বলে?

মৃদু হেসে নেকি বললে, হ্যাঁ। মাসিমার কাছে আপনার কথা এত শুনেছি যে, বিশ্বাস না করে উপায় নেই। আপনার আসবার কথা জানতাম, রাগের মাথায় খেয়াল ছিল না। এখানকার কোনো ফাজিল ছোঁড়া মনে করেছিলাম আপনাকে।

বেশ করেছিলেন।

আপনি ভীষণ চটেছেন দেখছি।

অশোক কথা বললে না।

নেকি বললে, চটার কথাই। মিথ্যে অপবাদ কে আর সইতে পারে? আচ্ছা আমি হাত জোড় কবে ক্ষমা চাচ্ছি, তাতে হবে তো?

হবে। কেউ বাড়ি নেই, বিকেলে এলে ভালো করতেন।

অর্থাৎ, আপনি এখন যান, এই তো?

অশোক নির্বিকার উদাসীনের কণ্ঠে বললে, সেই রকম মানেই তো দাঁড়ায়।

নেকিব মুখ ম্লান হয়ে গেল, কথা না খুঁজে পেয়ে বললে, তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

না, না তাডাব কেন? অতখানি অভদ্রতা করতে পারি আপনার সঙ্গে? আমার বলবার উদ্দেশ্য— অশোক থেমে গেল।

উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য মবুক। আসল কথা কী জানেন, আপনাকে আমি ভয করি। হয়তো বলে বসবেন, একলা পেয়ে আপনাকে আমি অপমান করেছি।

বাকিও তো রাখলেন না কিছু।

এ অপমান নয়, অন্যরকম।

অভদ্র উক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত! চারিদিকের নির্জনতা অন্যরকম অপমানের অর্থটাকে এমনই স্ফুটতব করে তুলল, যে অপমানে নেকির মুখ লাল হয়ে উঠল। বইদুটি মেঝেব ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, আপনি চাষা। নিজের মনে ময়লা থাকলে সমস্ত পৃথিবীটাকে কালো দেখায়। স্নানের ঘাটেই পরিচয় পেয়েছি। বলে ঝড়েব মতো চলে গেল।

মিথ্যা অপবাদের জ্বালা আছে, তাতে রাগ হওয়াটাও আশ্চর্য নয়। কিন্তু এইবার অশোক স্পষ্ট উপলব্ধি করল, সে ভুল করেছে। শ্রদ্ধা যার প্রাপ্য তাকে দিয়েছে অপমান। সে না হয় নজর দিতে যায়নি, কিন্তু অমন কি কেউ যায় না? বাঙালির মেয়ে, লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়ে কোনো রকমে ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখ থেকে নিজের দেহটা সরিয়ে নিয়ে যায়। অমন মুখোমুখি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে কটি মেয়ে? ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কবে কটি মেয়ে একান্ত নির্জনে একজন অপরিচিত যুবকের মুখের ওপর বলতে পারে, আপনি গোরু, মহিষ, আপনাকে আমি লজ্জা করব না! আজ তুচ্ছ আত্মাভিমানের বশে সেই মেয়েটিকেই সে অপমান করেছে। তাও সে যখন ক্ষমা চেয়েছে তখন।

বিকালে দুভাইকে খাবার দিয়ে মা বললেন, তোর নেকিদি দু দিন এল না কেন রে পুলক?

পুলক আমে কামড় দিয়েছিল, আমটা সরিয়ে সংক্ষেপে জবাব দিল, দাদা বকেছে। বলে আবাব আমটা মুখে তুলল।

দাদা বকেছে! সত্যি নাকি রে অশোক?

হুঁ।

আবার ঝগড়া হয়েছে তোদের? কী হয়েছিল?

অশোক বললে, পরশু তুমি বাড়ি ছিলে না, দুপুরবেলা বই হাতে করে এসে হাজির। যেমনি বলেছি মা বাড়ি নেই, বিকেলে আসবেন, যা মুখে এল বলে চলে গেল।

সবটুকু দোষ অশোক নির্বিকারে নেকির ঘাড়েই চাপিযে দিল। এমনি করে মানুষ নিজের অন্যায় করার জ্বালার সান্ত্বনা খোঁজে! বেদনা দেওয়া সহজ, আঘাত করা ততোধিক! কিন্তু অমন একটা সহজ কাজ কবেও সুখ মেলে না। সুন্দরী এবং তরুণী আর হাসিভরা মুখখানি যে কথার আঘাতে ম্লান করে দিয়েছিল, এই স্মৃতিটা কাঁটার মতো ক্রমাগত বিঁধে চলে।

মা বললেন, কী ছেলেমানুষি যে তোরা করছিস অশোক। নেকি তো গায়ে পড়ে ঝগড়া করার মেয়ে নয়।

না। খুব ভালো মেয়ে!

রোদ পড়ে এলে পুলককে নিয়ে অশোক বেড়াতে বার হল। আমবাগানের পরেই বিস্তৃত মাঠ, আলে আলে পাযে গড়ে ওঠা সরু পথটি দিয়ে চলতে তার এমনি ভালো লাগে। মাঝে মাঝে লাঙল দেওয়া খেতে নেমে পড়ে, মাটির ঢেলাগুলি পায়ের নীচে গুঁড়িয়ে যায়। খেতগুলি সমস্তদিন বৈশাখের বেহিসাবি সূর্যের তাপ চুবি করে সঞ্চিত করে রাখে, সূর্য বিদায় নিলে মৃদুভাবে সেই তাপ বিকীর্ণ করে। অশোক সর্বাঙ্গ দিয়ে সেটুকু অনুভব করে। চষা মাটির অস্পষ্ট সুবাস তার মনকে উদাস করে দেয়। পুলকের হাত ধবে চলতে চলতে অশোক ভাবে, এমনিভাবেই মাটি যেন নিজেকে চিনিয়ে দিতে চায়। নিশ্চল জড় যেন বলতে চায়, সারা জাগতেব জীবনের রস যোগাই আমি, আমায় চিনে রাখো!

মাঠের পরে বাড়ি থেকে মাইল খানেক তফাতে ছোটো একটা নদী, এখন স্রোত নেই। স্থানে স্থানে জল জমে আছে, বাকিটুকু বালিতে বোঝাই। সাদা ধবধবে বালি। এককালে স্রোতের নীচে ছিল, জলের গতি নিপুণ শিল্পীব মতো অপূর্ব নকশা এঁকে দিয়েছে। কোথাও বালির বুকে ঢেউয়ের ছবির হুবহু ছাপ পড়েছে, কোথাও বিচিত্র রেখার সমাবেশে সূক্ষ্ম আলপনা গড়ে উঠেছে। এমনি সূক্ষ্ম এমনি কোমল যে, দেখলে মনে হয় আঁকল কে? অশোক নিত্য এইখানে এসে বসে। পায়ের দাগে বালির কারুকার্য নষ্ট হয়ে যায়, অশোক ব্যথিত হয়ে ওঠে। অথচ ওই কারুকার্য শতকরা নিরানব্বই জনের চোখেই হয়তো পড়ে না। তুচ্ছ বলে নয়, সূক্ষ্ম সৌন্দর্য আবিষ্কার করবার মানুষের একটা বিপুল অক্ষমতা আছে বলে।

অশোক আজ সেইখানেই যাচ্ছিল। আমবাগানের ভেতরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ি পাক দিতেই অশোক আর নেকি একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। কাপড় গামছা নিয়ে নেকি স্নান করতে যাচ্ছিল, চোখাচোখি হতেই তার মুখের ভাব কঠিন হয়ে উঠল। নিঃশব্দে একপাশে সরে গিয়ে সে অশোককে পথ দিল।

অশোক এগিয়ে গেল, কিন্তু পুলক নেকির সামনে দাঁড়িয়ে বললে, আর যে আমাদের বাড়ি যাও না নেকিদি? দাদা আর কিছু বলবে না, মা বকে দিয়েছে।

অশোক এগিয়ে গিয়েছিল, দাঁড়িয়ে ডাকল, পুলক আয, দেরি হয়ে গেছে।

নেকি পুলককে কাছে টেনে নিয়ে কী বলতেই সে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। নেকিব হাত থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে বললে, তুমি যাও দাদা, আমি যাব না। নেকিদিব সঙ্গে সাঁতার কাটব।

বেড়াতে যাবি না?

পুলক ঘাড় নেড়ে বললে, রোজ তো বেড়াই, আজ সাঁতার দেব। তুমিও এস না দাদা, তিনজনে সুইমিং রেস দেব, নেকিদির সঙ্গে পারবে না তুমি।

অশোক ধমক দিয়ে বললে, এই অবেলায় পচা ডোবায় স্নান করলে অসুখ হবে পুলক। এখন বেড়িয়ে আসি, কাল সকালে বড়ো পুকুরে সাঁতার কাটব।

পুকুরের ছোটো-বড়োত্বের জন্য পুলকের মাথা ব্যথা ছিল না, নেকিদির সঙ্গে সাঁতার দিতে পেলেই সে সুখী। নেকির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার একটা হাত চেপে ধরে দাদার প্রস্তাবে প্রবল আপত্তি জানিয়ে দিল। নেকি তার হাত ধরে পুকুরের দিকে অগ্রসর হল।

অশোক ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, এই অবেলায় ওকে যে পচা ডোবায় স্নান করবার জন্যে নাচালেন, অসুখ হলে দায়ি হবে কে?

মুখ না ফিরিয়ে নেকি জবাব দিল, আমি। ওর অভ্যাস আছে।

অভ্যাস আছে কী রকম? ও কি গেঁয়ো ভূত যে পচা ডোবায় স্নান করা অভ্যাস থাকবে?

গেঁয়ো ভূত না হোক, শহুরে বাবু নয়। বলে নেকি পুলককে নিয়ে মোটা আমগাছটাব ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শহুরে বাবু! মেয়েটা শেষ পর্যন্ত তাকে শহুরে বাবু ঠাউরাল নাকি! নিতান্ত চটে যত দূর সম্ভব দূরে দূরে পা ফেলে হনহন করে বাগান পার হয়ে অশোক মাঠে পড়ল।

মাঠে বেড়ানোর আনন্দটুকু মাঠে মারা গেল। অশোক ভাবলে কী কুক্ষণেই মেয়েটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

সন্ধ্যার অন্ধকার একটু অস্বাভাবিক রকম ঘন হয়ে এল। সেদিকে অশোকের নজর পড়ল না। নজর পড়লে নদীর চড়ায় বসে থাকবার মতো সাহস তার হত না।

ঈশান কোণের জমাট-বাঁধা কালো ছায়াটি যে রকম দ্রুতবেগে আকাশের অর্ধেকটা ঢেকে ফেললে তাতে আর অল্পক্ষণের ভেতরেই যে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেলবে সে বিষয়ে সন্দেহ করবার উপায় রইল না। হলও তাই। আকাশ যখন প্রায় সবটা ঢাকা পড়েছে তখন অশোক হঠাৎ ব্যাপারটা উপলব্ধি করল। তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিল। যতবার শঙ্কিত দৃষ্টি তুলে আকাশের ভয়ানক কালো, ভয়ানক গম্ভীর মূর্তির দিকে চাইল ততবারই তার গতিবেগ বেড়ে গেল। নেকি তো নেকি, ঝড় শুরু হবার আগে কোনোরকমে বাড়ি পৌঁছানোর চিন্তা ছাড়া অন্য সব কথা তার মন থেকে বেমালুম লুপ্ত হয়ে গেল। এ সময় এক রকম নিত্যকার ব্যাপার হলেও ইতিপূর্বে পূর্ববঙ্গের কালবৈশাখীর যে পরিচয় পেয়েছিল তাতে এই নির্জন মাঠে এই কালবৈশাখীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াবার কল্পনা করেই সে ভয় পেয়ে গেল।

জমাট-বাঁধা অন্ধকারকে শিউরে দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে উঠল। অশোকের দ্রুত চলা দৌড়নোতে পরিবর্তিত হয়ে গেল।

অশোক পুরী গিয়েছিল, দূর থেকে সমুদ্রগর্জন কেমন শোনায় জানত। পিছন থেকে সেই রকম একটা অস্পষ্ট গর্জন কানে আসতেই সে বুঝতে পারল কালবৈশাখী তাড়া করে আসছে এবং তাকে ধরে ফেলতে মাত্র দু-তিন মিনিটের ওয়াস্তা।

হাঁফ ধরে গিয়েছিল। দৌড়ে বিশেষ লাভ নেই বরং উঁচু নিচু মাঠের ভেতর অন্ধকারে আছাড় খাওয়ার আশঙ্কা পুরো মাত্রায়। বাধ্য হয়ে দৌড়ানো বন্ধ করে অশোক দ্রুত চলা শুরু করল। আর একবার বিদ্যুৎ চমকাতে অশোক দেখলে আমবাগান তখনও পাঁচ-সাত মিনিটের পথ।

আমবাগান? ঝড় তো ধরে ফেলবে ঠিক, তখন আমবাগানের ভেতর দিয়ে যাওয়াটা কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? অশোকেব ইচ্ছা হল একবার থমকে দাঁড়িয়ে কথাটা ভালো করে চিন্তা করে নেয়। কিন্তু পিছনের গর্জনটা খুব কাছে এবং বেশি রকম স্পষ্ট হয়ে উঠেছে দেখে দাঁড়াবাব সাহস হল না। আর দ্বিতীয় পথের সন্ধান তো সে রাখে না! অন্যসময় ঘণ্টাখানেক ধরে খুঁজে অন্যদিক দিয়ে ঘুরে যাবার ভালো রাস্তা আবিষ্কার করা হয়তো সম্ভব হত, কিন্তু এখন সারারাত ধবে খুঁজলেও যে সে পথের খবর মিলবে না তা ঠিক। আমবাগান ছাড়া পথ নেই। কাঁচা পাকা ঢের ফল গাছগুলি খাইয়েছে, আজ যদি নিতান্তই চাপা দেয় কী আর করা যাবে!

পিছন থেকে মহাকলরব করতে করতে ঝড় এসে অশোককে এমনি জোরে ধাক্কা দিল যে, মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে কোনো রকমে সামলে নিল। আর জোরে চলবার চেষ্টা করবার প্রয়োজন হল না, বাতাসেই অশোককে ঠেলে নিয়ে চলল।

ঠিক যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। চিরকাল মাথা উঁচু করেই আছে, কিন্তু গাছগুলি পর্যন্ত সটান শুয়ে পড়বার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি শুরু কবে দিল। লাখখানেক ঢাকঢোল বাজিয়ে প্রকৃতি যেন বিদঘুটে রকমের ওয়ার-ডান্স আরম্ভ করে দিল, সব ভেঙে চুরমার করে ঠান্ডা হবে। মেঘেব সংযম রইল না, ফোঁটা ছেড়ে ধারাপাত আরম্ভ হয়ে গেল। সেই পতনশীল বাবিধারা নিয়ে পাগলা হাওয়া এমনি খেলা শুরু করে দিল যে, দেহের অনাবৃত অংশের স্পর্শেন্দ্রিয় দিয়ে এবং বিদ্যুতের আলোতে দর্শনেন্দ্রিয় দিয়ে ভালো করে অনুভব করে অশোকের ইচ্ছে হতে লাগল সেই মাঠের ভেতবই মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। ঝড়ের শব্দ তো আছেই, তার ওপরে আকাশে মেঘেদের অজস্র চকমকি ঠুকে আলো জ্বালাবার অবিশ্রাম চেষ্টায় ক্রমাগত যে আওয়াজ হতে লাগল তাতে অশোকের শ্রবণেন্দ্রিয় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়বাব উপক্রম করল।

আমবাগানের শেষ প্রান্তে হৃদয় মোক্তারের বাড়ি, অশোকের পথ তার রান্নাঘরেব পাশ দিয়ে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বসানো জানালার পাশে আসতেই সুতীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল, অশোকবাবু দাঁড়ান। অশোক থমকে দাঁড়াল।

নেকি অশোকের প্রতীক্ষাতেই রান্নাঘরের জানালায় চোখ রেখে দাঁড়িয়েছিল, ডাক দিয়েই বাইবে বেরিয়ে অশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বললে, গলা চিরে ডেকেছি, যে শব্দ! ভাবলাম বুঝি শুনতেই পাবেন না। ঘরে চলুন।

না। মা ভাববেন।

অশোকেব পথ আগলে দাঁড়িয়ে নেকি বললে, বাগানের ভেতর দিয়ে তো যাওয়া যাবে না, এর ভেতরেই তিন-চাবটা গাছ পড়ে গেছে শব্দ শুনেছি। দাঁড়াবেন না, আসুন।

অশোক তবু দ্বিধা করল, কিন্তু মা যে পাগল হয়ে উঠবেন।

নেকি ব্যাকুল হয়ে বললে, সে অল্পক্ষণের জন্য, কিন্তু যদি গাছ চাপা পড়েন সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবেন। বলে হাত জোড় করে বললে, অন্য সময় যত পারেন রাগ করবেন, আপনার পায়ে পড়ি, চলুন।

আকাশে বিদ্যুৎ চমকে গেল, সেই আলোতে নেকির মুখের যে ব্যাকুল ভাবটা অশোকের চোখে পড়ল তাতে আর দ্বিধা করবার অবকাশ রইল না। বললে, চলুন।

নেকি অশোককে পথ দেখিয়ে রান্নাঘরের পাশ দিয়ে উঠান পার হয়ে বড়ো ঘরের দাওয়ায় উঠল। দরজায় বাব থেকে শিকল লাগানো ছিল, ক্ষিপ্র হস্তে শিকল খুলে ফেললে। ঘরে প্রদীপ জ্বলছিল, দরজা খুলতেই বাতাসে নিভে গেল।

অশোককে হাত ধরে ঘরের ভেতর নিয়ে গিয়ে নেকি বললে, দাঁড়ান, আলো জ্বালছি। ঘরের একদিকের তাক হাতড়ে একটা ল্যাম্প নিয়ে এসে বললে, আপনার কাছে দেশলাই আছে?

না।

সিগারেট খান না?

না।

খুব ভালো ছেলে তো! নাঃ, আপনার সঙ্গে তা হলে পারা গেল না দেখছি। রান্নাঘরেই যেতে হল। থাকুন অন্ধকারে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। বলে নেকি বাইরে চলে গেল।

দেশলাই নিয়ে ফিরে এসে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়েই বললে, হাত বাড়িয়ে দেশলাই নিয়ে আলোটা জ্বেলে ফেলুন অশোকবাবু! একবার তো দুজনেই খানিকটা করে জল ঢেলেছি, সর্বাঙ্গে যে রকম ধারা বইছে, এবার ঘরে ঢুকলে মেঝেতে নদী বয়ে যাবে!

নিকষ-কালো আঁধার, কিন্তু তারই ভেতর নেকির হাতের দুগাছি সোনার চুড়ি রান্নাঘরের অদৃশ্যপ্রায় আলোয় চিকচিক করছিল। দেশলাই নিয়ে অশোক একটা কাঠি জ্বালিয়ে বললে একেবারে ভিজে গেছেন যে!

সেটা উভয়ত, পরে দুঃখ করা যাবে, বাতিটা জ্বালুন।

আলো জ্বেলে অশোক বললে, মেঝেটা সত্যিই ভেসেছে।

তা হোক মুছে নিলেই হবে। আলনা থেকে লালপেড়ে শাড়িটা দিন। বাক্সো না খুললে আবার আপনার কাপড় জুটবে না।

অশোক শাড়িটা এনে দিলে। বারান্দার একদিকে একটু ঘেরা ছিল, শাড়ি নিয়ে নেকি সেখানে চলে গেল।

অশোকের জামা কাপড়ের অতিরিক্ত জলটুকু ইতিমধ্যে প্রায় সবটাই ঝরে গিয়েছিল, কিন্তু ভিজে জামার আলিঙ্গনটা বড়োই বিশ্রী লাগছিল। জামাটা খুলে হাতে নিয়ে নেকির প্রতীক্ষায় ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অশোক একবার চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। প্রকাণ্ড ঘর। একপাশে দুটি বড়ো বড়ো খাট জোড়া লাগিয়ে পাতা রয়েছে। তাতে যে বিছানা আছে খাটের অর্ধেকটাও আবৃত করবার সাধ্য তার নেই। সেকেলে আসবাব, যেমন বিরাট তেমনি কদাকার। এক কোণে গোটা কুড়ি-পঁচিশ হাঁড়িকলসি তাতে সংসারের চাল-ডাল থাকে বোঝা গেল। পুরানো রংচটা একটা কাঠের আলনা, সোজা দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, হেলে পড়েছে। ফরসা, মলিন, আস্ত এবং ছেঁড়া নানা রকমের নতুন পুরাতন ধুতি শাড়ি শেমিজ যত্ন করে গোছানো রয়েছে। চাঁচের বেড়ার গায়ে বাঁশের পেরেকে একটা আয়না ঝুলছে, কাছেই একটা চিরুনি গোঁজা। আয়নার নিচে একটা টুল, তার কাছে হাতলভাঙা কাঠের চেয়ার। একটা আমকাঠের সিন্দুক একটা কোণের সবটুকু দখল করে আছে। মাথা নিচু করে অশোক খাটের নীচে উঁকি মারল। ধুলোয় মলিন বড়ো বড়ো পিতলের হাঁড়িকলসি ডেকচি ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে কুলো ধুচুনি পর্যন্ত সেখানে জমা হয়ে আছে।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই দরজার কাছে নেকি খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, ভূত দেখছিলেন না কি?

না বাঘ। অন্তত একটা শেয়াল যে খাটের নীচে—

চোখ তুলে অর্ধপথে সে থেমে গেল। মন থেকে রাগের জ্বালা নিঃশেষে মুছে গিয়েছিল, বিদ্বেষশূন্য দৃষ্টি তুলে লণ্ঠনের আলোতে সম্মুখের তরুণী নারীটির মুখের দিকে চেয়ে অশোক মুগ্ধ হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কাপড় ছেড়ে এসেছে, ভিজে চুল ভালো করে মোছা হয়নি। এক গোছা জলসিক্ত কুন্তল গালের পাশ দিয়ে লতিয়ে নেমে বুকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে। কপালে বিন্দু বিন্দু জল জমে আছে, আলো পড়ে মনে হচ্ছে কে যেন মেয়েটার কপাল বেড়ে মুক্তোর মালা পরিয়ে দিয়েছে। চোখের পাতা ভেজা, তার অন্তরাল হতে যে দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে তার যেন তুলনা নেই।

নেকি লাল হয়ে চোখ নত করলে হঠাৎ,—আচ্ছা তো আমি! ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়ে আছেন খেয়ালই নেই। বলে কাঠের সিন্দুকটার কাছে চলে গেল। ধোপদোরস্ত একখানা ধুতি এনে অশোকেব হাতে দিয়ে ভিজে জামাটা নিয়ে বললে, কাপড় ছেড়ে ফেলুন, আমি আসছি। বলে বেরিয়ে গেল।

কাপড় ছেড়ে অশোক ডাকল, আসুন এবার।

নেকি এল। দরজা দিয়ে প্রথম থেকেই কিছুকিছু ছাঁট আসছিল। ঘরে এসে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করে নেকি দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, আমাকে 'আপনি আপনি' করছেন এমন বিশ্রী লাগছে! এতটুকু সাহস নেই যে 'তুমি' বলেন?

অশোক বললে, সাহস আছে কিনা পরিচয় পাবে। ওটা কী হল? বলে রুদ্ধ দরজার দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল।

নেকি বললে, এই সহজ কথাটা বুঝলেন না? ছাট আসছিল, বন্ধ করে দিলাম। মেঝেটা ভাসিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই কিছু।

কিন্তু—

সে সব পরে বিবেচনা করা যাবে অশোকবাবু, আপনি কোঁচাব খুঁটটা গায়ে দিয়ে ভাঙা চেয়ারটাতে বসুন। আমাব নাম নেকি, কিন্তু ন্যাকামি দুচক্ষে দেখতে পাবি না। আপনাব সঙ্গে একা এক ঘরে যদি থাকতে পারি, দরজা খোলা-বন্ধয় বিশেষ আসবে যাবে না। খোলা থাকলে বরং ঘরটা ভিজবে।

অশোক বসে বললে, তুমিও বসো, কতকগুলি প্রশ্ন আছে।

খাটের কোনায বসে হাসিমুখে নেকি বললে, হুকুম করুন।

তুমি এখানে একা থাক?

নেকি হেসে উঠল,—তাই কি আপনি সম্ভব মনে করেন না কি? হাসি থামিয়ে বললে, থাকি তিনজনে, মামা পিসিমা আর স্বয়ং। মামা জমি দেখতে পরশুদিন মফস্বলে গেছেন, পিসি বিকেলে কাদের বাড়ি গিয়েছিল ঝড়ের জন্য আটকা পড়ে গেছে। যে আচমকা ঝড় এল আজ! আপনি ফিরছেন না দেখে আমার যা—ঝড়ের সময় মাঠের মাঝে ভারী ভয় হয় অশোকবাবু।

ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অশোক বললে, আমি চললাম।

নেকি বিস্মিত হয়ে বললে, কী হল আবার?

আমার মতো মূর্খ আর নেই। ছি ছি একবারও খেয়াল হল না।

কী হল বলুন না?

বুঝলে না? কেউ যদি হঠাৎ এসে পড়ে—সে ভারী বিশ্রী হবে, আমি যাই।

নেকি বললে, ভাববেন না, এই ঝড়ে কেউ আসবে না। যাবেনই বা কী করে?

না না তুমি বুঝছ না। তোমার কত বড়ো ক্ষতি হবে, জান?

নেকি দৃঢ়কণ্ঠে বললে, জানি, বসুন। সে ভয় করলে আপনাকে ডেকে আনতাম না। পাগল হয়েছেন, ভালো দিনে কেউ আসে না, আর ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে গোয়েন্দাগিরি করতে আসবে!

অশোক বসল। বললে, তোমার কিন্তু বেজায় সাহস। লোকে নাই জানুক, আমাকে তো একরকম জানই না, কী বলে ডেকে আনলে?

আপনাকে জানি না কে বললে?

আমি বলছি। এসেছি পাঁচদিন, দেখা হয়েছে তিনবার, তিনবারই ঝগড়া করেছি চেনবার সুযোগ পেলে কোথায়? পুকুরপাড়ে বরং—

নেকি খিলখিল করে হেসে উঠল। ওটা তার স্বভাব। বললে, পুকুরের ঘটনাটা ভোলেননি দেখছি।

না ভুলিনি। ঠাট্টা নয়, সত্যি বল কী করে চিনলে আমায়?

নেকি বললে, একজনকে চিনতে হলে তার সঙ্গে দু-চার বছর মিশবার দরকার হয় বলে মনে করেন নাকি আপনি? আমার সঙ্গে প্রথম থেকে যে অমনভাবে ঝগড়া করতে পারে তাকে ভয় করা আমি প্রয়োজন মনে করি না। বুঝলেন?

অশোক ঘাড় নেড়ে বললে, না।

তবে অন্যরকম করে বলি। আমাদের অনুভূতি বলে একটা জিনিস আছে অশোকবাবু, একবার দেখলেই আমরা মানুষকে চিনতে পারি। আর কি জানেন, মাসিমার ছেলেকে চিনবার দরকার হয় না।

নেকির কথায় তার মার প্রতি এমন একটা সহজ শ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ পেলে যে, অশোক খুশি হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা নেকি, তোমার ভালো নামটা কী বলো তো?

নেকি নামটা পছন্দ হয় না? ও নামটা আমায় একেবারে মানায় না কী বলেন? আপনি না হয় আমাকে লীলা বলবেন।

লীলা? বেশ নাম।

সত্যি বেশ?

অশোক জবাব দিলে না, একটু হাসল।

হঠাৎ নেকি বললে, আপনার খিদে পেয়েছে? আম খাবেন?

অশোক ঘাড় নাড়ল।

আম খাবেন না? তাহলে কী দিই! কাল সন্দেশ করেছিলাম, গোটা চারেক আছে বোধ হয়, তাই খান তবে।

অশোক আবার ঘাড় নাড়ল।

ঘাড় নাড়ছেন যে খালি? ইচ্ছেটা কী?

ইচ্ছে কিছু না খাওয়া। বাড়ি থেকে যতদূর সাধ্য খেয়ে বার হয়েছিলাম, খিদে নেই।

নেকি মুখ গোঁজ করে বললে, হুঁ!

রাগ হল? আচ্ছা দাও, খাব।

থাক। খিদে না থাকলে খেতে নেই।

তৎক্ষণাৎ বললে, খিদে যেন পাচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, এতক্ষণ বুঝতে পারিনি। কী দেবে দাও, খেয়েনি।

নেকি হাসিমুখে খাবার নিয়ে এল। শুধু সন্দেশ নয়, আমও কেটে দিল। ঘরেই ছিল। কোণের কলসি থেকে জল গড়িয়ে দিল।

অশোক নিঃশব্দে আহারে মন দিল।

নেকি বললে, খেতে খেতে কথা বলুন, চুপ করে থাকতে ভালো লাগে না।

কী বলব?

যা খুশি।

যা খুশি নয়, অশোক নেকির কথাই পাড়ল। একটু একটু করে নেকির জীবনের যে ইতিহাস সে শুনল তাতে অবাক হয়ে গেল।

বড়োলোকের মেয়ে, কলকাতায় বাবার ব্যাবসা ছিল। মা কবে মারা গিয়েছিলেন, নেকির মনে নেই। পিসিই তাকে মানুষ করেছে। কী সব কারণ ঘটেছিল নেকি জানে না, তার যখন ষোলো বছর বয়স, ব্যাবসা ফেল পড়ল। বাজারে দেউলিয়া নাম জাহির হবার আগেই বন্দুকের গুলিতে নিজের মাথাটা ফুটো করে দিয়ে নেকির বাবা সব দায় এড়িয়ে গেলেন। আপনার বলতে এই মামা, চোখ মুছতে মুছতে বছর দুই আগে পিসিকে নিয়ে এই মামার আশ্রয়ে এল। পিছনে ফেলে এল আজন্ম-অভ্যস্ত শৌখিন জীবন।

—নতুন জীবনের ভয় বাবার শোককে পর্যন্ত ছাপিয়ে উঠেছিল অশোকবাবু। পাড়াগাঁ চক্ষে দেখিনি, পিসির কাছে শুনে দুচোখে খালি অন্ধকার দেখতে লাগলাম। গাঁয়ের মেয়েরা কীভাবে থাকে, ভোর পাঁচটায় উঠে গোবর দিয়ে কেমন করে ঘর নিকোয়, ডোবায় গিয়ে বাসন মাজে, লাউ-কুমড়োর চচ্চড়ি দিয়ে কেমন আরামে দুবেলা পেট ভরায়, পিসির কাছে লম্বা ফিরিস্তি শুনে মনে হয়েছিল, কাজ নেই বাবা বেঁচে থেকে, তার চেয়ে আপিং গুলে খাওয়া সহজ!

অশোক বললে, তারপর যখন সত্যি সত্যি এলে তখন কেমন লাগল?

নেকি বললে, এসে দেখলাম, ভয়ের কারণ নেই, ঘর নিকোবার দরকার হল না, বাসনও মাজতে হল না। রান্নার ভারটাও পিসিমা নিলেন। সেদিকে দিয়ে বিশেষ কষ্ট হল না, কিন্তু কপাল মন্দ, আমি আসার তিন মাসের ভেতরেই কয়েকটা মকদ্দমায় হেরে মামার অবস্থা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল। মামা অবশ্য বললেন না, অবস্থা বুঝে আমি নিজেই ঝিকে ছাড়িয়ে দিলাম। বুক বেঁধে একদিন যে ভয়ে আপিং খেতে ইচ্ছে হয়েছিল সেই গোবর-লেপা থেকে বাসন-মাজা পর্যন্ত সব কাজগুলি করে ফেললাম। কোথায়ও কিন্তু বাধল না।

অশোক বললে, রান্নাটাও বোধ হয় এখন করতে হয়?

হ্যাঁ। পিসিমার বাতের শরীর, পারেন না।

ঝড়ের বেগ কম পড়তেই নেকি বললে, আপনি এখন আসুন অশোকবাবু। একা ফেলে গেছে, পিসি হয়তো ঝড় ঠেলেই এসে পড়বে। এ সামান্য ঝড়ে আর গাছ পড়বে না।

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, পিসির আসার কথাই ভাবছ, আমি যদি সবাইকে বলে দিই সন্ধেটা কোথায় কাটিয়ে গেলাম?

নেকি হেসে বললে, ওইটুকু আপনি করতে পারেন না, এই দু-ঘণ্টার কথা সম্পূর্ণ গোপন থাকবে।

মাকে কিন্তু বলতে হবে।

তা তো হবেই, মাসিমাকে বলবেন বইকী! আমি অন্য লোকের কথা বলছিলাম। চলুন, আপনাকে বরং একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।

অশোক হেসে বললে, তারপর তোমাকে কে এগিয়ে দিয়ে যাবে লীলা?

আমার দরকার হবে না, একাই আসতে পারব।

অশোক ঘরের বাইরে পা দিয়ে বললে, বাড়াবাড়ি কোরো না, আমি শিশু নই। দরজা দিয়ে বসো, এটুকু খুব যেতে পারব।

আচ্ছা, আসুন তবে।

অশোক বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, নেকি বললে, বাড়ি গিয়েই কাপড় ছেড়ে ফেলবেন কিন্তু। দুবার ভিজতে হল, অসুখ না হয়।

আচ্ছা, বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে আবার উঠে এল। বললে তোমার ভয় করবে না তো? একটু একটু করবে। আর দাঁড়াবেন না, পিসি এলে ভারী মুশকিলে ফেলবে।

অশোক উঠানে নেমে গেল। নেকি চেঁচিয়ে বললে, আর একটা কথা অশোকবাবু, আপনাতে আমাতে সন্ধি তো?

উঠান থেকেই ঘাড় ফিরিয়ে অশোক বললে, সন্ধিপত্রের খসড়া করে রেখো সই করে দেব। বলে রান্নাঘরের ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নেকি সেইখানে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ঝড়ের বেগ কমেছিল কিন্তু বৃষ্টি সমভাবেই পড়ছিল। ছাঁট লেগে নেকির বসনপ্রান্ত ভিজে যেতে লাগল, কিন্তু সেদিকে তার খেয়ালই রইল না।

পরদিন সকালে অশোকের জামা আর কাপড় হাতে করে যেতেই অশোকের মা নেকিকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলেন। বললেন, বাগানের এক একটা গাছ-পড়ার শব্দ শুনছিলাম আর আমার বুকের পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্ছিল মা। যে ছেলে, তুই না ডাকলে ওই বাগানের ভেতর দিয়েই আসত।

সুখে তৃপ্তিতে লজ্জায় নেকির মুকখানি আরক্ত হয়ে উঠল। মাথা নত করল।

মা বললেন, বোস, খাবার খেয়ে যাবি। ঠাকুরকে ভাঁড়ারটা বার করে দিয়ে আসি। বলে চলে গেলেন।

আপনার জামার পকেটে এই কাগজপত্রগুলি ছিল অশোকবাবু। ভিজে চুপসে গেছে।

অশোক কাগজগুলি নিয়ে বললে, মনিব্যাগটা।

মনিব্যাগ? মনিব্যাগ তো ছিল না!

ছিল না কী রকম? কাগজ রইল, ব্যাগ উড়ে গেল?

নেকি হেসে ফেললে, যতই করুন অশোকবাবু, আর ঝগড়া বাধবে না, সন্ধি হয়ে গেছে। ঠাট্টা নয়, বেশি টাকা ছিল না কি?

না, গোটা পাঁচেক। দৌড়বার সময় মাঠে পড়েছিল। বুঝেছিলাম, তুলে নেবার সুযোগ হয়নি। ভালোই হয়েছে, সারের কাজ দেবে।

তা দেবে, টাকার মতো সার আর নেই।

মাসখানেক কেটে গেছে।

সকালবেলা মা চা করছিলেন, ঝরাফুলের মতো পরিম্লান মূর্তি নিয়ে নেকি এসে তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল।

মা বললেন, জ্বর ছেড়েছে? উঠে এলি যে?

জ্বর নেই। আমায় এক কাপ চা দিও মাসিমা।

এখনও খাসনি কিছু?

নেকি ঘাড় নাড়ল।

তবে আগে একটু দুধ খেয়ে নে, তারপর চা খাস। দুদিনের জ্বরে কী চেহারাই হয়েছে মেয়ের! স্টোভের ওপর কড়ায় দুধ জ্বাল হচ্ছিল, বাটিতে ঢেলে নেকির সামনে ধরলেন।

অশোক বললে, তিন-চারবার করে পচা ডোবায় স্নান করলে জ্বর হবে না?

নেকি বললে, প্রথম দিন থেকেই ও-পুকুরে স্নান করাটা আপনার চক্ষুশূল হয়েছে দেখছি!

কী মুশকিল! এ মেয়েটা প্রথম দিনের সেই ঘটনাটুকু নিজেও ভুলবে না, অশোককেও ভুলতে দেবে না।

মা কী কাজে উঠে যেতেই বাটির দুধ প্রায় সবটা কড়ায় ঢেলে দিয়ে চোখ কান বুজে বাকিটুকু নেকি উদরস্থ করে ফেললে। চায়ের কাপ তুলে নিয়ে বললে, দুধ তো না, বিষ!

তাই দেখছি। মাকে বলতে হবে।

না লক্ষ্মী, বলবেন না। এক্ষুনি একবাটি দুধ গিলিয়ে দেবেন।

ভালোই তো!

ভালো বইকী! চায়ের কাপটা শেষ করে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে, মার আসবার আগেই পালাই তাহলে।

অশোক বললে, না বসো, বলব না।

রাঁধতে হবে, পিসিমার অসুখ।

এই শরীরে রাঁধবে?

না রাঁধলে চলবে কেন? মামা দুদিন হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়েছেন। ওই যা, আসল কথাই ভুলে গেছি। বিকালে আপনার আম খাবার নেমন্তন্ন রইল, পুলককে নিয়ে যাবেন। বলে নেকি চলে গেল।

বিকালে প্রায় ছটার সময় পুলককে সঙ্গে নিয়ে অশোক আম খাবার নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেল। হৃদয় চক্রবর্তী একগাল হেসে অভ্যর্থনা করলেন। কী সৌভাগ্য—কথাটাই উচ্চারণ করলেন বার কুড়ি।

চক্রবর্তীর বয়স নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মাথার চুলে পাক ধরেছে। চুল বলা সংগত নয়, কদমফুলের পাপড়ি। মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। হাসবার উপক্রম করলেই সেই জঙ্গল ফাঁক হয়ে তামাকের ধোঁয়ার বিবর্ণ কতকগুলি দাঁত আত্মপ্রকাশ করে। এমনি অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করতে লাগলেন যে, সেগুলি প্রকাশ হয়েই রইল।

বড়ো ঘরের বারান্দায় সেই ভাঙা চেয়ার আর টুলখানা পাতা হয়েছিল, অশোক আর পুলককে বসিয়ে চক্রবর্তী নিজে একটা পিঁড়ি দখল করে উবু হয়ে বসে ডাকলেন, নেকি!

নেকি ভেতর থেকে সাড়া দিল, আম কেটে নিয়ে যাচ্ছি মামা।

দু-থালা বোঝাই আম দুজনের সামনে ধরে দিতেই অশোক বললে, এ কী ব্যাপার! এত আমি খাব কী করে?

চক্রবর্তী মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না কিছু না। যুবাকাল, লোহা পেটে পড়লে হজম হয়ে যাবে। খান, লজ্জা করবেন না। আপনার মাঠাকুরুন নেকিকে স্নেহ করেন তাই, নইলে আমাদেব মতো লোকের বাড়ি আপনাকে খেতে বলা--সাহসই হত না!

নেকি মুচকে হেসে ভেতবে চলে গেল।

কী যে বলেন! বলে অশোক একটা আম মুখে তুলে নিলে। বললে, খা পুলক, উনি যখন ছাড়বেন না, যা পারি খাই, বাকি নষ্ট হবে।

চক্রবর্তী মোক্তার মানুষ বকতে পারেন, আসর সরগরম করে রাখলেন। অশোক কখনও হুঁ দিয়ে কাজ সারতে লাগল, কখনও বললে, নিশ্চয়! কখনও মৃদু হেসে বললে তা-বইকী! বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে চক্রবর্তী কলিকালের লোকের ধর্মজ্ঞানহীনতা এবং উৎকট লোভ-পরায়ণতার কথা কীর্তন করলেন। বললেন, আদালতে এত মামলা মকদ্দমা কী জন্যে মশায়? ওই লোভ! মিথ্যে সাক্ষী তৈরি করে কার দুবিঘে জমি আছে তাই আত্মসাৎ করবার চেষ্টা! কেনরে বাপু? পরের জিনিস নিয়ে টানাটানি কেন? নিজের যা আছে তাই নেড়ে-চেড়ে খা না!

অশোক ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, তা বইকী!

এইবার চক্রবর্তীর এই চিন্তার উৎসমুখের সন্ধান পাওয়া গেল। একটা পাজি লোক তাঁর পাঁচ বিঘে জমি যে কীরকমভাবে আত্মসাৎ করবার উপক্রম করেছে এবং অশোকের বাবার কাছেই মিথ্যে

দাবির মকদ্দমা রুজু করেছে, সবিস্তার বর্ণনা করে চক্রবর্তী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললেন। শুনে অশোক আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করলেন।

থালা অর্ধেক খালি করে ঠেলে দিতেই চক্রবর্তী হাত জোড় করলেন। অশোক ব্যস্ত হয়ে বললে, ও কী? ও কী? সত্যি বলছি আর খাবার ক্ষমতা নেই, নইলে ফেলে রাখতাম না।

লোকটার প্রতি অশ্রদ্ধায় অশোকের অন্তর পূর্ণ হয়ে গেল। বাপের বয়সি ভদ্রলোক, বিনয়ের ছলে নিজেকে ক্রমাগত হীন করে ফেলছেন দেখে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করলে।

জোড়হাতেই চক্রবর্তী নিবেদন করলেন, তবে দুটি সন্দেশ মুখে দিন। বলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁকলেন, নেকি! নেকি!

নেকি নিঃশব্দে চৌকাঠের কাছে এসে দাঁড়াল।

দুটো আম ফেলে দিলেই হবে? একী হেঁজিপেঁজি লোক পেয়েছিস! বাপের তো টাকা ছিল, এটুকু শিক্ষাও হয়নি? সন্দেশগুলো কি তোর জন্যে এনেছি নাকি?

চারটে প্রশ্ন। নেকি নতমুখে শুধু সন্দেশের সংবাদটাই দিল, সন্দেশ নেই!

নেই? কী হল? পাখা গজিয়েছে?

আছে, দেওয়া যাবে না। হাঁড়ি ভেঙে সন্দেশ মাটিতে পড়ে গিয়েছিল।

হাঁড়ি ভাঙল কেন?

তাকের ওপর ছিল, বেড়ালে ফেলে দিয়েছে।

হুঁ! বলে চক্রবর্তী স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

অশোক হেসে বললে, বেড়াল ভালো কাজ করেছে, এর ওপর সন্দেশ খেলে ডাক্তার ডাকতে হত।

চক্রবর্তী সখেদে বললেন, ষোলো-সতেরো বছর বয়স হল, কোনোদিকে যদি নজর থাকে! আপনার জন্য কত যত্ন করে আনা। হায়! হায়! আগেই জানি অদৃষ্ট আমার নিতান্তই মন্দ!

অশোকের ভাগ্যে সন্দেশ জুটল না সে জন্য চক্রবর্তীর অদৃষ্ট মন্দ হতে যাবে কেন, ভেবে অশোকের হাসি পেল। লোকটির কী অপূর্ব বিনয়!

চক্রবর্তী বলে চললেন, অদৃষ্ট মন্দ না হলে এমনটা হয়! সাতপুরুষের জমি আমার, তাতে আর একজন ভোগা দেবার চেষ্টা করে! আপনার বাবার কাছে যতক্ষণ মকদ্দমা আছে ভাবনা নেই, উনি বিচক্ষণ হাকিম, চট করে সাজানো মামলা ধরে ফেলবেন। কিন্তু তা কি থাকবে! দেবে হয়তো এক দরখাস্ত ঝেড়ে, কোন কাঠখোট্টা হাকিমের হাতে গিয়ে পড়বে ঈশ্বরই জানেন!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিল, অশোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আজ আসি চক্রবর্তীমশাই।

চক্রবর্তীও উঠে দাঁড়ালেন, আসবেন? যা তো মা নেকি একটা আলো নিয়ে সঙ্গে।

না না, আলো লাগবে না, এখনও তেমন অন্ধকার হয়নি। এটুকু বেশ যেতে পারব।

চক্রবর্তী জিভ কেটে বললেন, আরে বাসরে! তা কি হয়? গ্রীষ্মকাল, জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ। একটা লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসুক।

অশোকের ইচ্ছা হল বলে, আপনিই আলো নিয়ে চলুন না মশাই? রোগা মেয়েটাকে না হয় নাই পাঠালেন!

এ রকম ইচ্ছা দমন করতে হয়। অশোকও করল। নেকি একটা আলো জ্বেলে নিয়ে তার সঙ্গে চলল।

বাগানের মাঝখানে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে নেকি বললে, অশোকবাবু, আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

অশোক হেসে বললে, মস্ত ভূমিকা, অনুরোধ ছোটো হলে চলবে না।

না, ছোটো নয়।

নেকি একটা ঢোক গিলল। আলোটা এমনভাবে ধরলে যে মুখ তার অন্ধকারেই রইল। একটু চুপ করে থেকে বললে, মামা যে জমির কথা বলছিলেন সেটা সত্যি সত্যি আমাদের। আপনার বাবাকে একটু বলবেন?

সম্মুখে সাপ দেখলে মানুষ যেমন চমকে ওঠে অশোক তেমনি চমকে উঠল।

অন্য অবস্থায় এ অনুরোধটা অশোকের কাছে এত কদর্য ঠেকত না। সরলভাবে নেকি যদি এই অনুরোধ জানাত অশোক মৃদু হেসে তাকে বিচারকের কর্তব্যের কথাটা বুঝিয়ে দিত। নেকির অজ্ঞতায় কৌতুক অনুভব করত। কিন্তু এ যে ষড়যন্ত্র! তাকে ভুলিয়ে আদর দিয়ে, যত্ন দিয়ে, নেমন্তন্ন করে খাইয়ে, শত রকমভাবে ঘনিষ্ঠতার বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করে এমনিভাবে এই নির্জন আমবাগানে এ অনুরোধ করার আর কোনো অর্থই তো হয় না! টাকা নয়, কিন্তু আদর-যত্নও তো ঘুষের রূপ নিতে পারে! হয়তো এই মেয়েটার রূপ—চক্রবর্তীর নিজের মুখে না জানিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জনে সুন্দরী তরুণীকে দিয়ে এ অনুরোধ করার আর কী মানে হয়? ঘৃণায় অশোকের অন্তর সংকুচিত হয়ে গেল। গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তোমার এ অনুরোধের অর্থ জান?

নেকির গলা কেঁপে গেল, আমরা বড়ো গরিব অশোকবাবু।

অন্য সময় এই কণ্ঠস্বর শুনলে অশোকের হয়তো করুণা হত, এখন হল রাগ। বললে, গরিব বলে তোমাদেব জন্য আমাকে অন্যায় করতে হবে নাকি?

অন্যায় তো নয়। জমিটা আমাদের। আমার কথা আপনার বিশ্বাস হয় না?

তিক্তস্বরে অশোক বললে, না হয় না। হলেও, জমি তোমাদের কি অন্যের, সে মীমাংসা হবে আদালতে, সাক্ষী প্রমাণ দিয়ে। তোমার অনুরোধ যে আমাকে আর আমাব বাবাকে কতদূর অপমান করতে পারে সে ধারণা তোমার নেই বলেই নিঃসংকোচে জানাতে পারলে।

নেকি কী বলতে গিয়ে সামলে নিল। একটা নিশ্বাস ফেলে বললে—চলুন।

থাক, তোমার আর কষ্ট করবার দরকার নেই।

নেকির মুখ দেখা গেল না, দেখলে অশোক ভয় পেয়ে যেত। বললে, অতিরিক্ত সাধুতা ফলাবেন না অশোকবাবু।

অহেতুক দংশন। অন্তরে জ্বালা ধরলে, কারণ যাই হোক, এই রকম যুক্তিহীন কথাই মুখ দিয়ে বাব হয়। অশোক কিন্তু তা বুঝলে না, বললে, সাধুতা-অসাধুতার তফাত বুঝবার ক্ষমতা তোমার নেই, তাই এ কথার জবাব দিলাম না। আমার সব চেয়ে বড়ো দুঃখ লীলা, ভগবানের দেওয়া রূপকে তুমি তুচ্ছ ঘুষের মতো ব্যবহার করলে।

অন্তরে ওই কথাটাই বড়ো যন্ত্রণা দিচ্ছিল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো বিঁধছিল ; অসতর্ক মুহূর্তে অশোকের শিক্ষা-দীক্ষা মার্জিত বুদ্ধি সকলের বাধা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল। এমন বিশ্রী শোনাল যে অশোক নিজেই চমকে উঠল।

নেকির হাত থেকে আলোটা পড়ে গিয়ে বার কয়েক দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলেই নিভে গেল।

পুলক ভয় পেয়ে গিয়েছিল, অশোকের একটা হাত ধরে বললে, বাড়ি চল দাদা।

বাড়ি? চল।

অশোক মনকে বোঝাল, নতুন একটা অভিজ্ঞতার সঞ্চয় হল, মন্দ কী! ফুলে যে কীট থাকে সে তত্ত্বটা তো জানাই ছিল! এবার থেকে সাবধান হওয়া যাবে। উঃ কীরকম জড়িয়ে বাঁধছিল! মুক্তি পেলাম, বাঁচা গেল!

মুক্তিও বটে, বাঁচাও বটে! দুটোর একটার চিহ্নও অশোক খুঁজে পেল না। বাঁধন খসেছে মনে করতেই বাঁধনে টান পড়ল। যা নেই বলে জানল, তারই টানে টানে পাকে পাকে হৃদয় ভেঙে পড়তে চায় দেখে অশোক চমকে গেল।

অশোক দেখে অবাক হয়ে গেল, নেকিকে সে যেভাবে ভাবতে চায় নেকি সেভাবে ধরা দেয় না। মনে হয়, তার বিতৃষ্ণা যেন তার চোখের সামনে কুয়াশা রচনা করে দিয়েছে, সেই কুয়াশার ভেতর দিয়ে নেকিকে সে নিষ্প্রভ দেখছে কিন্তু কুয়াশার ওদিকে নেকি তেমনি উজ্জ্বল হয়েই আছে।

অশোক ধরতে পারে না, কিন্তু তার মনে হয় কোথায় যেন ভুল হয়েছে। খোঁজে। হদিস মেলে না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে সে আগাগোড়া একবার ভেবে নিল। হঠাৎ ভুলটা ধরা পড়ে গেল।

চক্রবর্তী! হৃদয় চক্রবর্তী! ঠিক।

অশোক ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। মূর্খ, মূর্খ! নিতান্ত মূর্খ সে। সবটুকুই যে হৃদয় চক্রবর্তীর খেলা এটুকু বুঝবার ক্ষমতাও তার নেই! মামা আদেশ করলে তার কথা নেকি কেমন করে অস্বীকার করবে? আজ এক মাস যার সঙ্গে পরিচয়, যার চরিত্রের এতটুকু অংশ তার কাছে গোপন নেই, তাকে কী করে এতখানি হীন বলে সে মনে করল? নেকির তো বিন্দুমাত্র অপরাধ নেই! অশোকের বুক থেকে মস্ত একটা ভার নেমে গেল। বন্ধনের যে দড়িদড়াগুলো এতক্ষণ বেদনা দিচ্ছিল হঠাৎ সেগুলো হয়ে গেল ফুলের মালা।

খুব ভোরে ঘুম ভাঙতেই অশোক আমবাগানে চলে গেল। পুকুরধারে ঘাটের কাছে একটা তালগাছ কাত হয়ে পড়েছিল, তার গুঁড়ির ওপর বসে সরু বাঁকা পথটির দিকে চেয়ে রইল।

একগোছা বাসন হাতে নিয়ে ঝোপ ঘুরে পুকুরের তীরে এসে অশোকের দিকে নজর পড়তেই নেকি থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একরাত্রে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে। চোখ লাল, চোখের কোলে কালি। কাল বিকালে অতি যত্নে কবরী রচনা করেছিল, কার জন্যে—বুঝি কাল অশোকের খুশির সীমা থাকেনি। আজ সে কবরী বিশৃঙ্খল হয়ে গেছে।

অশোকের বুক টনটন করে উঠল। কাছে এসে বললে, লীলা, আমায় মাপ করো।

নেকির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। জবাব দিতে পারল না।

অশোক আবার বললে, আমি বুঝতে পারিনি লীলা। তোমার কোনো দোষ ছিল না।

ছিল না?

অশোক ভুল করলে, বললে, না। আমি জানি তোমার মামার জন্যেই—

আপনার পায়ে পড়ি অশোকবাবু, যে নীচ, ভগবানের দেওয়া রূপকে যে ঘুষের মতো ব্যবহার করে, দয়া করে তাকে নীচেই থাকতে দিন। বলে নেকি অগ্রসর হল, পথ ছাড়ুন।

অশোক পথ ছেড়ে দিল। তার অস্বাভাবিক বিবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে নেকি ঘাটে নেমে গেল।

পরদিন অশোক কলকাতা রওনা হল।

মাস তিনেক পরের কথা।

সকালে মার কাছ থেকে অশোক একখানা চিঠি পেলে। মা লিখেছেন, মাসখানেক ধরে তিনি জ্বরে ভুগছেন, খুব সম্ভব ম্যালেরিয়া ধরেছে। ডাক্তার চেঞ্জে যেতে বলেছেন, বাঁচি যাওয়া ঠিক হয়েছে।

অশোকের বাবার ছুটি নেই, রাঁচি পর্যন্ত যেতে পারবেন না। কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে তিনি ফিরে যাবেন, কলকাতা থেকে অশোককে সঙ্গে যেতে হবে। সে যেন প্রস্তুত হয়ে থাকে।

চিঠি পড়ে অশোক মিনিট পনেরো ভাবল, তারপর সুটকেস গোছাতে বসল। সেইদিন রাত্রের সিরাজগঞ্জ মেলে উঠে বসল।

মা বললেন, তোর আসবার দরকার ছিল না। আমরাই তো কলকাতা যাচ্ছিলাম। যাক, বেশ করেছিস।

অশোক মুখ নত করলে। কেন যে এল, সে প্রশ্নের বিরামহীন মহলা তো তার মনেই চলেছে! জবাব দেবে কী?

তোর কি কোনো অসুখ হয়েছিল অশোক?

অশোক ঘাড় নেড়েই প্রশ্ন করল, পুলকের স্কুল তো ছুটি হয়নি? ও কি এখানে থাকবে?

কথা ঘুরিয়ে নেবার জন্য ছেলের প্রয়াস দেখে মাব চোখে জল এল। বললেন, থাকবে? থাকবার ছেলেই বটে। আর জানিস, নেকি আমাদের সঙ্গে যাবে।

অশোক চমকে উঠল।

মেয়েটা একেবারে শেষ হয়ে গেছে রে! তুই থাকতেই ম্যালেরিয়া ধরেছিল, এখন কালাজ্বরে দাঁড়িয়েছে। অত্যাচারের তো সীমা ছিল না। জ্বর গায়ে কবার যে স্নান করত ঠিক নেই। কী চেহারা হয়ে গেছে! মা একটা নিশ্বাস ফেলে চলে গেলেন।

মার চেঞ্জে যাওয়ার আসল উদ্দেশ্য এবার আর অশোকেব কাছে গোপন রইল না।

নেকি অল্প অল্প হাঁটতে পারত, কিন্তু আমবাগান পার হয়ে আসবার আর ক্ষমতা ছিল না। মা পালকি নিয়ে গিয়ে নিজে তাকে নিয়ে এলেন। অশোক উঠানে দাঁড়িয়েছিল, পালকির খোলা দরজা দিয়ে তার দিকে চেয়ে নেকি ম্লান হাসি হাসল। রাগ নেই, দ্বেষ নেই, অভিমান নেই, সারারাত্রি ঝড়ের আঘাত সয়ে রজনীগন্ধার দল ভোরবেলা যেমন শ্রান্ত ক্লান্ত হাসি হাসে সেই রকম হাসি। অশোক মুখ ফিরিয়ে নিল।

নেকির পিসির অসুখ, চক্রবর্তীর তাই এই সঙ্গে যাওয়া হল না। পিসি একটু ভালো হলেই যাবেন। যাত্রা করবার সময় ভদ্রলোক হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন, অশোকের মাকে উদ্দেশ করে বিকৃত কণ্ঠে বললেন, আমার আর কেউ নেই মা, ওকে আপনি ফিরিয়ে আনবেন।

চক্রবর্তীর ওপর অশোকের বিতৃষ্ণার সীমা ছিল না, আজ তার মনে হল এর চেয়ে ভালো লোক বোধ হয় পৃথিবীতে নেই!

শহরের প্রান্তবাহী ছোটো নদীটি বর্ষার জলে ভরে উঠেছে। স্টিমারঘাট পর্যন্ত গাড়ি যায় না, নৌকোয় যেতে হয়। স্টিমারঘাট শহর থেকে মাইল পাঁচেক দূরে।

স্টিমারে উঠে নেকি কেবিনে ঢুকতে রাজি হল না। রেলিঙের পাশে ডেকচেয়ার পেতে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল। অশোক আর তার মা কাছেই বসলেন। নেকি একদৃষ্টে মেঘনার জলরাশির দিকে চেয়ে রইল। স্টিমার এক তীর ঘেঁষে চলেছে, ওপারের তটরেখা অস্পষ্ট। দু বছর আগে এই পথ দিয়েই সে একটা অতিপরিচিত জীবনকে পিছনে ফেলে দুরুদুরু বুকে অজানা অচেনা জীবনের মাঝে গিয়ে পড়েছিল। আজ আবার সেই পথেই কোনো নতুন জীবনের সন্ধানে সে চলেছে কে জানে! দেনাপাওনা হয়তো মিটবে না, ওপারের তটরেখার মতোই অস্পষ্ট অনুভূতি তাকে চিরন্তন জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে সে জীবনে যেতে মন হয়তো তার কেঁদেই উঠবে। কিন্তু যেতে বোধ হয় হবেই।

অশোক শুষ্ক বিষণ্ণ মুখে ডেকের পাটাতনের দিকে চেয়ে রইল। মা-ই কেবল মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বলতে লাগলেন। পুলকের এ সমস্ত উচ্চাঙ্গের সুখদুঃখের বালাই নেই, রেলিঙে ভর দিয়ে তন্ময় হয়ে সে ঢেউয়ের ওঠানামা দেখতে লাগল।

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে মা বললেন, তোরা গল্প কর অশোক, আমার ভারী মাথা ধরেছে, কেবিনে একটু ঘুমিয়ে নিই গে।

মা উঠে যেতেই অশোকের মুখের দিকে চেয়ে নেকি হাসল। যেন বলতে চায়, রাগ তো তোমারও নেই আমারও নেই, তবে কথা বলছ না কেন?

চেয়ারটা নেকির কাছে সরিয়ে এনে তার মুখের ওপর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে অশোক বললে, আমায় মাপ করেছ লীলা?

নেকি তেমনিভাবে হেসে বললে, মাপ করবার কিছু নেই, সে সব আমি ভুলে গেছি। তুচ্ছ ব্যাপারকে বড়ো করে দেখবার আর আমার শক্তিও নেই, সময়ও বোধ হয় নেই।

অশোকের চোখে জল এল, বললে, আমিই তোমায় শেষ করে দিলাম লীলা।

নেকি তাড়াতাড়ি বললে, না না, ও কথা বলো না। হঠাৎ আকাশের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, কতকগুলো সাদা পাখি কেমন সার বেঁধে চলেছে দ্যাখো! বক তো নয়।

অশোক দেখলে। বললে, না। বুনোহাঁস।

হাঁস? ওমা! এ আবার কী রকম হাঁস! আচ্ছা ওরা দল বেঁধে কোথায় চলেছে? বেড়াতে বেরিয়েছে বুঝি?

অশোক বুঝলে, একেবারে নেকির পাশে সরে গেল। নেকির একখানা হাত নিজের হাতের ভেতর গ্রহণ করে বললে, ওদের তো বাড়িঘর নেই, ওরা বেড়িয়েই বেড়ায়। তুচ্ছ কথার অন্তরালে অনাড়ম্বর চেষ্টায় এতদিনের বিচ্ছেদের সংকোচ মুছে ফেলাই সব চেয়ে সহজ।

সত্যি? বাড়িঘর না থাকা কিন্তু বেশ! না?

বাতাসে একরাশি রুক্ষ চুল নেকির মুখের ওপর এসে পড়েছিল। অশোক সযত্নে চুলগুলো সরিয়ে দিলে। আরামে নেকির চোখ বুজে এল। নিঃশব্দে অশোকের আঙুলের মৃদু স্পর্শটুকু সমস্ত মন দিয়ে উপভোগ করে চোখ মেলে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে লজ্জিত সুখের হাসি হেসে বললে, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই?

ঘুমোও।

নেকির হাতখানি হাতের মুঠোতেই ধরা রইল। নেকির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নীল আকাশের বুকে সঞ্চরণশীল শ্বেতচন্দনের ফোঁটার মতো গতিশীল বুনোহাঁসগুলোর দিকে চেয়ে রইল।

শ্রাবণের আকাশ, কিন্তু মেঘ নেই। ওপারের অস্পষ্ট তটরেখা অস্পষ্ট হয়েই রইল।

অশোক মনে মনে বললে, তাই থাক। যে তীর ঘেঁষে চলেছি সেই তীর স্পষ্টতর হোক, উজ্জ্বলতর হোক, ওপারের তটরেখা আরও অস্পষ্ট হয়ে মিলিয়ে যাক।

বৃহত্তর মহত্তর

আমাদের পাড়া থেকে উঠে যাওয়ার তিন বছর পরে একদিন নগেনের সঙ্গে পথে দেখা হল। লোকটার চেহারার না হোক, পোশাকের খুব উন্নতি হয়েছে দেখলাম। মাথায় চকচকে টেরি, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে কোঁচানো শান্তিপুরে ধুতি, পায়ে চকচকে ডার্বি। হাতে আবার একটা রিস্টওয়াচ বাঁধা!

একগাল হেসে পরমাত্মীয়ের মতো বললে, রেস্টুরান্টে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, পকেটে হাত দিয়ে দেখি মনিব্যাগটা ভুলে এসেছি। এমন খিদে পেয়েছে ভায়া!

আশেপাশে শুধু দেশি খাবারের দোকান ছিল ; বললাম, খাবার খাবেন?

অগত্যা! বলে সে একটা বিড়ি ধরাল। সঙ্গে করে তাকে খাবারের দোকানে নিয়ে গিয়ে বসালাম। সে নিজেই এটা ওটা ফরমাশ করল, আমি তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে টাকা তিনটে আর একবার গুনে নিলাম। জিজ্ঞাসা করলাম, দিদি কেমন আছে?

জানি না, বলে সে একটা রসগোল্লা গিলে ফেললে।

জানেন না মানে?

মানে আমায় কলা দেখিয়ে শালি ভেগেছে চারমাস!

আমি নীরবে উঠে দাঁড়ালাম। যাবার জন্য পা বাড়াতেই সে ব্যাকুল হয়ে বললে, চললেন যে?

সে কৈফিয়তে আপনার প্রয়োজন?

এহেঃ, চটেন কেন! খাবারের দামটা দিয়ে যান। আমার কাছে একটাও পয়সা নেই। মাইরি বলছি। কালীর দিব্যি।

দাম? দাম আমি জানি না, বলে পা বাড়ালাম।

সে উঠে এসে কাঁদোকাঁদো হয়ে বললে, এ কোন দেশি ঠাট্টা ভাই? বিপদে ফেলে পালাতে চান কীরকম? প্রতিজ্ঞা করছি আর খারাপ কথা বলব না। খুব সম্মান করে কথা কইব। কী জ্বালা, আপনার পায়ে পড়ছি দাদা, হল?

আমি ফিরলাম। সে আবার খেতে আরম্ভ করে অনুযোগের সুরে বললে, রাগের মাথায় একটা বেফাঁস কথা বার হয়ে গেছে বলে কি এমন করতে হয় রে দাদা! মাইরি আমার বুক কাঁপছে এখনও।

কাঁপুক। চট করে বলুন দিদির কী হয়েছে?

সে অনেকক্ষণ ধরে যা বললে তার সংক্ষিপ্ত মর্ম এই : মাস চারেক আগে একদিন সকালে উঠেই মমতাদি বললে, আমি বিদায় হলাম। এ জীবনের ক্ষুদ্রতা আমার সইছে না। আমি মহত্তর বৃহত্তর জীবনে সার্থকতা খুঁজতে চললাম। বলে নগেনকে কথাটি কইবার (অর্থাৎ চুলের মুঠি ধরে আটকাবার) সুযোগ না দিয়েই ফস্ করে চলে গেল। নগেন প্রথমটা ভেবেছিল সে বুঝি আমায় ভর করেই অকূলে ভাসল। (এইখানে সে হাত জোড় করলে, পাছে আমি রাগ করি।) শেষে শুনলে, তা নয়, কী একটা নারী-সমিতিতে যোগ দিয়ে সে দেশের কাছে লেগেছে। চরকা ঘোরায়, ছোটো ছেলেমেয়েদের পড়ায়, বাড়ি বাড়ি মেয়েদের কাছে স্বদেশি প্রচার করে। এ কথা জেনে আমাকে মিথ্যা সন্দেহ করার জন্য দুঃখে লজ্জায় অনুতাপে—

আমি চুপ করে বসে রইলাম, সে আমার কানের কাছে দুঃখলজ্জা অনুতাপের জ্বলন্ত বর্ণনা করে চলল। আমি খানিক শুনলাম, খানিক শুনলাম না, শেষটা কিছুই শুনলাম না।

উদ্‌গারের শব্দে সচেতন হয়ে দেখলাম, তার খাওয়া ও বক্তৃতা শেষ হয়েছে। পুনরায় উদ্‌গার তুলে বললে, আর খাব না, দামটা দিয়ে দিন।

দিচ্ছি। এত ঘটা করে সাজ করেছেন কেন বলুন তো? দিদির শোকে না কি?

কালো দাঁত বার করে সে হাসল, আরে রামো, সে বৃহত্তর মহত্তর জীবনে সার্থক হতে গেছে তার জন্যে শোক কী! আবার বিয়ে করে ফেলেছি কি না—বুঝলেন না? দুটো পয়সা দিন তো, পান কিনব।

আমার হঠাৎ ইচ্ছা হল খাবারের দাম না দিয়ে চলে যাই; দোকানির হাতের অনেক মিষ্টি খেয়েছে, একটু প্রহারও খাক। কষ্টে সে সংগত ইচ্ছা সংযত করে দাম মিটিয়ে দিলাম। পান খাবার পয়সা দিয়ে নারী-সমিতির নাম টুকে নিয়ে পথে নেমে গেলাম। পথে মানুষের ভিড়। আমার মনে হল, একই পথ বেয়ে আমিও চলেছি এত লোকও চলেছে কিন্তু প্রত্যেকের মনোবেদনার উৎস কত বিভিন্ন! এতগুলো চিন্তা-জগতের একটিতেও কি মমতাদির মতো কেউ নীরব দুঃখের পদচিহ্ন এঁকে চলেছে?

নারী-সমিতিটির খোঁজ করে সম্পাদিকার সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি জানালেন মমতাদি মাঝে একমাস জেল খেটেছে এবং আবার জেলে যাবার জন্য বাড়াবাড়ি আরম্ভ করায় তাকে মফস্বলে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে। এই সমিতির কাজ গঠনমূলক, ধ্বংস এর কর্মীদের ব্রত নয়, মমতাদিকে নিয়ে সম্পাদিকার বড়ো মুশকিল।

পরদিন আমি মমতাদি যে গ্রামে ছিল সেখানে গেলাম। কলকাতা থেকে চার পাঁচ ঘণ্টার পথ। বেশ বড়ো গ্রাম। গ্রামের পাশে একটা নদী। খোঁজ করে, শোভার প্রাচুর্যে নদীতীর যেখানে আপনাতে-আপনি মুগ্ধ হয়ে আছে সেইখানে একটি ছোটো টিনের বাড়িতে মমতাদির দেখা পেলাম। মমতাদি এবং তার সঙ্গিনীদের জন্য গ্রামের কে এক সদাশয় ব্যক্তি এই বাড়িখানা ছেড়ে দিয়েছিলেন।

তখন দুপুর। শরতের প্রথম হলেও রোদের তেজ ছিল। সদরের বারান্দায় উঠে দাঁড়াতে চার-পাঁচটি চরকার শব্দ শুনতে পেলাম। মমতাদিকে ডাকতে চরকা থেমে গেল, সে বেরিয়ে এল।

হেসে বললে, এসেছ? আমি জানতাম খোঁজ পেলে তুমি আসবেই, দু-এক ঘণ্টা তর্ক করবেই! তোমার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

তর্ক করব নিশ্চিত জান?

জানি। যে কাণ্ড করেছি, তর্ক না করে তুমি ছাড়বে?

যদি না করি তর্ক?

বিস্মিত হব! ভেবে পাব না বাঙালি হয়েও তর্কের এমন সুযোগ কী করে ত্যাগ করলে। কিন্তু তুমি করবে। তোমার চোখে-মুখে তর্ক উঁকি মারছে। অন্তত আলোচনা।

নদীতে নেমে মুখ-হাত ধুয়ে আমি বারান্দায় মাদুরে বসলাম। সেও বসল, অর্ধেক মাদুরে অর্ধেক মাটিতে। মেয়েরা অমনিভাবে বসে, বিনয়ের লক্ষণ ওটা। কথা আরম্ভ হওয়ার আগে আমি একবার ভালো করে তার মুখ দেখে বুঝবার চেষ্টা করলাম, এ জীবনে সে সুখী হয়েছে কিনা। কিছুই স্পষ্ট বোঝা গেল না। আগের জীবনে সে অসুখী ছিল কিন্তু মুখের একটু ম্লানিমা দেখে তার অসুখের পরিমাণ স্থির করা যেমন সম্ভব ছিল না, আজ সেই ম্লানিমার অন্তর্ধান এবং দেহে স্বাস্থ্য ও চোখে-মুখে একটা শান্ত জ্যোতির আবির্ভাব দেখে বোঝা গেল না সে কতখানি সুখী হয়েছে। বিশেষ, মাঝে মাঝে তার দৃষ্টিতে ব্যথার বিকাশ দেখা যেতে লাগল।

সে প্রশ্ন করল, তুমি কি আমাকে সমর্থন কর না?

আমি বললাম, ঠিক জানি না। ইচ্ছা হয় সমর্থন করি, কিন্তু বাধা পাই। তোমার সিদ্ধান্তে অনেক জটিলতা, সহজে মেনে নেওয়া কঠিন। তোমায় আমি চোখ বুজে সমর্থন করতাম যদি—

যদি?

যদি তোমার দেশপ্রেম নিজের তেজে স্বামী-পুত্রের প্রেমকে ছাপিয়ে যেত, যদি রাগ আর অভিমানের ভেজাল না থাকত।

সে হাসল। বললে, তাপসী নই, মন নির্বিকার নয়। ভেজাল হয়তো আছে। কিন্তু তুমি যে রাগ আর অভিমানের কথা ভাবছ তার ভেজাল নেই। তুমি ভাবছ আমি ঝগড়া করে ঝোঁকের মাথায় চলে এসেছি। তা সত্যি নয়। সে ভয় আমারও ছিল। কতদিন ধরে চেষ্টা করে আমি বাড়ি ছাড়তে পেরেছি জান? ছ-সাত মাসের বেশি। রাগের মাথায় চলে এসেছি ভেবে পরে পাছে আমার অনুতাপ হয় এই ভয়ে যখনি সে বেশি রকম খারাপ ব্যবহার করত আমি গৃহত্যাগের সময় পনেরো দিন পিছিয়ে দিতাম। প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে অন্তত পনেরোটা দিন যখন রাগের কোনো কারণ উপস্থিত হবে না তখন বাড়ি ছাড়ব, তার আগে নয়। এই প্রতিজ্ঞা বজায় রাখতে গিয়ে, আসবার জন্য পা বাড়িয়ে থেকেও ছ-সাত মাস আসতে পারিনি। শেষের দিকে হতাশ হয়েই পড়েছিলাম যে একবারও খিটিমিটি বাধবে না এমন পনেরোটা দিন এ জীবনে আসবে না। কিন্তু হঠাৎ তার কঠিন অসুখ হল—

সেই সুযোগে চলে এলে!

সে হাসল।—শোনোই আগে, পরে মন্তব্য প্রকাশ করবে। তার তো অসুখ হল, আমি নাওয়া-খাওয়া ঘুম সব ছেড়ে দিয়ে এমন সেবাটাই করলাম যে অসুখ ভালো হওয়ার সঙ্গে সেও কিছুকালের জন্য ভালো হয়ে গেল। ঠিক বিয়ের দিনগুলি যেন ফিরে এল—এত আদর, এত সোহাগ, এত ভালোবাসা! পনেরো দিন হঠাৎ সদয় অদৃষ্টের দান ভোগ করে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমি চলে এলাম। রাগ করে এসেছি আমি? ঝগড়া করে এসেছি? তা আর বলতে হয় না।

তবে এলে কেন?

না এসে চলল না তাই।

তার মানেই তুমি হার মেনেছ। নগেনবাবুর সঙ্গে যে বাজি রেখেছিলে তাতে তোমার হার হয়েছে।

কীসের বাজি?

মনে নেই? একদিন বলেছিলে সে নিছক স্বামী, বিধাতা নয়। চোখ বোজার আগে তোমায় বাড়ি-ছাড়া করার সাধ্য তার নেই, নেই, নেই।

নেই তো! আমায় কেউ বাড়ি-ছাড়া করেনি, আমি নিজে এসেছি। শুধু স্বামীকে সইতে না পেরে চলে আসব আমি কী তেমন মেয়ে? নই, নই, নই। এগারো বছর ধরে তার অবিচার অত্যাচার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল—সে জন্য নালিশ করতেও আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া স্বামী কি সারাদিন অত্যাচার করে? চব্বিশ ঘণ্টায় দিন, ক ঘণ্টা মানুষের নিষ্ঠুরতায় ধৈর্য থাকে? যদি কোনো বইয়ে পড়ে থাক অত্যাচারী স্বামীর কথা, জানবে লেখক শুধু চব্বিশ ঘণ্টার গোটা একটা দিনের আধঘণ্টার হিসেব দিয়েছে, বাকি সময়টা চালাকি করে রেখে দিয়েছে নেপথ্যে! ওই বাকি সময়টা স্নেহ-ভালোবাসায় বোঝাই না হয়ে একদম ফাঁকা হতে পারে—কিন্তু ও সব ফাঁক সংসারী মেয়েমানুষের সয়। শুধু স্বামী যার অবলম্বন, সপ্তাহে একটিও মিষ্টি কথা না শুনলে তার অসহ্য ঠেকতে পারে, আমার তো একমাত্র স্বামীই ছিল না জীবনে অবলম্বন! শুধু স্বামীর হিসাবে অভাগিনি হলে অভাগিনি হয়েই আমি থাকতাম ভাই। তার হীনতা যদি শুধু আমার প্রতি অন্যায় করে নিরস্ত থাকত, যদি আমার বর্তমান জীবন এবং ভবিষ্যতে যে জীবন পৃথিবীতে রেখে যাব সমস্ত গ্রাস না করত, আমি মুখ

বুজে তার সংসার ঘাড়ে করে মরতাম। সুখ শান্তির অভাব আমায় কাতর করত না, অনাহার, অনিদ্রা, প্রহার, নির্যাতন উপেক্ষা কিছুই মুছে নিতে পারত না মুখের হাসি। জীবনের আংশিক সফলতা পেলেই আমি তুষ্ট থাকতাম। কিন্তু তা হল না। কতক স্বামীর জন্যে কতক পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভিশাপে সমগ্রভাবে আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম—সম্পূর্ণভাবে আমার জীবন হল অকারণ অর্থহীন। স্বামী নয়, দুঃখদুর্দশা নয়—ব্যর্থ বেঁচে থাকাটা আমার সইল না। আমার আত্মা আর্তনাদ আরম্ভ করে দিল।

সতিনের ভয়ে?—বলে আমি খোঁচা দিলাম।

সে চমকে উঠল। সতিনের ভয়ে আত্মার আর্তনাদ? সতিন? সতিন হয়েছে না কি এর মধ্যে? স্ত্রী ছাড়া তার চলবে না জানতাম, কিন্তু এত শিগগির! আমার পায়ের আলতার দাগ এখনও বোধ হয় ঘরের মেঝে থেকে মুছে যায়নি। আমি কি তার ঘরের এতখানি স্থান জুড়ে ছিলাম যে বিশাল ফাঁকটা সইল না, তাড়াতাড়ি পূর্ণ করতে হল?

নালিশ! ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ অভিযোগ! মনে হল, অভিমানও জেগেছে—ঈর্ষার বসন-পরা অবুঝ অভিমান। মুখে একটা কালো ছায়া ভেসে এসেছে, দুচোখে ঘনিয়েছে ব্যথা। দেখে আমার বিশেষ ভালো লাগল না। মুখে সমর্থন করি আর না করি মনে মনে তার মানবীত্ব ঘুচিয়ে তাকে দেবীর মতো জ্যোতির্ময়ী করে তুলেছিলাম—দধীচি থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সংখ্যাহীন জ্যোতিষ্ক যে-জ্যোতির সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে মানষের। মানবতার ছায়াপাতে মমতাদির সে ভাস্বর মূর্তি কল্পনার নেপথ্যে হঠাৎ যেন ম্লান হয়ে গেল।

বললাম, এবার আমার পুরো অসমর্থন মমতাদি! ছলনা করেছ নিজেকে। ভেবেছ কর্তব্য ত্যাগ বুঝি সত্যি ত্যাগ। দুঃখের কাছে হার মেনে তুমি পালিয়েছ কর্তব্য পিছনে ফেলে!

সে বললে, কর্তব্য মানে? স্বামীসেবা? তনুমন দিয়ে তনু পরিচর্যা? শিক্ষা তোমায় উদার করেনি দেখছি! এই নারী-বিদ্রোহের যুগে ও কী কথা বলছ তরুণ? কোন যুগের মানুষ তুমি?

—এ যুগের। আমায় টেনো না। আমার শিক্ষা অতি অনুদার। উদার শিক্ষা কোথায় পাব? নচিকেতার মতো যমের বাড়ি না গেলে আর সে শিক্ষা জুটছে না। দুঃখ এই যে যম আমায় বাড়ি ফেরার জন্য ছেড়ে দেবে না। কিন্তু তনু-পরিচর্যার নালিশ পুরোনো, পচা। নিজেই বলেছ ও জন্য বাড়ি ছাড়নি। একটা অমানুষের মঙ্গল যে করতে পারল না, নিজের লোকের অত্যাচার সইতে পারল না, লক্ষ মানুষের মঙ্গল করার শক্তি সে কোথায় পাবে, পরের অত্যাচার সয়ে কী করে ব্রতরক্ষা করবে?

—লাখো মানুষের আশীর্বাদের জোরে। কিন্তু তোমার যুক্তিটা বেশ! লজিকের এই ফ্যালাসির মতো—মানুষ অমর নয়, বানর অমর নয়, অতএব মানুষ বানর। একের সঙ্গে লাখের তুলনা চলে? যে বক আঁকতে পারল না, সাহিত্যিক হয়ে সে মানুষের সৃষ্টি করতে পারবে না এ কথা বলা যায়? একটিমাত্র রত্নাকরের মঙ্গল করে গেলে সে একদিন বাল্মীকি হয়ে উঠবে এমন আশা করা বোকামি। কিন্তু এ আশা অনায়াসেই করা যায় লাখের মধ্যে হাজার বাল্মীকি ঘুমিয়ে আছে! গণ্ডি ছোটো হলেই যে ভালো কাজ করা যাবে তার মানে নেই! বাড়ির বউ সমস্ত বাড়ি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে পারে—কিন্তু বাড়ির সবচেয়ে ছোটো ঘরটি পরিষ্কার করার জন্য ডাকতে হয় মেথরকে। আমি চেষ্টা করিনি ভেবেছ? এগারো বছর চেষ্টা করেছি। কিন্তু ঘরের পাকা মেঝেতে আমার চেষ্টার লাঙল আঁচড় কাটতে পারেনি—ফসল ফলাব কী! তাই এসে দাঁড়িয়েছি এই বিস্তীর্ণ মাঠে। যত আগাছা থাক মাটি যত শক্ত হোক, অল্প একটু স্থান পরিষ্কার করে আবাদ করতে পারব না? বাকি জীবনের চেষ্টায় একটু সোনা ফলবে না? পারব—ফলবে। সে থামল। একটু ভেবে বললে, এই কথাটা আমি ভাবতাম।

রাত্রিদিন ভাবতাম। স্বামী আমার কাছে ছোটো নয়—তুচ্ছ নয়—কিন্তু পর। সব স্বামীই পর—নিজের চেয়ে মানুষের আপনার কেউ নয়—প্রেমে নয়, স্নেহে নয়। প্রেম দুটি আত্মাকে কাছে আনে কিন্তু আত্মগত আত্মার চেয়ে কাছে-আসা আত্মার দূরত্ব বেশি। তাই আমি ভাবতাম যে, শুধু পরের কল্যাণেই বেঁচে থাকব, আমার আত্মার কল্যাণ নেই? আমার জীবন তাদেরই কল্যাণে ব্যর্থ হবে যাদের কল্যাণ হয় না? সবাই পরের জন্যেই অবশ্য বেঁচে থাকে, কিন্তু নিজের জন্য আহরণ করে ওই বেঁচে থাকার সার্থকতাটুকু। ওরই নাম নিজের আত্মার কল্যাণ। নিজেকে দিলাম কিন্তু দেওয়াটা মিথ্যা হল না, এইটুকু। অন্যায়ের বিনাশের জন্য দধীচির আত্মদান—ইন্দ্র বজ্র নিয়ে খেলা করবে বলে নয়। আমি দধীচির মেয়ে নই। যদি হইও দধীচির মেয়ে, আমার অস্থির বজ্র নিভে গেছে। একটু তাপ শুধু আছে নেভা বজ্রের ভস্মে। সেইটুকু যদি বরফের ঘর গরম রাখতে ব্যয় করে যেতাম, মরবার সময় অপচয়ের স্মৃতিতে আমার আত্মা দগ্ধ হত। আজীবন স্বামী-সেবার পুণ্যও পুড়ে হত ভস্ম! কারণ, সারা জীবন চোখ বুজে কাটিয়ে মরবার সময় আমি চোখ মেলে দেখতাম দুর্লভ জীবন কার পূজায় কাটল। তখন জীবনব্যাপী দানব-পূজার আপশোশ নিয়ে আমায় পরলোকে যেতে হত। আপশোশ নিয়ে মানুষ কোন পরলোকে যায় জান? নরকে।

আমি বললাম, এটুকু বুঝলাম। কিন্তু আসল কথা এখনও বলিনি। তোমার তো শুধু স্বামী নয়, দুটি ছেলে।

সে সংশোধন করে বললে, দুটি না, ছটি। চারটি স্বর্গে গেছে। দুটি গর্ভের অন্ধকার থেকে, দুটি পৃথিবীর আলো দেখে। না, দুটিই আলো দেখে নয়, একটি অন্ধ হয়ে জন্মেছিল।

এ বারতায় ব্যথা ছিল, আঘাত ছিল, আমাদের শিশু জগতে স্থায়ী মড়ক আছে সে কথা শুনেছিলাম। শুনেছিলাম মানে দৈনিক অথবা মাসিকে পড়েছিলাম। শুধু পড়েছিলাম। কখনও ভেবে দেখিনি শিশুর মরণের শেষ শিশুর মরণে নয়, মমতাদির মতো অসংখ্য মাতার মর্ম-বেদনায়। জগতে যার বাড়া মর্ম-বেদনা নেই।

সে বললে, তুমি ভাবছ এতক্ষণ ব্রহ্মাস্ত্র তুলে রেখেছিলে, ছেলে দুটির কথা তুলে আমাকে কাবু করবে। ছেলেই বটে! বড়ো ছেলের বয়স বারো—মনের বিকৃতিতে বারো শো। সে চোর, তাড়িখোর, কুটিল, রাগি, বোকা, অলস। ছোটোটিও অমনিভাবে গড়ে উঠছে—দুজনেই একদিন বাপের মতো হবে।

অত খারাপ? বলে আমি জিভ কাটলাম।

সে বললে, জিভ কেটো না। সারা জীবন কথা কইতে হবে—এখন জিভ কাটা গেলে মুশকিল। নিজেই স্বামীনিন্দে জুড়েছি, তোমার কথায় আর কত ব্যথা পাব? আমার ছেলে দুটি বাপের মতো অত খারাপ যদি নাও হয়, যেটুকু হবে তাতেই প্রকাণ্ড অমানুষ হবে। সদ্‌গুণে বোঝাই হয়ে করবে ত্রিশ টাকার কেরানিগিরি—তাতেই অধিকারী হবে স্ত্রী-পুত্র সংসারের। দশ বছরে দশটা কুকুর-ছানার বাপ হবে—অকালমৃত্যু এড়াতে পারলে যারা বড়ো হয়ে দশ দশে একশোটা শূকর-ছানা পৃথিবীকে উপহার দেবে। অবিশ্বাস করছ? পৃথিবী এমনি করে ভারাক্রান্ত হয় ভাই—একটা গলিত আত্মায় হাজার হাজার গলিত আত্মার বীজ কিলবিল করে। এই জন্যে যিশু বলেছিলেন, একটি পাপী স্বর্গের দিকে মুখ ফেরালে স্বর্গরাজ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। একটি মানুষ থেকে মানবজাতি হয়েছে—কে বলতে পারে একটি পাপী থেকে একদিন একটা বিরাট পাপীর জাতি পৃথিবীতে দেখা দেবে না? একটি অমানুষের মধ্যে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংসের সম্ভাবনা নিহিত আছে। অমনি অমানুষ হয়ে উঠছে আমার ছেলেরা! দশ মাস দেহের মধ্যে বয়ে বেড়িয়েছি, নিজের রক্তে পুষ্ট করেছি, দিনের পর দিন বুকে নিয়ে পালন করেছি, স্নেহ করেছি, ভালোবেসেছি, জগতের দুটি অভিশাপকে। জ্ঞানের আলোয় নিজের এই মহৎ দুষ্কর্ম চিনে আমি পালিয়ে এসেছি। পাপে আমার বিরাগ, ব্যর্থতায়

অরুচি। প্রাণপাত সেবায় দেশের বুকের পাথরকে পাহাড় করে তোলা পাপ। ......তোমার দুচোখে প্রতিবাদ কেন? সংস্কার কি তোমাব পাপ আর ব্যর্থতার স্বরূপ ভুলিয়ে দিচ্ছে?

আমি বললাম, না। তোমার কথাগুলি এত ছোটো-বড়ো কথাব চুম্বক যে হঠাৎ শুনে ঠিক মতো ধারণা করে উঠতে পারছি না।

সে বললে, সেটা আশ্চর্য নয়। বিয়ের পর থেকে এগারো বছর শুধু তো জ্বলিনি--তিল তিল করে চিন্তার হিমালয় সৃষ্টি করেছি। আমার কথা তোমার চিন্তাশক্তিকে পীড়ন তো করবেই। এগারো বছরের ভাবনা কি দু মিনিটে ভাবা যায়? আমি বললাম, বুদ্ধি থাকলে যায়, বোকা হলে যায না। আমি সময়মতো ভাবব। তুমি বলে যাও, আমি আরও কিছু ভাবনাব খোরাক সংগ্রহ করি।

সে বললে, ভেবো। ভেবে দেখ আমি বাড়িয়ে বলিনি, অবস্থা বিশেষে মা হওয়া সত্যিই মহাপাপ, মহৎ ব্যর্থতা। তুচ্ছ পযসা দিয়ে কেনা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষা অন্যায, দুর্ভাগ্য ; —শরীরের রক্ত খাইয়ে সাপ পোষা কত বড়ো অন্যায়, কত বড়ো দুর্ভাগ্য? আবার, এই শোচনীয় কৌতুক একমাত্র মাযেব অদৃষ্টে। স্বামীব কাছে জীবনেব একটি স্ফুলিঙ্গ ভিক্ষা পেযে তিল তিল করে বাড়িয়ে জননীকেই জ্বেলে দিতে হবে একটি সম্পূর্ণ জীবনেব চুল্লি—যদি সে চুল্লিতে জগতের কল্যাণে যজ্ঞ করা যায় গৌরব জননীব, যদি তাব আগুনে গৃহদাহ হয় কলঙ্কও জননীব। মায়ের দায়িত্ব এত বড়ো ভাই! তাই পৃথিবীব দুটি গলগ্রহ সৃষ্টি করে আজ আমাব অসীম অনুতাপ। আমার মাঝে মাঝে ভয় হয় দেশ আমার সেবা নেবে না। অসুস্থ দেশের মুখে যে দু ফোঁটা বিষ ঢেলে দিয়েছি সে অপরাধ ভুলবে না। এ চিন্তাব দাহে আমাব শুধু খেপে যাওযা বাকি আছে। ভগবান আজ যদি ওদেব কাছে টেনে নেন, তবে বোধ হয—তবে বোধ হয—

ভগবানেব নাম নিয়ে মার মুখে সন্তানেব মৃত্যুকামনা। এই অস্বাভাবিক ভীষণ মহত্ত্বে আমি চমকে গেলাম। নিজেব অসমাপ্ত উক্তির প্রহারে সেও কেঁদে ফেলল। আমি বুঝলাম এ কান্নার অর্থ কী। অভিশাপেব প্রত্যাহাব। মুখেব কথা নয়, ভগবান যেন মনের কথাটাই কানে তোলেন এই নিবেদন।

সূর্যালোকে নদীতে ঢেউগুলি চমকাচ্ছিল, তীর ঘেঁষে চলেছিল একটি পানসি। বুড়ো মাঝি লগি ঠেলছে, ছেলে কোলে একটি মেয়ে তীরের শোভায় মুগ্ধ হয়ে বসে আছে, একটি দুরন্ত ছেলের হাত শক্ত করে ধবে। কিছু দূরে নদীব বাঁক, সে পর্যন্ত আমি নৌকোব জননীটিকে অনুসরণ কবলাম। ততক্ষণ কাছেব জননী শান্ত হয়েছে।

বললাম, এ ভাবে চবমে উঠলে আমাদেব আলোচনা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।

সে ম্লান হেসে বললে, চরম কীর্তির আলোচনায চরমে না উঠে উপায়?

বললাম, তুমি শুধু ইঙ্গিত কর, বাকিটা আমি অনুমান কবব। নরকের অন্ধকাব আর স্বর্গের জ্যোতি টেনে আনলে দুটোই চোখকে খোঁচা দেবে, অসুস্থ কববে। আমরা পৃথিবীর মানুষ আমাদেব মাঝামাঝি রফা হওয়াই ভালো।

ভীরু! বলে সে হাসবার চেষ্টা করলে।

আমি বললাম, নিঃসন্দেহে। কিন্তু আর সমালোচনা নয়। যত রেখে ঢেকেই বল অপমানিত হব। তোমার কথাই হোক। তুমি যা বললে তাতে একটা প্রকাণ্ড মুশকিল আছে। বোধ হয় সে মুশকিলের অবসানও নেই।

কী মুশকিল?

আমার মতো ভীরু অকর্মণ্য থেকে আরম্ভ করে তোমার ছেলেদের মতো চোর-ছ্যাঁচোড়কে জন্ম দিতে সবাই যদি তোমার মতো অস্বীকার করে, দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল ভেঙে পড়বে। দেশটা তখন জন্মাবে কোথায়?

জন্মাবে না!

শুনে আমি থ বনে গেলাম। সে বললে, ভড়কে গেলে দেখছি। দুর্ভাবনার কারণ নেই। দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকের দেয়াল কি আমার মতো মায়েরা? দেশ কি জন্মায় কেরানি আর অপদার্থ ধনীর ঘরে? শহরের বিষপান করে যে কটি মানুষ জ্ঞান হারিয়েছে তাদের বাড়িতে? কলকাতাতেই অগুনতি ডালিম বেদানা,—আইন করে তাদের সকলকে হত্যা করলে কলকাতার নারী-সমাজের কী আসবে যাবে? বরং লাভ হবে—ক্ষতি নয়। আমার মতো মায়েরা মা হতে অস্বীকার করলে সূতিকাঘরের অনাবশ্যক ভিড় কমবে, দেশের উপকার হবে। গান্ধারীর সংযমে কুরুক্ষেত্রের কলঙ্ক রদ হবে। ঘরের মানুষের সঙ্গে লড়াই করে ধর্মকর্মের শক্তিক্ষয় হবে না,—জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম জগতে ছড়িয়ে পড়ার সময় পাবে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কর্মী জগতের স্বাধীনতা মুহূর্তে অর্জন করবে। দুর্যোধনকে সজুত রাখতেই যুধিষ্ঠির আর অর্জুনের সময় ও শক্তি ব্যয়িত হলে গান্ধারীর কী লজ্জা ভাই? সহজ লজ্জায় কি মা হয়ে ছেলেকে বলেছিল, তোমার নয়, ধর্মের জয় হোক।

আমি বললাম, তবে বললে কেন—দেশ জন্মাবে না? কথাব সুরে মনে হল দেশ না জন্মালে ক্ষতি নেই।

সে বললে, ও যদির কথা। আমরা মা না হলে যদি দেশের সূতিকাঘরের সাড়ে তিনদিকে দেয়াল সত্যি ভেঙে পড়ে। জন্মানোটাই কি দেশের চরম সৌভাগ্য? না জন্মানোটা দুর্ভাগ্য? কত দেশ গেছে সমুদ্রের তলে, কত জাতির চিহ্ন লুপ্ত হয়েছে। সে জন্য কে তাদের দোষ দেয়? অবসানের দুঃখ কী? মৃত্যু যদি মানুষের লজ্জা না হয়, মানুষে-গড়া জাতির মৃত্যুতেও লজ্জা নেই। ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে বরং মরণ ভালো।

আমি বললাম, এ সব হতাশার বাণী, ভুল কথা। মৃত্যুতে মানুষের লজ্জা নেই, কারণ মৃত্যু যবনিকা নয়, পটপবিবর্তন। নিজের জীবন মানুষ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে জমা করে রেখে যায়, স্বর্গে নিয়ে যায় না।

জমা করা জীবন যখন পচে যায়? একমাত্র নোয়া-কে বাঁচিয়ে প্রলয়ের মধ্য দিয়ে যখন ভগবান ভ্রম সংশোধন করতে বাধ্য হন?

তখন ভগবান অত্যাচারী খেয়ালি। প্রলয় যে এনে দিতে পারে সে সংস্কারে অক্ষম হবে কেন? জীবনের রোগ আছে, ফাঁসি ছাড়া আরোগ্য নেই? ক্রমাগত রোগে ভোগার চেয়ে মরণ ভালো, কিন্তু রোগ সারিয়ে বেঁচে থাকা আরও ভালো।

সে মৃদু হাসল, তোমার হল কী? আমি পুবে পা বাড়াচ্ছি, তুমি হাঁকছ পশ্চিমে যাত্রা নাস্তি। সুস্থ সবল হয়ে বাঁচা মন্দ আমি তা বলিনি। বলেছি, লয় অপরাধ নয়, লয়ে লজ্জা নেই। এটা আমাদের আলোচনা-গণ্ডির বাইরের অতিরিক্ত সত্য। আমার সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে ব্যাকুল হয়ো না। পাগল! হাজার হাজার মানুষের দেহের রক্ত আর জীবনের দিন দিয়ে অসুস্থ দেশের জন্যে ওষুধ তৈরি হচ্ছে, আমি করব তার প্রতিবাদ? অতিরিক্ত দার্শনিক তত্ত্বকথা থাক, আমার কথাটা নিয়ে আলোচনা চলুক। আমি বলেছি, অসুস্থ দেশের ওষুধের উপযুক্ত জীবন সৃষ্টি হোক, কিন্তু কুপথ্য আর বিষের সৃষ্টি যেন না হয়। তুমি প্রতিবাদ কর?

আমি বললাম, ঠিক প্রতিবাদ নয়। বলতে চাই, সে তো তোমাদের হাতে।

মানে?

মানে, সব শিশুই আরম্ভ—পরিণতি নয়। জীবনের ভিত্তির মিস্ত্রিও তোমরা। তুমি ছেলে দুটিকে মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? স্বামীর মঙ্গল করতে পারলে না, তার কারণ বুঝতে পারি তার

শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল তোমার সঙ্গে পরিচয়ের আগে। কিন্তু তোমার ছেলেরা ভালো-মন্দ কোনো শিক্ষা নিয়েই জন্মায়নি। তাদের তুমি মানুষ করে গড়ে তুললে না কেন? নিজেই বললে তোমার শক্তি সামান্য। সামান্য শক্তি এত বড়ো দেশে ছড়িয়ে দিয়ে কী লাভ হবে? দুটি ঘুমন্ত দেশ-সেবককে জাগাতে পারলে সব চেয়ে বড়ো দেশসেবা হত না? কেন তা করলে না?

কেন কবলাম না? পারলাম কই? খাঁচার শিকে শিকে বাধা পেলাম। কোলের ছেলে যখন এক বছরেরও নয়, গর্ভে ছেলে এল। সকাল-সন্ধ্যা রান্নাঘরে কাটল, বাকি সময় নানা কাজে। অভাবেব খোঁচায় মাথায় ঘা হয়ে গেল, চিন্তার বিষে অবসন্নতা ও অবহেলা এল। যেটুকু সময় ও সাধ্য হাতে বইল, স্বার্থপব স্বামী ছিনিয়ে নিল। তবু আমি পারতাম। অতিমানুষ না করতে পারি অমানুষ হতে দিতাম না, যদি ওদের জীবন বিষাক্ত আবহাওয়ায় বিষিয়ে না যেত। চব্বিশ ঘণ্টা পলে পলে যাদের জীবন বিকৃত হয়, পাঁচ মিনিটের চেষ্টায় আমি তাদের কী করতে পারি? জন্ম থেকেই ওরা অভিশপ্ত। বাপের অসংযমে জন্মাল রুগ্‌ণ হয়ে, খাদ্যের অপ্রাচুর্যে দেহ-মন কুঁকড়ে গেল, বিকাশ হল না, জীবনীশক্তির অভাবে ক্রমাগত রোগে ভুগল, দোষে বিনাদোষে বাপের ছ্যাঁচা খেয়ে কুটিলতা শিখল, শিশুমনের তুচ্ছতম আকাঙ্ক্ষাটি অতৃপ্ত থাকায় চুরি শিখল, বাড়ির ভয় ও নিরানন্দের আবহাওয়ায় মন না টেঁকায় বেশি সময় বাইরে কাটাতে ভালোবাসল, যার তার সঙ্গে মিশে অসৎসঙ্গের অশেষ দোষ সঞ্চয় করল, পয়সা আর খাবারের লোভে বজ্জাত লোকের কাছে কামুকতার দীক্ষা পেল। এ তো সংক্ষিপ্ত হিসাব, আবও কত আছে। এবার বুঝলে কেন পারলাম না?

আমি কতক্ষণ কথা বলতে পাবলাম না। এ কী বর্ণনা, এ কী নালিশ! মনের জ্বালা কি শব্দের রূপ নিতে পাবে? অত্যুক্তি মনে করার চেষ্টায় আমি ব্যর্থ হলাম, আমার কোনো সান্ত্বনা বইল না। শুধু মুখেব কথা তো নয় যে, শোনার সঙ্গে হৃদয়ের যোগাযোগ কম বেশি করে যতটুকু মানলে মনের স্বস্তি ততটুকু মানব। সন্তানহাবা মা আমার সামনেই বসেছিল। অত্যুক্তি যদি, ও কেন ছেলে ফেলে এল! সন্তান হাবানোব চরম প্রমাণেই যে ও প্রমাণ কবেছে অভিযোগ বাড়িয়ে বলা নয়!

সে বললে, অনেক দুঃখেই বাড়ি ছেড়েছি ভাই। আমি অভিশপ্তা স্ত্রী ও জননী, আমার সন্তান দেশেব অভিশাপ, জীবনেব এমন অসামঞ্জস্য বরদাস্ত হল না। আমি মুক্তি নিলাম। এ মুক্তি সময় সময় পীড়া দেয়, এগারো বছরেব চেনা খাঁচার ডাক আমি শুনতে পাই। আমার বুক ফেটে যায়। আমি যাতনায় ছটফট কবি। কতক্ষণেব জন্য দেশের সেবায় দারুণ বিরাগ জন্মে। মনে হয়, ন্যুব্জ হয়ে পথের ধুলোয় চোখ বুলিয়ে চলতে দেশের মানুষ যদি ভালোবাসে, ভালোবাসুক, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুক্ত নীলাকাশের দিকে না তাকাতে চায় না চাক,—আমাব কী? আমি কেন মাতৃত্বের আত্মহত্যা দিয়ে এমন নিষ্ঠুব পুজো কবে চলি? কিন্তু এ দুর্বলতা কেটে যায়, মুক্তির পীড়ন গর্ব ও আনন্দ হয়ে ওঠে।

আমি বললাম, দেশে অসংখ্য পুরুষ দিদি। তরুণ তরুণীতে দেশ ভরা। তোমার মতো তারা মাটিতে শিকড়-বসা তরু নয়। নিজেকে উপড়ে তুলে এই অস্বাভাবিক ত্যাগ তোমার করতে হবে কেন? তুমি ফিরে যাও।

সে হাসল। —সংখ্যাব গর্বে দেখি ফেটে পড়ছ! প্রমাণ কই? তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পারবে যে আমি অনাবশ্যক অতিরিক্ত বাহুল্য? যদি পার, এখুনি ফিরে যাব। সতিনকে পর্যন্ত ভয় করব না। একটু থেমে বললে, তুমিও তো পুরুষ, না ভাই? শিকড়হীন পুরুষ! কেবল কলেজ ডিঙিয়ে শিকড় গাড়বার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছ, এই যা আপশোশ। একটি বাড়ি, টুকটুকে একটি বউ, চাঁদের টুকরো একটি ছেলে। খাসা শিকড়। না? লোভী!

আমি ক্ষুণ্ন হয়ে বললাম, অনেক আগে ঘাট মেনেছি, খোঁচাচ্ছ কেন?

খোঁচাচ্ছি? মাইরি না। কালীর দিব্যি। স্বামীর ভাষাতে প্রতিবাদ করলাম, আর রাগ কোরো না। বলে সে হাসল। আমি গম্ভীর হয়ে ভাবতে লাগলাম।

সেও গম্ভীর হয়ে বললে, সত্যি খোঁচাইনি ভাই। খোঁচাবার অধিকার কোথা পাব? যার যে অধিকার নেই সে তা করলে ভেবে নিতে হয় ঠাট্টা করেছে।

খোঁচাবার অধিকার তোমার কাছে।

না, নেই! আমার দেশসেবা যে বাধ্যতামূলক।

সে সবারই। অধীনতা বাধ্য করে।

করে কি? অধীনতার দুঃখ না স্বাধীনতার লোভ করে কী করে জানলে? না ভাই জবাব চাইনি। এ কথার জবাব মানে আধঘণ্টা ধরে তোমার বক্তৃতা। আমি জানি জবাব। দুই কারণেই। কিন্তু ও রকম দেশসেবা বাধ্যতামূলক নয় ভাই। তা হলে মাতৃস্নেহকেও বাধ্যতামূলক বলতে হয়। আমার এই সেবা কিন্তু সত্যি বাধ্যতামূলক। সে জীবন সইল না বলে আমি এ জীবনে আশ্রয় নিয়েছি—ঝড়ে ভাঙা তরী এনেছি বন্দরে। বেশি নয়, একটা ছেলেকেও যদি মানুষ করতে পারতাম আমি সেখানকার মাটি কামড়ে থাকতাম। আকণ্ঠ নয়, ব্যর্থতায় একেবারে তলিয়ে গিয়ে দম আটকাল বলেই না এখানে নিশ্বাস ফেলতে এসেছি! আমি আজ সুখী দুঃখী দুই, কিন্তু এগারো বছর যে দেয়ালের অন্তরালে ছিলাম সেখানে থেকে সন্তানের মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করতে পারলে আরও সুখী হতাম। কিন্তু এ কথাটাও বলি, আমার এ জীবন তুলনাহীন। ছিলাম যন্ত্র—আজ আমি মানবী, যার আত্মা আছে, যার জীবনের অনেক মূল্য, অনেক প্রয়োজন, অনেক মানে। বেশি কী, আমি আজ তোমার প্রণম্য!

আমি নীরবে তাকে প্রণাম করলাম, পেলাম আশীর্বাদ। তারপর চুপ করে বসে রইলাম। সূর্য তখন নদীর অপর তীরে, তরুশ্রেণির খানিক উর্ধ্বে। নদী দিয়ে একটি স্টিমার চলে গেল, তীরে আছড়ানো ঢেউ-এর শব্দ মৃদুভাবে কানে এল। কয়েকটা বক নদীতীরে বসে ছিল, হঠাৎ উড়ে গেল।

মমতাদি বোধ হয় ভাবেনি এত শিগগির আমি তাকে রেহাই দেব। স্পষ্ট অনুভব করলাম সে আমার কথা বলার প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু আমি আর মুখ খুললাম না। কত কথা তো বললাম, কিন্তু কথা বলে লাভ কী? সংসারের জ্বালায় কত মানুষ গেরুয়া পরে পালিয়েছে, কত মানুষ খেপে গেছে, কত মানুষ আত্মহত্যা করেছে,—মমতাদি যদি জগতের মধ্যে মহত্তম কর্ম-বৈরাগ্যে আধপোড়া মনের আগুন নেবাতে চায়, কথার বিনিময়ে কোনো কিছুর এদিক-ওদিক হবে না। পরিণয়ের যজ্ঞভস্মে ঘি ঢেলে চলা যত বড়ো কর্তব্য হোক, সেটা ঘিয়ের অপচয় নিশ্চয়ই; সে অপচয় বন্ধ করা যত বড়ো অকর্তব্য হোক, স্বাধীনতার হোমানলে ঘি ঢেলে চলা যে ঘিয়ের সবচেয়ে সদ্‌ব্যবহার তাও নিশ্চয়ই। সুতরাং নানাবিধ ধারণা ও সংস্কারে বোঝাই মন নিয়ে তর্ক করা কথারই অপচয়।

অতএব কথা বন্ধ করে আমি ভাবতে লাগলাম অধুনা-পরিত্যক্ত স্বামী-পুত্রের কল্যাণে এই নারীটি একদিন আমাদের বাড়ি রাঁধুনি হয়েছিল,—গভীর রাত্রে ঘুমের কবল থেকে ছিনিয়ে-নেওয়া কয়েক ঘণ্টা সময় ছাড়া এগারোটি বছর একটানা বেঁচেছিল শুধু স্বামী-পুত্রের জন্য।

স্নেহ, প্রেম, মমতা মানুষের নাগপাশ। নাগপাশে মূর্ছার তন্দ্রা। সে নাগপাশে আবদ্ধা থেকেও যে মোহনিদ্রা টুটিয়ে দিলে, বাঁধন-সুদ্ধ যে বেরিয়ে পড়ল পথে, পাশবদ্ধ কর্মশক্তি নিয়ে যে সকলের জন্য যে-বিপুল কাজ পড়ে আছে তার নিজের ভাগটুকু শেষ করতে প্রবৃত্ত হল তাকে বোঝা যায় না। সে দুর্বোধ্য, তাকে ঘিরে রহস্য। মমতাদির শান্ত ও গম্ভীর মুখ দেখে আমার মনে হল, রাঁধুনির কাজ নিতে এসে যে আমার শেষ-শৈশবে স্নেহ-করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল, আজ আমার প্রথম যৌবনে সে আবার স্নেহ অস্বীকার করার শক্তিতে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে।

সন্ধ্যার সময় বিদায় নিলাম—প্রদীপ জ্বালার আগে। সে বললে, তোমায় একটা কাজ দেব।

কী কাজ?

সপ্তাহে একখানা কার্ড লিখে ওদের খবর দেবে।

কী খবর? কুশল?

হুঁ, বলে সে চোখ মুছতে মুছতে হাসল।

বলছ ওদের। ওদের মানে কী তোমার স্বামীরও?

নিশ্চয়। আধখানা কুশল-সংবাদ নিয়ে করব কী?

স্বামী-ভাগ একেবারে আধখানা! একটা স্পষ্ট জিজ্ঞেস করছি। স্বামীকে তুমি ভালোবাসতে?—বাসো?

সে একটু ভাবল, ভালোবাসা? প্রেম? কী জানি ভাই, ও সব বুঝি না। এইটুকু বুঝি যে না দেখলে মন কেমন করে, খবর জানতে ইচ্ছা হয়। এগারো বছর যার ঘর করা যায় তার হীনতা বোধ হয় স্নেহমমতাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।

আজ ঠিক করতে পারি না তার স্বামীপ্রেম ছিল কী ছিল না।

শিপ্রার অপমৃত্যু

এবার, ছত্রিশ সালের এই মহাপূজার সময় পরাশর, শিপ্রা ও অনিন্দিতা পদ্মাতীরের কোকনদে একত্র হয়েছে। অনিন্দিতার গ্রামে আসবার কারণটির মধ্যে কোনো বিশেষত্ব নেই। তাব আত্মীয়স্বজন কয়েক বছর ধরে বসবাস করছেন দেশে। কলেজের ছুটি হলে শিপ্রাও আত্মীয়স্বজনের কাছে এসে থাকতেই ভালোবাসে।

পরাশর এসেছে তার বাবার কাছে থেকে কিছু টাকা আদায়ের চেষ্টায়। এবাব তার ধারটা হয়েছে বেশি। বৈশাখ থেকে আশ্বিন পর্যন্ত পরপর দুটি সোসাইটি গার্লের বিলাসিতার খরচ জোগানো সহজ কথা নয়। যথেষ্ট কৃপণতা করেও পরাশরের ধার না করে চলেনি। মেয়ে দুটির সঙ্গে একে একে তার বিচ্ছেদ হয়েছে, ছ মাসের মধ্যে দুটি অস্ত্রোপচার। ক্ষতেব চিহ্ন অবশ্য লোপ পেয়েছে একমাসের মধ্যেই কিন্তু ধারটা বেঁচে থেকে সুদে বেড়েছে। আগে পরাশরের ভাবনা ছিল না। চিঠি লিখে টাকাটা চেয়ে পাঠালেই জবাবে কিছু গালাগালি দিয়ে মধু বোস তাকে টাকা পাঠিয়ে দিত। এখন সে সহজে টাকা দিতে চায না। বুড়ো হয়ে মধু বোস হয়েছে ভারী কৃপণ, বেশি টাকা চাইলে রেগে যায়। স্পষ্ট বলে, দেব না, দরকার থাকে বোজগার করে নাও গে। তার এই সুস্পষ্ট না-কে হাঁ তে পরিণত করতে মার সাহায্যে পরাশরের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। সে এত বেশি আরামপ্রিয় অলস প্রকৃতির লোক যে কোনো ব্যাপারে কাঠ-খড় পোড়ানো আর নিজেকে পোড়ানোর মধ্যে তার বিশেষ কোনো পার্থক্য থাকে না।

মাকে পত্র লিখলে মা জবাবে লেখেন : এক বছরের বেশি বিনা কাজে কলকাতায় বসে আছ। কখনও চিঠিপত্র লেখ না। উনি বড়ো রেগে আছেন। তুমি একবার বাড়ি এলে টাকার কথা বলতে পারি। ইতি মা।

সুতরাং শুধু বাবা নয়, মাও ভয়ানক রেগে আছেন বুঝতে পেরে পবাশরকে গ্রামে আসতে হয়। দিন পনেরোর জন্য জীবনটা ব্রেক কসে থেমে থাকে। জগৎ জুড়ে থাকে শুধু একটা গতিহীন স্তব্ধ বিষণ্ণতা।

শিপ্রার কোকনদে আসবার কারণটি পুরোনো। সে শহরের মেয়ে। শহরের রাশি রাশি ইটের আনাচে-কানাচে নিশ্বাস ফেলে সে বড়ো হয়েছে। সংকীর্ণ গৃহ, সীমাবদ্ধ আকাশ, শুধু সম্মুখ ও পিছন-থাকা পথ, পুনবাবর্তিত কর্তব্য ও অবকাশ! সব জড়িয়ে বাহান্নটি সপ্তাহে তার বছর, এ বছরের সঙ্গে ও বছরের কোনো পার্থক্য নেই। বেড়াতে যদি সে কখনও যায় তো মাইনের টাকা বাঁচিয়ে হয় একা, নয় দু-চারজন বন্ধুর সঙ্গে যায় পশ্চিম, যায় পুরী। পাহাড়ের বন্ধুর পথে হেঁটে বেড়িয়ে সে হাঁপায়, সমুদ্রতীরে বালিতে লুটোপুটি খেয়ে সমুদ্রস্নান করে আর সর্বদা আধ-আধ অন্যমনস্ক হয়ে হতাশ অবসন্ন হৃদয়ে ভাবে, সমস্ত জীবনটার মতো এবারের ছুটিটাও তার মাঠে মারা গেল। তারপর একদিন সে মরিয়া হয়ে চলে যায় তার পিসিমার কাছে হাজারিবাগে। কয়েকদিন বাড়ির রান্না ঝোল-ভাত খেয়ে বর্ধিত রক্তের রঙে চামড়ার ধবধবে সাদা রংটা একটু রঙিন করে এনে এবং দু-চারদিন বনে-জঙ্গলে পিকনিক করে ফেরে কলকাতায়। সেখানে ছুটির বাকি কটা দিন ঝিমিয়ে স্কুল খুললে রোজ চার ঘণ্টা সিক্সথ্ ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস অবধি বাংলা পড়িয়ে যায়।

নদীর দেশে এসে কিছুদিন থাকবার প্রবৃত্তি সে সংগ্রহ করেছে অনিন্দিতার কাছ থেকে। অনিন্দিতাব চেয়ে বয়সে সে সাত-আট বছরের বড়ো হবে। কিন্তু এতগুলি বছরের ব্যবধান তাদের মধ্যে নেই। দুটি পুরুষের মধ্যে বয়সের এই পার্থক্যের অর্থ যা দাঁড়ায় মেয়েবা সচরাচর তা মেনে চলে না। কুড়িব পর ওদের বয়স বাড়তে বছর দশেক সময় লাগে। কুড়ির পর একেবারে একত্রিশ, মাঝখানে আব বছবের পদক্ষেপ নেই। সম্পর্ক মেনে চলার হিসাবেও ওবা সাধারণত পুরুষেব অনুকবণ কবে না। ওদেব মধ্যে যাবা গুরুত্ব ও গৌববের মোহগ্রস্তা, মেজাজ যাদেব চড়া এবং স্বভাব যাদেব কড়া, ছোটো ছোটো বালিকাদের বন্ধুত্ব বঞ্চিত করতে পাবলেও প্রতিদিন একঘণ্টা সময় একত্র থাকতে হয়, সতেবো পেবোনো এমন একটি মেয়েকে সাতদিনের বেশি গাম্ভীর্যেব আড়ালে ঠেকিয়ে রাখতে ওবা মরে যায়। বিকাশ পাওয়াটাই মর্মকথা কিনা। আজ যে বিকাশ পেল তার দাম বিকাশ যার পুবোনো হয়ে এল তার চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। এই নির্মম সত্যকে সাতদিনের বেশি উলটিয়ে রাখাব ক্ষমতা ফুলের উপমায় পুলকিতা নারীর নেই। তাই, একদিন যদিও শিপ্রা কিছুকাল তার মামাব বাড়িতে শিক্ষয়িত্রী রূপে বাস করেছিল এবং ক্লাসে আবও ত্রিশটি মেয়েব সঙ্গে তাকেও সামনে বেঞ্চিতে বসিয়ে বেখে নিজে উঁচু প্ল্যাটফর্মে-পাতা চেয়াবে বসে সপ্তাহে চারদিন একঘণ্টা করে বাংলা পড়িয়েছিল, ওদেব বন্ধুই বলতে হয়। এক পক্ষেব কিছু কিছু পৃষ্ঠপোষক স্নেহ এবং অপব পক্ষের জোব করে বাঁচিয়ে রাখা সম্মানের ভেজাল হয়তো কিছু মেশানো আছে কিন্তু অনেক সমবয়সি বন্ধুর সম্পর্কেও তা থাকে।

কথ্যভাষায় অনিন্দিতাব দখল আছে। কথা সে অনর্গলই বলে। বর্ণনাব বর্ণে ছবি আঁকাব ক্ষমতাও তাব নিন্দনীয় নয়। খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাব কথা শুনে গেলে তার মানসিক প্রক্রিয়া ও হৃদয়াবেগগুলি এত সহজে ও এমন নির্ভুলভাবে অনুসরণ করা যায় যে মনে হয় ওর কপালেব হাড় আব বুকেব পাঁজব স্বচ্ছ হয়ে মস্তিষ্ক ও হৃৎস্পন্দন চোখে দেখতে পেলেও এর চেয়েও ভালো কবে ওকে বোঝা যেত না। বিপুল বিস্তীর্ণ নদীর ভাঙন-ধবা তীবে অস্থায়ী স্টিমারঘাটটির আধমাইল তফাতে তাদেব অতি শ্যামল, অতীব মনোবম গ্রামটিব কথা শুনে শুনে শিপ্রার মনে হত, বাবা, অমন দেশে মানুষ যায়! তাই, এবার পশ্চিম অথবা পুরী যাবাব টাকা হাতে না থাকায় এবং হাজাবিবাগের পিসিমা কবাচি চলে যাওয়ায় অনিন্দিতা ডাকা মাত্রা শিপ্রা তার সঙ্গে কোকনদে চলে এসেছে।

গ্রামে এসে অনিন্দিতা গেঁয়ো বনে যায়। স্টিমাব থেকে নামাব আগেই মন থেকে সে শহরেব আবরণ খসিয়ে দেয়, বাড়ি পৌঁছে শহরেব বেশও পরিবর্তন কবে ফেলে। হাঁপ ছেড়ে সে বাঁচে না কারণ শহরকে অপছন্দ কবার মতো গেঁয়ো সে নয়, হোস্টেলের জীবনকে সে অপ্রীতিকর মনে করে না। শহরকে সে পছন্দ করে, গ্রামকে সে ভালোবাসে। মন ও হৃদয়েব ভিত্তি তার গ্রাম্য। গ্রামের খাল ও পুকুরে তার দুরন্ত শৈশব বহুকাল সাঁতাব দিয়েছে, গাছের ডগা থেকে পাখির ছানা পেড়েছে, কলহান্তরিতকে দূব থেকে ঢিল ছুঁড়েছে, আমবাগানের স্নিগ্ধ নির্জনতায় গাছের তলা থেকে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে পেতেছে খেলাঘর। যে বয়সে আত্মীয়ের সতর্ক-রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়া সে নিরাপদ নয় সে বয়সেও পদ্মার মাঝিদের সঙ্গে ভাব করে তাদের সঙ্গে একা নদীর বুকে নৌকায় ভেসে বেড়িয়েছে। এ সব এখন ইতিহাস, এ জীবনে হয়তো পুনরাবর্তন নেই। কিন্তু বিদেশ থেকে দেশে এসে গ্রামের মাসি পিসি ও সখীদের মধ্যে, গ্রামের কাকা ও দাদাদের মধ্যে ও নিজের বাড়িতে পুরোনো স্থানটি অনিন্দিতা আজও বিনা চেষ্টায় দখল করে নিতে পারে। গ্রাম্যতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সে কখনও লড়াই করে না, বয়স্কা মেয়েদের করা উচিত নয় এমন দু-একটি পুরুষোচিত অকাজ এখনও

মাঝে মাঝে করে ফেললেও প্রথা সে সবই মেনে চলে। ঘরে বাইরে কোথাও তার সংস্কার সাধনের প্রয়াস নেই। যা আছে তাই তার ভালো, সে সমালোচনা করে না।

ঘরে এসে সে এত বেশি করে ঘরের মেয়ে হয়ে যায় বলে গৃহপ্রবাসী পরাশরের মনে হয় সে একটা অচেনা মেয়ে, কলকাতায় ওর সঙ্গে তার কোনোদিন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, ছেলেবেলার প্রায় ভুলে-যাওয়া পরিচয় ছাড়া ওর সঙ্গে তার আর কোনো সম্পর্ক নেই। পদ্মানদীর জোলো বাতাস দিবারাত্রি পরাশরের গায়ে লাগে কিন্তু সে বাস করে তার একটি নিজস্ব নিঃসঙ্গতার আবহাওয়ায়। শহরেব অনিন্দিতাকে নিয়ে কয়েক ঘণ্টা সময় সে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে কিন্তু এখানে গ্রামের স্তিমিত নরনারীর সঙ্গে এমন করে মিশে গিয়ে সময়ের বহু পিছনে পড়ে-থাকা এখানকার স্থায়ী স্তব্ধতায় এমন করে ডুবে যায় যে তার সান্নিধ্যের সঙ্গ পরাশর পায় না।

সকালে গিয়ে হাজির হলে বলে, বসো। রাঁধছি।

রেঁধে কী করবে। পারিবারিক প্রবন্ধ পড়তে বসবে? বলে পরাশর চলে আসে।

বিকালে অনিন্দিতা বলে, বসো। এদের চুলবাঁধা শেখাচ্ছি। এলোচুলে কত রকম খোঁপা হয় তাই।

পরাশর রেগে বলে, নিজের চুল বাঁধবার সময় পাওনি দেখছি!

সময় লাগে না। এই দ্যাখো—

নিমেষে চুলগুলি জড় করে অনিন্দিতা এলোখোঁপা বেঁধে নেয়।

বলে, বসবে না কি?

পরাশর বলে, বসব। নদীর ধারে। তোমার বাড়িতে নয়।

চুলবাঁধা শেখানো শেষ করে অনিন্দিতা নদীর ধারে যায়। পরাশরকে দেখতে না পেয়ে ভাবে, কলকাতায় থেকে থেকে একেবারে বখাটে হয়ে গেছে। মিথ্যা কথা মুখে আটকায় না।

দেখা হলে পরাশরকে সে খানিক উপদেশ শোনায়। কলকাতায় ফিরে যেতে বাবণ করে। গ্রামে থাকতে অনুরোধ জানায়।

জিজ্ঞাসা করে, এ বছর কটা পয়সা ইনকাম হয়েছে?

এক পয়সাও নয়। পরাশর সগৌরবে স্বীকার করে।

একটা বছর তুমি তবে গ্রামে থাকো এবাব। মনের বিষ কেটে যাবে। কলকাতায় যে তিন-চার হাজার টাকা খরচ করছ সেটা বাঁচাতে পারলেও একটা ইনকাম হচ্ছে ভেবে নিজের ওপর তোমাব একটু শ্রদ্ধাও হবে। নিজেকে ঘৃণা করছ বলেই তুমি আরও বেশি গোল্লায় যাচ্ছ মন্টু।

পরাশর গলায় ঝাঁজ এনে বলে, এ রকম উপদেশ ঝাড়তে শিখবে বলেই তোমাকে সংস্কৃত নিতে বারণ করেছিলাম। চালকলাভোজীদের প্রভাব যাবে কোথায়?

তুমি কিছু বোঝ না। তুমি থাকলে আমিও থাকব। তোমার যতক্ষণ খুশি রোজ আমার সঙ্গে এসে ঝগড়া কর। এবার তাহলে আমার একজামিন দেওয়া হবে না। কিন্তু তোমার সংশোধনের জন্য তাতেও আমি রাজি আছি।

অনিন্দিতার অনুরোধ ও উপদেশ ভাসা-ভাসা ছাড়া-ছাড়া ছেলেমানুষি নয়। তার বলবার ভঙ্গিতেই বোঝা যায় এ বিষয়ে সে অনেক ভেবেছে। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে সে একটু হাসে, একটু আচার অথবা তেঁতুল-মাখা মুখে দেয়, কপালের বাঁ দিকে গভীর ক্ষতচিহ্নটি অন্যমনস্ক অভ্যাসে বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে ঘষতে থাকে, সরু চেনহারটি জামার ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়। তার এই পরিচিত মুদ্রাদোষগুলি তার কথাকে হালকা করতে পারে না। পরাশরকে সে যে প্রলোভন দেখায় তাও জোরালো হয়েই থাকে। কিন্তু পরাশর এত রেগে যায় যে তার প্রলোভনে কাজ হয় না।

পরাশর বলে, আগে বিয়ে হোক, এখানে এক বছর হনিমুন করতে পারি। এই গাঁয়ে বসে এক বছর কোর্টশিপ চালানো আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

তুমি কিছু বোঝ না।

তোমার সঙ্গে মিশেই আমার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে।

অনিন্দিতা নকল নিশ্বাস ফেলে বলে, সেকালের মেয়েরাই ছিল সুখী। কারও মুখের কথায় নির্ভর করে মরতে হত না। সাতটা সমুদ্র তেরোটা নদী আব সাতশো রাক্ষস তাদের পক্ষ হয়ে এমন প্রমাণই আদায় করে নিত, একালের সাইকলজিও যা পারে না। একালের ছেলেগুলি সমুদ্রে পাড়ি দেয় শুধু ডিগ্রির জন্য। কপাল কী আমাদের ফুটো হয়েছে এমনি!

কথ্য-ভাষায় অনিন্দিতাব দখল থাকার জন্য কথাগুলি পরাশরের মর্মে গিয়ে বেঁধে।

তোমার কপাল ফুটো হয়েছে গাছ থেকে পড়ে। আমি ফেলেও দিইনি।

অনিন্দিতা বলে, না। তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে ধরে তুলেছিলে। আর সেই আঠেরো বছর বয়সে পাকা রাক্ষসের মতো শুষে খেয়েছিলে আমার ফুটো কপালের রক্ত।

তুমি মবে গিয়েছিলে ভেবে চুমু খাচ্ছিলাম।

তোমার আশেপাশে থাকলে আমাকে অমর হতে হবে।

পরাশর তাব সমস্ত আভিজাত্য ভুলে চাপা গলায় ধমক দিয়ে বলে, অমর হয়ে তুমি যদি সাবাজীবন তপস্যা করো, আর মরে মরে আমার পাঁচশো জন্ম কেটে যায়, তবু আমার ধারে কাছে থাকবাব সুযোগ তুমি পাবে না অনি।

কোকনদে পা দিয়ে ওদের ব্যাপারটা তলিয়ে বুঝে শিপ্রা খুশি হয়ে উঠল। বুদ্ধিটা তার যেন অকস্মাৎ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে গেল। একটা বাত্রি সে এমন নিবিড়ভাবে চিন্তা করল যে তার ভালো ঘুম হল না।

পরদিন থেকেই এই নিরীহ কোকনদ গ্রামটিতে সে তাব শহরটি রচনা করে নিল। এমন অকস্মাৎ সে গ্রাম ও গ্রাম্যতার বিরুদ্ধে তার আশ্চর্য বিদ্রোহ শুরু করে দিল যে অনিন্দিতার বাড়ির মেয়ে ও পুরুষ গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা চমকে গেল। আজকালকার দিনে এমন গ্রাম খুব কমই আছে যার দু মাইল পরিধিব মধ্যে দুটো-একটা গোল্ডফ্লেক সিগারেটের দোকান নেই। গ্রামের বুকে শহরের আকস্মিক আবির্ভাবে ভড়কে যাবার পাত্র একালের গ্রামবাসী নয়। তারা টিউবওয়েলের জলে চা তৈবি করে খায়, মাথার উপর দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে গেলে চোখ তুলে একবার তাকিয়ে দেখেই কাস্তে ধরে ধান কাটে। কিন্তু শিপ্রাকে ঘিরে এ যে কোন দেশি শহর গড়ে উঠল কেউ তা ভেবে পেল না। মাটির পৃথিবীতে মাটির মানুষ যে সব শহর রচনা করে শহুরে হয়েছে সে সবের সঙ্গে শিপ্রার যেন যোগ নেই। সে যেন আকাশের পরি, কাল বিকালের ঝড়বৃষ্টিতে আকাশ থেকে খসে পড়েছে।

শিপ্রার শাড়িসম্পদ ছিল প্রচুর। সকালবেলা প্যারাসোল হাতে পরি সেজে সেই যে সে বেড়াতে যায়, সারাদিন কয়েকবার বেশপরিবর্তন করলেও তার বেশে পরিত্বের ছাপ কখনও ঘোচে না। তার চলার ভঙ্গি, তার কথা ও হাসি, তার নাওয়া ও খাওয়া এবং বিশ্রাম সমস্তই এমন অসাধারণ ও অস্বাভাবিক হয়ে যায় যে তার শরীরটা মেয়েমানুষের রক্তমাংসে তৈরি কিনা সে বিষয়ে অনেকের সন্দেহ জাগে। প্রাণের প্রাচুর্যে সে যেন ফেটে পড়তে চায়, কী করবে দিশে পাচ্ছে না। গ্রামে পা দেবার সাতদিনের মধ্যেই পূজার ছুটিতে যে কটা কলেজের ছেলে বাড়ির দুধ-ভাত খাবার জন্য গ্রামে এসেছিল তাদের একত্র করে সে আড্ডা দেয়, গান শোনায়, নাচ দেখায়, আর আজ একে কাল ওকে নিয়ে অনভ্যস্ত লোকেরও বোধগম্য হয় এমনিভাবে ফ্লার্ট করে। সাতবছরের মেয়ের অপরিমেয় চঞ্চল উল্লাসে পরাশরের চোখের সামনে ওদের সঙ্গে সে গ্রামের পথে রেস দেয়, গৃহে পরাশরের

সান্নিধ্যে সে ওদের কাছে হয়ে ওঠে হরিণীর মতো চপল,—রানির মতো প্রভাবশালিনী, অভিনেত্রীর মতো রহস্যময়ী, প্রবঞ্চিতার মতো সংযত, প্রজাপতির মতো হালকা।

তার পাশে অনিন্দিতা বৈদ্যুতিক বাল্‌বের পাশে প্রদীপের মতো নিভে যায়। শিপ্রার দিকে তাকিয়ে পরাশর চিন্তিত হয়ে ওঠে।

নাম ছড়ায়। কলকাতার একটি নগণ্যা স্কুল-মিস্ট্রেস আশেপাশের দশটা গ্রামে আলাপ-আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। একদিন সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে ফিরবার সময় অন্ধকারে একটা মাটির ঢেলা শিপ্রার পিঠে এসে গুঁড়ো হয়ে যায়, আট-দশ মাইল দূরের গ্রাম থেকে দু-একজন তাকে দেখতে আসে। জীবনের ত্রিশটা বছর মানুষের মতামতকে সম্মান করে নিরীহ ও ভীরু হয়ে থেকে একটি কাম্য ভবিষ্যৎকে হঠাৎ একদিন গায়ের জোরে সৃষ্টি করার চেষ্টা শুরু করেই শিপ্রা চারিদিকে বিস্ময় কৌতূহল ও কৌতুক পুঞ্জীভূত করে দেয়। যৌবনের মৃত্যুর তার বেশি দেরি নেই। সমস্ত ভয়ভাবনা বিসর্জন দিয়ে জীবনকে সে মরণকামড় দিয়ে আয়ত্ত করতে চায়।

অনিন্দিতার বাবা ছিলেন বিদেশে। অনিন্দিতার মা সভয়ে মেয়েকে বলেন, এ তুই কাকে বাড়ি নিয়ে এলে অনি?

অনিন্দিতা চিন্তিত মুখে বলে, ওর বোধ হয় নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে মা।

নার্ভাস ব্রেকডাউন হোক আর যাই হোক ওকে এবার তুমি যেতে বলো বাছা। দশ-বারো দিন হয়ে গেল, এখনও কোন লজ্জায় ও পরের বাড়ি পড়ে আছে?

দেখি আর দুটো দিন।

কিন্তু শিপ্রা যাই আরম্ভ করুক, একটা আশ্চর্য সংযম সে আগাগোড়া বজায় রেখে চলছিল। তার সাজগোজ অশ্লীল নয়, তার আড্ডাতে হল্লা হয় না, তার ফ্লার্টিং শুধু কথা ও হাসির। ভোরে ঘুম ভেঙে রাত্রে বিছানায় যাওয়া পর্যন্ত অজস্র খাপছাড়া কাণ্ডে সে সকলকে উত্তেজিত করে রাখে কিন্তু নিজে সে উত্তেজিত হয় না। তার কথা হয় মৃদু ও সুরের রেশ লাগানো, তার হাসি হয় অপার্থিব একটা অধর-ভঙ্গি, তার চলন হয় ঢিমে তালের একটা নৃত্যছন্দ! এক কাব্যাত্মক আভিজাত্য, খুব উঁচুস্তরের আধুনিকতা ব্রহ্মাস্ত্রের মতো আত্মরক্ষার জন্য সে পরিস্ফুট করে রাখে। গ্রামের অল্পশিক্ষিত অল্প আলোকপ্রাপ্ত নবনারীর মধ্যে সে আলোর মতো উদয় হয়েছে, এরা যদি তাকে পছন্দ না করে সেটা হবে এদেরই সংকীর্ণতা ও কুসংস্কারের দোষ, এদেরই পিছনে পড়ে থাকার পরিচয়। এ ছাড়াও শিপ্রার আরও একটা চালাকি আছে। অনেক ভেবে কৌশলে সে এই ভাবটাও বজায় রেখেছে যে, সে সকলকে মাতায়নি তাকে নিয়ে সকলে মেতেছে। অনিয়ম ও অসংযম যদি কিছু ঘটে থাকে তার দায়িত্ব অন্যের, তার নয়।

পরাশর প্রথমে দূর থেকে শিপ্রাকে লক্ষ করছিল, অনিন্দিতার মধ্যস্থতায় তার সঙ্গে প্রথম যে ভদ্রতার পরিচয় হয়েছিল মাঝখানে অনিন্দিতাকে খাড়া রেখে এ পরিচয়কে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে দেয়নি। কিন্তু অনিন্দিতাকে শিপ্রা এক রকম ঠেলে সরিয়ে দিল। অনিন্দিতার ক্ষমতা রইল না পরাশরের সান্নিধ্যে শিপ্রাকে সহ্য করে। শিপ্রার এক একটি বানানো কথা, এক একটি নকল হাসি তার কানে আর চোখে বিঁধতে আরম্ভ করতেই সে দুজনকে আসর ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে গেল। তখন শিপ্রার বন্ধু হয়ে উঠতে শহরবিরহী পরাশরের সূর্যকে বার তিনেকের বেশি অস্ত যেতে হবে না।

পরাশরকে শিপ্রা যখন সকালে প্যারাসোল হাতে বেড়াতে যাবার সময়, অপরাহ্নে বসে গল্প করার সময়, সন্ধ্যায় নদীর ধারে নির্জনতা উপভোগ করার সময় এবং রাত্রে গান শোনাবার সময় কাছে রাখার শক্তি অর্জন করলে, কলেজের ছেলেগুলিকে সে তখন বিদায় করে দিলে। চিরবিদায় নেওয়া সে সব ছেলেমানুষগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাদের চিরবিদায় দেওয়া শিপ্রাও ভালো মনে

করেনি। পরাশর সর্বদা একেবারে একা থাকলে তার মতো ভয়ংকর শহুরেকে খুশি করে রাখতে পারার ক্ষমতা তার নেই এ কথা শিপ্রা ভালো করেই জানত। তাই বিদায় করে দিলেও ওরা যে পরিমাণ আসা-যাওয়া বজায় রাখল শিপ্রা সেটুকু গ্রহণ ও অনুমোদন করল।

পরাশর বোকা নয়, সে সব বুঝতে পারে। শিপ্রাও বোকা নয়, পরাশর যে সব বুঝতে পারছে এটা বুঝতে পারে সে। কিন্তু পরাশর তার ভানকে গোপন করলেও শিপ্রা এ বিষয়ে কোনো ছলনার আশ্রয় নেয় না। তার জটিল মস্তিষ্কগত হৃদয়াভিযানে তাই একটি মনোরম সারল্যের ছাপ পড়ে। পরাশরের তা ভালো লাগে। এদিক দিয়ে সে একটু দুর্বল বোহেমিয়ান। বুদ্ধি দিয়ে গড়ে তোলা ভালোবাসার মধ্যেও সে একটু বোকামি একটু সরলতার খাদ পছন্দ করে। তার রঙিন কাগজের ফুলটির অন্তত চেহারায় আসল ফুলের মতো হওয়া চাই।

অনিন্দিতা মার কাছে যে দুদিন অপেক্ষা করে শিপ্রাকে চলে যেতে বলবে বলেছিল সে দিন দুটি পার হয়ে যাবার আগে নিজের প্রয়োজনেই শিপ্রা তার সৃষ্টি করা শহরকে নিজের চারিদিকে ঘনীভূত করে আনল। বাইরে সাধারণের কাছে সে যতটুকু প্রকাশ করতে লাগল তা প্রশংসনীয় না হলেও এত বেশি নিন্দনীয় নয় যে সে জন্য তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়। সর্বনাশের ধারে এসে শিপ্রা তাই অল্পের জন্য বেঁচে গেল। তাকে একদিন একটু সাবধান করে দেবার বেশি অনিন্দিতা আর কিছুই করতে পাবল না।

বদনাম কুড়োচ্ছ কেন শিপ্রাদি?

অনেক বয়েস হল, এই বেলা একটু কুড়িয়ে না নিলে আর তো পাব না।

কলকাতায় কুড়োলেই হত।

পরেব বাড়ি অতিথি হয়ে থাকবাব সময় কোনো বিষয়ে বাড়াবাড়ি ভালো নয়, অনিন্দিতা এই কথাটাই এ বকম মোলায়েম করে শিপ্রাকে বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু শিপ্রা এখন কিছুই বুঝতে চায় না।

কলকাতা মস্ত শহর। বদনাম তৈরি করার কম্পিটিশন পর্যন্ত সেখানে এমন জোরালো যে আমি পাত্তা পাই না অনি। তাছাড়া, কলকাতার বদনাম কর্তাদের কানে গেলে চাকরিটা যাবে।

অনিন্দিতা তার মুদ্রাদোষের আশ্রয় নিয়ে বললে, তোমার স্বভাব সত্যি ভারী খারাপ হয়ে গেছে শিপ্রাদি। গাঁয়ে এসেও কদিন একটু সামলে চলতে পার না?

শিপ্রা গুনগুন করে গান ধরে দিল। বললে, এতদিনে একটু বসন্ত এসেছে, এত জেলাস হসনে অনি। তোর গোল্ডেন ড্রিম তোরই থাকবে।

অনিন্দিতাকে একটু হাসতে হল।

অনি যেদিন জেলাস হবে অনির তুলনায় জগতের সবাই সেদিন হবে বদ্ধ পাগল। বাজে সেন্টিমেন্টর চেয়ে কমনসেন্স আমি বেশি পছন্দ করি। এ হল রিয়ালিজমের যুগ। এ যুগে প্র্যাকটিক্যাল না হলে কোনো মেয়ের চলে?

শিপ্রা তখনও গুনগুন করে গান করে। অনিন্দিতার মুদ্রাদোষ কপালেব ক্ষতচিহ্নটি আঙুল দিয়ে ঘষা আর শিপ্রার মুদ্রাদোষ গুনগুনানো গান।

তোর বুদ্ধি এখনও কাঁচা আছে অনি। পৃথিবীতে রোমান্স না থাকলে মেয়েদের উপায় আছে? রোমান্টিক যুগে মেয়েদের ভোঁতা হওয়া চলত, হাজার প্র্যাকটিক্যাল হলেও ক্ষতি ছিল না। এখন পুরুষরা রোমান্স ভুলতে বসেছে, সিনিক আর প্র্যাকটিক্যাল হয়ে উঠেছে। মেয়েদেরই এখন রোমান্টিক সেন্টিমেন্টাল সব কিছু হওয়া দরকার। নইলে তারা টিকবে কী করে? স্যানস্‌ক্রিট পড়ে পড়ে তুই যেন কেমন হয়ে গেছিস অনি!

অনিন্দিতা খানিকক্ষণ ভেবে বললে, তুমি তাহলে সিরিয়াস শিপ্রাদি? সময় কাটাচ্ছ না।

শিপ্রা গম্ভীর হয়ে বললে, সময় কাটাবার মতো সময় আর আছে কই? সিরিয়াস না হয়ে একটা ছোটো ছেলেকেও কি এ বয়সে ভোলাতে পারব?

অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে বললে, পরাশর তোমার চেয়ে তিন-চার বছরের ছোটো।

নিজের বোকামি বুঝতে পেরে শিপ্রা তৎক্ষণাৎ গাম্ভীর্য পরিত্যাগ করলে। হেসে বললে, এই যে জেলাসি উপচে উঠছে!

এবার অনিন্দিতা তর্কচ্ছলেও এ কথার প্রতিবাদ করলে না।

নিজের সম্বন্ধেও অনিন্দিতা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। অন্তত তার ধারণা তাই। অর্থাৎ সাধারণ সুস্থ মানুষের মতো নিজের সম্বন্ধে সে অনেক ভুল ধারণা পোষণ করে। শিপ্রা সম্বন্ধে পরাশরের সঙ্গে একদিন সে অত্যন্ত নির্মমভাবে আলোচনা করলে। এতে অপমানের প্রশ্নটা খুব বড়ো বলে এই নির্মমতার প্রয়োজন ছিল। বিশেষত সংক্ষেপে তার জেরাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে পরাশর ব্যাপারটাকে আরও জটিল করে তুললে।

অনিন্দিতা অশ্রু গোপন করে বললে, আজ পর্যন্ত তুমি অনেক অন্যায় করেছ। কখনও কিছু গোপন করার চেষ্টা করনি বলে তোমাকে শ্রদ্ধা করতাম মন্টু।

এ থেকে তোমার বোঝা উচিত এখন যা করছি সেটা অন্যায় নয়। অন্যায় হলে গোপন করতাম না।

অন্যায় কী? তুমি পাপ করছ!

পাগল, এ হল ভালোবাসা। ভালোবাসা অতি পবিত্র জিনিস, স্বর্গীয়।

পরাশর তার বাছা পোশাকি হাসিটি হাসল।

যদি কখনও কাউকে ভালোবাস অনি তা হলে জানতে পারবে ভালোবাসা কত উঁচু স্তরের জিনিস!

এর জবাবে অনিন্দিতা বললে, তুমি কলকাতা যাবে কবে?

শিপ্রার স্কুল খুললে একসঙ্গে যাব।

অনিন্দিতা মরিয়া হয়ে বললে, তোমার বাবা রেগে আগুন হয়ে আছেন। তোমার মা রোজ কাঁদেন।

তাতে কী। বুড়ো বয়সে সব স্বামী-স্ত্রীর ওরকম ঝগড়াঝাঁটি হয়।

তখন অনিন্দিতা বুঝতে পারল মনে মনে একটা গভীর ষড়যন্ত্র করে পরাশর প্রথমে শিপ্রাকে আমল দিয়েছিল,—এখন তার মনের মোড় ঘুরে গিয়েছে। প্রথমে চেষ্টা করে পরাশরের ষড়যন্ত্রকে সফল হতে দিলে শিপ্রার উন্মাদ অভিযান ব্যর্থ করা যেত, কিন্তু সে সুযোগও এখন তার নেই। এতকাল সে যে পরাশরের অবাধ্যতা করেছে তার একটা নাটকীয় প্রতিশোধ নেবার সম্ভাবনায় পরাশর অন্ধ হয়ে গিয়েছে। পুরাতন যুগের ব্যর্থ প্রেমিকের মতো—শুধু কথায় নয়, কাজেও সে আত্মহত্যা করে ছাড়বে।

কিন্তু বেশি প্রতিবাদ ভালো নয়! অনিন্দিতা চুপ করে গেল।

নদীতীরে শারদীয় কাশগুচ্ছের এবার অভাব হয়েছে। আকাশের টুকরো টুকরো রুপালি মেঘ মানুষের মনোবাসনার মতো শিথিল মন্থর গতিতে ভেসে বেড়ায়। নদী ও পুকুরের জলে এখনও পর্যন্ত বর্ষার অস্বচ্ছতা থেকে যাওয়ায় পরিষ্কার প্রতিবিম্ব ফোটে না। অনিন্দিতা রাঁধে, চুল বাঁধে, বই পড়ে, পাড়া বেড়াতে যায়। পরাশর ও শিপ্রার গোপন পরামর্শ অফুরন্ত হয়ে থাকে। গোপন অভিপ্রায়ের সীমা কণ্ঠের তলদেশে, কিন্তু গোপন আলাপ দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায়। অনিন্দিতা শুনতে পায় আগামী

উৎসবের পরের রাত্রেই রক্তকরবী অভিনয় হবে। সে পর্যন্ত দুটোরই রিহার্সেল চলবে একসঙ্গে উৎসব ও অভিনয়ের ; ভালোবাসা ও নাটকের।

অনিন্দিতা তবু কিছু বলে না। সকলের হা-হুতাশ তার কানে আসে। পরাশরের এমন কুমতি হবে, তার চেয়ে বয়সে বড়ো একটা বেহায়া মাস্টারনিকে শেষ পর্যন্ত সে বিয়ে করার জন্য খেপে উঠবে এ কথা কেউ যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, অনিন্দিতাকে বারবার তা না শুনিয়ে কেউ তৃপ্তি পায় না। অনিন্দিতা হেসে বলে, আমি তার কী করব?

তাকে কেউ কিছু করতে বলেনি। কিন্তু শিপ্রাকে কোকনদের বোস-বাড়ির বউ মনে করতে গিয়ে সকলের মন খুঁতখুঁত করে। তারা বিশেষ করে অনিন্দিতাকেই মনের দুঃখ নিবেদন করে। শিপ্রাকে গ্রামে আনার দায়িত্ব সকলের বিরুদ্ধ সমালোচনা ও নালিশের সমবেত বোঝা হয়ে অনিন্দিতার কাঁধে চেপে থাকে। শৈশবের শেষে গ্রামে অনিন্দিতার নিন্দা নেই, দোষ তাকে কেউ দেয় না। কিন্তু সকলের ক্ষুণ্ণ ও ক্রুদ্ধ অভিযোগ শিপ্রা ও পরাশরের নাগাল না পেয়ে অনিন্দিতার চারিদিকে এসেই ভিড় করে। অনিন্দিতার মধ্যস্থতায় তাদের নালিশ যেন যুগল অপরাধীদের বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

অনিন্দিতার সামনে পড়ে গেলে শিপ্রা একটু হাসে। তাকে এত সুন্দর দেখায় যে তাকে আর তার হাসিকে চেনা যায় না। মুখ থেকে সে যেন এক পরত মরা চামড়া তুলে ফেলেছে, লাবণ্যের একটা অজ্ঞাত মাজন দিয়ে দেহ মার্জন করেছে। কোকনদে এসে এই কদিনের মধ্যে তার স্বাস্থ্য অসাধারণ উন্নতি লাভ করেছে, তার দেহের কঠোর শুভ্রতা রঙে ভিজে কোমল হয়ে এসেছে। মাথার চুলগুলি পর্যন্ত যেন খোলস বদলে হয়েছে উজ্জ্বলতর। তার মুখে চোখে যে অশান্ত উদ্‌বেগ ও গ্লানিকর বিরক্তির অভিব্যঞ্জনা অনিন্দিতা চিরকাল দেখে এসেছে এখন তার চিহ্ন নেই। তার দৃষ্টি গভীর ও গম্ভীর, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক অবস্থায় অনিন্দিতার দিকে চেয়ে একটু কেবল শঙ্কা তার চোখে দেখা দেয়।

অনিন্দিতা লক্ষ করে, শিপ্রা প্রতিদিন নিজেকে সংহত ও অখণ্ড করে এনে পরাশরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ভোজবাজির মতো তার জাদুনির্মিত শহরটি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে, অকস্মাৎ সমস্ত বিষয়ে সে যে-সব বাহুল্য আমদানি করেছিল একে একে তাদের পরিত্যাগ করে সে স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। একটি পুরুষের সঙ্গে স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যে সব সুপ্রাচীন ও অপরিবর্তনীয় বাঁধনে তাকে বেঁধে ফেলা জগতের সব চেয়ে আধুনিক মেয়েটির পক্ষেও এখন পর্যন্ত অপরিহার্য হয়ে আছে, অনিবার্য অধ্যবসায়ে পরাশরকে শিপ্রা সেই সব বাঁধনেই ক্রমে ক্রমে নিজস্ব করে ফেলছে। পরাশরকে সে যতখানি আকর্ষণ করে, নিজেকে ততখানি ভালো লাগায়। মুখে যখন সে ঘোষণা করে যে জগতের মানুষ শুধু সেইদিনই সুখী হতে পারবে একজনের জীবনে আরেক জনের যেদিন কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না, যার যেভাবে খুশি নিজের জীবনটা কাজে লাগাবে অথবা অপব্যয় করবে,—দুটি চোখের দৃষ্টি দিয়ে সে তখন এই নিয়ম থেকে পরাশরকে অব্যাহতি দেয়, মানুষের চোখের আড়ালে এই কোকনদ গ্রামের অনেক গেঁয়ো-বউয়ের মতো পরাশরের কাছে প্রেমের মোহে সে দাসী হয়ে থাকে।

অনিন্দিতা তাকে বলতে শুনেছে, বনিবনা না হলে আমরা কিন্তু পৃথক হয়ে যাব। একটা দিনও গায়ের জোরে কাছাকাছি থাকবার চেষ্টা করব না। এবং এটুকু জানতেও অনিন্দিতার বাকি থাকেনি যে পরাশরকে এ কথা বলার আগে শিপ্রা তিনদিন চেষ্টা করে পরাশরের মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিয়েছে বনিবনার অভাব তাদের এ জীবনে কখনও হবে না। কারণ, এতকাল শিপ্রা যে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করেছে সে শুধু পরাশরের মতো এমন একজনের দেখা সে এতদিন পায়নি বলে, যার সঙ্গে কোনোদিন মনোমালিন্য না হবার সম্ভাবনায় প্রথম থেকে সে বিশ্বাস করতে পারে।

শিপ্রা বলে, বালিগঞ্জের দিকে ছোটো একটি বাড়ি ভাড়া নেব অনি। প্রত্যেক শনিবার বিকেলে হোস্টেল থেকে গিয়ে সোমবার পর্যন্ত তুই আমার কাছে থাকবি।

অনিন্দিতা সরলভাবে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের খরচ চলবে কী করে? এখানে না থাকলে মন্টুর বাবা একটি পয়সা দেবেন না।

শিপ্রাও সরলভাবে হেসে বলে, বিয়ের পর আমি কি মন্টুকে ভেসে বেড়াতে দেব রে অনি! ওকে তুই একেবারে চিনতে পারিসনি। দায়িত্ব দিলেই ও দায়িত্ব নেবে। মাসে তিন-চারশো টাকা ও রোজগার করতে পারে।

এ সব লোভ দেখিয়েছে নাকি?

দেখিয়েছে। কিন্তু তুই যা ভাবছিস তা নয় অনি। এ সব শুধু লোভ-দেখানো হলেও শিপ্রা ঠকবে না। একমাস করে আমি এখানে থাকলে বুড়ো খুশি হয়ে এগারো মাস কলকাতায় থাকার খরচ দেবে। ছেলের বউ দুবার পায়ের ধুলো নিলে সিন্দুকের চাবি পর্যন্ত তার আঁচলে বেঁধে না দিয়ে রাত্রে ওঁর ঘুম হবে ভাবিস? মন্টুর বাবাকেও তুই চিনতে পারিসনি অনি।

অনিন্দিতা বলে, চিনতে আমি কারুকেই পারি না শিপ্রাদি। তোমাকেও নয়।

শিপ্রা সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখে, ছলছল চোখে তাকিয়ে মিষ্টি মোলায়েম গলায় বলে, এবারটা ঠকেই শেখ অনি। জীবনে আর ভুল হবে না। আমি তোর টিচার ছিলাম, আমার কাছে শিখতে দোষ কী?

অনিন্দিতা কাঁধ থেকে তার হাত নামিয়ে আঙুলগুলি মুঠো করে ধরে। হাসিমুখে বলে, তোমায় ভালোরকম গুরুদক্ষিণা দেব শিপ্রাদি।

শিপ্রা বলে, আমার সঙ্গে কনসাল্ট করে দিস। দু জায়গা থেকে এক রকম প্রেজেন্ট পেলে বিশ্রী লাগে।—ছাড়, হাত ছাড়। আংটিটা বিঁধছে।

অনিন্দিতার মুষ্টির চাপে পরাশরের দেওয়া আংটিতে শিপ্রার দুটি আঙুল গর্ত হয়ে কেটে যায়। কয়েক ফোঁটা রক্তেরও আবির্ভাব হয়।

শিপ্রা একটু হেসে বলে, তুই খুব সরল অনি। তাই বড়ো বোকা।

অনিন্দিতা বোকা না হলেও শিপ্রা যে বুদ্ধিমতী দু একদিনের মধ্যে তার আরও একটি পরিচয় পাওয়া যায়। শিপ্রা রক্তকরবীর রিহার্সেল বন্ধ করে দেয়। পরাশর তার মত পরিবর্তনের চেষ্টা করে। সে পরাশরের অবাধ্য হয়। পরাশর রাগ করে। সে নির্বিকার হয়ে থাকে। বলে, ও সব ছেলেমানুষি ভালো নয়।

যে দৃষ্টি দিয়ে মানুষ বিপদের পরিমাপ করে শিপ্রাকে সেই দৃষ্টিতে ঈষৎ ভীতা করে তুলে পরাশর বলে, তুমি শেষ পর্যন্ত অনিন্দিতা হয়ে উঠবে না তো শিপ্রা?

শিপ্রা থাকাই সহজ।

শিপ্রার এই আশ্বাসকে অনিন্দিতা যেচে সমর্থন করলে। পরাশরকে সে অভয় দিয়ে বললে যে শিপ্রার যতটুকু স্বাভাবিক সেটুকু কৃত্রিম, পরাশরেব চিন্তার কারণ নেই। কোকনদে এসে শিপ্রা পাগল হয়ে গিয়েছে। একবার পাগল হয়ে মানুষ যদি বা মাঝে মাঝে শ্রান্ত হয়ে পাগলামি স্থগিত রাখে— পাগলামি তার জীবনে কখনও ঘোচে না। চিরজীবন উন্মাদিনী থেকে শিপ্রা পরাশরের জীবনকে ভরপুর করে রাখবে।

পরাশর সভয়ে বললে, তোমার এ মন্তব্যে sarcasm নেই তো অনি!

না। খাঁটি শুভানুধ্যায়ীর মন্তব্য বলে গ্রহণ করো।

পরাশর আত্মগোপন করে বললে, জীবনটা তাহলে জমবে।

বরফের মতো। ঠান্ডা আর শক্ত।

তাই বা মন্দ কী? বরফ দিয়ে আইসক্রিম হয়, পাথর চিরকাল পাথর।

এমনিভাবে হেঁয়ালিতে কথা বলার জন্য তাদের মন খারাপ হয়ে যায়। শিপ্রাকে সঙ্গে নেবাব কথা ভুলে গিয়ে পরাশর একা চলে যায় পুকুরে, পুকুরের মাঝখানে সাঁতার দেবার চেষ্টা না করে চোখ বুজে চিত হয়ে ভাসে। অনিন্দিতা শিপ্রাকে পরাশরের গন্তব্য স্থানের সন্ধান বলে দিয়ে অবেলায় বাড়ির পাশের পোড়ো জমিটাতে ইজেল খাড়া করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে।

একটি একটি করে দিন চলে যায় কোকনদের আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদটি কলায় কলায় বাড়তে থাকে। পূর্ণিমার আগের রাত্রে পরাশর ও শিপ্রার বিবাহের সময় স্থির হয়েছে বলে চাঁদের নৈশ বৃদ্ধিতে অনিন্দিতা মৃদু কৌতূহল বোধ করে।

শিপ্রা তার হাজারিবাগের পিসিমাকে পত্র লিখেছিল। পত্রে সে প্রস্তাব করেছিল যে পিসিমা যদি কলকাতায় এসে তার বিয়েটা দিয়ে দেন তবে বড়ো ভালো হয়। পিসিমা চিঠির জবাবে লিখেছেন, তাঁব বড়ো টাকার টানাটানি, কলকাতায় বাড়ি ভাড়া করে শিপ্রার বিয়ের আয়োজন করার সংগতি তাঁব নেই। শিপ্রা টাকা পাঠালে ব্যবস্থা করতে পারেন। শিপ্রা নিঃসংকোচে এ চিঠি পরাশরকে দেখিয়েছে। পবাশর বলেছে, তাই তো!

তখন শিপ্রা বুদ্ধি খাটিয়ে এক উপায় উদ্‌ভাবন করেছে। কোকনদে বিয়ে হতে কোনো অসুবিধা নেই, তার উদ্‌ভাবিত উপায়ের মর্মকথাটি এই। এবং কোকনদেই যদি বিয়ে হয়, অনিন্দিতার বাড়িতে না হলে তাকে বিশেষ অপমান করা হবে। এ বিয়ে যে হচ্ছে অনিন্দিতাই কি তার কারণ নয়? তাছাড়া সে তাদের দুজনেরই বিশিষ্ট বান্ধবী। প্রস্তাবটা যে অনিন্দিতার দিক থেকেই ওঠা উচিত ছিল এটা খেয়াল করে তারা দুজনেই অস্বস্তি বোধ করে, কিন্তু মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না। পরাশরের বাবা ও মা শেষ পর্যন্ত মত দিলেও এ বিয়ে তাঁরা অনুমোদন করেননি, গম্ভীর উদাসীন হয়ে আছেন। পাত্রপক্ষের বিয়ের আয়োজনও অনিচ্ছুক মন্থর গতিতে চলেছে। পাত্রীর এক পিসিমা পৃথিবীর কোথাও আছে এবং পাত্রীপক্ষে যতটুকু আয়োজন দরকার তিনিই তা করবেন এমনি একটা আভাস পেয়ে পরাশরের আত্মীয়স্বজন চুপ করে আছে। এখন এ পক্ষের ব্যবস্থার ভারটাও তাঁদের নিতে বলার সাহস পরাশরের নেই।

শিপ্রা ইচ্ছা করলে এই অসুবিধা রদ করতে পারত। দুটি সুব্যবস্থা সম্ভব ছিল। হাজারিবাগের পিসিমাকে মধু বোসের আর্থিক অবস্থার বিবরণ লিখে জানিয়ে অভয় দিলে তিনি কলকাতায় ছুটে এসে উৎসবের আয়োজন করতেন। কলকাতায় শিপ্রার কয়েকটি বন্ধু আছে। তাদের অনুরূপ বিবরণ দিয়ে পত্র লিখলে তারা দরকার হলে চাঁদা করেও শিপ্রার বিয়েতে দু-চারশো টাকা খরচ করতে পিছপা হত না। কিন্তু শিপ্রা অনেক ভেবে এদিক দিয়ে কোনো চেষ্টাই করেনি। পরাশরেব কাছে নিজেকে সে অসহায় অনন্যনির্ভর করে রাখতে চায়। পরাশর শুধু ভালোবেসেই তাকে গ্রহণ করছে না, তাকে দয়া করছে। সহায়-সম্পদহীনা এক নারীর প্রতি এ তার অনন্ত অনুগ্রহ। শিপ্রা জানে এই করুণার ভেজাল-মেশানো প্রেম খাদ-মেশানো সোনার মতো খাঁটি জিনিসটির চেয়ে শক্ত হয়। চারিদিক থেকে বাধা ও আঘাত পেয়ে শেষের দিকে পরাশর যদি ভালোবাসাকে অস্বীকারও করতে চায়, এই ভেজালকে তার মানতে হবে। জগতে যার কেউ নেই তাকে সে কোনো কারণেই ভাসিয়ে দিতে পারে না।

শুক্লা নবমীর সকালে অনিন্দিতার কাছে সে-ই কথা পাড়ল। বললে, নিজের ভার আর বইতে পারি না অনি।

অনিন্দিতা শাড়ি-গামছা কাঁধে ফেলে চশমার খাপ খুঁজছিল, অন্যমনস্ক ব্যস্ততার জন্যই বোধ হয় তার কথা রূঢ় শোনাল, গাড়িঘোড়ার ব্যবস্থা তো হয়েছে।

শিপ্রা আরও নরম হয়ে বলল, একটা মুশকিল হয়েছে অনি।

মুশকিল বাধা নয়, সর্বনাশের সূচনাও নয়। তবু অনিন্দিতা চশমার খাপের কথা ভুলে গেল। কী মুশকিল শিপ্রাদি? পরাশরের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে?

মুশকিলের বিবরণ দেওয়ার পরিবর্তে শিপ্রা পরাশরের সঙ্গে তার পরামর্শের বর্ণনা খানিক কমিয়ে খানিক বানিয়ে ব্যক্ত করল। মনে হল, এ বিষয়ে তার নিজের যেন কোনো বক্তব্যই নেই। সে শুধু দূতী। পরাশরেরই একটা অনুরোধ সে অনিন্দিতার কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। নিজের ভার বহনে তার অক্ষমতার সকরুণ ভূমিকাটির সঙ্গে ঠিক খাপ না খাওয়ায় কথাগুলিতে এতখানি দুর্বিনয় প্রকাশ পেল যে অনিন্দিতা গম্ভীর হয়ে গেল।

পুকুরে চলো শিপ্রাদি। স্নান করতে করতে পরামর্শ হবে।

কোন পুকুরে যাবে?

পরাশরদের পুকুরে। পরাশরকেও ডেকে নেব।

শুনে শিপ্রার অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হৃদয়খানি হঠাৎ আত্মবিস্মৃত হয়ে গেল। তার মনে হল পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীবন যে স্বকেন্দ্রীয় তার এই নির্মল জ্ঞান পরিপূর্ণ সত্য নয়। অনিন্দিতার মতো মেয়েরা সংসারের রূঢ়তম নিয়মগুলিকেও মাঝে মাঝে বাতিল করে দিতে পারে।

মধু বোসের বাগানে পুকুরটির চারিদিকে এতগুলি ফলের গাছ আছে যে বেলা দশটার আগে শীতল জলের সঙ্গে উষ্ণ রোদের মিলন হয় না। তারা তিনজনে যখন পুকুরে ঘাটে গিয়ে দাঁড়াল সূর্য তখন আকাশের অনেক নীচে পড়ে আছে, পুকুরের কালো জল নিবিড় ছায়ায় তরল রাত্রির মতো রহস্যময়। পরাশর ও শিপ্রা মাঝে মাঝে কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু কথায় যাঁর দখল অসাধারণ তার মুখে আজ কথা নেই। শুধু কথা নেই নয়, তার মুখের স্বচ্ছ সরলতায় একটা দুর্বোধ্য পাণ্ডুর কালিমা ঘনিয়ে এসেছে। মুখের কোন রেখা কীভাবে জটিল বক্রতা অবলম্বন করেছে কারও পক্ষেই তা অনুমান করা সম্ভব নয়, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালে একটু-একটু ভয় করে। এতকাল নিজস্ব মুখরতায় ওর হৃদয়ের স্পন্দনটি পর্যন্ত ধ্বনিত হয়েছে, আজ স্তব্ধতা পর্যন্ত মুখর বলে ওকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

ঘাটে পৌঁছে অনিন্দিতা বললে, তুমি বসো পরাশর। আমরা জলে নামব।

শিপ্রা বললে, আমি যে কস্টুম আনিনি অনি?

অনিন্দিতা বললে, আমিও তো আনিনি!

শাড়ি পরে সাঁতার দিতে পারব না।

সাঁতার দিতে তোমায় কে বলেছে?

হাত ধরে একান্ত অনিচ্ছুক শিপ্রাকে অনিন্দিতা একরকম টেনে জলে নামিয়ে নিয়ে গেল। জলের নীচেই ঘাট পিছল। বুক জলে পৌঁছে থামবার চেষ্টা করে শিপ্রা থামতে পারল না, অনিন্দিতার আকর্ষণে তাকে পুকুরের মাঝখানে যেতে হল। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে সে বললে, হাত ছাড় অনি! ডুবে যাব।

অনিন্দিতা বললে, তুমি কতক্ষণ ডুবে থাকতে পার শিপ্রাদি?

শিপ্রা কেঁদে বললে, এক সেকেন্ডও পারি না অনি ছেড়ে দে। ঘাটে ফিরে যেতেই প্রাণ বেরিয়ে যাবে।

অনিন্দিতা মৃদু হেসে বললে, রোজ সকালে পরাশরেব কাছে তবে শিখলে কী? সকালটা যে তোমাদের পুকুরের জলেই কাটত!

গলা উঁচু করে সে ঘাটের পরাশরকে চেঁচিয়ে বললে, আমরা ডুবে থাকাব কম্পিটিশন দিচ্ছি পরাশর, তুমি আম্পায়ার। পার্শিয়ালিটি কোরো না।

এক হাতে শিপ্রার গলা জড়িয়ে ধরে আরেক হাতে জল কেটে অনিন্দিতা তলিয়ে গেল। পরাশর জামা খুলে সিঁড়ি বেয়ে জলের ধারে নেমে এসেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল না। ফিরে গিয়ে ঘাটের পাকা আসনে বসে জামাটি গায়ে দিয়ে ধীরে ধীরে বোতাম আটকাতে লাগল। অনিন্দিতা ও শিপ্রা তখন ভেসে উঠেছে। তার নাম ধরে শিপ্রার তীক্ষ্ণ সুতীব্র চিৎকার আবার যখন পুকুরের শান্ত জলের তলে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল তখনও তার শেষ বোতামটি আটকানো হয়নি।

এবার যখন তারা ভেসে উঠল শিপ্রা নির্বাক হয়ে গেছে। অনিন্দিতা তাকে টেনে ঘাটে নিয়ে এল। অতিকষ্টে ওর প্রাণরক্ষা করেছে পরাশর। নতুন সাঁতার শিখে অতদূরে ওর যাওয়া উচিত হয়নি। ঘাটে তুলে নিয়ে যাও, আমি শাড়িটা খুঁজে না এনে উঠতে পারছি না।

পরদিন শিপ্রাকে স্টিমারে তুলে দিয়ে অনিন্দিতা বললে, সত্যি বলছি শিপ্রাদি তুমি ডুবে যাচ্ছ পরাশর তা বুঝতে পারেনি. তাছাড়া আমি ছিলাম কিনা। আমি এমন সাঁতার জানি যে পরাশরকে পর্যন্ত আমি জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলতে পারি। আমি ছিলাম বলে ও জলে নামা দরকার মনে করেনি।

শিপ্রা কিছু বলল না। নদীর জলীয় বাতাসে তার শীত করছিল। জলের দেশে এসে পুকুরের জলে আর চোখের জলে তার দুটি চোখ লাল হয়ে গেছে। জলে ডুবে আকস্মিক অপমৃত্যু লাভের এটা পরবর্তী অবস্থা।

সর্পিল

প্রান্তরের প্রান্ত মিলিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল।

· গ্রামে প্রবেশ করিবার আগে পালকি থামাইয়া অনন্ত একবার নামিয়া পড়িল, দাঁড়াইল প্রান্তরের দিকে মুখ করিয়া। অতিক্রান্ত পথটি বহুদূর অবধি নজরে পড়ে। যে নিঃসঙ্গ বটগাছটি অনেকক্ষণ আগে ছাড়াইয়া আসিয়াছিল, এতদূর হইতে তার অবস্থান আরও করুণ ও রহস্যময় মনে হয়। তার পর দিগন্তে মেশানো পৃথিবীর সীমা। বেলা দশটায় যে ক্ষুদ্র স্টেশনটিতে সে অবতরণ করিযাছিল, তাহাকে অনুসরণ করিয়াই যেন ওই দিগন্ত সেই স্টেশনটি পার হইয়া আসিয়াছে। ডাহিনে বামে অর্ধচক্রাকার তরুশ্রেণি, পাশপাশি প্রান্তরটির বিস্তার তিন-চার মাইলের বেশি হইবে না। অদূরে প্রকাণ্ড একটা দীঘির জল চকচক করিতেছে। তাহারই তীরে কোনো কৃষকের অস্থায়ী হোগলার ঘর। দিবারাত্রি ওই ঘরে থাকিয়া সে তাহার শস্যভরা কয়েক বিঘা পৃথিবীকে পাহাবা দেয়।

করতলের ছায়ায় চক্ষুকে আশ্রয় দিয়া অনন্ত চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। পত্র লিখিয়া কেতকী তাহাকে এত দূরে এমন দুর্গম গ্রামে টানিয়া আনিবে কে ভাবিয়াছিল!

কিন্তু দুর্গম গ্রামেও পালকি থামিল না। গ্রামবাসীর বিস্মিত দৃষ্টি ও কুকুরজাতীয় কতকগুলি জন্তুর সচিৎকার অভিনন্দন সংগ্রহ করিয়া গ্রাম ছাড়াইয়া পালকি জঙ্গলাকীর্ণ কাঁচাপথ ধরিল। থামিল আরও প্রায় আধ মাইল গিয়া।

কেতকীই পালকি বেহারা পাঠাইয়াছিল, সুতরাং ভুল হইবার কথা নয়। সম্মুখেই কেতকীর আধুনিক বাসগৃহ।

কিন্তু গৃহ বলিয়া চেনা কঠিন। এ যেন রূপধরা পুরাতত্ত্ব।

সেকেলে তিনমহাল বাড়ি, একসারিতে খানচারেক ঘর ছাড়া বাকি সমস্তটাই প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এখানে দাঁড়াইয়া আছে খানিকটা ভাঙা দেওয়াল, ওখানে ঝুলিতেছে ছাদের একটু অংশ ও কড়িবর্গার কঙ্কাল,—যে প্রাচীর একদিন গৃহটিকে আড়াল করিয়া রাখিত তাহার চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকে শুধু ইঁটের স্তূপ ও আগাছার জঙ্গল। দেউড়িটা বিপজ্জনক অবস্থায় কোনোমতে খাড়া আছে. দেউড়িটার সামনে একটি বৃহৎ অশ্বত্থ তরু বিস্তৃত ছায়া ফেলিয়া স্থানটির অস্বাভাবিক স্তব্ধতা দ্বিগুণ নিবিড় করিয়া তুলিয়াছে।

অদূরে একটি মন্দির।

প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় মন্দিরটি বেশি পুরাতন নয়, কিন্তু ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে ভুল ভাঙে। বুঝিতে পারা যায়, মানুষের যে গৃহ আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়া গিয়াছে, দেবতার এই আবাসটির বয়স তার চেয়ে কম নয়। কিন্তু আজও জীর্ণতা দেখা দেয় নাই, একটি ইটও খসিয়া পড়ে নাই। কাল যেন দেবতার ভয়ে মন্দিরকে শুধু স্পর্শ করিয়া গিয়াছে, আঘাত করে নাই।

সিঁড়িটা ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু সে কীর্তি কালের নয়। কত কাল ধরিয়া কত মানুষের পায়ের আঘাত সিঁড়িটা সহিয়াছে তার ঠিকানা নাই। তাহা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত মানুষ যে দেবতার কাছে পৌঁছিবার কাজে তাহাকে লাগাইতে পারে এইটুকুই আশ্চর্য।

নিবিষ্ট চিত্তে মন্দির দেখিবার ফাঁকে কখন কেতকী আসিয়া নিকটে দাঁড়াইয়াছিল অনন্ত টের পায় নাই। কেতকী কথা বলিতে সে একটু চমকিয়া উঠিল।

তিন বছর পরে তুমি এলে—

অনন্তের চমক লক্ষ করিয়া কেতকী হাসিয়া কথাটা শেষ করিল,—আর বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছ মন্দির!

অনন্তও হাসিল। বলিল, অভ্যর্থনা করার জন্য তুমি দেউড়িতে দাঁড়িয়ে নেই দেখে রাগ হয়েছিল। কেতকী বলিল, দাঁড়িয়ে থাকতাম, কিন্তু তুমি এত আগে এসে পড়বে ভাবিনি। এখানে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে যায়।

ভালো ভালো খাবার ঘুষ পেয়ে বেহারারা উড়ে এসেছে। অত খাবার পাঠিয়েছিলে কেন বলো তো?

বলিয়া অনন্ত হাসিতে লাগিল। কেতকী বলিল, বিলিয়ে দিয়েছ বেশ করেছ, নিজে পেট ভরে খেয়ে নিয়েছিলে তো?

নিয়েছিলাম। আর খেতে খেতে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছিলাম এই ভেবে যে, আমি কী খেতে ভালোবাসতাম সব তোমার মনে রইল কী করে! লেবুর শরবতটি পর্যন্ত তো ভোলনি?

কেতকীর মুখের পাশে রোদ পড়িয়াছিল, একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিয়া সে বলিল, যেন কত জন্ম কেটে গেছে, ভোলাই উচিত! তিন বছরেই মানুষের স্মৃতি লোপ হয় এই বুঝি তোমার ধারণা? কী করে চিনলাম ভেবে তো কই আশ্চর্য হলে না?

অবিকল এমনিভাবে কেতকী হাসিত, এমনি ভঙ্গিতে কথা কহিত, প্রত্যেকটি বাক্য তাহার এমন রসাত্মক লাগিত যেন এক একটি সংক্ষিপ্ত স্বতন্ত্র কাব্য।

অথচ পরিবর্তন হইয়াছে। এত বেশি হইয়াছে যে তাহা লইয়াই আর একটু হইলে সে প্রথম কথা আরম্ভ করিয়া দিত। ভারী ছেলেমানুষি শোনাইত তাহা হইলে। মনে হইত এ একটু নূতনভাবে ভদ্রতার কুশল প্রশ্নটিই সে করিয়াছে। তিন বছর পরে দেখা হওয়ার প্রথম দিকে অসংখ্য ছোটোখাটো প্রশ্নোত্তরের মধ্যে পরিবর্তনের বিবরণ দাখিল করিতে কেতকীরই কি ভালো লাগিত?

কুশল জিজ্ঞাসা কবিতে আশঙ্কাও হয।

গায়ের রং মলিন হইয়া দেহের গড়ন ভাঙিয়া গিয়া কী চেহারাই আজ ইহার হইয়াছে? মুখে লাবণ্যের লেশ নাই, চোখ দুটি স্তিমিত। অসময়ে গা ধুইতে গিয়া স্নান কবিয়া আসিয়াছে, তবু!

এখন যে তুমি স্নান করেছ কেতকী? পুজো করবে না কি মন্দিরে?

আমি ওই মন্দিরে পুজো করব? কেতকী যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।

মন্দিরে পুজো হয় না?

হয। ও করে।

এবার অনন্তের আশ্চর্য হইবার পালা। শঙ্কর দেবমন্দিরে পূজা করে! সেই দেবদ্রোহী বিলাসী শঙ্কর! হঠাৎ সে কোন দেবতার প্রতি ভক্তি অর্জন করিয়াছে?

এটা কোন দেবতার মন্দির কেতকী?

কেতকী মাথা নাড়িয়া বলিল, দেবমন্দির তো নয়। ওর মধ্যে দেবতা নেই।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, বিগ্রহ নেই তো শঙ্কর পুজো করে কার?

পাংশুমুখে কেতকী বলিল, কুগ্রহের পুজো করে। দুষ্টগ্রহের পুজো করে। ওর কথা বাদ দাও।

সেটা কঠিন কাজ। কেতকীর স্বামীর সম্বন্ধে এত বড়ো কথাটা বাদ দেওয়া যায় না। অনন্ত বলিল, কুগ্রহ দুষ্টগ্রহের কথাটা আমায় বুঝিয়ে দাও তো, শুনি।

কেতকীর চোখ ছলছল করিয়া আসিল, কী বোঝাব? সাতপুরুষের পাগলামি ওর কাঁধে ভর করেছে. এখানে এসে থেকে এমন ভয়ংকর কালীভক্ত হয়েছে যে সে আর বলার নয়। ও মন্দিরে কালীমূর্তি আছে, কিন্তু ও কালীমার পুজো করে না, নিজেব পাগলামির পুজো করে।

অনন্ত একটু ভাবিয়া বলিল, চলো, মা কালীকে দর্শন করে আসি।

কেতকী সভয়ে বলিল, না।

না কেন?

কেতকীর মুখ পাংশু হইয়া গিয়াছিল, ঢোঁক গিলিয়া সে বলিল, ভয় পাবে। মা কালী বলে চেনা যায় না,—মনে হয় খাঁড়া হাতে জমাট-বাঁধা অন্ধকার। দু চোখ হিরার মতো জ্বলজ্বল করছে। দিনের বেলাও মন্দিরে ভালো করে আলো যায় না, প্রদীপ জ্বেলে দেখতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমার দুচোখে দুটো প্রদীপ দপ্ করে জ্বলে ওঠে। প্রথম দিন একা গিয়ে ওই দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলাম।

কেতকী একবার শিহরিয়া উঠিল। এবং তাহাতেই তাহার শরীর ও মনের বর্তমান অবস্থা অনন্তর কাছে সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হইয়া গেল।

কিন্তু সে কিছুই বলিল না। কেতকীর আত্মসংবরণের প্রক্রিয়াটা নীরবে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

চলো, ঘরে যাই,—কেতকী বলিল।

চলো। চিঠিতে তুমি আমায় কোনো খবরই দাওনি কেতকী! পদে পদে অপ্রস্তুত হচ্ছি।

এ সব কী চিঠিতে জানানোর মতো খবর?

না, তা নয়।—অনন্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। এ সব মানে যে সব খবর অতি সামান্যই সে জানাইয়াছে। সেটুকুও চিঠিতে লেখা কেতকীর পক্ষে সত্যই অসম্ভব। এ বাড়ির ছবি কি চিঠিতে ওঠে! কেতকীর এই শীর্ণ পাণ্ডুর মুখচ্ছবির বর্ণনা কেতকীর ভাষাতে নাই—চিঠির ভাষাতে তো একেবারেই নাই।

দেউড়ির নীচে আসিয়া কেতকী হাসিয়া বলিল, অমন করে ওপর দিকে তাকাচ্ছ যে? আমি যখন সঙ্গে আছি ভয় নেই।

তুমি সঙ্গে থাকলে বুঝি মাথায় ইট ভেঙে পড়তে পারে না?

কই আর পারে? তিনবছর এর তলা দিয়ে যাতায়াত করছি, চুনবালিও তো কোনোদিন মাথায় খসে পড়েনি। জানো, এ বাড়ির বিপদ আমায় এড়িয়ে চলে।

অনন্ত থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

তবে এইখানে দাঁড়িয়ে তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কেতকী। এ ভাঙা দেউলে এসে নীড় বাঁধার দরকার হল কেন তোমাদের?

সাতপুরুষের ভাঙা দেউল ছাড়া মানুষ আর কোথায় শান্তি পাবে বল?

অনন্ত বিচলিতভাবে বলিল, এমন ভয়ানক শান্তির দরকার পড়ল কার? তোমার না শঙ্করের?

ওঁর। স্বামীর শান্তিতেই স্ত্রীর শান্তি।

এ কথার সত্যমিথ্যা ভগবান জানেন, অনন্ত নীরবে চলিতে আরম্ভ করিল। ইটের স্তূপ বেড়িয়া আঁকাবাঁকা সরু পথ ঘর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে—শঙ্কর ও কেতকীর পায়ে পায়েই পথটি গড়িয়া উঠিয়াছে বোধ হয়।

অনন্ত ভাবিতে লাগিল, শঙ্করের জীবনে যে শান্তির অভাব ঘটিয়াছিল সে তো তাহা টের পায় নাই? শহরের বাস তুলিয়া দিয়া জমিদারিতে গিয়া বাস করিবে অকস্মাৎ সে সময় শঙ্কর এই সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছিল, তার কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাহার মধ্যে অনেক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল সত্য, কিন্তু তার কারণ যে অশান্তি এরূপ অনুমানের কোনো সংগত কারণই ছিল না। যে গাম্ভীর্য তাহার আসিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত, জীবনের সর্বপ্রকার অগভীর আনন্দ উৎসবে যে ক্রমবর্ধমান বিমুখতা দেখা দিয়াছিল তাহা ছিল প্রশান্ত। মনে হইয়াছিল, সে ভাবিতে শিখিয়াছে। প্রত্যেক মানুষের যে একটি করিয়া নিজস্ব অন্তর্জগৎ আছে ধীরে ধীরে তাহার সন্ধান পাইতেছে। অনেকের জীবনেই এ রকম ঘটে। শুধু বাঁচিয়া থাকার মধ্যেই এমন কতকগুলি চিরন্তন রহস্য আছে সচরাচর যাহার

খবর সব মানুষ রাখে না, তুচ্ছ কোনো উপলক্ষে হঠাৎ একদিন সেগুলো মানুষকে চিন্তিত করিয়া তোলে, বিচলিত করিয়া দেয়। শঙ্করের জীবনেও এমন কিছু ঘটিয়াছে মনে হইয়াছিল। উপলক্ষটাও কিছু কিছু সে অনুমান করিতে পারিয়াছিল বইকী!

সে যে শঙ্করের অশান্তির বহিঃপ্রকাশ এ কথা কিন্তু কল্পনা করাও চলে নাই।

অথচ নিদারুণ অশান্তিতেই যে তার দিন কাটিতেছিল, আজ আর তাহাতে সংশয় করা যায় না। এখানে কি মানুষ বাঁচিতে পারে যে, সাধ করিয়া অকারণে এখানে সে বাসা বাঁধিয়াছে! বেশি দিন হয় নাই, কত টাকা খরচ করিয়া বাগান-ঘেরা ছবির মতো বাড়ি কিনিয়াছিল, বিলাসের আয়োজনের কোনো অভাব রাখে নাই। শহরের সব রকম সুখসুবিধা সে সেখানে লাভ করিত, শিক্ষিত মার্জিত নরনারীর সঙ্গ পাইত, হাসি ও সংগীতে সুমধুর সন্ধ্যা যাপন করিত। আর পাইত কেতকীর ভালোবাসা। এখানকার এই শীর্ণা সন্ত্রস্তা কেতকীর ভালোবাসা নয়, সে তখন ছিল হাস্যমুখী কল্যাণী বধূ।

সেই জীবন পিছনে ফেলিয়া আসিয়া অকারণে শঙ্কর এখানে তাহার সমাধি খুঁজিয়া নেয় নাই। আগাছা কাটাইয়া ইটের স্তূপ সরাইয়া ঘর কখানার একটু সংস্কার করিবার ইচ্ছারও তার এখন অভাব। আধুনিকতম আবেষ্টনী হইতে ছুটিয়া আসিয়া ধূলিসাৎ শতাব্দীর গৌরবে সে মুখ গুঁজিয়া দিয়াছে।

শঙ্করের সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার দিন সে যে কাণ্ড করিয়াছিল, তাহাতেই তাহাকে পাগল মনে হইয়াছিল, কিন্তু ইহার তুলনায় সে পাগলামি কত তুচ্ছ!

সে রাত্রির কথা তোমার মনে আছে কেতকী?

কোন রাত্রির কথা?

শঙ্করের অসুখ হয়েছিল, বিছানার দু পাশে বসে আমরা রাত জেগেছিলাম?

পড়ে বইকী মনে। সে অসুখ তো আর ভালো হল না। দুমাস ছটফট করে পাগলের মতো এখানে ছুটে এল। পরদিন তোমার জাপান যাবার কথা ছিল।

অনন্ত চিন্তিতভাবে বলিল, হ্যাঁ। শঙ্কর ঘুমোলে বিদায় দিতে তুমি আমার সঙ্গে গেট পর্যন্ত এসেছিলে। কী সব অদ্ভুত কারণ দেখিয়ে চিঠি লিখতে বারণ করেছিলে এখনও স্পষ্ট মনে আছে কেতকী। বাকি রাতটুকু শঙ্কর ঘুমিয়েছিল?

এতদিন পরে কী প্রশ্ন!

মাথা নাড়িয়া কেতকী বলিল, না। ফিরে গিয়ে দেখি বিছানায় উঠে বসে নিজেই কপালে বরফ ঘষছে।

খুব ধীরে ধীরে হাঁটিলেও এতক্ষণে তারা ঘরের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিল।

অনন্ত গলা নামাইয়া বলিল, সেদিন হঠাৎ ওর কী হয়েছিল আজও ঠিক বুঝে উঠতে পারি না কেতকী।

কেতকী বলিল, মাথার মধ্যে ভূমিকম্প হয়েছিল।

দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনন্ত যেন ঘরের ভিতরের দৃশ্যটা চোখে সহাইয়া নিতে লাগিল। দারিদ্র্যকে ঘরের মধ্যে সযত্নে বরণ করিয়া নেওয়া হইয়াছে। প্রত্যেকটি জিনিস যেন অভিনয় করিতেছে,—দারিদ্র্যের। তক্তপোশে কম্বলের শয্যা—কম্বলটা পুরু শালের মতো দেখিতে এবং সম্ভবত খুবই কোমল। ঘরের মাঝখানে বেতের একটি ক্ষুদ্র কৌচ। মেঝে জুড়িয়া ছেঁড়া বিবর্ণ গালিচা পাতা, শঙ্করই হয়তো একদিন যাহা তিন-চারশো টাকায় কিনিয়াছিল। উত্তর দিকের দেওয়াল ঘেঁসিয়া কপাটভাঙা একটা আলমারি বোঝাই বই।

খদ্দরের মোটা চাদর গায়ে জড়াইয়া এক প্রান্তে কার্পেটের আসনে সিধা হইয়া বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছে স্বয়ং শঙ্কর। ছোটো করিয়া চুল ছাঁটিয়া মাথার পিছনে সে স্থূল শিখা রাখিয়াছে, কপালে আঁকিয়াছে রক্তচন্দনের স্বস্তিক।

কে, অনন্ত? বলিয়া সে ভয়ানক আশ্চর্য হইয়া গেল। বইটা সশব্দে বন্ধ করিয়া বলিল, কিন্তু আসবে আশা করিনি। তারা! তারা! কত অদ্ভুত ঘটনাই তোমার পৃথিবীতে ঘটে!

কী অভ্যর্থনা! অনন্ত হতবাক হইয়া গেল।

কেতকী বলিল, আমি ওকে আসবার জন্য চিঠি লিখেছিলাম।

বেশ করেছিলে, কিন্তু কথাটা সময়মতো আমায় জানানো বুঝি তুমি উচিত বিবেচনা করনি?

স্বামীর অসম্ভব গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া কেতকী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, না। সময়মতো জানালে তুমি ওকে আসতে বারণ করতে।

শঙ্কর একটা অদ্ভুত হাসি হাসিল। তারা! তারা! তোমার সন্তানকে সবাই কী ভুলই বোঝে মা! আসতে বারণ করতাম না কেতকী। অভ্যর্থনার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে আমিও সাদর আহ্বান জানাতাম। ও তোমার বাল্যবন্ধু হতে পারে ; কিন্তু বেশি বয়সে কি বন্ধুত্ব হয় না? এসো অনন্ত, জুতো খুলে ঘরে এসে বোসো।

জুতা খুলিয়া ঘরে ঢুকিয়া অনন্ত বেতের কৌচটাতে বসিল। স্বামীর মন্তব্যের কোনো জবাব না দিয়া কেতকী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি স্নান করবে?

অনন্ত বলিল, না।

বারান্দায় জল আছে, মুখ-হাত ধুয়ে নাও তবে। আমি চা করে আনি।

কেতকী চলিয়া গেল। শঙ্কর হাই তুলিয়া বলিল, চা আনবে বলে গেল শুনে ভয় পেও না অনন্ত, সব পাবে। হিন্দুর যত কিছু অখাদ্য আছে সব।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, কী যে তুমি বল শঙ্কর!

শঙ্কর বলিল, কী বলি! ও কি হিন্দুর মেয়ে? ও সব পারে। চা-টা খাইয়ে অর্গান বাজিয়ে ও ঠিক তোমায় গান শোনাবে, দেখ। ও না পারে কী?

অনন্ত বিস্মিত হইল। মৃদুস্বরে বলিল, ওর গান তোমার আর ভালো লাগে না শঙ্কর?

শঙ্কর তীব্রকণ্ঠে বলিল, ভালো লাগে? অপমান বোধ হয়! পঁচিশ বছর আগে এ বাড়ির বউ অমন গান গাইলে তার কী করা হত জান? গলা টিপে গান বন্ধ করে জন্মের মতো বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হত। বাড়ির বউ, সে গাইবে প্রেমের গান!

অনন্ত সত্যই বিস্মিত হইয়া বলিল, প্রেমের গান গায়? এখানে?

শঙ্কর আনমনে আবার বইটা খুলিয়াছিল, কম্পিত হস্তে কয়েকটা পাতা উলটাইয়া বলিল, ও যখন গান ধরে অনন্ত, এ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে ক্রুদ্ধ মুখ দেখা দেয়। সব মুখ আমার চেনা। বাবার মুখ ওই ওখানে ফুটে ওঠে,—আঙুল বাড়াইয়া দক্ষিণের দেওয়ালের একটা অনির্দিষ্ট স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, সে কী ভর্ৎসনা তাদের চোখে অনন্ত, একটু তাকিয়ে থাকলে আপনা থেকে মাথা নিচু হয়ে যায়। সাদা ঠোঁট নেড়ে ফিসফিস করে তারা আমাকে বলে কুলাঙ্গার! কুলাঙ্গার!

অনন্ত প্রত্যেকটি দেওয়ালে দৃষ্টি বুলাইয়া আনিল। কী-ই বা দেখিবার আছে দেওয়ালে? শ্যাওলা-ধরা দেওয়ালের উপর চুনকাম করার ফলে যে আবছা অদ্ভুত চিত্রগুলি দেওয়ালের গায়ে ফুটিয়া আছে, মানুষের মুখের সঙ্গে তাহাদের কোনো সাদৃশ্যই আবিষ্কার করা যায় না।

তবু যেন শঙ্করের পাগলামিতে বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়। বলা কি যায়! শঙ্করের মুখেই তার পিতৃপুরুষের ইতিহাস সে শুনিয়াছে। আত্মার তৃপ্তি বলিতে যাহা বোঝায় তার সঙ্গে সেই মানুষগুলির সুদূরতম পরিচয়ও ছিল না। কেতকীর গানের অপমানে জাগিয়া উঠিয়া তারা যদি কোনো ঘরের দেওয়ালে ভ্রূকুটিভরা মুখে উঁকি দিতে পারে—এ ঘরের দেওয়ালে দেওয়াই সম্ভব।

শঙ্কর একাগ্র দৃষ্টিতে অনন্তকে দেখিতেছিল, হঠাৎ কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত করিয়া বলিল, এ কথাটা ওকে বলো না ভাই, ভয় পাবে। ও ভারী ভীরু।

তা জানি।

করে কি জান? রাত্রে উঠে এসে জানালা দিয়ে আমায় দেখে যায়। আমি বেঁচে আছি এইটুকু জানলেই যেন ওর ভয় কমে!

অনন্ত শঙ্কিত হইয়া বলিল, রাত্রে ও একা থাকে না কি?

থাকে বইকী, ওর মহল যে ভিন্ন।

অনন্ত বুঝিতে না পারিয়া বলিল, মহল কী?

শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া গেল,—মহল জান না!—আচ্ছা, বলি তোমায় বুঝিয়ে। এ চৌধুরী বংশের কেউ কোনোদিন স্ত্রীর আঁচল পেতে ঘুমোয়নি ভাই. সে দীনতা এ বংশের রক্তে নেই। নিজের মহলে এ বাড়ির বউ প্রদীপ জ্বেলে রাত কাটিয়েছে চিরদিন,—স্বামী খুশি হলে দর্শন দিয়েছে, খুশি না হলে দেয়নি।

অনন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, স্ত্রীকে ভালোবাসা এ বংশের রীতি নয়—না?

নাঃ, বলিয়া শঙ্কর হাসিল—মেয়েমানুষকে আমরা জয় করি, তার সঙ্গে হৃদয়-বিনিময়ের কারবার করি না। জান, আমার এক পূর্বপুরুষ রাজা ছিলেন। নিজের হৃদয়ে রাজত্ব করতে না পারলে আর রাজবংশে জন্মানো কেন?

সাবান ও তোয়ালে দিতে কেতকী যে দুয়ারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কেহই তাহা লক্ষ করে নাই। নজর পড়িতে শঙ্কর একটু দমিয়া গেল।

কেতকী মৃদুস্বরে বলিল, নিজের হৃদয়রাজ্য থেকে কী রাজস্ব তুমি বৎসরান্তে সংগ্রহ কর শুনতে পাই কি?

শঙ্কর নরম সুরে বলিল, শুনলে বুঝি আমার কথা সব?

না, সব শুনিনি। যেটুকু শুনেছি তাই ঢের। একটা কথা তুমি জেনে রেখো, যে রাজ্যে শুধু বালি ধুধু করছে, তার অধিকাব নিয়ে মেয়েমানুষ মারামারি করে না।—সে আপন মনে একটু হাসিল। শঙ্করকে কঠিন কথা বলিতে পারিলে সে যে তৃপ্তি পায়, অনন্তর কাছে তাহা আর গোপন রহিল না।

এ যেন তাবই দুর্গতি এমনি ব্যথা বোধ হয়। শত্রুকেও আঘাত করা চিরদিন কেতকীর আয়ত্তাতীতই ছিল, নিজের স্বামীকে ঘা দিয়া সে আজ হাসিতে পারে!

অনন্ত একটা নিশ্বাস চাপিযা গেল।

কেতকী অনন্তকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, বালতির কাছে সাবান আর তোয়ালে রইল। মুখ-হাত ধোবে এসো। তোমার সুটকেসের চাবিটা দাও, কাপড়-জামা বার করে দি।

চাবি নিয়া কেতকী চলিয়া গেলে শঙ্করের দুই হাতের দশটা আঙুল সজোরে পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিল। হতাশভাবে সে বলিল, দেখলে অনন্ত! চোখ রাঙিয়ে চলে গেল, ধমক দিতে পারলাম না। দেখলে!

অনন্ত চুপ করিয়া রহিল।

স্ত্রীর কড়া কথা চুপচাপ সহ্য করলাম! তারা! তারা! কী লজ্জাই আমার কপালে লিখেছিলি মা?

একটা অদ্ভুত স্তব্ধতার মধ্যে সন্ধ্যা নামিয়া আসে।

পুবের জানালার শিক ধরিয়া কেতকী বহুক্ষণ নিশ্চল নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। যে গ্রামের ভিতর দিয়া এখানে আসিতে হইয়াছিল তার চেয়ে কাছে বোধ হয় অন্য গ্রাম আছে, অনেকগুলি কুকুরের ডাক অস্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। বিকালে যে ঠান্ডা বাতাসটি বহিতেছিল হঠাৎ কখন তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে খেয়াল থাকে না। মনের মধ্যে শুধু পাক খায় শৃঙ্খলাহীন অবাস্তব চিন্তা।

তিন বছর ধরিয়া বান্ধবী ও বন্ধু যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাহা যেন ঠিক ধারণা করিয়া উঠিতে পারা যায় না।

কেতকীর চুলে যে মড়ক লাগিয়াছে খানিক আগে অনন্ত তাহা লক্ষ করিয়াছিল। কী আগুন জ্বলিতেছে ওর মাথায় কে জানে? তালু কতখানি তপ্ত হইয়া ওঠায় চুল ঝরিয়া পড়িতেছে, ওর মাথায় হাত দিয়া তাহা অনুভব করিবার জন্য হঠাৎ একসময় অনন্তর মন কেমন করিয়া ওঠে। কিশোর বয়সে কেতকী একদিন তাহার পায়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়াছিল। অনেক দিনের কথা। কেন প্রণাম করিয়াছিল আজ মনে পড়ে না, বোধ হয় কোনো কারণ ছিল না। আশীর্বাদ করিতে সেদিন যে খেয়াল থাকে নাই, সে কথাটা স্পষ্টই মনে পড়ে। বিদায় নেওয়ার সময় এবার যদি কেতকী প্রণাম করে—অকারণেই প্রণাম করে—প্রণাম করিতে হয় বলিয়া নয়,—মাথায় হাত রাখিযা সে আশীর্বাদ করিবে।

কিন্তু কী বলিয়া আশীর্বাদ করিবে?

ইহার কল্যাণের কোন পথটা আজ খোলা আছে? মনে মনেও কোনো আশীর্বচন উচ্চারণ করিলে আজ ব্যঙ্গের মতো শোনাইবে না?

কেতকী কথা কহিল।

সূর্য ডুবতে না ডুবতে পুব দিকে কী মেঘ করে এলো দ্যাখো! রাত্রে বোধ হয় খুব ঝড় হবে। কী ধুমসো কালো মেঘ!

অনন্ত বলিল, ঝড় হবে বলছ কেন? শুধু বৃষ্টিও তো হতে পারে!

কেতকী মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া বলিল, তা নিশ্চয় পারে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ঝড হবে। তা ছাড়া কী গুমোট করেছে দেখেছ? আমি রীতিমতো ঘামছি।

কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, বাইরে কারা কথা বলছে?

দেখি—

বাহিরে গিয়া অনন্ত দেখিল শঙ্কর বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছে, বারান্দার নীচে যুক্তকরে দুজন কৃষকশ্রেণির লোক। একজন একটি হৃষ্টপুষ্ট পাঁঠার গলবজ্জু ধরিয়া আছে।

শঙ্কর আপনা হইতে বলিল, রাত্রে মার কাছে বলি হবে অনন্ত। জোড়া-পাঁঠা বলি দেওয়াই নিয়ম, কিন্তু বলির কথা সারাদিন স্রেফ ভুলেছিলাম, অসময়ে লোক পাঠিয়ে একটার বেশি পাওয়া গেল না। সমস্ত রাত্রি আজ পুজো করব।

কালীপুজো?

শঙ্কর প্রশান্ত হাসি হাসিল,—তোমরা বেটিকে কালী বলেই জানো, আমরা বলি শক্তি। যার প্রলয়ংকরী শক্তির সংযমে সৃষ্টির স্থিতি। এক স্তনে বিষ সঞ্চিত রেখে অন্য স্তনের অমৃতে যে জগৎকে পালন করছে।

ওই পাঁঠাটিকে ছাড়া।

মহাজ্ঞানীর মতো মুখ করিয়া শঙ্কর বলিল, ধ্বংস তুমি চেনো না অনন্ত, মৃত্যুর স্বরূপ কিছুমাত্র বোঝো না। মার ভাণ্ডার থেকে কী কিছু হারায়? যে পোকাটিকে তুমি না জেনে পায়ের নীচে পিষে দাও, সেও না। আজ পাঁঠাটির বলি হবে, কাল কি মা আবার ওকে পালন করবেন না?

বলিয়া বারান্দার নীচে নামিয়া শঙ্কর যেন সস্নেহেই পাঁঠাটির গলদেশ চুলকাইয়া দিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ নীরবে তাহার কাণ্ড দেখিয়া অনন্ত প্রশ্ন করিল, কিন্তু একাদশীর দিন কি কালীপুজো হয়?

মার পুজোর আবার তিথি অ-তিথি কী হে সাহেব? মুখ না ফিরাইয়াই শঙ্কর এই জবাব দিল।

তা বটে!

অনন্ত কেতকীর ঘরে ফিরিয়া গেল।

শঙ্কর কি পাগল হয়ে গেছে কেতকী?

কেতকী জানালা ছাড়িয়া নড়ে নাই—এই সুস্পষ্ট বিচলিতভাবে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

তা তো জানি নে। আমার মনে হয় ওঁর রক্তে এই বিকার ছিল, হঠাৎ একদিন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে আসবার আগে আমি একটা পার্টি দিয়েছিলাম। একটা কথা শোনো বলে আমায় তেতলার সেই ছোটো ঘরে ডেকে নিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল। সেই আমার প্রথম শাস্তি পরে আর কাঁদিনি, সেদিন কেঁদেছিলাম, আর ভেবেছিলাম জাপান কতদূর?

অনন্ত মৃদুস্বরে বলিল, বসো কেতকী। বসে বলো।

কেতকী বসিয়া বলিল, তুমি তো ছিলে না, শেষ দু মাসের ইতিহাস শোনো। দুদিন তিনদিন অন্তর রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁতকে জেগে উঠত। কাঁপতে কাঁপতে বলত, কেতকী ওঠো আলো জ্বালো শিগগির! রক্তে আমি নেয়ে উঠেছি। ধড়মড় করে উঠে আলো জ্বালতাম। দেখতাম, ঘামে ওর সর্বাঙ্গ ভেসে গেছে। স্বপ্নের কথা বলতে গিয়ে ও বারবার শিউরে উঠত। গগন-ছোঁয়া কালীমূর্তি, প্রকাণ্ড জিব বুকে এলিয়ে পড়েছে, দু কষ বেয়ে স্রোতের মতো রক্ত ঝরছে—এর পায়ের কাছে স্বপ্নে ও দিত নরবলি।

কেতকী জানালার কাছে সরিয়া গেল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িতেছিল। বাহিরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বলিল, সেই থেকে আমায় এখানে এনে ফেলেছে। একটা ঝিকে পর্যন্ত কাছে থাকতে দেয় না, এক-একদিন রাত্রে আমার এমন ভয় করে!—যে তাড়াতাড়ি মেঘ বাড়ছে রাত্রে না জানি কী ঝড়বৃষ্টিই হবে!

অনন্ত বলিল, ঝড়বৃষ্টি হওয়া আর আশ্চর্য কী।

আশ্বিনে ঝড় কালবৈশাখীর চেয়ে ভয়ানক হতে পারে, তা জানো?

আগামী ঝড়ের চিন্তা যে তাহাকে বিশেষ বিচলিত করিয়াছে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়।

অনন্ত সহজভাবে বলিল, তা নিশ্চয় পারে! কিন্তু তোমাদের বাড়িতে কি সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না! অন্ধকার হয়ে গেল যে!

কে জ্বালবে সন্ধ্যাদীপ? আমি? কাজ নেই সন্ধ্যাকে অমন লজ্জা দিয়ে! বলিয়া কেতকী হাসিল, চাকর লণ্ঠন জ্বেলে আনছে।

চাকর বোধ হয় এই কাজেই ব্যাপৃত ছিল, অল্পক্ষণ পরেই ঘরে আলো দিয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে কী পরিবর্তন যে ঘটিয়া গেল বলিবার নয়। ঘর আলো হওয়ামাত্র বাহিরের অন্ধকার গাঢ় হইয়া ধ্বংসপুরীকে নিজের মধ্যে যেন সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিল। অনন্তর মনে হইল একটা বিশ্রী দুঃস্বপ্নের শেষে কেতকীর তিন বৎসর পূর্বেকার ঘরখানাতেই সে জাগিয়া উঠিয়াছে;—এ ঘরের চারিদিকে ভাঙা ইটের স্তূপ নাই, আগাছার জঙ্গল নাই, আছে ফুলের বাগান এবং বাগানের শেষে শহরের জনবহুল আলোকিত পথ।

পাশের ঘরে বাসনপত্র নাড়াচাড়ার শব্দ পাওয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর ও চাকর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল।

আমরা যাচ্ছি মা।

কেতকী বলিল, সব ভালো করে ঢেকে রেখেছ ঠাকুর? আচ্ছা, একটু দাঁড়াও।

অনন্তর দিকে চাহিয়া বলিল, খেয়ে নিয়ে তুমিও এদের সঙ্গে চলে যাও। কাছারি-বাড়িতে এরা তোমার শোবার ব্যবস্থা করে দেবে।

অনন্ত বিস্মিত হইয়া বলিল, কেন? এখানে শোবার ঘর নেই?

আছে। কিন্তু তুমি যাও। এই ভাঙা বাড়িতে রাত কাটাবে কোন দুঃখে?

কেতকীর পাংশু-মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত হাসিয়া বলিল, বেচারিরা ভয়ে ভয়ে চারিদিকে চাইছে, দরকার না থাকলে ওদের ছুটি দাও কেতকী।

তুমি যাবে না?

তুমি যদি যাও, যেতে পারি। যাবে?

কেতকী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আচ্ছা তোমরা যাও ঠাকুর।

অনুমতি পাওয়ামাত্র তারা এমনভাবে প্রস্থান করিল যে অনন্ত হাসি চাপিতে পারিল না।

কেতকী ম্লানমুখে বলিল, তুমি হাসছ, আমার যা হচ্ছে ভগবান জানেন। কী থমথম করছে চারিদিক!

অনন্ত হাসি বন্ধ করিল।

হাসা তাহার উচিত হয় নাই।

বাজনা নাই, ভক্তের কোলাহল নাই, একক পুরোহিতের নীরব পূজা। রাত্রির সঙ্গে গুমোট বাড়িয়াছে। তারার জগতে এখন মেঘের পরিপূর্ণ অমাবস্যা। কোথাও যেন শব্দ নাই, জীবনের স্পন্দন নাই, নিশ্চল পাষাণ মূর্তির সামনে ধ্যানস্থ ভক্তের মতো সমস্ত জগৎ যেন একটা ভয়ংকর অবরুদ্ধ শক্তির মুক্তি পাইবার প্রতীক্ষায় সমাধি পাইয়াছে।

মাঝে মাঝে এক একটা রাত্রিচর পাখি ডাকিয়া ওঠে, বটগাছে দুটি তক্ষক পালা করিয়া বীভৎস আর্তনাদ করে, মন্দিরের গায়ে ছোটো ছোটো চতুষ্কোণ ফাঁকগুলিতে যে বন্য-কপোতেরা আশ্রয় লইয়াছে তারা পাখা ঝাপটায়, মন্দিরের পিছনে জঙ্গলাকীর্ণ শুষ্কপ্রায় দীঘিতে ছপছপ করিয়া কী যেন হাঁটে। একটা বড়ো গুবরে পোকা দেবীকে ঘিরিয়া বোঁবোঁ করিয়া পাক খাইতে খাইতে বারকয়েক একদিকের দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া মেঝেতে পড়িয়া যায়। কিন্তু এই সব বিচিত্র শব্দে ও অবিশ্রান্ত ঝিঁঝির ডাকে স্তব্ধতা বাড়ে বই কমে না।

শঙ্করের মুখের দিকে চাহিয়া অনন্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। দেবীকে দক্ষিণে রাখিয়া সে পাশাপাশি হইয়া বসিয়াছে, ঠোঁটে মৃদু-মৃদু হাসির আভাস, অর্ধনিমীলিত চোখে স্তিমিত চাহনি। প্রশস্ত কপালে যেন অনুর্বর প্রান্তরের কঠোরতা। বলি হইয়া গিয়াছিল, প্রতিমার সামনে ছিন্ন ছাগমুণ্ডের নৈবেদ্য ও একপাত্র শোণিতের পানীয়। প্রতিমার চোখ-দুটি আগুনের মতো জ্বলিতেছে, কিন্তু রক্ত তিনি একবিন্দুও পান করেন নাই। শঙ্করের কপালেই একটি রক্তের ফোঁটা জমাট বাঁধিয়া আছে।

জামার হাতায় টান পড়িতে অনন্ত সচেতন হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখে, কেতকী কাঁপিতেছে।

চলে এসো। আমার ভয় করছে।

কথাটা শঙ্করের কানে গেল।

ভয় করছে কেতকী? মার কাছে অভয় প্রার্থনা করো।

পুনরায় অনন্তকে টানিয়া কেতকী বলিল, এসো।

শঙ্কর বলিল, মাকে প্রণাম করে যাও কেতকী। এসো মার মাথার সিঁদুর তোমায় পরিয়ে দিই। মার দয়ায় সব ভয় ভুলে যাবে। মা আমার সকলকে ক্ষমা করেন—সকলকে।

এ যেন ছাগশিশুর চেয়ে অসহায়ের উপর হত্যার চে'য়ে নিষ্ঠুর অত্যাচার। কেতকী গলায় আঁচল জড়াইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল, অনন্ত তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, মনে মনে প্রণাম করো কেতকী। মা মনের প্রণামেই খুশি হন। চলো।

আলোটা তুলিয়া নিয়া কেতকীর হাত ধরিয়া অনন্ত সাবধানে ভাঙা সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিল।

দেউড়ির নীচে তিন-চারহাত লম্বা একটা কালো মোটা সাপ শুইয়াছিল, আলো চোখে পড়িতে আধহাত উঁচু ফণা তুলিয়া স্থির হইয়া রহিল।

দুজনে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কেতকী ফিসফিস করিয়া বলিল, নড়ো না, আলো নেড়ো না। ছুটে এসে ছোবল দেবে।

অনন্ত নড়িল না, আলোও নাড়িল না, মৃদুস্বরে বলিল, এই ভদ্রলোকটির সন্ধানেই চারিদিকে চঞ্চলভাবে তাকাচ্ছিলে বুঝি? আমি ভাবছিলাম মন্দির থেকে নেমে এসেও তোমার ভয় কমেনি। কতক্ষণ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে উনি পথ দেবেন?

দু-এক মিনিট।

অভিজ্ঞতা আছে দেখছি। এ বাড়ির এই সব বিপদও কি তিনবছর ধরে তোমায় এড়িয়ে চলেছে?

কেতকী মৃদু হাসিল, সাপ আর বিপদ কী!

সাপ যে বিপদ নয় সঙ্গে সঙ্গেই সে প্রমাণ পাওয়া গেল। কেতকীর দুই হাতের মধ্য দিয়া অমনি মোটা আব একটি সাপ মন্থর গতিতে দেউড়ির তলে সঙ্গীর কাছে আগাইয়া গেল।

কেতকী বলিল, ওব বউ। ভারী শান্ত।

তা দেখতেই পাচ্ছি। এখানকার যমরাজাও ভারী শান্ত। স্বামীর গায়ের উপব দিয়ে পিছলাইয়া গিয়া শান্ত সর্পবধূ একটা ইটেব স্তূপে ঢুকিয়া পড়িল। ফণা নামাইয়া স্বামীটিও তাহাকে অনুসরণ করিল।

কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে পুনর্মিলন বেচারির অদৃষ্টে ছিল না। ইটেব স্তূপেব কাছে পৌঁছিবার পূর্বেই একটা আস্ত ইঁট কুড়াইয়া নিয়া অনন্ত সামনে আগাইয়া গেল এবং সাপের মাথা লক্ষ করিয়া সজোরে ইটটা ছুঁড়িয়া মারিল।

শিহরিয়া কেতকী অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া উঠিল, এ কী করলে?

অনন্তর তখন কথা কহিবার সময় ছিল না। ইটের আঘাতে ফণার খানিক নীচে মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাওয়ায় সাপটা ওলট-পালট খাইতেছিল, একটির পর একটি ইট তুলিয়া অনন্ত ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। সাপের ফণা ছেঁচিয়া গেল, রক্তাক্ত দেহটা একবার দড়ির মতো পাকাইয়া গিয়া আর নড়িল না, লেজের দিকটা শুধু এদিক ওদিক আন্দোলিত হইতে লাগিল।

অনন্ত হাত ঝাড়িয়া বলিল, যাক। এবার ওর শান্ত বউটা বাকি রইল।

কেতকী ধরা গলায় বলিল, কেন মারলে?

সাপ মারতে হয় কেতকী। বেঁচে থাকতে হলে ভাঙা বাড়ির সংস্কার করার মতো এও অপরিহার্য কর্তব্য।

তাই বলে ইট দিয়ে কেউ অত বড়ো সাপ মারে! যদি না লাগত? চোখের পলকে তাহলে—কেতকী শিহরিয়া উঠিল।

অনন্ত হাসিয়া বলিল, সাপটা মরে গেছে, না লাগার কথা এখন আব ওঠে না। কিন্তু প্রথমবাব তুমি যে 'এ কী করলে' বলে চেঁচিয়ে উঠলে সে তো আমার বিপদের কথা ভেবে নয়?

কেতকী বলিল, ওঁর নিষেধ ছিল। একজন চাকর একবার এতটুকু একটা বাচ্চা সাপ মেরেছিল, চাবকিয়ে উনি তার পিঠের কিছু রাখেননি। আজও বোধ হয় বেচারির পিঠেব দাগ আছে। ওঁর মতে,—মা কালীর ডাকিনী-যোগিনীরা এ বাড়িতে সাপ হয়ে আছে—মারলে মহাপাপ হয়, অকল্যাণ হয়, সর্বনাশ হয়।

অনন্ত শান্তভাবে বলিল, আমিও এই রকম কিছু অনুমান করেছিলাম কেতকী। সেই জন্যেই তো মারলাম।

কেতকীব মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। অস্ফুটস্বরে সে বলিল, সেই জন্যে মারলে? তবে যে বললে সাপ মারতে হয় বলেই—

সাপ মারতে হয়, কিন্তু ইট দিয়ে আমি সাপ মারি না কেতকী। বিপজ্জনক অভ্যাস। লাঠি খুঁজি। সেই অবসরে সাপ যদি পালায় একটু দুঃখিত হই না।

তবে? আজ কী জন্যে এমন করলে? কী বুঝেছ তুমি?

লণ্ঠনের আলোর ব্যাপ্তি আর কতটুকু, চারিদিকের গাঢ় অন্ধকারের হিংসায় এ যেন ক্ষুদ্র অক্ষম ভালোবাসা। অনন্ত কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, আমি কিছু বুঝিনি কেতকী এই ভাঙা বাড়ির প্রেম শঙ্করকে কেন পাগল করলে সে কি বোঝা যায়! সাপ আর ইটের স্তূপের জন্য ওর তো একবিন্দু মমতা থাকার কথা নয়!

কেতকী সহসা হাসিল, না, তা থাকার কথা নয। ও আরও অনেকদিন বাঁচতে চায়।

অনন্ত বলিল, তা জানি। তাই ওব ঘরে কার্বলিকের গন্ধ পেয়েছিলাম। ঝড়ের সম্ভাবনা দেখলে ও তাই সারারাত মন্দিবে পুজো করে।

কেতকী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিল।

খাবে চলো। আলোটা দাও, আমি আগে যাই।

অনন্ত তাহার হাতে আলো দিল, কিন্তু চলিতে আরম্ভ করিল তাহাকে পিছনে বাখিয়া। বলিল, সাপেব শান্ত বউটি যদি স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায় আমাব ওপরে নেওয়াই উচিত কেতকী। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—

কেতকী বলিল, এ সব অলুক্ষুনে কথা বলা কেন? কাল তুমি ভালোয় ভালোয় ফিরে যেযো বাপু।

ঝড় ওঠে শেষবাত্রে।

কেতকী যে বলিয়াছিল আশ্বিনের ঝড় কালবৈশাখীর চেয়ে প্রবল হইতে পাবে, ঝড়ের প্রথম ঝাপটার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইয়া যায়।

অনন্তকে শেষরাত্রে রওনা হইতে হইয়াছিল, সারাদিন গাড়িতে পালকিতে কাটিযাছে। শুইতেও প্রায় বারোটা বাজিযা গিযাছিল। ঘুমও যেন চোখ ছাড়িযা নড়িতে চাহে না অথচ প্রকৃতিব এই তাণ্ডবলীলার মধ্যে ঘুমানোও অসম্ভব। নিদ্রামিশ্রিত নিস্তেজ জাগবণে কিছুই ভালো করিয়া বুঝিতে পারা যায় না, কেমন একটা গুরুভাব আতঙ্ক বুকে চাপিয়া থাকে। চাবিদিক হইতে যেন ভয়ানক একটা বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে, অথচ এমনি অবশ্য অসহায় অবস্থা যে, প্রতিকারের জন্য আঙুলটিও তুলিতে পারা যাইবে না।

কী যেন ঘটিবে,—ঘটিল বলিয়া! এক অজানা শত্রুর বিলম্বিত প্রতিশোধ কোন দিক দিয়া যেন আঘাত করিবে। ভিজা মাটির সোঁদা গন্ধে যেন তাহার হিংসার আভাস মেলে, দেওযালে দেওয়ালে তাহারই সহস্র ক্রুদ্ধ কবাঘাতের শব্দ শোনা যায়।

সহসা প্রবল আঘাতে অনন্ত পূর্ণমাত্রায় সচেতন হইয়া ওঠে। কতকক্ষণের জন্য তার মনে হয কে যেন সত্যই তাহার বুকে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়াছে—একটা পাঁজরও আর আস্ত নাই। নিশ্বাস টানিবার শক্তি খানিকক্ষণ তাহার থাকে না—হাঁ করিয়া আস্তে আস্তে সে হাঁপাইতে থাকে। সামান্য বাতাসটুকু ভিতরে নিতে গিয়াই বুকের পাঁজরগুলো তার টনটন করিয়া ওঠে। অস্ফুটস্বরে সে কাতরাইতে আরম্ভ করিয়া দেয।

কিন্তু বেশিক্ষণ ও ভাবে পড়িয়া থাকা যায় না। দেশলাইয়েব সন্ধানে বিছানা হাতড়াইয়া সে অনুভব করে ধুলা ও কাঁকরে বিছানা ভরিয়া গিয়াছে এবং পাশেই পড়িয়া আছে চুনসুরকির চাপড়া লাগানো

অনাদি প্রস্তুত হয়ে নিশ্চয়ই ছিলেন। দুয়ারের সম্মুখে নির্নিমেষ চাহিয়া
... চুড়িটা ফেলিয়া দিয়া ~~...~~ সে চৌকাঠ হইতে নামিয়া দাঁড়াইল।

দরজার বাহিরে মাথা রাখিয়া, হিংস্র কামনা ও আলোড়িত অন্ধকার যেন তাহারই প্রতীক্ষা করিয়া ছিল। সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনাদি কেন কিন্তু দুয়ারের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা ভিতর হইতে বন্ধ নাই, ঠেলা দিলেও খোলে না, বাতাসে বন্ধ হইয়া ~~...~~ সে বন্ধ করিয়াছে। সে চেষ্টা একবার আলগা দরজা ঠেলিয়া ফেলেই অনাদির কাছে সহজ মনে হইল।

দরজা খুলিল সহজেই।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। অনাদি চাহিয়া দেখিল আলোয়ান চাদর মুড়ি দিয়া কেতকী নিঃসন্দেহে বোধ হয় ঘুমাইয়াছে আছে, আড়াআড়ি ভাবে তার বুকের উপর পড়িয়া আছে একটা স্থূল বাহু। (উঠিয়া)
কাছে গিয়া অনাদি হঠাৎ ঠেলাঠেলি করিতে পারিল।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া শাড়ির বন্ধনের হাঁটুর নীচে অনাবৃত দেহটার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর একটা ভাঙা চুড়ি খুঁটিয়া দেখা চুড়ি চুড়ি হইয়া আসিয়া হাতের মুঠোয় ফেলিতে লাগিল।

দেহটাকে সে সম্পূর্ণভাবে দাঁড়াইয়া দিতে চায়। সমস্ত রাত্রি সে শয্যায় ছড়ানো পরস্পরের ভালবাসিয়াছে অনন্তকাল সেই শয্যাতেই ছড়ানো ঘুমাইয়া থাক, শরীরের হাওয়া নাই। কিন্তু কেহ কোন না জানে।

জানুয়ারির মাঘের দেহ ~~...~~ মাটিতে পরিণত হইতে কত সময় লাগে? শেষবেলায় শেষ হইয়া, ~~...~~ চুড়িটা তুলিতে না পারিয়া মাটিতে বসিয়া শাড়ির তাহাই ~~...~~ লাগিল।

শ্রী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

'সর্পিল' গল্পের পাণ্ডুলিপি-ধৃত পাঠের মধ্যভাগে একটি সমাপ্তিবাচক রেখা দৃষ্টে মনে হয় গল্পের সমাপ্তি প্রথমবারের তুলনায় লেখক কতৃক পরিবর্তিত হয়েছে, নায়কের নামও পরিবর্তিত হয়েছে।

একটি আস্ত টালি। বুকের বেদনা বিস্মৃত হইয়া সে তড়িদ্‌বেগে উঠিয়া বসে। এবার আর তার বুঝিতে কষ্ট হয় না যে দেওয়ালে দেওয়ালে যে আর্তবিলাপ আরম্ভ হইয়াছে, সে শুধু বাতাসের কান্না নয়, ওর মধ্যে মিশিয়া আছে প্রত্যেকটি ইটের মুক্তি পাইবার শব্দিত ব্যাকুলতা।

দিয়াশলাই খুঁজিয়া লইয়া কম্পিতহস্তে অনন্ত একটা কাঠি জ্বালিল। দুয়ারের অবস্থান দেখিয়া লইয়া কাঠিটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া সে চৌকি হইতে নামিয়া পড়ে।

দরজার বাহিরে পাগলা হাওয়া বারিকণা লইয়া যে খেলা খেলিতেছিল তাহার বর্ণনা হয় না। সমস্ত অন্ধকার যেন সে উন্মত্ত খেলায় আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। এমন ঝড়-বাদল অনন্ত জীবনে আর দেখে নাই। পায়ে ভর দিয়া দাঁড়ানো অবধি বুকের ভিতর আবার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছিল, দেওয়াল ধরিয়া ধরিয়া অনন্ত অতিকষ্টে আগাইয়া যায়। মাঝে একখানা ঘরের পরেই কেতকীর ঘর—এই সামান্য দূরত্বটুকু যেন আর অতিক্রম করা যায় না। অনন্ত সজোরে দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া ধরে।

অবশেষে কেতকীর দরজাটা হাতে ঠেকে। বিদ্যুৎ ক্রমাগতই চমকাইতেছিল, অনন্ত লক্ষ করে বাহির হইতে দরজায় শিকল তোলা রহিয়াছে।

পতনোন্মুখ গৃহ ত্যাগ করিয়া কেতকী মন্দিরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে—এ কথা ভাবিয়া প্রথমটা অনন্ত পরম স্বস্তি বোধ করে। কেতকী ঘুমাইয়া থাকিলে চারিদিকের এই প্রচণ্ড শব্দের মধ্যে তাহাকে ডাকিয়া তোলা সহজ হইত না। দরজায় ধাক্কা দিয়া লাভ ছিল না, বাতাস বহুক্ষণ ধরিয়া বীরবিক্রমে সে কাজ করিতেছে। নিজের কানে পৌঁছিবার মতো শব্দও বোধ হয় তাহার ফুসফুসে এখন নাই। কিন্তু যেমন করিয়াই হোক কেতকীকে ডাকিয়া তুলিতে হইবে ;—এই ঝড়ে এখানে থাকা অসম্ভব। আপনা হইতে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া নিয়া সে ভালোই করিয়াছে।

কিন্তু তাহাকে একবার না ডাকিয়াই কেতকী চলিয়া গেল? ঝড়ের সম্ভাবনা দেখিয়া সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর-চাকরের সঙ্গে তাহাকে গ্রামে পাঠাইয়া দিবার জন্য যে অমন ব্যাকুল হইয়াছিল?

অনন্ত শিকল খুলিয়া ফেলে। বাতাসের ধাক্কায় দুই পাট দরজা আছড়াইয়া খুলিয়া যায়।

ঘরের কোণে আলো জ্বলিতেছিল, বাতাসে নিভিয়া যায় নাই। অনন্ত দেখিতে পায় আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া কেতকী বোধ হয় নিরুদ্‌বেগে ঘুমাইয়াই আছে, আড়াআড়িভাবে তাহার বুকের উপর পড়িয়া আছে একটা স্থূল কড়িকাঠ।

ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া রাখিয়া কেতকী যে এমনভাবে ঘুমাইয়া পড়ে নাই বুঝিতে অনন্তর কষ্ট হয় না। অনেক টানাটানি করিয়াও বাহির হইতে শিকল লাগানো দুয়ারটা যখন সে খুলিতে পারে নাই, তখনই এ ভাবে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়াছে।

কাছে গিয়া অনন্ত দুই হাতে কড়িকাঠটা ধরিয়া টানিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

সকালে ঝড় কমে কিন্তু থামে না।

রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়া শঙ্কর বহুক্ষণ ইষ্টকস্তূপের নীচে অর্ধাবৃত দেহাংশ দুটির দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর একটা ভাঙা ঝুড়ি খুঁজিয়া নিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি ইট আনিয়া ইটের স্তূপে ফেলিতে থাকে।

দেহ দুটিকে সে সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া দিতে চায়। সমস্ত রাত্রি যে শয্যায় ইহারা পরস্পরকে ভালোবাসিয়াছে অনন্তকাল সেই শয্যাতেই ইহারা ঘুমাইয়া থাক, শঙ্করের আপত্তি নাই। কিন্তু কেহ যেন না জানে।

মানুষের মাটির দেহ মাটিতে পরিণত হইতে কত সময় নেয়? শেষ বেলায় ইটের শেষ ঝুড়িটা তুলিতে না পারিয়া মাটিতে বসিয়া শঙ্কর তাহাই ভাবে।

বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে সে ঠকঠক করিয়া কাঁপে। তাহাকে ঘিরিয়া থাকিয়া থাকিয়া বাতাস গর্জায়।

পোড়াকপালি

কচি ছেলে লইয়া সংসারের সব কাজ করিতে কুসুমের হিমসিম লাগিয়া যায়। ছেলেটাও হইয়াছে আচ্ছা, কাজের সময়েই চোখে ওর একদম ঘুম নাই। কাঁথায় চিত করিয়া শোয়াইয়া দিলে ও-বাড়ির সুশীলার ছেলের মতো একটু-যে খেলা করিবে, তাও নয়। কোল হইতে নামাইলেই কান্না।

সংসার অবশ্য ছোটো, শুধু স্বামী তারক। কিন্তু যত ছোটো হউক, সংসার তো? সবই করিতে হয়। সকালে উঠিয়া ঘর-লেপা বাসন-মাজা উনুন-ধরানো, তারককে চা জলখাবার করিয়া দেওয়া, ছেলেকে দুধ-খাওয়ানো, নটার মধ্যে রান্না শেষ করা,—এর কোন কাজটা একদিন বাদ দিলে চলে কে বলিতে পারে বলুক দেখি! এ তো গেল একবেলার বড়ো বড়ো কাজের হিসাব, খুঁটিনাটি কাজ অমন হাজারটা আছে। সামান্য এক গেলাস জল ভরিয়া দেওয়ার কথাটাই ধর। কোথায় গেলাস আছে খুঁজিয়া আনো, কলসির কাছে গিয়া জল গড়াও, যে জল চাহিযাছে তার কাছে পৌঁছাইয়া দাও, গেলাস খালি করিয়া দেওয়া পর্যন্ত দাঁড়াইয়া থাক, তারপর যেখানকার গেলাস সেখানে রাখিয়া এসো—তবে ওই সামান্য কাজের পরিসমাপ্তি।

ছেলে-কোলে মানুষ অত করিতে পারে? তবু সবই করিতে হয়। চাকর বামুন রাখিবার সামর্থ্য নাই। খোকা হইবার পর হইতেই কুসুমের শরীরটাও ভালো যাইতেছে না। মাঝে তো কদিন খুব জ্বরেই ভুগিল। সকালবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে আজকাল তার বড়ো কষ্ট হয়, প্রত্যেকদিন শেষবেলায় তার বুক জ্বলে ও সন্ধ্যার সময় মাথা ধরে।

মাথার যন্ত্রণাটাই সবচেয়ে অসহ্য। মনে হয়, গলা ছিঁড়িয়া মাথাটা টিপ করিয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে,—এত ভারী। গেলেও যেন বাঁচা যায়। মাথা তো আছে সকলেরই, মাথা লইয়া এমন ভোগান্তি হয় কাহার?

তারক অবশ্য বলে,—একটা তেলটেল এনে দিই কুসুম। চুল যে সব উঠে গেল!

তেলের দাম কুসুমের অজানা নয়। এক টাকায় এই এতটুকু একটা শিশি। মাথায় তেল মাখার জন্য সে বুঝি তার খোকার দুধ নেওয়া বন্ধ করিবে?

পোড়াকপাল আমার! তেলের জন্য বুঝি? বুড়ি বউকে আর আদর-টাদর কর না, মনের দুঃখে তাই চুল উঠে যাচ্ছে।

তারক ভারী বউ-পাগল লোক। রূপকথার রাজপুত্রের মতো সে যেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হইয়া অনেক বাধাবিপত্তি জয় করিয়া অনেক দুঃখ-কষ্ট পাইয়া তার রাজকন্যাকে মাত্র কাল পরশু উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, চার বছরের পুরানো বউকে সে এত ভালোবাসে।

সেদিনের জ্বরের কথাটাই কুসুম ভাবে। সে মরিতে বসে নাই, তবু নাওয়া-খাওয়া ঘুমের কামাই তো ছোটো কথা, আপিস কামাই হইতেও তারকের বাকি ছিল না।

এত বেশি ভালোবাসার আওতায় কুসুম যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। লতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে মেঘেরই ছায়া, রোদ আর গায়ে লাগিতে পায় না। সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে সে, তার মামাবাড়ি চিরকাল মাটির প্রদীপ জ্বলিত। অত্যন্ত শান্ত আবেষ্টনের মধ্যে সে মানুষ হইয়াছে, হৃদয়ের কারবার যেখানে ছিল ঢিমে এবং সংক্ষিপ্ত, খানিক ভালোবাসা, খানিক লাঞ্ছনা, খানিক অবহেলা অশ্রদ্ধা! অনভ্যস্ত

এত তীব্র অনুভূতি তার সয় না। সে ঝরনার ধারের ছোটো চারা গাছ, আসিয়া পড়িয়াছে প্রকাণ্ড নদীর ধারে, যে নদীতে বারোমাসই বন্যা।

কুসুমকে আজকাল অনেক সময় আপন মনে বিড়বিড় করিয়া বকিতে শোনা যায়।

আপন মনে বকে বলিয়া কুসুমের যে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাহা নয়। জীবনে তার আবেগের অভাব নাই, এদিকে তাহাকে বড়ো একা থাকিতে হয়। সকালে তারক পাড়ার একটি ছেলেকে পড়ায়, তারপরেই তাকে আপিসে যাইতে হয়। মাড়োয়ারি সওদাগরের আপিসে বাঙালি কেরানি, সন্ধ্যার অনেক পরে সে বাড়ি ফেরে। সারাদিন কুসুমকে মুখ বুজিয়া থাকিতে হয়, কথা বলিবার লোক নাই। দুপুরবেলা কোনো কাজ থাকে না কি-না, খোকা তাই সেই সময়টাই পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

লেখাপড়া কুসুম ভালো জানে না। কখনও বাড়িতে মাসিকপত্র আসিলে তিনদিনের চেষ্টায় একটা গল্প শেষ করে, সুতরাং ধৈর্যও থাকে না, রসও পায় না। আজকালকার গল্পে যে রকম চালাকি, এক নিশ্বাসে পড়িয়া ফেলিতে না পারিলে বোকাই বনিয়া যাইতে হয়।

বাড়িতে যে একটা পোষা পাখি নাই ইহাও কুসুমের কাছে অভাবের শামিল।

তারক পাখি কিনিয়া দিতে চায়, কুসুম মাথা নাড়ে, বলে, না আর পাখি পুষব না। তার একটা সাদা ধবধবে কাকাতুয়া ছিল, মরিয়া গিয়াছে। পাখি পুষুক আর পাখি মরুক, আর সে কাঁদিয়া সারা হোক। তার অত শখ নাই।

এমনিভাবে কাজের ভিড়ে হিমসিম খাইয়া আর কাজের অভাবে ছটফট করিয়া মহা দারিদ্র্যের মধ্যে পরম সুখে কুসুমের দিন যাইতেছিল, হঠাৎ ইতিমধ্যে তারক একদিন আপিস হইতে দুই পকেটে দুই শিশি মাথার তেল আর দেহে অস্বস্তি লইয়া বাড়ি ফিরিল।

তার কয়েকটা টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে।

কুসুম বলিল, ওমা, এ কী? দু-শিশি তেল তুমি কোন হিসেবে আনলে? দু দুটো টাকা!

না, চোদ্দো আনা করে নিয়েছে।

চোদ্দো আনায় এক টাকায় তফাত তো ভারী!—আচ্ছা, মাইনে বেড়েছে, না হয় এনেছ একটা জিনিস শখ করে, একসঙ্গে দুটো কিনতে গেলে কেন?

আবার আনা হয় কি না-হয়- ও তোমার দু-মাসেই ফুরিয়ে যাবে দেখো।

দু-মাসে দু-শিশি তেল মাখে, কত বড়োলোক!—হাসিভরা মুখখানা কাত করিয়া কুসুম একটু ভাবিল। বলিল, মাইনে বেড়েছে তোমার, তেল পেলাম আমি! তোমার তো কিছু পাওয়া উচিত? তোমায় আজ লুচি খাওয়াব।

তারকের শরীর খুব খারাপ লাগিতেছিল, দুপুর বেলা আপিসে সে একবার বমি করিয়াছে। বোধ হয় জ্বর হইবে। লুচির নাম শুনিয়াই তার আবার বমি আসিতেছিল, কিন্তু কুসুমের আগ্রহ দেখিয়া সে আপত্তি করিতে পারিল না। খাবে না? শরীর খারাপ? বলিতে বলিতেই ওর দীর্ঘস্থায়ী অনির্বচনীয় হাসিটি একেবারে মুছিয়া যাইবে। তাছাড়া, জ্বর এখনও আসে নাই, আসিবে কি-না তাহাও অনুমান মাত্র। যখন আসিবে তখন দেখা যাইবে, এখন তো কুসুম হাসিমুখে লুচি ভাজুক।

কুসুম তাড়াতাড়ি ময়দা মাখিয়া লেচি পাকাইয়া উনুন ধরাইয়া ফেলিল। ডাক দিয়া বলিল, ওগো বাবুমশায়! লুচি খেতে হলে বেলে দিতে হয়।

তারক দাওয়ায় তামাক টানিতেছিল। হুঁকাটা দেয়ালে ঠেস দিয়া রাখিতে গিয়া গড়াইয়া পড়িয়া গেল। খোলা বাতাসের সংস্পর্শে ছাইয়ের আবরণ সরিয়া গিয়া টিকাগুলি জ্বলজ্বল করিতে লাগিল।

ছেঁড়া চটি দিয়া ঘষিয়া তারক টিকাগুলি গুঁড়া করিয়া দিল, অনেকগুলো আগুনের কণা উড়িয়া উঠানেব অপর পার্শ্বে গিয়া পড়িল। তারকের ধুতিতেও কয়েকটি ছোটো ছোটো কালো ছিদ্র হইয়া গেল।

হুঁকাটা সোজা করিয়া রাখিয়া বিরক্ত তারক আপন মনে বলিল, কী তেজ ওইটুকু আগুনের।

এদিকে রান্নাঘরে কুসুম ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কই গো, এলে? লুচি তোমায় বেলতে হবে না বাবু, এখানে এসে শুধু বসো, দুটো কথাবার্তা কই।

রান্নাঘরে গিয়ে তারক বলিল, আমি লুচি বেলতে জানি যে বেলব? আমি বরঞ্চ ভাজতে পাবি।

তোমার কিচ্ছু পেরে কাজ নেই। বসে বসে তুমি শুধু বকবক কর। বাব্বা, সাবাদিন মানুষেব গলার আওয়াজ শুনতে পাই না।

না, দাও আমি ভাজি।

কুসুম সসন্দেহে বলিল, পারবে?

লুচি ভাজতে পারব না কী গো? তোমার চেয়ে ভালোই পারব।

কিন্তু সে পারিল না। প্রথম লুচিখানা ছাড়িতে গিয়া তপ্ত ঘিয়ে আঙুল ডুবাইয়া ফেলিল। তারপর তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া আনিতে কড়াটাই দিল উলটাইয়া।

হাতে পায়ে গায়ে সর্বত্রই ঘি ছিটকাইয়া লাগিল। সর্বাপেক্ষা জখম হইল তার ডান পা-টি। দেখিতে দেখিতে সমস্ত পাযের পাতা জুড়িয়া এক প্রকাণ্ড ফোসকা পড়িয়া গেল।

দেখিলে ভয় করে।

তারকের ফোসকাগুলি আর সারিল না। কারণ, সেই রাত্রেই তাহার খুব জ্বর হইল, ডাক্তাবি ভাষায় যে জ্বরকে মেলিগ্ন্যান্ট বলে, এবং ফোসকা সারিবার ঢের আগে সে গেল মরিয়া।

শেষ রাত্রে সে মারা গেল, লোকজন জুটাইয়া খাটুলি ইত্যাদি আনিয়া তাহাকে শ্মশানে লইয়া যাইতে যাইতে পরদিন বেলা এগারোটা বাজিয়া গেল। সেদিন দারুণ দুর্যোগ করিয়াছে, সকাল হইতে ঝড়বৃষ্টিব কামাই ছিল না। একটা মানুষকে ভালো করিয়া পুড়াইতে যত কাঠ দরকার তত কাঠ সংগ্রহ করা গেল না। চিতায় শোয়ানোর পর তারকের শরীরের কিছু কিছু অনাবৃত রহিয়া গেল।

মুখাগ্নি কবিল কুসুম।

চিতার খুব কাছে সে দাঁড়াইযা ছিল। চিতা ভালো করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে যতটুকু সরিযা গেলে আগুনের তাত সহ্য হয় ততটুকুই সে সরিয়া গেল। তার চোখে জল নাই। সম্ভবত আগুনের তাতেই শুকাইয়া গিয়াছে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল তারকেব দেহে বড়ো বড়ো ফোসকা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একে একে ফাটিয়া যাইতেছে। এ সব ফোসকায় জল নাই, শুধু আছে বাষ্প আর বাতাস।

কুসুমের মাথার মধ্যে পৃথিবী পাক খাইতেছিল, চিতাটা হাতের নাগালের সূর্য। মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া যাওয়ার ঠিক আগে কুসুমের মনে হইতেছে তারকের গায়ের ফোসকাগুলো ফোসকা নয়,—লুচি।

মাসখানেক পরে একদিন রাত্রিবেলা কুসুম মামাবাড়িতে রান্নাঘরে রাঁধিতেছিল। ডাল আর তরকারি রাঁধিয়া সে ভাত চাপাইয়াছে। ভাত-চাপানোর আগে মামি তাহাকে লুচি ভাজিতে বলিয়াছিলেন—মামার শরীর ভালো নয় ভাত খাইবেন না। কুসুম লুচি ভাজিতে রাজি হয় নাই। ভয়ে বিবর্ণ হইয়া বলিয়াছিল, আর যা বলবেন সব আমি করব মামিমা—লুচি ভাজতে পারব না।

কী করে যে মুখের ওপর পারব না বলিস বাছা বুঝতে পারি না। একে ওঁর সর্দি, এই বাদলাতে ভাত খেয়ে যদি অসুখ করে? ভাজতে না পারিস, ময়দাটা তো মাখতে পারবি, না তাও পারবি না?

কুসুম ময়দা মাখিয়া দিয়াছিল। মাখিতে মাখিতে তারকের অকালমৃত্যুর জন্য নিজেকে দৈনন্দিন হিসাবের চেয়ে একটু বেশি রকম দায়ি করিয়া ফেলিয়াছিল।

শ্মশানের মূর্ছা ঘরে আসিয়া ভাঙিবার পর যে আত্মগ্লানির জন্য সে কাঁদে নাই এ সেই আত্ম-নির্যাতন। স্বামীকে দিয়া সিঁদুর আনাইতে নাই এটা কুসুম জানিত, আজকাল তার ধারণা হইয়াছে বিষ্যুদ্‌বারের বারবেলায় স্বামী মাথার তেল আনিয়া দিলেও অমঙ্গল হয়। এ বিষয়ে কুসুমের যুক্তিও আছে। সিঁদুর পরে সধবা, তেলও সধবাই মাখে। দেবতার প্রসাদে তেল-সিঁদুরই সধবার সবচেয়ে কাম্য।

এ বিষয়ে সে কিন্তু একেবারে নিঃসন্দেহ নয়। তারক আরও কয়েকবার তাহাকে তেল কিনিয়া দিয়াছে, কখনও তো কিছু হয় নাই।

গরম ঘিয়ে পা পুড়িয়া না গেলে তারকের যে অত জ্বর হইত না, ইহাতে কুসুম লেশমাত্র সন্দেহ করে না। ম্যালেরিয়া ও রকম হয়? সে নিজে কত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছে ম্যালেরিয়ায় মানুষ তিনদিনে মারা যায় না।

তারপর তারকের ভালো-মতো চিকিৎসাও হয় নাই। কোথা দিয়া কী হইয়া গেল, চিকিৎসার সময়ও যেন পাওয়া গেল না। পোস্টাপিসের টাকা জমানো রহিল, গায়ের গহনা বাঁধা পড়িল না, বড়ো বড়ো ডাক্তারেরা তারককে দেখার সময়টা অবসর-হিসাবে যাপন করিল। একটু নিরীহ দুর্বল প্রতিবাদ করিয়াই সে হইল বিধবা।

উনুনটা চমৎকার জ্বলিতেছে, রান্নাঘরের এককোণে জমা করিয়া রাখার দরুন এই বাদলেও কাঠগুলো শুকনো খটখটে হইয়া আছে। পিঁড়িতে উবু হইয়া বসিয়া কুসুম মোহাবিষ্টার মতো আগুনের দিকে চাহিয়া রহিল। কী রং আগুনের! কুসুম কতকাল দু-বেলা উনুন জ্বালাইয়া রান্না করিয়াছে, এমন স্থূল অগ্নিশিখায় এমন গাঢ় রঙের আবির্ভাব সে কখনও দেখে নাই। তারকের চিতায়ও না।

ওদিকে মামি লুচি ভাজিতেছিলেন, ঘিয়ের গন্ধে কুসুমের কষ্ট হইতে লাগিল। আগুনের অভূতপূর্ব রূপ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াও ঘিয়ের গন্ধে সর্বাঙ্গে যে অস্বস্তিকর অনুভূতি হইতেছিল তাহাও সে উপলব্ধি করিতে পারিল। হঠাৎ রোমাঞ্চ হইয়া তার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত শিরশির করিয়া উঠিল।

কুসুম খুব রোগা হইয়া গিয়াছে। দেহে মনে সুস্থ থাকার পক্ষে তার কতকগুলি গুরুতর অসুবিধা উপস্থিত হইয়াছে। কয়েক মাসের মধ্যে পৃথিবী তার কাছে আর একটি মানুষ আদায় করিবে,—বৈধব্য-জীবনটা এ অবস্থায় উপযোগী নয়, রাত্রে তাহার ভালো ঘুম হয় না। শোক, অন্ধকার, ঘুমন্ত খোকা আর খানিকটা পাগলামি আজকাল কুসুমের রাত্রির সম্পদ। শোক তাহাকে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদায়, অন্ধকার তাহাকে ভয় দেখায়, খোকা তাহাকে বিরক্ত করে, আর পাগলামি তাহাকে জাগাইয়া রাখে।

তার পাগলামি এইরূপ।

সে মনে করে তারকের সঙ্গে গল্প করিয়া সে যত রাত জাগিত এখন তারকের জন্য শোক করিয়া তার চেয়ে ঢের বেশি রাত জাগা উচিত। ঘুম আসিলেও সে তাই ঘুমায় না। ঘুমকে ঠেকানো তার পক্ষে কঠিন নয়। তারকের সোনার রং কেমন করিয়া পুড়িয়া কালো হইয়া ফোসকা পড়িয়াছিল সেই দৃশ্যটা কল্পনা করিলেই হইল। ঘুমের আর চিহ্নমাত্র থাকে না।

মামির বড়ো মেয়ে বাটি নিতে আসিয়া বলিল, কত কাঠ গুঁজেছিস কুসুম? একদিনে সব পুড়িয়ে শেষ করবি না কি?

আনমনে গুঁজে ফেলেছি দিদি।

কুসুম তিন-চারখানা কাঠ টানিয়া বাহির করিয়া জল ছিটাইয়া নিবাইয়া উনুনের পাশে রাখিল। ধোঁয়ায় তার চোখ কটকট করিয়া জল পড়িতে লাগিল। জ্বলন্ত কাঠ ভালো করিয়া না নিবাইলে যেমন ধোঁয়া হয় তেমনি একটা বিশ্রী শ্মশান-আশ্রয়ী গন্ধ ছাড়ে।

ধোঁয়ার ছলনায় নয়, প্রকাশ্যে এবং গোপনে কুসুম আজকাল খুব কাঁদে। তার চোখের জল জমাইয়া রাখিলে একটা বাটি ভরিয়া যাইত।

মুছিয়া মুছিয়া চোখ শুকনো হইলে কুসুম চাহিয়া দেখিল ভাবী একটা বিপদের সূত্রপাত হইয়াছে। উনুনের পাশে এক আঁটি পাটকাঠি বেড়ায় ঠেস দিয়া রাখা হইয়াছিল, ইতিমধ্যে কখন নেবানো কাঠগুলির একটা আপনা-আপনি জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। কয়েক মিনিটের মধ্যে এ আগুন বেড়ায় লাগিবে এবং দেখিতে দেখিতে খড়ের চাল জ্বলিয়া উঠিবে। বৃষ্টিতে চালের উপরিভাগ অবশ্য ভিজিয়া আছে, কিন্তু আগুনকে ঠেকাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

রান্নাঘরের চাল একবার জ্বলিয়া উঠিতে পারিলে বাড়ির অন্য ঘরগুলিকেও দলে টানিবে। পাশের মুখুজ্যে-বাড়ি রেহাই পাইবে না, সরকারদের বাড়িটাও মুখুজ্যে-বাড়ির লাগাও। পাটকাঠিগুলির মধ্যে সদ্যজাগ্রত ওই ভীরু ও দ্বিধাগ্রস্ত শিশু অগ্নিদেবতাটি আজ পাড়ায় লঙ্কাকাণ্ড না করিয়া ছাড়িবে না।

ব্যাপারটা কুসুম চমৎকার কল্পনা করিতে পারে। একটা বিরাট বিশ্বগ্রাসী চিতা—একরাত্রে একসঙ্গে একরাশি মানুষের সর্বনাশ! রঙে আর উত্তাপে অন্ধকার আর শূন্য ভরপুর হইয়া যাওয়া এবং তাহারই চারিদিকে কেবল হায় হায়, কেবল বুক-চাপড়ানো!

দুই চারিজন পুড়িয়া মরিবে না?

তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টি মেলিয়া কুসুম হিংস্র সাপের মতো অগ্নিশিখার হেলিয়া-দুলিয়া বাড়িয়া-কমিয়া শ্লথ সন্তর্পণ অগ্রগতি চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ধীরে ধীরে আকার বাড়িতেছে, হেলানো সুদীর্ঘ সমিধ বাহিয়া ধীর অনিবার্য বেগে উপরে উঠিতেছে।

ঘরে আজ নিশ্চয় আগুন লাগিবে।

আর কেহ পুড়িয়া না মরুক, কুসুমের আজ উদ্ধার নাই। সে কিছুতেই পলাইতে পারিবে না। পিঁড়ির সঙ্গে মাটির সঙ্গে সে একেবারে আঁটিয়া গিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গে পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে অবশ, অবসন্ন। উঠিবার, নড়িবার, টানিয়া পাটকাঠিগুলি সরাইয়া আনিবার শক্তিও তাহার নাই। সে পালাইবে কেমন করিয়া?

কুসুম স্পষ্ট দেখিতে পাইল, খড়ের জ্বলন্ত চালের নীচে চাপা পড়িয়া সে ছটফট করিতেছে, তার গায়ের চামড়া কয়লার মতো কালো হইয়া যাইতেছে আর সর্বাঙ্গে পড়িতেছে বড়ো বড়ো ফোসকা। কাল্পনিক মৃত্যুর বীভৎসতার আতঙ্কে কুসুম এক প্রকার উৎকট আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিল।

তার আর কিছুমাত্র সংশয় রহিল না যে, একবার হাত বাড়াইলেই যে বিপদ আটকানো যায় সে-বিপদের সামনে সে যে হাত গুটাইয়া বসিয়া আছে সে বিধান ঈশ্বরের। ঈশ্বর তার বাড়াইবার শক্তি হরণ করিয়াছেন। সে সতী কী-না, বিলম্বিত সহমরণকে নিজেও তাই ঠেকাইতে পারিতেছে না।

নিজে সে এ আয়োজন করিতে পারিত না। তার আত্মহত্যার মধ্যে শুধু আত্মহত্যার পাপ নয় নরহত্যার পাপও আছে। কিন্তু ঘরে আগুন লাগিয়া পুড়িয়া মরাতে আর তার হাত কী? সে জন্য তাহাকে নরকে যাইতে হইবে না, কাহারও কাছে কোনো কৈফিয়ত দিতে হইবে না, হাসিতে হাসিতে সে স্বর্গে তারকের কাছে চলিয়া যাইবে। পঁয়ত্রিশ দিনের বেশি সে যে বিধবা হইয়া থাকিল না ইহার গৌরবে মুগ্ধ হইয়া লোকে ধন্য ধন্য করিবে।

খোকার কথা কুসুম ভাবিয়াছে। মামির ছোটো ছেলেটি আর নাতি-নাতনির সঙ্গে সে শুইয়া আছে, তাদের সঙ্গে ওকেও সকলে সরাইয়া লইবে নিশ্চয়। কোলের ছেলে তার মরিবে না। কষ্ট অবশ্য সে অনেক পাইবে, কিন্তু তাহা বিধাতার ইচ্ছা, কুসুমের ওতে হাত নাই। মার মরণের ব্যবস্থা আজ যিনি করিলেন মার ছেলের বাঁচার ব্যবস্থাও তিনিই করিবেন। কুসুমের মাথায় যত চুল ততকাল ধরিয়া করিবেন।

এতক্ষণে আগুন আঁটি-বাঁধা পাঁকাটির মাঝামাঝি পৌঁছিয়াছে এবং বেশ জোরেই জ্বলিতেছে। এখানটা ভালো করিয়া পুড়িয়া যাইতেই পাঁকাটিগুলি ভাঙিয়া নীচে পড়িয়া গেল। ঘরে যে আগুন আজ লাগিবেই তাহার আর তেমন নিশ্চয়তা রহিল না।

পুড়িতে পুড়িতে একসময় আগুন নিবিয়া গেল, অবশিষ্ট রহিল খানিকটা ছাই, কিছু জ্বলন্ত কয়লা আর কয়েক টুকরো পাঁকাটি।

কুসুমের মনে হইল সে খুব বেদনা পাইয়াছে, ভারী হতাশ হইয়াছে।

রান্নার খুন্তিটা দিয়া সে তাহার স্থূল আকাঙ্ক্ষার দগ্ধাবশেষগুলি নাড়িতে লাগিল। ছাইয়ের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পড়িল আধপোড়া একটা তেলাপোকা।

আগন্তুক

স্টেশনে নামিয়া মুকুল চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। সে বড়ো বিস্মিত হইয়াছে। পাঁচ বছরে স্টেশনটির কোনো পরিবর্তন হয় নাই, এমনকী, পার্সেল আপিসের দেয়ালে যেখানে যে অবস্থায় কবিরাজ মশায়েব জ্বরের পাঁচনের বিজ্ঞাপনটি লটকানো ছিল, সেটি সেইখানে সেই অবস্থাতেই ঝুলিতেছে, কিন্তু তবু চারিদিকে কেমন যেন অপরিচয়ের ছাপ। কিছুই সে ভোলে নাই, কাঁকর-বিছানো প্ল্যাটফর্ম, কালো আর সাদা রঙের পাঁচটা সিগ্‌ন্যাল লিভার, ইটের উপর লাল রং-করা রেলের আপিস, ওয়েটিং রুমের ধুলামাখা খড়খড়ি, টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলিতে মরিচা-ধরা লোহার শিক আব বাহিবে যাওয়ার পথে বাঁকানো লোহার পাতের নিষ্কর্মা গেট, সবই সে বেশ চিনিতে পারিতেছে, কিন্তু আজিকাব চেনা কেমন যেন অভিনব। এই জড় পদার্থগুলোর সঙ্গে তার পরিচয়ের যোগসূত্রটি যেন ছিঁড়িয়া গিয়াছিল ; স্টেশনে নামিয়া দাঁড়ানো মাত্র গিঁট পড়িয়া তার দুটি ছিন্নপ্রান্ত জুড়িয়া গেল, কিন্তু গিঁটের অস্তিত্বটাই হইয়া রহিল স্বপ্রধান।

স্বাভাবিক মোলায়েম যোগ যেন নাই, গিঁটের মধ্যে যে কৌশল ও শক্তিটুকু সংহত হইয়া আছে তারই কল্যাণে পরিচয় বজায় আছে। মুকুলের যেন সব ভুলিয়া যাওয়া উচিত ছিল ; স্টেশনেব যেন এমনভাবে বদলাইয়া যাওয়া উচিত ছিল যে দেখিলে সে না চিনিতে পারে,—মুকুল যে মনে রাখিযাছে, স্টেশনটি যে বদলায় নাই, দুপক্ষেরই সে বিশেষ অনুগ্রহ।

পাঁচ বছর পরে বাড়ি আসার আনন্দ ও উৎসাহ মুকুলের ঝিমাইয়া পড়িল। জড়-জগতের এ কী বিবূপ অভ্যর্থনা'

ছোটো ভাই অতুল দাদাকে লইতে আসিয়াছিল। বিচলিত বিব্রত ও সলজ্জভাবে সে মুকুলকে অভ্যর্থনা কবিল, গাড়িটা আধঘণ্টা লেট করিয়াছে।

অতুল বড়ো হইযাছে। গোঁপের কালো রেখায় তার মুখখানা দেখিতে হইয়াছে বিশ্রী। এখন আর তার পিঠ চাপডানো যায় না, তাকে একজন আস্ত পুরা মানুষ বলিয়াও স্বীকার করা চলে না। কতখানি স্নেহ আব কতখানি সম্মান তার প্রাপ্য স্থির করা আজ সমস্যার ব্যাপার।

দাঁড়ান, একটা গাড়ি ঠিক করে ফেলি।

কিছুক্ষণের জন্য সম্মুখ হইতে সে পালাইতে চায়। দাদা আসিবে বলিয়া তাহার আনন্দ কম হয় নাই, কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ করিতে তাহার লজ্জা করে। অথচ প্রকাশ না করাটাও কেমন যেন খারাপ দেখায়। অতুল নিজে মনে মনে অনেকদিন বিদেশে কাটাইয়া বাড়ি আসিবার কল্পনা করিয়া দেখিয়াছে, সকলে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে, চারিদিকে হইহই সমারোহ লাগিয়া যাইবে, এমনি একটা অভ্যর্থনার আশাই মনে সব চেয়ে প্রবল। মুকুলও নিশ্চয় ও রকম কিছু আশা করিতেছিল, আশা পূর্ণ না হইলে ওর মনে ব্যথা লাগিবাব সম্ভাবনা। অথচ একটু সংক্ষিপ্ত সলজ্জ হাসি ছাড়া দাদাকে সে কিছুই দিতে পারিল না। দাদা নিশ্চয় এই ভাবিয়া মনে মনে দুঃখ করিতেছে, এমন পর হইয়া গেছে তার ছোটো ভাই, যে তাকে দেখিয়া ওর এতটুকু আহ্লাদও হয় নাই।

মুকুল বলিল, চল, আমিও যাচ্ছি।

অতুল মুখের দিকে তাকায় না, ডান পাশে একটু আগে আগে চলিতে থাকে। মুকুল জিজ্ঞাসা করিল, বাড়িতে কে কে আছে রে অতুল?

সবাই আছে। পরশু ছোটো মাসি ও চারুদিদি এসেছে।

গোপাল এখনও কাজ করে?

গোপাল মরে গেছে।

মরে গেছে! বলিস কী? কবে মরল?

আর বছর মরেছে। বিয়ে করবে বলে দেশে গিয়েছিল, সেখানে কলেরা হয়ে না কী হয়ে মারা গেল।

মুকুল আরও দমিয়া গেল। গোপালের জায়গায় আর একজন চাকর কাজ করিতেছে, ভাবিতে কেমন যেন অশান্তি বোধ হয়। অমন চাকর আর পাওয়া যাইবে না।

বিবাহ করিতে দেশে গিয়াছিল? এই পাঁচ বছরে গোপালের আগের বউও তাহা হইলে মরিয়াছে। লাজুক গেঁয়ো বউ-এর অমন একটি টাইপও আর সহজে চোখে পড়িবে না।

গাড়িতে মাল তোলা হইলে তাহারা উঠিয়া বসিল।

পটলির বিয়েতে কী গোলমাল হয়েছিল রে?

অতুলের সংকোচ অনেক কমিয়াছে।

ছোড়দির বিয়ের কাণ্ড? সে ভয়ানক দাদা—আরেকটু হলে মারামারিই হয়ে যেত।

কেন?

কুমুদবাবুর একজন বন্ধু—বরযাত্রীদের মধ্যে ওই লোকটাই ছিল সবচেয়ে পাজি, বেণুদিকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সে ছোড়দিকে দেখতে গিয়েছিল। রেণুদির বাবা তাকে এই মারে তো সেই মারে—রাগের চোটে কাছাই খুলে গেল। অল্প অল্প শব্দ করিয়া অতুল একটু হাসিল।

মুকুল গম্ভীর মুখে বলিল, দেখতে দিলেই হত পটলিকে।

তখনও সাজানো হয়নি যে!

গাড়ি ঘরঘর করিয়া চলিয়াছে, ফুটবল গ্রাউন্ডের পাশ দিয়া বাঁয়ে একটা রাস্তা বাঁকিয়া গোল কুয়ার চকে গিয়াছে, ওই রাস্তার ধারে হাসপাতাল। ডাকবাংলাটি মুকুল লক্ষ করে নাই, ছাড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াইয়া সেটির অবস্থান দেখিয়া নিয়া সে আবার ঠেস দিয়া বসিল।

কুমুদ লোক কেমন রে?

স্বভাব-চরিত্র ভালো—কিন্তু বড়ো রাগ?

মুকুলের বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। আপনা হইতে ছেলেটা কোনো খবরই দিবে না, প্রশ্নের জবাব যেটুকু বলিবে তাহাও সংক্ষিপ্ত দুর্বোধ্য। পাঁচ বছরে সংসারে এমন কিছুই কি ঘটে নাই যা নিয়া অতুল আজ আগের মতো বকবক করিতে পারে?

অতুল যেন বোবা হইয়া গিয়াছে। বাকি পথটা মুকুল নীরব হইয়া রহিল।

বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া সে একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছে। বিদেশে প্রলোভনের অভাব ছিল না, অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে বাস করিতে করিতে তাহার মনের জোরও কেমন যেন কমিয়া গিয়াছিল। সে অনেক অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছে। সে জন্য তেমন জোরাল অনুতাপ তার কখনও হয় নাই, কিন্তু আজ মা বোন ও স্ত্রীর সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইবার আগে একে একে সমস্ত কথা মনে পড়িয়া নিজেকে তাহার অশুচি মনে হইতে লাগিল।

গাড়ি পাড়ায় ঢুকিয়াছে, দ্বিপ্রহর না হইলে অনেক চেনা মুখ চোখে পড়িত। শৈলেনদের বৈঠকখানায় মুকুল অনেক তাস-পাশা পিটিয়াছে, এখন দরজা বন্ধ। মুকুলের বিদেশযাত্রার কয়েক

দিন আগে সরকারদের মেজো-বউ কাপড়ে আগুন দিয়া পুড়িয়া মরিয়াছিল, এখন দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা ঝুলিতেছে। এদিকে বসন্তদের বাড়ি।

বসন্ত বাড়ির রোয়াকে দাঁড়াইয়া বিড়ি টানিতেছিল, কারণ এমনি সময় সেনেদের মেজো-বউ ছাতে কাপড় শুকাইতে দিতে আসিয়া পথের দিকে আলিসায় ভর দিয়া একটু দাঁড়ায়।

বসন্ত হাঁকিল, মুকুল যে!—এই গাড়োয়ান, রোকো রোকো।

বসন্ত গাড়ির কাছে নামিয়া আসিল। সে বসন্ত আর নাই। তার রং গ্রীষ্মকালের তৃণের মতো হইয়া গিয়াছে। মুকুলের গাড়ির গাড়োয়ানের মতো তাহার ঘাড় ছাঁটা, চোখে মদের রং।

সিলোন থেকে আসছ?

বন্ধুকে তুই সম্বোধন করিবার সাহসও বসন্ত হারাইয়াছে।

মুকুল সায় দিয়া বলিল, হ্যাঁ। কেমন আছ বসন্ত?

চলে যাচ্ছে একরকম! বলিয়া বসন্ত একটু নিস্তেজ হাসি হাসিল। মনটা কীরকম করিতে লাগিল মুকুলের। হাসি গল্প আড্ডা দিয়া অর্ধেক জীবন যার সঙ্গে মন খুলিয়া হইহই করিয়াছে, আজ তার সঙ্গে শুধু ভদ্রতার সম্পর্ক।

পথের দিকে কেহই তাকাইয়া ছিল না। বেলা বারোটা বাজিয়া গিয়াছে, ছেলেমেয়েরা ক্ষুধায় কাতর। তাহাদের ভাত না দিয়া উপায় ছিল না। সাত-আটটি ছেলেমেয়েকে খাওয়ানো শশীমুখীর একার কাজ নয়, ননদ বাসন্তী তাহার সাহায্য করিতেছে। ছেলের আসিতে দেরি দেখিয়া মা তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি সন্ধ্যাটা সারিয়া নিতে বসিয়াছেন,—সময়মতো স্নান না করিলে তাঁর মাথার তালু জ্বলে। ছোটো মাসির পায়ের বাতে তেলমালিশ এখনও শেষ হয় নাই। সুতরাং পথে চোখ পাতিয়া বসিয়া থাকিবার অবসর কাহারও ছিল না।

চারুর জ্বর। সে বিছানায় পড়িয়া আছে।

মুকুল উঠানে আসিয়া দাঁড়াইতে একটা হইচই পড়িয়া গেল। মাসি বারান্দায় পা ছড়াইয়া পায়ে তেল মালিশ করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, মুকুল এলি? বাসন্তী ভাতের থালা নামাইয়া রাখিয়া বলিল, ওমা দাদা এসে পড়েছে! ছেলেদের মধ্যে বাসন্তীর বড়ো ছেলে সকলের বড়ো, মামাকে তার স্মরণ ছিল, আকস্মিক উত্তেজনায় খেপিয়া গিয়া গলা ফাটাইয়া সে হাঁকিল, দিদিমা, শিগগির এসো, মামা এসেছে।

শশীমুখী রান্নাঘরে গিয়া লুকাইল।

কিন্তু সমারোহের ইতি ওইখানেই।

ছেলেমেয়েরা খাওয়া ফেলিয়া মুকুলকে ঘেরিয়া দাঁড়াইল না, এখনও তাহাদের পেট ভরে নাই। মাসি সমানে পায়ে তেল মালিশ করিতে লাগিলেন, মা ছুটিয়া নীচে নামিয়া আসিলেন না, চারু জ্বরের ঘোরে যেমন ছটফট করিতেছিল তেমনি ছটফট করিতে লাগিল, স্টেশনে যাওয়ার পরিশ্রমে কাতর অতুল দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া রহিল।

বাসন্তী এঁটো হাত সাবধানে ধুইয়া ঘর হইতে একটা চেয়ার আনিয়া রাখিল। মুকুলকে প্রণাম করিয়া বলিল, বসো দাদা।

মুকুল বসিলে—

হ্যাঁ দাদা, মেম-টেম বিয়ে করে আসনি তো?

সিলোনে মেম কী রে?

বাসন্তী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, জাহাজে যেতে হয় যে?

পটলি দোতলায় শুইয়া ছিল, অত্যন্ত ধীরপদে সে নীচে নামিয়া আসিল। কাছে আসিয়া অভিমান করিয়া বলিল, দাদা এল, আমায় কেউ ডাকল না।

মাসি ঘ্যানঘ্যান করিয়া বলিলেন, ডাকতে হবে কেন? তুই ঘুমোচ্ছিলি নাকি?

একটুখানি মাথা হেলাইয়া পটলি বলিল, ঘুমোচ্ছিলাম তো। দয়া করে আমায় ডাকলে অপরাধ হত?

মুকুল আবার বিস্মিত হইয়াছে। এ যেন সে পটলি নয়, আর কেউ। ইহার পিঠে তখন সাপের মতো বেণি দুলিত, দুই হাতে বুকের কাছে বই ধরিয়া স্কুলে পড়িতে যাইত। বেতস-লতার মতো ওর চেহারা ছিল রোগা লিকলিকে, হাঁটিবার পরিবর্তে সারা বাড়ি ও ছিটকাইয়া বেড়াইত, কোথায় যে ওর শেমিজের কাঁধ নামিত আর কোথায় যে লুটাইত আঁচল তার ঠিকানা ছিল না। আর আজ ও চুলের পাতা কাটিয়াছে, চলিবার সময় পা ফেলিয়া পা তুলিতে ওর যেন কষ্ট, মুখটা পর্যন্ত ঢাকিতে পারিলে ওর যেন আজ ভালো মতো লজ্জা নিবারণ হয়।

মুখে কথা আছে কিন্তু গলায় ওর শব্দ নাই।

অতুলের মতো এও মুখের দিকে তাকায় না। দাদাকে দেখিয়া আনন্দ ওর কতখানি হইয়াছে ওই জানে কিন্তু দাদা আসিতে কেহ ডাকে নাই বলিয়া অভিমান হইয়াছে প্রচুর। সেই অবশ্য এ অভিমানের উপলক্ষ কিন্তু অভিমানের আধারটিতে তার স্থান যে কতখানি মুকুল তাহা ভাবিয়া পাইল না। সে বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র সকলের আগে ওকে ডাকা হইলে ও দাদার সম্মান রাখিত কী দিয়া?-- অভিমান করিবার উপায় যখন থাকিত না?

পুতুলখেলা ছাড়িয়া কয়েক বৎসর যাবৎ ও ছেলেখেলা করিতেছে, একদা যে ভাঙা পুতুলের শোকে চোখে জল আসিলে চোখ মুছাইত আর ক্রমাগত পুতুল কিনিয়া দিত, অত কষ্টে জমানো তিন হাজার টাকা দিয়া যে ওর ছেলেখেলার মানুষটি যোগাড় করিয়া দিয়াছে, তার কথা মনে করিবার অবসর হয়তো ও পায় নাই। দাদা যে বিদেশে---সেটুকু ভালো করিয়া টের পাইবার সুযোগ হয়তো ওর ছিল না।

তোর খোকা কইরে পটলি?

ঘুমুচ্ছে।

দুই চোখে আনন্দ ভরিয়া ঔৎসুক্যের সহিত সে আবার বলিল, তুলে আনব?

থাক থাক, জাগলেই দেখবখন।

আচ্ছা।

পটলির আবার অভিমান হইয়াছে। দাদা আসিয়া খোকাকে দেখিবে, কোলে নিবে, আদর করিবে, এ তাহার অনেক দিনের সাধ। এ সাধ মিটিতে দেরি হইবে না, খোকার ঘুম মিনিটে মিনিটে ভাঙে, কিন্তু দাদা যে কতদূর পর হইয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া পটলির সাধের আর তেমন জোর রহিল না। বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র সকলের আগে তার খোকাকে দেখিবার আগ্রহ নাই দাদার! এ তো সে দাদা নয়।

এই ধরনের মনোভাব মুখে ছায়াপাত করে। পটলির মুখ দেখিয়া মুকুল রাগ করিয়া ভাবিল, ঘুমন্ত ছেলেটাকে তুলে আনতে বারণ করলাম এতে ওর রাগ করবার কী আছে?

মাসি বারবার উঃ আঃ শব্দ করিয়াও পায়ের দিকে মুকুলের দৃষ্টি টানিতে না পারিয়া মনে মনে চটিতেছিলেন, পটলিকে ধমক দিয়া বলিলেন, তুই যেন কেমনতরো মেয়ে পটলি। এদ্দিন পরে বড়ো ভাইটা এল, একটা পেন্নাম কর?

মুখ রাঙা করিয়া মাসির দিকে ঝুঁকিয়া চাপাগলায় পটলি বলিল, আঃ, তুমি চুপ কর মাসি, আমার আজ প্রণাম করতে নেই।

'অ!' বলিয়া মাসি থ বনিয়া গেলেন। মুকুলও।

এমনভাবেই তাহারা পর হইয়া গিয়াছে পরিবর্তনের মধ্যে। মুকুল বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল। বাড়িটাকে আজ ভারী চাপা, ভারী নোংরা মনে হইতেছে। ছোটো উঠানে আলো বাতাস স্বচ্ছন্দে আসিতে পারে না, সমস্ত উঠানে কত কী আবর্জনা। চোকলা-তোলা মেঝেতে শ্বেতপাথরের স্বপ্নও নাই, দেয়ালগুলি বিবর্ণ ও উপরের দিকে ঝুলভরা, ঘরে ঢুকিলে মুকুলের নিশ্চয় নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে। মাসির বাতের মালিশের দুর্গন্ধটাই যেন এ বাড়ির আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়াছে, তার রুমালের সিংহলি আতরের গন্ধ অতিথির মতো, পরের মতো এখানে বেমানান!

রান্নাঘরের জানালায় কালিবর্ণ শিকের ফাঁকে শশীমুখী উঁকি দিতেছিল, মুকুলের চোখ পড়া মাত্র তাহার ফরসা মুখ ডগডগে লাল হইয়া যাইতেছে! এ আর এক কৌতুক।

পাঁচ বছর আগে শশীমুখীর এই বারবার উঁকি দেওয়া আর মুখ লাল করার মধ্যে ভালোবাসার প্রকাণ্ড একটা প্রমাণ আবিষ্কার করিয়া সে পুলকিত হইত সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ তাহার অভিজ্ঞতায় ইহার ফাঁকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে। শশীমুখীর চাওয়া চোখে, লালিমা মুখে, মনে শুধু কৌতূহল আর লজ্জা। স্বামীকেও চোখে সহাইয়া নিতেছে। এতকাল পরে কল্পনার বাহিরের দেশ হইতে লক্ষকোটি বিপদ-আপদের হাত এড়াইয়া যে স্বামী ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে একটিমাত্র ব্যাকুল দৃষ্টিপাতে সুস্থ দেখিয়া অক্ষত দেখিয়া আড়ালে গিয়া শশীমুখী ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলে নাই, ব্যগ্র উৎসুক চোখে কম্পিত সচেতন অঙ্গুলিতে স্বামীকে ভালো করিয়া দেখিবার ও চিনিবার সাধ নিরালার মিলন মুহূর্তটির জন্য তুলিয়া রাখে নাই, পথের বৈচিত্র্য যেমন করিয়া দেখে তেমনিভাবে স্বামীকে দেখিতেছে, পরপুরুষের দৃষ্টিপাতে যেমন করিয়া মুখ লাল করে তেমনিভাবে স্বামীর চাহনিতে রাঙা হইয়া উঠিতেছে।

শশীমুখীর সম্বন্ধে মুকুল হতাশ হইয়া গেল। বউ ভালো হইলে নিজেকে কি এত সস্তা করিয়া দেয়? ও এমন ধৈর্যহীনা এমন লোভাতুরা যে আগামী মিলনকে অখণ্ড রাখিতে পারিতেছে না, এখন হইতেই ভাঙিয়া ভাঙিয়া চাখিতে শুরু করিয়াছে।

বিদেশে অন্যায় করিয়া আসার জন্যে মুকুলের হঠাৎ আর কোনো ক্ষোভ রহিল না।

ইতিমধ্যে গলায় কাঁটা বিঁধিয়া বাসন্তীর ছেলে কান্না আরম্ভ করিয়াছিল, মাসির ছোটো মেয়েটারও লঙ্কা চিবাইয়া ঝাল লাগিয়াছে।

বাসন্তী আদর করিয়া শশীমুখীকে ডাকিয়া বলিল, মাছ বেছে বুলুকে একটু খাইয়ে দাও না বউদিভাই!

মুকুল শুনুক, বুঝুক যে শশীমুখীর সঙ্গে সে বরাবর এমনি মধুর ব্যবহার করিয়াছে, কদাচ কলহ করে নাই। যদিই বা কখনও একটু কথা কাটাকাটি হইয়া থাকে শশীমুখী কি আর সে কথা দাদার কানে তুলিবে? একসঙ্গে থাকিতে গেলে সংসারে অমন কত হয়!

মাসি অত কারও খাতির করেন না।

ওকে মাছ বেছে দিলেই হবে বউমা? মেয়েটা এদিকে ঝাল খেয়ে সারা হয়ে গেল যে!

বাসন্তী বলিল, বউদি একহাতে কজনকে খাওয়াবে মাসি?

মাসি বলিলেন, তাই বলে মেয়েটা চেঁচিয়ে মরবে? ঝাল লাগলে জল পাবে না একটু?

বাসন্তী বলিল, ওই তো রয়েছে গেলাসে জল, খেলেই পারত।

শুনলি মুকুল? ওর অতবড়ো ছেলে কাঁটা বেছে মাছ খেতে পারে না, আর ওই একরত্তি মেয়ে গেলাস থেকে আপনি জল খাবে?

মাসির তুলনাটা শোনো দাদা! মাসির মেয়ের চেয়ে খোকা যে দেড় বছরের ছোটো!

সবটাই তার নিজের অপমান। নিজের বোন নিজের মাসি আজ তাহাকে এমন করিয়া মধ্যস্থ মানে। দুজনকে ধমক দিবার ক্ষমতা আজ তাহার নাই। ইহাদের হীনতাকে আজ তাহার পাশ কাটাইয়া যাইতে দিতে হইল।

শশীমুখীর পিঠে চাবির যে গোছাটা এক পরল কাপড়ের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, অমনি লোহার চাবি দিয়া এতকাল পরে আজিকার বিশেষ দিনটিতে ভাগ্য একে একে তাহার আপনজনের হৃদয়ের সিন্দুক খুলিয়া ভিতরের জঞ্জাল দেখাইতেছে, মুকুল যত স্নেহ দিয়াছিল তার খানিক হইয়া আছে রূপার টাকা, খানিক ধুলা আর খানিক আটকানো ভ্যাপসা বাতাস! মুকুলের মনে হইল, দেশে সে সত্যসত্যই বেড়াইতে আসিয়াছে, বেড়াইতে আসা ভিন্ন এই তামাদি হইয়া যাওয়া পাওনার সন্ধানে নিজের সেই শান্তিহীন তৃপ্তিহীন সুখের নীড় ছাড়িয়া এতদূর আসার কোনো মানেই হয় না।

খানিক পরে মা আসিলেন।

মন্ত্রগুলো কি বলে উঠতে পারি? যত তাড়াতাড়ি করতে যাই তত সব জড়িয়ে যায় জিভে। কী রোগাটাই হয়ে গেছিস মুকুল! এমন ছিরি তুই কী করে করলি? প্রণামোদ্যত ছেলেকে মা বুকে জড়াইয়া ধরিলেন, কাঁদিয়া বলিলেন, সোনার বরন কালি হয়ে গেছে!

গায়ে মাথায় পরম ব্যাকুলতার সঙ্গে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া মা ছেলেকে চিনিয়া নিতে লাগিলেন,—তাহার রত্ন ছেলে, তাহার সোনার চাঁদ ছেলে। পাড়ায় এমন ছেলে নাই, শহরে এমন ছেলে নাই, দেশে এমন ছেলে নাই।

মার ভালোবাসা সহ্য করিবার বয়স ও হৃদয় মুকুলের ছিল না, নিজেকে সে মুক্ত করিয়া নিল, চেয়ারে বসিয়া বলিল, তোমার শরীরও তো ভালো নেই মা?

কণ্ঠস্বরের পার্থক্য লক্ষ করিবার বিষয়। মার কথায় যেন কাব্যের আবির্ভাব আছে, বলিবার ভঙ্গিতেই তাহা মধুর,—মুকুলের শুধু বক্তব্য।

তবু মুকুল খুশি হইল না। নিজের কাঠিন্যের কষ্টিপাথরে মার মমতা সোনার দাগ কাটিয়া গেল, কিন্তু সে দাগে আগের মতো ঔজ্জ্বল্য যেন নাই, কেমন মেটে-মেটে হইয়া গিয়াছে। মার চোখে ঠিক উচিত পরিমাণে জল ঝরিল কই? আসিবে না আসিবে না করিয়া যে সন্তান এতকাল পরে আসিয়াছে তাকে বুকে নিয়াও তার আসাতে মার অবিশ্বাস রহিয়া গেল কোথায়? তার বাঁচিয়া থাকাটাই মার কাছে আর ভয়ংকর বিস্ময়ের ব্যাপার যেন নয়, তার সেই একফোঁটা মুকুল কোথায় সেই লঙ্কায় গিয়া পাঁচ পাঁচটা বছর কাটাইয়া আসিল, ইহার অভিনবত্ব মা আর তেমনভাবে আয়ত্ত করিতে পারিতেছেন না।

বহু পুরাতন বিদায়-নেওয়ার দিনটির কথা মনে করিয়া মুকুল আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মাকে বিচার করিল। হারানোর বেদনার সঙ্গে পাওয়ার আনন্দের তুলনা করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবার ক্ষমতা সে আয়ত্ত করিয়াছে, আজ তাই এতখানি যাচাই করা, এতখানি দর কষাকষি।

বাস্তবিক, জীবন-যুদ্ধে জয় করিয়া আর হার মানিয়া এতখানি ভোঁতা হইয়া গিয়াছে তার অনুভূতি, যে তার স্বার্থপরতার মধ্যে আজ গ্লানির ফ্যাক্টরি বসিয়াছে। সে বুঝিতে পারে না হৃদয়ের পূর্বকৃত প্রাপ্যের সঞ্চয়ের মধ্যেই ভবিষ্যৎ পাওনার মূল্য। ভুলিয়া গিয়াছে বলিয়া বেচারির দেনা শোধ করা আজ মায়েরও সাধ্যাতীত।

পাঁচ বছরে পাঁচশো দিন তার জন্য মা যে কাঁদিয়াছেন এই সহজ অনুমানও আজ মুকুলের নাই। আজ মার কাছে তার যা পাওনা ছিল পাঁচ বছর ধরিয়া মা তাহা দিয়া আসিতেছেন। আজ যে স্নেহ ফুরাইয়া যায় নাই, অভ্যস্ত দুঃখের অন্তে মার চোখ দিয়া জলও যে পড়িয়াছে সে গৌরব মায়েরই, এবং সেই গৌরবই মার পরিচয়।

মুকুল হিসাব করিতে শিখিয়াছে কিন্তু পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মতো হিসাব শেখে নাই। অশিক্ষিতা মেয়ের মতো ওর অনেক দোষ।

তবে সম্মান সে পাইল প্রচুর। আজ না চাহিতে শরবত আসিল, দাদাকে শরবত করিয়া দিতে পারিয়াই পটলি কৃতার্থ। বসন্তী পাখা আনিয়া কখন বাতাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, হাত ব্যথা হইয়া গেলেও সে থামে নাই। শশীমুখী ময়দা মাখিতে বসিয়া গিয়াছে, মুকুল গরম লুচি খাইবে।

দুপুরবেলা ভাতের বদলে লুচি! স্নেহের পরিবর্তে যে সমাদর জুটিতেছে ও যেন তারই অতি-বাস্তব রূপক।

স্নান করিতে যাওয়ার আগে প্রত্যেকের জন্য সে যে উপহার আনিয়াছিল একে একে সকলকে মুকুল বাঁটিয়া দিল।

মাসির জন্য কিছু আনা হয় নাই।

মুখ কালো করিয়া মাসি হাসিবার চেষ্টার সঙ্গে বলিলেন, আমি কিছু চাইনে বাবা—অত শখ আমার নেই। তুই বেঁচে থাক, তাই আমার ঢের!

আশীর্বাদের ছলে মাসি যেন গাল দিলেন।

মাসি একটু আড়ালে যাইতেই মা মুকুলকে বলিলেন, ওকে একজোড়া কাপড় দিস।

মুকুল বিমর্ষভাবে বলিল, দেব।

বেশি দামি নয়, সর্বদা ব্যবহারের জন্য দু-তিন টাকা জোড়ায় কাপড় দিলেই হবে।

তাই দেব।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরে শুইতে যাওয়ার আগে মুকুল চারুর ঘরে গেল।

চারু বলিল, মুকুলদাদা এতক্ষণে বুঝি মনে পড়ল?

মুকুল বলিল, আহা তুই এমন হয়ে গেছিস চারু!

বেঁচে তো আছি!

তোর কাপড় ছেঁড়া কেন? এমন নোংরা বিছানায় তুই শুয়ে আছিস কেন?

আস্ত কাপড় কে দেবে বল? বসো না মুকুলদা! না, কাপড় ময়লা হয়ে যাবে?

এক বোন সুখে আরেক বোন দুঃখে পর হইয়া গিয়াছে। রোগে শোকে পরের গলগ্রহ হইয়া জীবনধারণের লজ্জায় সকলের আগে চারু মুকুলের স্নেহকে বিক্রয় করিয়াছিল, অনেক ভণিতা করিয়া পত্র লিখিয়াছিল যে মুকুলদা, বড়ো কষ্টে আছি, আমায় পঁচিশটা করে টাকা দেবে মাসে মাসে?

টাকা অবশ্য মুকুল দিতে পারে না, বিদেশে বিশেষ কারণে তখন তাহার অনেক খরচ। কিন্তু তাই বলিয়া চারু কি তাহাকে এমনভাবে খোঁচা দিতে পারে? চারুর এমন অবস্থা হইয়াছে জানিলে সে কি সামান্য পঁচিশটা টাকা ওকে না দিয়া থাকিতে পারিত? চারুর কত আত্মীয়স্বজন, যার কাছেই থাক সুখে না থাকিলেও দুঃখ পাইবে না এই ছিল তাহার ধারণা। বাস্তবিক, এই ধারণাই তার ছিল।

তাছাড়া চারুর প্রকৃতি বড়ো হীন হইয়া গিয়াছে।

নিজের চোখে আমার অবস্থা দেখলে, এবারও কি আমার একটা ব্যবস্থা করবে না? নিশ্বাস ফেলিয়া,---তোমার ধর্ম তুমি করবে, আমি আর কী বলব বল। কিন্তু আমাকে পেটভরে খেতেও দেয় না মুকুলদা।

শশীমুখীর সঙ্গে মুকুলের দেখা হইল অনেক পরে। আগে সে যে ঘরে থাকিত সেই ঘরেই তার বিছানা হইয়াছিল। বিবাহে যৌতুক পাওয়া খাটে ফুলশয্যার রাত্রে শোয়া ভাঙা স্প্রিং-এর গদিতে মুকুলের স্বোপার্জিত টাকায় কেনা তোশকে ফুলকাটা বোম্বাই চাদর বিছানো শয্যা। বিবাহেব পূর্বে শশীমুখীর সংগে মুকুলের পঁচিশ বৎসর দেখা হয় নাই, ফুলশয্যার বিছানায় তাই সত্যিকারেব ফুল ছিল, এবারের বিরহ মোটে পাঁচ বছরের, বিছানায় তাই সূতার ফুল।

দরজাব বাহিবে ভিজা মুখখানা আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া শশীমুখী ঘরে ঢুকিল। প্রেমে নয়, উত্তেজনায় নয়, ভয়ে তাহার বুক ঢিপঢিপ করিতেছে। স্বামী যখন আজও কাছে থাকিত কালও কাছে থাকিত, তখনও তাহার মন জোগাইয়া চলা সহজ ছিল না, রোজই ভালোবাসার পরিচয় দিতে হইত, ঘুমেব জন্য মবিযা গেলেও বলিতে হইত ঘুম পায় নাই, হাত অবশ হইয়া আসিলেও বলিতে হইত, আর একটু বাতাস কবি।

কিন্তু তখন ধবাবাঁধা নিয়ম ছিল, মুকুল ভালো করিয়া নির্দেশ করিয়া দিয়াছিল কী ভাবে তাহাকে ভালোবাসিতে হইবে, মুকুলের হৃদযকে নকল কবিয়া চলিলেই তখন বেশ দিন কাটিত। আজিকাব অসাধাবণ অবস্থায় কী কবা দরকাব কিছুই শশীমুখী ভাবিয়া পাইতেছে না।

মাস্টাবেব কাছে পডা দেওয়ার মতো করিয়া সে তাই বলিল, ভালো ছিলে?

মাটির সাকি

দেহে নাই কান্তি মনে নাই শান্তি।

গরিবের এ দুটি অভাব চিরদিনের।

কিন্তু চিরদিনের অভাবও স্বভাবে পরিণত হয় না, একদিন সহিয়া যায় এই মাত্র। এবং তাহাতেও আপশোশ বড়ো কম নহে!

নিজের একটা অপ্রিয় অকথ্য রূপান্তরের আপশোশ।

ওমনিবাস ট্রেন, ছটা সতেরো মিনিটে ছাড়িয়া বজবজ যাইবে। ট্রেনটি এমনি সংক্ষিপ্ত যে মেয়েগাড়ির বাহুল্য নাই। গাড়ি ছাড়িবার কয়েক মিনিট পূর্বে উঠিয়া সুশ্রী মেয়েটি ঠিক সামনে শক্ত হইয়া বসিয়া আছে। মুখের দিকে চাহিবার ইচ্ছাও যেন হয় না। ভয় করে! মনে হয় ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে পাতলা ঠোঁটদুটি শুষ্ক ও শীর্ণ হইয়া উঠিবে, মসৃণ গাল ভাঙিয়া ব্রণের দাগে ভরিয়া যাইবে, ভাসা-ভাসা চোখদুটি বুভুক্ষায় মুমূর্ষু পশুর চোখের মতো পীড়িত ও সকাতর হইয়া উঠিবে, কপালে দেখা দিবে তেলমাখা চটচটে ঘাম! রূপ দেখিলে দুচোখ কুরূপের স্বপ্নে বিভোর হইয়া যায়! কী আতঙ্কেই মিনিটগুলি ভরিয়া উঠিল।

মাত্র দশ মিনিটের পথ, গাড়ি স্টেশনে দাঁড়াইল। লাইনের একদিকে শহরতলি বালিগঞ্জ, অপরদিকে গ্রাম কসবা। আভিজাত্যের ছাপমারা পিচ-বাঁধানো পথটি রেলের গেট পার হইয়াই গোবর আর কাদায় ভরিয়া উঠিয়াছে। দুপাশের দোকানগুলোর গ্রাম্যমূর্তির গায়ে শহুরে ভাবের তালি লাগানো— খালি-গায়ে বুট-পরা মানুষের মতো। কিন্তু এগুলোর দিকে চাহিয়া নিতাই শঙ্করের মনে হয় যে এ রকম একটা দোকান দিতে পারিলেও বুঝি মন্দ হইত না।

ঘোষালপাড়া ছাড়াইলেই শঙ্করের বাড়ি। বাড়িটি পাকাও বটে দোতলাও বটে কিন্তু যেমন পুরাতন তেমনি ক্ষুদ্র। পথ হইতে দোতলার খোলা ছাদে উঠিবার খোলা সিঁড়ি খানিকটা চোখে পড়ে : মনে হয় চুনবালির বাঁধনহীন কতকগুলো আলগা ইটে পা দিয়া এ বাড়ির লোকের ঊর্ধ্বগতির প্রয়াস। স্থানটি কিন্তু বেশ ফাঁকা আর পরিষ্কার। বাড়ির সামনে একটা পুকুর— ছোটো কিন্তু জল পচা নয়। দক্ষিণে হাত-পঞ্চাশেক মাঠের ব্যবধানে রায়বাহাদুর মহাদেব বোসের বাড়ি। রায়বাহাদুরের অনেক টাকা ছিল বলিয়া এখানে সস্তা জমি কিনিয়া বাড়ি করিয়াছিলেন। রায়বাহাদুর এখন বাঁচিয়া নাই, ছেলে সুকান্ত বাপের টাকা ও বাড়ির মালিক। বড়ো বড়ো ঘর তুলিয়া, দামি আসবাবে সাজাইয়া, ছবির ফ্রেমের মতো চারিদিকে বাগান করিয়া এবং অন্যান্য বহুবিধ সংস্কারের দ্বারা সে বাড়িটিকে বাসোপযোগী করিয়া নিয়াছে। বাগানের একটা যুবতি পুষ্পবতী বকুলিকার ছায়ায় বসিয়া নিত্য অপরাহ্নে সে পত্নী হিমানীর সঙ্গে চা পান করে।

আপিস-ফেরতা পুকুরপাড় ঘুরিয়া নিজের বাড়ির দরজায় যাইবার সময়টুকু শঙ্কর ইহাদের দেখিতে থাকে। মৃদু হাসি ও কথার মাঝে মাঝে চায়ের কাপে চুমুক দেওয়ার বিরাম, হ্রস্বপদ লোমশ কুকুরটিকে কাছে টানিয়া মাথা চাপড়ানো, আশেপাশে দুই চারিটা বকুলফুলের এলোমেলো বর্ষণ, শঙ্করের চোখে ইহা আর পুরানো হইল না। রোজই তার মনে হয় কলেজ-জীবনে পড়া কবিতাগুলির এক একটি বাছিয়া নিয়া উহারা যেন অভিনয় করে।

চেনা আছে, পরিচয় নাই। ও পক্ষে আগ্রহের অভাব এ পক্ষে সংকোচের বাধা। কল্পনাতীত উপভোগ্য জীবনটা উহারা কীভাবে ভোগ করে জানিবার সকরুণ কৌতূহল নিয়া ভাঙা ঘরে শঙ্করের দিন কাটায়।

পয়সার টানাটানি, ছেলেমেয়ের কান্না, আর বিধুর ধুঁকিতে-ধুঁকিতে রান্না-করা, বাসন-মাজার ফাঁকে ফাঁকে অদৃষ্টের নিন্দাবাদ, নটা-এগারোর গাড়িতে আপিসে গিয়া ছটা-সতেরোর গাড়িতে বাড়ি ফেরা। এই তো জীবন!

জীবনের এত অধিক বৈচিত্র্য সহ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া আপশোশ করিয়া মরে।

আজ বকুলতলা খালি দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। সচরাচর ইহা ঘটে না। শেষবেলায় বকুলতলায় আসিয়া বসার নেশা যে কত তীব্র দূর হইতেও সে যে তাহা জানে।

বাড়ি ঢুকিয়াই কারণটা বোঝা গেল। ছেলেমেয়ে তিনজন কাঁদো-কাঁদো মুখে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে, বিধু চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে চৌকির মলিন বিছানায় এবং শিয়রের কাছে টুলে বসিয়া হিমানী তার মাথায় ডবল আইসব্যাগ চাপিয়া ধরিয়া আছে।

অবস্থাটা বুঝিতে একটু সময় লইয়া শঙ্কর প্রশ্ন করিল, কী হয়েছে?

হিমানী বলিল, জ্বর! অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন, এখনও জ্ঞান হয়নি। ছেলেদের চেঁচামেচি শুনে এসে দেখি মেঝেতে পড়ে আছেন।

ঘামে জামাটা ভিজিয়া গিয়াছিল কিন্তু হিমানীর সামনে খোলা চলে না—তলায় গেঞ্জি নাই। স্বামীর খালি গাও হিমানী কোনোদিন দেখে নাই বলিয়াই শঙ্করের বিশ্বাস। বোতামগুলি আলগা করিয়া দিয়া সে বলিল, আমার আপিস এত দূরে যে চেঁচিয়ে ওরা মরে গেলেও শুনতে পাই না।

এই বাহুল্য কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য বাহুল্য নয়, হিমানী চুপ করিয়া রহিল।

ছোটো মেয়েটি বাবাকে দেখিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়াছিল, চোখের শাসনে তার কান্না থামাইয়া শঙ্কর বলিল, আজ এসে দেখছি অজ্ঞান, আর একদিন এসে হয়তো দেখব মরে গেছে!

শঙ্করের আশঙ্কা হালকা করিয়া দিবার কোনো চেষ্টা না করিয়া হিমানী বলিল, এ সময় কোনো আত্মীয়াকে এনে কাছে রাখা উচিত।

শঙ্করের সুর তৎক্ষণাৎ বদলাইয়া গেল।

এখনি? এই তো মোটে সাতমাস! এখন ভয় কীসের?

হিমানীর মুখের উপর দিয়া একটা কালো মেঘ ভাসিয়া গেল, কথা কহিল ক্লিষ্ট স্বরে, এ যে কী ভয়ানক সময় আপনি বুঝবেন না। যত সাবধান হওয়া যাক ভয় কমে না। সর্বদা একজন মেয়েমানুষ কাছে না থাকলে যে কী সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে—

অন্ধকারে সাপের ঠান্ডা স্পর্শ পাওয়ার মতো শিহরিয়া সে চুপ করিল। দেখা গেল তাহার মুখ ভারী বিবর্ণ হইয়াছে। তিনটি সন্তানের জননীর সম্বন্ধে অপুত্রবতীর আশঙ্কার পরিমাণটা শঙ্করের কাছে পরমাশ্চর্যের মতো লাগিল। এ ভাবে হিসাব করিলে সকল অবস্থায় নরনারী-নির্বিশেষে কতরকম সর্বনাশই তো হইতে পারে, মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া আধঘণ্টার ভিতর তার পঞ্চত্বলাভও সৃষ্টিছাড়া কিছু নয়, সে জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকার কোনো অর্থই যে হয় না! কিন্তু ইহার আতঙ্ক অত্যন্তই সুস্পষ্ট, ঠান্ডায় ফ্যাকাশে আঙুলগুলি পর্যন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। মনে হয় বুকের ভিতর ধুকধুকানিরও সীমা নাই। শঙ্কর বলিল, আপনার শরীর আজ ভালো নেই মনে হচ্ছে।

জ্বরে অচৈতন্য স্ত্রীকে অতিক্রম করিয়া সদাপরিচিতার শরীর একটু ভালো না থাকার জন্য দুর্ভাবনা ভালো শোনাইল না। মুখ তুলিয়া ম্লান হাসিয়া হিমানী বলিল, রোজ যেমন থাকি আজও তেমনি আছি।

আমার কথা বাদ দিন। শরীর ভালো থেকেই বা কী হবে! ডাক্তার চ্যাটার্জি এসেছিলেন, রক্ত নিয়ে গেছেন। ওষুধও লিখে দিয়েছেন, জ্ঞান হলে একদাগ খাওয়াতে হবে।

আমার জন্য কিছুই করার রাখেননি দেখছি। ডাক্তারের ভিজিট?

লাগেনি। উনি আমাদের বন্ধু।

তবে পীড়াপীড়ি করব না। কিন্তু আপনার চা খাওয়ার সময় পার হয়ে গেছে, আপনি এবার ছুটি নিন।

হিমানী ব্যাকুল হইয়া বলিল, না, না, আমায় ওঁর কাছে থাকতে দিন। চা এখানেই দিয়ে যাবে।

লণ্ঠনটা নতুন, ধোঁয়া হয় না, কিন্তু কমানো রহিয়াছে বলিয়া আলো অনুজ্জ্বল। এই আলোতেই হিমানীর মুখখানা যেন স্পষ্টতর দেখাইতেছে। সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া শঙ্করের মনে হইল আপিস যাইবার সময় সে কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল যে ফিরিয়া আসিয়া গৃহে এমন দুর্ভাবনা ও এত বড়ো বিস্ময় সঞ্চিত থাকিতে দেখিবে। হিমানীর আজকার ব্যবহার অদ্ভুত। চার বছরের প্রতিবেশী ইহারা কিন্তু গরিব প্রতিবেশীকে কবে কতটুকু আমল দিয়াছিল? সংবৎসরে হিমানী ও বিধুর মধ্যে একটি বাক্যবিনিময়ও হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আর আজ নিজে হইতে আসিয়া এমন সেবাই আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে প্রয়োজন শেষ হইলেও উঠিয়া যাইতে চায় না। টাইমপিসটায় দশটা বাজে। বেলা একটা হইতে একভাবে বিধুর শিয়রে বসিয়া আছে তিন-চার বার নিজে ডাকিতে আসিয়া একরকম ধমক খাইয়াই সুকান্ত ফিরিয়া গিয়াছে. কেরানির কুশ্রী বধূর সেবার জন্য ধনীর তরুণী প্রিয়ার এ কী লোলুপতা! মহত্ত্ব সন্দেহ নাই, উদারতারই পরিচয়, কিন্তু কী অস্বাভাবিক!

আধঘণ্টা পরে সুকান্ত আবার আসিল। কোনো কথা না বলিয়া গম্ভীর মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অসীম কুণ্ঠার সংগে শঙ্কর মিনতি করিয়া হিমানীকে বলিল, আর তো দরকার নেই, এবার আপনি যান। কতক্ষণ এ ভাবে ঠায় বসে থাকবেন?

অপ্রত্যাশিতভাবে এবার কিন্তু প্রতিবাদ আসিল সুকান্তর নিকট হইতে—থাক শঙ্করবাবু, কিছু বলবেন না, একেই সেবা করতে দিন।

অবাক হইয়া শঙ্কর বলিল, কিন্তু—

সুকান্ত মাথা নাড়িল—কিন্তু নয়। বাড়ি গিয়ে ছটফট করার চেয়ে এখানে শান্তিতে থাকা ভালো। আমার যদি একটু বসবার ব্যবস্থা করে দেন ওর সেবা করাটা দেখতে পারি।

মেঝেতে মাদুর বিছাইয়া দিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইতেই শঙ্কর দেখিল হিমানী কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া আছে। সুকান্ত একপ্রকার দুর্বোধ্য হাসি দিয়া সে দৃষ্টিকে নন্দিত করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

খাদ্য আসিয়াছিল সুকান্তর বাড়ি হইতে। ছেলেমেয়েরা খাইয়া ঘরের এককোণে ক্ষুদ্র বিছানায় জড়সড় হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শঙ্কর বিছানার পাশে মাটিতে বসিল। বুকের ভিতর চাপবাঁধা দুর্ভাবনা তবু হঠাৎ তাহার যেন হাসি পাইল। ঘরে আজ দুইজোড়া স্বামী-স্ত্রী জড়ো হইয়াছে কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় কী অসীম পার্থক্য! শয্যায় পড়িয়া আছ চামড়া-ঢাকা একটা কঙ্কাল, বাসর-রাত্রিতেও যার ওষ্ঠে মধুর বদলে জুটিয়াছিল দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে পচা খাদ্যকণার দুর্গন্ধ, আজ সাত বছরের বেশি যে তাহার মনকে উপবাসী রাখিয়া দুবেলা যোগাইয়াছে শুধু রাঁধা ভাত। তিনটি পেটমোটা শিশুর শিয়রে বসিয়া আছে একটা কলেপেষা জীবন্ত ইক্ষুদণ্ড, জীবনটা যার স্রষ্টা কবির সৃষ্টির খাতায় ভুলিয়া যাওয়া সাদা পৃষ্ঠা। আর রুগ্ণার শিয়রে যে স্ত্রীটি বসিয়া আছে, যে স্বামীটি

বসিয়া আছে তাহারই ছেঁড়া মাদুরে—রূপযৌবন অর্থ-সম্মান হাসি-উৎসবের কী সমারোহ উহাদের জীবনে!

রাত্রি এগারোটার সময়েও বিধুর জ্ঞান হইল না। কিছুক্ষণ হইতে হিমানী উশখুশ করিতেছিল, হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া সুকান্তকে বলিল, ডাক্তারবাবুকে আর একবার নিয়ে এসো।

সুকান্ত নীরবে উঠিয়া দাঁড়াইল।

হিমানী বলিল, দুজন এনো, কনসাল্ট করবেন।

সুকান্তর মুখে বিস্ময়ের চিহ্নও নাই, শুধু অভিজ্ঞতা। সামান্য একটু মাথা নাড়িয়া এমনভাবে স্বীকৃতি জানাইল যেন দুজন ডাক্তার আনিবার কথা সেও ভাবিতেছিল।

প্রতিবাদের ইচ্ছা শঙ্করের মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু কীসের প্রতিবাদ করিবে? ইহাদের ভাব দেখিয়া এ কথা তো কল্পনাও করা যায় না যে কলিকাতার সমস্ত ডাক্তার আনিয়া বিধুর চিকিৎসা করার চেয়ে বড়ো কর্তব্য ইহাদের আর কিছু আছে!

টর্চ জ্বালিযা সুকান্ত চলিয়া গেল। পাড়াটা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে—সেও যেন আজ অসুস্থ এবং ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোব উপর তাহার শুশ্রূষার ভার। জানালার বাহিরেই চাঁদ ওঠার ইঙ্গিত, রোয়াকে বিধুর হাতে মাজা পিতলের ঘটিটা চকচক করিতেছে। বিধুর পায়ের আঙুলে রেড়ির তেলে ভেজা ন্যাকড়া জড়ানো. হঠাৎ শঙ্কব তাহা লক্ষ করিল। আজ দুর্ভাবনা—অতন্দ্র নিশায় আলো নিভাইলে ওই পায়ে যদি জ্যোৎস্না আসিযা পড়ে?

হিমানীর পা দুটি চৌকিব তলার আবছা অন্ধকারে। জরি-বসানো চটির দু-একটা জরি শুধু চিকচিক কবিতেছে। পা দুটি যেন অন্ধকারে মোড়া সোনা, কয়েকটি সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া পরিচয় মিলিতেছে। ওই পায়ের গোড়ালি কি ফাটা? আঙুলের চিপায় কি জলে ক্ষয় পাওয়া সাদা ঘা?

শঙ্করেব মনে হইল হিমানীব পা দুটি চৌকির তলা হইতে টানিয়া আনিয়া এই একান্ত অসম্ভব সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া না নিলে চিবদিন তাহার মন কেমন করিবে।

চোখদুটা জ্বালা করিতেছে দেখিয়া শঙ্করের কৌতুক বোধ হইল। থাকিবার মধ্যে চোখে আছে একটু ক্ষীণদৃষ্টি—সে চোখ আবাব জ্বালা করে!

আপনি খাবেন না? খেয়ে নিন। ভেবে আর কী করবেন!

শঙ্কব চাহিয়া দেখিল হিমানী মুখের দিকে চাহিয়া আছে। স্ত্রীব অসুখের কথা ভাবিতেছিল না বলিযা তাহার একবিন্দু লজ্জা হইল না। বলিল, আজ খাব না।

আপনি না খেলে এঁর কোনো উপকার হবে না।

আমাব অপকাব হবে। অম্বলে বুক জ্বলে যাচ্ছে।

সকলেরই দেখছি সমান অবস্থা। আমারও অম্বল হলে বুক জ্বলে যায়।

বসিয়া থাকিতে থাকিতে শঙ্কর কুঁজা হইয়া গিয়াছিল. অকস্মাৎ সোজা হইয়া বসিল।

আপনাব অম্বল!

হিমানী ম্লান হাসিল, আর কলিক। যেদিন ধবে মনে হয বাথায় বুঝি দম আটকাবে। মাগো, সে যে আমাব কী কষ্ট।

শঙ্কর আবার কুঁজা হইয়া গেল—বিশেষভাবে হতাশ হইলেই তার মেরুদণ্ডটা ধনুকের মতো বাঁকিয়া যায়।

হিমানী একটু ভাবিয়া বলিল, কিন্তু ও জন্য আমার নালিশ নেই।

কলিকের ব্যথা থাকার জন্য আবার নালিশ কী থাকিতে পারে শঙ্কর বুঝিতে পারিল না। বলিল, কেন।

হিমানী নতমুখে অস্বাভাবিক গলায় বলিল, শুনলে আপনি লজ্জা পাবেন, ও যে আমার প্রাপ্য। প্রত্যেকটি মেয়ের জন্য ভগবান নির্দিষ্ট ব্যথা মেপে রাখেন, মাথা পেতে নিজের ভাগ নিতেই হবে। ব্যথার এক রূপ এড়িয়ে গেলে অন্যরূপে দেখা দেবেই।

কী অদ্ভুত মন্তব্য! সংকোচে নয় মন্তব্যের ভারে শঙ্কর মাথা হেঁট করিল। কথাগুলি যেন এক বোঝা অভিযোগ—একটি সুদীর্ঘ জীবনের ব্যর্থতার মতো অসম্ভব ভারী।

কিন্তু শয্যাশায়িনী ওই সংক্ষিপ্তা মানবীটির অভিযোগও তো নিখিল মানবতার ইতিকথায় প্রক্ষিপ্ত নয়! ওর বুকের দৃশ্যমান পাঁজরা, ওর কালিপড়া চোখের অত্যধিক স্নেহের কালো ছানি, ওর জীবনযাত্রার অধিকারীর অন্তহীন বঞ্চনার তবে মানে কী? ভগবানের মাপিয়া রাখা ব্যথার ভাগের সঙ্গে মানুষের গুঁজিয়া দেওয়া ব্যথায় ওর শিরায় রক্তের রংও বুঝি ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে।

হিমানীর কথাটা সে বুঝিল, না বোঝার মতো করিয়া। ও নিত্য অপরাহ্ণে বকুলতলায় স্বামীর সঙ্গে চা পান করিতে পায়। ভোরবেলা মোটরে চাপিয়া লোকালয় ছাড়িয়া গিয়া খোলা মাঠের মাঝখানে নির্জন পথপ্রান্তে ক্ষণকাল বিশ্রাম করে। লক্ষ্য ছাপানো মনের সঙ্গে নিত্য ওর ঘনিষ্ঠতা জন্মে,—আঙুলের সোনার কাঠি দিয়া সেতারের ঘুমন্ত রাগরাগিণীর ও ঘুম ভাঙায়। গন্ধতেলে খোঁপা বাঁধে, সাবান মাখিয়া স্নান করে। ঘরে পরিয়া বেনারসি ছিঁড়িয়া ফেলে।

বিধুর কী আছে?

সহানুভূতির অভাব ছিল না কিন্তু হিসাবে হিমানীর হার হইল।

সুকান্ত ডাক্তার নিয়া ফিরিবার পূর্বে বিধুর জ্ঞান হইল। রক্তবর্ণ চোখ মেলিয়াই সকলকে চমকাইয়া দিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। হিমানীর হাত হইতে দুইটা আইসব্যাগই খসিয়া পড়িল। ছোটো খোকা ঘুম ভাঙিয়া করুণ সুরে কাঁদিতে লাগিল। শঙ্কর ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিধুর আর্তনাদের শব্দার্থ এই :

মাগো এ ডাইনি কে! খোকা! ওরে খোকা!

বার কয়েক গলা চিরিয়া খোকাকে ডাকিয়া সে দিব্য সুর করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিয়া দিল, খোকারে .

হিমানী আইসব্যাগ দুটি তুলিয়া আবার মাথায় চাপিয়া ধরিল। খানিক পরে শ্রান্ত হইয়া বিধু বোধ হয় ঘুমাইয়াই পড়িল।

হিমানী জিজ্ঞাসা করিল, খোকা কোনটি?

নেই।

নেই।

নাঃ। ওর মনে থাকতে পারে, পৃথিবীতে নেই। জ্যোৎস্না রাতে খোকা একদিন ছাত থেকে পাকা উঠানে পড়ে গিয়েছিল।

হিমানী চমকিয়া বলিল, সত্যি?

হ্যাঁ। জ্যোৎস্না উঠলেই খোকাকে নিয়ে ও ছাতে উঠত কেন কে জানে। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে কতবার যে ছুটে যেত ঠিকানা নেই, জিজ্ঞাসা করলে বলত, জ্যোৎস্না দেখতে ভালো লাগে।

ও কথা সত্যি নয়।—হিমানীর কণ্ঠে কাতরতা।

তা ঠিক। জ্যোৎস্না দেখে ওর ভালো লাগা অসম্ভব। কিন্তু কেন যে উঠত ভেবে পাই না।

মুখ আড়ালে রাখিয়া হিমানী নীরব হইয়া রহিল। তেল কমিয়া গিয়াছিল, বার কয়েক দপদপ করিয়া আলোটা নিভিতে আরম্ভ করিল। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শঙ্কর যখন তেলের বোতলটা নিয়া

আসিল আলো প্রায় নাই। দেখা গেল জ্যোৎস্না আসিয়া সত্যই বিধুর পায়ের কাছে বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। বিধু কিন্তু পা গুটাইয়া নিয়াছিল।

তেল ভরিবার চেষ্টায় আলোটা একেবারে নিভিয়া গেল। প্রায় রুদ্ধকণ্ঠে হিমানী বলিল, কতদিন আগে শঙ্করবাবু?

কীসের?

কতদিন আগে খোকা ছাত থেকে—?

আলো জ্বালিবার চেষ্টা করিতে করিতে শঙ্কর বলিল, পাঁচ ছমাস হল বইকী।—চৈত্রের প্রথমে।

কান্না শুনিনি তো।

শঙ্কর মাথা নাড়িল, ও এখানে কাঁদেনি। খোকার সঙ্গে হাসপাতালে গিয়েছিল, সেখান থেকেই ওকে ওর মার কাছে রেখে এসেছিলাম।—লণ্ঠনটা কেরাসিন কাঠের ভাঙা টেবিলে বসাইয়া গম্ভীর গলায় বলিল, কী জানেন, মড়াকান্না আমার একেবারে সহ্য হয় না। মাথা ঘোরে।

যেন সে ছাড়া জগতের আর সব মানুষের মড়াকান্না সহ্য হয়, যে কাঁদে তারও! মানুষ যে কাঁচা মাটির পাত্র, একবার ভাঙিলে, চোখের জলে গুলিয়া আবার গড়া যায় এ কথা সে যেন জানে না।

হিমানী কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল, মড়াকান্না সত্যি বড়ো বিশ্রী। কিন্তু কাঁদতে না পারলে আরও বিশ্রী হয়। আমার ছোটোভাইটি যখন মরে যায় আমি কাঁদতে পারিনি।

শঙ্কর বলিল, কেন?

কী জানি। নিজের হাতে মানুষ করেছিলাম বলে বোধ হয়। ছমাসের ভাইকে সাতবছরের করেছিলাম, সে মরলে কি কেউ কাঁদতে পারে?

শঙ্কর নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল—পারে না।

হিমানী যেন তাহাতে খুশি হইল না,—ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, অন্তত পারা উচিত নয়। ও-রকম ভাই-এর সঙ্গে পেটের ছেলের কী তফাত আছে! মরলে অজ্ঞান হতে হয়, কাঁদতে নেই।

বলিয়া সে নিজের মনে বার কয়েক শিরশ্চালনা করিল। আবোলতাবোল মন্তব্যগুলির মধ্যে ইহা কোনটির প্রতি সংশয়ের প্রতীক বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কর চুপ করিয়া রহিল।

ডাক্তার চ্যাটার্জি এবং কলিকাতার আর একজন নামকরা ডাক্তারকে নিয়া সুকান্ত ফিরিল। চ্যাটার্জি রক্ত পরীক্ষা করিয়াছিলেন, বললেন, রক্তে মেলিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার জীবাণুর অন্ত নাই। অন্যজন বিনা বাক্যব্যয়ে ইনজেকশনের পিচকারিতে কুইনাইন ভরিলেন।

শঙ্কর বলিল, হাড়ে লেগে ছুঁচটা যেন না ভাঙে ডাক্তারবাবু।

এই মন্তব্যে ঘরের আবহাওয়াটা অকস্মাৎ বীভৎস রকমের করুণ হইয়া উঠিল।

ডাক্তার বিদায় নেওয়ার খানিক পরে হিমানী শান্তভাবেই স্বামীর সঙ্গে চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিতে যতটা সময় লাগিল তাহাতে বোঝা গেল বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়াছিল।

একটা কথা বলতে এলাম, বলিয়া ভূমিকা করিল।

কী কথা বলুন।

পাঁচ ছমাস আগে জ্যোৎস্না উঠলে আমরাও ছাদে উঠতাম। খোকার মৃত্যুর জন্য আমাদের কী পাপ হয়নি?

শঙ্কর আশ্চর্য হইয়া বলিল, আপনাদের কেন পাপ হবে?

ছাদে উঠে বিধু আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকত, কী দেখত জানিনে। আমাদের জন্যেই কি ছাদে উঠত?

শঙ্কর বলিল, হবে হয়তো। কিন্তু সে দোষ আপনাদের নয়।

হিমানীর চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, বলিল, আমারই দোষ, আমি সত্যি ডাইনি। না জন্মাতেই আমার সব খোকাকে আমি মেরেছি, কারও খোকা মরলে আমি ছাড়া আর কার পাপ হবে? জানেন জ্যোৎস্নায় নামতে আজ আমার গা ছমছম করছে। আপনার সেই খোকা যদি আঁচল ধরে টানে?

টানিলে শঙ্কর কী করিবে? পিতা বলিয়া এখন কী আর সে তার কথা শুনিতে চাহিবে।

হিমানী বলিল, আমার সঙ্গে একটু আসবেন?

সুকান্ত নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মৃদুস্বরে বলিল, ভয় কী, এসো।

সকালে সুকান্ত খবর নিতে আসিল বিধু কেমন আছে। চেহারা দেখিয়া সে যে সমস্তরাত্রি ঘুমায় নাই বুঝিতে কষ্ট হয় না। শঙ্কর টুলটা আগাইয়া দিয়া বলিল, বসুন।

দাঁড়ান, খবরটা দিয়ে আসি আগে, বলিয়া সুকান্ত চলিয়া গেল। পাঁচমিনিট পরে ফিরিয়া আসিয়া বিনা আহ্বানেই টুলটাতে বসিয়া পড়িল।

সকাল বেলার আলোতে রাত্রির আলোর ইঙ্গিতটুকুও নাই, এবং তাহা নিঃসন্দেহে পরম আশ্চর্যের ব্যাপার। তথাপি বিধুর পায়ের আঙুলে জড়ানো রেড়ির তেলের ন্যাকড়াটা শঙ্কর কখন যেন খুলিয়া নিয়াছে।

সুকান্ত বলিল, বুঝলেন শঙ্করবাবু, জীবনে একফোঁটা সুখ নেই।

এ কথা সকলেই জানে, শঙ্কর কিছু বলিল না।

আপনাব এখান থেকে গিয়ে কী চেঁচামেচি আর কান্না যে আরম্ভ করে দিলে যদি দেখতেন। কোনো অভাব নেই তবু কেন যে ওর মাথা এমনভাবে খারাপ হয়ে গেল!

অভাবের প্রাচুর্যে আধমরা স্ত্রীর দিকে চাহিয়া শঙ্কর এবারও কিছু বলিতে পাবিল না।

মহাসংগম

পশুপতি থুড়থুড়ে বুড়া হইয়া পড়িয়াছে।

এই মাঘে তার বয়স সাতাশি পূর্ণ হইল। দুটো একটা যুগ নয়, পশুপতি প্রাণপণ চেষ্টায় সাত যুগের বেশি পৃথিবীতে টিকিয়া আছে।

বিপুল সুদীর্ঘ জীবন।

কিন্তু তার সামনে যে মৃত্যু, সে আরও বিপুল, আরও সুদীর্ঘ! মৃত্যুকে কে ঠেকাইয়া রাখিবে? সাতাশি বছরের আয়ু নয়, সে বরং মৃত্যুকেই কাছে ডাকিতেছে বেশি। পৃথিবীতে যে যতদিন বেশি বাঁচিবে সে তত গিয়া পড়িবে মরণের কাছাকাছি। একদিন দেখা যাইবে তার দেহে তার মনে, তার ক্ষীণ স্পন্দিত প্রাণের জগতে মরণকে যেন অনায়াসে খুঁজিয়া পাওয়া যায়। জীবনেই যেন হইয়াছে জীবনের মরণের মহাসংগম।

পশুপতি বিকল হইয়া পড়িয়াছে, অথর্ব হইয়া পড়িয়াছে। গায়ের চামড়া তার বিবর্ণ, লোল, সহস্র কুঞ্চনে কুঞ্চিত। মাথায় কুড়ি বছরের পুরানো চকচকে টাকটি পর্যন্ত তার ঢিলা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। কানে সে ভালো শুনিতে পায় না। একটি অলৌকিক মর্মরিত জগতে সে বাস করে। বিরাট বায়ুস্তর হইতে কোটি মিশ্রিত শব্দ অহরহ তার দুই কানে আঘাত করে, কাছে কলরব করে মানুষ পশু আর পাখি, সব মিলিয়া তার শুধু একটি অবিচ্ছিন্ন চাপা গুঞ্জনধ্বনির অনুভূতি হয়। বাড়ির লোকে তার সঙ্গে কথা বলে চেঁচাইয়া।

বাড়ির লোকে তাই তাহার সঙ্গে কথা কয় কম। কত চেঁচাইবে।

চোখে এখনও সে অল্প অল্প দেখিতে পায়, কিন্তু চোখের পাতা দুটি সিসার মতো ভারী হইয়া সর্বদাই তার চোখ দুটিকে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, টানিয়া খুলিয়া রাখিতে তাহার কষ্ট হয়, পরিশ্রমও যেন হয়। ভ্রূ পাকিয়া প্রায় উঠিয়া গিয়াছে। মুখে আর একটাও দাঁত নাই। চোয়ালের দুপাশ দিয়া গালের গোড়া হইতে দুটি নিস্তেজ নীল শিরা তার শীর্ণ গলাটি বাহিয়া নীচে নামিয়া গিয়াছে। মেরুদণ্ডটি তাহার ধনুকের মতো বাঁকা। উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথাটি সে কোনোমতে নিজের কোমরের লেভেল ছাড়াইয়া উপরে তুলিতে পারে না। দুই হাতে মোটা একটা লাঠিতে ভর দিয়া তাহাকে দাঁড়াইতে হয়। লাঠি না থাকিলে সে মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়া যাইবে। দেহের ভরকেন্দ্র তাহার পায়ের আয়ত্তাধীন সীমানা ছাড়াইয়া অনেকখানি সামনে আগাইয়া গিয়াছে।

উবু হইয়া বসিলে তাহার দুই হাঁটু মাথার কাছে ঠেলিয়া ওঠে।

পশুপতি থাকে চাঁদপুতিয়ার শ্রীমন্ত সরকারের বাড়ি।

শ্রীমন্ত তার কেহ নয়। দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছে। পশুপতির একটি ছেলে ছিল। হয়তো এখনও আছে। কেহ তার খবর রাখে না। অনেককাল আগে সে পলাইয়া গিয়াছিল সেই বর্মা মুলুকে। মাঝখানে একবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল সেইখানেই বিবাহাদি করিয়া সে সুখে বসবাস করিতেছে। তারপর তার আর কোনো খবর পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমন্ত মোক্তার। মফস্বলে মোক্তারি করিয়াও অনেকে পাকা দালান তোলে কিন্তু শ্রীমন্ত এখনও সেটা পারিয়া ওঠে নাই। বাড়িটা তার বড়ো, কিন্তু কাঁচা। সদরের ঘরটা শ্রীমন্তের মোক্তারি ব্যবসার

জন্য লাগে। অন্দরের ঘরগুলি তার দখল করিয়া থাকে নিকটতম আত্মীয়স্বজন। বাড়ির একেবারে পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশে নিচু ভিটাতে একখানা ছোটো ঘর আছে। মাঝখানে বেড়া দিয়া ঘরখানাকে দুভাগে ভাগ করিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহারই একটা ভাগে কতকগুলি চাষের যন্ত্রপাতির সঙ্গে বাস করে পশুপতি।

পাশের ভাগটাতে থাকে কুন্দ, তার দুটি ছেলেকে লইয়া। ধরিলে কুন্দ, হয়তো শ্রীমন্তের কেহ হয়, না ধরিলে সে পরের চেয়েও পর। কিন্তু শ্রীমন্ত বোধ হয় সম্পর্কটা ধরিয়াই এই খোপটার ঘুঁটেগুলি অন্যত্র সরাইয়া তাহাকে থাকিতে দিয়াছে। কারণ পশুপতি তার পিতৃবন্ধু, মাননীয় ব্যক্তি। পশুপতির পাশের খোপে যাহাকে তাহাকে শ্রীমন্ত থাকিতে দিতে পারে না।

রাতটা পশুপতি তার ঘরে ছোটো একটি চৌকিতে শুইয়া কাটায়। দিনের বেলা ঘরের সামনে সংকীর্ণ দাওয়াটির একপ্রান্তে দুপরল চটের উপর পুরু করিয়া বিছানো একটা কাঁথায় বসিয়া থাকে। পাশে একটা ওয়াড়বিহীন তেলচিটা বালিশ দেওয়া আছে। বসিয়া বসিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলে কাত হইয়া বালিশে মাথা রাখিয়া সে শয়ন করে।

গ্রীষ্মকালে এখানে থাকে ছায়া। ঘরের ডাইনে সূর্য উঠিয়া বাঁদিকে অস্ত যায়। শীতকালে ঘরের আড়াল হইতে সূর্য সামনে সরিয়া আসে। বড়ো ঘরের চাল ডিঙাইয়া, রান্নাঘরের পাশে ঝাঁকালো আমগাছটার মাথার উপর দিয়া সমস্ত শীতকালটা পশুপতির বসিবার স্থানটিতে রোদ আসিয়া পড়ে।

মোটা একটা লেপ গায়ে দিয়াও সমস্ত রাত পশুপতি শীতে হিহি করিয়া কাঁপে, দেহে তার উত্তাপ এত কম যে শীতে হাড়ের ভিতরে পর্যন্ত যেন একটা জ্বালা কাঁপুনি ধরাইয়া দেয়। সকালে তার ঘরের সম্মুখ দিয়া যে যায় তাহাকেই সে জিজ্ঞাসা করে, রোদ উঠল গা? হ্যাঁগো, দাওয়াতে রোদ এল, আঁ?

কাঁপানো জড়ানো গলায় সে সকলের কাছে রোদের, উত্তাপের, জীবনের আবির্ভাবের সুসংবাদটি শুনিতে চায়। কেহ সংক্ষেপে জবাব দিয়া বলে, এই উঠল ; কেহ নিজের বিপুলতর প্রয়োজনে কিছু না বলিয়াই চলিয়া যায়, কেহ নির্বিকার চিত্তে শোনায় হতাশার বাণী : রোদ কি এত সকালে ওঠে? ঢের দেরি এখনও দাওয়ায় রোদ আসতে।

কুন্দ কোন সকালে উনান ধরাইয়া ডাল চাপাইয়াছে। সে এক সময় আসিয়া বলে, কী হাড় কাঁপানো জাড় গো বাবা এ বছর! ছেলে-পুলে মোলো। একটু আগুন দেব গো দাদামশায়?

আগে রাত্রে শুইতে যাওয়ার সময় উনান হইতে এক মালসা আগুন কুন্দ পশুপতির কাছে রাখিয়া যাইত। কিন্তু একবার মালসার আগুন তার বিছানায় লাগিয়া যাইবার উপক্রম হওয়ার পর হইতে এ ব্যবস্থা রহিত হইয়া গিয়াছে. আগুন পোহাইতে গিয়া বুড়ো কি শেষে পুড়িয়া মরিবে! সকালে চারিদিকে অনেক লোক, সে ভয় নাই।

পশুপতি সাগ্রহে বলে, দে দিদি, একটুকু আগুন দে তো।

কুন্দ মালসায় একটু আগুন করিয়া পশুপতির কাছে রাখিয়া যায়।

রোদ উঠিলে কুন্দ অথবা তার বড়ো ছেলে কেশব পশুপতিকে ধরিয়া দাওয়ায় লইয়া যায়। কুন্দর দুবছরের ছোটো ছেলেটির মতো সেও যেন অবোধ অসহায় শিশু। বার্ধক্যের গোড়াতেই পিছু চলিতে আরম্ভ করিয়া এখন সে যেন আবার তার সেই আদিম অথর্ব শৈশবে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

পশুপতি দাওয়ায় বসিয়া থাকে নির্বাক নিস্পন্দ জড়পিণ্ডের মতো। তার ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, হৃদয়ে অনুভূতি নাই, মস্তিষ্কে চিন্তা নাই। ঠান্ডায় সে ভিতরে বাহিরে জমিয়া গিয়াছে। চোখ বুজিয়া সূর্যদেবতার অন্ত্যজ ভক্তের মতো সে শুধু সবিনয়ে ব্যাকুল আগ্রহে সূর্যকিরণকে সর্বাঙ্গ দিয়া শুষিয়া লইতে থাকে।

সে বাঁচিতেছে। রাত্রে সে একেবারে মরিয়া গিয়াছিল, এখন আবার বাঁচিতেছে।

দেহে খানিকটা উত্তাপ সঞ্চিত হইলে সে ঘোলাটে চোখ মেলিয়া তাকায়।

প্রভাতে আপন আপন ক্ষুধা তৃষ্ণা হিংসা ও ভালোবাসা লইয়া শ্রীমন্তের বৃহৎ পরিবারটি জাগিয়া উঠিয়াছে। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খেলা ও কর্তব্য পালন চলিবে। পৃথিবীর মাটিতে গাছের ডালে, আকাশে সর্বত্র বিচিত্র চঞ্চল প্রাণ। কিন্তু পশুপতির স্থান এই সজাগ উদ্‌বিগ্ন ব্যস্ততার বাহিরে, দাওয়ার এই কাঁথাটির উপর। তার স্তিমিত নিষ্প্রভ জগতে আবছা মানুষগুলি চলাফেরা করে, কেহ কাছে আসিলে মনে হয় কুয়াশার ভিতর হইতে উঠিয়া আসিল। মাঝে মাঝে কারও চিৎকার করিয়া বলা কথার দু-এক টুকরা কথা তার কাছে ভাসিয়া আসে,—বহুদূর হইতে ভাসিয়া আসে। পৃথিবীব মানুষের জীবনে, পৃথিবীর আলো শব্দ ও গন্ধে পশুপতিব দাবি নিঃশেষ হইযা আসিয়াছে।

না থাক। পশুপতির বিশেষ কোনো ক্ষোভ নাই। সংসারে নিজেকে প্রয়োজনীয় করিয়া বাখিবার উৎসাহও তার শেষ হইয়া আসিয়াছে। কতকগুলি অভ্যাস, কতকগুলি নিয়ম এখনও তাহাকে পালন কবিয়া চলিতে হয়, সে তাহা অনেকটা যন্ত্রের মতোই করিয়া যায়—প্রায় বিগড়াইয়া-আসা যন্ত্রের মতো। জীবনের অসংখ্য বন্ধন একে একে শিথিল হইয়া আসিয়াছে, জীবনের প্রতি মমতাও বুঝি তার গিয়াছে কমিযা, মানুষেব প্রতিও। আপনার বয়সের দুর্বিষহ ভারটা বহিয়া বহিয়া সে বুঝি ভয়ানক স্বার্থপর হইযা পড়িয়াছে। মানুষেব, তাহাকে যে আশ্রয় দিয়াছে সেই উপকারক মানুষটি ও তাব পরিবারের, দৈনন্দিন সুখদুঃখেব প্রতি তার আসিয়াছে উদাসীনতা।

তবু, ওব মধ্যেই শরীব একটু ভালো থাকিলে সে একটু কৌতূহল বোধ করে, মনে মনে কী যেন সে ভাবে। ইশারায় শ্রীমন্তকে ডাকিযা সে বলে, খেঁদির জন্য পাত্র দেখা হচ্ছে? হোক, ভালো করে খোঁজখবব কব বাবা, মেয়ে বড়ো লক্ষ্মী।

গভীর দায়িত্ববোধের উপযোগী মুখভঙ্গি করিয়া পশুপতি জবাবেব প্রতীক্ষা করে।

শ্রীমন্তের বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। মাথার চুল তাবও প্রায় অর্ধেক সাদা হইয়া আসিল। সে অবাক হইয়া বলে, খেঁদির পাত্র? সাতবছরে পড়ল না মেয়ে, এখনি পাত্র কীসের?

কথাটা সে দুবাব বলিলে পশুপতি শুনিতে পায়। তার মাথার মধ্যে কেমন একটা গোল বাধিয়া যায়। সায় দিয়া বলে, তা বটে খেঁদি এখনও ছোটো বটে খুব।

নিঝুম হইয়া একটু ভাবিয়া সে আবার বলে, খেঁদি নয় গো, বলছি মুখীর কথা। বলছি মুখীর কথা, তুমি শুনছ খেঁদি। মুখীর কী হল—পাত্তরের?

যেমন-তেমন একটা জবাব দিয়া শ্রীমন্ত তাহাকে বুঝায়। পশুপতির চোখ মিটমিট করে। ক্ষণে ক্ষণে মাথা নাড়িয়া সে শ্রীমন্তের অর্ধেক-শোনা অর্ধেক না-শোনা কথায় সায় দিয়া যায়।

মুখীর বিবাহের জন্য তাহার চিন্তা ও উদ্‌বেগের যেন সীমা নাই।

কিন্তু পশুপতির হৃদয়-যন্ত্রটি একেবারে বিকল ও অসাড় হইয়া যায় নাই। কুন্দর জন্য তার বুকে মমতা আছে।

হয়তো এই মমতার মর্মকথাটি এই যে কুন্দর সেবা তার প্রয়োজন হয়। কিন্তু সেটা দোষের কথা নয়। মানুষের ধর্মই এই, সাতাশি বছর বয়সেও মানুষকে এই ধর্মই পালন করিতে হয়। সেবা হোক, মমতা হোক, তোযামোদ হোক, অর্থ হোক, দুপক্ষের প্রয়োজন আছে বলিয়াই সংসারে এ সবের আদান-প্রদান চলে।

শোয়ার আগে কুন্দ যখন পশুপতির খবর লইতে আসে, রাত্রি তখন অনেক। চারিদিক নিস্তব্ধ। পশুপতি এক একদিন ফিসফিস করিয়া বলে, দরজা বন্ধ কর দিদি।

কুন্দ দরজা বন্ধ করিলে পশুপতি আরও বেশি ফিসফিস করিয়া বলে, দেখ তো আছে কী নেই? কুন্দ হাতের ডিবরি নামাইয়া চৌকির তলে উঁকি দেয়। টিনের ছোটো তোরঙ্গ চৌকির কোণের পায়ার সঙ্গে দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া এখনও বাঁধা আছে, কেহ লইয়া যায় নাই।

পশুপতি শঙ্কিত হৃদয়ে অপেক্ষা করে। কুন্দ সিধা হইয়া তার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলে, আছে দাদামশাই, যাবে কোথা? পশুপতি নিশ্চিত হইয়া বলে, তোকে দিয়ে যাব দিদি, তোর কেউ নেই তোকেই দিয়ে যাব।

এটা স্তোকবাক্য নয়, টিনের তোরঙ্গটি পশুপতি সত্যসত্যই তাহাকে দিয়া যাইবার কামনা পোষণ করে। কুন্দও যে লোভ না করে এমন নয়। কিন্তু বাক্সে কী আছে পশুপতি স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। তার ভাসাভাসা জবাবে এইটুকু বুঝিতে পারা যায় যে বাক্সে গহনা আছে, টাকা আছে, অনেক লোভনীয় দামি জিনিস আছে. কুন্দ এতটা বিশ্বাস করে না। কিছু টাকা আছে. দু-একশো। বাক্সোটা কুন্দ একদিন সন্তর্পণে নাড়িয়াও দেখিয়াছে। ভিতরে ঝমঝম শব্দ হয়।

কুন্দর ছোটো ছেলেটিকে পশুপতি ভালোবাসে।

সকালে দাওয়ায় দুটি মুড়ি ছড়াইয়া কুন্দ ছেলেটাকে তার কাছে বসাইয়া দিয়া যায়। খোকার দিকে তাকাইয়া ফোকলা মুখে পশুপতি একটু হাসে। দুটি শুষ্ক শীর্ণ হাত তার দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলে, আ আ—মণি আ—সোনা আ—

বেশ একটু সুর করিয়াই যেন বলে। দু-আঙুলে একটি মুড়ি খুঁটিয়া মুখে তুলিতে গিয়া তার কচি দাঁত কটি চিকমিক করিয়া খোকাও হাসে।

কিন্তু ওই পর্যন্তই। খোকাকে কোলে করিয়া আদর করিবার সামর্থ্য পশুপতিব নাই। হাত বাড়াইয়া ওকে সে ছুঁইতে পারে, ডাকিয়া ডাকিয়া কাছে আনিতে পারে, ওর গায়ে মাথায় বুলাইতে পারে হাত। আর কিছু পারে না।

খোকা টলিতে টলিতে হাঁটিতে পারে। একদিন সে পশুপতির গায়ের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। খোকা জানিত মার মতো পশুপতিও এতে খুশি হইবে এবং যে ভাবেই সে ঝাঁপ দিবে দুহাতে তাহাকে সে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া ফেলিবে। কিন্তু খোকাকে সামলানো দূরে থাক, পশুপতি নিজেই হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল।

দুজনেই সেদিন কাঁদিয়াছিল—জীবনের দুই প্রান্তের দুটি শিশু। খোকার কান্না বাড়িব লোকে শুনিয়াছিল আর পশুপতির কান্না দেখিয়াছিল। দন্তহীন মুখখানি হাঁ করিয়া অবলা প্রাণীর মতো সে কাঁদিয়াছিল। সামান্য ব্যথাও সে আজকাল সহিতে পারে না। দেহের কোথাও তুচ্ছ এতটি আঘাত লাগিলে বহুক্ষণ অবধি তার সর্বাঙ্গ বেদনায় কন্‌কন্‌ করিতে থাকে।

অথচ আঘাত মাঝে মাঝে লাগেই।

কুন্দর অনেক কাজ। সব সময় তাহাকে হাতের কাছে পাওয়া যায় না। লাঠিতে ভর দিয়া পশুপতিকে উঠিতে হয়। তিনটি পায়ের সাহায্যে কষ্টে সে নিচু দাওয়া হইতে নীচে নামে, আরও কষ্টে দাওয়ায় ওঠে। চৌকাট ডিঙাইয়া ঘরে যায় এবং বাহিরে আসে। পড়িয়া যাওয়ার মতো ভয়ানক ব্যাপার কদাচিৎ ঘটে, কিন্তু প্রায়ই পায়ে হোঁচট লাগে, লাঠিটা মাথায় ঠুকিয়া যায়, চৌকির কোণে হাঁটুর কাছে ঠোক্কর লাগে। কোনো রকম শ্বাস রোধ করিয়া ঘরের শয্যায় অথবা দাওয়ার আশ্রয়ে পৌঁছিয়া পশুপতি অনুশ্বাসীয় হাহা শব্দে কাতরতা প্রকাশ করে, তার স্তিমিত চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে।

একদিন কুন্দর বড়ো ছেলে কেশব তাহাকে প্রাণান্তকর আঘাত দিয়াছিল। খোকার মতো সেও এক রকম পশুপতির গায়ের উপরে আছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তবে ইচ্ছা করিয়া নয়।

কেশব যোলো-সতেরো বয়সের দুরন্ত শয়তান ছেলে। স্কুলে যায় না, লেখাপড়া করে না, একটু একটু শ্রীমন্তের মুহুবিব কাজ শেখে, ফাই-ফরমাশ খাটে, খায় আর ঘুরিয়া বেড়ায়। মাঝে মাঝে কুন্দ ও পশুপতির কাছে পয়সা আদায় করে।

যত সে শয়তান ছেলে হোক, প্রাণ যে তার প্রচুর তাহাতে সন্দেহ নাই। সে গাছে ওঠে, কাঠ চেলায়, মারামারি করে, আর প্রবল নিষ্ঠুর অত্যাচারীর মতো সর্বদা তার চেয়ে অসহায় মানুষ ও পশুকে নির্যাতন করার সুযোগ খোঁজে।

তাহার এই অধীব চঞ্চল প্রাণাবেগের কাছেই পশুপতি বোধ হয় আত্মবিক্রয় করিয়াছে. ছেলেটাকে সে ভালোবাসে. ভয় করে, পূজা করে এবং ঘৃণা করে। সামনে সজনে গাছের ডালে কবে এক অজানা পাখি বাসা করিয়া ছিল, ডিম ফুটিয়া বড়ো হইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে. তবু গাছে উঠিয়া কেশবের তাহা নিজের চোখে দেখা চাই। সজনে গাছের ডাল ভারী বিশ্বাসঘাতক। কত মোটা ডাল কত সহজে ভাঙিয়া যায়—ভিতরে শাঁস নাই। কেশব ঢিপ করিয়া পড়িয়াছিল পশুপতির সামনে। সে আতঙ্ক উত্তেজনা পশুপতি বাকি জীবনে ভুলিবে না। আর গাছ হইতে পড়িয়া কেশবকে সঙ্গে সঙ্গে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে পালাইয়া যাইতে দেখিবাব বিস্ময়। কেশব ঘরে ঢোকে উঠান হইতে একলাফে দাওয়া ডিঙাইয়া এবং এক এক সময় অকারণে ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় একটা বাঁশের খুঁটি ধরিয়া বোঁ করিয়া এক পাক ঘুরিযা যায়। এবং তারপব আরও অকারণে ওই উঠানের প্রান্তে শ্রীমন্তের উদাসীন ছেলেমেয়ে বউদের দিকে আড়চোখে চাহিতে থাকে।

কিন্তু তাহার বাহাদুরিটা সম্যক বুঝিতে পারে শুধু পশুপতি। হৃদয়ের যতটুকু উষ্ণতা তার আজও জীবনেব কামনা করে তাই দিয়া কেশবকে সে বোধ হয় হিংসা করে, তাই ভালোও বাসে। শিহরন আজ পশুপতিব দুর্লভ নয় কিন্তু ছেলেটার কাণ্ডে তার যে শিহরন জাগে তাহা অভিনব, তাহা মৌলিক। তার ভীরু দুর্বল বুক আতঙ্কে টিপটিপ করে, ব্যাকুল হইয়া কেশবকে মুখে এ সব কাণ্ড করিতে বারণ করে. কিন্তু দুচোখ প্রাণপণে কুঁচকাইয়া এই চিত্তাকর্ষক অভিনয় দেখিতেও ছাড়ে না।

শেষে বলে, শোন কাছে আয় দিনি! আয় না দাদা, আয়। ওরে আয় না!

কেশবকে কাছে আনিয়া সে করিবে কী? কিছু না। শুধু বসাইয়া রাখিবে। নিজে তো দিবারাত্রি বসিয়াই আছে, এই উত্তাল প্রাণশক্তিকেও সে একটু কাছে বসাইয়া রাখিবে। হয়তো প্রাণপণে দেখিবে ও দুই হাতে স্পর্শ কবিবে। কিন্তু সেটা বাহুল্য। জীবনের এই অসংযমকে নিজের কাছে সংযত করিয়া রাখাই তাহার আসল কামনা।

একদিন এমনি দুবন্তপনার মধ্যে অত বড়ো ছেলে পশুপতির গায়ের উপর পড়িয়া গেল। তেমনভাবে পড়িলে পশুপতি বাঁচিত কিনা সন্দেহ, মাটিতে প্রথমে একটা হাত ফেলিয়া কেশব নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়াছিল। তবু তার হাঁটুর আঘাতে পশুপতির বাঁকা কোমর যেন ভাঙিয়া গেল। দুদিন তার উঠিবার সামর্থ্য রহিল না।

কেশব প্রায়ই নানা কারণে শাস্তি পায়। সেদিন তার শাস্তিটা হইল ভীষণ। শ্রীমন্তের হাতের শেষ থাপড়টাতে সে ঘুবিয়া পড়িয়া গেল।

এবং শুধু কেশবের উপর দিয়া নয়, কুন্দকেও অনেক কথার মার সহ্য করিতে হইল। ছেলেকে যদি সে শাসন না করে এ বাড়িতে তবে তার স্থান হইবে না, এমন আশঙ্কাজনক কথাটাও যেন শোনা গেল।

কোমরের ব্যথায় সর্বাঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিলেও ওর মধ্যেই পশুপতির কী রকম একটা ব্যথিত আনন্দ হইয়াছিল। বাড়িতে যে হইচই বাধিয়াছিল, দু-তিনজনে তাহাকে যে পাখা করিয়াছিল, কেশব যে চেঁচাইয়া কাঁদিয়াছিল, এ সব দিয়া যেন এই সত্যটাই যাচাই হইয়া গিয়াছে যে জগতে আজও তার

মূল্য আছে। তাহাকে দুবার আহা শুনাইয়া কেশবকে একটু বকিয়া এ ব্যাপার তো সকলে শেষ করিয়া দিতে পারিত! তাব বদলে একেবারে সমারোহ বাধিয়া গিয়াছিল!

কয়েক বছর ধরিয়া পশুপতির মনে একটা কষ্ট ছিল। তার মনে হইত, এতকাল বাঁচিয়া আছে বলিয়া সকলে বুঝি বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে, মরণকে এ ভাবে ঠেকাইয়া রাখিয়া মানুষের কাছে সে বুঝি অপরাধ করিতেছে। কবে সে মরিবে তারই প্রতীক্ষায় কারও আর ধৈর্য নাই। ব্যাপারটা চুকিয়া গেলে সকলে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ছেলে বর্মা পালানোর আগে বৃদ্ধবয়সে যে পরিমাণ আরাম ও সুখ পশুপতি কল্পনা করিত তার কিছুই সে পায় নাই। চারিদিক হইতে আসিয়াছে শুধু অবহেলা, অনাদর। সকলে তাহাকে যেন ছাঁটিয়া ফেলিতে চায়। দিনের পর দিন যত সে অসহায় হইয়া পড়িয়াছে, মানুষকে তার প্রয়োজন হইয়াছে যত বেশি, মানুষ তার তত দূরে সরিয়া গিয়াছে। মানুষের সুখ-দুঃখে পশপুতি আর ভাগ বসাইবার কামনা রাখে না, জীবনের সমারোহে তার বরং বিতৃষ্ণাই আসিয়াছে। কিন্তু মরিতে মরিতেও বাঁচিযা আছে বলিয়া সকলে রাগ করিবে, তার অপরিহার্য সেবা ও যত্ন সে পাইবে না, জীবনের শেষ দিনগুলো কষ্ট ও অসুবিধায় ভবিয়া থাকিবে, এটা সহ্য করা একটু কঠিন। দুমাসের জন্য কেহ বিদেশ যাওয়ার আয়োজন করিলে মানুষের কাছে হঠাৎ তাহাব দাম বাড়িয়া যায়। সে চিরকালের জন্য বিদেশের চেয়েও সুদূর বিদেশে চলিয়া যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, অথচ মানুষের কাছে তার দাম গেল কমিয়া।

কোমরে ঘা খাইয়া সকলকে ব্যস্ত করিতে পারিয়া পশুপতির এই দুঃখটা কমিয়া আসিয়াছে। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মৃত্যুর সঙ্গে তার নিবিড় ঘনিষ্ঠতাকে মানুষ অবহেলা করে নাই, মর্যাদা দিয়াছে। জগতে সে নিরাশ্রয়, তার ছেলে থাকিয়াও নাই। তাহার দেহ পঙ্গু, মন কুয়াশায আধ অন্ধকার। তবু পথে পথে তাহাকে যে আজ ভিক্ষা করিতে হয় না, একটি ঘেরা আশ্রয় ও দুটি অন্ন যে তাহার জুটিতেছে, সে শুধু তার বয়সের জন্য, মরিতে তার বেশি দিন বাকি নাই বলিয়া। বেশি কিছু হয়তো মানুষ দেয় নাই, কিন্তু যতদিন·সে না মরে ততদিন তার বাঁচিয়া থাকার অধিকারকে স্বীকার করিয়াছে সকলেই।

এবং জীবনেব সঙ্গে তাহার সম্পর্ক প্রায় চুকিয়া আসিয়াছে বলিয়াই পরেব বাড়ি থাকিয়া পরান্ন ভোজনে তাহার লজ্জাও নাই।

সেদিনের ব্যাপার পশুপতিকে এই সান্ত্বনা দিয়াছে কিন্তু তার পর হইতে কুন্দ ও কেশব একটু বদলাইয়া গিয়াছে। কুন্দ করিয়াছে রাগ আর কেশব পাইয়াছে ভয়।

কুন্দ মুখে কিছু বলে নাই, রাগ দেখাইয়াছে কাজে। তার কাছে যে পরিমাণ সেবা পশুপতি না চাহিয়াই পাইত এখন আর সে রকম পায় না। পশুপতির টিনের তোরঙ্গটি চৌকির পায়ার সঙ্গে আজও বাঁধা আছে। তাছাড়া বুড়া অসহায় মানুষকে একেবারে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা কুন্দর ছিল না। সে সাহসও ছিল না। সাহস না থাকার কাবণ এই। পশুপতিকে শ্রীমন্ত ও তার পরিবার যতই ভুলিয়া যাক কুন্দ যে তার সেবা করে এটা তাহারা জানিত এবং এই ব্যবস্থাই সকলে মানিয়া লইয়াছিল। রান্না করার মতো এও কুন্দর একটা কর্তব্য।

তবে ইচ্ছা করিলে আইন বাঁচাইয়া রাজার আইনও ভাঙা যায়। কুন্দও তেমনিভাবে নিজেকে বাঁচাইয়া পশুপতিকে মারিতেছিল। শেষেব দিকে শীত আরও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে মৃতপ্রায় বৃদ্ধটিকে এক মালসা আগুন দেওয়ার সময় কুন্দ করিয়া উঠিতে পারে না। কোনোদিন রোদ উঠিয়া পড়িলেও পশুপতিকে সেখানে পৌঁছাইয়া দিতে না আসে কুন্দ না আসে কেশব, সারারাত শীতে জমিয়া গিয়া নিজে নিজে বাহিরে যাওয়ার শক্তিও পশুপতি তখন খুঁজিয়া পায় না। কোনোদিন দেখা যায় তার ছেঁড়া চট ও ছেঁড়া কাঁথা রাত্রে কেহ তুলিয়া রাখে নাই, বাড়ির লোম-ওঠা বুড়া কুকুরটা

তার উপরে কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়া আছে। পশুপতির ভিজানো সাগু মাঝে মাঝে শক্ত থাকিয়া যায়, তার মাছের ঝোলে মশলা বেশি হয়, তার বলক-তোলা বরাদ্দ দুধটুকু অর্ধেকের বেশি সে পায় না। রাত্রে সরাসরি কুন্দ নিজের ঘরে গিয়া দরজা দেয়।

পশুপতি মাঝের বেড়া ভেদ করিয়া ডাকে, ও কুন্দ? ও দিদি, শুলি নাকি? শোন দিদি একবার।

কুন্দ ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব হাঁকিয়া বলে, মা ঘুমিয়ে পড়েছে।

পশুপতি খানিক চুপ করিয়া থাকে। তারপর আবার বলে, এই তো শুলো, একবারটি ডাক না কেশব? ডাক দাদা ডাক তোর মাকে।

কুন্দ আবার ছেলেকে শিখাইয়া দেয়। কেশব বলে, মার জ্বর গো দাদামশায়, ডাকতে মানা করে শুয়েছে।

পশুপতি তারপর চুপ করিয়া যায়। বড়ো শীতল পৃথিবী, বড়ো প্রাণহীন। হয়তো আজ রাত্রে সেও একেবারে শীতল হইয়া যাইবে। এমন তো কত লোকে যায়, বিছানায় শুইয়া শীতার্ত আধ-ঘুম-আধ জাগরণের মধ্যে। পঞ্চাশ বছর বয়সের সময় পশুপতির ছেলে বর্মা পালাইয়াছে, সাতান্ন বছর বয়সের সময় মরিয়াছে তার বউ। আজ ত্রিশবছর ধরিয়া এমনি নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পশুপতি আরও নিঃসঙ্গ আরও গাঢ় অন্ধকারের প্রতীক্ষা করিয়াছে।

ও ঘরে ছোটো ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিলে কোনো জাগ্রতা মাতার আদরে হঠাৎ তার কান্না থামিয়া যায় পশুপতির বুঝিতে বাকি থাকে না। কিন্তু কুন্দকে আর সে ডাকে না। বরফের মতো শীতল নির্বোধ পা দুটি হইতে দেহের দিকে জমজমাট মৃত্যুর ক্রমিক অগ্রগমনে বাধা পড়ায় কষ্টে লেপ কাঁথা সরাইয়া লাঠি খুঁজিয়া সে চৌকির নীচে নামে। উবু হইয়া বসিয়া লাঠিটা পাঠাইয়া দেয় চৌকির তলে সেইখানে, যেখানে তার টিনের তোরঙ্গটি আছে। লাঠি দিয়া নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া তোরঙ্গটির অস্তিত্বে সে নিঃসন্দেহ হয়। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় আবার চৌকিতে ওঠে।

তখন ঈশ্বরকে পশুপতির মনে পড়ে। পৃথিবীর আর কারও ঈশ্বরের সঙ্গে পশুপতির ঈশ্বরের মিল নাই। অনাদি অনন্ত কোনো কিছুকে মনে আনিবার চেষ্টা করিলে মাথা বোধ হয় তার ফাটিয়া যাইবে, সাধারণ মানুষ সীমাহীনকে যে অনুভূতি দিয়া যতটুকু উপলব্ধি করে ততটুকু জোরালো অনুভূতিও পশুপতির নাই। তার ভাবিবার শক্তি ক্ষীণ, অনুভূতি দুর্বল। তার ঈশ্বর একটা নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকারে খানিকটা আলো মাত্র।

যে আলোকে একদিন সে দুচোখ দিয়া পৃথিবীতেই ঢের বেশি উজ্জ্বল, ঢের বেশি ব্যাপকভাবে দেখিতে পাইত। পশুপতির ঈশ্বর আলোর একটু স্মৃতি মাত্র।

কিন্তু তাহা দিয়াই সে তার চিরন্তন ভবিষ্যতের স্বর্গ নির্মাণ করিতে পারে। স্বর্গের কামনাও তার এতখানি নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে।

এ শীতটাও কোনোরকমে কাটিয়া যায়। বসন্তের আবির্ভাবে পশুপতির দেহে মনে জীবনের ক্ষীণতম জোয়ারটিও আসে না বটে, কিন্তু তার অবশিষ্ট ক্ষীণ জীবনটুকুর অপচয় বন্ধ হইয়া যায়। কুন্দর অবহেলা সহিতে না পারিয়া তাহাকে শীতের শেষে পশুপতি কয়েকটা টাকা দিয়াছে। কেশবও গোপনে একটা টাকা আদায় করিয়া লইতে ছাড়ে নাই। কুন্দর রাগ অবশ্য এমনি কমিয়া আসিতেছিল, টাকাটা হাতে পাওয়ায় তাড়াতাড়ি কমিয়া গিয়াছে। পশুপতি ডাকিলে এখন সে মাঝে মাঝে সাড়া দেয়। পশুপতির সাগু নরম হয়, মাছের ঝোলে মশলা কম থাকে, দুধ কমে না। কেশব দাওয়ার খুঁটি ধরিয়া পাক খায়, তাহার কাছে বসে, দুটো একটা কাজও করিয়া দেয়।

শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহ হয় ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি। বিবাহের দিন বিকাল বেলা কেশবকে দিয়া টিনের তোরঙ্গটির দড়ির বাঁধন খোলাইয়া সেটি পশুপতি চৌকির তলা হইতে বাহিরে আনায়।

কেশবকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া দরজা বন্ধ করে। বেড়ার ফাঁকে চোখ রাখিয়া কেশব কিন্তু ভিতরের ব্যাপার সব দেখিতে পায়। একটা রিপু করা ফরসা শার্ট ও একটি কুচানো পাতলা কাপড় বাহির করিয়া পশুপতি তোরঙ্গ বন্ধ করে এবং দরজা খোলে।

কেশবকে ডাকিয়া বলে, যেমন ছিল তেমনি আবার পায়ার সাথে বাঁধ দিনি দাদা, বুঝি কেমন বাহাদুর!

তোরঙ্গটি বাঁধিয়া চৌকির তলা হইতে বাহির হইয়া কেশব জিজ্ঞাসা করে, জামা-কাপড় কী হবে দাদামশায়?

পশুপতি ফোকলা হাসি হাসে।

দেখিস কী হবে দেখিস।

সন্ধ্যার সময় জামা-কাপড় পরিয়া সে বাবু সাজে। আটবছরের পুরানো চটি জোড়াটি কিন্তু তার চেয়েও নানাদিকে এত বেশি বাঁকিয়া দুমড়াইয়া গিয়াছে যে কোনোমতেই পায়ে দেওয়া যায় না। না যাক। এই বয়সে অত বেশি বাবু পশুপতির না সাজিলেও চলিবে।

ঘরের বাহিরে গিয়া কেশবকে দিয়া দরজায় সে পিতলের তালাটি লাগায় এবং কেশবকে নির্ভর করিয়া হাজির হয় একেবারে বিবাহের আসরে। সকলের মাঝখানে বসিবার ইচ্ছা থাকিলেও সে সাহস পায় না। একদিকে বেড়া ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে।

বিবাহ-বাড়ির আলোয় পশুপতির নিবিড় অন্ধকার রাত্রি আজ একটু আলো হইয়াছে। এতগুলি মানুষের দেহের উত্তাপ সে যেন অল্প-অল্প অনুভব করিতে পারিতেছে। নিজের ইন্দ্রিয়গুলিকে আজ পশুপতির একটু সজাগ মনে হয়। জীবনের ঘোলাটে অস্পষ্ট স্মৃতিগুলিও যেন খানিকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। মানুষের সঙ্গে পশুপতির আলাপ করিতে ইচ্ছা হয়। তার ডাইনে যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি নিঃশব্দে শুধু তামাক টানিতেছেন তার বুকে খোঁচা দিয়া সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করিতে সাধ যায় : মহাশয়ের নাম?

তারপর একটু হাসিয়া : আমার নাম আজ্ঞে পশুপতি ঘোষ দস্তিদার। এখানেই ইস্কুলে মাস্টারি করি, ভার্নাকুলার মাস্টার আজ্ঞে আমি। মেয়ের বাপ আমার বন্ধুপুত্রও বটে ছাত্রও বটে—বড়ো মানে আমাকে, বড়ো খাতির করে।

বসিয়া বসিয়া পশুপতি ঝিমায়। তার চোখ ঢুলিয়া ঢুলিয়া আসে। একসঙ্গে অতীতে ও বর্তমানে থাকিবার সাধ্য তার নাই বলিয়া, যখন সে অতীতের কথা ভাবে তখন এই বিবাহ-সভা তার কাছে মুছিয়া যায়, চারিদিকে আলো ও গণ্ডগোলে সে যখন এখানে ফিরিয়া আসে তখন অতীতকে তার মনে থাকে না। তাই চোখে পূর্ণ দৃষ্টি, দুকানে তীক্ষ্ণ শ্রবণ-শক্তি ও মুখে সুস্পষ্ট ভাষা লইয়া একদিন এমনি সভায় সে যে অভিনয় করিত তার এতটুকু নকলও করিতে পারে না।

তারপর একসময় সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়ে। কেহ অবাক হইয়া তার দিকে তাকায়, কেহ তার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে কেহ তাকাইয়াও দেখে না।

পশুপতির ঘুমের আড়ালে শ্রীমন্তের মেয়ে মুখীর বিবাহোৎসব চলিতে থাকে।

আত্মহত্যার অধিকার

বর্ষাকালেই ভয়ানক কষ্ট হয়।

ঘরের চালটা একেবারে ঝাঁঝরা হইয়া গিয়াছে।

কিছু নারিকেল আর লতা-পাতা মানসম্ভ্রম বজায় রাখিয়াই কুড়াইয়া সংগ্রহ করা গিয়াছিল। চালের উপর সেগুলি বিছাইয়া দিয়া কোনো লাভ হয় নাই। বৃষ্টি নামিলেই ঘরের মধ্যে সর্বত্র জল পড়ে।

বিছানাটা গুটাইয়া ফেলিতে হয়, ভাঙা বাক্‌সো-পেটরা কয়টা এ কোণে টানিয়া আনিতে হয়, জামা-কাপড়গুলি দড়ি হইতে টানিয়া নামাইয়া পুঁটলি করিয়া, কোথায় রাখিলে যে ভিজিবে কম, তাই নিয়া মাথা ঘামাইতে হয়।

বড়ো ছেলেটা কাঁচা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে। আদর করিয়া তাহার কান্না থামানো যায় না, ধমক দিলে কান্না বাড়ে। মেয়েটা বড়ো হইয়াছে, কাঁদে না , কিন্তু ওদিকের দেয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া এমন করিযাই চাহিয়া থাকে যে নীলমণির ইচ্ছা হয় চড় মারিয়া ওকেও সে কাঁদাইয়া দেয়। এতক্ষণ ঘুমাইবার পর একঘণ্টা জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইল বলিয়া ও কী চাহনি? আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টি নামিযাছে, ঘরের চাল সাতবছর মেরামত হয় নাই। ঘরের মধ্যে জল পড়াটা নীলমণির এমন কী অপরাধ যে মেয়েটা তাহাকে ও রকমভাবে নিঃশব্দে গঞ্জনা দিবে?

ছোটো ছেলেটাকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া নিভা একবার এধার একবার ওধার করিয়া বেড়াইতেছিল।

হঠাৎ বলিল, ওগো, ছাতিটা একবার ধরো, একেবারে ভিজে গেল যে! লক্ষ্মী, ধরো একবার ছাতিটা খুলে , ওরও কি শেষে নিমুনিয়া হবে?

নীলমণি বলিল, হয় তো হবে। বাঁচবে।

নিভা বলিল, বালাই ষাট্—শ্যামা, তুইও তো ধরতে পারিস ছাতিটা একটু?

শ্যামা নীরবে ভাঙা ছাতিটা নিভার মাথার উপর ধরিল। ছাতি মেলিবার বাতাসে প্রদীপের শিখাটা কাঁপিয়া গেল। প্রদীপে তেল পুড়িতেছে। অপচয়! কিন্তু উপায় নাই। চাল-ভেদ করা বাদলে ঘর যখন ভাসিয়া যাইতেছে তখনকার বিপদে প্রদীপের আলোর একান্ত প্রয়োজন। জিনিসপত্র নিয়া মানুষগুলি এ কোণ-ও কোণ করিবে কেমন করিয়া?

এক ছিলিম তামাক দে শ্যামা। নীলমণি হুকুম দিল।

শ্যামা বলিল, ছাতিটা ধরো তবে?

নীলমণি আকাশের বজ্রের মতো ধমকাইয়া উঠিল, ফেলে দে ছাতি, চুলোয় গুঁজে দে। আমি ছাতি ধরব তবে উনি তামাক সাজবেন, হারামজাদি!

তামাক অবিলম্বেই হাতের কাছে আগাইয়া আসিল। ঘরের পশ্চিম কোণ দিয়া কলের জলের মতো মোটা ধারায় জল পড়িয়া ইতিমধ্যেই একটা বালতি ভরিয়া গিয়াছে। সেই জলে হাত ধুইয়া শ্যামা বলিল, তামাক আর একটুখানি আছে বাবা।

দুঃসংবাদ!

এত বড়ো দুঃসংবাদ-প্রদানকারিণীকে একটা গাল দিবার ইচ্ছা নীলমণিকে অতিকষ্টে চাপিয়া যাইতে হইল।

নীলমণি ভাবিল · বিনা তামাকে এই গভীর রাত্রির লড়াই জিতিব কেমন কবিয়া? ছেলের কান্না দুই কানে তিরের ফলার মতো বিঁধিয়া চলিবে, মেয়েটার মুখের চাহনি লঙ্কাবাটার মতো সারাক্ষণ মুখে লাগিয়া থাকিবে, নিমুনিয়ার সঙ্গে নিভার ব্যাকুল কলহ চাহিয়া দেখিতে দেখিতে শিহরিয়া শিহরিয়া মনে হইবে বাঁচিয়া থাকাটা শুধু আজ এবং কাল নয়, মুহূর্তে মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন,—আর ঘরে এখন তামাক আছে একটুখানি!

তামাক আনানো হয় নাই কেন জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া নীলমণি চুপ করিযা রহিল। প্রশ্ন করা অনর্থক, জবাব সে পরশু হইতে নিজেই সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে—পয়সা নাই। ছেলেটা বিকালে এক পয়সার মুড়ি খাইতে পায় নাই—তামাকের পয়সা কোথা হইতে আসিবে। নিজে গেলে হয়তো দোকান হইতে ধার আনিতে পারিত,

কিন্তু—

নীলমণি খুশি হয। এতক্ষণে ছুতা পাওয়া গিয়াছে।

তামাক নেই বিকেলে বলিসনি কেন?

আমি দেখিনি বাবা।

দেখিনি বাবা! কেন দেখনি বাবা? চোখের মাথা খেয়েছিলে?

তুমি নিজে সেজেছিলে যে? সারাদিন আমি একবারও তামাক সাজিনি বাবা।

তা সাজবে কেন? বাপের জন্য তামাক সাজলে সোনার অঙ্গ তোমার ক্ষয়ে যাবে যে!

নীলমণির কান্না আসিতেছিল। মুখ ফিরাইয়া সহসা উদ্‌গত অশ্রু সে দমন করিযা লইল। না আছে তামাক না থাক। পৃথিবীতে তার কী-ই বা আছে যে তামাক থাকিলেই সব দুঃখ দূর হইয়া যাইত!

বাহিরে যেন অবিরল ধারে জল পড়িতেছে না, ঘরের বায়ু যেন সাহারা হইতে আসিয়াছে, নীলমণির চোখ-মুখ এত জ্বালা করিতেছিল। খানিকক্ষণ হইতে তাহার হাঁটুর উপর বড়ো বড়ো ফোঁটায জল পড়িতেছিল—টপ্‌টপ। অঞ্জলি পাতিযা নীলমণি গুনিয়া গুনিয়া জলের ফোঁটাগুলি ধরিতে লাগিল। সিদ্ধ করা চামড়ার মতো ফ্যাকাশে ঠোঁট নাড়িয়া সে কী বলিল, ঘরের কেহই তাহা শুনিতে পাইল না। ছেলেমানুষের মতো তাহার জলের ফোঁটা সঞ্চয় করার খেলাটাও কেহ চাহিয়া দেখিল না। কিন্তু হাতে খানিকটা জল জমিলে তাই দিয়া মুখ ধুইতে গিয়া নীলমণি ধরা পড়িয়া গেল।

নিভা ও শ্যামা প্রতিবাদ করিল দুজনেই।

শ্যামা বলিল, ও কী করছ বাবা?

নিভা বলিল, পচা গলা চাল-ধোয়া জল, হ্যাঁগো, ঘেন্নাও কি নেই তোমার?

নীলমণি হঠাৎ একটু হাসিযা বলিল, হোক না পচা জল। চাল-ধোয়া জল তো! এও হয়তো কাল জুটবে না নিভা!

ইহাকে সূক্ষ্ম রসিকতা মনে করিয়া নীলমণি নিজের মনে একটু গর্ব অনুভব করিল। এমন অবস্থাতেও রসিকতা করিতে পারে, মনের জোর তো তাহার সহজ নয়। ঘরের চারিদিকে একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া নিভার মুখের দিকে পুনরায় চাহিতে গিয়া কিন্তু তাহার হাসি ফুটিল না। নিভার দৃষ্টির নির্মমতা তাহাকে আঘাত করিল।

অবিকল শ্যামার মতো চাহিয়া আছে! এত দুঃখ, এত দুর্ভাবনা ওর চোখের দৃষ্টিকে কোমল করিতে পারে নাই, উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই, রূঢ় ভর্ৎসনা আর নিঃশব্দ অসহায় নালিশে ভরিয়া রাখিয়াছে।

নীলমণি মুষড়াইয়া পড়িল।

সব অপরাধ তাহার। সে ইচ্ছা করিয়া নিজের স্বাস্থ্য ও কার্যক্ষমতা নষ্ট করিয়াছে, খাদ্যের প্রাচুর্যে পরিতুষ্ট পৃথিবীতে নিজের গৃহকোণে সে সাধ করিয়া দুর্ভিক্ষ আনিয়াছে, ঘরের চাল পচাইয়া ফুটা করিয়াছে সে, তাহারই ইচ্ছাতে রাতদুপুরে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়াছে। শুধু তাই নয়। ওদের সমস্ত দুঃখ দূর করিবার মন্ত্র সে জানে। মুখে ফিসফিস করিয়া হোক, মনে মনে নিঃশব্দে হোক, ফুস মন্তরটি একবার আওড়াইয়া দিলেই তাহার এই ভাঙা ঘর সরকারদের পাকা দালান হইয়া যায়, আর ঘরের কোনার ওই ভাঙা বাক্সোটা চোখের পলকে মস্ত লোহার সিন্দুক হইয়া ভিতরে টাকা ঝমঝম করিতে থাকে ;—টাকার ঝমঝমানিতে বৃষ্টির ঝমঝমানি কোনোমতেই আর শুনিবার উপায় থাকে না।

কিন্তু মন্ত্রটা সে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছে না।

ঘণ্টাখানেক এমনিভাবে কাটিয়া গেল।

নিভা একসময় জিজ্ঞাসা করিল, হ্যাঁগা, রাত কত?

তা হবে, দুটো তিনটে হবে।

একটা কিছু ব্যবস্থা কর? সারারাত জল না ধরলে এমনি বসে বসে ভিজব?

বসে ভিজতে কষ্ট হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেজো।

নিভা আর কিছু বলিল না। ছেঁড়া আলোয়ানটি দিয়া কোলের শিশুকে আরও ভালো করিয়া ঢাকিয়া রুক্ষ চুলের উপর খসিয়া-পড়া ঘোমটাটি তুলিয়া দিল। স্বামীর কাছে মাথায় কাপড় দেওয়ার অভ্যাস সে এখনও কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই।

ছাতি ধরিয়া আর দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারিয়া শ্যামা তার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া পড়িয়াছিল, মধ্যে মধ্যে তার শিহরনটা নিভা টের পাইতে লাগিল।

কাঁপছিস কেন শ্যামা? শীত করছে?

শ্যামা কথা বলিল না। একটু মাথা নাড়িল মাত্র।

নিভা বলিল, তবে ভালো করেই ছাতিটা ধর বাপু, খোকার গায়ে ছিটে লাগছে।

আঁচল দিয়া সে খোকার মুখ মুছিয়া লইল। ফিসফিস করিয়া আপন মনে বলিল, কত জন্ম পাপ করেছিলাম, এই তার শাস্তি। নীলমণি শুনিতে পাইল, কিন্তু কিছু বলিল না। মন তাহার সজাগ, নির্মমভাবে সজাগ, কিন্তু চোখের পাতা দিয়া দুই চোখকে সে অর্ধেক আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। দেখিলে মনে হয়, একান্ত নির্বিকার চিত্তেই সে ঝিমাইতেছে।

কিন্তু নীলমণি সবই দেখিতে পায়। তাহার স্তিমিত দৃষ্টিতে শ্যামার মুখ তেরচা হইয়া বাঁকিয়া যায়, প্রদীপের শিখাটা ফুলিয়া ফাঁপিয়া ওঠে, দেয়ালের গায়ে ছায়াগুলি সহসা জীবন পাইয়া দুলিয়া উঠিতে শুরু করে। মুখ না ফিরাইয়াই নীলমণি দেখিতে পায় ঘরের ও-কোণে গুটাইয়া রাখা বিছানার উপর উপুড় হইয়া নিমু ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না। তাহার মনে হয় ছেলেটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। দুই পা মেঝের জলস্রোতে প্রসারিত করিয়া দিয়া আকাশের গলিত মেঘে অর্ধেকটা শরীর ভিজাইতে ভিজাইতে ওইটুকু ছেলের অমন করিয়া ঘুমাইয়া পড়ায় আর কী মনে হয়? এর চেয়ে ও যদি নাকি সুরে টানিয়া টানিয়া শেষ পর্যন্ত কাঁদিতে থাকিত তাও নীলমণির ভালো ছিল। এ সহ্য হয় না। সন্ধ্যায় ও পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই, ক্ষুধার জ্বালায় মাকে বিরক্ত করিয়া পিঠের জ্বালায় চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে ঘুমাইয়াছিল। হয়তো ওর রূপকথার পোষা বিড়ালটি এই বাদলে রাজবাড়ির ভালো ভালো খাবার ওকে চুরি করিয়া আনিয়া দিতে পারে নাই। হয়তো ঘুমের

মধ্যেই ওর গালে চোখের জলের শুকনো দাগ আবার চোখের জলে ভিজিয়া গিয়াছিল। এত রাত্রে দুঃখের এই প্রকৃত বন্যায় ভাসিতে ভাসিতে ও তবে ঘুমায় কোন হিসাবে?

নিমুকে তুলে দে তো শ্যামা।

নিভা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, কেন, তুলবে কেন? ঘুমোচ্ছে ঘুমোক।

ঘুমোচ্ছে না ছাই। ইয়ার্কি দিচ্ছে। ঢং করছে!

হ্যাঁ, ইয়ার্কি দিচ্ছে! ঢং করছে! যেমন কথা তোমার! ঢং করার মতো সুখেই আছে কি না।

আধ-ঢাকা চোখ নীলমণি একেবারে বন্ধ করিয়া ফেলিল। ওরা যা খুশি করুক, যা খুশি বলুক। সে আর কথাটি কহিবে না।

খানিক পরে নিভা বলিল, দেখো, এমন করে আর তো থাকা যায় না। সরকারদের বাইরের ঘরটাতে উঠিগে চলো।

নীলমণি চোখ না খুলিয়াই বলিল, না।

নিভা রাগ করিয়া বলিল, তুমি যেতে না চাও থাকো, আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি।

নীলমণি চোখ মেলিয়া চাহিল।

না—যেতে পাবে না। ওরা ছোটোলোক। সেবার কী বলেছিল মনে নেই?

বললে আর করছ কী শুনি? রাতদুপুরে বিরক্ত করলে অমন সবাই বলে থাকে।

নীলমণি ব্যঙ্গ করিয়া বলিল, বলে থাকে? রাতদুপুরে বিপদে পড়ে মানুষ আশ্রয় নিতে গেলে বলে থাকে,—এ কী জ্বালাতন? ওইটুকু শিশুর জন্য একটু শুকনো ন্যাকড়া চাইলে বলে থাকে কাপড়-জামা সব ভিজে। ময়লা হবার ভয়ে ফরাশ তুলে নিয়ে ছেঁড়া শতরঞ্চি অতিথিকে পেতে দেয়? যেতে হবে না। বাস্।

নিভা অনেক সহ্য করিয়াছে। এবার তাহার মাথা গরম হইয়া গেল।

ছেলেমেয়ে বউকে বর্ষাবাদলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই দিতে পারে না, অত মান-অপমান জ্ঞান কী জন্যে? আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে হবে না?

নীলমণি বলিল, চুপ।

এক ধমকেই নিভা অনেকখানি ঠান্ডা হইয়া গেল।

চুপ করেই আছি চিরটা কাল। অন্য মানুষ হলে—

হাতের কাছে, ঘটিটা তুলিয়া লইয়া নীলমণি বলিল, চুপ। একদম চুপ। আর একটি কথা কইলে খুন করে ফেলব।

কথা কেউ বলছ না। নিভা একেবারে নিবিয়া গেল।

শ্যামা ঢুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাপের গর্জনে সে চমকাইয়া সজাগ হইয়া উঠিল। কান পাতিয়া শুনিয়া বলিল, মা ভুলু দরজা আঁচড়াচ্ছে।

গরিবের মেয়ে, হা-ঘরের বউ, নিভার মেরুদণ্ড বলিতে কিছু অবশিষ্ট ছিল না, কিন্তু তার বদলে যা ছিল নিরপরাধ মেয়ের উপর ঝাঁঝিয়া উঠিবার পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আঁচড়াচ্ছে তো কী হবে? কোলে তুলে নিয়ে এসে নাচো!—ভালো করে ছাতি ধরে থাক শ্যামা, মেরে পিঠের চামড়া তুলে দেব!

নীলমণি বলিল, আমার লাঠিটা কই রে?

শ্যামার মুখ পাংশু হইয়া গেল। সে মিনতি করিয়া বলিল, মেরো না বাবা। দরজা না খুললে ও আপনিই চলে যাবে।

তোকে মাতব্বরি করতে হবে না, বুঝলি? চুপ করে থাক।

বাঁ পাটি আংশিকভাবে অবশ, হাতে ভর দিয়া নীলমণি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঘরের কোনায় তাহার মোটা বাঁশের লাঠিটি ঠেস দেওয়া ছিল, খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে গিয়া লাঠিটি সে আয়ত্ত করিল। উঠানবাসী লোমহীন নির্জীব কুকুরটার উপর তাহার সহসা এত রাগ হইয়া গেল কেন কে জানে। বেচারি খাইতে পায় না, কিন্তু প্রায়ই অদৃষ্টে প্রহার জোটে, তবু সে এখানেই পড়িয়া থাকে, সারারাত শিয়াল তাড়ায়। শ্যামা একটু করুণার চোখে না দেখিলে এতদিনে ওর অক্ষয় স্বর্গলাভ হইয়া যাইত। কিন্তু নীলমণি কুকুরটাকে দেখিতে পারে না। ধুঁকিতে ধুঁকিতে লাথি-ঝাঁটা খাইয়া মৃত্যুর সঙ্গে ওর লজ্জাকর সকরুণ লড়াই চাহিয়া দেখিয়া তাহার ঘৃণা হয়, গা জ্বালা করে।

শ্যামা আবার বলিল, মেরো না বাবা, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

নীলমণি দাঁতে দাঁত ঘষিয়া বলিল, মারব? মার খেয়ে আজ রেহাই পাবে ভেবেছিস? আজ ওর ভবযন্ত্রণা দূর করে ছাড়ব।

ভবযন্ত্রণা নিঃসন্দেহ, কিন্তু শ্যামা শুনিবে কেন? পেটের ক্ষুধায় এখনও তাহার কান্না আসে, ছেঁড়াকাপড়ে তাহার সর্বাঙ্গ লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, তাহার বুকে ভাষা আছে, মনে আশা আছে, ভবযন্ত্রণা সহ্য করিতে তাহার শক্তির অকুলান হয় না, বরং একটু বাড়তিই হয়। ওইটুকু শক্তি দিয়া সে [illegible] জীবন হইতেও রস নিংড়াইয়া বাহির করে,—হোক পান্‌সা, এও তুচ্ছ নয়। ভুলুর মতো কুকুরটিরও মরিবার অথবা তাহাকে মারিবার কল্পনা শ্যামার কাছে বিষাদের ব্যাপার। তাহার সহ্য হয় না।

ছাতি ফেলিয়া উঠিয়া আসিয়া শ্যামা নীলমণির লাঠি ধরিল। কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, না বাবা, মেরো না বাবা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা।

নীলমণি গর্জন করিয়া বলিল, লাঠি ছাড় শ্যামা, ছেড়ে দে বলছি! তোকেই খুন করে ফেলব আজ।

শ্যামা লাঠি ছাড়িল না। তারও কি মাথার ঠিক আছে? লাঠি ধরিয়া রাখিয়াই সে বারবার নীলমণির পায়ে পড়িতে লাগিল।

নিভা বলিল, কী জিদ মেয়ের! ছেড়েই দে না বাবু লাঠিটা।

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নীলমণি বলিল, জিদ বার করছি!

লাঠিটা নীলমণিকে মেয়ের হাতে ছাড়িয়া দিতে হইল ; কিন্তু বেড়ার ঘরের বেড়ার অনেকগুলি বাতাই আলগা ছিল।

মেয়েকে মারিয়া নীলমণির মন এমন খারাপ হইয়া গেল বলিবার নয়। না মারিয়া অবশ্য উপায় ছিল না। ও রকম রাগ হইলে সে কখনও সামলাইতে পারে নাই, কখনও পারিবেও না। মন খারাপ হওয়ার কারণটাও হয়তো ভিন্ন! কে বলিতে পারে? মেয়েকে না মারিযাও তো মাঝে মাঝে তার মরিতে ইচ্ছা করে।

জীবনে লজ্জা, দুঃখ, রোগ, মৃত্যু, শোকের তো অভাব নাই। মন খারাপ হইবার, দশ বছর জ্বর ভোগ করিয়া যেমন হয় তেমনি মন খারাপ হইবার কারণ জাগিয়া থাকার প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ঘুমানোর সময় দুঃস্বপ্নে।

কয়েক মিনিট আগে বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিয়াছিল ; হঠাৎ আবার আগের চেয়েও জোরে আরম্ভ হইয়া গেল। নীলমণির মান-অপমান জ্ঞানটা এবার আর টিকিল না।

লণ্ঠনে তেল আছে শ্যামা।

শ্যামা একবার ভাবিল, চুপ করিয়া থাকিয়া রাগ আর অভিমান দেখায়। কিন্তু সাহস পাইল না।

একটুখানি আছে বাবা।

জ্বাল তবে।

নিভা জিজ্ঞাসা করিল, লণ্ঠন কী হবে?

সরকারদের বাড়ি যাব। ফের চেপে বৃষ্টি এল দেখছ না?

যেন সরকাবদের বাড়ি যাইতে নিভাই আপত্তি করিয়াছিল।

শ্যামা বলিল, দেশলাই কোথা রাখলে মা?

নিভা বলিল, দেশলাই? কেন, পিদিম থেকে বুঝি লণ্ঠন জ্বালানো যায় না? চোখের সামনে পিদিম জ্বলছে, চোখ নেই?

নীলমণি বলিল, ওব কি জ্ঞান-গম্যি কিছু আছে?

নিজের মুখের কথাগুলো খচখচ কবিয়া মনের মধ্যে বেঁধে! এ যেন তোতাপাখির মতো অভাবগ্রস্তের মানানসই মুখস্থ বুলি আওড়ানো। বলিতে হয় তাই বলা ; না বলিলে চলে না সত্য ; কিন্তু আসলে বলিযা কোনো লাভ নাই।

সাত বছরেব পুরানো লণ্ঠন জ্বালানো হইল।

নিভা মাথা নাড়িয়া বলিল, না বাপু, ছাতিতে আটকাবে না। আর একখানা কাপড় জড়িয়েনি। দে তো শ্যামা, শুকনো কিছু দে তো। আর এক কাজ কব—দুটো তিনটে কাপড় পুঁটলি কবে নে। ওখানে গিয়ে সব্বাইকে কাপড় ছাড়তে হবে। আমার দোক্তার কৌটো নিস।

নীলমণি একটু মিষ্টি করিয়াই বলিল, হুঁকোটা নিতে পারবি শ্যামা? লক্ষ্মী মা-টি আমার,—পারবি? জল ফেলেই নে না, ওখানে গিয়ে ভরে নিলেই হবে। জলেব কী অভাব!—তামাকটুকু ফেলে যাসনে ভুলে।

সব ব্যবস্থাই হইল, নিমুব কান্নায় কর্ণপাত না করিয়া তাকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া দাঁড করাইযা দিয়া পিঠে একটা ছেঁড়া চটেব বস্তা চাপাইয়া দেওয়া হইল।

দরজা খুলিয়া তাবা উঠানে নামিয়া গেল। উত্তরের ভিটার ঘরখানা গত বৎসরও খাড়া ছিল, এবারকার চতুর্থ বৈশাখী ঝড়ে পড়িয়া গিয়াছে ; সময়মতো অন্তত দুটি খুঁটি বদলাইতে পারিলেও এটা ঘটিত না। ভুলু বোধ হয় ওই ভগ্নস্তূপটির মাঝেই কোথাও মাথা গুঁজিয়া ছিল, মানুষের সাড়া পাইয়া বাহির হইযা আসিল। তখন ঘরের দরজায় তালা লাগানো হইয়া গিয়াছে। দরজা আঁচড়াইয়া ভুলু সকরুণ কান্নার সঙ্গে কুকুরের ভাষায় বলিতে লাগিল, দরজা খোলো দরজা খোলো।

বাড়ির সামনে একহাঁটু কাদা, তার পরেই পিছল এঁটেল মাটি। ছেলে লইয়া আছাড় খাইতে খাইতে বাঁচিয়া গিয়া নিভা দেবতাকেই গাল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কষ্ট নীলমণিরই বেশি, শুকনো ডাঙাতেই বাঁ পায়ের পদক্ষেপটি তাকে চট করিয়া ডিঙাইয়া যাইতে হয়,—এখন তার পা আর লাঠি দুই-ই কাদায় ঢুকিয়া যাইতে লাগিল।

লাঠি টানিয়া তুলিলে পা আটকাইয়া থাকে, পা তুলিলে লাঠি পোঁতা হইয়া যায়। নিভার তাকাইবার অবসর নাই। শ্যামার ঘাড়ে কাপড়ের পুঁটুলি, হুঁকা-কলকি, লণ্ঠন আর নিমুর ভার। তবু শ্যামাই নীলমণির বিপদ উদ্ধার করিয়া দিতে লাগিল।

ঘোষেদের পুকুরটা পাক দিলে সরকারদের বাড়ি। পুকুরটা ভরিয়া গিয়া পাড় ছাপাইয়া উঠিয়াছে। পশ্চিম কোনাব প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছটার তল দিয়া তিন-চার হাত চওড়া এক সংক্ষিপ্ত স্রোতস্বিনী

সৃষ্টি হইয়াছে। তেঁতুল গাছটাব জমকালো আবছা চেহারা দেখিলে গা ছমছম করে। ভরপুর পুকুরের বুকে শ্যামার হাতের আলো যে লম্বা সোনালি পাত ফেলিয়াছে, প্রত্যেক মুহূর্তে হাজার বৃষ্টির ফোঁটায় তাহা অজস্র টুকরায় ভাঙিয়া যাইতেছে।

নীলমণি থমকিয়া দাঁড়াইল। কাতর স্বরে বলিল, ও শ্যামা, পার হব কী করে!

শ্যামা বলিল, জল বেশি নয় বাবা, নিমুর হাঁটু পর্যন্তও ওঠেনি। চলে এসো।

সুখের বিষয় স্রোতের নীচে কাদা ধুইয়া গিয়াছিল, নীলমণির পা অথবা লাঠি আঁটিয়া গিয়া তাহাকে বিপন্ন করিল না। তবু, এতখানি সুবিধা পাওয়া সত্ত্বেও, নীলমণির দুচোখ একবার সজল হইয়া উঠিল। বাহির হওয়ার সময় সে কাপড়টা গায়ে জড়াইয়া লইয়াছিল, এখন ভিজিয়া গায়ের সঙ্গে আঁটিয়া গিয়াছে। খানিকক্ষণ হইতে জোর বাতাস উঠিয়াছিল, নীলমণির শীত করিতে লাগিল। জগতে কোটি কোটি মানুষ যখন উষ্ণ শয্যায় গাঢ় ঘুমে পাশ ফিরিয়া পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিতেছে,—সপরিবারে অক্ষম দেহটা টানিয়া টানিয়া সে তখন চলিয়াছে কোথায়? যে প্রকৃতির অত্যাচারে ভাঙা ঘরে টিকিতে না পারিয়া তাহাকে আশ্রয়ের খোঁজে পথে নামিয়া আসিতে হইল, সেই প্রকৃতিরই দেওয়া নির্মমতায় হয়তো সরকাররা দরজা খুলিবে না, ঘুমের ভান করিয়া বিছানা আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিবে। না, নীলমণি আর যুঝিয়া উঠিতে পারিল না। তাহার শক্তি নাই, কিন্তু আক্রমণ চারিদিক হইতে ; পেটের ক্ষুধা, দেহের ক্ষুধা, শীত বর্ষা, রোগ, বিধাতার অনিবার্য জন্মের বিধান,—সে কোন দিক সামলাইবে? সকলে যেখানে বাঁচিতে চায়, লাখো মানুষের জীবিকা একা জমাইতে চায়, কিন্তু কাহাকেও বাঁচাইতে চায় না, সেখানে সে বাঁচিবে কীসের জোরে?

স্রোত পার হইয়া গিয়া লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়া আছে। পাশেই ভরাট পুকুরটা বৃষ্টির জলে টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। নীলমণি সাঁতার জানিত না। কিন্তু জানিত যে পুকুরের পাড়টা এখানে একেবারে খাড়া। একবার গড়াইয়া পড়িলেই অথই জল, আর উঠিয়া আসিতে হইবে না।

নিভা তাড়া দিতেছিল। শ্যামা বলিল, বাবা, চলে এসো। দাঁড়ালে কেন?

নীলমণি চলিতে আরম্ভ করিল, ডাইনে নয় বাঁয়েও নয়। সাবধানে, সোজা শ্যামার দিকে।

হঠাৎ শ্যামা চিৎকার করিয়া উঠিল, মাগো, সাপ!

পবক্ষণে আনন্দে গদগদ হইয়া বলিল, সাপ নয় গো সাপ নয়, মস্ত শোল মাছ! ধরেছি ব্যাটাকে। ইঃ, কী পিছল!

তাড়াতাড়ি আগাইবার চেষ্টা করিয়া নীলমণি বলিল, শক্ত করে ধর, দুহাত দিয়ে ধর,—পালালে কিন্তু মেরে ফেলব শ্যামা!

সরকাররা বছর তিনেক দালান তুলিয়াছে। এখনও বাড়িসুদ্ধ সকলে বাড়ি বাড়ি করিয়া পাগল। বলে, বেশ হয়েছে, না? দোতলায় দুখানা ঘর তুললে, বাস্, আর দেখতে হবে না।

অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর সরকারদের বড়োছেলে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিল। বলিল, ব্যাপার কী? ডাকাত নাকি?

নীলমণি বলিল, না ভাই, আমরা। ঘরে তো টিকতে পারলাম না ভায়া, সব ভেসে গেছে, ভাবলাম, তোমাদের বৈঠকখানায় তো কেউ শোয় না, রাতটুকু ওখানেই কাটিয়ে আসি।

বড়োছেলে বলিল, সন্ধ্যাবেলা এলেই হত!

নীলমণি কষ্টে একটু হাসিল : সন্ধ্যায় কি বৃষ্টি ছিল ভাই! দিব্যি ফুটফুটে আকাশ—মেঘের চিহ্ন নেই। রাতদুপুরে হঠাৎ জল আসবে কে জানত।

নিভা ছাতি বন্ধ করিয়া ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, মাসিকের ছবির সদ্যস্নাতার অবস্থায় পড়িয়া শ্যামা লজ্জায় মার অঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। নিভার এটা ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু বড়োছেলের সামনে কিছু বলিবার উপায় নাই।

বড়োছেলে বলিল, বেশ থাকুন। কিন্তু চৌকি পাবেন না, চৌকিতে আমার পিসে শুয়েছে। আপনাদের মেঝেতে শুতে হবে।

তা হোক ভাই, তা হোক। ভিজতে না হলেই ঢের। একখানা কম্বলটম্বল?

ওই কোণে চট আছে।

বড়োছেলে বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

নীলমণি ঝাঁঝালো হাসি হাসিয়া বলিল, দেখলে? তখনি বলেছিলাম শুধু জুতো মারতে বাকি রাখবে!

নিভা বলিল, ঘরে যে থাকতে দিয়েছে তাই ভাগ্যি বলে জেনো।

নীলমণি তৎক্ষণাৎ সুর বদলাইয়া বলিল, তা ঠিক।

ঘরে অর্ধেকটা জুড়িয়া চৌকি পাতা, বড়োছেলের পিসে আগাগোড়া চাদর মুড়ি দিয়া তাহাতে কাত হইয়া শুইয়া আছে। শ্যামা লণ্ঠনটা মেঝেতে নামাইয়া রাখিয়াছিল বলিয়া চৌকির উপরে আলো পড়ে নাই, তবু এ বাড়ির আত্মীয়কেও ফরাশ তুলিয়া লইয়া শুধু শতরঞ্চির উপরে শুইতে দেওয়া হইয়াছে, এটুকু টের পাইয়া নীলমণি একটু খুশি হইল। বড়োছেলের পিসে।— আপনার লোক। সে যদি ও রকম ব্যবহার পাইয়া থাকে তবে তাহারা যে লাথি-ঝাঁটা পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য।

চারিদিকে চাহিয়া নীলমণির খুশির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইল। সুখশয্যা না জুটুক, নিবাত, শুষ্ক মনোরম আশ্রয় তো জুটিয়াছে। ঘরের এদিকে একটিমাত্র ছোটো জানালা খোলা ছিল, নিভা ইতিমধ্যেই সেটি ভালো করিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বাস্, বাহিরের সঙ্গে আর তাদের কোনো সম্পর্ক নাই। আকাশটা আজ একরাত্রেই গলিয়া নিঃশেষ হইয়া যাক, ঝড় উঠুক, শিল পড়ুক, পৃথিবীর সমস্ত খড়ের ঘরগুলি ভাঙিয়া পড়ুক,—তাহারা টেরও পাইবে না।

নীলমণির মেজাজ যেন ম্যাজিকে ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে। তাহার কণ্ঠস্বর পর্যন্ত মোলায়েম শোনাইল।

ও শ্যামা, দাঁড়িয়ে থাকিসনি মা, চটগুলো বিছিয়ে দে চট করে। একটু গড়াই। আহা, ভিজে কাপড়টা ছেড়েই নে আগে, মারামারির কী আছে। এতক্ষণই গেল না হয় আরও খানিকক্ষণ যাবে। ওগো, শুনছ? দাও না, খোকাকে চৌকির একপাশেই একটু শুইয়ে দাও না, দিয়ে তুমিও কাপড়টা ছেড়ে ফ্যালো। গলা নামাইয়া ফিসফিস করিয়া, ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন, অত লজ্জাটা কীসের শুনি? লজ্জা করে দরজা খুলে বারান্দায় চলে যাও না!

কাপড় ছাড়া হইল। বাহিরে এখন পুরাদমে ঝড় উঠিয়াছে। ঘরের কোথাও এতটুকু ছিদ্র নাই, কিন্তু বাতাসের কান্না শোনা যায়। চাপা একটানা শাঁ শাঁ শব্দ। তাদের,—নীলমণি আর তার পরিবারকে, নাগালের মধ্যে না পাইয়া প্রকৃতি যেন ফুঁসিতেছে।

নীলমণির মনে হইল, এ একরকম শাসানো। পঞ্চভূতের মধ্যে যাহার ভাষা আছে সে ক্রুদ্ধ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে, আজ বাঁচিয়া গেলে। কিন্তু কাল? কাল কী করিবে? পরশু? তার পরদিন? তারও পরের দিন?

শ্যামা চট বিছাইতেছিল, বলিল, মাগো কী গন্ধ!

নিভা বলিল, নে ঢং করতে হবে না, তাড়াতাড়ি কর।

নীলমণি বলিল, ঝেড়ে ঝেড়ে পাত না।

নিভা বলিল, না না, ঝাড়িসনি! ধুলোয় চাদ্দিক অন্ধকার হয়ে যাবে।

নিভা ছেলেকে স্তন দিতেছিল, কথাটা শেষ করিয়াই সে দমক মারিয়া চৌকির দিকে পিছন করিয়া বসিল।

নীলমণি চাহিয়া দেখিল, বড়োছেলের পিসে চাদর ফেলিয়া চৌকিতে উঠিয়া বসিয়াছে। লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় পিসের মূর্তি দেখিয়া নীলমণি শিহরিয়া উঠিল। একটা শব যেন সহসা বাঁচিয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল প্রায় ন্যাড়া করিয়া দেওয়ার মতো ছোটো ছোটো করিয়া ছাঁটা, চোখ যেন মাথার অর্ধেকটা ভিতরে চলিয়া গিয়াছে, গালের ঢিলা চামড়ার তলে হাড় উঁচু হইয়া আছে। বুকের সবগুলি পাঁজর চোখ বুজিয়া গোনা যায়। বুকের বাঁপাশে কী ঠিক চামড়ার নীচেই হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করিতেছে।

পিসে নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছিল। খানিকপরে ক্ষীণস্বরে বলিল, একটা জানলা খুলে দিন।

নীলমণি সভয়ে বলিল, দে তো শ্যামা, জানালাটা খুলে দে।

শ্যামা আরও বেশি ভয়ে ভয়ে বলিল, ঝড় হচ্ছে যে বাবা!

হোক, খুলে দে।

শ্যামা পশ্চিমের ছোটো জানালাটি খুলিয়া দিল। ঝড় পুবদিক হইতে বহিতেছিল, মাঝে মাঝে এলোমেলো একটু বাতাস আর ছিঁটে-ফোঁটা একটু বৃষ্টি ঘরে ঢোকা ছাড়া জানালাটি খুলিয়া দেওয়ায় বিশেষ কোনো মারাত্মক ফল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু ভীরু নিভা ছেলের গায়ে আর এক পরত কাপড় জড়াইয়া দিল।

পিসে বলিল, ঘুমের ঘোরে কখন চাদর মুড়ি দিয়ে ফেলেছি, আর একটু হলেই দম আটকাত! বাপ!

নীলমণি জিজ্ঞাসা করিল, আপনার অসুখ আছে নাকি?

পিসে ভর্ৎসনার চোখে চাহিয়া বলিল, খুব মোটা-সোটা দেখছেন বুঝি? অসুখ না থাকলে মানুষের এমন চেহারা হয়? চার বচ্ছর ভুগছি মশায়, মরে আছি একেবারে। যম ব্যাটাও কানা, এত লোককে নিচ্ছে আমায় চোখে দেখতে পায় না। যে কষ্টটা পাচ্ছি মশায়, শত্রুও যেন --

ব্যারামটা কী?

পিসে রাগিয়া বলিল, টের পান না? এমন করে শ্বাস টানছি দেখতে পান না? পারেন কেন, আপনার কী! যার হয় সে বোঝে।

বোঝা গেল, পিসের মেজাজটা খিটখিটে।

নীলমণি নম্রভাবে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আহা সেরে যাবে, ভালো মতো চিকিচ্ছে হলেই সেরে যাবে।

পিসে বলিল, হুঁ, সারবে। আমকাঠের তলে গেলে সারবে। চিকিচ্ছের কি আর কিছু বাকি আছে মশায়? ডাক্তার কবরেজ জলপড়া কিচ্ছুটি বাদ যায়নি। আজ চার বছর ডাঙায়-তোলা মাছের মতো খাবি খাচ্ছি, কোনো ব্যাটা সারাতে পারল!

কথার মাঝে মাঝে পিসে হাপরের মতো শ্বাস টানে, এক একবার থামিয়া গিয়া ডাঙায় তোলা মাছের মতোই চোখ কপালে তুলিয়া খাবি খায়। নীলমণির গায়ে কাঁটা দিতে লাগিল। বাতাস! পৃথিবীতে কত বাতাস! তবুও ফুসফুস ভরাইতে পারে না। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে সে উপবাসী, পঞ্চাশ মাইল গভীর বায়ুস্তরে ডুবিয়া থাকিয়া ওর দম আটকাইল।

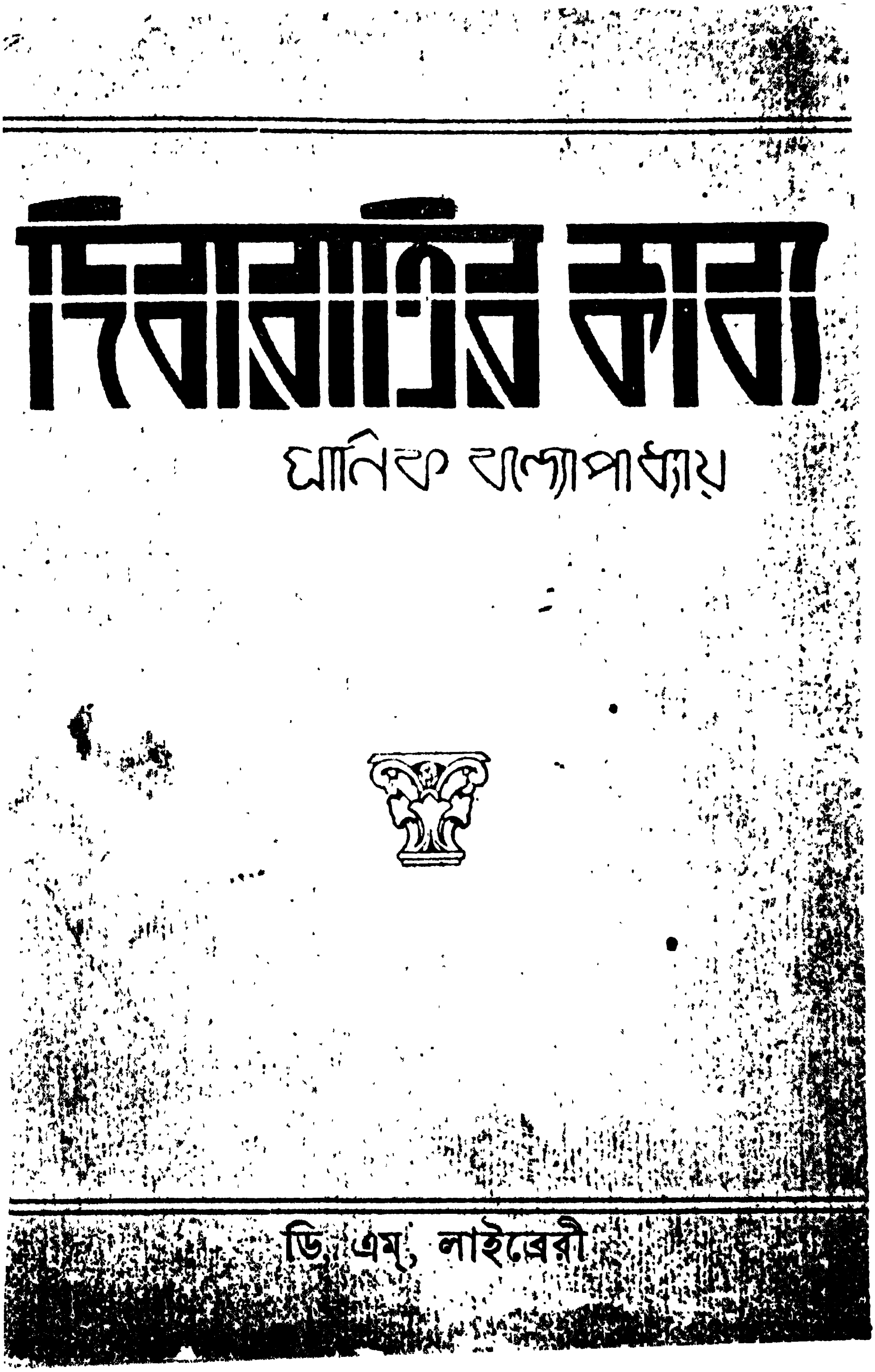
পিসে বলিল, কী করে জানেন? বলে, ভয় কী, সেরে যাবে। বলে, সবাই টাকা নেয় চিকিৎসে করে, শেষে বলে, না বাপু, তোমার সারবে না। এ সব ব্যারাম সারে না। আমি বলি ওরে চোর ডাকাত ছুঁচোর দল! সারাতে পারবি না তো মেরে ফ্যাল, দে মরবার ওষুধ দে।

উত্তেজনায় পিসে জোরে জোরে হাঁপাইতে লাগিল। নীলমণি কথা বলিল না, তাহার বিনিদ্র আরক্ত চোখ দুটি কেবলই মিটমিট করিয়া চলিল।

তেল কমিয়া আসায় আলোটা দপদপ করিতেছে, এখনই নিবিয়া যাইবে। ছেলেকে বুকে জড়াইয়া হাতকে বালিশ করিয়া নিভা দুর্গন্ধ ছেঁড়া চটে কাত হইয়া শুইয়া পড়িয়াছে। শ্যামা বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছে।

নীলমণির হুঁকা-কলকি শ্যামা জানালায় নামাইয়া রাখিয়াছিল। আলোটা নিবিয়া যাওয়ার আগে নীলমণি বাকি তামাকটুকু সাজিয়া লইল। তারপর ঠেস দিয়া আরাম করিয়া পিসের শ্বাস টানার মতো শাঁ শাঁ শব্দ করিয়া জলহীন হুঁকায় তামাক টানিতে লাগিল।

দিবারাত্রির কাব্য



দিবারাত্রির কাব্য প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ

দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্তন করে গত বছর বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।

দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক,—তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয়, উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতকগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের projection—মানুষের এক-এক টুকরো মানসিক অংশ।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম ভাগ

দিনের কবিতা

প্রাতে বন্ধু এসেছে পথিক,
পিঙ্গল সাহারা হতে করিয়া চয়ন
শুষ্ক জীর্ণ তৃণ একগাছি।
ক্ষতবুক তৃষার প্রতীক
বাতের কাজল-লোভী কাতর নয়ন,
ওষ্ঠপুটে মৃত মৌমাছি।

স্নিগ্ধ ছায়া ফেলে সে দাঁড়ায়,
আমারে পোড়ায় তবু উত্তপ্ত নিশ্বাস
গৃহাঙ্গনে মরীচিকা আনে
বক্ষ রিক্ত তার মমতায়,
এ জীবনে জীবনের এল না আভাস
বিবর্ণ বিশীর্ণ মরুতৃণে।

সকাল সাতটার সময় বূপাইকুড়ার থানার সামনে হেরম্বের গাড়ি দাঁড়াল।

বিস্‌না পর্যন্ত মোটরে আসতে তার বিশেষ কষ্ট হয়নি। কিন্তু রাত বারোটা থেকে এখন পর্যন্ত গোরুর গাড়ির ঝাঁকানিতে সর্বাঙ্গে ব্যথা ধরে গেছে। গাড়ি থেকে নেমে শরীরটাকে টান করে দাঁড়িয়ে হেরম্ব আরাম বোধ করল। এক টিপ নস্য নিয়ে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পুব আর পশ্চিমে কেবল প্রান্তর আর দিগন্ত। মাঝে মাঝে দুএকটি গ্রামের সবুজ চামড়া বসানো আছে, বৈচিত্র্য শুধু এই। উত্তরে কেবল পাহাড়। একটি দুটি নয়, ধোঁয়ার নৈবেদ্যের মতো অজস্র পাহাড় গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—অতিক্রম করে যাওয়ার সাধ্য চোখের নেই, আকাশের সঙ্গে এমনি নিবিড় মিতালি। দক্ষিণে প্রায় আধমাইল তফাতে একটি গ্রামের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা ও কতকগুলি মাটির ঘর চোখে পড়ে। অনুমান হয় যে, ওটিই বূপাইকুড়া গ্রাম। গ্রামটির ঠিক উপরে আকাশে এখন রূপার ছড়াছড়ি। তবে সেগুলি আসল রূপা নয়, মেঘ।

গাড়ি দাঁড়াতে দেখে থানার জমাদার মতিলাল বেরিয়ে এসেছিল। হেরম্বকে সে-ই সসম্মানে অভ্যর্থনা করল।

একটু অর্থহীন নিরীহ হাসি হেসে বলল, আজ্ঞে না, বাবু নেই। বরকাপাশিতে কাল একটা খুন হয়েছে, ভোর ভোর ঘোড়ায় চেপে বাবু তার তদারকে গেছেন। ও বেলা ফিরবেন —ঘরে গিয়ে আপনি বসুন, আমি জিনিসপত্র নামিয়ে নিচ্ছি। এ কিষণ! কিষণ! ইধার আও তো।

আপিস ও সিপাহীদের ছোটো ব্যারাকটির মধ্যে গম্ভীর লালিত্যহীন থানার বাগান। বাগানের শেষপ্রান্তে দারোগাবাবুর কোয়ার্টার। চুনকাম-করা কাঁচা ইটের দেয়াল, তলার দিকটা মেঝে থেকে তিন হাত উঁচু পর্যন্ত আলকাতরা মাখানো। চাল শণের। এ বছর বর্ষা নামার আগেই চালের শণ সমস্ত বদলে ফেলায় সকালবেলার আলোতে বাড়িটিকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। বাড়ির সামনে চওড়া বারান্দা।

ভিতরে যাবার দরজা পর্দা ফাঁক করে একটি সুন্দর মুখ উঁকি দিচ্ছিল। হেরম্ব বারান্দার সামনে এগিয়া আসতে খসে-পড়া ঘোমটাটি মাথায় তুলে দেবার প্রয়োজনে মুখখানা এক মুহূর্তের জন্য আড়ালে চলে গেল।

তারপর পর্দা সরিয়ে আস্ত মানুষটাই বেরিয়ে এল বারান্দায়।

আগ্রহ ও উত্তেজনা সংযত রেখে সহজ ভাবেই বলল, আসুন রাস্তায় কষ্ট হয়নি?

হয়েছিল। এই মুহূর্তে সব ভুলে গেলাম সুপ্রিয়া।

আমায় দেখেই? কোমল হাসিতে সুপ্রিয়ার মুখ ভরে গেল, বিশ্বাস করা একটু শক্ত ঠেকছে। যে রাস্তা আর যে গাড়ি, আসবার সময় আমি শুধু কাঁদতে বাকি রেখেছিলাম। পাঁচ বছর যার খোঁজ খবর নেওয়াও দরকার মনে করেননি, তাকে দেখে অত কষ্ট কেউ ভুলতে পারে?

আমি পারি। কষ্ট হলে যদি সহজে অবহেলাই করতে না পারব পাঁচ বছর তবে তোর খোঁজ-খবর নিলাম না কেন?

কত সংক্ষেপে কত বড়ো কৈফিয়ত! মেনে নিলাম ভাববেন না কিন্তু। আপনার সঙ্গে আমার ঢের ঝগড়া আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ভেতরে চলুন। জামা খুলে গা উদলা করে দিন। পাখা নেড়ে আমি একটু হাত ব্যথা করি। স্নান করবেন তো? আপনার জন্যে এক টব জল তুলে রেখেছি। ইঁদারা থেকে তোলা কিনা, বেশ ঠান্ডা জল। স্নান করে আরাম পাবেন।

সুপ্রিয়ার কথা বলার ভঙ্গিটি মনোরম। সকালবেলাই এখন একশো চার ডিগ্রি গরমে মানুষ সন্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সুপ্রিয়ার যেন একটি দার্জিলিঙের আবহাওয়ার আবেষ্টনী আছে। এত গরমেও

তার কথার মাধুর্যের এক কণা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়নি, তার কণ্ঠে শ্রান্তির আভাস দেখা দেয়নি। তার ইঁদারার জলের মতোই সেও যেন জুড়িয়ে আছে।

বাইরের ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দরের বারান্দা হয়ে হেরম্বকে সে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। যেতে যেতে হেরম্ব লক্ষ করে দেখল, চারিদিকে একটা অতিরিক্ত ঘষামাজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব। ঘর ও রোয়াকের ধোয়া মেঝে সবে শুকিয়ে উঠেছে, সাদা কালো দেয়ালে কোথাও একটু দাগ পর্যন্ত নেই। জলের বালতি, ঘটি-বাটি, বসবার আসন প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিসগুলি পর্যন্ত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে স্বস্থানে অবস্থান করছে। স্থানভ্রষ্ট একটি চামচও বোধ হয় এ বাড়ির কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না।

ঘরে ঢুকে সুপ্রিয়া বলল, ওই ইজিচেয়ারটাতে বসে সবচেয়ে আরাম হয়। জামা খুলে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ুন। ছারপোকা নেই, কামড়াবে না।

হেরম্ব জামা খুলে ইজিচেয়ারটাতে বসল। এলিয়ে পড়ার দরকার বোধ করল না।

আমার আরামের আর কী ব্যবস্থা রেখেছিস বল তো?

সুপ্রিয়া সত্যসত্যই পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করা শুরু করে বলল, আরামের ব্যবস্থার কথা আর বলবেন না, হেরম্ববাবু। বিশ মাইলের মধ্যে চাটি পর্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না, এমন বুনো দেশ। যে কদিন থাকবেন, আপনাকে কষ্ট করেই থাকতে হবে।—সে একটু হাসল—তবে কষ্ট আপনি সহজেই অবহেলা করতে পারেন, এই যা ভরসার কথা। নইলে মুশকিলে পড়তাম।

সুপ্রিয়ার এ ঘর সাজানো, ছবির মতো সাজানো। বিছানার ধবধবে চাদরে কোথাও একটি কুঞ্চন নেই, বালিশগুলি নিটোল। দেয়ালের গায়ে পেরেকের শেষ গর্তটি চুনের তলে অদৃশ্য হয়েছে। এদিকে টেবিলে সুপ্রিয়া ও তার স্বামীর প্রসাধন-সামগ্রীগুলির একটি কোনোদিনই হয়তো আর একটির গায়ে ঠেকে যাবে না, সেলাইয়ের কলের ঢাকনিটি চিরদিন এমনি ধূলিহীন হয়ে থাকবে। প্রতিদিন সুপ্রিয়া কতক্ষণ ঘর সাফ করে আর গোছায় হেরম্ব কল্পনা করে উঠতে পারছিল না।

সুপ্রিয়ার পাখার বাতাসে স্নিগ্ধ হতে হতেও সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল।

এক সময় একটু আচমকাই সে জিজ্ঞাসা করে বসল, দোকানের মতো ঘর সাজিয়েছিস কেন?

দোকানের মতো!

দোকানের মতো না হোক, বাড়াবাড়ি আছে একটু। তোর ভালো লাগে?

কী জানি।

কী জানি! ভালো লাগে কি না জানিসনে কী রকম?

অত বুঝিনে। মুদ্রাদোষের মতো হয়ে গেছে। না করেই বা কী করি বলুন? সারাদিন একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো মানুষের? একটা ছেলে দিয়ে ভগবান আবার কেড়ে নিলেন। বই-টই পড়তে আমার ভালো লাগে না। এই সবই করি। কিন্তু—সুপ্রিয়ার কথা বলার মধুর ভঙ্গি ফিরে এল, আমার কথা আগে কেন? আগে বলুন আপনার মা কেমন আছেন?

মা আশ্বিন মাসে স্বর্গে গেছেন।

সুপ্রিয়া চমকে বলল, কী সর্বনাশ! তার দুচোখ সজল হয়ে উঠল।

হেরম্ব বলল, মরবার আগে মা তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

সুপ্রিয়ার পাখা থেমে গিয়েছিল। আবার সেটা নাড়তে আরম্ভ করে বলল, আমাকে বড়ো ভালোবাসতেন। আপনাকে হেরম্ববাবু বলার জন্যে সকলের কাছে গাল খেয়েছি, তিনি শুধু বলতেন, পাগলি মেয়ে।

হেরম্ব বলল, তখন তুই পাগলিই ছিলি সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছিল, জবাব দিল না।

সুপ্রিয়া ভারী গৃহস্থ মেয়ে।

গোয়ালা আজ কী কারণে এত বেলাতেও আসেনি। সুপ্রিয়া নিজেই দুরন্ত গোরুর বাঁট টেনে হেরম্বের চায়ের দুধ বার করল। উঠানের এক পাশে দরমার বেড়ায় ঘেরা স্নানের জায়গা। হেরম্ব সেখানে স্নান করছিল। এই সময় বাইরে এসে তার দুধ দোয়া দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুপ্রিয়া বলল, বলক তোলা টাটকা দুধ খাবেন একটু? ভারী উপকারী। উনি রোজ খান। দুইব বেশি করে?

হেরম্ব বলল, বলক তোলা দুধ শিশুতে খায়। অশোক বাড়ি ফিরলে তাকে খাওয়াস। এ কাজটা শিখলি কবে?

এ আবার শিখতে হয় নাকি!

হয়। কারণ, শিখিনি বলে আমি পারব না।

সুপ্রিয়া হেসে বলল, পারবেন। দুধ দেবার জন্যে ভোর থেকে গোরু আমার হামলাচ্ছে, বাঁটে হাত দিলে দুধ ঝরবে। তবে আপনাকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে কিনা সন্দেহ,—গুঁতোবে হয়তো।

কাছে গেলে তো! চাউনি দেখে ভালো বোধ হচ্ছে না।

বড়ো দুরন্ত। দুবেলা দড়ি ছিঁড়বে, ধরতে গেলে শিং নেড়ে তেড়ে আসবে। কত মোটা শেকল দিয়ে বাঁধতে হয়েছে দেখছেন না? আমি খেতে দি বলে আমায় কিছু বলে না।

সুপ্রিয়া সস্নেহে তার গোরুর গলা চুলকে দিল। বলল, ঘরেই আয়না চিরুনি আছে।

গোরুর সামনে কয়েক আঁটি খড় ফেলে দিয়ে সে রান্নাঘরে গেল। কাল রাত্রে ছানা কেটেছিল, তাই দিয়ে তৈবি করল সন্দেশ, সন্দেশ ভালো হল না বলে তার যে কী দুঃখ!

হেরম্বকে খেতে দিয়ে বলল, আপনি খাবেন কিনা, তাই আজ শত্রুতা করেছে।

হেরম্ব সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আহা হোক না, খাব বই তো নয়।

খাবার জন্যই তো খাবার, কিন্তু তাই বলে যা তা দেওয়া যায়। মিহি না হলে সে আবার সন্দেশ। কাল রাত্রে পড়লাম ফিট হয়ে নইলে রাত্রেই করে রাখতাম। সারারাত ফেলে রেখে সে ছানায় কি সন্দেশ হয়?

হেরম্ব খাওয়া বন্ধ করে বলল, তোর না ফিট সেরে গিয়েছিল?

গিয়ে তো ছিল, এ বছর আবার হচ্ছে। কাল নিয়ে দুবার হল। রান্নাঘরে ছানা ডলছি, হঠাৎ মাথাব মধ্যে এমনি ঝিমঝিম করে উঠল! তার পর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি পাঁড়ে আর দাই গায়ে বালতি বালতি জল ঢালছে, রান্নাঘর ভেসে একেবারে পুকুর!

চা আনি। হেরম্বকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে সুপ্রিয়া রান্নাঘরে চলে গেল।

চা এনে সে অন্য কথা পাড়ল।

রাঁচিতে কদিন ছিলেন?

চারদিন।

এখানে কতদিন থাকবেন?

একদিন।

সুপ্রিয়া ভ্রূ কুঁচকে বলল, রক্ষে পেলেম। গেলেই বাঁচি।

চায়ে চুমুক দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে চিবুক ঘষে হেরম্ব বলল, আমাকে তুই কদিন রাখতে চাস?

দিন? বছর বলুন।

এ কথা হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। সুপ্রিয়া আকস্মিকতা পছন্দ করে না। ওর হিসাবে দিন নেই, মাস নেই, বছব দিয়ে ও জীবনকে ভাগ করেছে। ওর প্রকৃতির কল্পনাতীত সহিষ্ণুতা হেরম্বের অজানা নয়।

তবু তাকে বলতে হল, বছর নয়, মাস নয়, সপ্তাহও নয়। একদিন। শুধু আজ।

সুপ্রিয়া কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না।

ও বেলাই চলে যাবেন?

না, কাল সকালে।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয়া বলল, একদিন থাকবার জন্য এমন করে আপনার আসার দরকাব কি ছিল? পাঁচ বছর খোঁজ নেননি, আরও পাঁচ বছর নয় না নিতেন।

চায়েব কাপ নামিয়ে রেখে কাপড়ে মুখ মুছে হেরম্ব বলল, তাতে লাভ কি হত রে?

সুপ্রিয়া পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলল, আপনি বাড়িতে এলে বাইরের ঘরে বসিয়ে এক কাপ চা আর একটু সুজি পাঠিয়ে দিতাম। মনে মনে বলতাম, আপদ বিদেয় হলেই বাঁচি।

হেরম্ব একটু হেসে বলল, আচ্ছা, এবার দশ বছর পরে আসব। মনে তোর ক্ষোভ রাখব না, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বলল, আপনি তা পারেন। ছেলেমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার যখন বিয়ে দিয়েছিলেন, তখনি জেনেছিলাম আপনার অসাধ্য কর্ম নেই।

হেরম্ব প্রতিবাদ কবে বলল, আমি তোর বিয়ে দিইনি সুপ্রিয়া, তোর বাবা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ রে, বিয়েব সময় তোকে একটা উপহারও বোধ হয় আমি দিইনি। দিয়েছিলাম?

সুপ্রিয়া শেয কথাটা কানে তুলল না। বলল, বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বইকী। আমাকে ভজিয়ে ভজিয়ে রাজি করেছিল কে? কার মুখের বড়ো বড়ো ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে আমি ভেসে গিয়েছিলাম? কী সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথা! কত কথার মানে বুঝিনি। তবু শুনে গা শিউরে উঠেছিল! আচ্ছা, সে সব কথা অভিধানে আছে?

জবাব দিতে হেরম্বকে একটু ভাবতে হল। সুপ্রিয়ার ঝগড়া করার ইচ্ছা নেই এটা সে টের পেয়েছিল। কিন্তু তার অনেক দিনের জমানো নালিশ, কলহ না করলেও নালিশগুলি ও জানিয়ে রাখবে। না জানিয়ে ওর উপায় নেই। মনের নেপথ্যে এত অভিযোগ পুষে রাখলে মানসিক সুস্থতা কারও বজায় থাকে না। এখনকার মতো কথাগুলি স্থগিত রাখলেও সুপ্রিয়ার চলবে না। সে কাল চলে যাবে, দুচার বছরের মধ্যে তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা সুপ্রিয়া বিশ্বাস করে না। যা বলার আছে এখুনি সব বলে দিয়ে বাকি দিনটুকু নিশ্চিন্ত মনে অতিথির পরিচর্যা করবার সুযোগটাও সে বুঝি সৃষ্টি করে নিতে চায়। তাব সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বার কারণটা সে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দিতে চায়।

চোখের জলের মধ্যে সুপ্রিয়ার বক্তব্য শেষ হবে কিনা ভেবে হেরম্ব মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়েছিল।

তোর ভালোর জন্য যতটুকু বলার দরকার তার বেশি আমি কিছুই বলিনি, সুপ্রিয়া।

না বললে আমার মন্দটা কী হত? স্কুলে পড়ছিলাম, লেখাপড়া শিখে চাকরি করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতাম। আপনি আমাকে তা করতে দেননি কেন?

হেরম্ব মাথা নেড়ে বলল, তোর সহ্য হত না, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল, কেন হত না? পাঁচ বছর এই বুনো দেশে পড়ে থাকা সহ্য হচ্ছে, পেট ভরাবার জন্য পরের দাসীবৃত্তি করছি, গোরুবাছুরের সেবা করে আর ঘর গুছিয়ে জীবন কাটাচ্ছি,—ঝিমিয়ে পড়েছি একেবারে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে আমার সহ্য হত না কেন?

হেরম্ব বলল, দাসীবৃত্তি করছিস নাকি?

সুপ্রিয়া তার সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ রেখে বলল, ধরতে গেলে, কথাটা তাই দাঁড়ায় বইকী!

হেরম্ব আবার মাথা নেড়ে বলল, না তা দাঁড়ায় না। দাঁড়ালেও পৃথিবীসুদ্ধ সব মেয়ে হাসিমুখে যে কাজ কবছে, তার বিরুদ্ধে তোর নালিশ সাজে না। চাকরি করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটানো তুই হয়তো খুব মজার ব্যাপার মনে করিস। আসলে কিন্তু তা নয়। আর্থিক পরাধীনতা স্বীকার করবার সাহস যে মেয়ের নেই তাকে কেউ ভালোবাসে না। তাছাড়া,—এইখানে ইজিচেয়ারের দুইদিকেব পাটাতনে কনুইয়ে ভর রেখে হেরম্ব সামনে দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল, তাছাড়া স্বাধীনতা তোর সইত না। কতকগুলি বিশ্রী কেলেঙ্কারি করে জীবনটা তুই মাটি করে ফেলতিস?

সুপ্রিয়া সংক্ষেপে শুধু বললে, ইস!

ইস নয়। ওই তোর প্রকৃতি। পনেরো বছর বয়সেই তুই একটু পেকে গিয়েছিলি, সুপ্রিয়া। বাইশ-তেইশ বছর বয়সে মেয়েরা সারা জীবনের একনিষ্ঠতা অর্জন করে, তোর মধ্যে সেটা পনেরো বছর বয়সে এসেছিল। তখনই তোব জীবনের দুটো পথ তুই একেবারে স্থির করে ফেলেছিলি। তাব একটা হল লেখাপড়া শিখে স্বাধীন হয়ে থাকা, আর একটা—হেবম্বকে একটু থামতে হল,—অন্যটা এক অসম্ভব কল্পনা।

সুপ্রিয়া আবার পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, অসম্ভব কেন?

হেরম্ব চেয়ারে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

যা তুই, রান্নাঘর থেকে একবার ঘুরে আয়গে। ভাগ।

হেরম্বের আদেশে নয়, আতিথ্যের প্রয়োজনেই সুপ্রিয়াকে একসময়ে বান্নাঘরে যেতে হল। মনে তার কঠিন আঘাত লেগেছে। সংসারে থাকতে হলে সংসারের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়, এটা সুপ্রিয়া জানে এবং মানে। বিয়েই যখন তার করতে হল তখন মোটা মাইনের হাকিম অথবা অধ্যাপক অথবা পয়সাওয়ালা ডাক্তারের বদলে একজন ছোটো দারোগার সঙ্গে তাকে গেঁথে দেওয়া হল কেন ভেবে তাব কখনও আপশোশ হয়নি? বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য হয়ে মানুষকে যে সব হিসাব ধরতে হয় সেদিক থেকে ধরলে কোনো ছেলেমেয়েই সংসারে ঠকে না। এক বড়ো দারোগা যাচাই করতে এসে তাকে পছন্দ করেনি। তার নাকটা যে বোঁচা সে অপরাধও সেই বড়ো দারোগার নয়। একটি চোখা নাকেব জন্য কষ্ট করে বড়ো দারোগা হয়ে তাকে বাতিল করে দেওয়াটা সুপ্রিয়া তার অন্যায় মনে করে না। তবু কিশোর বয়সের কল্পনাটি অসম্ভব কেন, সুপ্রিয়া তার কোনো সঙ্গত কাবণ আবিষ্কার করতে পারেনি।

তার হতাশ বেদনা আজও তাই ফেনিল হয়ে আছে। চেনা মানুষ, জানা মানুষ, একান্ত আপনার মানুয। যে নিয়মে অচেনা অজানা ছোটো দারোগা তার স্বামী হল, ওই মানুষটির বেলা সে নিয়ম খাটবে কেন? ও খাটতে দেবে কেন? এ কী বিস্ময়কর অকারণ অন্যায় মানুষের। কেন, ভালোবাসা বলে সংসারে কিছু নেই নাকি? সংসারের নিয়মে এর হিসাবটা গুঁজবার ফাঁক নেই নাকি?

সুপ্রিয়া ভাবে। এত ভাবে যে বছরে তার দু-তিনবার ফিট হয়।

সুপ্রিয়াকে ডালভাত রাঁধতে হয় না, একজন পাঁড়ে সিপাহি বেগার দেয়। সুপ্রিয়া রাঁধে মাছ তরিতরকারি, রাঁধে ছানার ডালনা। গৃহকর্মকে সে সত্যসত্যই এত ভালোবেসেছে যে, মাছের ঝোলের

আলু কুটতে বসেই তার মনের আঘাত মিলিয়ে আসে। ও বেলা গাঁ থেকে দুটো মুরগি আনবার মতলবটাও এ সময় সে মনে মনে স্থির করে ফেলে।

রান্নার ফাঁকে এক সময় হেরম্বকে শুনিয়ে আসে, আর কেউ হলে রান্নাঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করত।—ওমা, ঘুমে যে চোখ ঢুলছে।

ভারী ঘুম পাচ্ছে সুপ্রিয়া। সারারাত ঘুমোইনি।

সুপ্রিয়া বলে, তাই বলে, এখন এই সকালবেলা ঘুমোতে পাবেন না। সারাদিন শরীর বিশ্রী হয়ে থাকবে। আরেক কাপ চা পাঠাচ্ছি, খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন, তারপর দুপুরবেলাটা পড়ে পড়ে যত ইচ্ছে ঘুমোবেন।

দুপুরবেলা হেরম্বের সঙ্গে গল্প করবে, না কয়েকটা বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরি করতে বসবে এতক্ষণ সুপ্রিয়া তা ঠিক করে উঠতে পারেনি। দুপুরে হেরম্বের ঘুমের প্রয়োজনে এ সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হয়।

ভাবে, একা ফেলে রেখে কি আর খাবার করা যেত? পেটুক তো সহজ নয়! এ বেশ হল। ঘুমোবার সময়ের মধ্যেই হাত চালিয়ে সব করে ফেলব। তারপর গা ধুয়ে এসে আর কাজ নয়। শুধু গল্প।

গম্ভীর হেরম্বের সঙ্গে সে কী গল্প করবে সে-ই জানে।

হেরম্বের জন্য আবার চা করতে গিয়ে সে ফিরে আসে।

একটু ব্র্যান্ডি খাবেন? শরীরের জড়তা কেটে যাবে।

সে তামাশা করছে ভেবে হেরম্ব একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, ব্র্যান্ডি! ব্র্যান্ডি তুই পাবি কোথায়?

আছে। উনি খান যে!

হেরম্ব অবাক হয়ে বলে, অশোক মদ খায়?

সুপ্রিয়া হাসে।

নেশা করবার জন্যে কি আর খায়? শরীর ভালো নয় বলে ওষুধের মতো খায়। আমিও কদিন খেয়েছি। খেলে এমন চনচনে লাগে শরীর যে মনে হয় ওজন অর্ধেক হালকা হয়ে গেছে। একদিন—রাগ করবেন না তো?—একদিন অনেকটা খেয়ে ফেলেছিলাম। নেশায় শেষে অন্ধকার দেখতে লাগলাম।

তোর সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি সুপ্রিয়া। নেশায় কেউ অন্ধকার দ্যাখে?

দ্যাখে না? আমার যে-রকম ভয় হয়েছিল, আপনার হলে বুঝতেন। চাবির গোছা হাতে নিয়ে সুপ্রিয়া একটা চাবি বেছে ঠিক করে, বলুন, চা খাবেন, না ব্র্যান্ডি খাবেন। আলমারিতে দু বোতল আছে। কী রং! দেখলে লোভ হয়।

মাতাল হবার জন্য স্বামী মদ খায় না বলে এটা সুপ্রিয়ার কাছে এখনও হাসির ব্যাপার। কিন্তু হেরম্বের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার হাসি উবে যায়।

সে ভয়ে ভয়ে বলে, রাগ করলেন? হেরম্বের রাত-জাগা লাল চোখ এ প্রশ্নে তার দিকে ফিরে আসে না, স্কুলের ছেলের সামনে কড়া মাস্টারের মতো তার গাম্ভীর্য কোথাও একটু টোল খায় না। রূঢ়, নীরস কণ্ঠে সে সংক্ষেপে বলে, না।

সুপ্রিয়ার কানে কথাটা ধমকের মতো শোনায়। নিজেকে হঠাৎ অসহায়, বিপন্ন মনে হয়।

কী হল, বলুন। আপনাকে বলতে হবে। আমি ব্র্যান্ডি খেয়েছি বলে? সত্যি বলছি, একদিন শুধু শখ করে একটুখানি—

হেরম্ব বলে, ছেলেমানুষের মতো কথা বলিসনে, সুপ্রিয়া। তোর অনেক বয়স হয়েছে।

সুপ্রিয়া দু পা সামনে এগিয়ে যায়। হেরম্বের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, ছেলেমানুষের মতো কথা আমি বলিনি। আপনিই আমায় ছেলেমানুষ করে রাখছেন।—এ সব চলবে না, তাকান, তাকান, তাকান আমার দিকে। আমার ছ বছর বিয়ে হয়েছে, আমি কচিখুকি নই যে, হঠাৎ কেন এত রেগে গেলেন শুনতে পাব না।

হেরম্ব তার চোখের দিকে তাকাল না। তেমনি ভাবে বসে তেমনি কড়া সুরে বলে, শুনে কী হবে? তুই কী বুঝবি? তোর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু তুই এমন আস্তে আস্তে নিজের সর্বনাশের ব্যবস্থা করছিস কেন? আমি তোকে ভালো উপায় বলে দিচ্ছি। রাত্রে একদিন অশোককে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘরের চালে আগুন লাগিয়ে দিস।

অনেকক্ষণ স্তব্ধ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সুপ্রিয়া কেঁদে ফেলে রান্নাঘরে চলে গেল। তার মনে হতে লাগল, বিশেষভাবে তাকে আঘাত করবার জন্যই হেরম্ব এতকাল পরে তার বাড়িতে অতিথি হয়েছে। দুদিনের নোটিশ দিয়ে ওর আকস্মিক আবির্ভাবটা গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। পাঁচ বছরে তার মনের অবস্থা কী রকম দাঁড়িয়েছে, আগে তার একটা ধারণা করে নিয়ে তাকে আঘাত দিয়ে অপমান করে তার কল্পনা ও স্বপ্নের অবশিষ্টটুকু মুছে নেবার উদ্দেশ্যেই হেরম্ব তার বাড়িতে পদার্পণ করেছে। তাকে ও শাসন করবে, সংকীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত একটি বাগানে তার মূল বিস্তার করা দবকার বলে তার সব বাহুল্য ডালপালা ছেঁটে ফেলবে, এমন একটি শাখা রেখে যাবে না, যেখানে সে দুটি অনাবশ্যক ফুল ফোটাতে পারে।

ছোটো দারোগার সঙ্গে হেরম্ব তার বিয়ে দিয়েছিল। আজ একদিনে সে তাকে ছোটো দারোগারই বউ তৈরি করে দিয়ে চলে যাবে।

এবার আর কাজে সুপ্রিয়া সহজে মন বসাতে পারে না, মাছের ঝোলে আলুর দমের গোটা গোটা আলু ছেড়ে খুন্তি দিয়ে তরকারির মতো ঘুটে দেয়। নুন দেওয়া হয়েছে কিনা মনে করতে না পেরে খুন্তিটা উঁচু করে ঠান্ডা হবার সময় না দিয়েই একফোঁটা তপ্ত ঝোল জিভে ফেলে দেয়। গরমের জ্বালাটাই সে টের পায়, নুনের স্বাদ পায় না।

ডেকে বলে, ও পাঁড়ে, দ্যাখ তো নিমক দিয়া কী নেই? এবং মাছের ঝোল মুখে করা দূরে থাক, পাঁড়ে তার ছোঁয়া পর্যন্ত খায় না স্মরণ করে তার রাগ হয়।

যাও, তুম্ বাহার চলা যাও।

ভাবে, হয়েছে। আজ আর আমি রেঁধে খাইয়েছি!

তার মনের মধ্যে হেরম্বের কথাটা পাক খেয়ে বেড়ায়। শরীর খারাপ বলে অশোক ওষুধের মতো মদ খেলে তার অপরাধটা কোনখানে হয় সে ভেবে পায় না। আজকের ওষুধ কাল অশোকের নেশায় দাঁড়িয়ে গেলেও সে ঠেকাবে কী করে? বারণ সে করতে পারে। একবার কেন দশবার বারণ করতে পারে। দরকার হলে পায়ে ধরে কাঁদাকাটা করতেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু চাকরির জোরে বিয়ে-করা বউয়ের কথা শুনছে কে? সংসারে সকলে যদি তার কথামতোই চলত তবে আর ভাবনা ছিল কীসের! মদে আসক্তি জন্মে যাবার আশঙ্কা অশোক হেসেই উড়িয়ে দেবে। বলবে, খেপেছ? আমার ওটুকু মনের জোর নেই? এ বোতল দুটো শেষ হলে হয়তো আর কিনবার দরকার হবে না। বলবে, কতগুলো টাকা থাকলে পোস্টাপিসে জমত। সাধ করে কেউ অত দামি পদার্থ কেনে!

সে জবাব দেবে কি? স্বামীর মনের জোরে সন্দেহ প্রকাশ করবে? তার স্বাস্থ্য ভালো করার দরকার নেই বলে আবদার ধরবে? অশোক ধমকে উঠলে তার মুখখানা হেরম্ব যেন তখন দেখে যায়।

গরমে, আগুনের তাতে, সুপ্রিয়া এতক্ষণে ঘেমে উঠেছে। উঠোনে চনচনে রোদ। একটু বাতাস গায়ে লাগাবার জন্য দরজার কাছে সরে গিয়ে সুপ্রিয়া দেখতে পেল, হেরম্ব শোবার ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। দুজনের মাঝে উঠানের ব্যবধান ভরে ঝাঁজালো কড়া রোদটা সুপ্রিয়ার কাছে বৃপকের মতো ঠেকল।

বারান্দা থেকেই হেরম্ব বলল, এত গরমে তোর না রাঁধলেও চলবে, সুপ্রিয়া। পাঁড়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে আয়, যা পারে ওই করবে।

সুপ্রিয়া কথা বলল না। আঁচলে মুখ মুছে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

হেরম্ব বলল, আমাকে চা দিলি না যে?

এত গরমে একশোবার চা খেতে হবে না।

এক গেলাস জল দে তবে।

হেরম্বকে তৃষ্ণার্ত জেনে সুপ্রিয়ার সেবাবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠল।

শরবত করে দেব? লেবুর শরবত?

হেরম্ব আগ্রহ জানিয়ে বলল, দে, তাই দে।

আহত, উত্তপ্ত ও ঘর্মাক্ত সুপ্রিয়ার হাত থেকে শরবতের গ্লাস নেবার সময় এক মুহূর্তের জন্য হেরম্বের মনে হল হয়তো সত্যসত্যই মেয়েদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পুরুষেরা গোড়াতেই কোথাও একটা গলদ বাধিয়ে বসে আছে, যে জন্য ওদের মনের শৈশব কোনোদিনই ঘুচতে চায় না। ঘুণ যদি ধরে তো একেবারে কাঁচা মনেই ধরে, নইলে ওরা আজন্ম শিশু। জীবন-সাগরের তীরে বালি খুঁড়ে পুকুর তৈরি করে ওরা খুশি থাকবে, সমুদ্রের সঙ্গে তাদের সে কীর্তির তুলনা কখনও করবে না। ডাবের জলে ডাবের শাঁসে জগতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয় চিরদিন এই থাকত ওদের ধারণা, জগতের ক্ষুধাও ওরা বুঝবে না, তৃষ্ণার প্রকৃতিও জানবে না।

শরবত পান করে হেরম্ব বলল, কাল ফিট হয়েছিল, আজ আবার রাঁধতে গেলি কেন?

বাড়িতে অতিথি, রাঁধব না? অতিথি খাবে কী?

অতিথি দইচিঁড়ে দিয়ে ফলার করবে।

অতিথির অত দরদ দেখিয়ে কাজ নেই।

সুপ্রিয়ার মুখের মেঘ আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল। সে ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে, হেরম্ব খেয়ালি মানুষ, মনের খেয়ালে ও যদি একটা অদ্ভুত কিছু করতে চায়, রাগ করে আর লাভ কী হবে? যে উদ্দেশ্যে যে মনোভাব নিয়েই ও এসে থাক, সে বিনা প্রতিবাদে ওকে গ্রহণ করবে। নিজের সুখ-দুঃখ মান-অভিমানের কথাটা একেবারেই ভাববে না। বড়ো ভাইয়ের মতো ও যদি তাকে শাসন করে, ছোটো বোনের মতো সে নীরবে শাসিত হবে। ভ্রান্ত কল্যাণকামীর মতো ও যদি তার মনে ব্যথা দেয়, মুখ বুঁজে সে ব্যথিত হবে। ও যদি তার চোখের জল দেখতে চায় দুচোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঢেলে ওকে সে চোখের জল দেখাবে। স্বপ্নহীন মাধুর্যহীন রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে তাকে যদি আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেখতে চায়, পাকা গিন্নির মতো ব্যবহার করে ওকে সে তাক লাগিয়ে দেবে।

হেরম্বের নিদ্রালস প্রভাতটি অতঃপর সুপ্রিয়ার এই গোপন প্রতিজ্ঞার ফলাফলে ক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সহসা সুপ্রিয়া যেন তার কাছে একটা দুর্বোধ্য রহস্যের আবরণ নিয়েছে। বিদায়কামী কচের কাছে দেবযানীর অভিশাপের মতো সুপ্রিয়ার আকস্মিক ও অভিনব সহজ হাসিখুশির ভাবটা হেরম্বের কাছে দুর্বলের বিশ্রী প্রতিশোধ নেওয়ার মতো ঠেকতে লাগল। মনে হল, ইঁদারার জলের মতো ঠান্ডা মেয়েটা হঠাৎ বরফ হয়ে গেছে। স্নিগ্ধতা দেখালে আরও জমাট বাঁধছে, উত্তাপে বিনা বাক্যব্যয়ে গলতে আরম্ভ করে দিচ্ছে। কিন্তু গ্রহণ করছে না কিছুই।

সুপ্রিয়ার রান্না শেষ হতে বারোটা বাজল। ফিট হতে শুরু হওয়ার পর থেকে তার চোখের কোলে নিষ্প্রভ কাজলের মতো একটা কালিমার ছাপ পড়েছিল। এই আবেষ্টনীর মধ্যে তার চোখ দুটি আজকাল আরও বেশি উজ্জ্বল দেখায়। এখন, এই গরমে এতক্ষণ কাঠের উনানে রান্না করার ফলে তার সমস্ত মুখ মলিন নিরুজ্জ্বল হয়ে গেছে। হেরম্ব আর একবার স্নান করবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে এলে তাব মুখের দিকে তাকিয়ে হেরম্ব ব্যথিত হল। একধার থেকে কেবল রান্না করে যাওয়ার পাগলামি মেয়েদের কেন আসে হেরম্বের তা অজানা নয়। আরও অনেককেই সে এ নেশায় মেতে থাকতে দেখেছে। সুপ্রিয়াব মতো তাদেরও এমনি রান্নার ঝোঁক চাপে, রেঁধে রেঁধে আধমবা হয়ে তারা খুশি হয়।

অথচ তাদের সঙ্গে, যারা ভাববার উপযুক্ত মন থেকে বঞ্চিত, সুপ্রিয়ার একটা অতিবড়ো মৌলিক পার্থক্য আছে। ওব এত রান্না করাকে .হরম্ব কোনোমতেই সমর্থন করতে পারল না।

বারান্দায় দাঁড়ালে বাড়ির প্রাচীর ডিঙিয়ে বহুদূর অবধি প্রান্তর চোখে পড়ে। মাঠ থেকে এখন আগুনের হলকা উঠছে। খানিক তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

হেরম্ব বলল, বারবার স্নান করিয়ে আমাকে ঠান্ডা করতে চাস, তুই যে গরমে গলে গেলি নিজে?

সুপ্রিয়া এখনও হাসল, গলে গেলাম? ননীর পুতুল নাকি?

হেরম্ব গম্ভীর হয়ে বলল, হাসিস নে। তুই কী বলবি জানি, তবু তোকে বলে রাখি, শবীর ভালো রাখার চেয়ে বড়ো কাজ মানুষের নেই। শরীর ভালো না থাকলে মানুষ ভাবুক হয়, দুঃখ বেদনা কল্পনা করে, ভাবে জীবনটা শুধু ফাঁকি। বদহজম আর ভালোবাসাব লক্ষণগুলি যে একরকম তা বোধ হয় তুই জানিস নে?—

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুপ্রিযা আনমনে হেরম্বের মুখে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় উপদেশ শুনল। কিন্তু তাব একটি কথাতেও সায় দিল না।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে হেরম্ব দেখল আয়নার সামনে সুপ্রিয়া চুলবাঁধা শেষ কবে এনেছে। সে টের পেল, সুপ্রিয়ার একটি আশা সে পূর্ণ করেছে। প্রসাধন শেষ হবার আগে ঘুম ভেঙে সে তাকে দেখবে সুপ্রিয়াব এই কামনা হেরম্বকে রীতিমতো বিস্মিত করে দিল।

চুলের জট ছাড়াতে কান্না আসছিল, হেরম্ববাবু। কপাল ভালো, তাই একটু আগে আপনাব ঘুম ভাঙেনি। তখন আমার মুখ দেখলে আর এক মিনিট এ বাড়িতে থাকতে রাজি হতেন না।

দুহাতের তালু একত্র করে মাথার পিছনে রেখে হেরম্ব বলল, ডেকে তোলা উচিত ছিল। চুলের জট ছাড়াবার সময় তোদের মুখভঙ্গি দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগে, সুপ্রিয়া।

সৃষ্টিছাড়া ভালো লাগা নিয়েই তো কারবার আপনার।

সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি খোঁপা বেঁধে ফেলল। আয়নায় একবার পরীক্ষকের দৃষ্টিতে নিজের মুখখানা দেখে নিয়ে প্রসাধনে যবনিকা-পাত করল।

বলল, আর ঘরে কেন? বাইরে বসে চা খাবেন চলুন। এর মধ্যে চারিদিক জুড়িয়ে গিয়ে ঝিরঝিব বাতাস বইছে।

রাত্রে এখানে ঠান্ডা পড়ে, না?

সুপ্রিয়া হেসে মাথা নেড়ে বলল, গরম কমে, ঠান্ডা পড়ে না। তবে খুব বাতাস বয়,—ওই যে ঝাউ গাছগুলি দেখছেন? সমস্ত রাত সাঁ সাঁ করে ডাকবে, শুনতে পাবেন।

হেরম্ব ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হযে গেল। ঝাউগাছের কাছ থেকে বেড়িয়ে আসি চল, সুপ্রিয়া।

যাবেন? সুপ্রিয়া এক মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল, —তবে উঠুন, উঠে শিগগির তৈরি হয়ে নিন। আমি চট করে চা করে ফেলছি। উঠুন না!

হেরম্ব প্রশান্তভাবে শুয়ে রইল। উঠবার তার কোনো তাড়াই আর দেখা গেল না। আলসোর আড়ালে আশ্রয় নিয়ে স্তিমিত চোখে তাকিয়ে সে বলল, আলসেমি লাগছে, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, যাবেন বললেন যে?

যাব বললাম বটে কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম, ঝাউগাছ দূর থেকেই ভালো দেখায়।

অন্যদিকে চলুন তবে? চলুন দুজনে মাঠে খানিকটা হেঁটে আসি। যাবেন বলেছেন যখন, আপনাকে যেতে হবেই হেরম্ববাবু। উঠুন। দশ গোনার মধ্যে না উঠলে হাত ধরে টেনে তুলে দেব।

হাত ধরে টেনে তোলার ইচ্ছাটা সুপ্রিয়ার আকস্মিক নয়, হাত ধরে টেনে তোলবার সুযোগটা হেরম্ব তাকে দেবে এ আশাও সুপ্রিয়া করছিল। রহস্যের ছলে এ তো তুচ্ছ, সামান্য দান! কিন্তু এটুকু বুঝবার মতো নিবিড় মনোযোগ সুপ্রিয়ার প্রতি হেরম্ব বজায় রাখতে পারেনি। সুপ্রিয়ার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিছানায় উঠে বসল।

সুপ্রিয়াকে চেষ্টা করে চোখের জল নিবারণ করতে হল। তার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে পদে পদে ব্যথা না পেয়ে তার উপায় ছিল না। গোধূলি-লগ্নে নির্জন তরঙ্গায়িত প্রান্তরে তার সঙ্গে পাশাপাশি বেড়াতে যাওয়া হেরম্বের কাম্য নয় সন্দেহ করে, কাম্য হলেও একটা তুচ্ছ খেয়ালের বশে বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহ সে সত্যসত্যই দমন করে ফেলেছে নিশ্চিত জেনে, সুপ্রিয়া কম আহত হয়নি। তবু, হৃদয়কে হেরম্ব জোর করে নিয়ন্ত্রিত করছে এই ধারণা সুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কিন্তু সে যে ছুতো করে হেরম্বের হাত ধরে টেনে তুলতে চায় এটা হেরম্ব খেয়াল পর্যন্ত করতে পারল না দেখে নিজেকে তার অপমানিত ও অবহেলিত মনে হতে লাগল। সে যেন বুঝতে পারল, হেরম্বের মন থেকে সে মিলিয়ে গেছে। একটা কর্তব্য-বুদ্ধির, একটা মোটা সাংসারিক প্রতিকারস্পৃহার আশ্রয় ছাড়া হেরম্বের কোনো মনোবৃত্তিই আর তাকে নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে নেই।

শেষ পর্যন্ত মাঠে হেরম্ব তাকে বেড়াতে নিয়ে গেল, কিন্তু বেড়ানো উপভোগ করার ক্ষমতা সুপ্রিয়ার আর ছিল না। সমস্ত দুপুরটা প্রকৃতির গ্রীষ্ম আর উনানের ধোঁয়া সহ্য করে সে কল্পনার জাল বুনেছে। ভেবেছে, পথের গ্লানি কেটে গেলে বিকালে শত অনিচ্ছাতেও নিজেকে ও প্রকাশ না করে পারবে না। নিজের অজ্ঞাতেই ও কত কথা বলবে, কত ভুল করবে, কত সময় অন্যমনে আমার দিকে চাইবে। ও টেরও পাবে না ওর কোন কথাটি কুড়িয়ে, কোন ভুলটি ধরে, কোন চাউনির মানে বুঝে ওকে আমি চিনে ফেলেছি। সুপ্রিয়া আরও ভেবেছে, আমি এখন বড়ো হয়েছি। পাঁচ বছর ধরে ভেবে ভেবে আমি বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে একটা ব্যাপার হয় না। বেশ মোটা করে ভালোবাসা বুঝিয়ে না দিলে—

সারা দুপুর সুপ্রিয়া এই কথা ভেবেছে। ভেবেছে আমার এই শরীরটা এত সুন্দর নয় যে শুধু চোখে দেখার সান্নিধ্যে কেউ খুশি হয়। ওর মনের বাজে খেয়ালটা নষ্ট করে দিতে হলে আমাকে লজ্জা একটু কমাতে হবে। ওর কী, কাল চলে গেলে মস্ত একটা ত্যাগ করার গৌরব নিয়েই বাকি জীবনটা দিব্যি কাটিয়ে দেবে। সর্বনাশ আমার। কাব্য নিয়ে থাকলে আমার চলবে কেন? আমি যে একটা দিনের জন্য সুখ পেলাম না, সারাদিন আমার যে কিছু ভালো লাগে না, কিছুই ভালো লাগে না—

কাল ও জন্মের মতো চলে গেলে বেঁচে থেকে আমি কী করব? এতদিন আশায় আশায় কাটিয়েও যে কষ্টটা আমি পেয়েছি, ও তার কী বুঝবে! ছাই সংসার, ছাই ভালোমন্দ! ছাই আমার মঙ্গল অমঙ্গল! একজনের অদর্শন সইতে না পেরে আমার যদি শুধু অসহ্য যন্ত্রণাই হতে থাকে,

জগতে কীসে তবে আমার মঙ্গল হওয়া সম্ভব শুনি? পাঁচ বছর পরীক্ষা করেই তো বোঝা গেল এসব আমার পোষাবে না। কলের মতো হাত-পা নেড়েছি, শুয়েছি, বসেছি, হেসেছি পর্যন্ত; কিন্তু আমি তো জানি কী করে এতকাল আমার কেটেছে, দিনের মধ্যে কতবার আমার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে সাধ গিয়েছে।

না বাপু, এমন করে একটা দিনও আমি আর থাকতে পারব না।

কড়াইয়েব ফেনার তলে অদৃশ্যপ্রায় রসগোল্লাগুলির দিকে তাকিয়ে ভেবেছে আমি ওর সঙ্গে চলে যাব। কিছুতেই আমাকে ফেলে রেখে যেতে দেব না। বলব আপনার জন্য না হোক, আমার জন্যই আমাকে নিয়ে চলুন। না নিয়ে গেলে আমি যে জীবনে প্রথমবার ওব অবাধ্য হয়ে বিষ খেয়ে মরে যাব এ কথাটাও ওকে আমি জানিয়ে দেব।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হেরম্বের সঙ্গে শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে হাঁটতে হাঁটতে সুপ্রিয়া তার এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে মূক হয়ে গিয়েছিল। এই নিস্তেজ আত্মবিস্মৃত মানুষটির সঙ্গে গিয়ে তার লাভ কি হবে? ও তো ভুলে গিয়েছে। ও আর না চায় সুপ্রিয়ার দেহ না চায় তার মন। সংসারের টানে সুপ্রিয়া ওর কাছ থেকে ভেসে গিয়েছে। ওর আর ইচ্ছা নয় সাঁতরে সে ফিরে আসে।

হে ভগবান! জগতে এমন ব্যাপার ঘটে কী করে!

মাটির স্থির তরঙ্গের মতো একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছে সুপ্রিয়া অস্ফুট স্বরে বলল, একটু বসি।

থানার মিটমিটে আলোটির দিকে মুখ করে তারা বসল।

সুপ্রিয়া হঠাৎ বলল, বউয়ের কথা বলতে আপনার কি কষ্ট হয়?

হেরম্ব পাশবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জবাব দিল, না।

বউ গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন?

জানি না।

চারিদিকে অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হয়ে আসছিল। রূপাইকুড়া গ্রামে দুএকটি আলোকবিন্দু সঞ্চরণ করছে। বছরে দুবার আকাশে তারাখসার মরশুম আসে, এখন আর শীতকালে। আকাশে অর্ধেক তারা উঠবার আগেই থানার পিছনে একটা তারা খসে পড়ল।

হেরম্বের সংক্ষিপ্ত জবাবটি মনে মনে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সুপ্রিয়া বলল, দাদার চিঠিতে যখন জানলাম বউ ও রকম ভাবে মরেছে, প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি। জগতে এত লোক থাকতে আপনার বউ গলায় দড়ি দেবে এ যেন ভাবাও যায় না।

আমার মতো লোকের বউয়েরাই গলায় দড়ি দেয়, সুপ্রিয়া। আমি হলাম জগতের সেরা পাষণ্ড। তুই ছেলেমানুষ—

আবার ও কথা!

হেরম্ব এবার একটু শব্দ করেই হাসল।

ছেলেমানুষ বললে তোরা রাগ করিস, এদিকে বয়স কমাবার চেষ্টার কামাই নেই। তোরা—

এ সব বিশ্রী পচা ঠাট্টা শুনতে ভালো লাগছে না, হেরম্ববাবু।

সেটা আশ্চর্য নয় সুপ্রিয়া। হেরম্ব একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সুপ্রিয়া বলল, তারপর বলুন।

হেরম্ব বলল, আমি জগতের সেরা পাষণ্ড, এ কথা স্বীকার করার পর আর কি বলার থাকে মানুষের? গলায় দড়ি না দিলে উমা খেপে যেত। প্রকৃতপক্ষে, একটু খেপে গিয়েই সে গলায় দড়ি দিয়েছিল।

সুপ্রিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, আমার কথা শুনে?

তোর কথা আমি ওকে কিছুই বলিনি।

তবে? কী জন্য তবে ও অমন কাজ করল? আমি ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি, হেরম্ববাবু। দাদা লিখেছেন, অমন শান্ত ভালো মেয়ে আর হয় না। শুধু শুধু সে অমন কাজ করতে যাবে কেন?

তোর দাদা জগতের সব খবর রাখে।

আশ্চর্য মানুষ আপনি! সুপ্রিয়া আর কথা খুঁজে পেল না। হেরম্বের কাছে কথার অভাব তার চিরন্তন। হেরম্বের কাছে এলে মনের কথা ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন তার শেষ হয়ে যায়। হেরম্ব যেন তার ভাবনা শুনতে পাবে। কাছে বসে ভেবে গেলেই হল। প্রথম প্রেমে-পড়া মেয়েদের এই ভ্রান্ত অবস্থাটি সুপ্রিয়া এখনও একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। হাজার প্রশ্নে ভারী করে সে তাই নীরবে বসে রইল।

উমা তারই জন্য আত্মহত্যা করেছে এই ছিল এতকাল তার ধারণা। স্বামী মনপ্রাণ দিয়ে আর একজনকে ভালোবাসে—তাকে ভালোবাসে না, এটা বেচারির সহ্য হয়নি। আরেকজনের তরে, প্রেমে তলিয়ে যাওয়া স্বামীকে ছেড়ে সে তাই মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। এই ধারণা হেরম্বের কথায় ভেঙে যেতে সুপ্রিয়া বিহ্বল হয়ে গেল। হেরম্ব যে তাকে ভালোবাসে উমার আত্মহত্যা ছিল তার প্রমাণ। মৃত্যুর মতো অখণ্ড অপরিবর্তনীয় নিঃসংশয় প্রমাণ। এই প্রমাণের বাঁধ অপসারিত হয়ে যেতে যে সন্দেহ ও আত্মগ্লানির বন্যা এল, সুপ্রিয়া তাতে আর থই পেল না। তার মনে হল, সারাদিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর এতক্ষণে হেরম্ব তাকে আশ্রয়চ্যুত করে দুঃখ হতাশার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পেরেছে। জীবনে আর তার কিছুই রইল না। একদিনের ভুল আর বাকি দিনগুলির জন্যে সেই ভুলের উপলব্ধি—এই দুটি পরিচ্ছেদই তার জীবনী। যে জীবনকে সে মহাকাব্য বলে জেনে রেখেছিল সে একটা সাধারণ কবিতাও নয়।

থানায় পৌঁছে তারা দেখল, অশোক ফিরে এসে স্নান সমাপ্ত করে বিশ্রাম করছে।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ ফিরেছ, অশোক?

আপনারা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।

সুপ্রিয়া অনুযোগ দিয়ে বলল, আমায় ডেকে পাঠালে না কেন? আমরা ওই সামনের মাঠে ছিলাম। এখান থেকে দেখা যায়।

অশোক হেসে বলল, কী বলে ডেকে পাঠাতাম? আমি বাড়ি এসেছি, তুমি চট করে বাড়ি চলে এসো? তার চেয়ে দিব্যি স্নান-টান করে বিশ্রাম করছিলাম।—গা হাত, জানো গো, ব্যথা হয়ে গেছে।

আহা, তা হবে না! সারাটা দিন যে ঘোড়ার পিঠে কাটল। খাওনি কিছু? জানি খাওনি, আমি এসে না দিলে খাবে—

অশোক অপরাধীর মতো বলল, খেয়েছি, সুপ্রিয়া, এমন খিদে পেয়েছিল—

হেরম্ব লক্ষ করল, সুপ্রিয়ার মুখ প্রথমে একটু কালো হয়ে শেষে লালিমায় পরিবর্তিত হয়ে গেল। চাকরি ছাড়া স্বামীকে আর সব বিষয়েই সে যে তার মুখাপেক্ষী করে রেখেছে, হেরম্বের কাছে তা প্রকাশ হয়ে গেল। একদিন খুব ক্ষুধার সময় তার অপেক্ষায় বসে না থেকে পেট ভরালে অশোকের যদি অপরাধ হয়, স্ত্রীর কাছে সে অনেকটা শিশুত্বই অর্জন করেছে বলতে হবে। আগাগোড়া স্ত্রীর মন জোগানোর এই আদর্শ বজায় রেখে অশোক দিন কাটায় কী করে ভেবে হেরম্ব অবাক হয়ে রইল।

সুপ্রিয়া বলল, কী খেলে?

তুমি যা যা করেছ খুঁজে পেতে সব একটা করে খেয়েছি।

তবে তো খুব খেয়েছ! —বলে সুপ্রিয়া জেরা আরম্ভ করল, সন্দেশ খেয়েছ? খেয়েছ। না খেলেই ভালো হত, সন্দেশে তোমার অম্বল হয়। রসগোল্লা খেয়েছ? একটা খেলে কেন মোটে? আর দুটো খেলেই হত। আজ ঠিক স্পঞ্জ হয়নি? মালপো খেয়েছ? কেন খেলে? যা সয় না তা খাবার দরকার! এই জন্যেই তো তোমাকে আমি নিজের হাতে খেতে দিই। লোভে পড়ে যা তা খাবে, শেষে বলবে সোডা দাও। ...সরভাজা খাওনি?

হেরম্ব অশোককে জিজ্ঞাসা করল, তোমার নাকি স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়েছে, অশোক? শরীর ভালো করার জন্য ব্র্যান্ডি খাও।

অশোক চমকে বলল, আমি? কই না খাই না তো ! কে বললে খাই?

হেরম্ব বলল, কেউ না, এমনি কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম।

সুপ্রিয়া বলল, নাই বা করতেন কথাটা জিজ্ঞাসা?

কিন্তু এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য তার সফল হল না। অনায়াসে প্রসঙ্গান্তর এনে হেরম্ব তার কথাটা চাপা দিয়ে দিল। অশোককে সে জিজ্ঞাসা করল, খুনি ধরতে গিয়েছিলে শুনলাম? কোথায় খুন হল?

বরকাপাশিতে। অশোক সংক্ষেপে জবাব দিল।

ধরলে?

ধরেছি। বড়ো ভুগিয়েছে ব্যাটা। এ গাঁ থেকে সে গাঁ—হয়রান করে মেরেছে। শেষে একটা ঝোপের মধ্যে কোণঠাসা করে ধরতে ধরা দিলে। অশোক একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। নিজের ব্যবসার কথা বলতে পেলে সকলেই খুশি হয়। দা নিয়ে খুন করতে উঠেছিল, জমাদার জাপটে না ধরলে আজ একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। ব্যাটা কী জোয়ান।

সুপ্রিয়ার চোখের দিকে একবার স্পষ্টভাবে তাকিয়ে হেরম্ব বলল, কাকে খুন করেছে?

বউকে। চিরকাল যা হয়ে থাকে, —অসময়ে স্বামী বাড়ি ফিরল লাভার গেল পালিয়ে, বউ হল খুন। গলাটা একেবারে দুফাঁক করেও ব্যাটার তৃপ্তি হয়নি। সমস্ত শরীর দা দিয়ে কুপিয়েছে!

সুপ্রিয়া শিউরে উঠে বলল, মাগো!

খুনিটা তার স্বামীকে দা নিয়ে কাটতে উঠেছিল শুনে সুপ্রিয়া শব্দ করেনি স্মরণ করে হেরম্ব একটু ক্ষুব্ধ হল।

ফাঁসি হবে?

অশোক বলল, না! যথেষ্ট প্রোভোকেশন ছিল।

সুপ্রিয়া অস্থির হয়ে বলল, কী আলোচনা আরম্ভ করলে? ও সব কথা থাক বাপু, ভালো লাগে না। খুন, জখম, ফাঁসি—বলার কি আর কথা নেই?

হেরম্ব হেসে বলল, তুই দারোগার বউ, খুন জখম ভালো না লাগলে তোর চলবে কেন সুপ্রিয়া?

দারোগার বউ হয়ে কি অপরাধ করেছি? আমি তো দারোগা নই।

কী জানি কী অপরাধ করেছিস। আমি বলতে পারব না। অশোককে জিজ্ঞাসা কর। খুন জখম ভালো না লাগলে পাছে অশোককেও তোর ভালো না লাগে এই ভেবে বলছিলাম সংসারের রাহাজানির ব্যাপারগুলোকে ভালোবাসতে শেখ। তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন বল তো, সুপ্রিয়া? অশোকের সামনে তুই দাঁড়িয়ে থাকিস নাকি? এ তো ভালো কথা নয়। হেঁটে এসে তোর নিশ্চয় পা ব্যথা করছে। দাও হে অশোক, ওকে বসবার অনুমতি দাও। ভালো করে বসে একটা গল্প শোন, সুপ্রিয়া।

শুনব না গল্প।

আহা শোন না। অশোক ওকে শুনতে বলো তো।

শুনব না, শুনব না, শুনব না। হল? গল্প শুনবে—আমি কচিখুকি নই।

হেরম্ব একটা চুরুট বার করে বলল, তবে দেশলাই দে। চুরুট খাই।

অশোক অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে যেন ঘুম ভেঙে উঠে বলল, এ কী কাণ্ড! আপনারা যে রীতিমতো ঝগড়া করছেন!

হেরম্ব হেসে বলল, না। সুপ্রিয়াকে একটু রাগাচ্ছিলাম। ছেলেবেলায় গল্প বলুন, গল্প বলুন বলে এত বিরক্ত করত—কোথায় যাচ্ছিস সুপ্রিয়া?

রান্নার ব্যবস্থা একটু দেখি? বলে সুপ্রিয়া চলে গেল।

হেরম্ব বলল, চটেছে।

অশোক বলল, ঠাট্টা তামাশা একেবারে সইতে পারে না। একটু ইতস্তত করে যোগ দিল, সেন্স অফ হিউমার বড়ো কম।

হেরম্ব বলল, তাই নাকি!

ওকে আমি এত ভয় করি শুনলে আপনি হাসবেন।

ওকে কে ভয় করে না, অশোক? এমন একগুঁয়ে জেদি মেয়ে সংসারে নেই। একবার যা ধরবে শেষ না দেখে ছাড়বে না। ওকে বোধ হয় মেরে ফেলা যায়। কিন্তু জেদ ছাড়ানো যায় না।

ঠিক। অবিকল মিলে যাচ্ছে।

হেরম্ব শঙ্কিত হয়ে বলল, মিলে যাচ্ছে কী রকম?

আপনি জানেন না? বিয়ের পর একবছর ধরে চেষ্টা করেও ওকে কিছুতে এখানে আনতে পারিনি। শেষবার আনতে গেলে ওর কাকা বুঝি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, না যাস তো আমার বাড়িতে থাকতে পাবিনে। আমারও একটু অন্যায় হয়েছিল—রাগারাগি আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। যাই হোক, আমার সঙ্গে সেই যে এল তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনও ওর কাকা ওকে নিয়ে যেতে পারেননি। বলে, যাব না বলে এসেছি, যাব কেন?

প্রথমে এখানে আসতে চায়নি জানতাম। আমিও অনেক বুঝিয়েছি। কিন্তু আসবার সময় ফিরে যাবে না বলে এসেছিল এ খবর তো পাইনি।

ছেলেমানুষ রাগের মাথায় কী বলেছে না বলেছে কে খেয়াল করে রেখেছিল। ও যে ফিরে যাবে না প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল, ও ছাড়া কারুর হয়তো সে কথা এখন মনেও নেই। ওর কাকা এখনও দুঃখ করে আমাকে চিঠি লেখেন। চিঠি পড়ে কাঁদে, কিন্তু একদিনের জন্য যেতে রাজি হয় না।

হেরম্ব একটু চুপ করে থেকে বলল, আমার ধারণা ছিল, তুমিই ওকে পাঠাও না।

অশোক বিমর্ষভাবে হাসল। বলল কাকার চিঠির যে জবাব আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে, তাতে আপনি কেন, সকলেরই ও রকম ধারণা হবে। কথাটা প্রকাশ করবেন না, দাদা। ওদিকে কাকা মনে ব্যথা পাবেন, এদিকে আপনাকে বলার জন্য আমাকে টিকতে দেবে না। রাগের মাথায় মত বদলে, কাকার কাছে চললাম, তোমার কাছে আর আসব না বলে বিদায় নিলে তো বিপদেই পড়ে যাব।

অশোকের কাছে লুকিয়ে হেরম্ব গভীরভাবে চিন্তা করছিল। চারিদিক বিবেচনা করে ক্রমে ক্রমে তার ধারণা হচ্ছে, এতদিন পরে সুপ্রিয়ার সংস্পর্শে না এলেই সে ভালো করত।

সুপ্রিয়ার কোন শিক্ষাটা বাকি আছে যে ওকে আজ নতুন কিছু শেখানো সম্ভব? জীবনের স্তরে স্তরে সুপ্রিয়া নিজেকে সঞ্চয় করেছে, কারও অনুমতির অপেক্ষা রাখেনি, কারও পরামর্শ নেয়নি। ওর সঙ্গে আজ পেরে উঠবে কে?

খানিক পরে সুপ্রিয়া ফিরে এল। তাব এক হাতে ব্র্যান্ডির বোতল, অন্য হাতে কাচের গ্লাস।

তোমার ওষুধ খাবাব সময় হয়েছে। সকালে খাওনি, বড়ো ডোজ দি, কেমন?

অশোক কথা বলতে পারে না। একবার মদের বোতলটার দিকে, একবার হেরম্বের মুখের দিকে তাকায়। ভাবে কী সব কাণ্ড সুপ্রিয়ার!

হেরম্ব একটু হাসে। তার একেবারেই বিস্ময় নেই। সুপ্রিয়া যে নারী তার এই প্রমাণটা সে না দিলেই আশ্চর্য হত। এটুকু বিদ্রোহ না করলে ও তো মরে গেছে!

আমায় একটু দিস তো সুপ্রিয়া।

আপনি খাবেন? মদ কিন্তু, খেলে নেশা হয়। মদে শেষে আপনার আসক্তি জন্মে যাবে না তো?

হেরম্ব তবু হাসে।

আসক্তি জন্মালে কী হবে? আমার জন্যে মদ জোগাড় করে রাখবে কে সুপ্রিয়া? আমার তো বউ নেই।

এক মিনিটের জন্য হেরম্বকে সুপ্রিয়া ঘৃণা করল বইকী! রাগে তার মুখ লাল হয়ে গেছে।

না, আপনার বউ নেই। আপনাব বউ গলায় দড়ি দিয়েছে।

এ কথা হেরম্বর জানা ছিল যে, এ রকম অসংযম সুপ্রিয়াব জীবনে আরও একবাব যদি এসে থাকে তবে এই নিয়ে দুবার হল। এই সংখ্যাটি সুপ্রিয়ার বাকি জীবনে কখনও দুই থেকে তিনে পৌঁছবে কিনা সে বিষয়ে বাজি রাখতে হেরম্ব রাজি হবে না। তবু সুপ্রিয়াকে মারতে পারলে হেরম্ব খুশি হত।

অশোক স্তম্ভিত হয়ে বলল, এ সব তুমি কী বলছ?

কিন্তু সুপ্রিয়াব মুখে আর কথা নেই। কাচের গ্লাসে অশোককে নীরবে খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

•

রাত্রে তাবা যখন খেতে বসেছে, খুনিকে সঙ্গে করে সিপাহিরা ফিরে এল। হেরম্ব বহুক্ষণ আত্মসংবরণ করেছে। সুপ্রিয়াব মুখ ম্লান। আকাশ ঢেকে মেঘ করে এসেছে। পৃথিবী বায়ুহীন। হেরম্ব বলল, খুনিটাব সঙ্গে একটু আলাপ করতে পাবি না, অশোক? কৌতূহল হচ্ছে।

অশোক বলল, বেশ তো।

সুপ্রিয়া চেষ্টা করে বলল, খুনির সঙ্গে আলাপ করতে চান করবেন, সে জন্য তাডাতাড়ি করবার দরকাব কী! খুনি পালাবে না।

হেরম্ব হেসে বলল, না খুনি পালাবে না। কোমরে দড়ি বাঁধা হয়েছে, না অশোক?

নিশ্চয়।

সুপ্রিয়া অবাক হয়। হেরম্বের কথার মানে বুঝতে চেষ্টা করে। হঠাৎ তার মনে হয়, হেরম্ব নার্ভাস হয়ে পড়েছে, চাল দিচ্ছে, ওর কথার কোনো মানে নেই।

খেয়ে উঠে তারা বাইরের বারান্দায় গেল। একটা কালিপড়া লণ্ঠন জ্বলছে। থামে ঠেস দিয়ে ধূলিধূসরিত দেহে খুনি বসে আছে। যুদ্ধ না করে সে যে পুলিশের কাছে হার মানেনি সর্বাঙ্গে তার অনেকগুলি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কোমরে বাঁধা দড়িটা ধরে একজন কনস্টেবল উবু হয়ে বসে ছিল, হেরম্ব ও অশোকের আবির্ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, তোর নাম কিরে?

বিরসা। দুদিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে বুনো জন্তুর মতো কিন্তু বুনো জন্তু সে নয়, মানুষ। প্রশ্নের জবাব দিয়ে বিরসা আবাব ঝিমিয়ে পড়ল।

কনস্টেবল বলল, আস্নান করনে মাংতা, হুজুব।

অশোক বলল, এক বালতি পানি, ব্যস।

হেরম্বেব চিন্তাব ধাবা অন্যবকম।

এমন কাজ কবলি কেন বিরসা? বউকে তাড়িয়ে দিলেই পারতিস?

বিরসা কিছু বলল না। বউয়ের নামোল্লেখে লাল টকটকে চোখ মেলে হেরম্বের দিকে একবাব তাকিয়ে আবাব ঝিমোতে শুরু করল। অশোক শান্তভাবে বলল, ওকে ও সব বলে লাভ কী হেবম্ববাবু?

লাভ? লাভ কিছু নেই। হেরম্ব একটু ভীরু হাসি হাসল, আমি শুধু জানতে চাইছিলাম ফেথলেস ওয়াইফকে খুন করে মানুষের অনুতাপ হয় কিনা।

অশোক আরও শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, কী জানলেন?

জানলাম? অনেক কিছু জানলাম, অশোক। আমার বরাবর সন্দেহ ছিল যে, ঈর্ষার বশে যদি কোনো স্বামী স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে পারে, তাতে আর যাই হোক, স্বামীটিব চবম ভালোবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়, এই থিয়োবি হযতো সত্য নয়। আজ বুঝলাম আমাব সন্দেহ সত্যি! ওর তাকাবার রকম দেখলে, অশোক? স্ত্রীকে খুন কবে তাব দাম দেবাব ভয়ে ও একেবারে মরে গেছে! এটা ভালোবাসার লক্ষণ নয়। ও শুধু খুনি, স্রেফ খুনি; প্রেমিক আমি ওকে বলব না। না, স্ত্রীকে ও ভালোবাসত না। স্ত্রী আব একজনকে ভালোবাসে বলে যে তাকে খুন করে অথবা কষ্ট দেয়, অবহেলা করে, স্ত্রীকে সে ভালোবাসে না। তুমি বুঝতে পাব না অশোক, ভালোবাসার বাড়া-কমা নেই? ভালোবাসা ধৈর্য আর তিতিক্ষা? একটা একটানা উগ্র অনুভূতি হল ভালোবাসা, তুমি তাকে বাড়াতে পার না? স্ত্রীকে খুন কবে ফেলতে চাও কর, কিন্তু তাবপর একদিনের জন্য যদি তোমার ভালোবাসায় ভাঁটা পড়ে, মনে হয় খুন না কবলেই হত ভালো, সেইদিন জানবে, ভালোবেসে স্ত্রীকে তুমি খুন করনি, করেছিলে অন্য কাবণে। স্ত্রীকে যে ভালোবাসে সে অপেক্ষা কবে। ভাবে, এখন ও ছেলেমানুষ, আব একজনের স্বপ্ন দেখছে। দেখুক, যৌবনে ওব প্রেম পাব। ভাবে, যৌবন ওকে অন্ধ করে রেখেছে, ও তাই অতীতেব অন্ধকাবটাই দেখছে। দেখুক, যৌবন চলে গেলে আমি ওকে ভালোবাসাব। আচ্ছা অশোক, তোমার কি কখনও মনে হয় না যে প্রিয়া আর একজনকে ভালোবাসছে এই অবস্থাটাকে মৃত্যু দিয়ে অপরিবর্তনীয় কবে দেওয়া বোকামি? কষ্ট দিয়ে আব একজনেব প্রতি এই ভালোবাসাকে, এই মোহকে প্রবল আব স্থায়ী কবে দেওয়া মূর্খামি? একি স্ত্রীকে ভালো না বাসাব প্রমাণ নয়? এব চেয়ে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রেখে, তাকে সুখী করে—

সুপ্রিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হেরম্বের বক্তৃতাব ঠিক এইখানে তার ফিট হল। গোলমাল শুনে দুজনে গিয়ে দেখে সুপ্রিয়া বুকের নীচে দুটি হাত জড়ো করে উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

অশোক চেঁচিয়ে বলল, ওকে শুনিয়ে এ সব কথা কি আমায় না বললেই হত না? রাসকেল!

রাতদুপুরে সুপ্রিয়া হেরম্বের ঘরে এল।

জেগে আছেন?

জেগেই আছি সুপ্রিয়া।

বিছানায় উঠব না! শরীরটা এত দুর্বল লাগছে, দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে।

শুয়ে থাকলি না কেন, সুপ্রিয়া? কেন উঠে এলি?

সকালে চলে যাবেন, কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, হেরম্ববাবু।

হেরম্ব চুপ করে থাকে।

মাথা ঘুরে হয়তো আবার আমি ফিট হয়ে পড়ে যাব। সবাই উঠে আসবে। বলুন কিছু, বলুন যা হোক কিছু।

তুই তো চিরদিন লক্ষ্মী মেয়ে ছিলি সুপ্রিয়া। এত অবাধ্য এত দুরন্ত কবে থেকে হলি?

সুপ্রিয়াকে অন্ধকারেও দেখা যায়। কারণ, অন্ধকারে সে গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমার সত্যি দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।

হেরম্ব এবাবও চুপ করে থাকে।

আপনি আমাকে ডাকলেই পারেন। আপনি বললেই বিছানায় উঠে বসতে পারি।

হেরম্ব তবু চুপ কবে থাকে। কথা বলবার আগে সুপ্রিয়া এবার অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ।

আজ টের পেলাম, বউ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। আপনি মেয়েমানুষের সর্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই যান এড়িয়ে। কাল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে বলে বিছানায় উঠে বসতে দিচ্ছেন না। আমি দাঁড়াতে পারছি না, তবু!

হেরম্ব বলে, শোন সুপ্রিয়া। আজ তোর শরীর ভালো নেই, তাছাড়া নানা কারণে উত্তেজিত হয়ে আছিস। ধরতে গেলে আজ তুই রোগী, অসুস্থ মানুষ। আজ তুই যা চাইবি তাই কি তোকে দেওয়া যায়। তবে আর জ্বরের সময় বোগীকে কুপথ্য দিলে দোষ কি ছিল? বেশি ঝাল হয়েছিল বলে অশোককে তুই আজ মাছের ঝোল খেতে দিসনি মনে আছে? তুই আজ ঘুমিয়ে থাকবি যা সুপ্রিয়া। ছ মাসের মধ্যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে। তখন দুজনে মিলে পবামর্শ করে যা হয় করব।

আরও ছ মাস!

ছ মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

যদি দেখা না হয়? আমি যদি মরে যাই?

জীবনের দিগন্তে তাকে অস্তমিত রেখে সুপ্রিয়া মরতেও রাজি নয়? হেরম্বের দ্বিধা হয়, সংশয় হয়। জীবনকে কোনোমতেই পরিপূর্ণ করবার উপায় নেই। তবু সুপ্রিয়াকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে ফেললে হয়তো চিরদিনের জন্য জীবন এত বেশি অপূর্ণ থাকবে যে, একদিন আপশোশ করতে হবে হেরম্বেব এই আশঙ্কা কমে আসে। তার মনে হয়, আজ একদিনে সুপ্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে নিজের যে নব নব পরিচয় দিয়েছে হয়তো তা বহু সংযম, সাবধানতা ও কার্পণ্যের বাধা ঠেলেই বাইরে এসেছে। হয়তো পাঁচবছর ধরে সুপ্রিয়া যে ঐশ্বর্য সংগ্রহ করেছে তা অতুলনীয়, কল্পনাতীত। কিন্তু তবু হেরম্ব সাহস পায় নাই। নিজেকে দান করবার চেয়ে কঠিন কাজ জগতে কী আছে? অত বড়ো দাতা হবার সাহস হেরম্ব সহসা সংগ্রহ করে উঠতে পারে না।

বলে, মরবি কেন, সুপ্রিয়া? লক্ষ্মী মেয়ের মতো তুই বেঁচে থাকবি।

সুপ্রিয়া চলে গেলে হেরম্ব শয্যা ত্যাগ করে। দরজা খুলে বাইরে যায়। থানার পাহারাদার বলে—কিধার যাতা বাবু?

ঘুমনে যাতা। নিদ হোতা নেহি।

আকাশ মেঘে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনো ঘাসে-ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়তো মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় ভাগ

রাতের কবিতা

প্রেমে বন্ধু পঞ্জরের বাধা,
আলোর আমার মাঝে মাটির আড়াল,
রাত্রি মোর ছায়া পৃথিবীর।
বাষ্পে যাব আকাশেরে সাধা,
সাহাবার বালি যার ঊষর কপাল ;
এ কলঙ্ক সে মৃতা সাকির।

শান্ত রাত্রি নীহারিকা-লোকে,
বন্দি রাত্রি মোর বুকে উতল অধীর—
অনুদার সংকীর্ণ আকাশ।
মৃত্যু মুক্তি দেয় না যাহাকে
প্রেম তার মহামুক্তি। —নূতন শরীর
মুক্তি নয়, মুক্তির আভাষ।

হেরম্ব বলল, এতকাল পরে এইখানে সমুদ্রের ধারে আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে, এ কথা কল্পনাও করতে পারি না। বছর বারো আগে মধুপুরে আপনার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল, মনে আছে?

অনাথ বলল, আছে।

সেবার দেখা হয়ে না থাকলে আপনাকে হয়তো আজ চিনতেই পারতাম না। সত্যবাবুর বাড়ি মাস্টারি করতে করতে হঠাৎ আপনি যেদিন চলে গেলেন, আমার বয়স বারোর বেশি নয়। তারপর কুড়ি একুশ বছর কেটে গেছে। আপনার চেহারা ভোলবার মতো নয়, তবু মাঝখানে একবার দেখা হয়ে না থাকলে আপনাকে হয়তো আজ চিনতে না পেরে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।

অনাথ একটু নিস্তেজ হাসি হাসল।

আমাকে চিনেও চিনতে না পারাই তোমার উচিত ছিল হেরম্ব।

আমার মধ্যে ও সব বাহুল্য নেই মাস্টারমশায়। সত্যবাবুর মেয়ে কেমন আছেন?

ভালোই আছেন।

হেরম্ব অবিলম্বে আগ্রহ প্রকাশ করে বলল, চলুন দেখা করে আসি।

অনাথ ইতস্তত করে বলল, দেখা করে খুশি হবে না হেরম্ব।

কেন?

মালতী একটু বদলে গেছে।—অনাথ পুনরায় তার স্তিমিত হাসি হাসল।

হেরম্ব বলল, তাতে আশ্চর্যের কী আছে? এতকাল কেটে গেছে উনি একটু বদলাবেন বইকী! আপনি হয়তো জানেন না, ছেলেবেলায় আপনার আর সত্যবাবুর মেয়ের কথা যে কত ভেবেছি তার ঠিক নেই। আপনাদের মনে হত রূপকথার রহস্যময় মানুষ।

অনাথ বলল, সেটা বিচিত্র নয়। ও সব ব্যাপারে ছোটো ছেলেদের মনেই বেশি আঘাত লাগে। তারা খানিকটা শুনতে পায়, খানিকটা বড়োরা তাদের কাছ থেকে চেপে রাখে। তার ফলে ছেলেরা কল্পনা আরম্ভ করে দেয়। তাদের জীবনে এর প্রভাব কাজ করে। আচ্ছা, তুমি কখনও ঘৃণা করনি আমাদের?

না। সংসারের সাধারণ নিয়মে আপনাদের কখনও বিচার করতে পারিনি। মধুপুরে আপনাদের সঙ্গে যখন দেখা হল, আমি ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। হয়তো ছেলেবেলা থেকেই আপনাকে জানবার বুঝবার জন্য আমার মনে প্রবল আগ্রহ ছিল। এখনও যে নেই সে কথা জোর করে বলতে পারব না। আমার মনে যত লোকের প্রভাব পড়েছে, বিশ বছর অদৃশ্য থেকেও আপনি তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে আছেন।

অনাথ নিশ্বাস ফেলে বলল, ভগবান! পৃথিবীতে মানুষ একা বেঁচে থাকতে আসেনি—সকলের এটা যদি সব সময় খেয়াল থাকত! মালতীকে না দেখলে তোমার চলবে না হেরম্ব?

হেরম্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, আপত্তি করছেন কেন?

অনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বলল, দুর্বলতা। মনের দুর্বলতা হেরম্ব, চলো।

শহরের নির্জন উপকণ্ঠে সাদা বাড়িটি পার হয়ে হেরম্বের মনে হল, এইখানে শহর শেষ হয়েছে। অনেকক্ষণ সমুদ্রের অর্থহীন অবিরাম কলরব শুনে হেরম্বের মস্তিষ্ক একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে সমুদ্রের ডাক মৃদুভাবে শোনা যায়। হেরম্বের নিজেকে হঠাৎ ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল। অনাথ গভীর চিন্তামগ্ন অন্যমনস্ক অবস্থায় পথ চলছে। হেরম্ব তাকে প্রশ্ন করে জবাব পায়নি একটারও। বেলা আর বেশি অবশিষ্ট নেই। পথের দুপাশে খোলা মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে রাখালেরা গোরুগুলোকে একত্র করছে। পথ সোজা এগিয়ে গিয়েছে সামনে।

আরও খানিকদূর গিয়ে হেরম্ব ভাঙা প্রাচীরে ঘেরা বাগানটি দেখতে পেল। সামনে পৌঁছে হঠাৎ সচেতন হয়ে অনাথ বলল, এই বাড়ি।

কোথায় বাড়ি? বাড়ি হেরম্ব দেখতে পেল না। বাগানের শেষের দিকে গাছপালায় প্রায় আড়াল করা ছোটো একটি মন্দির মাত্র তার চোখে পড়ল। বাগানে গোলাপ গন্ধরাজ ফোটে কিনা বাইরে থেকে অনুমান করার উপায় ছিল না। যে গাছে হয়তো ফুল ফোটে কিন্তু গন্ধ দেয় না, যে গাছের ফল অথবা পাতা মানুষে খায়, তাই দিয়ে বাগানটিকে ঠেসে ভর্তি করা হয়েছে। সমস্ত বাগান জুড়ে গাছের নিবিড় ছায়া আর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।

কাঠের ভগ্নপ্রায় গেটটি খুলে অনাথ বাগানে প্রবেশ কবল। তাকে অনুসরণ করে বাগানেব মধ্যে প্রথম পদক্ষেপেব সঙ্গে হেরম্বের মনে হল এ যেন একটা পবিবর্তন, একটা অকস্মাৎ সংগঠিত বৈচিত্র্য। মানুষের অশান্ত কলরব ভরা পৃথিবীতে, ভাঙা প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে এমন সংক্ষিপ্ত একটি স্থানে এই মৌলিক শান্ত আবহাওয়াটি অক্ষুণ্ণ থাকা হেরম্বের কাছে বিস্ময়ের মতো প্রতিভাত হল।

বাগানেব সরু পথটি ধরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গাছের পর্দা পাব হয়ে তারা দাঁড়াল। এখানে খানিকটা স্থান একেবারে ফাঁকা! সামনে সেই পথ থেকে দেখা যায় মন্দির। মন্দিরেব দক্ষিণে অল্প তফাতে পুরানো একটি ইটের বাড়ি। মন্দিব আব বাড়ি দুই-ই নোনা-ধবা।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। দবজার সামনে ফাটলধরা চত্বরে গরদের শাড়ি-পবা স্থূলাঙ্গী একটি রমণী বসে ছিল। যৌবন তার যাব যাব করছে। কিন্তু গায়েব বং অসাধারণ উজ্জ্বল। চেহারা জমকালো, গম্ভীব।

কাকে আনলে গো? অতিথি নাকি?

শ্লেষ্মাজড়িত চাপা গলা। হেরম্ব একটু অভিভূত হয়ে পড়ল।

অনাথ বলল, চিনতে পারবে মালতী। ক কাতায় তোমাদেব বাড়ির পাশে থাকত। নাম হেরম্ব। মধুপুরেও একবার দেখেছিল।

মালতী বলল, চিনেছি। তা ওকে আবার ধরে আনবার কী দরকার ছিল! যাক এনেছ যখন, কী আর হবে? বোসো বাছা। আহা, সিঁড়িতেই বোসো না, মন্দিবের সিঁড়ি পবিত্র। কাপড় ময়লা হবার ভয় নেই, দুবেলা সিঁড়ি ধোয়া হচ্ছে। . তুমি বুঝি গিয়েছিলে সমুদ্রে? একদিন সমুদ্রে না গেলে নয়। যদি গেলেই, বলে কি যেতে নেই?

অনাথ বলল, আসন থেকে উঠেই চলে গিয়েছিলাম মালতী। তোমাকে বলে যাওয়ার কথা মনে ছিল না!

মালতী বলল, তবু ভালো, কথার একটা জবাব পেলাম। শহর হয়ে এলে, আমার জিনিসটা আনলে না যে? কাল থেকে পইপই করে বলছি।

অনাথ বলল, তোমাকে তো কবে বলে দিয়েছি ও সব আমি এনে দেব না।

মালতী উষ্ণ হয়ে বলল, কেন, দেবে না কেন? তোমার কী এল গেল।

গোল্লায় যেতে চাও তুমি নিজে নিজেই যাও। আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত নই।

কেতার্থ করলে! আমাকে গোল্লায় এনেছিল কে বের করে? পরের কাছে অপমান করা হচ্ছে!

মালতী হঠাৎ হেসে উঠল—তুমি না এনে দিলেও আমার এনে দেবার লোক আছে, তা মনে রেখো।—চললে কোথায় শুনি?

স্নান করব— সংক্ষেপে এই জবাব দিয়ে অনাথ বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা কবল, শহর থেকে কী জিনিস আনার কথা ছিল?

আমার একটা ওষুধ। বলে মালতী গম্ভীর হয়ে গেল। তার গাম্ভীর্য হেরম্বকে বিস্মিত করতে পারল না। সে টের পেয়েছিল মালতীর উচ্চহাসি এবং মুখভার কোনোটাই সত্য অথবা স্থায়ী নয়। যে কোনো মুহূর্তে একটা অন্তর্ধান করে আর একটা দেখা দিতে পারে। এর প্রমাণ দেবার জন্যই যেন মালতীর মুখে হঠাৎ হাসি দেখা গেল, কাণ্ড দেখলে লোকটার? তোমায় ডেকে এনে স্নান করতে চলে গেল। জ্বালিয়ে মারে। জানলে? জ্বালিয়ে মারে! ...তুমি কিন্তু অনেক বড়ো হয়ে গেছ।

আশ্চর্য নয়। বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে।

তাই বটে, আমি কি আজকে বাড়ি ছেড়েছি! কতযুগ হয়ে গেল। দাঁড়াও, কতবছর হল যেন! কুড়ি। ষোলো বছর বয়সে বেরিয়ে এসেছিলাম, আমার তবে ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। আঃ কপাল, বুড়ি হয়ে পড়লাম যে! কাণ্ড দ্যাখো!

হেরম্বকে আগাগোড়া সে ভালো করে দেখল।

তোমায় তো বেশ ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে? সাতাশ আটাশের বেশি বয়স মনে হয় না। তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে গো! তখন হেসে না মরে যদি রাজি হয়ে যেতাম! আমার তাহলে আজ দিব্যি একটি কচি সুপুরুষ বর থাকত।

হেরম্ব হেসে বলল, মাস্টারমশায় তখন যে রকম সুপুরুষ ছিলেন—

মনে আছে? মালতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, বলো তো, সেই মানুষকে এখন দেখলে চেনা যায়? আমার বরং এখনও কিছু কিছু রূপ আছে। দেখে তুমি মুগ্ধ হচ্ছ না?

না। ছেলেবেলা মুগ্ধ করে যে কষ্টটাই দিয়েছেন—

তাই বলে এখন মুখের ওপর মুগ্ধ হচ্ছ না বলে প্রতিশোধ নেবে? তুমি তো লোক বড়ো ভয়ানক দেখতে পাই। বিয়ে করেছ?

করেছিলাম। বউটি স্বর্গে গেছে।

ছেলে-মেয়ে?

একটা মেয়ে আছে, দু বছরের। আছে বলছি এই জন্য যে পনেরো দিন আগে ছিল দেখে এসেছি। এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকলে নেই।

বালাই যাট, মরবে কেন! এখন তুমি কী করছ?

কলেজে মাস্টারি করি।

বউয়ের জন্য বিবাগি হয়ে বাড়ি-ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়নি তো?

না। সারাবছর ছেলেদের শেলি কিট্‌স্ পড়িয়ে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়ি মালতীবউদি। গরমের ছুটিতে তাই একবার করে বেড়াতে বেরুনো অভ্যেস করেছি। এবার গিয়েছিলাম রাঁচি। সেখান থেকে বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতে এসেছি এখানে।

বন্ধু কে?

শঙ্কর সেন, ডেপুটি।

বেশ লোক। বউটি ভারী ভক্তিমতী। এই মন্দির সংস্কারের জন্য একশো টাকা দান করেছে।

মালতী ভাবতে ভাবতে এই কথা বলছিল, অন্যমনস্কের মতো। হঠাৎ সে একটু অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখানে কতদিন থাকবে?

দশ পনেরো দিন। ঠিক নেই।

ভালোই হল।

হেরম্ব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কীসের ভালো হল?

মালতী হাসল।

তোমাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে। তাই বললাম। ছেলেদের তুমি কী পড়াও বললে?

হেরম্ব হেসে বলল, কবিতা পড়াই। ভালো ভালো ইংরেজ কবির বাছা বাছা খারাপ কবিতা। বেঁচে থেকে সুখ নেই মালতীবউদি।

আকস্মিক দার্শনিক মন্তব্যে মালতী হাসল। গলার শ্লেষ্মা সাফ করে বলল, সুখ? নাইবা রইল সুখ! সুখ দিয়ে কি হবে? সুখ তো শুটকি মাছ! জিভকে ছোটোলোক না করলে স্বাদ মেলে না। সুখ স্থান জুড়ে নেই, প্রেম দিয়ে ভরে নাও, আনন্দ দিয়ে পূর্ণ কর। সুবিধা কত! মদ নেই যদি, মদের নেশা সুধায় মেটাও। ব্যস, আর কী চাই?

হেরম্ব মালতীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন সুধা।

আমি দেব? মালতী জোরে হেসে উঠল, আমার কী আর সে বয়স আছে!

তবে একটু জল দিন। তেষ্টা পেয়েছে।

তা বরং দিতে পারি। বলে মালতী ডাকল, আনন্দ, আনন্দ! একবার বাইরে শুনে যাও।

আনন্দ কে? হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল।

আমার অনন্ত আনন্দ! মনে নেই? মধুপুরে দেখেছিলে। চুমু খেয়ে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলে।

ওঃ আপনার সেই মেয়ে। তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

ভুলে গিয়েছিলে? তুমি অবাক মানুষ হেরম্ব! সে কি আমার ভুলবার মতো মেয়ে?

হেরম্ব বলল, ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েদের কথা আমার মনে থাকে না মালতী বউদি। আপনার মেয়ে তখন খুব ছোটোই ছিল নিশ্চয়?

মালতী স্বীকার করে বলল, নিশ্চয় ছোটো ছিল। ছোটো না থাকলে চুমু খেয়ে তাকে কাঁদাতে কী করে তুমি! তাছাড়া, তখন ছোটো না থাকলে মেয়ে তো আমার অ্যাদ্দিনে বুড়ি হয়ে যেত!

তারপর এল আনন্দ।

আনন্দকে দেখে হেরম্ব হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। আনন্দ অপ্সরী নয়, বিদ্যাধরী নয়, তিলোত্তমা নয়, মোহিনী নয়। তাকে চোখে দেখেই মুগ্ধ হওয়া যায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু হেরম্বের কথা আলাদা। এই মালতীকে নয়, সত্যবাবুর মেয়ে মালতীকে সে আজও ভুলতে পারেনি। এই স্মৃতির সঙ্গে তার মনে বারো বছর বয়সের খানিকটা ছেলেমানুষি, খানিকটা কাঁচা ভাবপ্রবণতা আজও আটকে রয়ে গিয়েছে। আনন্দকে দেখে তার মনে হল সেই মালতীই যেন বিশ্ব-শিল্পীর কারখানা থেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়ে, গত বিশ বছর ধরে প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে, বোবা পশু ও পাখির মধ্যে, ভোরের শিশির আর সন্ধ্যাতারার মধ্যে রূপ, রেখা ও আলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা অর্জন করে তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শীতকালের ঝরা শুকনো পাতাকে হঠাৎ একসময় বসন্তের বাতাস এসে যে ভাবে নাড়া দিয়ে যায়, আনন্দের আবির্ভাবও হেরম্বের জীর্ণ পুরাতন মনকে তেমনিভাবে নাড়া দিয়ে দিল।

বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে সে আনন্দকে দেখতে লাগল। তার মনের উপর দিয়ে কুড়ি বছর ধরে যে সময়ের স্রোত বয়ে গেছে, তাই যেন কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে এসেছে।

এই উচ্ছ্বসিত আবেগ হেরম্বের মনে প্রশ্রয় পায়। আবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠলেই সে যেন তৃপ্তি পেত। তার বন্দী কল্পনা দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ যেন আজ মুক্তি পায়। তার সবগুলি ইন্দ্রিয় অসহ্য উত্তেজনায় অসংযত প্রাণ সঞ্চয় করে। চারিদিকের তরুলতা তার কাছে অবিলম্বে জীবন্ত হয়ে ওঠে। শেষ অপরাহ্ণের রঙিন সূর্যালোককে তার মনে হয় চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া রঙিন স্পন্দমান জীবন।

বাড়ির দরজা থেকে কাছে এসে দাঁড়ানো পর্যন্ত আনন্দ হেরম্বকে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে দেখেছিল। সে এসে দাঁড়ানো মাত্র হেরম্ব তার চোখের দিকে তাকাল। কৌতূহল অন্তর্হিত হয়ে আনন্দের চোখে তখন ঘনিয়ে এল ভাব ও ভয়। হেরম্ব এটা লক্ষ করেছে। সে জানে এই ভয় ভীরুতার লক্ষণ নয়, মোহের পরিচয়। আনন্দের চোখে যে প্রশ্ন ছিল, হেরম্বের নির্বাক নিষ্ক্রিয় জবাবটা তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

সুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এসে হেরম্বের যা হয়নি, এখন তাই হল। নিজের কাছে নিজের মূল্য তার অসম্ভব বেড়ে গেল। সে জটিল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়। জীবনে সে এত বেশি পাক খেয়েছে যে মাথা তার সর্বদাই ঘোবে। আনন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আনন্দ আজ তাকে আর তার দৃষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, বিচলিত হয়ে তাকে ছেলেমানুষের মতো উল্লসিত করে দিয়েছে। তাব দেহমন হঠাৎ হালকা হয়ে গিয়েছে। তার মনে ভাষার মতো স্পষ্ট হয়ে এই প্রার্থনা জেগে উঠেছে, আনন্দ যেন চলে যাবার আগে আর একবার তার চোখেব দিকে এমনি ভাবে তাকিয়ে যায়।

ডাকলে কেন মা? আনন্দ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

এঁকে এক গেলাস জল এনে দে।

আনন্দ জল আনতে চলে গেলে হেবম্ব যেন অসুস্থ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। অনেকদিন আগে অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে একবার ক্লোরোফর্ম করা হয়েছিল। সেই সময়কার অবর্ণনীয় অনুভূতি যেন ফিরে এসেছে।

মালতী নিচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, কী বকম দেখলে আমার আনন্দকে?

বেশ, মালতী বউদি।

আঠারো বছর আগে ওকে কোলে পেয়েছিলাম হেরম্ব। জীবনে আমার দুটি সুদিন এসেছে। প্রথম, তোমার মাস্টারমশায় যেদিন দাদাকে পড়াতে এলেন, অন্দরের জানালায় অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আমি লোকটাকে দেখলাম, সেদিন। আর যেদিন আনন্দ কোলে এল। প্রসববেদনা কেমন জান?

হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, জানি।

জানো! পাগল নাকি, তুমি কী করে জানবে।

আমি এককালে কবিতা লিখতাম যে মালতী বউদি।

কবিতা লেখা আর প্রসববেদনা কী এক? মাথা খারাপ না হলে কেউ এমন কথা বলে! তোমাতে আর ভগবান লক্ষ্মীছাড়াতে তাহলে আর কোনো প্রভেদ থাকত না বাপ। আমরা প্রসব করি ভগবানের কবিতাকে, তার তুলনায় তোমাদের কবিতা ইয়ার্কি ছাড়া আর কি! যাই হোক, আনন্দকে দেখে আমি সেদিন প্রসববেদনা ভুলে গেলাম হেরম্ব।

সব মা-ই তাই যায়, মালতী বউদি।

মালতী রাগ করে বলল, তুমি বড়ো রূঢ় কথা বলো হেরম্ব!

আনন্দ জল আনলে গেলাস হাতে নিয়ে হেরম্ব বলল, বোসো আনন্দ।

আনন্দ অনুমতির জন্য মালতীর মুখের দিকে তাকাল।

মালতী বলল, বোস লো ছুঁড়ি, বোস। এ ঘরের লোক। কেমন ঘরের লোক জানিস? আমার ছেলেবেলার ভালোবাসার লোক। ওর যখন বারো বছর বয়স আমাকে বিয়ে করার জন্য খেপে উঠেছিল। রোজ সন্দেশ-টন্দেশ খাইয়ে কত কষ্টে যে ভুলিয়ে রাখতাম, সে কেবল আমিই জানি।

হাসিস ক্যানো লো! একি হাসির কথা? বিশ বছর ধরে খুঁজে তোর বাপকে খুন করতে এসেছে, তা জানিস?

আনন্দ বলল, কী সব বলছ মা? এর মধ্যেই—

এর মধ্যেই কী লো? বল না, এর মধ্যেই কী বলছিস?

কিছু না মা। চুপ করো।

মালতী কিন্তু ছাড়ল না।

এর মধ্যেই গিলেছি নাকি আজ, এই তো বলছিলি? না গিলিনি! কারণ হল সাধনে বসার জন্য, যখন তখন আমি ও সব গিলি না বাপু।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, কী মালতী বউদি? মদ?

মদ নয়। কারণ। ধর্মের জন্য একটু খাওয়া, এই আর কী।

আনন্দ বলল, মদ খাওয়া হল ধর্ম!

মালতী বলল, নয়? এবার বাবা এলে শুধোস। মালতী হেরম্বের দিকে তাকাল, বাবার আদেশে একটু একটু খাই হেরম্ব। প্রথমে হয়েছিলাম বৈষ্ণব—ভক্তিমার্গ পোষাল না। এবার তাই জোরালো সাধনা ধরেছি। বাবা বলেন—

বাবা কে?

আমার গুরুদেব। শ্রীমৎ স্বামী মশালবাবা। —নাম শোননি? দিবারাত্রি মশাল জ্বেলে সাধন করেন। মালতী যুক্তকর কপালে ঠেকাল।

আনন্দ বলল, কারণ খাওয়া যদি ধর্ম মা, আমি সেদিন একটু খেতে চাইলাম বলে মারতে উঠেছিলে কেন? কাল থেকে আমিও পেট ভরে ধর্ম করব মা।

হেরম্ব ভাবে : আনন্দ এ কথা বলল কেন? সে কারণ খায় না আমাকে এ কথা শোনাবার জন্যে?

মালতী বলল, করেই দেখিস!

তুমি কর কেন?

আমার ধর্ম করবার বয়স হয়েছে। তুই একরত্তি মেয়ে, তোর ধর্ম আলাদা। আমার মতো বয়স হলে তখন তুই এ সব ধর্ম করবি, এখন কী? যে বয়সের যা। তুই নাচিস, আমি নাচি?

আনন্দ হেসে বলল, নেচো না, নেচো। নাচতে তো বাপু একদিন! এখনও এক একদিন বেশি করে কারণ খেলে যে নাচটাই নাচো—

তোর মতো বেযাদব মেয়ে সংসারে নেই আনন্দ!

মালতীর পরিবর্তন হেরম্ব বুঝতে পারছিল না। সে মোটা হয়েছে, তার কণ্ঠ কর্কশ, তার কথায় ব্যবহারে কেমন একটা নিলাজ রুক্ষতার ভাব। আনন্দের মধ্যস্থতা না থাকলে মালতীর মধ্যে সত্যবাবুর মেয়ের কোনো চিহ্নই খুঁজে না পেয়ে হেরম্ব হয়তো আজ আরও একটু বুড়ো, আরও একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে বাড়ি ফিরত। কুড়ি বছরের পুরোনো গৃহত্যাগের ব্যাপারটার উল্লেখ মালতী নিজে থেকেই করেছিল, দ্বিধা করেনি, লজ্জা পায়নি। এটা সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে দশ বছরের মধ্যে একদিনের লজ্জাতুরা নববধূ যদি সকলের সামনে স্বামীকে বাজারের ফর্দ দিতে পারে, মালতীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা কুড়ি বছর পরে তুচ্ছ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু তার পরিচয় পাবার পরেও কারণ না এনে দেবার জন্য অনাথকে সে তো অনুযোগ পর্যন্ত করেছিল! আনন্দের সঙ্গে তর্ক করে মদকে কারণ নাম দিয়ে ধর্মের নামে নিজেকে সমর্থন করতেও তার বাধেনি। মালতী এ ভাবে বদলে গিয়েছে কেন? তার ছেলেবেলার রূপকথার অনাথ আজও তেমনি আছে, মালতীকে এ ভাবে বদলে দিল কীসে?

আনন্দ আর একবারও হেরম্বের দিকে তাকায়নি। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাকে না দেখে হেরম্বের উপায় ছিল না। ওর সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা তার মনে এসেছে যে মালতীর পরিবর্তন যদি বেশি দিনের হয় আনন্দের চরিত্রে হয়তো ছাপ পড়েছে। আনন্দের কথা শুনে, হাসি দেখে, মালতীর দেহ দিয়ে নিজেকে অর্ধেক আড়াল করে ওর বসবার ভঙ্গি দেখে মনে হয় বটে যে, সত্যবাবুর মেয়ের মধ্যে যেটুকু অপূর্ব ছিল, যতখানি গুণ ছিল, শুধু সেইটুকুই সে নকল করেছে; মালতীর নিজের অর্জিত অমার্জিত রুক্ষতা তাকে স্পর্শ করেনি। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও ভোলা যায় না যে, যে আবহাওয়া মালতীকে এমন করেছে আনন্দকে তা একেবারে রেহাই দিয়েছে।

মালতীর উপর হেরম্বের রাগ হতে থাকে। এমন মেয়ে পেয়েও তার মা হয়ে থাকতে না পারার অপরাধের মার্জনা নেই। মালতী আর যাই করে থাক হেরম্ব বিনা বিচারে তাকে ক্ষমা করতে রাজি আছে, মদ খেয়ে ইতিমধ্যে সে যদি নরহত্যাও করে থাকে সে চোখ কান বুজে তা সমর্থন করবে। কিন্তু মা হয়ে আনন্দকে সে যদি মাটি করে দিয়ে থাকে, হেরম্ব কোনোদিন তাকে মার্জনা করবে না।

খানিক পরে অনাথ বেরিয়ে এল। স্নান সমাপ্ত করে এসেছে।

আমার আসন কোথায় রেখেছ মালতী?

মালতী বলল, জানি না। হ্যাঁগা, স্নান যদি করলে আরতিটা আজ তুমিই করে ফেল না? বড়ো আলসেমি লাগছে আমার।

অনাথ বলল, আমি এখুনি আসনে বসব। আরতির জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।

একজনকে বাড়িতে ডেকে এনে এমন নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারলে আসনে বসব? কে তোমার অতিথিকে আদর করবে শুনি? স্বার্থপর আর কাকে বলে! সন্ধ্যা হতেই বা আর দেরি কত, অ্যাঁ?

অনাথ তার কথা কানে তুলল না। এবার আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, আমার আসন কে সরিয়েছে আনন্দ?

আমি তো জানিনে বাবা?

অনাথ শান্তভাবেই মালতীকে বলল, আসনটা কোথায় লুকিয়েছ বার করে দাও মালতী। আসন কখনও সরাতে নেই এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।

মালতী বলল, তুমি অমন কর কেন বলো তো? বোসো না এখানে, একটু গল্পগুজব করো। এতকাল পরে হেরম্ব এসেছে, দুদণ্ড বসে কথা না কইলে অপমান করা হবে না?

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলতে গেল, আমি—

কিন্তু মালতী তাকে বাধা দিয়ে বলল, আমাদের ঘরোয়া কথায় তুমি কথা কয়ো না হেরম্ব। হেরম্ব আহত ও আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল। অনাথ তার বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, আমি অপমান করব কল্পনা করে তুমি নিজেই যে অপমান করে বসলে মালতী! কিছু মনে কোরো না হেরম্ব। ওর কথাবার্তা আজকাল এ রকমই দাঁড়িয়েছে।

হেরম্ব বলল, মনে করার কী আছে?

মালতীর মুখ দেখে হেরম্বের মনে হল তাকে সমালোচনা করে এ ভাবে অতিথিকে মান না দিলেই অনাথ ভালো করত।

অনাথ বলল, আমার চাদরটা কোথায় রে আনন্দ?

আলনায় আছে—মার ঘরে। এনে দেব?

থাক আমিই নিচ্ছি গিয়ে। ...তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ হল না বলে অনাদব মনে করে নিয়ো না হেরম্ব। আমার মনটা আজ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। আসনে না বসলে স্বস্তি পাব না।

হেরম্ব বলল, তা হোক মাস্টারমশায়! আর একদিন কথাবার্তা হবে।

মালতী মুখ গোঁজ করে বসেছিল। এইবার সে জিজ্ঞাসা করল, চাদর দিয়ে হবে কী?

অনাথ বলল, পেতে আসন করব। আসনটা লুকিয়ে তুমি ভালোই করেছ মালতী। দশ বছর ধরে ব্যবহার করে আসনটাতে কেমন একটু মায়া বসে গিয়েছে। একটা জড় বস্তুকে মায়া করা থেকে তোমার দয়াতে উদ্ধার পেলাম।

মালতী নিশ্বাস ফেলে বলল, যা আনন্দ, আমার বিছানার তলা থেকে আসনটা বার করে দিগে যা।

অনাথ বলল, থাক, কাজ নেই. ও আসনে আমি আর বসব না।

মালতী ক্রোধে আবক্ত মুখ তুলে বলল, তুমি মানুষ নও। জানলে? মানুষ তুমি নও। তুমি ডাকাত! তুমি ছোটোলোক।

রেগো না মালতী। রাগতে নেই।

রাগতে নেই, রাগতে নেই! আমাব খাবে পরবে, আমাকেই অপমান কববে, —রাগতে নেই!

মাথা গবম কব। মহাপাপ মালতী—মৃদুস্বরে এই কথা বলে অনাথ বাড়ির মধ্যে চলে গেল।

খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে থেকে মালতী হঠাৎ তাব শব্দিত হাসি হেসে বলল, দেখলে হেরম্ব? লোকটা কেমন পাগল দেখলে?

হেবম্ব অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, আমি কী বলব বলুন?

আনন্দ বলল, বাইরেব লোকেব সামনেও ঝগড়া করে ছাড়লে তো মা?

মালতী বলল, হেবম্ব বাইরের লোক নয়।

হেরম্ব এ কথায় সায় দিয়ে বলল, না। আমি বাইবের লোক নই আনন্দ।

আনন্দ বলল, তা জানি। বাইরের লোকের সঙ্গে মা ঠাট্টা-তামাশা কবে না। প্রথম থেকে মা আপনার সঙ্গে যে রকম পরিহাস কবছিল তাতে বাইবের লোক হওয়া দূরে থাক, আপনি ঘরের লোকের চেয়ে বেশি প্রমাণ হয়ে গেছেন।

মালতী বলল, ঘবেব লোকের সঙ্গে আমি ঠাট্টা-তামাশা কবি নারে, আনন্দ? তামাশা করার কত লোক ঘরে! একটা কথা কওয়ার লোক আছে আমার?

আনন্দ হাতের তালু দিয়ে আস্তে আস্তে তাব পিঠ ঘষে দিতে দিতে বলল, ঘরে নাই বা লোক রইল মা, তোমার কাছে বাইরের কত লোক আসে, সমস্ত সকালটা তুমি তাদের সঙ্গে কথা কও।

পিঠ থেকে মেয়ের হাত সামনে এনে মালতী বলল, তাবা হল ভক্ত লক্ষ্মীছাড়াব দল। ওদের ঠকাতে ঠকাতেই প্রাণটা আমার বেরিয়ে গেল না! খাচ্ছিস দাচ্ছিস, মনের সুখে আছিস, লোককে ঠকিয়ে পয়সা করতে কেমন লাগে তুই তার কী বুঝবি! সারা সকালটা গম্ভীর হয়ে বসে বসে শুধু ভাব, কী করে কার কাছে দুটো পয়সা বেশি আদায় হবে। আমি মেয়েমানুষ, আমার কি ও সব পোষায়! তোর বাবা একটা পয়সা রোজগার করে? একবার ভাবে দিন গেলে পোড়া পেটে পিন্ডি কোথা থেকে আসে? তুই ভাবিস?

আনন্দ অনুযোগ দিয়ে বলল, ওঁর কাছে তুমি সব প্রকাশ করে দিচ্ছ মা!

এই অভিযোগে মালতী কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বলল, তাতে কী, যা করছি জেনে শুনেই করছি। হেরম্ব লুকোচুরি ভালোবাসে না!

এই ব্যাখ্যা অথবা কৈফিয়ত হেরম্বের মনে লাগল। সে বুঝতে পারল তার মতামতকে অগ্রাহ্য করে বলে নয়, শেষপর্যন্ত তার কাছে কোনো কথাই লুকানো থাকবে না বলেই মালতী কোনো বিষয়ে লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করছে না। নিজের এবং নিজেদের সঠিক পরিচয় আগেই তাকে জানিয়ে রাখছে।

এর মধ্যে আরও একটা বড়ো কথা ছিল, হেরম্বকে যা পুলকিত করে দিল। মালতী আশা করে আজই শেষ নয়, সে আসা-যাওয়া বজায় রাখবে। ভূমিকাতেই তার সামনে নিজের সব দুর্বলতা ধরে দিয়ে মালতী শুধু এই সম্ভাবনাই রহিত করে দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে তার যেন আবিষ্কার করার কিছু না থাকে। হেরম্বের মনে হল এ যেন একটা আশ্বাস, একটা কাম্য ভবিষ্যৎ। সে বারবার আসবে এবং তাদের সঙ্গে এতদূর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে যে মালতীর খাপছাড়া জীবনের সমস্ত দীনতা ও অসঙ্গতি সে জেনে ফেলবে, মালতীর এই প্রত্যাশা নানা সম্ভাবনায় হেরম্বের কাছে বিচিত্র ও মনোহর হয়ে উঠল। মালতীর এই মৌলিক আমন্ত্রণে তার হৃদয় কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্ল হয়ে রইল।

এ কথা মিথ্যা নয় মালতী বউদি। আমার কাছে কিছুই গোপন করবার দরকার নেই।

গোপন করার কিছু নেই-ও হেরম্ব।

কী থাকবে?

তাই বলছি। কিছুই নেই।

একটা যেন চুক্তি হয়ে গেল। মালতী স্বীকার কবল সে কারণ পান করে, লোকঠকানো পয়সায় জীবিকা নির্বাহ করে। হেরম্ব ঘোষণা করল, তাতে কিছু এসে যায় না।

জীবন মালতীকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে, হয়তো সে শিক্ষা হৃদয়সংক্রান্ত নয়। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সন্দেহ কবা চলে না।

কিন্তু আনন্দ?

আনন্দের হৃদয় কি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও মার্জনা পায়নি? ওর জমকালো বাইরেব রূপ তো ওব হৃদয়কে ছাপিয়ে নেই?—হেরম্ব এই কথা ভাবে। মালতী যে মেয়েকে কুশিক্ষা দেবে তার এ আশঙ্কা কমে এসেছিল। সে ভেবে দেখেছে, মালতী ও আনন্দের জীবন এক নয়। যে সব কাবণ মালতীকে ভেঙেছে, আনন্দের জীবনে তার অস্তিত্ব হয়তো নেই। তাছাড়া ওদিকে আছে অনাথ। মেয়েরা মাব চেয়ে পিতাকেই নকল করে বেশি, পিতাব শিক্ষাই মেয়েদের জীবনে বেশি কার্যকর হয়। অনাথেব প্রভাব আনন্দের জীবনে তুচ্ছ হতে পারে না। মালতীর সঙ্গে পরিচয় করে মানুষ যে আজকাল খুশি হতে পারে না, অনাথ সমুদ্রতীরে এ কথা স্বীকার করেছে। অনাথের যদি এই জ্ঞান জন্মে থাকে, মেয়ের সম্বন্ধে সে কি সাবধান হয়নি?

অনাথ ওস্তাদ কারিগর, হৃদয়ের প্রতিভাবান শিল্পী। আনন্দ হয়তো তারই হাতে গড়া মেয়ে। হয়তো মালতীর বিরুদ্ধ প্রভাবকে অনাথের সাহায্যে জয় করে করে তার হৃদয়-মনের বিকাশ আরও বিচিত্র, আরও অনুপম হয়েছে। ঘরে বসে হৃদয়ের দলগুলি মেলবার উপায় মানুষের নেই, মনের সামঞ্জস্য ঘরে সঞ্চয় করা যায় না। মন্দের সম্পর্কে না এলে ভালো হওয়া কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। জীবনের রুক্ষ কঠোর আঘাত না পেলে মানুষ জীবনে পঙ্গু হয়ে থাকে, তরল পদার্থের মতো তার কোনো নিজস্ব গঠন থাকে না। আনন্দ হয়তো মালতীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর পরিচয় পেয়ে সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। টবের নিস্তেজ অসুস্থ চাবাগাছ হয়ে থাকার বদলে মালতীর সাহায্যেই হয়তো সে পৃথিবীর মাটিতে আশ্রয় নেবার সুযোগ পেয়েছে, রোদ বৃষ্টি গায়ে লাগিয়ে আগাছার সঙ্গে লড়াই করে ও মাটির রস আকর্ষণ করে বেড়ে ওঠা তরুর মতো সতেজ, সজীব জীবন আহরণ করতে পেরেছে।

কিছুক্ষণের জন্য তিনজনেই নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। অনাথের কিছু দরকার আছে কি না দেখতে গিয়ে আনন্দ সমস্ত মুখ ভালো করে ধুয়ে এসেছে। হেরম্বের দৃষ্টিকে চোখে না দেখেও তার মুখে যে অল্প-অল্প রক্তের ঝাঁজ ও রং সঞ্চারিত হচ্ছিল বোধ হয় সেই জন্যই। তবে আনন্দের সম্বন্ধে কোনো বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার সাহস হেরম্বের ছিল না। তার যতটুকু বোধগম্য হয় আনন্দের প্রত্যেকটি কথা ও কাজের যেন তাবও অতিরিক্ত অনেক অর্থ আছে।

আনন্দ বলল, আজ আরতি হবে না মা?

হবে।

এখনও যে মন্দিরেব দরজাই খুললে না?

তোর বুঝি খিদে পেয়েছে? প্রসাদের অপেক্ষায় বসে না থেকে কিছু খেয়ে তো তুই নিতে পারিস আনন্দ?

খিদে পায়নি মা। খিদে পেলেও আজ খাচ্ছে কে?

মালতী তাব মুখেব দিকে তাকাল।

কেন, খাবি না কেন? নাচবি বুঝি আজ?

আনন্দ মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ। এখন নয়! চাঁদ উঠুক, তারপর।

আজ আবার তোর নাচবাব সাধ জাগল! তোকে নাচ শিখিয়ে ভালো কবিনি আনন্দ। রোজ রোজ না খেয়ে--

আনন্দ নিবতিশয় আগ্রহেব সঙ্গে বলল, অনেক রাত্রে আজ চন্দ্রকলা নাচটা নাচব মা।

তারপর বাত্রে না খেয়ে ঘুমোবি তো?

ঘুমোলাম বা! একরাত না খেলে কী হয়? আজ পূর্ণিমা তা জান?

মালতী বলল, আজ পূর্ণিমা নাকি? তাই কোমরটা টনটন করছে, গা ভারী ঠেকছে!

হেবম্ব কৌতূহলেব সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, তুমি নাচতে পাব নাকি আনন্দ?

মালতী বলল, পারবে না? আর কিছু শিখেছে নাকি মেয়ে আমার। গুণেব মধ্যে ওই এক গুণ— নাচতে শিখেছে। দুটি লোকের রান্না করতে দাও—মেয়ে চোখে অন্ধকাব দেখবেন!

আনন্দ হেসে বলল, মিথ্যে আমার নিন্দা কোবো না মা। বাবাকে দু বেলা রেঁধে দেয় কে?

যে রান্নাই রেঁধে দিস, ও তোর বাপ ছাড়া আর কেউ মুখেও করবে না।

হেরম্ব বলল, আমি তোমার নাচ দেখতে পারি আনন্দ?

খুব। কেন পাববেন না? এ তো থিয়েটারেব নাচ নয় যে দেখতে পয়সা লাগবে! কিন্তু আপনি কি অতক্ষণ থাকবেন?

থাকতে দিলেই থাকব।

মালতী বলল, থাকবে বইকী। তুমি আজ এখানেই খাবে হেরম্ব।

আনন্দ হেসে বলল, নেমন্তন্ন তো করলে, ঘরের লোকটিকে খাওয়াবে কি মা?

আমরা যা খাই তাই খাবে।

তার মানে উপোস। আজ পূর্ণিমার রাত, তুমি একটু দুধ খাবে, আমি কিছুই খাব না। অতিথিকে খাওয়াবার বেশ ব্যবস্থাই করলে মা।

মালতী বলল, তোর কথার, জানিস আনন্দ, ছিরিছাঁদ নেই। আমরা খাই বা না খাই একটা অতিথির পেট ভরাবার মতো খাবার ঘরে নেই নাকি!

আনন্দ মুচকে হেসে বলল, তাই বল! আমরা যা খাব ওঁকেও তাই খেতে হবে বললে কি না, তাই ভাবলাম ওঁর জন্যেও বুঝি উপোসের ব্যবস্থা হচ্ছে।

হেরম্ব ভাবে, মাকে মধ্যস্থ রেখে আমার সঙ্গে আলাপ করা কেন। এতক্ষণ যত কথা বলেছে সব আমাকে শোনাবার জন্য, কিন্তু নিজে থেকে সোজাসুজি আনন্দ আমাকে একটা কথাও বলেনি। আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, আমার কথার পিঠে দরকারি কথাও চাপিয়েছে কিন্তু আমাকে এখন পর্যন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আমার সম্বন্ধে ওর যে বিন্দুমাত্র কৌতূহল আছে তার নিরীহতম প্রকাশটিকেও অনায়াসে সংযত করে চলেছে। আমাকে এ ভাবে অবহেলা দেখানোর মানে কী। আমাকে একটা নিজস্ব ছোট্ট প্রশ্ন ও তো অনায়াসে করতে পারে, একটা বাজে অবান্তর প্রশ্ন।

আপনি কী ভাবছেন?

হেরম্ব চমকে উঠে ভাবল, মনের প্রার্থনা আমি তো উচ্চারণ করে বসিনি। তাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখে আনন্দ এই প্রশ্ন করেছিল, তার অপ্রকাশিত মনোভাবকে অনুমান করে নয়। এর চেয়ে বিস্ময়কর যোগাযোগও পৃথিবীতে ঘটে থাকে। কিন্তু হেরম্বের মনে হল, একটা অঘটন ঘটে গেছে, এই নিয়মচালিত জগতে একটা অত্যাশ্চর্য অনিয়ম। সে খুশি হয়ে বলল, ভাবছি, তুমি আমার মনের কথা জানলে কী করে।

আনন্দ ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল, আপনার মনের কথা কখন জানলাম?

এইমাত্র।

কী বলছেন, বুঝতে পারছি না।

মালতী বলল, হেঁয়ালি করছে লো, হেঁয়ালি করছে।

হেঁয়ালি করছেন?

হেরম্ব অপ্রতিভ হয়ে বলল, না। হেঁয়ালি করিনি।

তবে ও কথা বললেন কেন, আপনার মনের কথা জেনেছি?

এমনি বলেছি। রহস্য করে।

এ কী রকম দুর্বোধ্য রহস্য! আমি ভাবলাম, একটা কিছু মজার কথা বুঝি আপনার মনে হয়েছে, এটা তার ভূমিকা। শেষে ব্যাখ্যা করে আমাদের হাসিয়ে দেবেন।

হেরম্ব ইতিমধ্যে আত্মসংবরণ করেছে।

তাই মনে ছিল আনন্দ। শেষে ভেবে দেখলাম, ব্যাখ্যা না করেই হাসিয়ে দেওয়া ভালো।

এটা এখুনি বানিয়ে বললেন।

নিশ্চয় সঙ্গে সঙ্গে না বানাতে পারলে রক্ষা আছে? হাসির কথা আধমিনিটে পচে যায়।

আর হাসি? হাসি কতক্ষণে পচে যায়? আপনার কথাটা শুনে এমন সব অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে! আচ্ছা, আপনি কখনও ভেবেছেন হাসতে হাসতে মানুষ হঠাৎ কেন থেমে যায়? সিদ্ধি খেয়ে যারা হাসে তাদের কথা বলছি না। যারা হঠাৎ খুশি হয়ে হাসে,—মজার কথায় হোক, হাসির ব্যাপারে হোক অথবা আনন্দ পেয়েই হোক। হাসতে আরম্ভ করলেই মানুষের এমন কী কথা মনে পড়ে যায়, যার জন্য আস্তে আস্তে হাসি থেমে আসে? তাছাড়া এমন মজা দেখুন, পাগল না হলে মানুষ একা একা হাসতে পারে না। হাসতে হলে কম করে অন্তত দুজন লোক থাকা চাই। ঘরের কোণে বসে নিজের মনে যদিই বা কেউ কখনও হাসে, তার তখন নিশ্চয়ই এমন একটা কথা মনে পড়েছে যার সঙ্গে অন্য একজন লোকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। নিছক নিজের কথা নিয়ে কেউ হাসে না। হাসে?

না।

খুব আশ্চর্য না ব্যাপারটা? হাসির কথা পড়লে কিংবা শুনলে মানুষ হাসবে,—কেউ হাসবে তবে! হাসবার মতো কিছু হাতের কাছে না থাকলে কেউ মরলেও হাসতে পারবে না। হাসির উপলক্ষটা সব সময় থাকবে বাইরে, আবার তা থেকে তার নিজেকে বাদ থাকতে হবে। এ সব কথা ভাবলে আমি একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাই। হাসি এমন ভালো জিনিস, নিজের জন্য কেউ নিজে তা তৈরি করতে পারবে না! সাধে কি মানুষ দিনরাত মুখ গোঁজ করে থাকে। মাঝে মাঝে একটু একটু না হেসে মানুষ যদি সব সময় হাসতে পারত!

মালতী বলল, তোর আজ কী হয়েছে রে আনন্দ? এত কথা কইছিস যে?

আনন্দ বলল, বেশি কথা বলছি? বলব না! তোমরা থাকবে যে যার তালে, চুপ করে থেকে আমার এদিকে কথা জমে জমে হিমালয় পাহাড়! সুযোগ পেলে বলব না বেশি কথা?

তুই আজ নিশ্চয় চুরি করে কারণ খেয়েছিস!

না গো না, চুরি করে ছাইপাঁশ খাবার মেয়ে আমি নই। মনের স্ফূর্তির জন্য আমার কারণ খেতে হয় না।

হেরম্বের কাছে এইটুকু গর্ব প্রকাশ করেই আনন্দ বোধ হয় নিজেকে এত বেশি প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে করে যে, কিছুক্ষণের জন্য মালতীর দেহের আড়ালে নিজেকে সে প্রায় সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলে। অথচ এ কাজটা সে এমন একটি ছলনার আশ্রয়ে করে যে মালতী বুঝতে পারে না, হেরম্ব বুঝতে ভরসা পায় না।

মালতী বলে, কোমর টনটন করছে বলে তোকে আমি টিপতে বলিনি আনন্দ! এমনি টিপুনিতে যদি ব্যথা কমত তবে আর ভাবনা ছিল না।

হেরম্ব শুধু আনন্দের পায়ের পাতা দুটি দেখতে পায়। আঙুল বাঁকিয়ে আনন্দ পায়ের নখ সিঁড়ির সিমেন্টে একটা খাঁজে আটকেছে। হেরম্বের মনে হয়, আনন্দের আঙুলে ব্যথা লাগছে। এ ভাবে তার নিজেকে ব্যথা দেবার কারণটা সে কোনোমতেই অনুমান করতে পারে না। সিমেন্টের খাঁজ থেকে আনন্দের আঙুল কটিকে মুক্ত করে দেবার জন্য তার মনে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। একটি নিরীহ ছোটো কালো পিঁপড়ে, যারা কখনও কামড়ায় না কিন্তু একটু ঘষা পেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে প্রাণ দেয়, সেই জাতের একটি অতি ছোটো পিঁপড়ে, আনন্দের আঙুলে উঠে হেরম্বের চেতনায় নিজের ক্ষীণতম অস্তিত্বকে ঘোষণা করে দেয়। হেরম্ব তাকে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে হত্যা করে ফেলে।

আনন্দ বলে, কি?

একটা পোকা।

কী পোকা?

বিষপিঁপড়ে বোধ হয়।

মালতী বলে, একটা বিষপিঁপড়ে তাড়াতে তুমি ওর পায়ে হাত দিলে!—আহা কী করিস আনন্দ, করিস নে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস নে। কুমারীর কাউকে প্রণাম করতে নেই জানিস নে তুই?

আনন্দ হেরম্বকে প্রণাম করে বলল, তোমার ও সব অদ্ভুত তান্ত্রিক মত আমি মানি না মা।

হেরম্বের আশঙ্কা হয় মেয়ের অবাধ্যতায় মালতী হয়তো রেগে আগুন হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে মালতীর দুঃখই উথলে উঠল।

আগেই জানি কথা শুনবে না! এ বাড়িতে কেউ আমার কথা শোনে না হেরম্ব। আমি এখানে দাসী-বাঁদীরও অধম। বলত ওর বাপ, দেখতে কথা শোনার কী ঘটা মেয়ের! আমি তুচ্ছ মা বই তো নই।

তার এই সকরুণ অভিযোগে হেরম্বের সহানুভূতি জাগে না। আনন্দ মার অবাধ্য জেনে সে খুশিই হয়ে ওঠে। আনন্দ বাপের দুলালী মেয়ে এ যেন তারই ব্যক্তিগত সৌভাগ্য। আনন্দের সম্বন্ধে প্রথমে তার যে আশঙ্কা জেগেছিল এবং পরে যে আশা করে সে এই আশঙ্কা কমিয়ে এনেছিল, তাদের মধ্যে কোনটি যে বেশি জোরালো এতক্ষণ হেরম্ব তা বুঝতে পারেনি। অনাথ এবং মালতী এদের মধ্যে কাকে আশ্রয় করে আনন্দ বড়ো হয়েছে সঠিক না জানা অবধি স্বস্তি পাওয়া হেরম্বের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আনন্দের অন্তর অন্ধকার, এর ক্ষীণতম সংশয়টিও হেরম্বের সহ্য হচ্ছিল না। মালতীর আদেশের বিরুদ্ধেও তাকে প্রণাম করার মধ্যে তার প্রতি আনন্দের যতটুকু শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল, হেরম্ব সেটুকু তাই খেয়াল করারও সময় পেল না। মালতীকে আনন্দ নকল করেনি শুধু এইটুকুই তার কাছে হয়ে রইল প্রধান! আনন্দের অকারণ ছেলেমানুষি ঔদ্ধত্যে তার দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে।

আনন্দকে চোখে দেখে হেরম্বের মনে যে আবেগ ও মোহ প্রথমেই সঞ্চারিত হয়েছিল এতক্ষণে তার মনের সর্বত্র তা সঞ্চারিত হয়ে তার সমস্ত মনোধর্মকে আশ্রয় করেছিল। নিজেকে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ও মুগ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করাব বিস্ময় অপনোদিত হয়ে গিয়েছিল। তাব মন সেই স্তরে উঠে এসেছিল যেখানে আনন্দের অনির্বচনীয় আকর্ষণ চিরন্তন সত্য। আনন্দকে চোখে দেখা ও তাব কথা শোনা হেবম্বের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নেশা জমে এলে যেমন মনে হয় এই নেশার অবস্থাটিই সহজ ও স্বাভাবিক, আনন্দেব সান্নিধ্যে নিজের উত্তেজিত অবস্থাটিও হেরম্বের কাছে তেমনি অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। আনন্দ এখন তাকে আবার নতুন করে মুগ্ধ ও বিচলিত করে দিয়েছে। বয়স্ক হেবম্বের মনেও যে লোকটি এক রহস্যময় মায়ালোকবাসী হয়ে আছে নিজেকে সেই অনাথের অনুরক্তা কন্যা বলে ঘোষণা করে আনন্দ তার আবিষ্ট মোহাচ্ছন্ন মনের উন্মাদনা আরও তীব্র আরও গভীর করে দিয়েছে।

কিন্তু প্রেমিকের কাছে প্রেমের অগ্রগতির ইতিহাস নেই। যতদূরই এগিয়ে যাক সেইখান থেকেই আরম্ভ। আগে কিছু ছিল না। ছিল অন্ধকারের সেই নীরন্ধ্র কুলায়, যেখানে নব জন্মলাভের প্রতীক্ষায় কঠিন আস্তরণের মধ্যে হৃদয় নিস্পন্দ হয়ে ছিল। হেরম্ব জানে না তার আকুল হৃদয়ের আকুলতা বেড়েছে, এ শুধু বৃদ্ধি, শুধু ঘন হওয়া। আনন্দের অস্তিত্ব এইমাত্র তার কাছে প্রকাশ পেয়েছে, এতক্ষণে ওব সম্বন্ধে সে সচেতন হল। এক মুহূর্ত আগে নয়।

এক মুহূর্ত আগে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল কেবল শিরায় শিরায় রক্ত পাঠাবার প্রাত্যহিক প্রীতিহীন প্রয়োজনে। এইমাত্র আনন্দ তার স্পন্দনকে অসংযত করে দিয়েছে।

খানিক পরে মালতী উঠে দাঁড়াল।

আনন্দ বলল, কোথায় যাচ্ছ মা?

গা ধুতে হবে না, আরতি করতে হবে না? সন্ধ্যে হল, সে খেয়াল আছে।

গোধূলি লগ্নে হেরম্বের কাছে আনন্দকে ফেলে মালতী উঠে চলে গেল।

পৃথিবী জুড়ে নয়, এইখানে সন্ধ্যা নামছে। পৃথিবীর আর এক পিঠে এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমগ্রভাবে বিস্তৃত চলমান অবিচ্ছিন্ন দিন। এখানে যে রাত্রি আসছে তার নিজের দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছে মাটির পৃথিবী। পৃথিবী থেকে সূর্য যতদূর, মহাশূন্যে রাত্রির বিস্তার তার চেয়েও অনন্তগুণ বেশি। রাত্রির অন্ত নেই। মধ্যরাত্রিকে অবলম্বন করে কল্পনায় যতদূর খুশি চলে যাওয়া যাক, রাত্রির শেষ মিলবে না। পৃথিবীর এক পিঠে যে আলো ধরা পড়ে দিন হয়েছে, অসীম শূন্যের শেষ পর্যন্ত তার অভাব কোথাও মেটেনি।

মালতী চলে গেলে মুখ তুলে আকাশের দিকে একবাব তাকিয়ে হেরম্বেব মনে যে কল্পনা দেখা দিয়েছিল, উপরের কথাগুলি তারই ভাষান্তরিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আনন্দেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এ তার ক্ষণিকের বিশ্রাম মাত্র। মালতীব অন্তবালে সরে যাওয়াব আনন্দ যে নিজেকে অনাবৃত ও অসহায় মনে করছে হেরম্বের তা বুঝতে বাকি থাকেনি। চোখের সামনে ধূসর আকাশটি থাকায় আকাশকে উপলক্ষ করেই সে তাই কথা আরম্ভ কবল। আকাশ থেকে কথা পৃথিবীতে নামতে নামতে আনন্দ তাব লজ্জা ও সংকোচকে জয় করে নেবে।

কটা তারা উঠেছে বলো তো আনন্দ?

কটা? একটা দেখতে পাচ্ছি। না, দুটো।

দুটো তারা দেখতে পেলে কী যেন হয়?

কী হয়? তাবার মতো চোখের জ্যোতি বাড়ে?

আনন্দের কণ্ঠস্বব পরিবর্তিত হয়ে গেছে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার পায়ের নখেব দিকে।

অবান্তর কথা বেশি ক্ষণ চলে না। আনন্দই প্রথমে আলাপকে তাদের স্তরে নামিয়ে আনল।

বাবা বললেন, আপনি কলেজে পড়ান। আপনি খুব পড়াশোনা করেন বুঝি?

না। পডা হল পরেব ভাবনা ভাবা। তাব চেয়ে নিজের ভাবনা ভাবতেই আমার ভালো লাগে। তুমি বুঝি বাবার কাছে আমাব কথা সব জেনে নিয়েছ?

সব। শুধু বাবার কাছে জানিনি, মা জল দিতে ডাকা পর্যন্ত ওই জানলায দাঁড়িযে মার সঙ্গে আপনার যত কথা হয়েছে সব শুনে ফেলেছি।

আনন্দ চোখ তুলল। কিন্তু এখনও সে হেরম্বের দিকে তাকাতে পাবছে না।

শুনে কী মনে হল?

আনন্দ হঠাৎ জবাব দিল না। তারপর সংকোচেব সঙ্গে বলল, মনে হল খুব নিষ্ঠুরেব মতো স্ত্রীব কথা বললেন। আপনাব স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন?

হেবম্ব বলল, অনেক দিন। প্রায় দেড়বছর।

আনন্দ হেবম্বেব জামাব বোতামের দিকে তাকিয়ে বলল, অনেক দিন বললেন যে? দেডবছব কি অনেক দিন?

হেরম্ব বলল, অনেক দিন বইকী। দেড়বছরে কবাব সূর্য ওঠে কত লোক জন্মায়, কত লোক মরে যায় খবব রাখ?

আনন্দ মনে মনে একটু হিসাব করে বলল, দেড়বছরে সূর্য ওঠে পাঁচশো সাতচল্লিশ বার। লোক জন্মায় কত? কত লোক মরে যায়?

হেরম্ব হেসে বলল, পনেরো কুড়ি লাখ হবে।

আনন্দও তার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, মোটে? আমি ভাবছিলাম একবছরে পৃথিবীতে বুঝি কোটি কোটি লোক জন্মায়। মার কাছে রোজ যে সব মেয়ে ভক্ত আসে তাদের সকলেরই বুকে একটি, কাঁখে একটি, হাত-ধরা একটি, এমনি গাদা গাদা ছেলেমেয়ে দেখি কিনা, তাই মনে হয় পৃথিবীতে রোজ বুঝি অগুনতি ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে। কিন্তু দেড়বছরে আর যাই হোক, মানুষ কি বদলাতে পারে?

পারে। এক মিনিটে পারে। হেরম্ব জোর দিয়ে বলল।

আনন্দ একটু লাল হয়ে বলল, আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে বলিনি, এমনি সাধারণ ভাবে বলেছি।

দেড়বছরে মানুষ বদলাতে পারে কিনা প্রশ্ন করে তার মনে স্ত্রীর শোকটা কতখানি বর্তমান আছে আনন্দ তাই মাপতে চেয়েছিল হেরম্ব এ কথা বিশ্বাস করেনি। সে জেনেছে আনন্দের হৃদয়ে মানুষের

সহজ অনুভূতিগুলো সহজ হয়েই আছে। মৃতা স্ত্রীকে কেউ ভুলে গেছে শুনলে খুশি হবার মতো হিংস্র আনন্দ নয়।

কিন্তু আনন্দকে মিথ্যা কথা শোনানও হেরম্বর পক্ষে অসম্ভব।

আমার স্ত্রীর কথা ভেবে বললেও দোষ হত না আনন্দ। সংসারে কত পরিচিত লোক কত আত্মীয় থাকে, যারা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। বেঁচে থাকবার সময় আমাদের কাছে তাদের যতটুকু দাম ছিল, মরে যাবার পর কেবল কাছে নেই বলেই তাদের সে দাম বাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। দিলে মরণকে আমরা ভয় করতে আরম্ভ করব। আমাদের জীবনে মৃত্যুর ছায়া পড়বে। আমরা দুর্বল অসুস্থ হয়ে পড়ব।

কিন্তু—বলে আনন্দ চুপ করে গেল।

হেরম্ব বলল, তুমি যা খুশি বলতে পার আনন্দ, কোনো বাধা নেই।

কথাগুলির মধ্যে আপনার স্ত্রী এসে পড়েছেন বলে সংকোচ হচ্ছে। যাই হোক, বলি। মনের কথা চেপে রাখতে আমার বিশ্রী লাগে। আমার মনে হচ্ছে আপনার কথা ঠিক নয়। ভালোবাসা থাকলে শোক হবেই। শোক মিথ্যে হলে ভালোবাসাও মিথ্যে।

হেরম্ব খুশি হল। প্রতিবাদ তার ভালো লাগে। প্রতিবাদ খণ্ডন করা যেন একটা জয়ের মতো।

ভালোবাসা থাকলে শোক হয় আনন্দ। কিন্তু ভালোবাসা কতদিনের? কতকাল স্থায়ী হয় ভালোবাসা? প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। প্রেম চিরকাল টিকলে মানুষকে আর টিকতে হত না। প্রেমের জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান বেশি নয়। প্রেম যখন বেঁচে আছে তখন দুজনের মধ্যে একজন মরে গেলে শোক হয়—অক্ষয় শোক হয়। প্রেমের অকালমৃত্যু নেই বলে শোকের মধ্যে প্রেম চিরন্তন হয়ে যায়। কিন্তু প্রেম যখন মরে গেছে, যখন আছে শুধু মায়া, অভ্যাস আর আত্মসান্ত্বনার খেলা, তখন যদি দুজনের একজন মরে যায়, বেশি দিন শোক হওয়া অসুস্থ মনের লক্ষণ। সেটা দুর্বলতা আনন্দ। তুমি রোমিও জুলিয়েটের গল্প জান?

জানি। বাবার কাছে শুনেছি।

প্রেমের মৃত্যু হবার আগেই ওরা মরে গিয়েছিল। একসঙ্গে দুজনে মরে না গিয়ে ওদের মধ্যে একজন যদি বেঁচে থাকত, তার শোক কখনও শেষ হত না। কিন্তু কিছুকাল বেঁচে থেকে ক্রমে ক্রমে ভালোবাসা মরে যাওয়ার পর ওদের মধ্যে একজন যদি স্বর্গে যেত, পৃথিবীতে যে থাকত চিরকাল তার শোকাতুর হয়ে থাকার কোনো কারণ থাকত না। একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ করেছ আনন্দ? রোমিও জুলিয়েটের ট্র্যাজেডি তাদের মৃত্যুতে নয়?

কীসে তবে?

ওদের প্রেমের অসমাপ্তিতে। রোমিও জুলিয়েটের কোনো দাম মানুষের কাছে নেই। জগতের লক্ষ লক্ষ রোমিও জুলিয়েট মরে যাক, কিছু এসে যায় না। কিন্তু ও ভাবে ভালো বাসতে বাসতে ওরা মরল কেন ভেবেই আমাদের চোখে জল আসে।

আনন্দ আনমনে বলল, তাই কী? তা হবে বোধ হয়।

হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, হবে বোধ হয় নয়, তাই। ওদের অসম্পূর্ণ প্রেমকে আমরা মনে মনে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করে ব্যথা পাই—রোমিও জুলিয়েটের ট্র্যাজেডি তাই। নইলে, ওদের জীবনে ট্র্যাজেডি কোথায়? ওরা দুজনেই মরে গিয়ে সব কিছুরই অতীত হয়ে গেল—ওদের জীবনে দুঃখ সৃষ্টি হবার সুযোগও ছিল না। আমরা সমবেদনা দেব কাকে? কীসের জোরে রোমিও জুলিয়েট আমাদের একফোঁটা অশ্রু দাবি করবে? ওরা তো দুঃখ পায়নি। প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশের সময় ওরা দুঃখকে এড়িয়ে চলে গেছে। আমরা ওদের প্রেমের জন্য শোক করি, ওদের জন্য নয়।

আনন্দ বলল, প্রেম কতদিন বাঁচে?

হেরম্ব হেসে বলল কী করে বলব আনন্দ! দিন গুনে বলা যায় না। তবে বেশি দিন নয়। একদিন, এক সপ্তাহ, বড়ো জোর একমাস।

শুনে আনন্দ যেন ভীতা হয়ে উঠল।

মোটে।

হেরম্ব আবার হেসে বলল, মোটে হল? একমাসের বেশি প্রেম কারও সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ—একমাসেব বেশি হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ একদিন কি দুদিন মাতাল হয়ে থাকতে পারে। জলের সঙ্গে মদের যে সম্পর্ক মদেব সঙ্গে প্রেমেব সম্পর্ক তাই—প্রেম এত তেজি নেশা।

আনন্দ হঠাৎ কথা খুঁজে পেল না। মুখ থেকে সে চুলগুলো পিছনে ঠেলে দিল। ডান হাতের ছোটো আঙুলটিব ডগা কামড়ে ধরে এক পায়ের আঙুল দিয়ে অন্য পায়ের নখ থেকে ধুলো মুছে দিতে লাগল। তার মনে প্রবল আঘাত লেগেছে বুঝে হেরম্ব দুঃখ বোধ করল। কিন্তু এ আঘাত না দিয়ে তার উপায় ছিল না। আনন্দের কাছে সত্য গোপন করাব ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া, প্রেম চিরকাল বাঁচে কোনোদিন কোনো অবস্থাতে কোনো মানুষকেই এ শিক্ষা দিতে নেই। হেবম্ব বিশ্বাস করে পৃথিবী থেকে যত তাডাতাড়ি এ বিশ্বাস দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

আনন্দ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, প্রেম মরে গেলে কী থাকে?

প্রেম ছাড়া আব সব থাকে। সুখে শান্তিতে ঘবকন্না করবাব জন্য যা যা দরকার। তাছাড়া খোকা অথবা খুকি থাকে—আবও একটি প্রেমের সম্ভাবনা। ওরা তুচ্ছ নয়।

কিন্তু প্রেম তো থাকে না। আসল জিনিসটাই তো মরে যায়! তাবপব মানুষের সুখ সম্ভব কী করে?

সুখ হল শুঁটকি মাছ—মানুষের জিভ হল আসলে ছোটোলোক। তাই কোনো রকমে সুখের স্বাদ দিয়ে জীবনটা ভবে রাখা যায়। জীবন বড়ো নীরস আনন্দ—বড়ো নিবুৎসব। জীবনেব গতি শ্লথ, মন্থব। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মানুষকে জীবন কাটাতে হয়। তাব মধ্যে ওই প্রেমেব উত্তেজনাটুকু তার উপরি লাভ।

সুখ হল—? শুঁটকি মাছ। আগে যেন কার কাছে কথাটা শুনেছি।

তোমার মা খানিক আগে আমাকে বোঝাচ্ছিলেন।

হ্যাঁ, মা-ই বলছিল বটে। কিন্তু আপনি এমন সব কথা বলছেন যা শুনলে কান্না আসে।

হেরম্ব একটি পা একধাপ নীচে নামিয়ে বলল, কান্না এলে চলবে না আনন্দ, হাসতে হবে। বুক কাঁপিয়ে যে দীর্ঘশ্বাস উঠবে তার সবটুকু বাতাস হাসি আব গানে পবিণত করে দিতে হবে। মানুষের যদি কোনো ধর্ম থাকে, কোনো তপস্যার প্রয়োজন থাকে, সে ধর্ম এই সে তপস্যা এই। মানুষ কী করবে বল? পঞ্চাশ যাট বছর তাকে বাঁচতে হবে অথচ তার জীবনে কাজ নেই।

কাজ নেই?

কোথায় কাজ? কী কাজ আছে মানুষের? অঙ্ক কষা, ইঞ্জিন বানানো, কবিতা লেখা? ও সব তো ভান, কাজের ছল। পৃথিবীতে কেউ ও সব চায় না। একদিন মানুষের জ্ঞান ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, সভ্যতা ছিল না, মানুষের কিছু এসে যায়নি। আজ মানুষের ও সব আছে কিন্তু তাতেও কারও কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষ নিরুপায়। তার মধ্যে যে বিপুল শূন্যতা আছে সেটা তাকে ভবতেই হবে। মানুষ তাই জটিল অঙ্ক দিয়ে, কায়দাদুরস্ত ভালো ভালো ভাব দিয়ে, ইস্পাতের টুকরো দিয়ে, আরও সব হাজার রকম জঞ্জাল দিয়ে সেই ফাঁকটা ভরতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে

দেখো জীবন নিয়ে মানুষ কী হইচই করছে, কী প্রবল প্রতিযোগিতা মানুষের, কী ব্যস্ততা! কাজ! কাজ! মানুষ কাজ করছে! বউকে কাঁদিয়ে বৈজ্ঞানিক খুঁজছে নূতন ফরমুলা, আজও খুঁজছে কালও খুঁজছে। দোকান খুলে বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে চারিদিক ছেয়ে ফেলে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ব্যবসায়ী করছে টাকা। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বেলে বসে বিদ্রোহী কবি লিখছে কবিতা, সারাদিন ছবি এঁকে আর্টিস্ট ওদিকে মদ খেয়ে ফেনাচ্ছে জীবন। কেউ অলস নয় আনন্দ, কুলি মজুর গাড়োয়ান তারাও প্রাণপণে কাজ করছে। কিন্তু কেন করছে আনন্দ? পাগলের মতো মানুষ খালি কাজ করছে কেন? মানুষের কাজ নেই বলে। আসল কাজ নেই বলে। ছটফট করা ছাড়া আর কিছু করার নেই বলে।

কিন্তু আসল কাজটা কী? মানুষের যা নেই?

এ প্রশ্নেরও জবাব নেই আনন্দ। মানুষের কী নেই তাও মানুষের বুঝবার উপায় নেই। কাজ না পেয়ে মানুষ অকাজ করছে এটা বোঝা যায় কিন্তু তার কাজ কী হতে পারত তার কোনো সংজ্ঞা নেই। এর কারণ কী জান? মানুষ যে স্তরের, তার জীবনের উদ্দেশ্য সেই স্তরে নেই। ঈশ্বরের মতো, শেষ সত্যের মতো, আমিত্বের মানের মতো সেও মানুষের নাগালের বাইরে। জীবনের একটা অর্থ এবং পরিণতি অবশ্যই আছে, বিশ্ব-জগতে কিছুই অকারণ হতে পারে না। সৃষ্টিতে অজস্র নিয়মের সামঞ্জস্য দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু জীবনের শেষ পরিণতি জীবনে নেই। মানুষ চিরকাল তার সার্থকতা খুঁজবে কিন্তু কখনও তার দেখা পাবে না। যোগী ঋষি হার মানলেন, দার্শনিক হার মানলেন, কবি হার মানলেন, অমার্জিত আদিমধর্মী মানুষও হার মানলে। চিরকাল এমনি হবে। কারণ সমগ্র সত্তাকে যা ছাড়িয়ে আছে, মানুষ তাকে আয়ত্ত করবে কী করে!

কথা বলার উত্তেজনায় হেরম্বর সাময়িক বিস্মৃতি এসেছিল। শব্দের মোহ তার মন থেকে আনন্দের মোহকে কিছুক্ষণের জন্য স্থানচ্যুত করেছিল। জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করে পুনরায় আনন্দের সান্নিধ্যকে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে সে এই ভেবে বিস্মিত হয়ে রইল যে, শ্রোতা ভিন্ন আনন্দ এতক্ষণ তার কাছে আর কিছুই ছিল না। আনন্দকে এতক্ষণ সে এমনি একটা সাধারণ পর্যায়ে ফেলে রেখেছিল যে শ্রবণশক্তি ছাড়া ওর আর কোনো বিশেষত্বের সম্বন্ধেই সে সচেতন হয়ে থাকেনি। হেরম্ব বোঝে, বিচলিত হবার মতো ত্রুটি অথবা অসংগতি এটা নয়। কিন্তু ছেলেমানুষের মতো তবু সে আনন্দের প্রতি তার এই তুচ্ছ অমনোযোগে আশ্চর্য হয়ে যায়।

হেরম্ব এটাও বুঝতে পারে, তার কাছে জীবনের ব্যাখ্যা শুনতে আনন্দ ইচ্ছুক নয়। জীবন কী, জীবনের উদ্দেশ্য আছে কী নেই, এ সব তত্ত্বকথায় ওর বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। অন্য সময় বিশ্লেষণ ওর ভালো লাগে কিনা হেরম্ব জানে না, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তার মুখের বিশ্লেষণ ওর কাছে শাস্তির মতো লেগেছে। সে থেমে যেতে আনন্দ স্বস্তি লাভ করেছে। রোমিও জুলিয়েটের কথা বলুক, প্রেমের ব্যাখ্যা করুক, আনন্দ মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু সেইখানেই তার ধৈর্যের সীমা। অনুভূতির সমন্বয় করা জীবনের সমগ্রতাকে সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, ভাবতে চায় না।

তাই হোক। তাই ভালো। হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, চন্দ্রকলা নাচটা কী আনন্দ?

আনন্দ বলল, ধরুন, আমি যেন মরে গেছি। অমাবস্যার চাঁদের মতো আমি যেন নেই। প্রতিপদে আমার মধ্যে একটুখানি জীবনের সঞ্চার হল। ভালো করে বোঝা যায় না এমনই একফোঁটা একটু জীবন। তারপর চাঁদ যেমন কলায় কলায় একটু একটু করে বাড়ে আমার জীবনও তেমনই করে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে যখন পূর্ণিমা এল, আমি পূর্ণমাত্রায় বেঁচে উঠেছি। তারপর একটু একটু করে মরে—

এ নাচ ভালো নয়, আনন্দ।

কেন?

একটু একটু করে মরার নাচ নেচে তোমার যদি সত্যি সত্যি মরতে ইচ্ছা হয়?

আনন্দ একটু হাসল। মরতে ইচ্ছা হবে কেন? ঘুম পায়। এক মিনিটও তারপর আমি আব দাঁড়াতে পারি না। কোনো বকমে বিছানায় গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়েই নাক ডাকাতে আবম্ভ করে দি। মা বলে—

কী বলে?

আপনাকে বলতে লজ্জা হচ্ছে।

চোখ বুজে আমি এখানে নেই মনে করে বলো।

না দুব! সে বলা যায় না।

হেরম্ব মৃদু হেসে বলল, প্রথম তোমাকে দেখে মনে হয়নি তুমি এত ভীরু। এটা তোমার ভয় না লজ্জা, আনন্দ?

আনন্দ বলল, মানুষকে আমি ভয় করি নে।

তবে তুমি ছেলেমানুষ—লাজুক।

ছেলেমানুষ? আমায় এ কথা বললে অপমান করা হয় তা জানেন? আনন্দ হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে হেরম্বেব হাঁটুতে টোকা দিয়ে বলল, আমার অনেক বয়েস হয়েছে। আমাকে সম্ভ্রম কবে কথা কইবেন। হেরম্ব জানে, এ সব ভূমিকা। তার নাচ সম্বন্ধে মালতী কী বলেছে আনন্দ তা শোনাতে চায়, কিন্তু পেবে উঠছে না। হেরম্ব মৃদু হেসে অবজ্ঞাব সুরে বলল, ছেলেমানুষকে আবার সম্ভ্রম করব কী?

ছেলেমানুষ হলাম কীসে?

ছেলেমানুষরাই একটা কথা বলতে দশবার লজ্জা পায়।

আনন্দ উদ্ধত সাহসের সঙ্গে বলল, লজ্জা পাচ্ছে কে? আমি? জগতে এমন কথা নেই আমি যা বলতে লজ্জা পাই। নাচাব পব আমার ঘুম দেখে মা বলে, তোর আর বিয়ের দরকার নেই আনন্দ।

বলে আনন্দ হঠাৎ উদ্ধতভাবে হেরম্বকে আক্রমণ করল, বলল, আপনি নেহাত অভদ্র। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে জানেন না।

মনে হয় সে বুঝি উঠে চলে যাবে। হেবম্বেব মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সে মুখ ঘুবিয়ে নেয। ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে।

নিষ্ঠুর আনন্দেব সঙ্গে হেরম্ব লজ্জাতুর অপ্রতিভ আনন্দের আত্মসংবরণের ব্যাকুল প্রয়াসকে উৎসাহিত করে বলে, বলো বলো, থেমো না আনন্দ।

না, বলব না। কেন বলব!

হেরম্ব আবও নির্মম হয়ে বলে, তুমি তাহলে বুড়ি নও আনন্দ? মিছামিছি তোমার তাহলে রাগ হয়? এতক্ষণ আমাকে তুমি ঠকাচ্ছিলে?

আপনি চলে যান। আপনাকে আমি নাচ দেখাব না।

দেখিয়ো না। আমি ঢেব নাচ দেখেছি।

তাহলে অনর্থক বসে আছেন কেন? রাত হল, বাড়ি যান না।

বেশ। তোমাব মাকে ডাকো। বলে যাই।

আনন্দ চুপ করে বসে রইল। হেরম্ব বুঝতে পারে, সে কী ভাবছে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিষ্ঠুরতা করেছে বলে নয়, নিজেকে সে সত্যসত্যই সম্পূর্ণ অকারণে ছেলেমানুষি করে ফেলেছে বলে। এ ব্যাপার আনন্দ বুঝতে পারছে না। নৃত্য করে সে মেয়েদের বিবাহিত জীবনের আনন্দ ও অবসাদ পায় এই কথাটি সে এত বেশি লজ্জাকর মনে করে না যে হেরম্বকে শোনানো যায় না। হেবম্বকে অবাধে এ কথা বলতে পারার বয়স তার হয়েছে বলেই আনন্দ মনে করে। তাই অসঙ্গত

লজ্জার বশে বিচলিত হয়ে ব্যাপারটাকে এ ভাবে তাল পাকিয়ে দেওয়ার জন্য নিজেব উপরে সে রেগে উঠেছে। লজ্জা পেয়েও চুপ করে থাকলে অথবা পাকা মেয়ের মতো হাসি-তামাশার একটা অভিনয় বজায় রাখতে পারলে হেবম্বের কাছ থেকে লজ্জাটা লুকানো যেত ভেবে তার আপশোশের সীমা নেই। আঠাবো বছর বয়সে হেরম্বের কাছে আটাশ বছরেব ধীর, সপ্রতিভ ও পূর্ণ পরিণত নারী হতে চেয়ে একেবারে তেবো বছরের মেয়ে হয়ে বসার জন্য নিজেকে আনন্দ কোনো মতেই ক্ষমা করতে পারছে না।

আনন্দের অস্বস্তিতে হেরম্ব কিন্তু খুশি হল। আনন্দ রাগ করতে পারে এই ভয়কে জয় করে তার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পেরে নিজের কাছেই সে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। যার সান্নিধ্যই আত্মবিস্মৃতির প্রবল প্রেরণা, তাকে শাসন করা কি সহজ মনের জোরের পরিচয়। হেরম্বের মনে হঠাৎ যেন শক্তি ও তেজের আবির্ভাব ঘটল।

কিন্তু সেই সঙ্গে এই জ্ঞানকেও তার আমল দিতে হল যে, আনন্দকে সে আগাগোড়া ভয় করে এসেছে। আনন্দ ইচ্ছা করলেই তার ভয়ানক ক্ষতি করতে পারে, কোনো এক সময়ে এই আশঙ্কা তার মনে এসেছিল এবং এখনও তা স্থায়ী হয়ে আছে। নিজের এই ভীরুতার জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।

সে বুঝতে পারে অনেক দিক থেকে নিজেকে সে আনন্দের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। অনেক বিষয়েই সে আনন্দেব কাছে পরাধীন। দুঃখ না পাবার অনেকখানি স্বাধীনতাই সে স্বেচ্ছায় আনন্দের হাতে তুলে দিয়েছে। তার জীবনে ওর কর্তৃত্ব এখন সামান্য নয়, তার হৃদয়মনের নিয়ন্ত্রণে ওর প্রচুর যথেচ্ছাচার সম্ভব হয়ে গিয়েছে।

যতক্ষণ পাবে দেরি করে মালতীকে আসতে হল।

তোমাদের দুটিতে দেখছি দিব্যি ভাব হয়ে গেছে।

আনন্দ বলল, আমবা বন্ধু, মা।

বন্ধু! মালতীর স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ পেল। বন্ধু কি লো ছুঁড়ি। হেরম্ব যে তোব গুরুজন, শ্রদ্ধাব পাত্র।

বন্ধু বুঝি অশ্রদ্ধাব পাত্র মা?

মালতী প্রদীপ জ্বেলে এনেছিল। মন্দিরেব দরজা খুলে ভিতবে ঢুকে সে আরও একটি বৃহৎ প্রদীপ জ্বেলে দিল। হেবম্ব উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। মন্দিব প্রশস্ত, মেঝে লাল সিমেন্ট কবা। দেবতা শিশুগোপাল। ছোটো একটি বেদির উপর বাৎসল্য আকর্ষণের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। মালতী দুটি নৈবেদ্য সাজাচ্ছিল। হেরম্ব দেবতাকে দেখছে, মুখ না ফিরিয়েই এটা সে কী করে টেব পেল বলা যায় না।

কী বকম ঠাকুর, হেবম্ব?

বেশ, মালতী বউদি।

আনন্দ ওঠেনি। সেইখানে তেমনিভাবে বসেছিল। হেরম্ব ফিরে গিয়ে তার কাছে বসল।

তুমি দেবদাসী নাকি আনন্দ?

আজ্ঞে না, আমি কারও দাসী নই।

তবে মন্দিরে ঠাকুবের সামনে নাচো যে?

ঠাকুরের সামনে বলে নয়। মন্দিরে জায়গা অনেক, মেঝেটাও বেশ মসৃণ। সবদিন মন্দিরে নাচি না। মাঝে মাঝে। আজ এইখানে নাচব, এই ঘাসের জমিটাতে। ঠাকুর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, ভক্তের কাছে যা প্রণামি পান তাই দিয়ে ভরণপোষণ করেন। এটা হল তাঁর কর্তব্য। কর্তব্য করবার জন্য সামনে নাচব, নাচ আমার অত সস্তা নয়।

বোঝা যাচ্ছে দেবতাকে তুমি ভক্তি কর না।

ভক্তি করা উচিত নয়। বাবা বলেন, বেশি ভক্তি করলে দেবতা চটে যান। দেবতা কি বলেন, শুনবেন? বলেন, ওরে হতভাগার দল! আমাকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোরা একটু আত্মচিন্তা কর তো বাপু। আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে থাকবার জন্য তোদের আমি পৃথিবীতে পাঠাইনি। সবাই মিলে তোরা আমাকে এমন লজ্জা দিস!

হেরম্ব খুশি হয়ে বলল, তুমি তো বেশ বলতে পার আনন্দ?

আমি বলতে পারি ছাই। এ সব বাবার কথা।

তোমার বাবা বুঝি খুব আত্মচিন্তা করেন?

দিনরাত। বাবার আত্মচিন্তার কামাই নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আজ বোধ হয় মন একটু বিচলিত হয়েছিল, এসেই আসনে বসেছেন। কখন উঠবেন তার ঠিক নেই। এক একদিন সারারাত আসনে বসেই কাটিয়ে দেন।

মন্দিরের মধ্যে মালতী শুনতে পাবে বলে আনন্দ হেরম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

এই জন্য মা এত ঝগড়া করে। বলে বাড়ি বসে ধ্যান করা কেন, বনে গেলেই হয়। বাবা সত্যি সত্যি দিনের পর দিন যেন কী রকম হয়ে যাচ্ছেন। এত কম কথা বলেন যে, মনে হয় বোবাই বুঝি হবেন।

হেরম্ব এ কথা জানে। অনাথ চিরদিন স্বল্পভাষী। সে রকম স্বল্পভাষী নয়, বেশি কথা কইলে দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবে বলে যারা চুপ করে থাকে। নিজেকে প্রকাশ করতে অনাথের ভালো লাগে না। তার কম কথা বলার কারণ তাই।

মন্দিরের মধ্যে পঞ্চপ্রদীপ নেড়ে টুং টাং ঘণ্টা বাজিয়ে মালতী এদিকে আরতি আরম্ভ করে দিয়েছিল। হেরম্ব বলল, প্রণামি দেবার ভক্ত কই আনন্দ?

তারা সকালে আসে। দুমাইল হেঁটে রাত করে কে এতদূরে আসবে! বিকালে আমাদের একটি পয়সা রোজগার নেই। আজ আপনি আছেন আপনি যদি কিছু দেন।

তুমি আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছ।

আমি আদায় করব কেন? পুণ্য অর্জনের জন্য আপনি নিজেই দেবেন। আমি শুধু আপনাকে উপায়টা বাতলে দিলাম। আনন্দ হাসল। মালতীর ঘণ্টা এই সময় নীরব হওয়ায় আবার হেরম্বের দিকে ঝুঁকে বলল, তাই বলে মা প্রণাম করতে ডাকলে প্রণামি দিয়ে বসবেন না যেন সত্যি সত্যি। মা তাহলে ভয়ানক রেগে যাবে।

মাকে তুমি খুব ভয় কর নাকি আনন্দ?

না, মাকে ভয় করি না। মার রাগকে ভয় করি।

হেরম্ব এক টিপ নস্য নিল। সহজ আলাপের মধ্যে তার আত্মগ্লানি কমে গেছে।

আমাকে? আমাকে তুমি ভয় কর না আনন্দ?

আপনাকে? আপনাকে আমি চিনি না, আপনার রাগ কী রকম জানি না। কাজেই বলতে পারলাম না।

আমাকে তুমি চেনো না আনন্দ! আমি তোমার বন্ধু যে!

আনন্দ অতি মাত্রায় বিস্মিত হয়ে বলল, ব্যস! শোন কথা! আপনি আবার বন্ধু হলেন কখন?

একটু আগে তুমি নিজেই বলেছ। মালতী বউদি সাক্ষী আছে।

আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলল, ভুল করে বলেছিলাম। আমি ছেলেমানুষ, আমার কথা ধরবেন না। কখন কী বলি-না-বলি ঠিক আছে কিছু?

এ রকম অবস্থায় তোমার তবে কিছু না বলাই ভালো, আনন্দ।

কিছু বলছিও না আমি। কী বলেছি? চুপ করে বসে আছি। আপনার যদি মনে হয়ে থাকে আমি বেশি কথা বলছি, আপনাব ভুল মনে হয়েছে জানবেন।... ওই দেখুন চাঁদ উঠেছে।

আনন্দ মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর হেরম্ব তাকায় তার মুখের দিকে। তার অবাধ্য বিশ্লেষণ-প্রিয় মন সঙ্গে সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করে তেজি আলোর চেয়ে জ্যোৎস্নার মতো মৃদু আলোতে মানুষের মুখ আরও বেশি সুন্দর হয়ে ওঠে কেন। আলো অথবা মানুষেব চোখ, কোথায় এ ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়?

হেরম্বের ধারণা ছিল কাব্যকে, বিশেষ করে চাঁদের আলোর কাব্যকে সে বহুকাল পূর্বেই কাটিযে উঠেছে। জ্যোৎস্নার একটি মাত্র গুণের মর্যাদাই তার কাছে আছে, যে এ আলো নিষ্প্রভ, এ আলোতে চোখ জ্বলে না। অথচ, আজ শুধু আনন্দের মুখে এসে পড়েছে বলেই তার মতো সিনিকের কাছেও চাঁদের আলো জগতের আর সব আলোর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।

হেরম্বের বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব সত্য আবিষ্কার করে তাকে নিদারুণ আঘাত করে। কবির খাতা ছাড়া পৃথিবীর কোথাও যে কবিতা নেই, কবির জীবনে পর্যন্ত নয়, তার এই জ্ঞান পুরোনো। কিন্তু এই জ্ঞান আজও যে তার অভ্যাস হয়ে যায়নি, আজ হঠাৎ সেটা বোঝা গেছে। কাব্যকে অসুস্থ নার্ভের টঙ্কার বলে জেনেও আজ পর্যন্ত তার হৃদয়ের কাব্যপিপাসা অব্যাহত রয়ে গেছে, প্রকৃতির সঙ্গে তার কল্পনার যোগসূত্রটি আজও ছিঁড়ে যায়নি। রোমান্সে আজও তার অন্ধ বিশ্বাস, আকুল উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আজও তার কাছে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জ্যোৎস্না তাব চোখের প্রিয়তম আলো। হৃদয়েব অন্ধ সত্য এতকাল তার মস্তিষ্কের নিশ্চিত সত্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। তাব ফলে, জীবনে কোনো দিকে তার সামঞ্জস্য থাকেনি, একধার থেকে সে কেবল করে এসেছে ভুল। দুটি বিরুদ্ধ সত্যের একটিকে সজ্ঞানে আর একটিকে অজ্ঞাতসারে একসঙ্গে মর্যাদা দিয়ে এসে জীবনটা তাব ভরে উঠেছে শুধু মিথ্যাতে। তার প্রকৃতির যে রহস্য, যে দুর্বোধ্যতা সম্মোহনশক্তির মতো মেয়েদের আকর্ষণ করেছে, সে তবে এই? রূঢ় বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে হেরম্ব নিজেকে এই প্রশ্ন করে।

মিথ্যার প্রকাণ্ড একটা স্তূপ ছাড়া সে আর কিছুই নয়, নিজের কাছে এই জবাব সে পায়।

আনন্দের মুখ তার চোখেব সামনে থেকে মুছে যায়। আত্মোপলব্ধির প্রথম প্রবল আঘাতে তাব দেখবার অথবা শুনবার ক্ষমতা অসাড় হয়ে থাকে। এ সহজ কথা নয়। অন্তরের একটা পুরোনো শবগন্ধী পচা অন্ধকার আলোয় ভেসে গেল, একদা নিরবচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নেব রাত্রি দিন হয়ে উঠল। এবং তা অতি অকস্মাৎ। এ বকম সাংঘাতিক মুহূর্ত হেরম্বের জীবনে আর আসেনি। এতগুলো বছর ধরে তার মধ্যে দুজন হেরম্ব গাঢ় অন্ধকারে যুদ্ধ করেছে, আজ আনন্দের মুখে-লাগা চাঁদের আলোয় তারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠায় দেখা গেছে শত্রুতা করে পরস্পরকে দুজনেই তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। হেরম্বেব পরিচয়, ওদের লড়াই। আর কিছু নয়। ফুলের বেঁচে থাকবার চেষ্টার সঙ্গে কীটেব ধ্বংসপিপাসার দ্বন্দ্ব, এই রূপকটাই ছিল এতকালের হেরম্ব।

সমারোহের সঙ্গে দিনের পর দিন নিজের এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে সে বয়ে বেড়িয়েছে। চকমকির মতো নিজের সঙ্গে নিজেকে ঠুকে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়িয়েছে আগুন। কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সে-ই উমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সে খুনি!

হেরম্ব নিঝুম হয়ে বসে থাকে। জীবনের এই প্রথম ও শেষ প্রকৃত আত্মচেতনাকে বুঝেও আরও ভালো করে বুঝবার চেষ্টায় জাল-টানা পচা পুকুরের বুদবুদের মতো অসংখ্য প্রশ্ন, অন্তহীন স্মৃতি তার মনে ভেসে ওঠে।

আনন্দ দুবার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তবে সে তার কথা শুনতে পায়।

কী ভাবছি? ভাবছি এক মজাব কথা, আনন্দ।

কী মজার কথা?

আমি অন্যায় করে এতদিন যত লোককে কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিলে।

এই হেঁয়ালিটি নিয়ে আনন্দ পবিহাস করল না।

বুঝতে পারলাম না যে। বুঝিয়ে বলুন।

তুমি বুঝবে না আনন্দ।

বুঝব। আমি কী করেছি, আমি তা বুঝব। যত বোকা ভাবেন আমি তত বোকা নই।

হেরম্ব বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, তোমার বুদ্ধির দোষ দিইনি।

কথাটা বুঝিয়ে বলবার মতো নয়। আমার এমন খারাপ লাগছে আনন্দ।

আনন্দ সামনের দিকে তাকিয়ে নিরানন্দ স্বরে বলল, তার মানে আমার জন্য খারাপ লাগছে? আচ্ছা লোক যাহোক আপনি!

হেরম্ব অনুযোগ দিয়ে বলল, আমার মন কত খাবাপ হয়ে গেছে জানলে তুমি রাগ করতে না আনন্দ।

আনন্দ বলল, মন বুঝি খালি আপনারই খারাপ হতে জানে? সংসাবে আর কারও বুঝি মন নেই? হেঁয়ালি করা সহজ। কারণ তাতে বিবেচনা থাকে না। লোকের মনে কষ্ট দেওয়া পাপ এমনিতেই মানুষেব মনে কত দুঃখ থাকে।

আনন্দেব অভিমানে হেরম্বের হাসি এল।

তোমার দুঃখ কীসের আনন্দ?

আপনারই বা মন খারাপ হওয়া কীসের? চাঁদ উঠেছে, এমন হাওয়া দিচ্ছে, এখুনি প্রসাদ খেতে পাবেন, তারপব আমার নাচ দেখবার আশা করে থাকবেন—আপনারই তো ষোলো আনা সুখ। দুঃখ হতে পারে আমার। আমি এত মন্দ যে লোককে মিছিমিছি কখন শাস্তি দি নিজে তা টেরও পাই না। আমার কাছে বসতে হলে লোকের এমনি বিশ্রী লাগে, আমি মিষ্টি-মিষ্টি কথা বললেও। হুঁঃ, আমাব দুঃখের নাকি তুলনা আছে!

হেরম্ব ভাবল, আজ নিজের কথা ভেবে লাভ নেই। নিজের কথা ভুল কবে ভেবে এতদিন জীবনটা অপচয়িত হয়ে গেছে, এখন নির্ভুল করে ভাবতে গেলেও আজ রাত্রিটা তাই যাবে। আনন্দের অমৃতকে আত্মবিশ্লেষণেব বিষে নষ্ট কবে আগামীকালেব অনুশোচনা বাড়ানো সঙ্গত হবে না।

খারাপ লাগছে কেন, জান?

কী করে জানব? বলেছেন? আনন্দ আশান্বিত হয়ে উঠল।

তোমার কাছে বসে আছি বলে যে খারাপ লাগছে এ কথা মিথ্যে নয় আনন্দ।

তা জানি।

কিন্তু কেন জান?

আনন্দ রেগে বলল, জানি জানি। আমার সব জানা আছে। কেবল জানো জানো করে একটা কথাই একশো বার শোনাবেন তো!

একটা কথা একশো বার আমি কারুকেই শোনাই না। এমন কথা শোনাব, কখনও তুমি যা শোননি।

থাক। না শুনলেও আমার চলবে। আপনি অনেক কথা বলেছেন, ফুসফুস হয়তো আপনার বাথা হয়ে গেছে। এইবার একটু চুপ করে বসুন।

আর তা হয় না আনন্দ। তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার কাছে বসে আমার মনে হচ্ছে, এতকাল তোমার সঙ্গে কেন আমার পরিচয় ছিল না? তাই খারাপ লাগছে।

আনন্দের নালিশ করবার পর থেকে বিনা পরামর্শের তাদের গলা নিচু হয়ে গিয়েছিল। নিজের কথা নিজের কানেই যেন শোনা চলবে না।

হেরম্ব নয়, সে-ই যেন মিথ্যা কথা বলেছে এমনি ভাবে আনন্দ বলল, আপনি এমন বানিয়ে বলতে পারেন!

আরতি শেষ করে আনন্দ আজ মন্দিরে নাচবে না শুনে মালতী মন্দিরের দরজায় তালা দিল।

এসে থেকে ঠায় বসে আছ সিঁড়িতে। ঘরে চলো হেরম্ব। তুই এই বেলা কিছু খেয়ে নে না আনন্দ?

বাড়ির দিকে চলতে আরম্ভ করে আনন্দ বলল, প্রসাদ খেলাম যে?

প্রসাদ আবার খাওয়া কি লো ছুঁড়ি? আর কিছু খা। নাচবেন বলে মেয়ে আমার খাবেন না, ভারী নাচনেউলি হয়েছেন।

আনন্দ তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, শোনো মা, শোনো! আজ যদি আমায় বক, সেদিনের মতো হবে কিন্তু।

হেরম্ব দেখে বিস্মিত হল যে, এ কথায় মালতী সত্যসত্যই ভড়কে গেল।

কে তোকে বকছে বাবু! শুধু বলেছি, কিছু খা! খেতে বলাও দোয?

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, সেদিন কী হয়েছিল?

আনন্দ বলল, বোলো না মা।

মালতী বলল, আমি একটু বকেছিলাম। বলেছিলাম, উপোস করে থাকলে নাচতে পারবি না আনন্দ। এই শুধু বলেছি, আর কিছুই নয়। যেই বলা—

আনন্দ বলল, যেই বলা! কতক্ষণ ধরে বকেছিলে মনে নেই বুঝি?

মালতী বলল, হ্যাঁরে হ্যাঁ, তোকে আমি সারাদিন ধরে শুধু বকেছি। খেয়ে-দেয়ে আমার আর কাজ নেই। তারপর মেয়ে আমার কি করল জান হেরম্ব? কান্না আরম্ভ করে দিল। সে কী কান্না হেরম্ব, বাপের জন্মে আমি অমন কান্না দেখিনি। কিছুতেই কি থামে? লুটিয়ে লুটিয়ে মেয়ে আমার কাঁদছে তো কাঁদছেই। আমরা শেষে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি আদব করি, উনি এসে কত বোঝান, মেয়ের কান্না তবু থামে না। দুজনে আমরা হিমসিম খেয়ে গেলাম।

হেরম্ব ফিসফিস করে মালতীকে জিজ্ঞাসা করল, আনন্দ পাগল নয় তো, মালতী বউদি?

কী জানি। ওকেই জিজ্ঞেস করো।

আনন্দ কিছুমাত্র লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হল না। সপ্রতিভভাবেই সে বলল, পাগল বইকী। আমি অভিনয় করেছিলাম, মজা দেখছিলাম।

চোখ দিয়ে জলও অভিনয় করেই ফেলেছিলি, না রে আনন্দ?

চোখ দিয়ে জল ফেলা শক্ত নাকি! বল না, এখুনি মেঝেতে পুকুর করে দিচ্ছি! বসুন এই চৌকিটাতে।

হেরম্ব বসল। দুটি ঘরের মাঝখানে সরু ফাঁক দিয়ে বাড়িতে ঢুকে অন্দরের বারান্দা হয়ে সে এই ঘরে পৌঁছেছে। বারান্দায় বোঝা গিয়েছিল, বাড়িটা লম্বাটে ও দুপেশে। লম্বা সারিতে বোধ হয় ঘর তিনখানা, অন্যপাশে একখানি মাত্র ঘর এবং তার সঙ্গে লাগানো নিচু একটা চালা। চালার নীচে দুটি আবছা গোরু হেরম্বের চোখে পড়েছিল। বাড়ির আর দুটি দিক প্রাচীর ঘেরা। প্রাচীরের মাথা ডিঙিয়ে জ্যোৎস্নালোকে বনানীর মতো নিবিড় একটি বাগান দেখা যায়।

এ ঘরখানা লম্বা সারির শেষে।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, এটা কার ঘর?

আনন্দ বলল, আমার।

চৌকির বিছানা তবে আনন্দের? প্রতি রাত্রে আনন্দের অঙ্গের উত্তাপ এই শয্যায় সঞ্চিত হয়? বালিশে আনন্দের গালের স্পর্শ লাগে? হেরম্ব নিজেকে অত্যন্ত শ্রান্ত মনে করতে লাগল। জুতো খুলে বলল, আমি একটু শুলাম আনন্দ।

শুলেন? শুলেন কী রকম! তার শয্যায় হেরম্ব শোবে শুনে আনন্দের বোধ হয় লজ্জা করে উঠল।

মালতী বলল, শোও না, শোও। একটা উঁচু বালিশ এনে দে আনন্দ। আমার ঘর থেকে তোর বাপের তাকিয়াটা এনে দে বরং। যে বালিশ তোর।

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলল, বালিশ চাই না মালতী বউদি। উঁচু বালিশে আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়।

মালতী হেসে বলল, কী জানি বাবু, কী রকম ঘাড় তোমার। আমি তো উঁচু বালিশ নইলে মাথায় দিতে পারি না। আচ্ছা তোমরা গল্প কর, আমি আমার কাজ করি গিয়ে। ওঁকে খেতে দিস আনন্দ।

আনন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, কী কাজ করবে মা?

সাধনে বসব।

আজও তুমি ওই সব খাবে? একদিন না খেলে চলে না তোমার?

মালতীর মধ্যেও হেরম্ব বোধ হয় সাময়িক কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। রাগ না করে সে শান্তভাবেই বলল, কেন, আজ কী? হেরম্ব এসেছে বলে? আমি পাপ করি না আনন্দ যে ওর কাছ থেকে লুকোতে হবে। হেরম্বও খাবে একটু।

আনন্দ বলল, হ্যাঁ খাবে বইকী! অতিথিকে আর দলে টেনো না মা।

মালতী বলল, তুই ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিসনে, কেন কথা কইতে আসিস আনন্দ? হেরম্ব খাবে বইকী। তোমাকে একটু কারণ এনে দি হেরম্ব? বলে সে ব্যগ্র দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেরম্বের অনুমানশক্তি আজ আনন্দসংক্রান্ত কর্তব্যগুলো সম্পন্ন করতেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছিল। তবু নিজে কারণ পান করে একটা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা অর্জন করার আগেই তাকে মদ খাওয়াবার জন্য মালতীর আগ্রহ দেখে সে একটু বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। ভাবল, মালতী বউদি আমাকে পরীক্ষা করছে নাকি? আমি মদ খাই কিনা, নেশায় আমার আসক্তি কতখানি তাই যাচাই করে দেখছে?

মালতীর অস্বাভাবিক সারল্য এবং ভবিষ্যতে আসা-যাওয়া বজায় রাখার জন্য তাকে অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতায় বেঁধে ফেলার প্রাণপণ প্রয়াস স্মরণ করে হেরম্বের মনে হল মালতী যে সন্ধ্যা থেকে তার দুর্বলতার সন্ধান করছে—এ কথা হয়তো মিথ্যা নয়। মালতীর মনের ইচ্ছাটা মোটামুটি অনুমান হেরম্ব অনেক আগেই করেছিল। যে গৃহ একদিন সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছে, মেয়ের জন্য তেমনি একটি গৃহ সৃষ্টি করতে চেয়ে মালতী ছটফট করছে। সে বা চিরকাল বাঁচবে না আনন্দের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু গৃহ যাদের একচেটিয়া তারা যে কতদূর নিয়মকানুনের অধীন সে খবর মালতী রাখে। কুড়ি বছরের পুরাতন গৃহত্যাগের ব্যাপারটা লুকিয়ে অনাথ যে তার বিবাহিত স্বামী নয় এ খবর গোপন করে, মেয়ের বিয়ে দেবার সাহস মালতীর নেই। অথচ আনন্দ যে পুরুষের ভালোবাসা পাবে না, ছেলে-মেয়ে পাবে না, মেয়েমানুষ হয়ে এ কথাটাও সে ভাবতে পারে না। আজ সে এসে দাঁড়ানোমাত্র মালতীর আশা হয়েছে। বারো বছর আগে মধুপুরে তার যে পরিচয় মালতী পেয়েছিল হয়তো সে তা ভোলেনি।

কিন্তু তবু সে যাচাই করে নিতে চায়। বুঝতে চায়, অনাথের শিষ্য কতখানি অনাথের মতো হয়েছে।

হেরম্ব বলল, না, কারণ-টারণ আমার সইবে না মালতী বউদি।

খাওনি বুঝি কখনও?

কখনও খায়নি বললে মালতী বিশ্বাস করবে না মনে করে হেরম্ব বলল, একদিন খেয়েছিলাম। আমার এক ব্যারিস্টার বন্ধুর বাড়িতে। একদিনেই শখ মিটে গেছে, মালতী বউদি।

সুপ্রিয়ার কথা হেরম্বের মনে পড়ছিল। একদিন একটুখানি মদ খেয়েছিল বলে তাকে সে ক্ষমা করেনি। আজ মিথ্যা বলে মালতীর কাছে তাকে আত্মসমর্থন করতে হচ্ছে।

মালতী খুশি হয়ে বলল, তাহলে তোমার না খাওয়াই ভালো। সাধনের জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে খেতে হয়, তাছাড়া ওতে আমার কোনো ক্ষতিই হয় না, হেরম্ব। কারণ-পান করলে তোমার নেশা হবে, আমার শুধু একাগ্রতার সাহায্য হয়। প্রক্রিয়া আছে, মন্ত্রতন্ত্র আছে—সে সব তুমি বুঝবে না, হেরম্ব। বাবা বলেন, নেশার জন্য ও সব খাওয়া মহাপাপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খাও, কোনো দোষ নেই।

আনন্দ মিনতি করে বলল, আজ থাক মা।

মালতী মাথা নেড়ে অস্বীকার করে চলে গেল।

ঘরের মাঝখানে লণ্ঠন জ্বলছিল। কাচ পরিষ্কার, পলতে ভালো করে কাটা, আলোটা বেশ উজ্জ্বল। পূর্ণিমার প্রাথমিক জ্যোৎস্নার চেয়ে ঢের বেশি উজ্জ্বল। হেরম্বের মনে হল, আনন্দেব মুখ ম্লান দেখাচ্ছে।

আনন্দ বলল, মার দোষ নেই।

দোষ ধরিনি, আনন্দ।

দোষ না ধরলে কী হবে! মেয়েমানুষ মদ খায় এ কী সহজ দোষের কথা।

সুপ্রিয়াকে মনে করে হেরম্ব চুপ করে রইল।

একটা জলচৌকি সামনে টেনে এনে আনন্দ তাতে বসল।

কিন্তু মার সত্যি দোষ নেই। এ সব বাবার জন্য হয়েছে। জানেন, মার মনে একটা ভয়ানক কষ্ট আছে। একবার পাগল হয়ে যেতে বসেছিল এই কষ্টের জন্যে।

কীসের কষ্ট?

আনন্দ বিষণ্ন চিন্তিত মুখে গোলাকার আলোর শিখাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, মা বাবাকে ভয়ানক ভালোবাসে। বাবা যদি দুদিনের জন্যও কোথাও চলে যান, মা ভেবে ভেবে ঠিক পাগলের মতো হয়ে থাকে। বাবা কিন্তু মাকে দুচোখে দেখতে পারেন না। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে একদিন বাবাকে একটি মিষ্টিকথা বলতে শুনিনি। হেরম্ব অবাক হয়ে বলল, কিন্তু মাস্টারমশায় তো কড়া কথা বলবার লোক নন!

রেগে চেঁচামেচি করে না বললে বুঝি কড়া কথা বলা হয় না? আপনার সামনে মাকে আজ কী রকম অপদস্থ করলেন, দেখলেন না? চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়িতে থাকি, মার অবস্থা আমার কী আর বুঝতে বাকি আছে। এমনি মা অনেকটা শান্ত হয়ে থাকে। মদ খেলে আর রক্ষা নেই। গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেবে। শুনতে পাবার ভয়ে আমি অবশ্য বাগানে পালিয়ে যাই, তবু দুচারটে কথা কানে আসে তো। আমার মন এমন খারাপ হয়ে যায়। ক্ষণিকের অবসর নিয়ে আনন্দ আবার বলল, বাবা এমন নিষ্ঠুর!

কাত হয়ে আনন্দের বালিশে গাল রেখে হেরম্ব শুয়ে ছিল। বালিশে মৃগনাভির মৃদু গন্ধ আছে। মালতীর দুঃখের কাহিনি শুনতে শুনতে সে স্মরণ করবার চেষ্টা করছিল কস্তুরীগন্ধের সঙ্গে তার মনে কার স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আনন্দের উচ্চারিত নিষ্ঠুর শব্দটা তার মনকে আনন্দের দিকে ফিরিয়ে দিল।

নিষ্ঠুর?

ভয়ানক নিষ্ঠুর। আজ বাবার কাছে একটু ভালো ব্যবহার পেলে মা মদ ছোঁয় না। জেনেও বাবা উদাসীন হয়ে আছেন। এক এক সময় আমার মনে হয়, এর চেয়ে বাবা যদি কোথাও চলে যেতেন তাও ভালো ছিল। মা বোধ হয় তাহলে শান্তি পেত।

বাবা যদি কোথাও চলে যেতেন! আনন্দও তাহলে প্রয়োজন উপস্থিত হলে নিষ্ঠুর চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে পারে? মালতীর দুঃখের চেয়ে আনন্দের এই নূতন পরিচয়টিই যেন হেরম্বের কাছে প্রধান হয়ে থাকে। তার নানাকথা মনে হয়। মালতীর অবাঞ্ছনীয় পরিবর্তনকে আনন্দ যথোচিতভাবে বিচার করতে অক্ষম নয় জেনে সে সুখী হয়। মালতীর অধঃপতন রহিত করতে অনাথকে পর্যন্ত সে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করে, মালতীর দোষগুলো তার কাছে এতদূর বর্জনীয়। মাতৃত্বের অধিকারে যা খুশি করবার সমর্থন আনন্দের কাছে মালতী পায়নি। শুধু তাই নয়। আনন্দের আরও একটি অপূর্ব পরিচয় তার মালতী সম্পর্কীয় মনোভাবের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। মালতীকে সে দোষী বলে জানে, কিন্তু সমালোচনা করে না, তাকে সংস্কৃত ও সংশোধিত করবার শতাধিক চেষ্টায় অশান্তির সৃষ্টি করে না। মালতীকে কীসে বদলে দিয়েছে আনন্দ তা জানে। কিন্তু জানার চেয়েও যা বড়ো কথা, মনোবেদনার এই বিকৃত অভিব্যক্তিকে সে বোঝে, অনুভব করে। জীবনের এই যুক্তিহীন অংশটিতে যে অখণ্ড যুক্তি আছে, আনন্দের তা অজানা নয়। ওর বিষণ্ণ মুখখানি হেরম্বের কাছে তার প্রমাণ দিচ্ছে।

আনন্দ চুপ করে বসে আছে। তার এই নীরবতার সুযোগে তাকে সে কতদিক দিয়ে কতভাবে বুঝেছে হেরম্বের মনে তার চুলচেরা হিসাব থাকে। কিন্তু এক সময় হঠাৎ সে অনুভব করে এই প্রক্রিয়া তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আনন্দকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টায় তার মধ্যে কেমন একটা অনুত্তেজিত অবসন্ন জ্বালা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্মুখে পথ অফুরন্ত জেনে যাত্রার গোড়াতেই অশ্রান্ত পথিকের যেমন স্তিমিত হতাশা জাগে, একটা ভারবোধ তাকে দমিয়ে রাখে, সেও তেমনি একটা ঝিমানো চেপে-ধরা কষ্টের অধীন হয়ে পড়েছে। আনন্দের অন্তরঙ্গ প্রশ্রয়ে তার যেন সুখ নেই।

হেরম্ব বিছানায় উঠে বসে। লণ্ঠনের এত কাছে আনন্দ বসেছে যে তাকে মনে হচ্ছে জ্যোতির্ময়ী, আলো যেন লণ্ঠনের নয়। হেরম্ব অসহায় বিপন্নের মতো তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আরও একটি অভিনব আত্মচেতনা খুঁজে পায়। তার বিহ্বলতার সীমা থাকে না. সন্ধ্যা থেকে আনন্দকে সে যে কেন নানাদিক থেকে বুঝবার চেষ্টা করছে, এতক্ষণে হেরম্ব সে রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। ঝড়ো রাত্রির উত্তাল সমুদ্রের মতো অশান্ত অসংযত হৃদয়কে এমনিভাবে সে সংযত করে রাখছে, আনন্দকে জানবার ও বুঝবার এই অপ্রমত্ত ছলনা দিয়ে। আনন্দ যেমনি হোক কী তার এসে যায়? সে বিচার পড়ে আছে সেই জগতে, যে জগৎ আনন্দের জন্যই তাকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। জীবনে ওর যত অনিয়ম—যত অসঙ্গতিই থাক, কীসের সঙ্গে তুলনা করে সে তা যাচাই করবে? আনন্দকে সে যে স্তরে পেয়েছে সেখানে ওর অনিয়ম নিয়ম, ওর অসঙ্গতিই সঙ্গতি। ওর অনিবার্য আকর্ষণ ছাড়া বিশ্বজগতে আজ আর দ্বিতীয় সত্য নেই; ওর হৃদয়মনের সহস্র পরিচয় সহস্রবার আবিষ্কার করে তার লাভ কী হবে? তার মোহকে সে চরম পরিপূর্ণতার স্তরে তুলে দিয়েছে. তাকে আবার গোড়া থেকে শুরু করে বাস্তবতার ধাপে ধাপে চিনে গিয়ে তিল তিল করে মুগ্ধ হবার মানে কী হয়। এ তারই হৃদয়মনের দুর্বলতা। ঈশ্বরকে কৃপাময় বলে কল্পনা না করে যে দুর্বলতার জন্য মানুষ ঈশ্বরকে ভালোবাসতে পারে এ সেই দুর্বলতা। আনন্দকে আশ্রয় করে যে অপার্থিব অবোধ অনুভূতি নীহারিকালোকের রহস্য-সম্পদে তার চেতনাকে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে দিতে চায়, পৃথিবীর মাটিতে প্রোথিত সহস্র শিকড়ের বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে ঊর্ধ্বায়ত জ্যোতিস্তরের মতো তাকে উত্তুঙ্গ আত্মপ্রকাশে সমাহিত করে ফেলতে চায়, সেই অব্যক্ত অনুভূতি ধারণ করবার শক্তি হৃদয়ের

নেই বলে অভিজ্ঞতার অসংখ্য অনভিব্যক্তি দিয়ে তাকেই সে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। আকাশকুসুমকে আকাশে উঠে সে চয়ন করতে পারে না। তাই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে বাগানের মাটিতে তার চাষ করছে। হৃদয়ের একটিমাত্র অবাস্তব বন্ধনের সমকক্ষ লক্ষ বাস্তব বন্ধন সৃষ্টি করে সে আনন্দকে বাঁধতে চায়। সুখদুঃখের অতীত উপভোগকে সে পরিণত করতে চায় তাব পরিচিত পুলক-বেদনায়। আজ সন্ধ্যা থেকে সে এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছে।

আনন্দ পুরাতন প্রশ্ন করল।

কী ভাবছেন?

অনেক কথাই ভাবছি, আনন্দ। তার মধ্যে প্রধান কথাটা এই আমার কী হয়েছে।

কী হয়েছে?

কী রকম একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে।

আনন্দ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, আমারও হয়। নাচবার আগে আমারও ও রকম হয়।

হেরম্ব উৎসুক হয়ে বলল, তোমার কী রকম লাগে?

কী রকম লাগে? আনন্দ একটু ভাবল, তা বলতে পারব না। কী রকম যেন একটা অদ্ভুত—।

আমি কিন্তু বুঝতে পারছি, আনন্দ।

আমিও আপনারটা বুঝতে পারছি।

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে তাবা হেসে ফেলল।

আনন্দ বলল, আপনার খিদে পায়নি? কিছু খান।

হেরম্ব বলল, দাও। বেশি দিও না।

একটি নিঃশব্দ সংকেতের মতো আনন্দ যতবার ঘরে আনাগোনা করল, জানালার পাটগুলো ভালো করে খুলে দিতে গিয়ে যতক্ষণ সে জানালার সামনে দাঁড়াল, ঠিক সম্মুখে এসে যতবাব সে চোখ তুলে সোজা তার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল—তাব প্রত্যেকটির মধ্যে হেরম্ব তার আত্মার পরাজয়কে ভুলে যাবার প্রেরণা আবিষ্কার করল। তার ক্রমে ক্রমে মনে হল, হয়তো এ পরাজয়ের গ্লানি মিথ্যা। বিচারে হয়তো ভুল আছে। হয়তো জয়-পরাজয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

হেরম্বের মন যখন এই আশ্বাসকে খুঁজে পেয়েও সন্দিগ্ধ পরীক্ষকেব মতো বিচার করে না দেখে গ্রহণ করতে পারছে না, আনন্দ তার চিন্তায় বাধা দিল। আনন্দের হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, সিঁড়িতে বসে হেরম্বকে একটা কথা বলবে, মনে করেও বলা হয়নি। কথাটা আর কিছুই নয়। প্রেম যে একটা অস্থায়ী জোরালো নেশা মাত্র হেরম্ব এ খবর পেল কোথায়? একটু আগেও এ কথা জিজ্ঞাসা করতে আনন্দের লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখুন হেরম্ববাবু, এখন আর একটুও লজ্জা করছে না।

আপনাকে সত্যি কথাটা বলি। সন্ধ্যার সময় আপনাকে যে বন্ধু বলেছিলাম, সেটা বানানো কথা। এতক্ষণে আপনাকে বন্ধু মনে হচ্ছে।

এখন কত রাত্রি?

কী জানি। দশটা সাড়ে দশটা হবে। ঘড়ি দেখে আসব?

থাক। আমার কাছে ঘড়ি আছে। দশটা বাজতে এখনও তেরো মিনিট বাকি।

আনন্দ বিস্মিত হয়ে বলল, ঘড়ি আছে, সময় জিজ্ঞেস করলেন যে?

হেরম্ব হেসে বলল, তুমি ঘড়ি দেখতে জান কিনা পরখ করছিলাম। মালতী বউদির সাড়াশব্দ যে পাচ্ছি না?

আনন্দ হাসল। বলল, অত বোকা নই, বুঝলেন? এমনি করে আমার কথাটা এড়িয়ে যাবেন, তা হবে না। রোমিও জুলিয়েট বেঁচে থাকলে তাদের প্রেম অল্পদিনের মধ্যে মরে যেত, আপনি কী করে জানলেন বলুন।

হেরম্ব এটা আশা করেনি। লজ্জা না কবার অভিনয় করতে আনন্দের যে প্রাণান্ত হচ্ছে, এটুকু ধবতে না পারার মতো শিশুচোখ হেরম্বের নয়। এবাব মবিয়া হয়ে সে প্রশ্ন করছে, তাব সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত প্রশ্নটা। তাব এ সাহস অতুলনীয়। কিন্তু প্রশ্নটা চাপা দিয়েও আনন্দেব সরম-তিক্ত অনুসন্ধিৎসাকে চাপা দেওয়া গেল না দেখে হেরম্ব অবাক হয়ে বইল।

বুদ্ধি দিয়ে জানলাম। হেরম্ব এই জবাব দিল।

শুধু বুদ্ধি দিয়ে?

শুধু বুদ্ধি দিয়ে, আনন্দ! বিশ্লেষণ করে। আনন্দের বালিশ থেকে সদ্য-আবিষ্কৃত লম্বা চুলটির একপ্রান্ত আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে সেটিকে হেরম্ব সোজা করে রাখল।

জল খেয়ে আসি। বলে আনন্দ গেল পালিয়ে।

হেরম্ব তখন আবার ভাবতে আরম্ভ করল যে কোন অজ্ঞাত সত্যকে আবিষ্কার করতে পাবলে তার হৃদয়ের চিরন্তন পরাজয়, জয়-পরাজয়ের স্তরচ্যুত হয়ে সকল পার্থিব ও অপার্থিব হিসাবনিকাশেব অতীত হয়ে যেতে পারে। চোখ দিয়ে দেখে, স্পর্শ দিয়ে অনুভব করে, বুদ্ধি দিয়ে চিনে ও হৃদয় দিয়ে কামনা করে, মর্ত্যলোকেব যে-আত্মীয়তা আনন্দের সঙ্গে তাব স্থাপিত হওযা সম্ভব, আত্মাব অতীন্দ্রিয় উদাত্ত আত্মীয়তাব সঙ্গে তাব তুলনা কোথায রহিত হয়ে গেছে। কোন হৃদ্য যুক্তি, সীমাবেখার মতো, এই দুটি মহাসত্যকে এমন ভাবে ভাগ করে দিয়েছে যে, তাদেব অস্তিত্ব আর পরস্পর-বিবোধী হয়ে নেই, তাদেব একটি অপরটিকে কলঙ্কিত করে দেয়নি।

আনন্দেব ফিরে আসতে দেরি হয়। হেরম্বের ব্যাকুল অন্বেষণ তাব দেহকে অস্থির কবে দেয়। বিছানা থেকে নেমে সে ঘরের মধ্যে পাযচারি আরম্ভ করে। এদিকের দেয়াল থেকে ওদিকেব দেয়াল পর্যন্ত হেঁটে যায়, থমকে দাঁড়ায এবং প্রত্যাবর্তন করে। তিনটি খোলা জানালা প্রত্যেকবার তার চোখের সামনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পৃথিবীকে মেলে ধরে। কিন্তু হেবম্বেব এখন উপেক্ষা অসীম। সম্মুখেব সুদূব সাদা দেয়ালটির আধ হাতেব মধ্যে এসে গতিবেগ সংযত করে, আব কিছুই দেখতে পায় না। মেঝেতে আনন্দেব পরিত্যক্ত একটি ফুল তার পায়ের চাপে পিষে যায়।

হেরম্ব জানে, আলো এই অন্ধকাবে জ্বলবে। তাকে চমকে না দিয়ে বিনা আড়ম্বরে তাব হৃদয়ে পরম সত্যটির আবির্ভাব হবে। তাব সমস্ত অধীরতা অপমৃত্যু লাভ কববে না, ঘুমিয়ে পডবে জীবনের চরম জ্ঞানকে সুলভ ও সহজ বলে জেনে সে তখন ক্ষুণ্ণ অথবা বিস্মিত পর্যন্ত হবে না। কিন্তু তাব দেরি কত?

ফিরে এসে তার চাঞ্চল্য লক্ষ করে আনন্দ অবাক হয়ে গেল কিন্তু কথা বলল না। বিছানার একপাশে বসে তার অস্থির পদচারণাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। হেরম্ব বহুদিন হল তাব চুলের যত্ন নিতে ভুলে গেছে। তবু তার চুলে এতক্ষণ যেন একটা শৃঙ্খলা ছিল। এখন তাও নেই। তাকে পাগলের মতো চিন্তাশীল দেখাচ্ছে। আনন্দের সামনে এমনিভাবে সে যেন কত যুগ ধরে খ্যাপার মতো অসংলগ্ন পদবিক্ষেপে হেঁটে হেঁটে শুধু ভেবে গিয়েছে। পৃথিবীতে বাস করার অভ্যাস যেন তার নেই। প্রবাসে আপনার অনির্বচনীয় একাকিত্বের বেদনায় এমনি প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের সঙ্গে সে সর্বদা স্বদেশের স্বপ্ন দেখে।

আনন্দের আবির্ভাব হেরম্ব টের পেয়েছিল। কিন্তু সে যে মানসিক অবস্থায় ছিল তাতে এই আবির্ভাব কিছুক্ষণের জন্য মূল্যহীন হয়ে থাকতে বাধ্য।

হেরম্ব হঠাৎ তার সামনে দাঁড়াল।

ব্যায়াম করছি, আনন্দ।

ব্যায়াম শেষ হয়ে থাকলে বসে বিশ্রাম করুন।

হেরম্ব তৎক্ষণাৎ বসল। বলল, তুমি বারবার মুখ ধুয়ে আসছ কেন?

মুখে ধুলো লাগে যে। আনন্দ হাসবার চেষ্টা করল।

তাদের অদ্ভুত নিরবলম্ব অসহায় অবস্থাটি হেরম্বের কাছে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে যায়। তাদের কথা বলা অর্থহীন, তাদের চুপ করে থাকা ভংয়কব। পায়ের তলা থেকে তাদের মাটি প্রায় সরে গেছে, তাদেব আশ্রয় নেই। মানুষের বহুযুগেব গবেষণাপ্রসূত সভ্যতা আর তাবা ব্যবহাব করতে পারছে না। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম, এমনকী, ঈশ্বরকে নিয়ে পর্যন্ত তাদের আলাপ-আলোচনা অচল, এতদূব অচল যে, পাঁচ মিনিট ও সব বিষয়ে চেষ্টা করে কথা চালালে নিজেদের বিশ্রী অভিনয়ের লজ্জায় তারা কণ্টকিত হয়ে উঠবে। এই কক্ষের বাইরে জ্ঞান নেই, সমস্যা নেই, প্রয়োজনীয় কিছু নেই— মানুষ পর্যন্ত নেই। তাদের কাছে বাইরের জগৎ মুছে গেছে, আব সে জগৎকে কোনো ছলেই এ ঘরে টেনে আনা যাবে না। একান্ত ব্যক্তিগত কথা ছাড়া তাদের আর বলবার কিছু নেই। অথচ এই সীমাবদ্ধ আলাপেও যে কথাগুলো তারা বলতে পারছে সেগুলো বাজে, অবান্তর। বোমার মতো ফেটে পড়তে চেয়ে তাদের তুড়ি দিয়ে খুশি থাকতে হচ্ছে।

এ অবস্থা সুখের নয়, কাম্য নয়, হেরম্বের তা স্বীকার করতে হল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ যে এই অসুবিধাকে ছাপিয়ে আছে এ কথা জানতেও তার বাকি ছিল না। পবস্পরের কত অনুচ্চাবিত চিন্তাকে তারা শুনতে পাচ্ছে। তাদের কত প্রশ্ন ভাষায় রূপ না নিয়েও নিঃশব্দ জবাব পাচ্ছে। শাড়ির প্রান্ত টেনে নামিয়ে পায়ের পাতা ঢেকে দিয়ে বলছে, পা দুটি তার অত করে দেখবার মতো নয় , আঁচলের তলে হাত দুটি আড়াল করে বলছে, পা দেখতে দিলাম না বলে তুমি অমন করে আমার হাঁতের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তা হবে না। সে তার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিচ্ছে এবার তুমি মুখ ঢাক কী করে দেখি! আনন্দের মৃদু রোমাঞ্চ ও আরক্ত মুখ প্রতিবাদ করে বলছে, আমাকে এমন করে হার মানানো তোমার উচিত নয়। দবজার দিকে চেয়ে আনন্দ ভয় দেখাচ্ছে আমি ইচ্ছে করলেই উঠে চলে যেতে পাবি।

হঠাৎ তাব মুখে বিষণ্ণতা ঘনিয়ে আসছে। তার চোখ ছলছল করে উঠছে। চোখের পলকে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এও ভাষা, সুস্পষ্ট বাণী! কিন্তু এর অর্থ অতল, গভীব, বহস্যময়। তার কত ভয়, কত প্রশ্ন, নিজের কাছে হঠাৎ নিজেই দুর্বোধ্য হয়ে উঠে তার কী নিদারুণ কষ্ট, হেরম্ব কি তা জানে? তার মন কতদূর উতলা হয়ে উঠেছে হেরম্ব কি তার সন্ধান বাখে? একটা বিপুল সম্ভাবনা গুহা-নিরুদ্ধ নদীর মতো তাকে যে ভেঙে ফেলতে চাচ্ছে, হেরম্ব তাও কি জানে? হয়তো আজ থেকেই তার চিরকালের জন্য দুঃখের দিন শুরু হল, এ আশঙ্কা যে তার মনে জ্বালার মতো জেগে আছে, হেরম্ব কি তা কল্পনাও কবতে পারে?

নিঃশব্দ নির্মম হাসির সঙ্গে উদাসীন চোখে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে হেরম্ব জবাব দিচ্ছে : দুঃখকে ভয় কোরো না। দুঃখ মানুষের দুর্লভতম সম্পদ! তাছাড়া আমি আছি। আমি!

কথার অভাবে তাদের দীর্ঘতম নীরবতার শেষে আনন্দ বলল, চলুন, নাচ দেখবেন।

আনন্দের নাচ যে বাকি আছে, সে কথা হেরম্বের মনে ছিল না।

চলো। বেশ পরিবর্তন করবে না?

করব। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।

দিবারাত্রির কাব্য : আদি পাণ্ডুলিপির একটি পৃষ্ঠা

হেরম্ব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনাথের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল এককোণে মেরুদণ্ড টান করে নিস্পন্দ হয়ে সে বসে আছে। জীবনে বাহুল্যের প্রয়োজন আছে। কত বিচিত্র উপায়ে মানুষ এ প্রয়োজন মেটায়!

বাড়ির বাইরে গিয়ে মন্দিরের সামনে ফাঁকা জায়গায় হেরম্ব দাঁড়াল। ইতিমধ্যে এখানে অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে গেছে। তা যদি না হয়ে থাকে, তবে হেরম্বের চোখেরই পরিবর্তন হয়েছে নিশ্চয়। মন্দিব ও বাড়ির শ্যাওলার আবরণ এক প্রস্থ ছায়ার আস্তরণের মতো দেখাচ্ছে। বাগানে তরুতলেব রহস্য আরও ঘন আরও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। আনন্দ যে ঘাসেব জমিতে নাচবে সেখানে জ্যোৎস্না পড়েছে আর পড়েছে দেবদারু গাছটার ছায়া। সমুদ্রের কলরব ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। রাত্রি আবও বাড়লে, চারিদিক আরও স্তব্ধ হয়ে এলে, আরও স্পষ্টভাবে শোনা যাবে।

পৃথিবীতে চিরদিন এই সংকেত ও সংগীত ছিল, চিবদিন থাকবে। মাঝখানে শুধু কয়েকটা বছরের জন্য নিজেকে সে উদাসীন করে রেখেছিল। সে মরেনি, ঘুমিয়ে পড়েছিল মাত্র। ঘুম ভেঙে, দুঃস্বপ্নের ভগ্নস্তূপকে অতিক্রম করে সে আবার স্তবে স্তরে সাজানো সুন্দর রহস্যময় জীবনের দেখা পেয়েছে। যে স্পন্দিত বেদনা প্রাণ ও চেতনার একমাত্র পবিচয় আজ আর হেরম্বের তার কোনো অভাব নেই।

হেবম্ব মন্দিরেব সিঁড়িতে বসল।

আনন্দের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বাড়ির দরজায় সে চোখ পেতে রাখল না। আনন্দ বেশ পরিবর্তন করেই বাইরে এসে তাকে নাচ দেখাবে, চঞ্চল হয়ে ওঠাব কোনো কারণ নেই। এই সংক্ষিপ্ত বিরহটুকু তার বরং ভালোই লাগছে। আনন্দ যদি আসতে দেরিও করে সে ক্ষুণ্ণ হবে না।

আনন্দ দেরি না করেই এল। চাঁদেব আলোয় তাকে পরীক্ষা কবে দেখে হেরম্ব বলল, তুমি তো কাপড় বদলাও নি আনন্দ?

না। শুধু জামা বদলে এলাম। কাপড়ও অন্যবকম করে পরেছি, বুঝতে পারছেন না?

বুঝতে পারছি।

কী রকম দেখাচ্ছে আমাকে?

তা কি বলা যায় আনন্দ?

হেরম্ব সিঁড়ির উপরের ধাপে বসেছিল। তার পায়ের নীচে সকলের তলাব ধাপে আনন্দ বসতেই সেও নেমে এল। আনন্দ চেয়ে না দেখেই একটু হাসল।

হেরম্ব কোনো কথা বলল না। আনন্দের এখন নীরবতা দবকার এটা সে অনুমান করেছিল। হাঁটুর সামনে দুটি হাতকে বেঁধে আনন্দ বসেছে। তার ছড়ানো বাবরি চুল কান ঢেকে গাল পর্যন্ত ঘিবে আসছে। তার ছোটো ছোটো নিশ্বাস নেবার প্রক্রিয়া চোখে দেখা যায়।

আনন্দ এক সময়ে নিশ্বাস ফেলে বলে, জামা-কাপড়! কী ছোটো মন আমাদেব!

আমাদের, আনন্দ।

না, আমাদের। এ সব সৃষ্টি করেছি আমরা। এ আমাদের এক ধরনের ছল।

নিঃশব্দে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তারা চুপ করে বসে থাকে। আনন্দকে চমকে দেবার ভয়ে হেরম্ব নড়তে সাহস পায় না; জোরে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে চেপে যায়। আকাশে চাঁদ গতিহীন। আনন্দের নাচের প্রতীক্ষায় হেরম্বের মনেও সমস্ত জগৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারপর এক সময় আনন্দ উঠে গেল। ঘাসে-ঢাকা জমিতে গিয়ে চাঁদের দিকে মুখ করে সে

হাঁটু পেতে বসল। প্রণামের ভঙ্গিতে মাথা মাটিতে নামিয়ে দুহাত সম্মুখে প্রসারিত করে স্থির হয়ে রইল।

আনন্দ কতক্ষণ নৃত্য করল হেরম্বের সে খেয়াল ছিল না।

চাঁদের আলো তার চোখে নিভে নিভে ম্লান হয়ে এসেছিল নাচের গোড়াতেই। এটা তার কল্পনা অথবা আকাশের চাঁদকে মেঘে আড়াল করেছিল, হেবম্ব বলতে পারবে না। কিন্তু শ্লথ, মন্থর গতিছন্দ থেকে আনন্দেব নৃত্য চঞ্চল হতে চঞ্চলতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নাও যে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল এ কথা হেরম্ব নিঃসংশয়ে বলতে পারে। হয়তো চোখে তাব ধাঁধা লেগেছিল। হয়তো চন্দ্রকলা নৃত্যের শোনা ব্যাখ্যাটি তার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূর্ণিমা থেকে আনন্দ কিন্তু অমাবস্যায় ফিবে যেতে পাবেনি। নৃত্য যখন তার চরম আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তার সবাঙ্গের আলোড়িত সঞ্চালন এক ঝলক আলোর মতো প্রখর দ্রুততায় হেরম্বের বিস্ময়চকিত দৃষ্টির সামনে চমক সৃষ্টি করেছে, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ সে থেমে গেল।

ঘাসের উপরে বসে তাকে হাঁপাতে দেখে হেরম্ব তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গেল।

কী হল আনন্দ?

ভয় কবছে। আনন্দ বলল। রুদ্ধস্বরে, কান্নার মতো করে।

সে থরথর করে কাঁপছে। তাব মুখ আরক্ত, সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। তাব দুচোখে উত্তেজিত অসংযত চাহনি। চুলগুলি তার মুখে এসে পড়ে ঘামে জড়িয়ে গিয়েছিল। চুল পিছনে সরিয়ে হেরম্ব তাব কানের পাশে আটকে দিল। তাকে দম নেবার সময় দিয়ে বলল, ভয় কবছে? কেন ভয় করছে, আনন্দ?

আনন্দ বলল, কী জানি! হঠাৎ সমস্ত শরীর আমার কেমন কবে উঠল। মনে হল, এইবার আমি মরে যাব। মরে যেতে আমার কখনও ভয় হয়নি। আজ কেন যে এ বকম করে উঠল! অন্যদিন নাচের পর ঘুম আসে। আজ শরীর জ্বালা করছে।

গরম লাগছে?

না। ঝাঁজের মতো জ্বালা করছে—হাড়ের মধ্যে। আমি এখন কী করি! কেন এই বকম হল?

একটু বিশ্রাম কবলেই সেরে যাবে। শোবে আনন্দ? শুয়ে পড়লে হয়তো- -

আনন্দ হেবম্বেব কোলে মাথা রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। তার নিশ্বাস ক্রমে ক্রমে সহজ হয়ে আসছে, কিন্তু মুখেব অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব একটুও কমেনি। হেরম্বেব চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতেই তার দুচোখ জলে ভরে গেল।

এ রকম হল কেন আজ? তোমার জন্যে?

হতে পারে। আমি তো সহজ লোক নই। পৃথিবীতে আমার জন্যে অনেক কিছুই হয়েছে।

অন্ধ যে ভাবে আশ্রয় খোঁজে, আনন্দ তেমনি ব্যাকুল ভঙ্গিতে তার দুটি হাত বাড়িয়ে দিল। হেরম্বের হাতের নাগাল পেতেই শক্ত করে চেপে ধরে সে যেন একটু স্বস্তি পেল।

ঠিক করে কিছুই বুঝতে পারছি না। আরও যেন কত কী দুঃখ একসঙ্গে ভোগ করছি। আচ্ছা তুমি তো কবি, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না?

আমি কবি নই, আনন্দ। আমি সাধারণ মানুষ।

আনন্দ তার এই সবিনয় অস্বীকারের প্রতিবাদ করল।

তুমি আমাব কবি। কবি না হলে কেউ এমন ঠান্ডা হয়? সন্ধ্যার সময় তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম। তুমি না থাকলে আমি এখন এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে নাচের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরে যেতাম।

জ্বালা কমেনি আনন্দ?

কমেছে।

নাচ শেষ করবে?

না। নাচ শেষ করে ঘুমোবে কে? তার চেয়ে এ কষ্টও ভালো। ঘুম তো মরে যাওয়ার সমান, শুধু সময় নষ্ট।

আনন্দ হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে বলল, কটা বাজল? অনেক দূরে থানায় ঘণ্টা বাজছে। কটা বাজল শুনলে?

হেরম্ব বলল, ও ঘণ্টা ভুল আনন্দ। এখন ঠিক মাঝরাত্রি।

আনন্দ বলল, তাই হবে, চাঁদটা আকাশের ঠিক মাঝখানে এসেছে।

ওইখানে, আকাশের চাঁদের কাছে পৌঁছে, আনন্দ একেবারে নির্বাক হয়ে গেল। হেরম্বের দেহের আশ্রয়ে নিজের দেহকে আরও নিবিড়ভাবে সমর্পণ করে সে আকাশের নিষ্প্রভ তারা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল।

হেরম্ব এখন তাও জানে। তাই তার গালের উত্তেজনা, তার চিবুকের মনোরম কুঞ্চন, তার স্বপ্নাতুর চোখে কালো ছায়ার গাঢ় অতল রহস্য মিথ্যা নয়। তার ওষ্ঠে তাই শুধু স্পর্শই নয়, জ্যোৎস্নাও আছে। ওর মুখের প্রত্যেকটি অণুর সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা আর তাই অর্থহীন নয়। এমন একটি মুখকে তিল তিল করে মনের মধ্যে সঞ্চয় করায় আর অপরাধ নেই, সময়ের অপচয় নেই।

এতকাল হেরম্ব এক মুহূর্ত বিশ্লেষণ ছাড়া থাকতে পারেনি। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে এসে এবার তার বিশ্লেষণ লব্ধ সত্য সূক্ষ্মতার সীমায় পৌঁছেছে। আর তার কিছুই বুঝবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু হেরম্বের আপশোশ তা নয়। এই অক্ষমতার পরিচয় তার জানা। এই তার চরম জ্ঞান। সে বিজ্ঞান মানে, আজ বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে কাব্যকে মানল। চোখ যখন আছে, চোখ দেখুক। দেহ যখন আছে, দেহে রোমাঞ্চ হোক। হেরম্ব গ্রাহ্য করে না। অনাবৃত আনন্দের দেহ থেকে জ্যোৎস্নার আবরণ আজ কীসে ঘোচাতে পারবে? লক্ষ আলিঙ্গনও নয়, কোটি চুম্বনও নয়।

'আছেন' বললে ঈশ্বর অস্তিত্ব পান এবং সে অস্তিত্ব মিথ্যা নয়, কারণ 'আছেন' বলাটাই স্ব-সম্পূর্ণ সত্য, আর কোনো প্রমাণসাপেক্ষ সত্যের উপর নির্ভরশীল নয়। হেরম্বের প্রেমও শুধু আছে বলেই সত্য। কল্পনার সীমা আছে বলে নয়, যে অনুভূতির স্রোত তার জীবন ধার ঐতিহাসিকতায় নেই বলে নয়, নিজের সমগ্র সচেতন আমিত্ব দিয়ে আয়ত্ত করতে পারছে না বলে নয়। প্রেম আছে বলে প্রেম আছে। কাম-পঙ্কের পদ্ম এর উপমা নয়। মানুষের মধ্যে যতখানি মানুষের নাগালের বাইরে, প্রেম তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না---সে প্রেম করছে। এ তার নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম।

আনন্দের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, দুহাতের তালুতে পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ অনুভব করে হেরম্ব খুশি হয়ে উঠল। প্রশান্ত চিত্তে সে ভাবল, পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্যায় ফিরে না গিয়ে আনন্দ ভালোই করেছে।

তৃতীয় ভাগ

দিবারাত্রির কাব্য

অন্ধকারে কাঁদিছে উর্বশী
কান পেতে শোন বন্ধু শ্মশানচারিণী
মৃত্যু-অভিসারিকার গান ;
'সব্যসাচি! আমি উপবাসী!'
বলি অঙ্গে ভস্ম মাখে সৃষ্টির স্বৈরিণী,
হিমে তাপে মাগে পরিত্রাণ।

'সব্যসাচি! আমি ক্ষুধাতুরা,
শ্মশানের প্রান্ত-ঘেঁষা উত্তর-বাহিনী
নদীস্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
মোর সর্ব ভবিষ্যৎ-ভরা
ব্যর্থতার পরপারে।---কে কহে কাহিনি,
মোর লাগি রহিবে বসিয়া?'

জলের সমুদ্র নয়, আরও উন্মাদ হৃদয়-সমুদ্রের কলরবে মাঝরাত্রি পার না হলে হেরম্বের ঘুম আসে না। তবু আজ প্রত্যুষেই তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমের প্রয়োজন আছে কিন্তু ঘুম আসবে না, শুয়ে শুয়ে সে কষ্ট ভোগ করার চেয়ে উঠে বসে চুরুট ধরানোই হেরম্ব ভালো মনে করল! কাল গিয়েছে কৃষ্ণাচতুর্দশীর রাত্রি। আনন্দের পূর্ণিমা-নৃত্যের পরবর্তী অমাবস্যা সম্ভবত আজ দিনের বেলাই কোনো এক সময়ে শুরু হয়ে যাবে।

হেরম্ব উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাগানের অপর প্রান্তে আনন্দ ফুল তুলছে। দেখে হেরম্বের খুশি হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু আগামী সমস্ত দিনটির কল্পনায় সে বিষণ্ণ হয়েই থাকে। দিনের বেলাটা এখানে হেরম্বের ভালো লাগে না। উৎসবের পর শামিয়ানা নামানোর মতো নিরুৎসব কর্ম-পদ্ধতিতে সারাদিন এখানকার সকলে ব্যাপৃত হয়ে থাকে, হেরম্বের সুদীর্ঘ সময় বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায়। সকালে মন্দিরে হয় ভক্ত-সমাগম। লাল চেলি পরে কপালে রক্তচন্দনের তিলক এঁকে মালতী তাদের বিতরণ করে পুণ্য, অভয় চরণামৃত এবং মাদুলি। চন্দন ঘষে, নৈবেদ্য সাজিয়ে, প্রদীপ জ্বেলে ও ধূপধুনো দিয়ে আনন্দ মাকে সাহায্য করে, হেরম্বকে খেতে দেয়, অনাথের জন্য এক-পাকের রান্না চড়ায় আর নিজের অসংখ্য বিস্ময়কর ছেলেমানুষি নিয়ে মেতে থাকে। ফুলগাছে জল দেয়, আঁকশি দিয়ে গাছের উঁচু ডালের ফল পাড়ে, কোঁচড়ভরা ফুল নিয়ে মালা গেঁথে গেঁথে অনাথের কাছে বসে গল্প শোনে।

হেরম্বের পাকা মন, যা আনন্দের সংস্রবে এসে উদ্‌বেল আনন্দে কাঁচা হয়ে যেতে শিখেছে, খারাপ হয়ে যায়। সে কোনোদিন ঘরে বসে ঝিমায়, কোনোদিন বেরিয়ে পড়ে পথে।

জগন্নাথের বিস্তীর্ণ মন্দির-চত্বরে, সাগর সৈকতের বিপুল উন্মুক্ততায়, আপনার হৃদয়ের খেলা নিয়ে সে মেতে থাকে। মিলন আর বিরহ, বিরহ আর মিলন। দেয়ালের আবেষ্টনীতে ধূপগন্ধী অন্ধকারে বন্দী জগন্নাথ, আকাশের সমুদ্রের দিকহীন ব্যাপ্তির দেবতা। পথে কয়েকটি বিশিষ্ট অবসরে সুপ্রিয়াকেও তার স্মরণ করতে হয়। কাব্যোপজীবীর দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের মতো এক অনিবার্য বিচিত্র কারণে সুপ্রিয়ার চিন্তাও মাঝে মাঝে তার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই বাড়ি আর বাগানের আবেষ্টনীর মধ্যে সে যতক্ষণ থাকে, পর্যায়ক্রমে তীব্র আনন্দ ও গাঢ় বিষাদে সে এমনই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে তার চেতনা আনন্দকে অতিক্রম করে সুপ্রিয়াকে খুঁজে পায় না। পথে বার হয়ে অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে সে যখন শহরের শেষ সীমা সাদা বাড়িটির কাছে পৌঁছোয়, তখন থেকে শুরু করে তার মন ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সে স্পষ্ট অনুভব করে, একটা রঙিন, স্তিমিত আলোর জগৎ থেকে সে পৃথিবীর দিবালোকে নেমে আসছে। ধূলিসমাচ্ছন্ন পথ, দুদিকের দোকানপাট, পথের জনতা তার কাছে এতক্ষণ ফোকাস-ছাড়া দূরবিনের দৃশ্যপটের মতো ঝাপসা হয়ে ছিল, এতক্ষণে ফোকাস ঠিক হয়ে সব উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। পৃথিবীতে সে যে একা নয়, শোণিত-সুরা-সন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে জীবনের চিরন্তন ও অনভিনব সুখদুঃখে বিচলিত অসংখ্য নরনারী যে তাকে ঘিরে আছে, এই অনুভূতির শেষ পর্যায়ে জীবনের সাধারণ ও বাস্তব ভিত্তিগুলির সঙ্গে হেরম্বের নূতন করে পরিচয় হয়। সুপ্রিয়া হয়ে থাকে এই পরিচয়ের মধ্যবর্তিনী কান্তা, রৌদ্রতপ্ত দিনের ধূলিরুক্ষ কঠোর বাস্তবতায় একটি কাম্য পানীয়ের প্রতীক।

কোনোদিন বাইরে প্রবল বর্ষা নামে। মন্দির ও সমুদ্র জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে বিছানো লোমশ কম্বলে বসে আনন্দ ঝিনুকের রাশি গোনে এবং বাছে, ডান হাত আর বাঁ হাতকে প্রতিপক্ষ করে খেলে জোড়-বিজোড়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হেরম্ব চুরুট খায় আর নিরানন্দ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দের খেলা চেয়ে দেখে। এই বিরহ-বিপন্ন বিষণ্ণ মুহূর্তগুলিতেও তার যে দৃষ্টির প্রখরতা কমে যায় তা নয়। আনন্দের স্বচ্ছপ্রায় নখের তলে রক্তের আনাগোনা তার

চোখে পড়ে, অধরোষ্ঠের নিগূঢ় অভিপ্রায়ের সে মর্মোদঘাটন করে, কপালে ছেলেখেলার হারজিতের হিসাবগুলিকে গোনে। ঘরের আলো বর্ষার মেঘে স্তিমিত হয়ে থাকে।

আনন্দ শ্রান্তস্বরে বলে, কী বৃষ্টিই নেমেছে! সমুদ্রটা পর্যন্ত বোধ হয় ভিজে গেল।

হেরম্ব কথা বলে না। আনন্দের বর্ষা-বিরাগে তার দিন আরও কাটতে চায় না।

চুরুটের গন্ধে আনন্দ মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। হেরম্ব ভাবল, আনন্দ হয়তো হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকবে। এখন বাগানে যেতে অস্বীকার করার জন্য হেরম্ব নিজেকে প্রস্তুত করেছে, আনন্দ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, যার সুস্পষ্ট অর্থ, এখন হেরম্বের বাগানে যাবার দরকার নেই : দূরত্বই ভালো, এই ব্যবধান। হেরম্ব চুরুটটা ফেলে দিয়ে সরে গেল। কাছাকাছি না গেলে চাওয়া-চাওয়িও এখন না হলে চলবে।

গামছা কাপড় নিয়ে হেরম্ব খিড়কির দরজা দিয়ে বার হয়ে বাড়ির পূর্বদিকের পুকুরে স্নান করে এল। বাড়িতে ঢুকে দেখল, বাগান থেকে ঘরে এসে আনন্দ অনাথের কাছে গল্প শুনতে বসেছে। হেরম্বও একপাশে বসে পড়ল। গল্প শোনার প্রত্যাশায় নয়, অনাথের বলা ও আনন্দের শোনা দেখবার জন্য।

অনাথ আজ মেয়েকে নচিকেতার কাহিনি শোনাচ্ছে।

তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস। বাজশ্রবসের নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। একবার এক যজ্ঞ করে বাজশ্রবস নিজের সর্বস্ব দান করলেন। দক্ষিণা দেবার সময় হলে নচিকেতা—স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মাং দাস্যসি ইতি, আমায় কাকে দেবেন? নচিকেতা তিনবার এ প্রশ্ন করলে বাজশ্রবস রাগ করে বললেন, তোমায় যমকে দেব।

হেরম্ব মৃদুস্বরে বলল, যম নয়, মৃত্যুকে।

আনন্দ বলল, তফাত কী হল?

হেরম্ব বলল, উপনিষদে মৃত্যু শব্দটা আছে।

আনন্দ তার এই বিদ্যার পরিচয়ে মুগ্ধ হল না। বলল, তারপর কী হল বাবা?

হেরম্বের মনে হয়, আনন্দ তাকে অবহেলা করেছে। তার অস্তিত্বকে আনন্দের এ পরিপূর্ণ বিস্মরণ। বাগানে আনন্দের ঘাড় নাড়া ধরলে এই নিয়ে দুবার হল। সকালের শুরু দেখে আজকের দিনটি হেরম্ব মোটামুটি নিরানন্দের মধ্যে কাটিয়ে দেবারও আশা করতে পারে না।

এদিকে মালতী এসে নচিকেতার কাহিনিতে বাধা জন্মায়।

তারপর কী হল বাবা? কচি খুকির মতো সকালে উঠে গপ্পো গিলছিস? স্নান-টান করে মন্দিরটা খোল না গিয়ে। কাজের সময় গপ্পো কি?

অনাথ বলে, এমনি করে বুঝি বলতে হয়, মালতী?

কী করে বলব তবে? একটা কাজ করতে বলার জন্যে পেটের মেয়ের কাছে গলবস্ত্র হতে হবে?

অনাথ চুপ করে যায়। আনন্দ স্নানের উদ্দেশ্যে চলে যায় পুকুরে। তার পরিত্যক্ত স্থানটি দখল করে বসে মালতী। হেরম্বের মনে হয়, সেও বুঝি অনাথের কাছে গল্পই শুনতে চায়। যে-কোনো কাহিনি।

হেরম্বের আবির্ভাবে এদের দুজনের সম্পর্কে বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অনাথের অসংগত অবহেলার জবাবে মালতীর স্বেচ্ছাচারিতা যেমন উগ্র ছিল তেমনি উগ্র হয়েই আছে। কিন্তু তার সমস্ত রূক্ষ আচরণের মধ্যে একটি পিপাসু দীনতা, ক্ষীণতম আশ্বাসের প্রতিদানে নিজেকে আমূল পরিবর্তিত করে ফেলবার একটা অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞা হেরম্ব আজকাল সর্বদা আবিষ্কার করতে পারে। বোঝা যায়, অনাথের প্রতি মালতীর সমস্ত ঔদ্ধত্য অনাথকে আশ্রয় করেই যেন দাঁড়িয়ে থাকে। নিজের জীবনে সে যে স্থূল অপরিচ্ছন্নতা আমদানি করেছে, অনাথের গায়ে তার নমুনাগুলি লেপন করে

দেবার চেষ্টার মধ্যে তার একটি প্রার্থনার আর্তনাদ গোপন হয়ে থাকে, আমাকে শুদ্ধ করো, পবিত্র করো। অনাথের নিরুপদ্রব নির্বিকার ভাব মাঝে মাঝে হেরম্বকেও বিচলিত করে দেয়। সময় সময় তার মনে হয়, এও বুঝি এক ধরনের অসুখ। জ্বর যেমন উত্তাপ বেড়েও হয়, কমেও হয়, এরা দুজনে তেমনি একই মানসিক বিকারের শান্ত ও অশান্ত অবস্থা দুটি ভাগ করে নিয়েছে।

কখনও কখনও এমন কথাও হেরম্বের মনে হয় যে, অনাথের চেয়ে মালতীরই বুঝি ধৈর্য বেশি, তিতিক্ষা কঠোরতর, অনাথের আধ্যাত্মিক তপস্যার চেয়ে মালতীর তপস্যাই বেশি বিরাম-বিহীন। অনাথের বিষয়ান্তরের আশ্রয় আছে, অন্যমনস্কতা আছে, যৌগিক বিশ্রাম আছে,—মালতীর জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গতি নিরবচ্ছিন্ন ভাবে একনিষ্ঠ। অনাথকে কেন্দ্র করে সে পাক খাচ্ছে। অনাথ তার জগৎ, অনাথ তার জীবন, অনাথকে নিয়ে তার রাগ দুঃখ হিংসা ক্লেশ, অনাথ তার অমার্জিত পার্থিবতার প্রস্রবণ, তার মদের নেশার প্রেরণা, অনাথকে বাদ দিলে তার কিছুই থাকে না।

হেরম্বকে চোখ ঠেরে মালতী গম্ভীর মুখে অনাথকে বলল, কাল এক স্বপন দেখলাম। তুমি আর আমি যেন কোথায় গেছি,—অনেক দূর দেশে। পোড়া দেশে আমরা দুজন ছাড়া আর মানুষ নেই, রাস্তায় ঘাটে, ঘরে-বাড়িতে সব মরে রয়েছে।

অনাথ বলল, ভুলেও তো সৎ চিন্তা করবে না। তাই এ রকম হিংসার ছবি দ্যাখো।

মালতী এ কথা কানেও তুলল না, বলে চলল, স্বপন দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেছে বাপু, যাই বল। আচ্ছা, চলো না আমরা দুজনে একটু বেড়িয়ে আসি কদিন? ওদের কণ্ঠিবদলটা চুকিয়ে দিয়ে যাই, ওরা এখানে থাক। তুমি আমি বৃন্দাবনে গিয়ে ঘর বাঁধি চলো।

মালতীর গাম্ভীর্যকে বিশ্বাস করে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে অনাথ বলল, এখনও তোমার ঘর বাঁধবার শখ আছে, মালতী? বনে যদি যাও তো চলো।

মালতী তার আকস্মিক বিপুল হাসিতে অনাথের ক্ষণিকের অন্তরঙ্গতা চূর্ণ করে দিল। বলল, কেন, বনে যাবার এমনকী বয়েসটা আমার হয়েছে শুনি? রাধাবিনোদ গোঁসাই কণ্ঠিবদলের জন্য সেদিনও আমায় সেধে গেল না? মেয়ে টের পাবে বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম, ডাকলেই আবার আসে। তোমার চোখ নেই তাই আমাকে বুড়ি দ্যাখো! না কী বলো, হেরম্ব? আমি বুড়ি?

হেরম্বকে সে আবার চোখ ঠারল, রাধাবিনোদ গোঁসাইকে জান, হেরম্ব? মাঝে মাঝে আমায় দেখতে আর সাধতে আসে—লক্ষ্মীছাড়া ব্যাটা। চেহারা যেমন হোক, প''া আছে। সেবাদাসীর খাতিরও জানে বেশ—শৌখিন বৈরিগি কিনা। তোমাদের এই মাস্টারমশায়ের মতো কাঠখোট্টা নয়।

অনাথ বলল, কী সব বলছ, মালতী?

মালতী হঠাৎ ঢোক গিলে এদিক-ওদিক তাকায়। দৃষ্টি দিয়ে অনাথকে গ্রাস করতে তার এই দ্বিধা দেখে হেরম্ব অবাক হয়ে যায়। কিন্তু মালতী নিজেকে চোখের পলকে বদলে ফেলে। ঔদ্ধত্যের সীমা তার কোনোদিনই নেই। সে হেসে বলে, বৈরিগি মানুষের মতো লজ্জা কেন? বলি না হেরম্বকে কাণ্ডটা।—শোনো হেরম্ব, বলি। এই যে গোবেচারি ভালো মানুষটিকে দেখছ, সাত চড়ে মুখে রা নেই, আমার জন্যে একদিন এ রাধাবিনোদ গোঁসাইয়ের সঙ্গে মারামারি করেছে। হাতাহাতি চুলোচুলি সে কী কাণ্ড হেরম্ব, দেখলে তোমার গায়ে কাঁটা দিত। আমি না সামলালে সেদিন গোঁসাই খুন হয়ে যেত, হেরম্ব। আর আজকে আমি মরি-বাঁচি গ্রাহ্যি নেই!

হেরম্ব বুঝতে পারে, কথার আড়ালে মালতী পুষ্পাঞ্জলির মতো অনাথের পায়ে নিবেদন বর্ষণ করছে— যেদিন ছিল সেদিন আবার ফিরে আসুক।

হ্যাঁ গো, চলো না, আমরা যাই? মেয়ের মুখ চেয়ে আর কতকাল আমায় কষ্ট দেবে?

তোমার সঙ্গে কথা কইলেই তুমি বড়ো বাজে বকো, মালতী।

বলে অনাথ উঠে গেল। মালতী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল, আমার সঙ্গে এমন করলে ভালো হবে না বলছি। বোসো এসে, আমার আরও কথা আছে, ঢের কথা আছে।

অনাথ চলে গেলে মালতী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে নিরুৎসাহ ও নিরুৎসব ভাব চাপা পড়ে গেল। এইমাত্র যে ছিল ভিখারিনি, সে হঠাৎ ক্ষমাদাত্রী হয়ে বলল, লোকটা পাগল হেরম্ব, খ্যাপা। আর ছেলেমানুষ।

আমি কিছু বলব, মালতী বউদি?

চুপ! একটি কথা নয়।—মালতী টেনে টেনে হাসল, তুমি বোঝ ছাই, বলবেও ছাই। দেড় যুগ আঙুল দিয়ে ছোঁয় না, তাই বলে আমি কি মরে আছি? বুড়ো হয়ে গেলাম শখ-টখ আমার আর নেই বাপু, এখন ধম্মকম্ম সার। ঠাট্টা-তামাশা করি একটু, মিনসে তাও বোঝে না।

স্নান করে এসে চাবি নিয়ে আনন্দ মন্দিরে গেল। মালতী ঘরে ঢুকে এই ভোরে বাসিমুখে গিলে এল খানিকটা কারণ। মালতী প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবী, কিন্তু সব দিক দিয়ে অনাথের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য মালতী তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে। মন্ত্র নিয়ে ধ্যান-ধারণা সমস্ত পর্যবসিত করেছে কারণ-পানে। হেরম্বর প্রায় সহ্য হয়ে এসেছিল, তবু ঘুম থেকে উঠেই মালতীর মদ খাওয়া তার বরদাস্ত হল না। সে বাইরে চলে গেল।

মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, তোমাকে হয়তো আজ ভক্তদের ব্যবস্থাও করতে হবে, না আনন্দ?

আনন্দ চন্দন ঘষছিল। কাজে আর তার উৎসাহ নেই।

না, মা আসবে।

তিনি এইমাত্র খালি পেটে কারণ খেলেন। চোখ লাল হতে আরম্ভ করেছে।

কারণ খেলে মার কিছু হয় না।

হেরম্ব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আনন্দের অন্যমনস্ক কাজ করা চেয়ে দেখল। হাত পা নাড়তে আনন্দের যেন বড়ো কষ্ট হচ্ছে। যেমন তেমন করে পূজার আয়োজন শেষ করে দিতে পারলে সে যেন আজ বাঁচে। তিনদিন আগে বর্ষা নেমেছিল। সেদিন থেকে আনন্দের কী যে হয়েছে কেউ জানে না, হয়তো আনন্দ নিজেও নয়। অল্পে অল্পে সে গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে যে আবেগময় উদগ্রীব উল্লাস আপনা হতে উৎসারিত হতে পথ পেত না, হেরম্বের ডাকেও আজ তা সাড়া দিতে চায় না। সে ঝিমিয়ে পড়েছে, হেরম্বের কাছ থেকে গিয়েছে সরে। দূরে নয়, অন্তরালে। সেদিনের মেঘ-মেদুর আকাশের মতো কোথা থেকে সে একটি সজল বিষণ্ণ আবরণ সংগ্রহ করেছে, ভালোবাসার পাখায় ভর করে হেরম্বের মন ঊর্ধ্বে, বহু ঊর্ধ্বে উঠেও অবারিত নীল আকাশকে খুঁজে পাচ্ছে না।

এতদিন হেরম্ব কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আজ সে প্রশ্ন করল, তোমার কী হয়েছে, আনন্দ?

আমার অসুখ করেছে।

হেরম্ব হতবাক হয়ে গেল। তার প্রশ্নের জবাবে এই যদি আনন্দের বক্তব্য হয়, তার ভালোবাসাকে শুধু এই কৈফিয়ত যদি আনন্দ দিতে চায়, তবে আর কিছু তার জিজ্ঞাস্য নেই। সে কী জানে না আনন্দের অসুখ করেনি!

গুরুতর পরিশ্রমের কাজে মানুষ যেভাবে ক্ষণিকের বিরাম নেয়, চন্দন ঘষা বন্ধ করে আনন্দ তেমনি শিথিল অবসন্নভাবে মন্দিরের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল। বলল, মাথাটা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে—

নিষ্ক্রিয় অবসাদে হেরম্ব মাথা নেড়েও সায় দিল না।

আর মন কেমন করছে। চন্দনটা ঘষে দেবে?

আনন্দেব বিষণ্ণতাব সমগ্র ইতিহাস এইটুকু। হয়তো এর বিশদ ব্যাখ্যা ছিল ; কিন্তু আজও, এক পূর্ণিমা থেকে আরেক অমাবস্যা পর্যন্ত আনন্দের হৃদয়ে অতিথি হয়ে বাস কবার পরেও, বিশ্লেষণে যা ধরা পড়ে না, শুধু অনুমান দিয়ে আবিষ্কার করে তাকে গ্রহণ কবাব শক্তি হেরম্বের জন্মায়নি। আনন্দের মুখ দেখে হেরম্ব ছাড়া আব সকলের সন্দেহ হবার সম্ভাবনা আছে যে আনন্দের দাঁত কনকন করছে।

চন্দনটা তুমিই ঘষে নাও, আনন্দ—বলে হেরম্ব মন্দির ছেড়ে চলে এল। বহুদিন আগে একবার এক বর্ষণ-ক্ষান্ত নিশীথ স্তব্ধতায় সজল বায়ুস্তর ভেদ করে হেবম্বেব কলকাতাব বাড়িতে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়েছিল! স্ত্রীর ভয় তারও মনে সংক্রমিত হওয়াতে বাকি রাতটা হেবম্ব আতঙ্কে ঘুমাতে পাবেনি। আজ কিছুক্ষণেব জন্য তার অবিকল সেই বকম ভয় করতে লাগল।

ঘরে গিয়ে হেরম্ব বিছানায় আশ্রয় নিল। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখে গেল, অনাথ তার ঘরে ধ্যানস্থ হয়েছে। তার নিস্পন্দ দেহের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, বাহ্যজ্ঞান নেই। অনাথের সুদীর্ঘ সাধনা হেরম্ব দেখেনি, এত দ্রুত তাঁকে সমাধিস্থ হতে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আনন্দের কাছে সে শুনেছে, গত বৎসরও অনাথের এ ক্ষমতা ছিল না। মাস চারেক আগে অনাথ একবার মাথাব যন্ত্রণায় কদিন পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে আসনে বসলেই সে সমাধি পায়।

জীবনে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবাব শখ হেবম্বের কোনোদিন ছিল না, এ বিষয়ে কৌতূহলও তার নেই। বিছানায় চিত হয়ে সে ঘুমেরই তপস্যা আরম্ভ করল। আনন্দ যখন ঘরে এল ঘুমের আশা সে ত্যাগ করেছে, কিন্তু চোখ মেলেনি।

আনন্দ জিজ্ঞাসা কবল, ঘুমিয়েছ?

না।

চন্দন ঘষে দিলে না যে?

হেবম্ব উঠে বসল। বলল ও সব আমি পারি না। আমাদেব সংসাব হলে তুমি যে বলবে এটা কব ওটা কব তা চলবে না, আনন্দ। আলসেমিকে আমি প্রায় তোমাব সমান ভালোবাসি।

ভালোবাসো নাকি আমাকে?

আনন্দের কণ্ঠস্বব হেরম্বকে চমকে দিল।

সহজ ও সবল প্রশ্ন নয়। উচ্চারণের পর মরে যায় না এমন সব কথা আনন্দ আজকাল এমনি অবহেলার সঙ্গে বলে। হেবম্বের মনশ্চক্ষে যে ছানি পডতে আরম্ভ কবেছিল চোখেব পলকে তা স্বচ্ছ হয়ে গেল। আনন্দের মুখ দেখে সে বুঝতে পারল শুধু বিষণ্ণতা নয়, সেই প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রকলা নাচ শেষ কবার পর আনন্দের যে যন্ত্রণা হয়েছিল তেমনি একটি কষ্ট সে জোর করে চেপে রাখছে। হেরম্ব সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, এ কথা বলছ কেন, আনন্দ?

আমার কদিন থেকে এ রকম মনে হচ্ছে যে।

আগে বলনি কেন?

মনে এলেই বুঝি সব কথা বলা যায়? আগে বলিনি, এখন তো বলছি। তুমি বলেছিলে ভালোবাসা বেশি দিন বাঁচে না। আমাদের ভালোবাসা কি মরে যাচ্ছে?

হেবম্ব জোর দিয়ে বলল, তা যাচ্ছে না, আনন্দ। আমাদের ভালোবাসা কি বেশি দিনেব যে মরে যাবে? এখনও যে ভালো করে আরম্ভই হয়নি?

আনন্দ হতাশার সুরে বলল, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। সব হেঁয়ালির মতো লাগে। তুমি, আমি, আমাদের ভালোবাসা, সব মিথ্যে মনে হয়। আচ্ছা আমাদের ভালোবাসাকে অনেকদিন, খুব অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না?

হেরম্ব একবার ভাবল মিথ্যে বলে আনন্দকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সত্য, মিথ্যা কোনো সান্ত্বনাই

আত্মোপলব্ধির রূপান্তর দিতে পারে না, হেরম্ব তা জানে। সে স্বীকার করে বলল, তা যায় না আনন্দ, কিন্তু সে জন্য তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন? বেশি দিন নাইবা বাঁচল, যতদিন বাঁচবে তাতেই আমাদের ভালোবাসা ধন্য হয়ে যাবে। ভালোবাসা মরে গেলে আমাদের যে অবস্থা হবে এখন তুমি তা যত ভয়ানক মনে করছ, তখন সে রকম মনে হবে না। ভালোবাসা মরে কখন? যখন ভালোবাসার শক্তি থাকে না। যে ভালোবাসতে পারে না, প্রেম না থাকলে তার কী এসে যায়?

আনন্দ বিস্মিত হয়ে বলল, একী বলছ? যা নেই তার অভাব-বোধ থাকবে না?

থাকবে, কিন্তু সেটা খুব কষ্টকর হবে না। আমাদের মন তখন বদলে যাবে।

যাবেই? কিছুতেই ঠেকানো যাবে না?

সোজাসুজি জবাব হেরম্ব দিল না। হঠাৎ উপদেষ্টার আসন নিয়ে বলল, এ সব কথা নিয়ে মন খারাপ কোরো না, আনন্দ। বেশিদিন বাঁচলে কি প্রেমের দাম থাকত? তোমার ফুলগাছের ফুল ফুটে ঝরে যায়, তুমি সে জন্য শোক কর নাকি?

ফুল যে রোজ ফোটে।

কিছুক্ষণের জন্য হেরম্ব বিপন্ন হয়ে রইল। তার মনে হল, আনন্দের কথায় একেবারে চরম সত্যটি রূপ নিয়েছে, এখন সে যাই বলুক সে শুধু তর্কের খাতিরে বলা হবে, তার কোনো মানে থাকবে না। কদিন থেকে প্রয়োজনীয় নিদ্রার অভাবে হেরম্বর মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, জোর করে ভাবতে গিয়ে তার চিন্তাগুলি যেন জড়িয়ে যেতে লাগল। অথচ সত্যকে চিরদিন বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে এসে আনন্দের উপমা-নিহিত অন্তিম সত্যকে কোনোরকমে মানতে পারছে না দেখে তার আশা হল, বংশহীন ফুলের মতো একবার মাত্র বিকাশ লাভ করে ঝরে যাওয়ার ব্যর্থতাই মানব-হৃদয়ের চরম পরিচয় নয়, বিকাশের পুনরাবৃত্তি হয়তো আছে, হৃদয়ের পুনর্জন্ম হয়তো অবিরাম ঘটে চলেছে। মানুষের মৃত্যু-কবলিত জীবন যেমন সার্থক, তেমনি সার্থকতা ক্ষণজীবী হৃদয়েরও হয়তো আছে।

হেরম্ব যতক্ষণ ব্যাকুল হয়ে চারিদিকে অন্ধের মতো হাতড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল এই সার্থকতার স্বরূপ তার কাছে ধরা পড়ল না। হেরম্বের নিদ্রাতুর মনও বেশিক্ষণ খেইহারা চিন্তার অর্থহীন বিড়ম্বনা ভোগ করবার মতো নয়। ক্রমে ক্রমে সে শান্ত হয়ে এলে এত সহজে হৃদয়ের মৃত্যু-রহস্য তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল যে, এই সুলভ জ্ঞানের জন্য ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বলে নিজের কাছেই সে লজ্জা পেল।

সে প্রীতিকর প্রসন্ন হাসি হেসে বলল, মানুষও রোজ ভালোবাসে, আনন্দ। প্রত্যেকটি ঝরে-যাওয়া ভালোবাসার জায়গায় আবার তেমনি একটি করে ভালোবাসা জন্মায়। আমরা মানুষ, গাছ-পাথরের মতো সীমাবদ্ধ নই। আমাদের চেতনা সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সঙ্গে এক হয়ে আমরা বেঁচে আছি। আমি যেমন সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি, সমস্ত মানুষ তেমনি আমার প্রতিনিধি। একটা প্রকাণ্ড হৃদয় থেকে একটুকরো ভাগ করে নিয়ে আমার স্বতন্ত্র হৃদয় হয়েছে, কিন্তু নাড়ি কাটার পরেও মা আর ছেলের যেমন নাড়ির যোগ থাকে, সমস্ত মানুষের সমবেত অখণ্ড হৃদয়ের সঙ্গে আমারও তেমনি আত্মীয়তা আছে। তুমি ভাবছ এ শুধু কল্পনার বাহার। তা নয়, আনন্দ। আকাশ আর বাতাস থেকে আমার মন, আমার হৃদয় নিজেকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করেনি, তাদের প্রত্যেকটি কণা এসেছে মানুষের ভান্ডার থেকে। আমরা জন্মাই একটা বিপুল শূন্য নিয়ে, আজীবন মানুষের সাধারণ হৃদয়-মনের সম্পত্তি থেকে তিলতিল করে ঐশ্বর্য নিয়ে সেই শূন্য পূরণ করি। আমরা তাই পরস্পর আত্মীয়, আমরা তাই প্রত্যেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেদের অনুভব করতে পারি। তাই আমাদের ভালোবাসা যখন মরে যাবে, অন্য মানুষ তখন ভালোবাসবে। আমাদের প্রেম ব্যর্থ হবে না।

আনন্দ মুহ্যমানের মতো তাকিয়ে ছিল। বলল, যাবে না?

কেন যাবে? আমরা তো একদিন মরে যাব। আমরা যদি মানুষ না হতাম, যদি নিজেদের গণ্ডির মধ্যেই প্রত্যেকে নিজেদের জেল দিতাম তাহলে ভাবতাম, মরে যাব বলে আমাদের জীবন নিরর্থক। কিন্তু যে চেতনা থাকার জন্য আমরা পশুর মতো জীবনের কথা না ভেবে বাঁচি না, মরণের কথা না ভেবে মরি না, সেই চেতনাই আমাদের বলে দেয় যে মানুষ মরে, মানবতার মৃত্যু নেই। মানুষের জীবন নিয়ে মানবতার অখণ্ড প্রবাহ চলে বলে জীবনও ব্যর্থ নয়। তেমনি ···

চুপ করো। হেরম্বকে তীব্র ধমক দিয়ে আনন্দ কেঁদে ফেলল।

ধমকের চেয়ে আনন্দের কান্না আরও তীব্র তিরস্কারের মতো হেরম্বকে আঘাত করল। আনন্দ তো কবি নয়।

মেয়েরা কখনও কবি হয় না। পৌরুষ ও কবিত্ব একধর্মী। নিখিল মানবতার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ হৃদয়ের একদা বর্ণিত ধ্বনির প্রতিধ্বনিকে সে কখনও খুঁজে বেড়াতে পারবে না। জগতে তার দ্বিতীয় প্রতিরূপ নেই, সে বৃহতের অংশ নয় , সে সম্পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র। যে বংশপ্রবাহ মানবতার রূপ, সে তা বোঝে না। অতীত ভবিষ্যতের ভারে তার জীবন পীড়িত নয়, সার্থকও নয়। সৃষ্টির অনন্ত সূত্রে সে গ্রন্থির মতো বিগত ও অনাগতকে নিজের জোরে যুক্ত করে রাখে না। পৃথিবী যেমন মানুষের জড় দেহকে দাঁড়াবার নির্ভর দেয়, মানুষের জীবনকে এরা তেমনি আশ্রয় যোগায়। পৃথিবী জুড়ে হেরম্বের আত্মীয় থাক, আনন্দের কেউ নেই। সে একা।

অনেকক্ষণ কারও মুখে কথা ছিল না। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলার সাহস কার হত বলা যায় না। এমন সময় হঠাৎ মালতীর তীব্র আর্তনাদ শোনা গেল।

হেরম্ব চমকে বলল, ও কী?

মা বুঝি ডাকল।

বারান্দায় গিয়ে হেরম্ব বুঝতে পারল, ব্যাপার যাই ঘটে থাক অনাথের ঘরে ঘটেছে। ঘরে ঢুকে সে দেখল, অনাথ অজ্ঞান হয়ে আসনে লুটিয়ে পড়ে আছে, মৃদু ও দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, অতিরিক্ত রক্তের চাপে মুখ অসুস্থ, রাঙা। মালতী পাগলের মতো সেই মুখে ক·· চলেছে চুম্বনবৃষ্টি!

তাকে ঠেলা দিয়ে হেরম্ব বলল, শান্ত হন, সরে বসুন, কী হল দেখতে দিন।

ও মরে গেছে হেরম্ব, আমি ওকে মেরে ফেলেছি।

হেরম্বের চিকিৎসা চলল আধঘণ্টা। তিন কলসি জল খরচ হল মালতীর আউন্সখানেক কারণও কাজে লাগল। তারপর অনাথ চোখ মেলে চাইল।

আঃ, কী কর মালতী! বলে আরও খানিকটা সচেতন হয়ে অনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, কী হয়েছিল?

মালতী কপাল চাপড়ে বলল, আমার যেমন পোড়া কপাল! জন্মদিন ব·· একটা প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, কে জানে তাতেই ভড়কে গিয়ে ভিরমি যাবে?

অনাথের স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠ আরও ঝিমিয়ে গেছে। সে বলল, আসনে বসলে আমাকে ছুঁতে তোমায় কতবার বারণ করেছি, মালতী। কঠিন যোগাভ্যাস করেছি, হঠাৎ অপবিত্র স্পর্শ পেলে—

মালতী ইতিমধ্যেই খানিকটা সামলেছে।

কীসের অপবিত্র স্পর্শ· চান করে আসিনি আমি? এমনি বিদঘুটে স্বভাব জানি বলেই না পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম।

পুকুরে ডুব দিয়ে এলেই মানুষ যদি পবিত্র হত—

আমার পোড়া কপাল তাই মরণ নেই।

অনাথ হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, তুমি বুঝতে পার না, মালতী। পবিত্র অপবিত্র স্পর্শের জন্য শুধু নয়, আসনে আমি যেরকম অবস্থায় থাকি আমাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হয়, কোনো কারণে হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরলে বিপদ ঘটে। আমি আজ মরেও যেতে পারতাম।

মালতী কোনো সময় হার স্বীকার করে না। বলল, এমন আসনে তবে বসা কেন?

অনাথ বলল, সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু আজ তো তোমার জন্মদিন নয়—কাল।

আজ তো আগের দিন।—আজ আমার জন্মদিনের পারণ।

অনাথ আর তর্ক করল না। ঘরের কোণে টাঙানো দড়ি থেকে একখানা শুকনো কাপড় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মালতী বসে রইল মুহ্যমানা হয়ে। সেও আগাগোড়া ভিজেছে। তাকে কয়েকটা সদুপদেশ দেবার ইচ্ছা হেরম্ব জোর করে চেপে গেল। এত কাণ্ডের পরেও আনন্দ এ ঘরে আসেনি খেয়াল করে সে উশখুশ করতে লাগল।

দেখলে, হেরম্ব?

এ প্রশ্নের জবাব হয় না, মন্তব্য হয়। হেরম্ব সাহস পেল না।

এমন জানলে কে মিনসেকে ঠাট্টা করতে যেত!

এ আপনার ঠাট্টা নাকি মালতী বউদি?

মালতী রেগে বলল, কী তবে? সংকেত্তন? আবোলতাবোল বোকো না বাপু, মাথায় আগুন জ্বলছে, মন্দ কিছু বলে বসব। কাল আমার জন্মদিন। জন্মদিনে শ্রীচরণে ঠাঁই পাই। বছরে ওর এই একটা দিনরাত্তির আমার সঙ্গে সম্পর্ক,—হেসে কথাও কয়, ভালোও বাসে।—গা ছুঁয়ে বলছি ভালোবাসে, হেরম্ব! মালতী মুচকে মুচকে হাসে, কেন তা জান না বুঝি? শোন বলি। সেই গোড়াতে, মাথাটা যখন পর্যন্ত ওর খারাপ হয়নি, তখন পিতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছিলাম আর যেদিন যা খুশি কর বাপু, কথাটি কইব না, আমার জন্মদিনে সব হুকুম মেনে চলবে। পাগল হলে কী হবে হেরম্ব, পিতিজ্ঞের কথাটি ভোলেনি। মুখ বুজে আজও মেনে চলে। মালতী বিজয়-গর্বে হাসে, বিষ খেতে বললে তাও খায়, হেরম্ব।

অনাথের এটুকু দুর্বলতা হেরম্ব কল্পনা করতে পারে।

এবার জন্মদিনে তাই বরং মাস্টারমশাইকে খেতে দেবেন, মালতী বউদি।

শুনে মালতী আগুন হয়ে হেরম্বকে ঘর থেকে বার করে দেয়।

হেরম্ব আর কোথায় যাবে, প্রথম রাত্রিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাড়ির পিছনে প্রাচীর ডিঙিয়ে অদূরবর্তী যে আমবাগান তার চোখে অরণ্যের মতো প্রতিভাত হয়েছিল, বানপ্রস্থাবলম্বীর মন নিয়ে হেরম্ব সেইখানে গেল। এখানে আছে ভোরে পাখির ডাক আর অসংখ্য কীটপতঙ্গের প্রণয়। পচা ডোবার জলে হয়তো অ্যামিবা আত্মপ্রণয়ে নিজেকে বিভক্ত করে ফেলছে, তরু-বল্কলের আড়ালে পিপীলিকার চলেছে শুঁড়ে শুঁড়ে প্রণয়ভাষণ, হেরম্বের পায়ের কাছ দিয়ে এক হয়ে এগিয়ে চলেছে কর্ণজলৌকা দম্পতি, গাছের ডালে ডালে একজোড়া অচেনা পাখির লীলাচাঞ্চল্য।

অনেকক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরে আসে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে মন্দির-চত্বরে সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে সুপ্রিয়াকে আবিষ্কার করতে তার বেশিক্ষণ দেরি হয় না। তখন পূজা ও আরতি শেষ হয়েছে। মালতী বিতরণ করছে মাদুলি। তার কাছে বসে সুপ্রিয়া তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনন্দের দিকে। হেরম্ব মিলিয়ে দেখল কদিনের বর্ষার পর আজ যে ঝাঁজালো রোদ উঠেছে, সুপ্রিয়ার চোখের আলোর

তুলনা হয় না।

প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য মালতীর জন্মদিনে অনাথ তার সমস্ত হুকুম মেনে চলে, প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই এখানে এসে হেরম্ব সুপ্রিয়াকে একখানা পত্র লিখেছিল। সুপ্রিয়া যে তাকে দিয়ে চিঠি লেখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল তা নয়, কথা ছিল ঠিকানা জানাবার। চিঠি না লিখে একজনকে ঠিকানা জানানো যায় না বলে হেরম্ব বাধ্য হয়ে একখানা চিঠিই লিখেছিল। ঠিকানা দিয়ে তার দুটি দরকারের কথা সুপ্রিয়া স্বীকার করেছিল। প্রথম, মাঝে মাঝে চিঠি লিখে হেরম্বকে সে তার কথা ভুলতে দেবে না। দ্বিতীয়, হেরম্ব কোথায় আছে জানা না থাকলে তার যে কেবলই মনে হয় সে হারিয়ে গেছে, অসুখে ভুগছে, বিপদে পড়েছে—এই দুশ্চিন্তাগুলির হাত থেকে সে রেহাই পাবে।

খুশিমতো কাছে এসে হাজির হওয়ারও একটা তৃতীয় প্রয়োজনও যে তার থাকতে পারে হেরম্ব আগে তা খেয়াল করেনি। একটা নিশ্বাস ফেলে সে মন্দির-চত্বরে ভক্তদের সভায় গিয়ে বসল।

কবে এলি সুপ্রিয়া?

সে যেন জানত সুপ্রিয়া পুরীতে আসবে। কবে এসেছে তাই শুধু সে জানে না।

এসেছি পরশু। আপনি এখানে কদিন আছেন?

আজ নিয়ে পনেরো দিন।

দিন গোনার স্বভাব তো আপনার ছিল না? বলে সুপ্রিয়া আনন্দের দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করল।

হেরম্ব হেসে বলল, এমনি অনেকগুলি স্বভাব আমি অর্জন করেছি সুপ্রিয়া, যা আমার ছিল না। আগেই তোকে বলে রাখলাম পরে আর গোল করিসনে।

মালতী রুক্ষস্বরে বলল, বড়ো গোল হচ্ছে। এদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বস না আনন্দ? এটা আড্ডা দেবার বৈঠকখানা নয়।

সুপ্রিয়া এ কথায় অপমানিত বোধ করে বলল, আমি বরং আজ যাই।

আনন্দ বলল, না না, যাবেন কেন? ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন।

হেরম্বও আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, আয় সুপ্রিয়া।

অপমান ভুলে সুপ্রিয়া ঘরে গিয়ে বসতে রাজি হল। হেরম্ব জানত রাজি সে হবে। এতক্ষণ মালতী ও আনন্দের সঙ্গে সুকৌশলে আলাপ করে সে কতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করেছে হেরম্ব তা জানে না, কিন্তু আনন্দকে দেখার পর এই জ্ঞানলাভের পিপাসা তার অবশ্যই এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যে, আরও ভালো করে সব জানবার ও বুঝবার কোনো সুযোগই সহজে আজ সে ত্যাগ করবে না। তার ভালো করে জানা ও বোঝাটাই ঠিক কী ধরনের হবে হেরম্ব তাও অনুমান করতে পারছিল। অনুমান করে তার ভয় হচ্ছিল। ভয়ের কথাই। চোখের সামনে ভবিষ্যৎকে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখে ভয়ংকর না হয়ে ওঠার মতো নিরীহ সুপ্রিয়া এখন আর নেই। মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে গল্প শুনে যে বড়ো হয়েছিল, বড়ো হয়ে ছোটো ছোটো কাজ করে, ছোটো ছোটো সেবা দিয়ে আর সর্বদা কথা শুনে চলে যে ভালোবাসা জানাবার চেষ্টা করেছিল, আজ হেরম্বের সাধ্য নেই তাকে সামলে চলে। অথচ, আজকের এই সঙিন প্রভাতটিতে সে আর আনন্দ দুজনকেই সামলে চলার দায়িত্ব পড়েছে তার উপরে। জীবন-সমুদ্রে তাকে লক্ষ্য করে দুটি বেগবতী অর্ণবপোত ছুটে আসছে, সে সরে দাঁড়ালে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য, সরে না দাঁড়ালে তার যে অবস্থা হওয়া সম্ভব তাও একেবারেই লোভনীয় নয়। আজ পর্যন্ত হেরম্বের জীবনে অনেকবার অনেকগুলি সকাল ও সন্ধ্যায় কাব্যের অন্তর্ধান ঘটেছে। আজ সকালে কাব্যলক্ষ্মী শুধু যে পালিয়ে গেলেন তা নয়, তার সিংহাসন যে-হৃদয়ে সেখানে প্রচুর অনর্থ ও রক্তপাতের সম্ভাবনাও ঘনিয়ে এল। অনাথের একটি কথা তার বারংবার মনে পড়তে লাগল ; মানুষ যে একা পৃথিবীতে বাঁচতে আসেনি সব সময় তা যদি মানুষের *খেয়াল থাকত!*

তাদের দুজনকে হেরম্বের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আনন্দ চলে গেল। সুপ্রিয়া ম্লান হেসে বলল, মেয়েটার বুদ্ধি আছে তো!

হেরম্ব অন্যমনস্ক ছিল। বলল, কার বুদ্ধি আছে? খেপেছিস! আমাদের ও বুদ্ধি করে একা রেখে যায়নি। কাজ করতে গিয়েছে। কাজ না থাকলে এখান থেকে ও নড়ত না, বসে বসে তোর সঙ্গে গল্প করত।

সত্যি? তাহলে মেয়েটা খুব সরল। আমি বুঝতে পারিনি।

বুঝতে পারিসনি? তুই কি ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিটও কথা বলিসনি, সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়ার মুখ লাল হয়ে গেল। সে নিচু গলায় বলল, তা বলেছি। আমারই বুদ্ধির দোষ। বুদ্ধি ঠিক থাকলে ওই মেয়েটা যে খুব সরল এটা বুঝতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগত না।

সুপ্রিয়ার অপলক দৃষ্টিপাতে হেরম্ব একটু লজ্জা বোধ করল। সরলতার হিসাবে সুপ্রিয়াও যে কারও চেয়ে ছোটো নয় এও তো সে জানে। সুপ্রিয়ার অভিজ্ঞতা বেশি, মানুষের মনের জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবন করার শক্তি বেশি, সে তাই সাবধানে কথা বলে, হিসাব করে কাজ করে। কিন্তু তার কথা ও কাজে সরলতার অভাব কোনোদিনই হেরম্বের কাছে ধরা পড়েনি, মিথ্যার মানস-স্বর্গ ওর নেই। এও হয়তো সত্য যে, আনন্দের সহজাত সরলতার চেয়ে সুপ্রিয়ার মনোভিজাত্যের সরলতা বেশি মূল্যবান। একটা ছেলেমানুষি, আর একটা সুশিক্ষা।

হেরম্ব সুর বদলাল!

ভালো করে বোস সুপ্রিয়া, তোর কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট হওয়া মন্দ কি? তাতে মানুষের দরদ পাওয়া যায়। চোখে না দেখলে কেউ তো বোঝে না কারও কষ্ট আছে কি নেই।

কারও কী নিজের কষ্টের কিছু অভাব আছে সুপ্রিয়া, যে পরের মধ্যে কষ্ট খুঁজে বেড়াবে?

সবাই তো সকলের পর নয়।

হেরম্ব হেসে বলল, নয়? তুই ছাই জানিস। মোহ-মুদগর, বৈরাগ্যশতক, মহানির্বাণ-তন্ত্র সব লিখেছে—

সুপ্রিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল, কাছে এসে বসুন না? দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে লাভ কি?

কোথায় বসব দেখিয়ে দে।

তাহলে দাঁড়িয়ে থাকুন।

সুপ্রিয়া জানালার সংকীর্ণ স্থানটিতে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে বসে ছিল ; সেখানে তার কাছে বসা অসম্ভব। হেরম্ব বিছানায় বসে তাকে ডাকল, আয় সুপ্রিয়া, এখানে বোস। এখুনি এলি, এসেই ঝগড়া জুড়ে দিলি কেন?

উঠে এসে বিছানায় বসে সুপ্রিয়া বলল, আপনিই বা শুধু হালকা কথা বলছেন কেন? পুরীতে কেন এলাম জিজ্ঞাসা করবেন কখন?

একেবারেই যদি জিজ্ঞাসা না করি?

তাহলে একটু মুশকিলে পড়ব। সুপ্রিয়া এবার হাসল, আপনি এ ঘরে থাকেন, না?

হ্যাঁ, একা। আমি এ ঘরে একা থাকি সুপ্রিয়া।

তা জানি না নাকি!

জানিস বইকী। তবু বললাম। রাগিস নে। তোকে তো গোড়াতেই বলেছি, আমার ছিল না এমন অনেক স্বভাব ইতিমধ্যে আমি অর্জন করে ফেলেছি। বাহুল্য কথা বলা তার মধ্যে একটা।

কথা, কথা কথা! শুধু কথা পাকানো, কথা মোচড়ানো, কথা নিয়ে লড়াই করা। সুপ্রিয়া মাথা

নত করল। এত কথা কী জন্য? পরিচয়ের জন্য নয়, উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্যও নয়। পরিচয় তাদের যা আছে আর তা বাড়বে না, পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ভুল হবার তাদের কোনো কারণ নেই, কথা না বললেও তাদের সময় কাটবে। তবু প্রাণপণে তারা কথা বলছে। চিরকাল এমনভাবে মানুষ কত কথা বলতে পারে? আজও অনিশ্চয়তা বজায় থাকার অভিমানে সুপ্রিয়া কথা বন্ধ রাখল। হেরম্ব চুপ করল বক্তব্যের অভাবে এ কথা মিথ্যা নয় যে, কথা নিয়ে লড়াই করাটাই চরম উদ্দেশ্য দাঁড়িয়ে গেছে বলে সুপ্রিয়াকে বলার তার কিছুই নেই।

কাছাকাছি বসে এমনিভাবে পরের মতো তারা চিন্তা করছে, আনন্দ ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে টাকা আছে? দশটা টাকা দিতে পারবে?

টাকা কী হবে আনন্দ?

বাবা চাইল।

হেরম্ব অবাক হয়ে গেল। মাস্টারমশাই টাকা চাইলেন। টাকা দিয়ে তিনি কী করবেন?

আনন্দ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। সে জানে না। টাকা নিয়ে সে চলে গেলে হেরম্ব চেয়ে দেখল সুপ্রিয়া খুব সরলভাবে অত্যন্ত কুটিল হাসি হাসছে। আনন্দের সঙ্গে হেরম্বের আর্থিক সম্পর্কটি আবিষ্কার করা মাত্র তার যেন আর কিছু বুঝতে বাকি নেই। এতক্ষণে সে নির্ভর ও নিশ্চিন্ত হল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে হেরম্ব চুপ করে গেল। প্রতিবাদ শুধু নিষ্ফল নয়, অশোভন।

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, বাড়ি পৌঁছে দেবেন না?

এখুনি যাবি?

আর বসে কী হবে? চলুন পৌঁছে দেবেন।

তুই কি একা এসেছিস নাকি, সুপ্রিয়া? একা এসে থাকলে একা যাওয়াই তো ভালো।

একা কেন আসব? চাকরকে সঙ্গে এনেছিলাম, আপনি আছেন শুনে তাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। চলুন, যাই।

ছলনা নয়, হেরম্ব সত্যসত্যই আলস্য বোধ করে বলল, আর একটু বোস না সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়া মাথা নেড়ে বলল, না, আর একদণ্ডও বসব না। কী করে বসতে বলছেন?

হেরম্ব আশ্চর্য হয়ে বলল, তুই আসতে পারিস, আমি তোকে বসতে বলতে পারি না? আমার ভদ্রতা-জ্ঞান নেই?

সুপ্রিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, ভদ্রতা-জ্ঞান কোনো কাজের জ্ঞান নয়। আমি এখানে কেন এসেছি জানা দূরে থাক, পুরীতে কেন এসেছি ও-জ্ঞান দিয়ে আপনি তাও অনুমান করতে পারবেন না। না যদি যান তো বলুন মুখ ফুটে, এখানে আমার গা কেমন করছে, আমি ছুটে পালিয়ে যাই। পুরী শহরে আপনি আমাকে আজকালের মধ্যে খুঁজে বার করতে পারবেন সে ভরসা আছে।

হেরম্ব আর কথা না বলে জামা গায়ে দিল। বারান্দা পার হয়ে তারা বাড়ির বাইরে যাবার সরু প্যাসেজটিতে ঢুকবে, ও ঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দ একরকম তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল।

কোথায় যাচ্ছ?

হেরম্ব বলল, একে বাড়ি পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।

খেয়ে যাও।

সুপ্রিয়া এর জবাব দিল। বলল, আমার ওখানে খাবে।

আনন্দ বলল, পেটে খিদে নিয়ে অদ্দুর যাবে? সকালে উঠে খেতে না পেলে ওর মাথা ঘোরে তা জানেন?

সুপ্রিয়া বলল, মাথা না হয় একদিন ঘুরলই।

হেরম্ব অভিভূত হয়ে লক্ষ করল, পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে তারা আর চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। সুপ্রিয়ার চোখে গভীর বিদ্বেষ, তাই দেখে আনন্দ অবাক হয়ে গেছে। দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেরম্ব সসংকোচে বলল, আমার খিদে পায়নি আনন্দ, একটুও পায়নি।

আনন্দ অভিমান করে বলল, পায়নি? তা পাবে কেন? আমি কিছু বুঝিনে কিনা!

হেরম্ব তখন নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এবার কী কর্তব্য সুপ্রিয়া?

তাকে মধ্যস্থ মেনে হেরম্ব একরকম স্পষ্টই ইঙ্গিত করল যে, সে যখন বয়সে বড়ো, আনন্দের কাছে হার স্বীকার করে তারই উদারতা দেখানো উচিত। সুপ্রিয়া রাগ করে বলল, আমি জানিনে।

এখান থেকেই খেয়ে যাই, কী বলিস?

তাও আমি জানিনে।

হেরম্ব নির্বাক হয়ে গেল। আনন্দ একটু হেসে বলল, আচ্ছা, আপনি যে এত জোর খাটাচ্ছেন, আপনার কী জোর আছে বলুন তো? ও আমাদের অতিথি, আপনার তো নয়।

আমি ওর বন্ধু।

আনন্দ আরও ব্যাপকভাবে হেসে বলল, আমিও তো তাই!

হেরম্ব কখনও কোনো কারণে সুপ্রিয়ার মুখে হিংস্র-ব্যঙ্গ শোনেনি, আজ শুনল, হঠাৎ মুচকে হেসে সুপ্রিয়া বলল, তুমি?—বলে, এই একটিমাত্র শব্দে আনন্দকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে ক্ষণিকের বিরাম নিয়ে সে যোগ দিল, ওর সঙ্গে, আমার যেদিন থেকে বন্ধুত্ব, তোমার তখন জন্মও হয়নি।

আনন্দ আশ্চর্য হয়ে বলল, যান! আমার জন্মের সময় আপনার আর কত বয়স ছিল?—কত আর বড়ো হবেন আপনি আমার চেয়ে? আপনার বয়স উনিশ কুড়ির বেশি কখনও নয়।

সুপ্রিয়া বুঝতে পারল না, হেরম্বই শুধু টের পেল আনন্দের এ প্রশ্ন কৃত্রিম নয়, সে পরিহাস করেনি। সুপ্রিয়ার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে যেন হঠাৎ ধমক দিয়ে বলল, তুমি ছেলেমানুষ তাই তোমাকে কিছু বললাম না। বয়সে যারা বড়ো আর কখনও তাদের সঙ্গে এ রকম ঠাট্টা কোরো না।

সুপ্রিয়ার ধমকে মুখ ম্লান করে আনন্দ যা বলেছিল তার কোনো মানে নেই,—শুধু একটি 'আচ্ছা'। হেরম্ব ভালো করেই জানে সুপ্রিয়ার কাছে সে যে অপমান পেয়েছে তার জন্য আনন্দ তাকেই দায়ি করবে। দায়ি করে সে হয়ে থাকবে বিষণ্ণ। আনন্দের বর্তমান মানসিক অবস্থায় সহজে এর প্রতিকারও করা যাবে না।

গাড়িতে সুপ্রিয়ার সামনের আসনে বসে আনন্দের কথা ভাবা চলছিল। সে উঠে পাশে এসে বসায় হেরম্বের আর সে ক্ষমতা রইল না।

পাশে বসাই নিয়ম, না?

হেরম্ব একটু হেসে বলল, অন্তত অনিয়ম নয়।

সুপ্রিয়া হেসে বলল, আসল কথা, কথা বলব। কে একটা লোক পিছনে উঠে বসেছে, শুনতে পাবে বলে সামনে এগিয়ে এলাম।

তোর প্রগতির অর্থ খুব গভীর, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, আপনার এই যে কথা বলার ঢং মন্ত্রদাতা গুরুর মতো, চিরকাল এই সুর শুনে আসছি। হালকা কথা বলেন, তাও উপদেশের মতো ভারী আওয়াজে।

একটা কথা ভাবতে ভাবতে অন্যকথার জবাব অমনি করেই দিতে হয়।

ও, আচ্ছা, ভাবুন; আমি চুপ করলাম।

বাড়ির দরজায় গাড়ি থামা পর্যন্ত সুপ্রিয়া সত্যই চুপ করে রইল। যেখানে তারা বাড়ি নিয়েছে সেখান থেকে সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যায় বটে, বাড়ির ছাদে না উঠলে সমুদ্র দেখা যায় না। এবারও

সুপ্রিয়া হেরম্বকে বাড়ির বাজে অংশ পার করিয়ে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে হাজির করল। হেরম্ব লক্ষ করল ঘরখানা দোকানের মতো সাজানো নয়, শয়নঘরের মতোও নয়। বিদেশ বলে বোধ হয়, ঘরে আসবাব বেশি নেই, অস্থায়ী বলে সুপ্রিয়ার নেই ঘর সাজাবার উৎসাহ। উৎসাহের অভাব ছাড়া অন্য কারণও হয়তো আছে। এটা যদি সুপ্রিয়ারই শয়নকক্ষ হয় তবে সে এখানে একাই থাকে। ছোটো চৌকিতে যে বিছানা পাতা আছে সেটা একজনের পক্ষেও ছোটো। অশোক যদিও এখন বিছানায় চিত হয়ে পড়ে আছে, এ অধিকার হয়তো তার সাময়িক, হয়তো এ তার নিছক গায়ের জোর। এই সব পলকনিহিত অনুমানের মধ্যে হেরম্ব কিন্তু টের পাচ্ছিল অশোকের গায়ের জোর বড়ো আর নেই। সে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মতো শীর্ণ হয়ে গেছে।

অশোক উঠল না। বলল, হেরম্ববাবু যে!

হেরম্ব বলল, আমিই। তোমাকে চেনা যাচ্ছে না, অশোক।

যাবেও না। মরে ভৌতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি যে! এ যা দেখছেন, এ হল সূক্ষ্ম শরীর।

সূক্ষ্ম সন্দেহ নেই।

আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পত্রে জানা গেল এখানকার জল-হাওয়া ভালো। উনি মনে করলেন, আমার অবস্থা বুঝে পুরীতে আমাদের নেমন্তন্নই বুঝি করছেন ওই কথা লিখে। তাই জোর করে টেনে এনেছেন। ছুটি জন্য বেশি লেখালেখি করতে গিয়ে চাকরিটি প্রায় গিয়েছিল, মশায়।

আনন্দের সঙ্গে কথা বলার সময় সুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বরে যে ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, অশোকের কথায় যেন তারই ভদ্র, গোপন-করা ধ্বনি শোনা যায়। হেরম্ব একটু সাবধান হল।

তোমার আঙুল কি হল, অশোক?

অশোকের ডান হাতের মাঝের আঙুলদুটি কাটা। ঘা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু আরক্তভাব এখনও যায়নি, শুকনো ঘায়ের মামড়ি তুলে ফেললে যেমন দেখায়। এ বিষয়ে অশোকের নিজের কৌতূহল বোধ হয় এখনও যায়নি, হাতটা চোখের সামনে ধরে সে কাটা আঙুলের গোড়া দুটি পরীক্ষা করে নিল। বলল, একজন ছোরা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।

ছোরা, অশোক?

উঁহু, দেশি দা—ভয়ানক ধার। আটকাতে গিয়ে আঙুল দুটো উড়ে গেছে। উড়ে যাওয়া উচিত ছিল মাথাটার, কেন যে গেল না ভাবলে মাথাটা আজও গরম হয়ে ওঠে।

সুপ্রিয়া বলল, মাথা গরম করে আর কাজ নেই। দোষ তো তোমার। থানাভরা সেপাই জমাদার, তবু নিজে ডাকাতের সামনে গলা এগিয়ে দেবে, বিবেচনা তো নেই।

অশোক নির্মমভাবে হাসল। বলল, বিবেচনা করেই গলা বাড়িয়ে ছিলাম, কর্তব্যের খাতিরে। তুমি যা ভেবেছিলে তা একেবারেই সত্য নয়।

আমি, কিছুই ভাবিনি।

ভাবোনি? তবে যে ডাকাত ধরতে গেলেই বলতে জেনে-শুনে প্রাণটা দিতে যাচ্ছি নিজের, খুন হতে যাচ্ছি সাধ করে? অমনি করে অমঙ্গল ডেকে আনতে বলেই তো আঙুল দুটো আমার গেল।

সুপ্রিয়া বিবর্ণ মুখে বলল, কী সব বলছ তুমি? চুপ করো।

হেরম্ব এতক্ষণ ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করার যে ধারালো ক্ষমতা সে প্রায় পরিত্যাগ করেছিল, এবার তাই সে কাজে লাগাল।

আহা বলুক না, সুপ্রিয়া, বলুক। অতিথিকে অশোক এন্টারটেন করছে বুঝতে পারিস না? গৃহস্বামীর এই তো প্রথম কর্তব্য। ওর কথা শুনো না, অশোক, তোমার যা বলতে ইচ্ছা হয় এমনি রস দিয়ে বলো। তোমার কর্তব্য তুমি করবে বইকী!

অশোকের স্তিমিত চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। হেরম্ব স্পষ্ট দেখল অসুস্থ স্বামীর লাঞ্ছনায় সুপ্রিয়ার মুখও ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু হেরম্বের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা মরে যাচ্ছিল আজ তা মরণ-কামড় দিতে চায়। গলা নামিয়ে সে যোগ দিল, তুমি গৃহস্বামী যে!

অশোক দেয়ালের দিকে মুখ করে বলল, না।—না।

হেরম্ব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, কি না, অশোক?

গৃহস্বামী অসুস্থ। তার কর্তব্য নেই।

হেরম্ব বলল, তাহলে তোমায় বিরক্ত করা উচিত হবে না। আমরা অন্য ঘরে যাই।

হেরম্ব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুপ্রিয়া তাকে অন্য একটি ঘরে যে ঘরের মেঝেতে শুধু মাদুর পাতা ছিল, নিয়ে গিয়ে বলল, বসুন। ওকে একটু শান্ত করে আসি।

পারবি না, সুপ্রিয়া, ও একটা আস্ত বাঁদর।

গালাগালি কেন? বলে সুপ্রিয়া চলে গেল।

শুধু একটা মাদুর বিছানো, একটা বালিশ পর্যন্ত নেই। মাদুরটা দেয়ালের কাছে সরিয়ে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হেরম্ব আরাম করে বসল। হেরম্বের প্রাণশক্তি অপরিমেয়, ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত, চেতনার বাদ-বিসংবাদ সহ্য করার ক্ষমতা তার অনমনীয়, কিন্তু আজ সে অপরিসীম শ্রান্তি বোধ করল। দুঃখ, বিষাদ বা আত্মগ্লানি নয়, শুধু শ্রান্তি। সুপ্রিয়ার প্রত্যাবর্তনের আগে এই বাড়ি ছেড়ে, আনন্দের সঙ্গে দেখা হবার আগে পুরী থেকে পালিয়ে, চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে পেলে সে যেন এখন বেঁচে যায়। হেরম্বের ঘুম আসে,—এক সদয় দেবতার আশীর্বাদের মতো। সে চোখ বোজে। একটা ব্যাপার সে বুঝতে পেরেছে। আনন্দের বিষণ্ন, বিরস প্রহরগুলির জন্ম-ইতিহাস। আর এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে কারণে না মরে তার পুনর্জন্ম সম্ভব নয়, সেই কারণেই তার ক্ষয় পাওয়া হৃদয়েরও পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হয়ে গেছে। তার জীবনে প্রেম। এসেছে অসময়ে। প্রেমের সে অনুপযুক্ত। বসন্ত-সমাগমে অর্ধমৃত তরুর কতগুলির পল্লব কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু কত শুষ্ক শাখায় জীবন নেই, কত শাখার বল্কল পিপীলিকা-বাস জীর্ণ। তার অকাল-বার্ধক্যের সঙ্গে আনন্দের অহরহ পরিচয় ঘটে, আনন্দের কত খেলা তার প্রিয় নয়, আনন্দের কত উল্লাস তার কাছে অর্থহীন। আনন্দ তা টের পায়। কত দিক দিয়ে আনন্দ তার সাড়া পায় না, যদি বা পায় তা কৃত্রিম, মন রাখা সাড়া। আনন্দ বিমর্ষ হয়ে যায়। মনে করে, হেরম্বের প্রেম বুঝি মরে যাচ্ছে। হেরম্বের প্রেমই যে দুর্বল এখনও সে তা টের পায়নি।

সুতরাং আনন্দকেও সে ঠকিয়েছে। জীর্ণাবশিষ্ট যৌবনের সবখানিই প্রায় তাকে ব্যয় করতে হয়েছে আনন্দকে জয় করতে, এখন তাকে দেবার তার কিছু নেই। এ কথা তার জানা ছিল না যে, পরিপূর্ণ প্রেমের অনন্ত দাবি মেটাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের। অভিজ্ঞতায় প্রেমের খোরাক নেই, মনস্তত্ত্বে ব্যুৎপত্তি প্রেমকে টিকিয়ে রাখার শক্তি নয়। নারীকে নিয়ে একদিনের জন্যও যে খেয়ালের খেলা খেলেছে, তুচ্ছ সাময়িক খেলা, প্রেমের উপযুক্ততা তার ক্ষুণ্ন হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে তাই প্রেম আসে একবার, আর আসে না, কারণ একটি প্রেমই মানুষের যৌবনকে ব্যবহার করে জীর্ণ করে দিয়ে যায়। হৃদয় বলে মানুষের কাব্যে উল্লিখিত একটি যে শতদল আছে, তার বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে একবারই হয়, তারপর শুরু হয় ঝরে যাবার আয়োজন। সাধারণ হৃদয়, প্রতিভাবানের হৃদয়, সমস্ত হৃদয় এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কারও বেলা এর অন্যথা নেই।

সুপ্রিয়ার ফিরতে দেরি হল। সে একেবারে হেরম্বের খাবার নিয়ে আসায় বোঝা গেল যে, শুধু অশোককে শান্ত করতেই তার এতক্ষণ সময় লাগেনি।

খাবার খেয়ে ঠান্ডা হয়ে হেরম্ব বলল, তোর উপরে রাগ হচ্ছিল, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া খুশি হয়ে বলল, সত্যি? কখন?

এই মাত্র। খিদেয় অন্ধকার দেখছিলাম।

খিদেয়? আমাকে না দেখে নয়?

হেরম্ব হাই তুলে বলল, একটা বালিশ এনে দে তো, ঘুমোব।

সুপ্রিয়া একটি অত্যন্ত কুটিল প্রশ্ন করল।

কেন? রাত জাগেন বুঝি, ঘুমোবার সময় পান না?

হেরম্বও সমান কুটিলতার সঙ্গে জবাব দিল, সময় পাই বইকী। রাত দশটা বাজতে না বাজতে ওখানকার সবাই, আনন্দ সুদ্ধ, ঢুলতে ঢুলতে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। তারপর সারারাত নিষ্কর্মাঘুম দিলে আমায় ঠেকায় কে!

সুপ্রিয়া লজ্জা পেল। বানিয়ে বানিয়ে এত কথা আপনি বলতে পারেন! কিন্তু আপনার শরীর যে রেটে খারাপ হয়েছে তাতে মনে হয় না ঠিকমতো আহার-নিদ্রা হয়।

রেটটা তোরও কম নয়, সুপ্রিয়া।

আমার অসুখ, ফিটের ব্যারাম। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনার শরীর খারাপ হবে কেন?

আমারও হয়তো অসুখ, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া হেসে বলল, তর্কে হারাবার উপক্রমেই অসুখ হয়ে গেল। বসুন, বালিশ এনে দিচ্ছি।— ওয়াড় পরিয়ে আনতে হবে। এমন আলসে হয়েছি আজকাল, ময়লা বালিশে শুয়ে থাকি তবু ওয়াড় বদলাই না। এবার আমি মরব নাকি?

বালিশ নিয়ে সুপ্রিয়া ফেরার আগে এল অশোক।

দুপুরে এখানেই খাবেন, দাদা।

তার আমন্ত্রণের এই অমায়িক সুরে হেরম্ব বুঝতে পারল সুপ্রিয়া সত্যসত্যই অশোককে শান্ত করতে পেরেছে। সুপ্রিয়ার এ ক্ষমতা তার অভিনব মনে হল না। অশোকের প্রতি সুপ্রিয়ার যে গভীর ও আন্তরিক মমতা আছে, অশোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যে নিবিড় মনোযোগ ও অক্লান্ত সেবায় তার এই মমতা প্রকাশ পায়, অশোকের অতিরিক্ত দুঃখ ও অপমান মুছে নেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সুপ্রিয়ার প্রকৃতি শান্ত, সে বিশ্বাস করে মানুষ মাথাপাগলা নয়, বাস্তব জগতে ভাব নিয়ে মানুষের দিন কাটে না। যার জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সে সমস্তই পাওয়া চাই। জীবন নষ্ট করবার জন্য নয়, নিজের জন্য চাইতে এবং নিতে, যতটা পারা যায় পরকে পাইয়ে দিতে, কারও লজ্জা নেই। নিজের জীবন গুছিয়ে নেওয়া চাই, পরের জীবন সাজিয়ে দেওয়া চাই। হেরম্বের জন্য অশান্তি, উদ্‌বেগ, সন্দেহ, ঈর্ষা প্রভৃতি যতগুলি পীড়াদায়ক অনুভূতি আছে তার প্রায় সবগুলি অনুভব করে দিন কাটানোর ফলে ফিটের ব্যারাম জন্মে যাওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত মনোভাবের দরুন সুপ্রিয়ার কথায় ব্যবহারে সর্বদা এমন একটি কোমল ভাব ও সহানুভূতির সঙ্গে চারিদিক হিসাব করে চলবার আন্তরিক চেষ্টা প্রকাশ পায় যে, তার সম্বন্ধেও মানুষকে সে বিবেচনা করে চলতে শেখায়। সে যাকে ব্যথা দেয়, নিদারুণ ক্রোধের সময়ও তাকে স্মরণ রাখতে হয় যে উপায় থাকলে ব্যথা সে দিত না। সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে মনে নালিশ পুষে রাখা কঠিন।

হেরম্ব অশোকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। বলল, বেশ তো।

আর বিকেলে যদি পারেন ওকে একবার মন্দির স্বর্গদ্বার-টার যা দেখবার আছে দেখিয়ে আনবেন। আমার নিজের তো ক্ষমতা নেই নিয়ে যাব।

আচ্ছা।

অশোক চুপিচুপি বলল, আমার কী ভীষণ সেবাটাই যে ও করছে, দাদা, বললে আপনার বিশ্বাস

হবে না। নাওযা নেই, খাওযা নেই, ঘুম নেই, নিজেব চোখে যে না দেখেছে—এখনও যথেষ্ট করছে। ও মনে করে আমি বুঝি কিছুই চেয়ে দেখি না, আমার কৃতজ্ঞতা নেই। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, ওর সেবা আমি কখনও ভুলবো না।

হেরম্ব বলল, তুমি ভুল করছ অশোক, ও কৃতজ্ঞতা চায় না।

জানি, জানি, ওব মন কত উঁচু আমি জানি না।

সুপ্রিয়া বালিশ নিয়ে ফিরে আসায় এ প্রসঙ্গ থেমে গেল। অশোককে এ ঘরে দেখে সুপ্রিয়া সন্ধিগ্ধভাবে দুজনের মুখের দিয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। বালিশটা মাদুরে ফেলে দিয়ে বলল, হেরম্ববাবু এখন ঘুমোবেন। চল আমরা যাই।

অশোক উঠল।—আমি ওঁকে এ বেলা খাবার নেমন্তন্ন করেছি, সুপ্রিয়া।

বেশ করেছ। নিজে রাঁধোগে, আমি পারব না।

বলে সুপ্রিয়া হাসল। সুপ্রিয়াকে এত ঠান্ডা হেরম্ব আর কখনও দেখেনি।

বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ভেঙে হেরম্ব দেখতে পায় তার ঘুমের অবসরে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে বাইরে দারুণ দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। বাতাস বইছে সাঁ সাঁ শব্দে, উত্তাল সমুদ্রের গর্জন বেড়ে গেছে। উঠে ঘরের বাইরে যেতে গিয়ে হেরম্ব অবাক হয়ে যায়। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ডাকাডাকি শুনে সুপ্রিয়া এসে দরজা খুলে দেয়। ভারী তালা খোলার শব্দ হেরম্ব শুনতে পায়।

দরজা খুললে তালাটিকে সে খুঁজে পায় না। সন্দিগ্ধ হয়ে বলে, দেখি তোর হাত? ওটা নয়, আঁচলেব নীচে যেটা লুকিয়েছিস।

কেন?

দেখা কী লুকিয়েছিস, তালা বুঝি? দরজায় তালা দেওয়ার মানে?

সুপ্রিয়া হেসে বলে, মানে আর কী, পালিয়ে না যেতে পারেন তাই। যে পালাই-পালাই স্বভাব!

হেরম্ব বলে, আমাব ঘুমের মধ্যে অশোক বুঝি চোরা হাতে এদিকে আসছিল?

সুপ্রিয়া গলা নামিযে বলে, আস্তে কথা কইতে পারেন না?—তা আসেনি। আসতে পারত।

হেরম্ব হেসে বলে, ও, তোর শুধু সন্দেহ! তুই সত্যি দারোগাব বউ, সুপ্রিয়া। সে গেছে কোথায়?

ছাদে।

এই ঝড়বৃষ্টিব মধ্যে ছাদে?

সমুদ্র দেখতে গেছে। বললে, ঝড় উঠলে সমুদ্র কেমন দেখায় দেখবার এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আমাকেও জোব করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একটু ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে এসেছি।

ধস্তাধস্তি কেন?

কারণ ছিল বইকী। আমায় ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। যত সব বিদঘুটে খেয়াল!

হেরম্ব ফিরে গিয়ে মাদুরে বসল। ঘরের জানালা দুটি বায়ুর গতির দিকে খোলে, বন্ধ করার দরকাব হয়নি। বাইরে এমন দুর্যোগ নামলে আনন্দ তার ঘরে সমুদ্রের ঝিনুক নিয়ে খেলা করে, তার যখন খুশি তাকায়, যখন খুশি কথা বলে। তাদের নিজেদের প্রেমের সমস্যা ছাড়া সে ঘরে দুর্ভাবনার প্রবেশ নিষেধ। কারও জীবনের প্রভাব সেখানে নেই, সুপ্রিয়ারও নয়,—তাকে সে ভুলে যায়। কিন্তু সুপ্রিয়ার কাছে থাকলে একটি বেলার জন্যও তার রেহাই নেই। আবহাওয়া অবিলম্বে বৈদ্যুতিক হয়ে ওঠে। দুর্ঘটনা ঘটে, দুঃসংবাদ পাওয়া যায়। তাদের মাঝখানে আর একটি জীবনের নাটকীয় অভিনয়

ঘটে চলে। বাড়ির ছাদের ভয়ংকর ঘটনাটুকুর সংবাদ সুপ্রিয়া তাকে কেন দিয়েছে বুঝে হেরম্বের বড়ো কষ্ট হয়। সুপ্রিয়াও কি মালতী হয়ে উঠল?

কী হয়েছিল? হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল।

শুনে অবিচার করবেন না। আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যাবার সময় ওর কোনো মতলব ছিল না, শুধু ছেলেমানুষি খেয়াল। আমাকে ধারে দাঁড়াতে দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। হঠাৎ 'সুপ্রিয়া' বলে চেঁচিয়ে ধাঁ করে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আর একটু হলেই দুজনে একসঙ্গে—

তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া কোনোদিন কলহ করেনি, আজও করল না। তার চোখে শুধু জল এল। হেরম্ব একটু নরম হয়ে বলল, তুই ইচ্ছে করে মিথ্যে বলেছিস, তা বলছি না, সুপ্রিয়া। তুই বুঝতে পারিসনি।

আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

হেরম্ব খনিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, ঝড়-বাদলে খোলা ছাদে তোকে কাছে পেয়ে হঠাৎ মনের আবেগে—

সুপ্রিয়া হাত বাড়িয়ে হেরম্বর পা ছুঁয়ে বলল, বিশ্লেষণ করবেন না, আপনার পায়ে পড়ি। আবেগ!— আকাশ থেকে বৃষ্টির মতো আবেগ গড়িয়ে পড়ছে।

হেরম্ব আশ্চর্য হয়ে বলল, তুই বুঝি আবেগে বিশ্বাস করিস না, সুপ্রিয়া?

সুপ্রিয়া জবাব না দিয়ে চোখ মুছে ফেলল।

এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালোবাসে না, সুপ্রিয়াও নয়, আনন্দও নয়। তার এ কী অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালোবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? এ কি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কী হবে? বরং আজ পর্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিষাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।

সুপ্রিয়া তার মুখের ভাব লক্ষ করছিল। একটু ভয়ে ভয়ে বলল, ওকে নামিয়ে আনবেন না? ভিজে ভিজে মরবে নাকি!

বা, সেটা ঘটতে দেওয়া উচিত হবে না, বলে হেরম্ব উঠে দাঁড়াল।

অশোককে নামিয়ে এনে স্নানাহার করতে বৃষ্টি থেমে গেল। হেরম্ব বিদায় নিল। বলে গেল বিকালে যদি পারে একবার আসবে, সুপ্রিয়াকে যে সব জায়গা দেখিয়ে আনবার কথা আছে দেখিয়ে আনবে।

যদি পারি কেন?

না পারলে কী করে আসব, সুপ্রিয়া?

চারটের মধ্যে যদি না আসেন তাহলে ধরে নেব আপনি আর এলেন না।

যদি আসি চারটের মধ্যেই আসব।

বাগানে ঢুকতেই আনন্দের দেখা পাওয়া গেল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, এত দেরি করলে! মা এদিকে খেপে গেছে।

আনন্দ সংবাদটা এমনভাবে দিল যে হেরম্ব বুঝে নিল মালতীর খেপবার কারণ সুপ্রিয়ার সঙ্গে গিয়ে তার ফিরতে দেরি করা। সে রুক্ষস্বরে বলল, খেপলে আমি কী করব?

আনন্দ বলল, মন্দির থেকে বাড়িতে এসে মা যেই দেখলে বাবা নেই, বাবার কম্বল, বই, খাতা এ সবও নেই, ঠিক যেন পাগল হয়ে গেল।

হেরম্ব আশ্চর্য হয়ে বলল, মাস্টারমশায় গেলেন কোথায়?

বাবা, চলে গেছে।

কোথায় চলে গেছেন?

আনন্দের চোখ ছলছল করে এল।

তা জানিনে তো। তোমার কাছ থেকে যখন টাকা নিয়ে দিলাম, তখন কিছু বললেন না। তোমরা চলে যাবার পর বাবা আমাকে ডেকে চুপিচুপি বললেন, আমি যাচ্ছি আনন্দ, তোর মাকে বলিস না, গোল করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ বাবা, কবে ফিরবে? বাবা জবাবে বললেন, সে সব কিছু ঠিক নেই। আমি বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলাম।

বলে আনন্দ চোখ মুছতে লাগল। হেরম্ব তাকে একটি সান্ত্বনার কথাও বলতে পারল না। বাতাসের নাড়া খেয়ে গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে, আনন্দ প্রায় ভিজে গিয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে হেরম্ব ঘরে গেল। জানালা কেউ বন্ধ করেনি। বৃষ্টির জলে মেঝে ভেসে গিয়েছে। হেরম্বের বিছানাও ভিজেছে। বিছানাটা উলটে নিয়ে হেরম্ব তোশকের নীচে পাতা শুকনো শতরঞ্চিতে বসল। বলার অপেক্ষা না রেখে আনন্দও তার গা ঘেঁষে বসে পড়ল। সে অল্প কাঁপছিল, জলে ভিজে কিনা বলবার উপায় নেই। হেরম্বের মনে হল সান্ত্বনার জন্য যত নয়, নির্ভরতার জন্যই আনন্দ ব্যাকুল হয়েছে বেশি। এ রকম মনে হওয়ার কোনো সঙ্গত কারণ ভেবে না পেয়ে হেরম্ব তাকে সান্ত্বনাও দিল না, নির্ভরতাও দিল না। সে বরাবর লক্ষ করেছে এ রকম অবস্থায় ঠিকমতো না বুঝে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়।

আনন্দ বলল, মা কি হয়েছে জান? বাবাকে টাকা দিয়েছি বলে আমাকে মেরেছে। হেরম্বের দিকে পিছন ফিরে পিঠের কাপড় সে সরিয়ে দিল, দ্যাখ কী রকম মেরেছে। এখনও ব্যথা কমেনি। ঘষা লেগে জ্বালা করে বলে জামা গায়ে দিতে পারিনি, শীত করছে, তবু। কী দিয়ে মেরেছে জান? বাবার ভাঙা ছড়িটা দিয়ে।

তার সমস্ত পিঠ জুড়ে সত্যিই ছড়ির মোটা মোটা দাগ লাল হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিশ্বাস রোধ করে বলল, তোমায় এমন করে মেরেছে!

আনন্দ পিঠ ঢেকে দিয়ে বলল, আরও মারত, পালিয়ে গেলাম বলে পারেনি। বৃষ্টির সময় মন্দিরে বসেছিলাম। তুমি যত আসছিলে না, আমি একেবারে মরে যাচ্ছিলাম। তিনি বুঝি আসতে দেননি যাঁর সঙ্গে গেলে?

হ্যাঁ, তার স্বামী আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না। পিঠে হাত বুলিয়ে দেব আনন্দ?

না, জ্বালা করবে।

হেরম্ব ব্যাকুল হয়ে বলল, একটা কিছু করতে হবে তো, নইলে জ্বালা কমবে কেন? আচ্ছা সেঁক দিলে হয় না? বলে হেরম্ব নিজেই আবার বলল, তাতে কী হবে?

এখন জ্বালা কমেছে।

কমেনি, জ্বালা টের পাচ্ছ না। তোমার পিঠ অসাড় হয়ে গেছে। বরফ ঘসে দিতে পারলে সবচেয়ে ভালো হত।

তা হত। কিন্তু বরফ নেই। তুমি বরং আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েই দাও।

বোসো, বরফ নিয়ে আসছি।

আনন্দের প্রতিবাদ কানে না তুলে হেরম্ব চলে গেল। শহর পর্যন্ত হেঁটে যেতে হল। বরফ কিনে সে ফিরে এল গাড়িতে। আনন্দ ইতিমধ্যে মেঝের জল মুছে ভিজে বিছানা বদলে ফেলেছে। সে যে সোনার পুতুল নয় এই তার প্রমাণ।

এত কষ্ট করে বরফ সংগ্রহ করে এনেও এক ঘণ্টার বেশি আনন্দের পিঠে ঘষে দেওয়া গেল না। বরফ বড়ো ঠান্ডা। আনন্দ চুপ করে শুয়ে রইল, হাত গুটিয়ে বসে রইল হেরম্ব। যে কোনো কারণেই হোক, আনন্দকে মালতী যে এমনভাবে মারতে পারে সে যেন ভাবতেই পারছিল না।

মেঘ কেটে গিয়ে এখন আবার কড়া রোদ উঠেছে। পৃথিবীর উজ্জ্বল মূর্তি এখনও সিক্ত এবং নম্র। আনন্দকে শুয়ে থাকতে হুকুম দিয়ে হেরম্ব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

মালতী কখন থেকে বারান্দায় এসে বসে ছিল। হেরম্বকে সে কাছে ডাকল। হেরম্ব ফিরেও তাকাল না। মালতী টলতে টলতে কাছে এল। বেশ বোঝা যায়, মাত্রা রেখে আজ সে কারণ পান করেনি। কিন্তু নেশায় তার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে বলে মনে হল না।

সাড়া দাও না যে!

কারণ আছে বইকী।

মালতী বোধ হয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সেখানে দুপ করে বসল।—শুনি, কারণটা শুনি।

সেটুকু বুঝবার শক্তি আপনার আছে, মালতী বউদি।

মালতী এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। গলা যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, আর মালতী বউদি কেন, হেরম্ব?—কেমন খাবাপ শোনায়। ভাবছি আজকালের মধ্যেই তোমাদের কণ্ঠিবদলটা সেরে দেব, আর দেরি করে লাভ কী? কণ্ঠিবদলে তোমার আপত্তি নেই তো? আপত্তি কোরো না, হেরম্ব। আমরা বৈষ্ণব, তোমার মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আমারও কণ্ঠিবদল হয়েছিল। তোমাদেরও তাই হোক, তারপর তুমি তোমার তিন আইন চার আইন যা খুশি কর, আমার দায়িত্ব নেই, ধর্মের কাছে আমি খালাস।

সুপ্রিয়া যতদিন পুরীতে উপস্থিত আছে ততদিন এ সব কিছু হওয়া সম্ভব নয়। সুপ্রিয়ার কাছে এখনও সে সেই ছমাসের প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ, তার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া দরকার। আনন্দকে চোখে দেখে গিয়েও সুপ্রিয়া তাকে রেহাই দেয়নি। স্পষ্টই বোঝা যায় সেকালের নবাব-বাদশার মতো সে যদি সুন্দরীদের একটি হারেমে রাখে, সুপ্রিয়া গ্রাহ্য করবে না, তার ভালোবাসা পেলেই হল। এমন একদিন হয়তো ছিল যখন দেখা হওয়া মাত্র হেরম্ব সুপ্রিয়ার সঙ্গে তার সেই ছমাসের চুক্তি বাতিল করে দিতে পারত। এখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে তার সময় লাগে। কণ্ঠিবদল কিছুদিন এখন স্থগিত না রেখে উপায় নেই।

শুনে মালতী সন্দিগ্ধ হয়ে কারণ জানতে চাইল। হেরম্ব সোজাসুজি মিথ্যা বলল, বলল যে পূর্ণিমা আসুক, আগামী পূর্ণিমায় না হয় হবে। ইতিমধ্যে অনাথ ফিরে আসতে পারে। অনাথের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করা সঙ্গত নয় কি?

মালতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী মনে হয় হেরম্ব ও আর ফিরবে?

ফিরতে পারেন বইকী।

মালতী বিশ্বাস করল না। না, সে আর ফিরছে না হেরম্ব, মিনসে জন্মের মতো গেছে।

হেরম্ব বলল, নাও যেতে পারেন, হয়তো কালকেই তিনি ফিরে আসবেন। আনন্দকে মিছামিছি মেরেছেন।

মালতী অল্প একটু গরম হয়ে বলল, মিছামিছি! ওর বাবার ভাগ্যি ভালো ওকে খুন করিনি। কে জানত পেটে আমার এমন শত্তুর হবে!

হেরম্ব এবার রূঢ়কণ্ঠে বলল, কী শত্রুতা করল ভেবে পাই না। টাকা দশটা জোগাড় করে না দিলে কি তাঁর যাওয়া হত না? যে যেতে চায় অত সহজে তাকে আটকানো যায় না, মালতী বউদি।

মালতী বলল, তুমি ছাই বোঝ। টাকা জোগাড় করে দেওয়ার জন্য নাকি! আমাকে না জানিয়ে ও চুপ করে রইল কোন হিসাবে? আমি টের পেলে কি সে যেতে পারত, হেরম্ব!

দুহাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে মালতী আবার বলল, অদেষ্ট দেখেছ, হেরম্ব? আজ আমার

জন্মদিন, জ্বালাতন করব, তাই পালিয়ে গেল। মালতীর গাল আর চিবুকের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে আসছিল, রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।—একেবারে পাগল, হেরম্ব, উন্মাদ। গেছে যাক, আজ দেখব কাল দেখব তারপর ঘরদোরে আমিও ধরিয়ে দেব আগুন।... ওলো সর্বনাশী উঁকি মেরে দেখিস কোন লজ্জায়? আয় ইদিকে আয়, হতভাগি!

আনন্দ আসে না। হেরম্ব তাকে ডেকে বলল, এসো, আনন্দ।

আনন্দ কুণ্ঠিত পদে কাছে এলে মালতী খপ করে তার হাত ধরে ফেলল। কাছে বসিয়ে পিঠের কাপড় সরিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখে বলল, তোর কি মাথা খারাপ হয়েছিল আনন্দ? লক্ষ্মীছাড়া মেয়ে, তুই পালিয়ে যেতে পারলি না?

আনন্দ মুখ গোঁজ করে বলল, গেলাম তো পালিয়ে।

পালিয়ে গেলি তো এমন করে তোকে মারল কে শুনি? মালতীর গলা হতাশায় ভেঙে এল, গোঁয়ার! যেমন বাপ তেমনি গোঁয়ার মেয়ে। ঠায় দাঁড়িয়ে মার খেয়েছ। যত বলি—যা আনন্দ, চোখের সমুখ থেকে সরে যা, মেয়ে তত এগিয়ে এসে মার খায়।

মাতা ও কন্যার মিলন হল এইভাবে। হেরম্বের না হল আনন্দ, না হল স্বস্তি। নূতন ধরনের যে বিষাদ তার এসেছে তাতে সবই যেন তার মনে হচ্ছে সাধারণ, স্বাভাবিক।

তারপর মালতী জিজ্ঞাসা করল, পিঠে নারকেল তেল দিতে পারিসনি একটু?

বরফ দেওয়ার কথাটা কেউ উল্লেখ করল না। হেরম্বকে দিয়ে তেলের শিশি আনিয়ে মালতী মেয়ের পিঠে মাখিয়ে দিতে আরম্ভ করল।

আনন্দকে প্রহার করেই মালতী শান্ত হয়ে যাবে হেরম্ব সে আশা করেনি। অনাথ যে সত্যই চিরদিনের মতো চলে গেছে তাতে সেও সন্দেহ করে না। মৃত্যুর চেয়ে এভাবে প্রিয়জনকে হারানো বেশি শোকাবহ। এই শোক মালতীর মধ্যে ঠিক কী ধরনের উন্মত্ততায় অভিব্যক্ত হবে তাই ভেবে হেরম্ব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মালতীর শান্ত ভাবটা সে ঠিক বুঝতে পারল না। কারণের প্রভাব হওয়া আশ্চর্য নয়।

ওদিকে সুপ্রিয়ার সমস্যা আছে। চারটের মধ্যে সুপ্রিয়ার কাছে তার হাজির হবার কথা। ঘড়ি দেখে বোঝা গেল এখন আর তা সম্ভব নয়—চারটে বাজে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলে দেরি করে যাওয়ার অপরাধ সুপ্রিয়া ধরবে না। যেতেই হেরম্বের ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

তাকে সামনে পেলে সুপ্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে নবজাগ্রত আশায় উৎফুল্ল হয়, ক্ষণে ক্ষণে ব্যথায় মলিন হয়ে যায়। হেরম্বের চোখের দৃষ্টিতে মুখের কথায় আজও সে অদম্য আগ্রহে অনুসন্ধান করে প্রেম, নিজেরই সুদীর্ঘ তপস্যার অন্ধ-শক্তিতে পলে পলে হতাশাকে জয় করে চলে। তার কাছে হেরম্বকে প্রত্যেকটি মুহূর্ত সাবধান হয়ে থাকতে হয়। ক্রমাগত সুপ্রিয়ার চিত্তকে ভিন্নাভিমুখী করার চেষ্টায় মাঝে মাঝে তার ভ্রান্তি জন্মে যায়, সুপ্রিয়ার প্রেমকে হত্যা করার বদলে সে বুঝি প্রশ্রয় দিয়েই চলেছে। হেরম্বের সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে এই যে, আনন্দের সংস্রবে এসে তার মন এমন দুর্বল হয়ে উঠেছে কারও প্রতি কল্যাণকর নিষ্ঠুরতা দেখাবার শক্তি তার নেই। রূপাইকুড়ায় গভীর রাত্রে সুপ্রিয়া যেমন সোজাসুজি তার দাবি জানিয়েছিল, আজও যদি সে তেমনিভাবে স্পষ্টভাষায় তাকে প্রার্থনা করে, জীবন থেকে বরখাস্ত করে দেওয়া হেরম্বের পক্ষে হয়তো সহজ নয়। কিন্তু সুপ্রিয়া তাদের সেই ছমাসের চুক্তিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এদিকে আজকাল কেবল নিজের এবং একান্ত নিজস্ব যে, তার সুখদুঃখের কথা ভাবার মতো সঙ্গত স্বার্থপরতা হেরম্বের কাছে হয়ে উঠেছে লজ্জাকর। সুতরাং যদি দুদণ্ড তার সঙ্গে কথা বলে শান্তি পায়, তার দীর্ঘকালব্যাপী জীবন-পণ ভালোবাসার কথা স্মরণ করে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার নিজের আছে বলে হেরম্ব ভাবতে

পারে না। এদিক দিয়ে বিচার করে হেরম্ব চিনতে পারে না নিজেকে। সে ছিল কঠিন, মানুষের ছোটো বড়ো সুখদুঃখের কোনো মূল্য তার কাছে ছিল না, কারও হৃদয়কে সে কোনোদিন খাতির করে চলেনি। আজ শুধু কোমল হওয়া নয়, গলিত বরফের মতো সে তরল হয়ে গেছে, যে যেখানে তৃষার্ত আছে তারই অঞ্জলিতে নিজেকে সে বিলিয়ে দিতে চায়।

ঘরে বসে উদ্‌বেগ ও অশান্তিতে হেরম্ব কাতর হয়ে পড়ে। আবার তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হয়। জীবন যখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে তখন আর দাঁড়িয়ে মার খেয়ে লাভ কী? সুপ্রিয়ার আবির্ভাব হওয়া মাত্র তার যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, শেষ পর্যন্ত কী অবস্থা দাঁড়াবে কে বলতে পারে?

যে তেজ, সে প্রচণ্ড গতির অবসান হয়ে গেছে তার জন্য হেরম্বের মন হাহাকার করে। একদিন যা দিয়ে সে মানুষের বুকও ভেঙেছে ঘরও ভেঙেছে, আজ সে শক্তি থাকলে সে মহামানবের মতো ভাঙা বুক জোড়া দিতে পারত, ভাঙা ঘর গড়ে তুলতে পারত। মনে জোর থাকলে জীবনে সমস্যা কোথায়? মালতী, সুপ্রিয়া ও আনন্দকে নিয়ে বিপুল পৃথিবীর এককোণে ঠাঁই বেছে নেওয়া কঠিন নয়, জীবনের দুটি প্রান্তে সুপ্রিয়া ও আনন্দকেও এমনভাবে রেখে দেওয়া অসম্ভব নয় যাতে নিজস্ব সীমা তাদের কোনোদিন চোখে পড়বে না, খণ্ডিত হেরম্বকে দিয়েও জীবনের পূর্ণতা সাধিত হওয়ায় কোনোদিন তারা অনুভব করতে পারবে না নিজেকে দুভাগে ভাগ করে দুজনকেই সে ঠকিয়েছে। একদিন হেরম্বের পক্ষে এ কাজ সম্ভব ছিল। আজ এ শুধু কল্পনা, অক্ষমের দিবাস্বপ্ন।

সত্যই কল্পনা। আজ সারাদিন, বিশেষভাবে আনন্দের পিঠে বরফ ঘষে দেবার সময়, এই দিবাস্বপ্নই সে দেখেছে। সুপ্রিয়া থাকে জনপদের একটি দ্বিতল গৃহে, তার ছবির মতো সাজানো ঘরে সারাদিন হেরম্ব গৃহস্থ সংসারী, সন্ধ্যায় সে ফিরে যায় আনন্দের স্বহস্তে রোপিত ফুলগাছে সাজানো বাগানে ঘেরা শান্ত নির্জন কুটিরে। সুপ্রিয়া তাকে রেঁধে খাওয়ায়, আনন্দ তাকে দেখায় চন্দ্রকলা নাচ। তার মধ্যে যে ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট দেবতা আছেন হেরম্ব তাকে এমনি সব উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার নৈবেদ্য নিবেদন করে। নিবেদন করে সসংকোচে, প্রায় সজল চোখে। তার কি বুঝতে বাকি আছে যে, এই ভ্রান্ত আত্মপূজা তার বার্ধক্যের পরিচয়, এইসব রঙিন কল্পনা তার কৈশোরে ফিরে আসার লক্ষণ নয়, যৌবন-অপরাহ্ণের মৃত্যু উৎসব।

মালতী আজ হেরম্বকে বেদখল করেছে। দশ মিনিটের বেশি একা থাকতে দেয় না।

মালতী বলে, মিনসে যদি আর একটা দিন থেকে যেত, আমার জন্মদিনের উৎসবটা হতে পারত। যাক, কী আর হবে, গেছেই যখন মরুকগে যাক। তারও শান্তি, আমারও শান্তি।

শান্তিই মানুষের সব। হেরম্ব সংক্ষেপে বলে।

মালতী হেসে বলে, খুব একটা মস্ত কথা বললে তো! আসল কথাটা জান, হেরম্ব? আমায় আর দেখতে পারত না। ও সব যোগটোগ মিছে কথা, ভণ্ডামি। একজনকে দেখতে না পারলেই মানুষের ও সব ভণ্ডামি আসে। কই, সংসারে বিরাগ না এলে সন্ন্যাসী হতে দেখলাম না তো কাউকে! ভোগ ভালো না লাগলে তখন তোমাদের ধর্মে মতি হয়। তোমরা পুরুষ মানুষেরা হলে কি বলে গিয়ে সুখের পায়রা। যখন যাতে মজা লাগে তাই তোমাদের ধর্ম। ঘেন্নার জাত বাপু তোমরা।

শেষ পর্যন্ত মালতীকে সহ্য করতে না পেরেই হেরম্ব পথে বেরিয়ে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, তুমি বুঝি তার বাড়ি যাচ্ছ?

হ্যাঁ, তুমি বারণ করলে যাব না।

বারণ করব কেন?

সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব, আনন্দ।

আনন্দ ম্লানমুখে বলল, তাই এসো। আমার আজ বড়ো মন কেমন করছে। হেরম্ব ইতস্তত করে বলল, তবে না হয় নাই গেলাম, আনন্দ। চল, আমরা সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।

আনন্দ বলল, না, আমি মার কাছে থাকব।

হেরম্ব আর দ্বিধা করল না। থাক, আমি যাব না, আনন্দ। যেতে বলেছিল একবাব, কাল গেলেই হবে।

কিন্তু আনন্দ তাকে মত পরিবর্তন করতে দিল না। বলল, না, যাও। না গেলে তিনি আবার এসে হাজির হবেন তো! এখন দেখা করে এসো, সন্ধ্যার পরে তুমি আর কোথাও যেও না, আমাব কাছে থেকো।

হেরম্ব জানত সুপ্রিয়া তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। দেরি দেখে হয়তো মাঝে মাঝে পথের দিকেও তাকাবে। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছানোমাত্র সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে যোগ দেবে হেরম্ব তা ভাবতে পারেনি। সুপ্রিয়ার পক্ষে এতখানি অধীরতা কল্পনা করা কঠিন।

সুপ্রিয়া নিজে থেকে কৈফিয়ত দিল।

ওঁর দাদা-বউদি এসে পড়েছে। চলুন আমরা পালাই।

পালাই? পালাই কিরে?

সুপ্রিযা ব্যাকুল হয়ে বলল, সরে চলুন এখান থেকে, কেউ দেখতে পাবে। হেঁয়ালি বুঝবার সময় পাবেন ঢের।

সে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। মূঢ়ের মতো তাকে অনুসরণ করা ছাড়া হেরম্বের আব উপায় বইল না। সমুদ্রের ধারে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত সুপ্রিয়া মুহূর্তের জন্য তার গতিবেগ শ্লথ করল না। সে যেন চুরি কবে পালাচ্ছে। বঙ্গনারীর এই অস্বাভাবিক জোর চলনে পথের লোক অবাক হয়ে চেয়ে আছে লক্ষ করে হেরম্বের লজ্জা করতে লাগল। সুপ্রিয়ার পায়ে জুতো নেই, পবনের সাধারণ শাড়িখানা ময়লা, তার আলগা খোঁপা খুলে গেছে। বয়সও তার কম হয়নি, চার বছর আগে একবাব সে মা হয়েছিল।

তবু সমুদ্রতীর অবধি হেরম্ব চুপ করে রইল। সেখানে সুপ্রিয়া দাঁড়াতে সে মৃদু ও কড়া সুরে বলল, রাস্তাব লোক হাসালি, সুপ্রিয়া।

হাসুক। মাগো, এইটুকু জোরে হেঁটে হাঁপ দবে গেছে'

বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে সে নিশ্বাস নেয়। সমুদ্রের বাতাসে তার আলগা চুল, অনাবদ্ধ অঞ্চলপ্রান্ত উড়তে থাকে। হেরম্ব সভয়ে স্মরণ করে সুপ্রিযার এ রূপ প্রায় পাঁচ বছরেব পুরোনো, যখন ছেলেমানুষ পেয়ে আনন্দের সমবয়সি সুপ্রিয়াকে সে ভুলিয়ে বিয়ে দিয়েছিল বলে রূপাইকুড়ায় সুপ্রিয়া অভিযোগ করেছে।

দাঁড়াবেন না, চলুন। বলে সমুদ্রের ঢেউ যেখানে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যায় সেখান দিয়ে সুপ্রিয়া হাঁটতে আরম্ভ করল। রোদের তেজ এখনও কমেনি, কিন্তু জোরালো বাতাস রোদের তাপ গা থেকে মুছে নিয়ে যাচ্ছে। হেরম্ব বলল, 'ব্যাপার কী বল তো, সুপ্রিয়া?'

ব্যাপার কঠিন কিছু নয়। বাড়িতে ভিড় জমেছে, নিরিবিলি কথা বলার জন্য সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এলাম—শুধু এই।

ফিরে গিয়ে কী কৈফিয়ত দিবি?

তার দরকার হবে না।

নীরবে দুজনে এগিয়ে চলল। সমুদ্রতীর পথ নয় কিন্তু হেঁটে বড়ো আরাম। পাশে অনন্ত সমুদ্রের গা ঘেঁষে সমুদ্রতীরও কোথায় কতদূর চলে গেছে, শেষ নেই। সঙ্গী নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটবার সুবিধাও এইখানে, সমুদ্রের কলরব নীরবতাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, পীড়ন করতে দেয় না।

অনেক দূর গিয়ে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা কল, চিঠিতে ওই মেয়েটার কথা লেখেননি কেন?

লিখিনি? ভুল হয়ে গিয়েছিল।

আমি খবর পেয়েছিলাম। ও সাক্ষী দিতে একবার পুরী এসেছিল। গিয়ে বলল, আপনি এক তান্ত্রিকের আড্ডায় ডুবতে বসেছেন।

তান্ত্রিক নয়, বৈষ্ণব।

মেয়েটাকে দেখেই আমার ভালো লাগেনি। ওর মা-টা আরও খারাপ।

হেরম্ব গম্ভীর হয়ে বলল, তুই বুঝি বুলে গেছিস, সুপ্রিয়া, কতকগুলি কথা আছে মুখ ফুটে যা বলতে নেই?

সুপ্রিয়া কলহের সুরে বলল, চুপ করে থাকব, না? আমি তা পারব না। আমি মেয়েমানুষ, অত উদাব আমি হতে চাই না। পারলে ওই রাক্ষসীকে আমি বিষ খাইয়ে গলা টিপে মেরে ফেলব, এই আপনাকে আমি স্পষ্ট বলে বাখলাম।

হেরম্ব অনাথের মতো অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, তুই যে ক্রমেই মালতী বউদি হয়ে উঠছিস, সুপ্রিয়া।

মালতী বউদি কে? ওই মা-টা বুঝি? হুঁ, ডাকের দেখি বাহার আছে?

চেহাবাব বাহাব আছে, সুপ্রিয়া।

তা আছে, দুজনাবই।

খোঁচা খেয়ে হেরম্ব একটু বিরক্ত হল। সুপ্রিয়ার এবারকার পদ্ধতিটা ভালো নয়। রূপাইকুড়ায় সে তাদেব বাহ্য সম্পর্ককে প্রাণপণে ঠেলে তুলতে চেয়েছিল সেই স্তরে যেখানে বাস্তবধর্মী মানুযেব আবেগ ও স্বপ্ন বিছানো থাকে, যেখানে বস ও মাধুর্যেব সমাবেশ। সাধারণ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে তুচ্ছ কবে দেবার প্রবৃত্তি হেবম্ব যাতে দমন করতে না চায়, রূপাইকুড়ায় তাই ছিল সুপ্রিয়ার প্রাণপণ চেষ্টা। এবার সুপ্রিয়া তার সমস্ত নেশা টুটিয়ে দিতে চায়, সে যে প্রায় ভুলে যেতে বসেছে সে রক্তমাংসের মানুয, তার এই ভ্রান্তিকে সে টিকতে দেবে না। আত্মবিস্মৃত পাখির মতো নিঃসীম আকাশে পাখা মেলে অনন্ত-যাত্রায় তাকে প্রস্তুত হতে দেখে এই নীড়লুব্ধা বিহঙ্গমী তাব কাছে পৃথিবীর আকর্যণ টেনে এনেছে, তাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই। হেরম্ব ধীবে ধীবে হাঁটে। সুপ্রিযাব ইঙ্গিত মিথ্যা নয়, রূপের বাহার ছাড়া আনন্দের আর কিছুই নেই। আনন্দের ভিতর ও বাহিব সুন্দর, অপার্থিব সৌন্দর্যে তার দেহ-মন মণ্ডিত হয়ে আছে : সে রঙিন কালিতে ছাপানো অনবদ্য কবিতার মতো। অথবা সে আকাশের মতো, তার মধ্যে ডুবে গিয়েও পাখিকে নিজের পাখায় ভর করে থাকতে হয়, পাখা অবশ হলে পৃথিবীতে পতন অনিবার্য। আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কোনো পূজায় পাওয়া যায় না, প্রেমের শেষ অবশ নিশ্বাসের সঙ্গে সে হারিয়ে যাবে। সুপ্রিয়ার কাছে অভ্যস্ত বিবক্তি ও মমতার অবাধ খেলায় বিস্ময়কর স্বস্তিবোধ করে হেরম্ব কি এখন বুঝতে পারছে না আনন্দের সান্নিধ্য তাকে অনির্বচনীয় সুতীব্র সুখের সঙ্গে কী অসহ্য যন্ত্রণা দেয়? তার অর্ধেক হৃদয় ভালোবাসার যে পুলক সংগ্রহ করে, অপরার্ধ মরণাধিক কষ্ট সয়ে তার মূল্য দেয়। সুপ্রিয়ার কাছে সে উন্মাদনা পাবার সম্ভাবনা যেমন নেই, সে রকম অসহ্য দুঃখও সে দেয় না।

তবু সেই দুঃখই তার চাই, তাকে পরিহার করা যাবে না।

চল ফিরি।

চলুন আর একটু। নির্জনতা গভীর হয়ে আসছে।

জলে ভিজে অশোকেব কিছু হয়নি তো?

হঠাৎ অশোকের কথা ওঠায় সুপ্রিয়া একটু বিস্মিত হয়ে হেরম্বের মুখের দিকে তাকাল।

হু হু করে জ্বর এসেছে।

তুই যে চলে এলি?

ছোটোলোক ভাবছেন, না? সেবা করার লোক না থাকলে আসতাম না। দাদা, বউদি, ভাইঝি সবাই ঘিরে আছে, তারা আপনার জন। আমি তো পর!

তোর কী হয়েছে বল তো?

বুঝতে পারেননি? আমার মন আগাগোড়া বদলে গেছে। আজকাল সর্বদা অন্যমনস্ক থাকি।

হেরম্বের কাছে এটা সুপ্রিয়ার অনাবশ্যক আত্মনিন্দার মতো শোনাল। মাঝে মাঝে অনামনস্ক হতে পারলেও সর্বদা অন্যমনস্ক থাকা সুপ্রিয়ার পক্ষে অসম্ভব। তার এ কথা হেরম্ব বিশ্বাস করল না।

তুই ইচ্ছা করলেই অশোককে সুখী করতে পারতিস, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়াল।

যদি কথা তুললেন, তাহলে বলি। আমি তা পারতাম না। কেউ পারে না। ছেলেখেলা হলে পারতাম, চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা ছেলেখেলা নয়। ও বিনাদোষে মারা গেল, কিন্তু উপায় কি, সংসারে অমন অনেক যায়। ওর সত্যি কোনো উপায় নেই।

দূরদিগন্তে চোখ রেখে হেরম্ব বলল, তবু অশোককে নিয়ে তুই যদি জীবনে সুখী হতে পারতিস, তাহলে তোব প্রশংসা করতাম, সুপ্রিয়া।

কথাটা ভেবে বললেন?

ভেবে বললাম। মনকে তুই একেবারে উন্মুক্ত করে দিলি, কিছু ঢাকবার চেষ্টা করলি না। সত্যকে সহ্য করবার স্পর্ধা দেখিয়েছিস বলেই কথাটা বললাম। বিচলিত হলে চলবে কেন? ওব ভালোমন্দেব দায়িত্ব তোরও অনেকখানি আছে বইকী।

সুপ্রিয়া রুক্ষস্বরে বলল, আপনার কথার মানে হয় না। ওর ভালোমন্দেব সঙ্গে আমার সম্পর্ক কী? রূপাইকুড়াতেও আপনি আমাকে এ সব বলে অপমান করতেন। আপনাব ভুল হয়েছে, স্বামী আমার সমস্যা নয়, আপনিই তাকে শিখণ্ডীব মতো সামনে খাড়া করে রেখে আমাব সঙ্গে লড়াই করছেন।

এবার হেরম্বের চুপ করে যাওযাই উচিত ছিল। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তর্কে হাব মানা হেরম্বেব স্বভাব নয়।

লড়াই বাধাচ্ছিস তুই ; আমি লড়াই করতে চাইনি, সুপ্রিয়া। এই কঠোর কথায় সুপ্রিয়া ক্রন্দনবিমুখ আহত শিশুব মতো মুখ করে বলল, ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করার জন্য এ কথা যদি বলতেন, ফিরে গিয়ে আমি বিষ খেতাম।

হেরম্ব সাগ্রহে সায় দিয়ে বলল, ফিরে গিয়ে আমরা দুজনেই তাই খাই চল, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া অতিকষ্টে বলল, তার চেয়ে এখানে একটু বসা ভালো।

জলের ধার থেকে খানিক সরে শুকনো বালিতে তারা নীরবে বসে থাকে। হেরম্ব বুঝতে পারে রূপাইকুড়ায় তাদের যে ছমাসের চুক্তি হয়েছিল সুপ্রিয়া এখনও তা অখণ্ডনীয় ধরে রেখেছে। এখন যে তাদের অন্তরঙ্গতা বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের সম্বন্ধে যে আলোচনা তাদের হয়ে গেল, পরস্পরের কাছে দাম কমে যাবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকলে এ আলোচনা তাদের এত স্পষ্ট হয়ে উঠত না। উঠলেও এত সহজে সমাপ্তি লাভ না করে তাদের এমন কলহ হয়ে যেত যে, আগামীকাল পর্যন্ত পরস্পরকে তারা ঘৃণা করত। যাদের মধ্যে চেনা নেই, শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ আত্মাকে পর্যন্ত এ অবস্থায় তারা ক্লেশ দেয় ; বলে—এই দ্যাখ পাপ। তোমার পাপ, তোমার মহৎ চিত্তের মহাব্যাধি! অশোকের মধ্যস্থতাতেই কি সে আর সুপ্রিয়া পরিচয়ের এই নিম্নতম স্তর অতিক্রম করে এল? মুহূর্তের

তেজি হিংসার বশে সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে ঠেলে দিতে চেয়ে, অশোক কি তার আর সুপ্রিয়ার মধ্যে পরম সহিষ্ণুতা এনে দিয়েছে?

তাই যদি না হয়,—সুপ্রিয়ার প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে হেরম্ব মনে মনে তার এই চিন্তাকে ভাষায় উচ্চারণ করে,—সুপ্রিয়ার মুখের আলো নিবে যাবার কথা। তার শেষ কথায় সুপ্রিয়া তো কাঁদত।

হেরম্বের সবচেয়ে বিস্ময় বোধ হয় সুপ্রিয়ার দীর্ঘ নীরবতায়। নিরিবিলিতে কথা বলতে এসে তার কথা যেন ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গিয়েছে। বেলা শেষ হয়ে আসে, তবু সুপ্রিয়া কিছু বলে না। এই নীরবতা যে রাগ অথবা অভিমানের লক্ষণ নয় তাও সহজেই বোঝা যায়—সুপ্রিয়ার মুখে কোনো অভিব্যঞ্জনা নেই বলে শুধু নয়, সরে সরে অতি নিকটে এসে তার আধ-অন্যমনস্ক বসবার ভঙ্গিতে। খোলা চুল সে আর বাঁধেনি, আঁচল জড়িয়ে গলার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে, অনাবৃত মাথায় শুধু কয়েকটি আলগা চুল বাতাসে উড়ছে। হেরম্বের জামার যেটুকু বালিতে বিছানো হয়ে আছে তাতে সে পেতেছে হাত, সে হাতে দেহের ঊর্ধ্বাংশের ভর রেখে হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে বসেছে। সে যেন হেরম্বকে উঠতে দেবে না, জামা ধরে বসিয়ে রাখবে। অথবা বৃন্তচ্যুত ফুলের মতো হেরম্বের কোলে ঝরে পড়ার জন্য সে শুধু হাতটির অবশ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে।

এখন একটু চেষ্টা করলেই হেরম্ব আনন্দকে ভুলে যেতে পারে। ফেননন্দিতা সাগরকূলে জনহীন দিবাবসানের বৈরাগ্যকে একটু প্রশ্রয় দেওয়া, সরল মনে একবার স্মরণ করা পার্শ্ববর্তিনীর জীবনেতিহাস। সে তো কঠিন নয়। কত দিনের কত ক্ষুধা ও পিপাসা, কত স্বপ্ন ও সংকল্প সঞ্চয় করে সুপ্রিয়া আজ এমন শিথিল ভঙ্গিতে এত কাছে বসেছে সে ছাড়া আর কার তা স্মরণীয়? নিজেকে হেরম্বের দুর্বল ও অসহায় মনে হয়।

সুপ্রিয়া হঠাৎ মৃদু হেসে বলল, বাড়িতে এখন আমার খোঁজ পড়েছে।

হেরম্ব বলল, এবার ওঠা যাক।

এখনি? আগে সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তখন যদি উঠি তো উঠব।

যদি?

হ্যাঁ। সারারাত নাও উঠতে পারি, কিছু ঠিক নেই। বেশ বালির বিছানা পাতা আছে। বসতে কষ্ট হলে আপনি শুতে পাবেন। বৃষ্টি নামলে কষ্ট হবে।

হেরম্ব অভিভূত হয়ে বলল, তারপর কী হবে?

এখান থেকে স্টেশানে গিয়ে গাড়িতে উঠব। আপনার কলেজ অনেকদিন খুলে গেছে। আর বেশি কামাই করলে চাকরি যাবে।

হেরম্ব কথা বলতে পারল না।

সুপ্রিয়া বলল, চাকরি গেলে চলবে না, আমাদের টাকার দরকার হবে। ছোটো বাড়িতে আমি থাকতে পারব না। সাত-আটখানা ঘর আর খুব বড়ো খোলা ছাদ থাকা চাই।

সুপ্রিয়ার এই অন্তিম আবেদন।

ভীরু হেরম্ব পকেট হাতড়ে চুরুট বার করে। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চুরুট ধরিয়ে বলল, টিকিটের টাকা আনতে একবার কিন্তু আশ্রমে যেতে হবে, সুপ্রিয়া।

সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে পরদিন সকালে তাদের কলকাতা চলে যাবার মতো বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে টিকিটের টাকার জন্য চিন্তিত হওয়া এত বেশি তুচ্ছ যে, হেরম্ব ভাবতেও পারল না, সুপ্রিয়া বুঝবে না এ শুধু তার সময়োচিত গম্ভীর পরিহাস, সুপ্রিয়ার প্রস্তাবকে এমনিভাবে দুর্বল হেরম্বের হেসে উড়িয়ে দেওয়া। সুপ্রিয়া কিন্তু সত্যসত্যই তার এই কথাকে স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিল।

তার দরকার নেই, আমার গায়ে গহনা আছে।

একটু চিন্তা করে হেরম্ব বক্তব্য স্থির করে নিল।

শোন, সুপ্রিয়া। তোর বিয়ের সময় তোকে একটা উপহারও কিনে দিইনি। আর আজ তোর গয়না বিক্রির টাকায় কলকাতা যাব? এমন কথা তুই ভাবতে পারলি! একবার তোর ভয় হল না, লজ্জায় ঘৃণায় আমি তাহলে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব?

সুপ্রিয়ার হাত এতক্ষণে হয়তো অবশ্য হয়ে এসেছিল, হাত মুচড়ে তার শরীরের আশ্রয়চ্যুত ঊর্ধ্বভাগ হেরম্বের কোলে হুমড়ি দিয়ে পড়লে অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু সে সোজা হয়েই বসল। স্তব্ধ নিশ্চল, কাঠের মূর্তির মতো। রূপাইকুড়ায় হেরম্বের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শুকনো ঘাসে-ঢাকা মাঠে সে এমনিভাবে বসেছিল। হেরম্বের মনে আছে। তখন সূর্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা হয়েছিল। আজ সূর্যাস্তের সূচনা মাত্র হয়েছে। ছোটো একটি মেঘ এত জোরে ছুটে আসছে যে, সূর্যাস্তের আগেই সূর্যকে ঢেকে ফেলবে। সুপ্রিয়ার মুখ থেকে আকাশে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হেরম্বের মুখও বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেল। দুহাতে ভর দিয়ে সে বসেছে। দুই করতলে সূক্ষ্ম শীতল বালির স্পর্শ অনুভব করে তার মনে হল, যে পৃথিবীর তৃণাচ্ছাদিত হওয়ার কথা, তার আগাগোড়া হয়ে গেছে মরুভূমি।

অপরাধীর মতো মন্থরপদে হেরম্ব আশ্রমে ফিরে এল। অন্ধকার বাগান পার হয়ে বাড়ির রুদ্ধ দরজায় সে করাঘাত করল আস্তে। তারপর আনন্দের নাম ধরে ডাকল। অভিশপ্ত দেবদূতের মতো মর্ত্যের প্রবাস সাঙ্গ করে সে যেন স্বর্গের প্রবেশপথে সসংকোচে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খোলার জোরালো দাবি জানাবার সাহসও নেই।

আলো হাতে এসে দরজা খুলে আনন্দ নীরবে একপাশে সরে দাঁড়াল। হেরম্ব মৃদুস্বরে বলল, দেরি করে ফেলেছি, না?

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে মন্দিরে গিয়েছিলাম।

তার বাড়ি যাওনি—সকালে যিনি এসেছিলেন?

গিয়েছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এলেন। তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের সামনে এসে হাজির হয়েছি। মন্দিরে উঠে একটু বসলাম। মনটা ভালো ছিল না, আনন্দ।

কেন?

তিনি বললেন, আমায় তিনি ভালোবাসেন। আমি ভালোবাসি না বলায় মনে খুব ব্যথা পেলেন। কারও মনে ব্যথা দিলে মন খারাপ হয়ে যায় না?

দরজা বন্ধ করার জন্য আনন্দ হেরম্বের দিকে পিছন ফিরল। হেরম্বের মনে হল, এই ছুতায় সে বুঝি মুখের ভাব গোপন করছে। দরজায় খিল দিয়ে আনন্দ ঘুরে দাঁড়াতে বোঝা গেল, হেরম্বের অনুমান সত্য নয়। আনন্দ কখনও কিছু গোপন করে না।

তিনি অনেক দিন থেকে তোমায় ভালোবাসেন, না?

তাই বললেন।

দুজনে তারা হেরম্বের ঘরে গেল। মালতীর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সবগুলি আলো আজ জ্বালা হয়নি, বাড়িতে আজ অন্ধকার বেশি, স্তব্ধতার নিবিড়। আলগোছে মেঝেতে আলোটা নামিয়ে রেখে আনন্দ বলল, আমার ভালোবাসা দুদিনের!

হেরম্ব অনুরাগ দিয়ে বলল, কেন তুমি কেবলই দিনের হিসাব করছ আনন্দ?

কথাগুলি হঠাৎ যেন আক্রমণ করার মতো শোনাল। আনন্দ থতোমতো খেয়ে বলল, না, তা করিনি। এমনি কথার কথা বললাম।

হেরম্ব বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল। কথার কথা কেউ বলে না, আনন্দ, আজ পর্যন্ত কারও মুখে আমি অর্থহীন কথা শুনিনি। তোমার ঈর্ষা হয়েছে।

হেরম্বকে আশ্চর্য করে দিয়ে সহজভাবে আনন্দ এ কথা স্বীকার করল, কেন তা হয়? আমার মন ছোটো বলে?

ঈর্ষা খুব স্বাভাবিক, আনন্দ, সকলের হয়।

সকলের হোক, আমার কেন হবে?

প্রশ্নটা হেরম্ব ঠিক বুঝতে পারল না। এ যদি আনন্দের অহংকার হয় তবে কোনো কথা নেই। কিন্তু সে যদি সরলভাবে বিশ্বাস করে থাকে যে তার অসাধারণ প্রেমে ঈর্ষারও স্থান নেই, তাহলে হয়তো তাকে অনেকক্ষণ বকতে হবে। বলতে হবে,—তোমার খিদে পায় না, আনন্দ? মাঝে মাঝে প্রকৃতি তোমাকে শাসন করে না? হিংসাকে তেমনি প্রকৃতির নিয়ম বলে জেনো।

হেরম্ব কথা বলল না দেখে আনন্দ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই মেঝেতে সে বসল। তাকে চৌকিতে উঠে বসতে বলার মতো মনের জোর হেরম্ব আজ খুঁজে পেল না। সমুদ্রতীরের কলরব থেকে দূরে চলে আসার পর তার মনে যে শুদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, এখনও একটা ভারী আবরণের মতো তা তার মনকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সুপ্রিয়ার সেই হাতে ভর দিয়ে বসবার শিথিল ভঙ্গি মনে পড়ে। আসন্ন সন্ধ্যায় সুপ্রিয়া স্খলিত পদে তার পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করার পর অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে তার অন্তরের অমৃত পিপাসাকে ছাপিয়ে যে কোটি ক্ষুধিত কামনার হাহাকার উঠেছিল মাটির মানুষ হেরম্বকে এখনও তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তার দেহ শোকে অবসন্ন, মৃত্তিকার কীটদংশনে বিপন্ন তার মন।

আমার আজ কী হয়েছে জান?—আনন্দ বলল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, বলো, শুনছি।

সকাল থেকে নিজেকে আমার অশুচি মনে হয়েছে, কেবলই ছোটো কথা মনে হয়েছে, হীন অশুদ্ধ ভাব মনে এসেছে, রাগে হিংসায় ঘেন্নাতে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। ঠিক যেন নরকবাস করেছি সারাটা দিন। এমন কষ্ট পেয়েছি আমি! যে ছিল অবোধ নিষ্পাপ শিশু, আজ সে আত্মজ পাপে মাথা হেঁট করল, তাই তোমাকে বলছিলাম সন্ধ্যার পর আমার কাছে থেকো, কোথাও যেয়ো না। আমি নীচে নেমে গেছি, আমাকে তুমি তুলে নিতে পার?

প্রথম দিন পূর্ণিমা রাত্রে নাচ শেষ না করে আনন্দ যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিল এখন তার নতমুখে তেমনি একটা যন্ত্রণার আভাস দেখে হেরম্ব ভয়ে পেল।

এ সব কী বলছ, আনন্দ?

মুখ দেখে বুঝতে পারছ না এখনও আমার মন নোংরা হয়ে আছে? একটা ভালো কথা ভাবতে পারছি না। আমার মনে এক ফোঁটা শান্তি নেই।

হেরম্ব নির্বোধের মতো কথা খুঁজে খুঁজে বলল, ঈর্ষায় তো এ রকম হয় না, আনন্দ।

আনন্দ বিরস কণ্ঠে বলল, কে বলেছে ঈর্ষা—শুধু ঈর্ষা হলে তো বাঁচতাম, আমি সবদিক দিয়ে খারাপ হয়ে গেছি। একটু আগে কী ভাবছিলাম জান?

কী ভাবছিলে?

দেখ, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।

ফাটবে না, বলো।

আনন্দ আঙুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বলল, বলা আমার উচিত নয়। অন্য মেয়ে হয়তো বলত না। তুমি তো জান আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে বেশি মিশিনি। বলা অন্যায় হলে রাগ

কোরো না, আমায় ক্ষমা কোরো। দেখ, আমি এত ছোটো হয়ে গেছি, একটু আগে তোমাকে খারাপ লোক মনে করেছিলাম।

আনন্দ যে তার ঠিক কী ধরনের মানসিক অপরাধের কথা স্বীকার করছে হেরম্ব বুঝতে পারল না। তার মনে হল আনন্দের কথায় সুপ্রিয়া সংক্রান্ত কোনো ইঙ্গিত আছে। আনন্দ না বুঝুক তার ঈর্ষারই হয়তো একটা শোচনীয় রূপ। তার কথাটা স্পষ্টভাবে না বুঝে সে কিছু বলতে সাহস পেল না। একটু উদ্‌বেগের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, কেন তা ভাবলে?

তা জানি না। আমার মনে হল আমাকে দেখে তোমার লোভ হয়েছিল তাই আমাকে ভুলিয়েছ, আমার ছেলেমানুষির সুযোগ নিয়ে।

হেরম্ব আশ্চর্য হয়ে বলল, তোমায় দেখে কার লোভ হবে না আনন্দ? আমারও হয়েছিল। সে জন্য আমি খারাপ লোক হব কেন?

লোভ হয়েছিল বলে নয়, শুধু লোভ হয়েছিল বলে। আমায় দেখে তোমার শুধু লোভই হয়েছিল, আর কিছু হয়নি?

অর্থাৎ আমার ভালোবাসা-টাসা সব মিছে?

আনন্দ মুখ তুলে তিরস্কার করে বলল, রাগ করবে না বলে রাগ করছ যে?

রাগ করব না, এমন কথা আমি কখনও বলিনি।

আনন্দের চোখ ছলছল করে এল। সে আবার মাথা নিচু করে বলল, ঝগড়া করবার সুযোগ পেয়ে তুমি ছাড়তে চাইছ না। আমি গোড়াতেই বলিনি আমি ছোটোলোক হয়ে গেছি? আমার একটা খারাপ অসুখ হলে কি তুমি এমনি করে ঝগড়া করবে?

হেরম্বের কথা সত্যসত্যই রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। সে গলা নরম করে বলল, ঝগড়া করিনি, আনন্দ। তুমি আমার সম্বন্ধে যা ভেবেছ তাতেও আমি রাগ করিনি। তুমি নিজেকে কী যেন একটা ঠাওরে নিয়েছ, আমার রাগের কারণ তাই। তুমি কী ভাব তুমি মানুষ নও, স্বর্গের দেবী? কখনও খারাপ চিন্তা তোমার মনে আসবে না? মানুষের মনে হীনতা আসে, মানুষ সে জন্য আত্মগ্লানি ভোগ করে, কিন্তু এই তুচ্ছ সাময়িক ব্যাপারে তোমার মতো বিচলিত কেউ হয় না।

আনন্দ বিবর্ণ মুখে বলল, আমার কী ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে যদি জানতে—

জানি। হওয়া কিন্তু উচিত নয়। আজ তুমি একবার আমাকে বললে তোমার ভয় হচ্ছে, আমাদের ভালোবাসা বুঝি মরেই গেল।—এখন বলছ আমি তোমাকে লোভ করেছি, ভালোবাসিনি। এ সব চিত্তচাঞ্চল্য আনন্দ, বিচলিত হয়ে এ সমস্তকে প্রশ্রয় দিতে নেই।

আনন্দ আবার মুখ তুলেছিল, তার তাকাবার ভঙ্গি দেখে হেরম্বের মন উদ্‌বেগে ভরে গেল। আনন্দ যেন তাকে চিনছে, আনন্দের দামি দামি ভুল যেন ভেঙে যাচ্ছে একে একে, তার বিস্ময়ের, বেদনার সীমা নেই। হেরম্ব নিজের ভুল বুঝে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ কথা তার স্মরণ নেই যে, তার মতো আনন্দ আজ বাইরের পৃথিবীতে বেড়াতে যায়নি, পরম সহিষ্ণুতায়—আলো ও অন্ধকারের যে সমন্বয় নিজের মধ্যে করে নিয়ে পৃথিবীর মানুষ ধৈর্য ধরে থাকে আনন্দের কাছে সে সহিষ্ণুতার নাম পরাজয়? সুপ্রিয়ার আবির্ভাবের আগে সে নিজে কী মন নিয়ে এখানে দিন কাটাচ্ছিল হেরম্বের সে কথা মনে পড়ে। এখানে আসবার আগে মনের সেই উদাত্ত ঊর্ধ্বগ অবস্থা তার কল্পনাতীত ছিল।—কী সেই বিপুল এক পিপাসা,—প্রশান্ত, নিবিড়, অনির্বচনীয়। এইখানে গৃহকোণে বসে সমগ্র অভিজাত মনোধর্মের বিরাট সমন্বয়ে চেতনার সেই অনাবিল নিরবচ্ছিন্ন পুলক-স্পন্দন, বিশ্বের একপ্রান্তের ভাঙা কুটির থেকে অন্যপ্রান্তের রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত প্রসারিত হৃদয়ে নিখিল হৃদয়ের জীবনোৎসব,—অনন্ত, উদার উপলব্ধির মেলা! সেই মনে ছোটো স্নেহ, ছোটো

মমতাকে কে খুঁজে পেয়েছে? সে মনের আলো ছিল দিন, অন্ধকার ছিল রাত্রি—অঙ্গনে বিছানো এক টুকরো রোদ আর তরুতলের ক্ষীণছায়ার যোগাযোগ আগের মতো মনের আলো-ছায়ার খেলা সাঙ্গ হয়ে যেত না। সুপ্রিয়াকে মনে করতে হবে সেই মন নিয়ে, হেরম্বকে শহরের ধূলিভরা পথে পথে বেড়াতে হত। আর আজ সুপ্রিয়ার কাছ থেকে পরিবর্তিত, ছোটো মমতায় ছোটো সুখ-দুঃখে উদ্‌বেলিত মন নিয়ে এসে সে কী বলে এত সহজে আনন্দের মনের বিচার করে রায় দিচ্ছে?

হেরম্বের অনুশোচনায় সীমা রইল না। তাই আনন্দ যখন বলল, তোমার আজ কী হয়েছে, তুমি কিছুই বুঝতে চাইছ না কেন?—তখন সে বিহ্বলের মতো আনন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কথা বলতে পারল না।

আনন্দ তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, দেখ তুমি প্রথম যেদিন এলে সেদিন থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। জেগে ঘুমিয়ে আমি যেন স্বপ্ন দেখতাম। সব সময় একটা আশ্চর্য সুর শুনছি, নানা রকম রঙিন আলো দেখছি, একটা কীসের ঢেউয়ে আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছি,—বিস্ফারিত চোখে হেরম্বের দিকে চেয়ে আনন্দ মাথা নাড়ল, বলতে পারছি না যে! আমি যে সব ভুলে গেছি!

তার ভুলে যাওয়ার অপরাধ যেন হেরম্বের, এমনি তীব্রস্বরে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, কেন ভুলে গেলাম? কেন বলতে পারছি না?

হেরম্ব অস্ফুট স্বরে বলল, ভোলোনি, আনন্দ। ও সব কথা মুখে বলা যায় না।

কিন্তু আনন্দ একান্ত অবুঝ।—কেন বলা যাবে না? না বললে তুমি যে কিছু বুঝবে না। সব কী রকম স্পষ্ট ছিল জান? আমার এক এক সময় নিশ্বাস ফেলতে ভয় হত, পাছে সব শেষ হয়ে যায়।

হেরম্ব কথা বলে না। উত্তেজিত আনন্দও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত হয়।

আমার আশেপাশে কী ঘটত ভালো জ্ঞান ছিল না। কলের মতো নড়াচড়া করতাম। তারপর যেদিন থেকে মনে হল আমাদের ভালোবাসা মরে যাচ্ছে সেদিন থেকে কী কষ্ট যে পাচ্ছি! আচ্ছা শোন, তোমার কী খুব গরম লাগছে?

না, আজ তো গরম নেই।

আনন্দ উঠে এসে বলল, দেখ, আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছি। আমার কী হয়েছে?

হেরম্ব গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বলল, শান্ত হয়ে বোসো। তোমার জ্বর হয়েছে।

ধীরে ধীরে রাত্রি বেড়ে চলে। আশেপাশে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। আনন্দকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেবার দুঃসাধ্য প্রয়াস একবার প্রাণপণে করে দেখবার জন্য হেরম্বের ঝিমানো মন মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু আজ কোথায় সেই উদ্ধত উৎসাহ, অদম্য প্রাণশক্তি! চিন্তা কষ্টকর, জিহ্বা আড়ষ্ট, কথা সিসার মতো ভারী। মুখ গুঁজে সর্বনাশকে বরণ করা ছাড়া আর যেন উপায় নেই। স্বর্গ চারিদিকে ভেঙে পড়ুক। মোহে অন্ধ রক্তমাংসের মানুষের অমৃতের পুত্র হবার স্পর্ধা ধুলায় লুটিয়ে যাক।

প্রেম? মানুষের নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম? সে সৃষ্টি করেছে। এবার যে পারে বাঁচিয়ে রাখুক। তার আর ক্ষমতা নেই।

আনন্দ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলেছিল, তুমিও আমায় ভাসিয়ে দিলে?

হেরম্ব শ্রান্তস্বরে বলেছিল, কাল সব ঠিক হয়ে যাবে, আনন্দ।

এ স্পষ্ট প্রতারণা। কিন্তু উপায় কী?

আজ রান্না হয়নি। কিন্তু সে জন্য হেরম্বের আহারের কোনো ত্রুটি হল না। ফল, দুধ এবং বাসি

মিষ্টির অভাব আশ্রমে কখনও হয় না, ভাতের চেয়ে এ সব আহার্যের মর্যাদাই এখানে বেশি, মালতীর স্থায়ী ব্যবস্থা করা আছে। আনন্দ প্রথমে কিছু খেতে চাইল না। কিন্তু হেরম্ব তার ক্ষুধার সঙ্গে তার মানসিক বিপর্যয়ের একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করায় রাগ কবে একরাশ খাবার নিয়ে সে খেতে বসল।

হেরম্ব বলল, সব খাবে?

খাব।

তোমার সুমতি দেখে খুশি হলাম, আনন্দ!

সে চিত হয়ে শুয়ে চোখ বোজা মাত্র আনন্দ সব খাবার নিয়ে বাইরে ফেলে মুখ হাত ধুয়ে এল। হেরম্বের বালিশের পাশে এলাচ লবঙ্গ ছিল, একটি এলাচ ভেঙে অর্ধেক দানা সে হেরম্বের মুখে গুঁজে দিল। বাকিগুলি নিজের মুখে দিয়ে বলল, আমি শুতে যাই?

হেরম্ব চোখ মেলে বলল, যাও।

যেতে চাওয়া এবং যেতে বলা তাদের আজ উচ্চারিত শব্দগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ রইল।

হেরম্ব ভেবেছিল আজ বুঝি তার সহজে ঘুম আসবে। দেহমনের শিথিল অবসন্নতা অল্পক্ষণেব মধ্যেই গভীব তন্দ্রায় ডুবে যাবে। কিন্তু কোথায় ঘুম? কোথায এই সকাতর জাগরণের অবসান? ঘরের কমানো আলোর মতো স্তিমিত চেতনা একভাবে বজায় থেকে যায়, বাড়েও না কমেও না। হেরম্ব উঠে বাইরে গেল। মালতী আজ তার নিজের ঘর ছেড়ে অনাথের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, মালতীর ঘরে শিকল তোলা। আনন্দই বোধ হয় সন্ধ্যার সময় এ ঘরে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়েছিল, জানালা দিয়ে হেরম্বের চোখ পড়ল তেল নিঃশেষ হয়ে প্রদীপের বুকে দপদপ কবে সলতে পুড়ছে। নিজের ঘব থেকে লণ্ঠন এনে হেরম্ব চোরের মতো শিকল খুলে মালতীর ঘরে ঢুকল। আলমারিতে ছিল মালতীর কারণের ভান্ডার, কিন্তু সবই সে প্রায় আজ অনাথের ঘরে সঙ্গে নিয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে কাশীর একটি কাজ করা ছোটো কালোরঙের মাটির পাত্রে হেবম্ব অল্প একটু কারণ পেল। তাই এক নিশ্বাসে পান করে আবার চুপিচুপি ঘরেব শিকল তুলে নিজের ঘবে ফিরে গেল।

কিন্তু মালতীব কারণে নেশা আছে, নিদ্রা নেই। হেরম্বের অবসাদ একটু কমল, ঘুম এল না। বিছানায় বসে জানালা দিয়ে সে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় শোনা গেল মালতীব ডাক। হেরম্ব এবং আনন্দ দুজনের নাম ধরে সে ফাটিযে চিৎকার করছে।

দুজনে তারা প্রায় একসঙ্গেই মালতীর ঘরে প্রবেশ করল। অনাথের প্রায় আসবাবশূন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানা মালতী এক বেলাতেই নোংরা করে ফেলেছে। সমস্ত মেঝেতে কাদামাখা পায়ের শুকনো ছাপ, এক কোণে অভুক্ত আহার্য এখানে-ওখানে ফলের খোসা ও আমের আঁটি। একটি মাটির পাত্র ভেঙে কারণের স্রোত নর্দমা পর্যন্ত গিয়েছিল, এখনও সেখানে খানিকটা জমা হয়ে আছে। ঘরে তীব্র গন্ধ।

কিন্তু মালতীকে দেখেই বোঝা গেল বেশি কারণ সে খায়নি। তার দৃষ্টি অনেকটা স্বাভাবিক, কথাও স্পষ্ট।

মালতী বলল, একা আমার ভয় করছে, হেরম্ব।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, কীসের ভয়?

মালতী বলল, তা জানি নে, হেরম্ব, ভয়ে আমার হৃৎকম্প হচ্ছিল? তোমরা এ ঘরে শোও।

হেরম্ব অবাক হয়ে বলল, তার মানে?

মালতী বলল, মানে আবার কী, মানে? বলছি আমার ভয় করছে, একা থাকতে পারব না, আবার মানে কীসের? ঝাঁটা এনে ঘরটা একটু ঝাট দিয়ে বিছানা পাত, আনন্দ।

হেরম্ব বলল, আনন্দ আপনার কাছে থাক, আমার থাকবার দরকার নেই।

মালতী বলল, না বাপু, না, আনন্দ থাকলে হবে না। ও ছেলেমানুষ, আমার ভয় করবে।

হেরম্ব আনন্দের মুখের দিকে তাকাল। আনন্দের নির্বিকার মুখ থেকে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। হেরম্ব বলল, তাহলে সবাই অন্য ঘরে যাই চলুন। এ ঘরে শোয়া যাবে না।

মালতী রেগে বলল, তুমি বড়ো বাজে বকো, হেরম্ব। বাহাদুরি না করে যা বলছি তাই করো দিকি। যা, আনন্দ, ঝাঁটা নিয়ে আয়।

ঝাঁটা এনে আনন্দ ঘর ঝাঁট দিল। মালতীর নির্দেশ মতো মন্দিরের দিকে জানালা ঘেঁষে হেরম্বের বিছানা হল। মার অবাধ্য হয়ে মালতীর বিছানার থেকে যতটা পারে দূরে সরিয়ে শুধু একটি মাদুর পেতে আনন্দ নিজের বিছানা করল। মালতীর অনুযোগের জবাবে রুক্ষস্বরে বলল, আমি কারও কাছে শুতে পারি না।

যে যার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মালতী বলল, সজাগ থেকে ঘুমিয়ো, হেরম্ব, ডাকলে যেন সাড়া পাই।

হেরম্ব বলল, সজাগও থাকব, ডাকলে সাড়াও পাবেন, এ রকম ঘুম ঘুমোব কী করে? তার চেয়ে আমি বসে থাকি।

মালতী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলল ইয়ারকি দিয়ো না, হেরম্ব। আমার এদিকে মাথার ঠিক নেই, উনি ঠাট্টা জুড়লেন।

সজাগ হেরম্ব বিনা চেষ্টাতেই হয়ে রইল। দুটি নারীকে এ ভাবে পাহারা দিয়ে ঘুমোনোর চেয়ে জেগে থাকাই সহজ।

ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে। আনন্দ নিজের আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়েছে; লণ্ঠনের আলো দেয়ালে তার যে ছায়া ফেলেছে তাকে মানুষের ছায়া বলে চেনা যায় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরে কে ঘুমিয়েছে কে জেগে আছে টের পাওয়া অসম্ভব হয়।

মালতী আস্তে আস্তে হেরম্বের সাড়া নেয়।—হেরম্ব?

ভয় নেই, জেগেই আছি।

আচ্ছা, বলো দিকি একটা কথা। মানুষকে খুঁজে বার করতে হলে কী করা উচিত?

খুঁজতে বার হওয়া উচিত।

যাবে, হেরম্ব? কদিন দেখ না একটু খোঁজ-টোজ করে। খরচ যা লাগে আমি দেব।

হেরম্ব নির্মম হয়ে বলল, মাস্টারমশায় কি ছোটো ছেলে যে খুঁজে পেলে ধরে আনা যাবে? আপনি তো চেনেন তাঁকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ তাঁকে দিয়ে করানো যায়?

মালতী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

হেরম্ব?

বলুন শুনছি।

আচ্ছা, এ রকম তো হতে পারে, চলে গিয়ে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয়েছে, লজ্জায় আসতে পারছে না? খ্যাপা মানুষ ঝোঁকের মাথায় চলে গিয়ে হয়তো আপশোশ করছে। কেউ গিয়ে ডাকলেই আসবে?

হেরম্ব এবারও নির্মম হয়ে বলল, এমনি যদিও বা আসেন, খোঁজাখুঁজি করে বিরক্ত করলে একেবারেই আসবেন না।

মালতীব কণ্ঠে হেরম্ব কান্নার আভাস পেল।

তোমার মুখে পোকা পড়ুক, হেরম্ব, পোকা পড়ুক। তুমিই শনি হয়ে এ বাড়িতে ঢুকেছ। তুমি যেই এলে ওমনি একটা লোক গৃহত্যাগী হল। কই আগে তো যায়নি।

হেরম্ব চুপ করে থাকে। আনন্দ মৃদুস্বরে বলে, ঘুমোও না, মা।

মালতী তাকে ধমক দিয়ে বলে, তুই জেগে আছিস বুঝি? আমাদের পরামর্শ শুনছিস?

তোমার পবামর্শের চোটেই যে ঘুম আসছে না।

জবাবে স্বাভাবিক কড়া কথার বদলে মালতী হঠাৎ মিনতির সুরে যা বলল শুনে হেরম্বেব বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আনন্দ, আয় না মা, আমার কাছে এসে একটু শো। আয়। হেরম্ব আরও বিস্মিত হল আনন্দেব নিষ্ঠুরতায়।

রাত দুপুরে পাগলামি না করে ঘুমোও তো।

হেবম্বেব অভিজ্ঞতায় মালতী আজ প্রথম ধমক খেয়ে চুপ করে রইল। এতক্ষণে হেরম্বের মাথার মধ্যে ঝিমঝিম কবছে। এ আশ্রম অভিশপ্ত ; মালতীব যুগব্যাপী অন্ধ অতৃপ্ত ক্ষুধায় এখানকার বাতাসও বিষাক্ত হয়ে আছে। গভীর নিশিতে এখানে মালতীর সঙ্গে একঘরে জেগে থাকলে দুদিনে মানুষ পাগল হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবে মালতী ডাকল, আনন্দ ঘুমুলি?

আনন্দ সাড়া দিল না।

মালতী উঠে বসল। হেরম্ব?

জেগেই আছি।

আমার বুকে আগুন জ্বলছে, হেরম্ব। আমি এখানে নিশ্বাস নিতে পারছি না। দম আটকে আসছে।

একটু ধৈর্য না ধরলে—

মালতী বাধা দিয়ে বলল, কিছু বোলো না, হেরম্ব। একবার ওঠো দিকি। শব্দ কোরো না বাপু, মেয়ের ঘুম ভাঙিও না।

মালতী উঠে দাঁড়াল। আনন্দের কাছে গিয়ে সে ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল পলকহীন চোখে। হেরম্ব উঠে এলে ফিসফিস করে বলল, দেখ, মুখ ঢেকে ঘুমিয়েছে। ওকে না জাগিয়ে মুখ থেকে কাপড়টা সবাতে পার হেরম্ব? একবার মুখখানা দেখি!

হেরম্ব সন্তর্পণে আনন্দেব মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে দিল। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আনন্দের মুখ দেখে হাত দিয়ে তাব চিবুক ছুঁয়ে মালতী চুমো খেল। তারপর পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

থামল সে একেবারে বাড়ির বাইরে বাগানে। হেরম্ব তাকে অনুসরণ করল নীরবে।

মালতী আঁচল থেকে চাবি খুলে হেরম্বের হাতে দিল।

আমি চললাম, হেরম্ব।

হেরম্ব শান্তকণ্ঠে বলল, চলুন, আমিও যাচ্ছি।

মালতী বলল, তুমিও খেপলে নাকি? আনন্দ একা রইল, তুমিও যাচ্ছ! আনন্দের চেয়ে আমার জনাই তোমাব মায়া বুঝি উথলে উঠল?

হেরম্ব বলল, আপনার সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ব আছে। রাতদুপুরে আমি একা যেতে দিতে পারি না।

মালতী বলল, পাগলামি কোরো না, হেরম্ব। প্রথম বয়সে একবার রাতদুপুরে ঘর ছেড়েছিলাম, মা-বাবা ভাই-বোন কেউ ঠেকাতে পারেনি, পোড় খেয়ে খেয়ে এখন তো পেকে গেছি, তুমি আমাকে

আটকাবে? শুধু যে নিজের জ্বালায় চলে যাচ্ছি তা ভেব না, হেরম্ব। আমার মতো মা কাছে থাকলে আনন্দ শান্তি পাবে না। আমি কারণ খাই, আমার মাথা খারাপ, আমার স্বভাব বড়ো মন্দ, হেরম্ব! তোমার মাস্টারমশায় আমাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।

হেরম্ব চুপ করে থাকে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ বাতাসের বেগে ছুটে চলছিল। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ডাক শোনা যায়।

আনন্দকে দেখো, হেরম্ব। দুঃখ দিয়ো না ওকে। তোমার মাস্টারমশায়ের হাতে আমার যে দুর্দশা হয়েছে ওর যেন সে রকম না হয়। টাকা পয়সা যা রোজগার করেছি সব রেখে গেলাম। আমার ঘরে যে কাঠের সিন্দুক আছে, তাতে সোনার গয়না আর রুপার বাসনকোসন পাবে। সবচেয়ে বড়ো চাবিটা সিন্দুকের তালার। মন্দিরে ঠাকুরের আসনের পিছনে একটা ঘটিতে সতেরোটা মোহর আছে, ঘরে নিয়ে রেখো। এখানে বেশি দেরি না করে তোমরা কলকাতায় চলে যেয়ো। ঠাকুরের জন্য ভেব না, আমি পূজার ব্যবস্থা করব।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

মালতী বলল, আনন্দকে বলো আমি তার বাবাকে খুঁজতে গেছি। আর তোমার মাস্টারমশায় যদি কোনোদিন ফেরে তাকে বলো আমি গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে যাচ্ছি, দেখা করতে গেলে কুকুর লেলিয়ে দেব।

মালতী হাঁটতে আরম্ভ করল। বাগানের গেটের কাছে গিয়ে বলল, ঘরে যাও হেরম্ব। আর শোনো, আনন্দকে তুমি বিয়ে করবে তো?

করব।

কোরো তাতে দোষ নেই। আনন্দ জন্মাবার আগেই আমাদের বৈরিগি মতে বিয়ে হয়েছিল, হেরম্ব—সাক্ষী আছে। একদিন কেমন খেয়াল হল, দশজন বৈষ্ণব ডেকে অনুষ্ঠানটা করে ফেললাম। আনন্দকে তুমি যদি সমাজে দশজনের মধ্যে তুলে নিতে পার, হেরম্ব— অন্ধকারে মালতী ব্যাকুল দৃষ্টিতে হেরম্বর মুখের ভাব দেখবার চেষ্টা করল, —ভদ্রলোকের সংসর্গই আলাদা।

হেরম্ব মৃদুস্বরে বলল, তাই, মালতী বউদি।

রাস্তায় নেমে মালতী শহরের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল।

ঘরে ফিরে গিয়ে হেরম্ব দেখল, আনন্দ বিছানায় উঠে বসে আছে।

হেরম্ব বসল।

তোমার মা মাস্টারমশায়কে খুঁজতে গেছেন, আনন্দ।

আনন্দ বলল, জানি।

তুমি জেগে ছিলে নাকি?

এ বাড়িতে মানুষ ঘুমোতে পারে? এ তো পাগলা-গারদ।

আনন্দের কথার সুরে হেরম্ব বিস্মিত হল। সে ভেবেছিল মালতী চলে গেছে শুনলে আনন্দ একটু কাঁদবে। মালতীকে এত রাত্রে এ ভাবে চলে যেতে দেওয়ার জন্য তাকে সহজে ক্ষমা করবে না। কিন্তু আনন্দের চোখে সে জলের আভাসটুকু দেখতে পেল না। বরং মনে হল কোমল উপাধানে মাথা রেখে ওর যে দুটি চোখের এখন নিদ্রায় নিমীলিত হয়ে থাকার কথা, তাতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দিয়েছে

হেরম্ব বলল, আমি আটকাবার কত চেষ্টা করলাম, সঙ্গে যেতে চাইলাম—

কেন ভোলাচ্ছ আমাকে? আমি সব জানি। আমিও উঠে গিয়েছিলাম।

হেরম্ব আনন্দের দিকে তাকাতে পারল না, আনন্দকে একটু মমতা জানাবার সাধও সে চেপে

গেল। সে বড়ো বেমানান হবে। কাল হয়তো সে আনন্দের চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলতে পারবে, আনন্দের চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারবে, আনন্দের বিবর্ণ কপোলে দিতে পারবে স্নেহ চুম্বন। আজ স্নেহের চেয়ে, সহানুভূতির চেয়ে বেখাপ্পা কিছু নেই। যতক্ষণ পারা যায় এমনি চুপচাপ বসে থেকে, বাকি রাতটুকু আজ তাদের ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই কাটিয়ে দিতে হবে। আজ রাত্রি প্রভাত হলে সে আর একটা দিনও এই অভিশপ্ত গৃহের বিষাক্ত আবহাওয়ায় বাস করবে না। আনন্দের হাত ধরে যেখানে খুশি চলে যাবে।

আনন্দ কথা বলল! আমি কী ভাবছি জান?

কী ভাবছ, আনন্দ?

ভাবছি আমারও যদি একদিন মার মতো দশা হয়!

হেরম্ব সভয়ে বলল, ও সব ভেব না, আনন্দ।

আনন্দ তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। রুদ্ধ উত্তেজনায় তার দুচোখ জ্বলজ্বল করছে, তার পাণ্ডুর কপোলে অকস্মাৎ অতিরিক্ত রক্ত এসে সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

মানুষের ভাগ্যে আমার আর বিশ্বাস নেই। তোমার সঙ্গে আমার কদিনের পরিচয়, এর মধ্যে আমার শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে । দুদিন পরে কী হবে কে জানে !

শান্তি ফিরে আসবে, আনন্দ।

আনন্দ বিশ্বাস করল না, আসবে কিন্তু টিকবে কি! হয়তো আমিও একদিন তোমার দুচোখের বিষ হয়ে দাঁড়াব। প্রথম দিন তুমি আর আমি কত উঁচুতে উঠে গিয়েছিলাম, স্বর্গের কিনারায়। আজ কোথায় নেমে এসেছি!

আমরা নামিনি, আনন্দ, সবাই মিলে আমাদের টেনে নামিয়েছে। আমরা আবার উঠব। লোকালয়ের বাইরে ঘর বাঁধব, কেউ আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না।

আনন্দ বলল, বিরক্ত আমরা নিজেদের নিজেরাই করব। আমরা মানুষ যে।

আনন্দ কি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে? স্বপ্ন ক্ষুণ্ণ হবার অপরাধে মানুষকে কি ঘৃণা করতে আরম্ভ করল? জেনে নিল বৃহত্তর জীবনে মানুষের অধিকার নেই? বিগত যৌবন প্রেমিকের কাছে প্রতারিত হয়ে তাই যদি আনন্দ জেনে থাকে তবে তার অপরাধ নেই, কিন্তু এই সাংঘাতিক জ্ঞান বহন করে সে দিন কাটাবে কী করে? হেরম্বের বুক হিম হয়ে আসে—কোথায় সেই প্রেম? পূর্ণিমা তিথির এক সন্ধ্যায় সে যা সৃষ্টি করেছিল ? আজ রাত্রিটুকুর জন্য সেই অপার্থিব চেতনা যদি সে ফিরে পেত! হয়তো কোনো এক আগামী সন্ধ্যায় সেই পূর্ণিমার সন্ধ্যাকে সে ফিরে পাবে। আজ সে আনন্দকে সান্ত্বনা দেবে কী দিয়ে?

হেরম্বের মুখের দিকে খানিকক্ষণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আনন্দ চোখ বুজল । ঘুমোবে ?—হেরম্ব বলল।

আনন্দ বলল, না।

হেরম্ব বলল, না যদি ঘুমোও, আনন্দ, তবে আমাকে নাচ দেখাও। তোমার নাচের মধ্যে আমাদের পুনর্জন্ম হোক।

আনন্দ চোখ মেলে বলল, নাচব?

চোখের পলকে রক্তের আবির্ভাবে আনন্দের মুখের বিবর্ণতা ঘুচে গেছে। হেরম্ব তা লক্ষ করল। তার বুকেও ক্ষীণ একটা উৎসাহের সাড়া উঠল।

তাই করো আনন্দ, নাচো। আমরা একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছি, না? আমাদের জড়তা কেটে যাক।

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। বলল, তাই ভালো। নাচই ভালো। উঃ, ভাগ্যে তুমি বললে! নাচতে পেলে আমার মনের সব ময়লা কেটে যাবে, সব কষ্ট দূর হবে।

আনন্দ টান দিয়ে আলগা খোঁপা খুলে ফেলল।—চলো উঠোনে যাই। আজ তোমাকে এমন নাচ দেখাব তুমি যা জীবনে কখনও দেখনি। দেখো তোমার রক্ত টগবগ করে ফুটবে। এই দেখ, আমার পা চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

আনন্দের এই সংক্রামক উন্মাদনা আনন্দের নৃত্যপিপাসু চরণের মতো হেরম্বের বুকের রক্তকে চঞ্চল করে দিল। শক্ত করে পরস্পবের হাত ধরে তারা খোলা উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। সকালে ঝড়বৃষ্টির পব যে রোদ উঠেছিল তাতে উঠান শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু উঠানভরা বর্ষাকালের বড়ো বড়ো তৃণের স্পর্শ সিক্ত ও শীতল। আনন্দের নাচের জন্যই যেন নিশীথ আকাশের নীচে এই সরস কোমল গালিচা বিছানো আছে।

কী নাচ নাচবে, আনন্দ? চন্দ্রকলা?

দূর! সে তো পূর্ণিমার নাচ। আজ অন্য নাচ নাচব।

নাচের নাম নেই?

আছে বইকী। পরিনৃত্য। আকাশের পরিবা এই নাচ নাচে। কিন্তু আলো চাই যে?

আলো জ্বালছি, আনন্দ।

ঘবে ঘরে অনুসন্ধান করে হেরম্ব তিনটি লণ্ঠন আর একটি ডিবরি নিয়ে এল। আলোগুলি জ্বেলে সে ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিল।

আনন্দ বলল, এ আলোতে হবে না। আরও আলো চাই। তুমি এক কাজ করো, রান্নাঘরে কাঠ আছে, কাঠ এনে একটা ধুনি জ্বেলে দাও।

ধুনি, আনন্দ?

আনন্দ অধীব হয়ে বলল, কেন দেরি করছ? কথা কইতে আমাব ভালো লাগছে না। ঝোঁক চলে গেলে কী করে নাচব?

আনন্দ উত্তেজনায থরথর করে কাঁপছিল। তাব মুখ দেখে হেরম্বের একটু ভয় হল। কদিন থেকে যে বিষণ্ণতা আনন্দেব মুখে আশ্রয় নিয়েছিল তার চিহ্নও নেই, প্রাণের ও পুলকের উচ্ছ্বাস তার চোখে মুখে ফুটে বার হচ্ছে। দাঁড়িয়ে আনন্দকে দেখবার সাহস হেরম্বের হল না। রান্নাঘর থেকে সে এক বোঝা কাঠ নিয়ে এল।

আনন্দ বলল, আরও আনো, যত আছে সব।

আর কী হবে?

নিয়ে এসো, আবও লাগবে। যত আলো হবে নাচ তত জমবে যে। পরি কি অন্ধকারে নাচে?

রান্নাঘরে যত কাঠ ছিল বয়ে এনে হেরম্ব উঠানে জমা করল। আনন্দের মুখে আজ মিনতি নেই, অনুরোধ নেই, সে আদেশ দিচ্ছে। মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেও প্রতিবাদ কবার ইচ্ছা হেরম্ব দমন করল। আনন্দ যা বলল নীরবে সে তাই পালন করে গেল। মালতীর ঘর থেকে এক টিন ঘি এনে কাঠের স্তূপে ঢেলে দিয়ে কিন্তু সে চুপ করে থাকতে পারল না।

ভয়ানক আগুন হবে, আনন্দ!

আনন্দ সংক্ষেপে বলল, হোক।

বাড়িতে আগুন লেগেছে ভেবে লোক হয়তো ছুটে আসবে।

এদিকে লোক কোথায়? আর আসে তো আসবে। দাও, এবার জ্বেলে দাও।

আগুন ধরিয়ে হেরম্ব আনন্দের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট যজ্ঞানলের মতো ঘৃতসিক্ত কাষ্ঠের স্তূপ হুহু করে জ্বলে উঠল। সমস্ত উঠান সোনালি আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল, এই না হলে আলো!

ওদিকের প্রাচীর, এদিকের বাড়ি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। ঘি-পোড়া গন্ধ বাতাসে ভেসে কতদূরে গিয়ে পৌঁছল কেউ জানে না। হেরম্ব আনন্দের একটা হাত চেপে ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আনন্দ বলল, তুমি সিঁড়িতে বসে নাচ দেখ। আমায় ডেকো না, আমার সঙ্গে কথা বোলো না।

হেরম্ব সিঁড়িতে গিয়ে বসল। আনন্দ আগুনের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। হেরম্বর মনে হল আগুনের সে এত কাছে দাঁড়িয়েছে যে তার চোখের সামনে সে বুঝি ঝলসে পুড়ে যাবে। কিন্তু নৃত্যের বিপুল আয়োজন, আনন্দের উন্মত্ত উল্লাস তাকে মূক করে দিয়েছিল। আগুনের তাপে আনন্দের কষ্ট হচ্ছে বুঝেও সে কাঠের পুতুলের মতো বসে রইল।

খানিকক্ষণ আগুনের সান্নিধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে একে একে কাপড়জামা খুলে আনন্দ অর্ঘ্যের মতো আগুনে সমর্পণ করে দিল। তার গলায় সোনার হারে তাবিজ ছিল, বাহুতে তুলসীর মালা ছিল, হাতে ছিল সোনার চুড়ি। একে একে খুলে তাও সে আগুনে ফেলে দিল। নিরাবরণ ও নিরাভরণ হয়ে সে যে কী নৃত্য আজ দেখাবে হেরম্ব কল্পনা করে উঠতে পারল না।

আনন্দ ধীরে ধীরে আগুনকে প্রদক্ষিণ করতে আরম্ভ করল। অতি মৃদু তার গতি, কিন্তু চোখের পলকে ছন্দ চোখে পড়ে। এও সেই চন্দ্রকলা নাচেরই ছন্দ। সে নাচে তিল তিল করে আনন্দের দেহে জীবনের সঞ্চার হয়েছিল, আজ তেমনি ক্রমপদ্ধতিতে সে গতি সঞ্চয় করেছে। গতির সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলাচাঞ্চল্যের সমন্বয়, যার জন্ম চোখে পড়ে না, শুধু মনে হয় সমগ্র নৃত্যের রূপ ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হচ্ছে। প্রথমে আনন্দের দুটি হাত দেহের সঙ্গে মিশে ছিল, হাত দুটি যখন আগুনের কম্পিত আলোয় তরঙ্গ তুলে তুলে দুই দিগন্তের দিকে প্রসারিত হয়ে গেল, তখন আনন্দের পরিক্রমা অত্যন্ত দ্রুত হয়ে উঠেছে। এখন যে তার নৃত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ, এই নৃত্যকে যে না চেনে তারও তা বোঝা কঠিন নয়। হেরম্ব বড়ো আরাম বোধ করল। তার অশান্তি ও উদ্‌বেগ, শ্রান্তি ও জড়তা মিলিয়ে গিয়ে পরিতৃপ্তিতে সে পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আনন্দের প্রথম নৃত্যের শেষে মন্দিরের সামনে সে প্রথম যে অলৌকিক অনুভূতির স্বাদ পেয়েছিল, আবার তার আবির্ভাবের সম্ভাবনায় হেরম্বের দেহ হালকা, মন প্রশান্ত হয়ে গেল।

কিন্তু এবারও অকস্মাৎ আনন্দের নৃত্য থেমে গেল। আগুনের আরও নিকটে সে থমকে দাঁড়াল। আগুন এখন তার মাথা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠেছে, আনন্দকেও মনে হচ্ছে আগুনের শিখা। পরক্ষণে আনন্দ কাত হয়ে সেই বিপুল যজ্ঞানলে ঢলে পড়ল।

হেরম্ব নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছু করার নেই। আনন্দ অনেক আগে মারা গেছে। শুধু চিতায় উঠবার শক্তিটুকুই তার বজায় ছিল।

পুতুলনাচের ইতিকথা

এক

খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছটার গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

হারুর মাথার কাঁচা-পাকা চুল আর মুখের বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তবুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা চিন্ময় জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটাক্ষ কবিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুংকার ছাড়িলেন । তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।

বটগাছেব ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়াব সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ বঙের সবু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়া ছিল । গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপেব বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুব দিকে চাহিযা থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হারুকে সহজে এখানে কেহ আবিষ্কার করিবে এরূপ সম্ভাবনা কম। এদিকে মানুষের বসতি নাই। এদিকে আসিবার প্রয়োজন কাহারও বড়ো একটা হয় না, সহজে কেহ আসিতেও চায় না। গ্রামেব লোক ভয় করিতে ভালোবাসে। গ্রামের বাহিরে খালেব এপারেব ঘন জঙ্গল ও গভীব নির্জনতাকে তাহারা ওই কাজে লাগাইয়াছে। ভূতপ্রেতেব অস্তিত্ব হয়তো গ্রামবাসীবই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের বাজ্য তাতে আর সন্দেহ নাই।

দিনের আলো বজায় থাকিতে থাকিতে বাজিতপুরেব দুএকটি সাহসী পথিক মাঠ ভাঙিয়া আসিয়া ঘাসেব নীচে অদৃশ্যপ্রায় পথ-বেখাটিব সাহায্যে পথ সংক্ষেপ কবে। বলিয়া কহিয়া কারও নৌকায় খাল পার হইলেও গাওদিযার সড়ক। গ্রামে পৌঁছিতে আর আধ মাইলও হাঁটিতে হয় না। চণ্ডীর মা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এদিকে কাঠ কুড়াইতে আসে। যামিনী কবিরাজেব চেলা সপ্তাহে একদিন গুল্মলতা কুড়াইয়া লইয়া যায়। কার্তিক অঘ্রান মাসে ভিনগাঁয়েব সাপুড়ে কখনও সাপ ধরিতে আসে। আর কেহ ভুলিয়াও এদিকে পা দেয় না।

বৃষ্টি থামিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। আকাশের এক প্রান্তে ভীরু লজ্জার মতো একটু রঙের আভাস দেখা দিল। বটগাছের শাখায় পাখিরা উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং কিছু দূরে মাটির গায়ের গর্ত হইতে উই-এর দলকে নবোদ্গত পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবার সেই দিকে উড়িয়া গেল। হারুর স্থায়ী নিস্পন্দতায় সাহস পাইয়া গাছের কাঠবিড়ালিটি এক সময় নীচে নামিয়া আসিল। ওদিকে বুঁদি গাছের ডালে একটা গিরগিটি কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকগুলি পোকা আয়ত্ত করিয়া ফেলিল। মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনের মাঠ দিয়া ছপছপ্ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বারবার মুখ ফিরাইয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!

শশী বলিল, নৌকা ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যা গোবর্ধন। ওই শ্যাওড়া গাছটার কাছে এখান দিয়ে নামানো যাবে না।

বটগাছটার সামনাসামনি খালের পাড় অত্যন্ত ঢালু। বৃষ্টিতে পিছলও হইয়া আছে। গোবর্ধন লগি ঠেলিয়া নৌকা পাশের দিকে সরাইয়া লইয়া গেল। সাত মাইল তফাতে নদীর জল চব্বিশ ঘণ্টায় তিন হাত বাড়িয়াছে। খালে স্রোতও বড়ো কম নয়। শ্যাওড়া গাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলিয়া নৌকা স্থির করিয়া গোবর্ধন বলিল, আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি।

শশী বলিল, দুর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই।

গোবর্ধন বলিল, ছুঁলাম বা, কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন।

শশী ভাবিয়া দেখিল, কথাটা মিথ্যা নয়। পড়িয়া গেলে হারুর সর্বাঙ্গে কাদা মাখা হইয়া যাইবে। তার চেয়ে গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর এমনকী বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে—মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।

আয় তবে দুজনে ধরেই নামাই। গাছের সঙ্গে টেনে নৌকা বাঁধ, সবে গেলে মুশকিল হবে। আচ্ছা, আলোটা আগে জ্বেলে নে গোবর্ধন। অন্ধকার হয়ে এল।

আলো জ্বালিয়া শ্যাওড়া গাছের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া গোবর্ধন উপরে উঠিয়া গেল। দুজনে ধরাধরি করিয়া হারুকে তাহারা সাবধানে নৌকায় নামাইয়া আনিল। শশী নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দে, নৌকো খুলে দে গোবর্ধন। আর দ্যাখ, ওকে তুই আর ছুঁসনে।

আমার ছোঁবার দরকার!

শশী শহর হইতে ফিরিতেছিল। নৌকায় বসিয়াই সে দেখিতে পায় খালের মনুষ্যবর্জিত তীরে সন্ধ্যার আবছা আলোয় গাছে ঠেস দিয়া ভূতের মতো একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। পাগল ছাড়া এ সময় সাপের রাজ্যে মানুষ ও ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। শশীর বিস্ময় ও কৌতূহলের সীমা ছিল না। হাঁক ডাক দিয়া সাড়া না পাইয়া গোবর্ধনকে সে নৌকা ভিড়াইতে বলিয়াছিল। গোবর্ধন প্রথমটা রাজি হয় নাই। এখানে এমন সময় মানুষ আসিবে কোথা হইতে? শশীরও চোখের ভুল। সত্য সত্যই সে যদি কিছু দেখিয়া থাকেও, ওই কিছুটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইয়া আর কাজ নাই, মানে মানে এবার বাড়ি ফেরাই ভালো। কিন্তু শশী কলিকাতার কলেজে পাশ করিয়া ডাক্তার হইয়াছে। গোবর্ধনের কোনো আপত্তিই সে তোলে নাই। বলিয়াছিল, ভূত যদি হয় তো বেঁধে এনে পোষ মানাব গোবর্ধন, নৌকা ফেরা।

তখনও আকাশে আলো ছিল। হারুর চারিপাশে কচুপাতায় আটকানো জলের রুপালি রূপ একেবারে নিভিয়া যায় নাই। কাছে গিয়া হারুকে দেখিবামাত্র শশী চিনিতে পারিয়াছিল।

ওরে গোবর্ধন, এ যে আমাদের হারু! এখানে ও এল কী করে?

গোবর্ধনের মুখে অনেকক্ষণ কথা সরে নাই। শেষে সভয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মরে গেছে না কি ছোটোবাবু?

মরে গেছে। বাজ পড়েছিল।

আহা চুলগুলো বেবাক জ্বলে গেছে গো!

হারুর বদলে আর কেহ হইলে, যে মানুষটা মরিয়া গিয়াছে তাহার চুলের জন্য গোবর্ধনকে শোক করিতে শুনিয়া শশীর হয়তো হাসি আসিত। কিন্তু গ্রামের বাহিরে হারুকে এ অবস্থায় আবিষ্কার করিয়া তাহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। হারুর ছেলেমেয়ে আছে, আত্মীয়বন্ধু আছে, সকলের চোখের আড়ালে একটা গাছের নীচে ওর একা একা মরিয়া যাওয়া কী শোচনীয় দুর্ঘটনা! গোবর্ধনের কথায় তাহার মন আরও বিষণ্ণ হইয়া গেল।

গোবর্ধনের বুকের মধ্যে ঢিপ্‌ঢিপ্‌ করিতেছিল।

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে ছোটোবাবু? গাঁয়ে খবর দিগে চলো।

এমনি ভাবে ফেলে রেখে চলে যাব গোবর্ধন?

তার আর করছ কী?

গাঁ থেকে লোকজন নিয়ে ফিরতে ফিরতে শেয়ালে যদি টানাটানি আরম্ভ করে দেয়?

গোবর্ধন শিহরিয়া বলিয়াছিল, তবে কী করবে ছোটোবাবু?

হাঁক তো, কেউ যদি আসে।

কিন্তু এই বাদল-সন্ধ্যায় আশেপাশে কে আছে যে হাঁকিলে ছুটিয়া আসিবে? নিজের হাঁক শুনিয়া গোবর্ধন নিজেই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। আর কোনো ফল হয় নাই। বসুলপুরের হাটের দিন খালে অনেক নৌকা চলাচল করে। আজ কতক্ষণে আর একটি নৌকার দেখা মিলিবে, একেবারে মিলিবে কিনা, তাহারও কিছুই স্থিরতা নাই।

হারুকে নৌকায় নামাইয়া লওয়ার কথাটা তখন শশীর মনে হয়।

নৌকা খুলিবামাত্র স্রোতের টানে গতিলাভ করিল। গলুই-এর উপর দাঁড়াইয়া লগিটা ঝপ্‌ করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া গোবর্ধন হঠাৎ ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, একটা কথা কও ছোটোবাবু। উযার মুক্তি নাই তো?

শশী হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। হাই তুলিয়া বলিল, কী জানি গোবর্ধন, জানি না।

তাহার হাই তোলাকে বিরক্তির লক্ষণ মনে করিয়া গোবর্ধন আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

শশী বিরক্ত হয় নাই, অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। হারুর মরণের সংস্রবে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া শশীর কম দুঃখ হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও গভীর ভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তাহার মমতা। মৃত্যু এক এক জনকে এক এক ভাবে বিচলিত করে। আত্মীয় পরের মৃত্যুতে যাহারা মর-মানবের জন্য শোক করে শশী তাহাদের মতো নয়। একজনকে মরিতে দেখিলে তাহার মনে পড়িয়া যায় না সকলেই একদিন মরিবে,— চেনা-অচেনা আপন-পর যে যেখানে আছে প্রত্যেকে এবং সে নিজেও। শ্মশানে শশীর শ্মশান-বৈরাগ্য আসে না। জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য, অতি উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়, মনে হয়, এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিক ভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বাঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের । জীবনে এই ক্ষতি প্রতিকারহীন।

মৃত্যুর সান্নিধ্য এইভাবে এইদিক দিয়া শশীকে ব্যথিত করে।

কিছুদুর সোজা গিয়া গাওদিয়ার প্রান্তভাগ ছুঁইয়া খাল পুবে দিক পরিবর্তন করিয়াছে। বাঁকের মুখে গ্রামের ঘাট। গাওদিয়া ছোটো গ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার বিশেষ ধারে না। ঘাটও আর কিছুই নয়, কোদাল দিয়া কয়েকটি ধাপ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ঘাটের উপরে একটা টিনের চালা আছে। পাটের সময় সেখানে পাট জমাইয়া বাজিতপুরের শশীর ভগ্নিপতি নন্দলালের গুদামে চালান দেওয়া হয়। তিন চার খেপ চালান গেলেই গাওদিয়ার পাট চালানের পাট ওঠে। তারপর সারা বছর চালাটা পড়িয়া থাকে খালি। গোরু, ছাগল, মানুষ যাহার খুশি ব্যবহার করে, কেহ বারণ করিতে আসে না। চালার সামনেই চণ্ডীর মার ছেলে চণ্ডী সারাদিন একটা কাঠের বাক্সের উপর কয়েক প্যাকেট লাল নীল কাগজ মোড়া বিড়ি ও রেকাবিতে ভিজা ন্যাকড়ায় ঢাকা কয়েক খিলি পান সাজাইয়া বসিয়া থাকে।

ঘাটে কয়েকটি ছোটোবড়ো নৌকা বাঁধা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একটিতেও এখন না আছে আলো, না আছে মানুষ।

গোবর্ধনের মনে ভয় ছিল, তাহাকে নৌকায় পাহারা রাখিয়া শশী হয়তো নিজেই গ্রামে যাইতে চাহিবে। ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াই সে তাই বলিল, আমি তাহলে গাঁয়ে খবর দিগে ছোটোবাবু?

শশী বলিল, যা। পা চালিয়ে যাস গোবর্ধন। আগে যাবি গোয়ালাপাড়ায়। নিতাই, সুদেব, বংশী ওরা সবাই যেন ছুটে চলে আসে। বলিস, আমি অন্ধকারে মড়া আগলে বসে রইলাম। আলোটা তুই নিয়ে যা, যেতে যেতে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হবে। পিছল রাস্তা।

আলো লইয়া গোবর্ধন চলিয়া গেল। এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ খুঁজিলে হয়তো এখনও একটু ধূসর আভা চোখে পড়ে, কিন্তু অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হইয়া আসিতেছে। শশী ভাবিল, আর পনেরো বিশ মিনিট দেরি করিয়া বটগাছটার কাছে পৌঁছিলে হারুকে সে ঠাহর করিতে পারিত না। খাল দিয়া যাতায়াত করিবার সময় ভূত ও সাপের রাজ্যটির দিকে সে বরাবর চোখ তুলিয়া তাকায়। আজও তাকাইত। কিন্তু হারুকে তাহার মনে হইত গাছের গুঁড়িরই একটা অংশ। হয়তো মানুষের আকৃতির সঙ্গে গাছের অংশটির সাদৃশ্য লক্ষ করিয়া আর হারুর পরনের কাপড়ের শ্বেতাভ রহস্যটুকুর মানে না বুঝিয়া তাহার একটু শিহরন জাগিত মাত্র। হারু ওইখানে পড়িয়া থাকিত। কতদিন পরে শিয়ালের দাঁত ও শকুনির চঞ্চুতে সাফ করা হাড় কয়খানি তাহার মানুষ আবিষ্কার করিত কে জানে। পঞ্চুকে চণ্ডীর মা যেমন আবিষ্কার করিয়াছিল। সর্বাঙ্গে খাবলা খাবলা পচা মাংস,কোথাও হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুই হাতের মুঠার মধ্যে প্রকাণ্ড খরিশ সাপটা শুকাইয়া হইয়া আছে একেবারে দড়ি।

স্রোতের বেগে নৌকা মৃদুমৃদু দুলিতেছিল। নৌকার গলুইয়ে সে দোলন একটা জীবন্ত প্রাণীর অস্থিরতার মতো পৌঁছিতেছে। নড়িয়া চড়িয়া শশী একসময় সোজা হইয়া বসে। মনে একটা বিড়ি ধরাইবার ইচ্ছা জাগিতেছিল। কিন্তু সেটুকু উৎসাহও সে যেন পায় না। তাহার চোখের সামনে চারিদিক ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়। তীরের গাছগুলি জমাটবাঁধা অন্ধকারের রূপ নেয়, জলের উপর জনহীন নৌকা কখনও হালকা ছায়ার মতো আলগোছে ভাসিতে থাকে। মাথার উপর দিয়া অদৃশ্যপ্রায় কতগুলি পাখি সাঁ সাঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। চারিদিকে জোনাকি ঝিকমিক করিতে আরম্ভ করে।

এত কাছেও হারুর মুখ ঝাপসা হইয়া যায়। তাহার মুখখানা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সে যে মরিয়া গিয়াছে এই সত্যটা শশী যেন আবার নূতন করিয়া অনুভব করে। ভাবে, মরিবার সময় হারু কী ভাবিতেছিল কে জানে! কোন কল্পনা কোন অনুভূতির মাঝখানে তাহার হঠাৎ ছেদ পড়িয়াছিল?

মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে হারু বাজিতপুরে গিয়াছিল এটা শশী জানিত। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য ওই বিপথে সে পাড়ি জমাইয়াছিল। পথ তাহার সংক্ষিপ্তই হইয়া গেল। পাড়িও জমিল ভালোই।

ঘণ্টা দুই পরে গোটা তিনেক লণ্ঠন সঙ্গে করিয়া হারুর সাত-আটজন স্বজাতি আসিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ ঘাটটি মুহূর্তে হইয়া উঠিল মুখরিত।

শশী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, নিতাই এসেছ, নিতাই?

নিতাই সাড়া দিল, আজ্ঞে, এই যে আমি ছোটোবাবু।

নিতাইয়ের দায়িত্বজ্ঞান প্রসিদ্ধ। শশী অনেকটা ভরসা পাইল।

হারুর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে নিতাই?

হয়েছে ছোটোবাবু।

আলো উঁচু করিয়া ধরিয়া সকলে তাহারা ভিড় কবিয়া হারুকে দেখিতে লাগিল। গোবর্ধনেব কাছে ব্যাপারটা তাহারা আগাগোড়া শুনিয়াছিল। শশীব কাছে আর একবার শুনিল।

তারপর ঘাটের খাঁজের উপর উবু হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিয়া দিল জটলা।

কিছুক্ষণের মধ্যে শশীর মনে হইল, হারুর পরলোকগমন ওদের কথার মধ্যেই এতক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। বর্ষণক্ষান্ত বিষণ্ণ রাত্রে কালিপড়া লণ্ঠনের মৃদু রঙিন আলোয় হারুর জীবনের টুকরো টুকবো ঘটনাগুলি যেন দৃশ্যমান ছায়াছবির রূপ গ্রহণ করিয়া চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। হারুর পরিবারের ক্ষতি ও বেদনার প্রকৃত উপলব্ধি যেন এতক্ষণে শশী আয়ত্ত করিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল, সংসারে হাবু যে কতখানি স্থান শূন্য রাখিয়া গিয়াছে—এই অশিক্ষিত মানুষগুলির মনের মাপকাঠি দিয়াই তাহার পরিমাপ সম্ভব। এতক্ষণ হারুর অপমৃত্যুকে সে বুঝিতে পারে নাই। হারুকে সে আপনার জগতে তুলিয়া লইয়াছিল। যেখানে শূন্য করিয়া রাখিয়া যাওয়ার মতো স্থান হারু কোনোদিন অধিকার করিয়া ছিল কি না সন্দেহ।

নীরবে শশী অনেকক্ষণ তাহাদের আলোচনা কান পাতিয়া শুনিল। শেষে রাত বাড়িয়া যাইতেছে খেয়াল করিয়া বলিল, তোমবা তাহলে আব বসে থেকো না নিতাই। রসিকবাবুব বাগান থেকে বাঁশ কেটে এনে একটা মাচা বেঁধে ফেল।

নিতাই প্রশ্ন করিল, সোজা মশান বিলে নিয়ে যাবে কি ছোটোবাবু?

শশী বলিল, না । ওর বাড়িতে একবার নামাতে হবে।

হারুকে সোজাসুজি শ্মশানে লইয়া গেলে অনেক হাঙ্গামা কমিত। কিন্তু হারুব মেয়ে মতিব জ্বর। সকলে শ্মশানে আসিলেও সে আসিতে পারিবে না। তাহাকে একবাব না দেখাইয়া হারুকে পোড়াইয়া ফেলিবার কথাটা শশী ভাবিতেও পারিতেছিল না। মতিব কাছে খবরটা এখন কযেক দিনের জন্য চাপিয়া যাওযার বুদ্ধিও বাড়ির কাহারও হইবে কি না সন্দেহ। মতি জানিতে পাবিবে তাহাবই জন্য বব খুঁজিতে গিয়া ফিবিবার পথে হারু অপঘাতে প্রাণ দিয়াছে। জ্বর গাযে এই বর্ষার রাত্রে হয়তো সে শ্মশানে ছুটিয়া আসিবে। জোব করিয়া বাড়িতে আটকাইয়া রাখিলে সকলকেই হয়তো সে ক্ষমা কবিবে, নিয়তিকে পর্যন্ত, কিন্তু শশীকে সে সহজে মার্জনা কবিবে না।

বলিবে : 'আপনি থাকতে আমাকে একটিবাবও না দেখিয়ে বাবাকে ওরা পুড়িয়ে ফেলেছিল গো'

বসিকবাবুব বাগান হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া মাচা বাঁধা হইল। তাবপব মাচায শোয়াইয়া হরিবোল দিযা মাচাটা তাহাবা কাঁধে তুলিয়া লইল।

শশী বলিল, এখন তোমরা হরিবোল দিও না, হাবু শ্মশান যাত্রা করেনি বাড়ি যাচ্ছে ।

কথাটা এমন করিয়া শশী ইচ্ছা করিয়া বলে নাই। নিজের কথায় নিজেরই চোখ দুটি তাহাব সজল হইয়া উঠিল।

রাস্তাটি চওড়া মন্দ নয়, কিন্তু কাঁচা। বর্ষাকালে কোথাও এক হাঁটু কাদা হয়, কোথাও এঁটেল মাটিতে বিপজ্জনক রকমের পিছল হইয়া থাকে। গোবুর গাড়ির চাকাতেই রাস্তাটির সর্বনাশ কবে সবচেয়ে বেশি। বর্ষার পর কাদা শুকাইলে মনে হয় আগাগোড়া যেন লাঙল দিয়া চষিয়া ফেলা হইয়াছে। শীত পড়িতে পড়িতে পথটি আবার সমতল হইয়া যায় সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষতের উঁচু সীমানাগুলি গুঁড়া হইয়া এত ধুলা হয় যে পায়ের পাতা ডুবিয়া যায়। ফাল্গুন চৈত্র মাসে বাতাসে ধুলা উড়িয়া দুপাশের গাছগুলিকে বিবর্ণ করিয়া দেয়।

গ্রামে ঢুকিবার আগে খালের সঙ্গে সংযুক্ত নালার উপর একটি পুল পড়ে। পুলের নীচে স্রোতের মুখে জাল পাতিয়া নবীন মাঝি সেই অপরাহ্ণ হইতে বুক জলে দাঁড়াইয়া আছে।

নিতাই ডাকিয়া বলে, কী মাছ পড়ল মাঝি?

নবীন বলে, মাছ কোথা ঘোষ মশায়? জল বড়ো বেশি গো!

মাগুরটাগুব পেলি নবীন? পেলে আমাকে একটা দিস। ছেলেটা কাল পথ্যি করবে।

নবীন মিথ্যা জবাব দেয়। বলে, জলে দেঁড়িয়ে কি মিছে কথা কইছি? এত জলে মাছ পড়ে না। ইদিকে তিন হাত ফাঁক রইছে দেখছনি?

হারুর মরণের খবরটা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে।

বলে, লোক বড়ো ভালো ছিল গো। জগতে শত্তুর নেই।

তারপর বলে, ই বছব, জান ঘোষ মশায়, অদেষ্ট সবার মন্দ । তিন বর্ষা নাবল না, এর মধ্যে জল কামড়াতে নেগেছে।

দিন নাই রাত্রি নাই জলেস্থলে নবীনের কঠোর জীবন সংগ্রাম। দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে। হারুব অপমৃত্যুতে বিচলিত হওযার সময় তাহার নাই।

অথচ এদিকে মমতাও জানে। দশ বছরের ছেলেটা বিকাল হইতে পুলেব উপর ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। জলে নামিয়া বাপের মতো সেও মাছ ধরিতে চায়। কিন্তু নবীন কোনোমতে অনুমতি দিবে না।

রেতে লয় বাপ, জ্বর হবে। কাল বিহানে আসিস।

বিহানে জল বইবেনি বাবা ।

হুঁ, রইবেনি আবাব। তোব ডুব জল হবে জানিস।

পুল পাব হইয়া কিছু দূর অবধি রাস্তার দুপাশে শুধু চযা খেত। তারপর গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে বসতি কম। রাস্তাব দক্ষিণে ঝোপঝাপের বেষ্টনীব মধ্যে পৃথক কয়েকটা ভাঙাচোরা ঘর বৃষ্টিতে ঘরে বাইরে ভিজিযাছে। ওখানে সাত ঘর বাগদি বাস করে। গ্রামের ছেলেমেয়েদেব মধ্যে এবাই সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে ছোটোলোক, সব চেয়ে চোর। দিনে ওরা যে গৃহস্থের চাল্ মেরামত করে, রাত্রে সুযোগ পাইলে তাহাবই ভিটায় সিঁদ দেয়। কেহ না কেহ ওদের মধ্যে ছমাস একবছর জেলেই পড়িয়া আছে।

ছাড়া পাইবাব পব গ্রামে ফিরিয়া বলে, শ্বশুর ঘর থে ফিবলুম দাদা। বেশ ছিলাম গো!

এটুকু পাব হইয়া গেলে বসতি ঘন হইয়া আসে। বাড়ি ঘরের উন্নত অবস্থা চোখে পড়ে। পথেব দুদিকেই দুটি-একটি শাখাপথ পাডার দিকে বাহির হইয়া যাইতে আরম্ভ করিযাছে দেখা যায। মাঝে মাঝে কলাবাগান সুপারি বাগান ও ছোটো ছোটো বাঁশঝাড় ডাইনে বাঁয়ে আবির্ভূত হয়। আমবাগানকে অন্ধকারে মনে হয় অরণ্য। কোনো কোনো বাড়িব সামনে কামিনী, গন্ধরাজ ও জবাফুলেব বাগান করিবার ক্ষীণ চেষ্টা চোখে পড়ে। ক্রমে দু-একটি পাকা দালানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাড়িগুলি আগাগোড়া দালান নয়, এক ভিটায় দুখানা ঘর হয়তো ইটের, বাকিগুলি শণে ছাওয়া চাঁচের বেড়ায় গ্রামেরই চিরন্তন নিজস্ব নীড়।

নির্জন স্তব্ধ পথে শববাহী তাহারাই জীবনের সাড়া দিয়া চলিয়াছে। শশীর বিষণ্ণতা ঘুচিবার নয়। আলো হাতে সকলের আগে আগে সে যাইতেছিল। নিতাই সুদেব ওরা কথা কহিতেছে, সকলেই, কথা নাই কেবল শশীব মুখে। পথের ধারে কোনো বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে দেখিলে তাহার ইচ্ছা হয় হাঁক দিয়া বাড়ির লোকের সাড়া নেয়। এক মিনিট দাঁড়াইয়া অকারণে বাড়ির সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে। তাহার সাড়া পাইয়া কান্নার রোল তুলিবে না এমন একটি পরিবারের খবর না লইয়া হারুর বাড়ির দিকে চলতে সে যেন জোর পাইতোছিল না।

খানিক আগাইয়া বাজার।

এখানে গ্রাম জমাট বাঁধিয়াছে। দোকানপাটের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বাদলের রাত্রি গভীর হওয়ার আগে সবগুলি দোকানই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাস্তার বাঁ দিকে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি টিনের চালা। একদিন অন্তর ওখানে বাজার বসে।

কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া একটা চালার নীচে আশ্রয় লইয়াছে। সম্মুখে তাহার ধুনির আগুন। আগুনে সন্ন্যাসী মোটা মোটা রুটি সেঁকিতেছিল। ওদিকের চালাটায় লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুরটা থাবায় মুখ রাখিয়া তাহাই দেখিতেছে। শশী তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল। পা বারবার জলকাদাভরা গর্তে গিয়া পড়িতেছিল। মনের গতির আজ সে ঠিক-ঠিকানা পাইতেছিল না।

শ্রীনাথ দাসের মুদিখানার পাশ দিয়া কায়েতপাড়ার পথটা বাহির হইয়া গিয়াছে। হারুর বাড়ি এই পথের শেষ সীমায়। তারপর আর বাড়ি ঘর নাই। ক্রোশব্যাপী মাঠ নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে।

পথের মোড়ে বকুল গাছটির গোড়া পাকা বাঁধানো। বিকালের দিকে এখানে প্রত্যহ সরকারি আড্ডা বসে। আলোটা ওখানে নামাইয়া রাখিয়া শশী একটা বিড়ি ধরাইল। চাহিয়া দেখিল গাছের নীচে শুকনো ডাল ও কাঁচা পাকা পাতার সঙ্গে পাতার উপরে ন্যাকড়া জড়ানো একটা পুতুল পড়িয়া আছে। পুতুলটা শশী চিনিতে পারিল। বৈশাখ মাসে বাজিতপুরের মেলায় শ্রীনাথের দোকানে বসিয়া এক ঘণ্টা বিশ্রাম করার মূল্যস্বরূপ তাহার মেয়েকে পুতুলটা কিনিয়া দিয়াছিল। বিকালে বৃষ্টি থামিলে এখানে খেলিতে আসিয়া শ্রীনাথের মেয়ে পুতুলটা ফেলিয়া গিয়াছে।

রাত্রে পুতুলের শোকে মেয়েটা কাঁদিবে। সকালে বকুলতলায় খুঁজিতে আসিয়া দেখিবে পুতুল নাই। পুতুল কে লইয়াছে মেয়েটা তাহা জানিতে পারিবে না।

শশীই কেবল অনুমান করিতে পারিবে যামিনী কবিরাজের বউ ভোর ভোর বকুলতলা ঝাঁট দিতে আসিয়া দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

যামিনী কবিরাজের বউ চোরও নয়, পাগলও নয় . মাটির পুতুলে সে লোভ করে না। কিন্তু প্রণাম করিয়া (যে গাছের তলা বাঁধানো, সেটি দেবধর্মী) মুখ তুলিতেই সামনে অত বড়ো একটা পুতুল পড়িয়া থাকিতে দেখিলে এ কথা মনে হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে যে এ কাজ দেবতার, এই তাহার ইঙ্গিত?

পুতুলটি আরও খানিকটা গাছের গোড়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া আলোটা তুলিয়া লইয়া শশী আগাইয়া গেল।

বলিল, সাবধানে পা ফেলে চলো নিতাই, আস্তে পা ফেলে চলো। ফেলে দিয়ে হারুকে কাদা মাখিয়ো না যেন। কী রাস্তা!

কায়েতপাড়ার সংকীর্ণ পথটির দুদিকে বাঁশ ঝাড়ে মশা ভনভন করিতেছিল। যামিনী কবিরাজের গোয়ালের পিছনটাতে তিন মাসের জমানো গোবর পচিয়া উঠিয়াছে। ডোবার মধ্যে সারা বছর ধরিয়া গজানো আগাছার জঙ্গল এখন বর্ষার টুবুটুবু জলের তলে হাঁফাইয়া হাঁফাইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

খানিক দূর আগাইয়া হারুর বউয়ের মড়াকান্না তাহাদের কানে ভাসিয়া আসিল।

দুই

শশীর চরিত্রে দুটি সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে এ কথা কেহ টের পাইবে না যে, তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতায় একটা গভীর

সহানুভূতিমূলক বিচারপদ্ধতি আছে। তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবি প্রকৃতির পরিচয়ই মানুষ সাধারণত পায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারি এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে।

শশীর চরিত্রের এই দিকটা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বাবা গোপাল দাস।

গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া। আসলে সে করে সম্পত্তি কেনাবেচা ও টাকা ধার দেওয়া। অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি। শোনা যায়, এককালে সে নাকি বার তিনেক জীবন্ত মানুষের কেনাবেচার ব্যাপারেও দালালি করিয়াছে—তিনটি বৃদ্ধের বউ জুটাইয়া দেওয়া। সে আজকের কথা নয়। বৃদ্ধ তিনজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হইয়াছে। এখন যামিনী কবিরাজের মরণ হইলেই ব্যাপারটা পুরাপুরি ইতিহাসের গর্ভে তলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যামিনী কবিরাজের বউ, শশী যাহাকে সেনদিদি বলিয়া ডাকে এবং শশীকে যে অপুত্রবতী রমণী গভীরভাবে স্নেহ করে, স্বামীকে সে এত যত্নে এত সাবধানে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে যে শীঘ্র যামিনী কবিরাজের মরিবার সম্ভাবনা নাই। যামিনী কিন্তু মরিতে চায়। গ্রামের কলঙ্ক রটানোর কাজে উৎসাহী নিষ্কর্মা ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি যে, এতটুকু এদিক ওদিক হইলে গ্রামের বউ-ঝিদের কলঙ্ক দিগদিগন্তে রটিয়া যায়। কেহ বিশ্বাস করে, কেহ করে না। যে বিশ্বাস করে সেও সত্যমিথ্যা যাচাই করে না, যে অবিশ্বাস করে সেও নয়। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্নটা নির্ভর করে মানুষের খুশির উপর। গ্রামের কলঙ্কিনীদের মধ্যে শশীর সেনদিদির প্রসিদ্ধিই বেশি। গোপালের সঙ্গেই তার নামটা জড়ানো হয় বেশি সময়। লোকে নানা কথা বলাবলি করে। শশী বিশ্বাস করে না। যামিনী করে। সে থুড়থুড়ে বুড়ো। সন্দেহের তীব্র বিষে সে দগ্ধ হইয়া যায়। স্ত্রী পাড়ায় কারও বাড়ি গেলে রাগে দুঃখে এক একদিন সে কাঁদিয়াও ফ্যালে। স্ত্রীর কায়েত-বাড়ি কাসুন্দি বানাইয়া আসার কৈফিয়তটা সে বিশ্বাস করে না। অথচ শশীর সেনদিদি সত্য কৈফিয়তই দেয়। অতীতে কখনও সে যদি কোনো অন্যায় করিয়া থাকে, তাহা অতীতের সত্যমিথ্যা পাপপুণ্যে মিশিয়া আছে। উন্মাদ ছাড়া আজ শশীর সেনদিদিকে কেহ অবিশ্বাস করিবে না। বুড়া হইয়া যামিনীর মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দেখা হইলে গোপালকে সে শাপ দেয়। বলে, এককাঁড়ি টাকা নিয়ে তুই আমার খুব উপকারটা করেছিলি গোপাল! উচ্ছন্ন যাবি তুই, তোর সর্বনাশ হবে, ঘরবাড়ি তোর শ্মশান হয়ে যাবে।

যামিনী কবিরাজের বউয়ের সম্বন্ধে গেপালের বদনাম হয়তো মিথ্যা, তবু লোক গোপাল ভালো নয়। তুচ্ছ কতগুলি টাকার জন্য সেই তো প্রতিমার মতো কিশোরীকে বুড়া, পাগলাটে যামিনী কবিরাজের বউ করিয়াছিল।

শশীই গোপালের একমাত্র ছেলে, মেয়ে আছে তিনটি। বড়ো মেয়ের নাম বিন্ধ্যবাসিনী। বড়গাঁর নায়েব শ্যামাচরণ দাসের বড়ো ছেলে মোহনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে। মোহনের একটি পা খোঁড়া। মেজো মেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিবাহ হইয়াছে খাস কলিকাতায়, বড়োবাজারের নন্দলাল এন্ড কোং -এর নন্দলালের সঙ্গে।

গোপালের সে এক স্মরণীয় কীর্তি।

নন্দলালের কারবার পাটের। চারিদিক হইতে পাট সংগ্রহ করিয়া জমা করিবার সুবিধা হয় এবং চালান দিবার ভালো ব্যবস্থা থাকে এমন একটি মধ্যবর্তী গ্রাম খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে বছর সাতেক আগে সে একবার এদিকে আসিয়াছিল। গোপাল তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল নিজের বাড়ি, আদরযত্ন করিয়াছিল ঘরের লোকের মতো। তারপর কোথা দিয়া কী হইয়া গেল কে জানে,—হয়তো নন্দলালের দোষ ছিল, হয়তো ছিল না,—তিন দিন পরে গোপালের অনুগত গ্রামবাসীরা লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া বিন্দুর সঙ্গে নন্দলালের বিবাহ দিয়া দিল। নন্দলালের চাকরটা রাতারাতি বাজিতপুরে পলাইয়াছিল। পরদিন মনিবের উদ্ধারে সে একেবারে পুলিশ লইয়া হাজির! নন্দলাল ইচ্ছা করিলে

কিছু কিছু শাস্তি অনেককেই দিতে পারিত,—গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে পুলিশকে কিন্তু সেই বিদায় করিয়া দিল। তারপর বউ লইয়া সেই যে সে কলিকাতায় গেল,—গাওদিয়ার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখিল না।

যাই হোক, নন্দলালের কাছে বিন্দুবাসিনী হয়তো সুখেই আছে। গ্রামের লোক সঠিক খবর রাখে না। সাত বছরের মধ্যে বিন্দু একবার মাত্র তিন দিনের জন্য বাপের বাড়ি আসিয়াছিল। গ্রামের ছেলে বুড়ো তখন ঈর্ষার চোখে চাহিয়া দেখিয়াছিল,—অলঙ্কারে অলঙ্কারে বিন্দুর দেহে তিল ধারণের স্থান নাই, একেবারে যেন বাইজি। তবু, হয়তো বিন্দু সুখে নাই! নন্দর তো বয়স হইয়াছে, আরেকটা স্ত্রী তো তাহার আছে, চরিত্রও সম্ভবত তাহার ভালো নয়। গাওদিয়াবাসী যাহাদের বিবাহিতা কন্যাগুলি সারি সারি দাঁড়াইয়া চোখের জলে ভাসে, তারা ভাবে : হয়তো বিন্দু সুখে নাই! ভাবিয়া তাহারা তৃপ্তি পায়। কেহ মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিয়াও ফেলে। গোপাল শুনিতে পাইলে অস্ফুট স্বরে বলে, লক্ষ্মীছাড়ার দল।

এমনি বাপের শাসনে শশী মানুষ হইয়াছিল। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার সময় তাহার হৃদয় ছিল সংকীর্ণ, চিন্তাশক্তি ছিল ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল। গ্রাম্য গৃহস্থের স্বকেন্দ্রীয় সংকীর্ণ জীবনযাপনের মোটামুটি একটা ছবিই ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাহার কল্পনার সীমা। কলিকাতায় থাকিবার সময় তাহার অনুভূতির জগতে মার্জনা আনিয়া দেয় বই এবং বন্ধু। বন্ধুটির নাম কুমুদ, বাড়ি বরিশালে, লম্বা কালো চেহারা, বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাব। মাঝে মাঝে কবিতাও কুমুদ লিখিত। কলেজে সে প্রায়ই যাইত না, হস্টেলে নিজের ঘরে বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া যত রাজ্যের ইংরেজি বাংলা নভেল পড়িত, কথকতার মতো হৃদয়গ্রাহী করিয়া ধর্ম, সমাজ, ঈশ্বর ও নারীর (ষোলো সতেরো বছরের বালিকাদের) বিরুদ্ধে যা মনে আসিত বলিয়া যাইত আর টাকা ধার করিত শশীর কাছে। শশী প্রথমে মেয়েদের মতোই কুমুদের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিল; ওকে টাকা ধার দিতে পারিলে সে যেন বর্তিয়া যাইত। কুমুদ প্রথমে তাহাকে বিশেষ আমল দিত না, কিন্তু অনেক দুঃখ অপমান ও অভিমান চুপচাপ সহ্য করিয়া শশী তাহার অন্তরঙ্গতা অর্জন করিয়াছিল।

সেটা তাহার অনুকরণ করার বয়স। এই একটিমাত্র বন্ধুর প্রভাবে শশী একেবারে বদলাইয়া গেল। যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাহার মনকে পুরিয়া সিল করিয়া দিয়াছিল, কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙিয়া ফেলিতে পারিল না বটে, কিন্তু অনেকগুলি জানালা দরজা কাটিয়া দিয়া বাহিরের আলো বাতাস আনিয়া দিল, অন্ধকারের অন্তরাল হইতে মনকে তাহার বাহিরের উদারতায় বেড়াইতে যাইতে শিখাইয়া দিল।

প্রথমটা শশী একটু উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া গেল। মাথা ঘামাইয়া ঘামাইয়া জীবনকে ফেনাইয়া ফাঁপাইয়া মানুষ এমন বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে? জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়, বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন? তারপর গ্রামে ডাক্তারি করিতে বসিয়া প্রথমে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতেছিল, সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। এই সব অশিক্ষিত নরনারী, ডোবা পুকুর বন জঙ্গল মাঠ, বাকি জীবনটা তাহাকে এইখানেই কাটাইতে হইবে নাকি? ও ভগবান, একটা লাইব্রেরি পর্যন্ত যে এখানে নাই! ক্রমে ক্রমে শশীর মন শান্ত হইয়াছে। সে তো গ্রামেরই সন্তান, গ্রাম্য নরনারীর মধ্যে গ্রামের মাটি মাখিয়া গ্রামের জলবায়ু শুষিয়া সে বড়ো হইয়াছে, হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়, কিন্তু সে শুধু ছাপ, দাগা নয়। শহরের অভ্যাস যতটা পারে বজায় রাখিয়া বাকিটা সে বিসর্জন করিতে পারিল, কুমুদ ও বইয়ের কল্যাণে পাওয়া বহু বৃহত্তর আশা-আকাঙ্ক্ষাও ক্রমে ক্রমে সে চিন্তা ও কল্পনাতে পর্যবসিত করিয়া ফেলিতে পারিল।

এই সুদূর পল্লীতে হয়তো সে বসন্ত কখনও আসিবে না যাহার কোকিল পিয়ানো, সুবাস এসেন্স, দখিনাবায় ফ্যানের বাতাস। তবু, শশীর মনকে কে বাঁধিয়া রাখিবে? দীর্ঘ জীবন পড়িয়া আছে, পড়িয়া আছে বিপুলা পৃথিবী। আজ শশী কামিনী ঝোপেব পাশে ক্যাম্প চেয়ারে বসিয়া বাঁশঝাড়ের পাতা কাঁপানো ডোবার গন্ধ-ভরা ঝিরঝিরে বাতাসে উন্মনা হোক, কোলের উপর ফেলিয়া রাখা বইখানার দুটি মলাটের মধ্যে কাম্য জীবনটি তাহার আবদ্ধ থাক, একদিন কেয়ারি করা ফুল বাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে, দামি ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে,—আলো গান হাসি আনন্দ আভিজাত্য কীসের অভাব তখন থাকিবে শশীর?

কায়েতপাড়াব পথটি তিন ভাগ অতিক্রম করিয়া গেলে শশীর বাড়ি। হারুর বাড়ি পথের একেবারে শেযে। সেই হারু ঘোষ। খালের ধারে বটগাছটার তলে যে সেদিন অপরাহ্নে বজ্রাঘাতে মরিয়া গিয়াছে।

মতির জ্বর কমে নাই। সন্ধ্যার সময় শশী তাহাকে দেখিতে গেল। সাবাদিন শশীব সময় ছিল না।

সন্ধ্যার সময় হাবুব বাড়িতে প্রদীপ জ্বলে নাই। হারুর বউ মোক্ষদা হারুর ছেলে পবানের বউ কুসুমের উপব ভারী খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপাবটা বুঝিয়া দ্যাখো। গৃহস্থ বাড়ি। সন্ধ্যা আসিযাছে। বাড়িতে একটা বউ আছে। অথচ সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই। গলায় দড়ি দিয়া বউটা মরিয়া যায় না কেন?

কুসুম গিয়াছিল ঘাটে। ফিবিয়া আসিয়া জলের কলসি নামাইয়া ধীরে সুস্থে সে কাপড় ছাড়িল। তারপর জ্বালিতে গেল প্রদীপ। তাহাব নির্লজ্জ ধীরতা মোক্ষদাকে একেবারে খ্যাপাইয়া তুলিল। কুসুমের হাত হইতে প্রদীপটা ছিনাইয়া লইয়া রান্নাঘরে গিযা উনানে পাটখড়ি ধবাইয়া সে প্রদীপ জ্বালিল। তারপর তাড়াতাড়ি পাব হইতে গিয়া শুকনো উঠানে সে কেমন করিয়া পডিয়া গেল কে জানে!

কুসুম হাসিযা উঠিল সশব্দে। তারপর আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া মোক্ষদাকে আড় কোলে শূন্যে তুলিয়া শোবাব ঘরের সামনে দাওয়ায় নামাইয়া দিল। তেইশ বছরের বাঁজা মেয়ে, গায়ে তাহার জোব কম নয়।

কিছুক্ষণ বাড়িতে আব কান পাতা যায না। মোক্ষদা গলা ফাটাইয়া শাপিতে থাকে। ছেলে কোলে বুঁচি ব্যাপার জানিতে আসিলে ছেলেটা তাহার জুড়িয়া দেয় কান্না। ওদিকের ঘরে বুঁচির মুমূর্যু পিসি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আর্তস্বরে বলিতে থাকে, কী হল রে? ও বুঁচি, ওলো কুসুম, কী হল রে? হেই ভগবান, কেউ কি সাড়া দেবে!

বড়ো ঘবের অন্ধকারে মতি শুইয়া ছিল, সেও তাহার ক্ষীণকণ্ঠ যতটা পাবে উঁচুতে তুলিয়া ব্যাপার জানিতে চায়।

অবিচলিত থাকে শুধু কুসুম। দাওয়ার নীচে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া সে মোক্ষদার গাল শোনে।

তারপর রান্নাঘর হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠ আনিয়া ঢুকিতে যায় শোবার ঘবে।

আঘাতের বেদনা ভুলিয়া মোক্ষদা হাউমাউ করিয়া ওঠে।

ও কী লো বউ, ও কী? ঘরে-দোরে আগুন দিবি না কি?

আগুন দেব কেন মা? পিলসুজের দীপটা জ্বালব।

উনুনের কাঠ এনে দীপ জ্বালবি? দ্যাখ বুঁচি দ্যাখ, মেলেচ্ছ হারামজাদি ঘরের মধ্যে চিতা জ্বেলে দিতে চলল, চেয়ে দ্যাখ!

কুসুম চোখ পাকাইয়া বলে, গাল দিয়ো না বলছি অত করে, দিয়ো না। আমপাতা দেখছ না হাতে? কাঠ থেকে যদি দীপ জ্বালব, পাতা নিয়ে যাচ্ছি কী চিবিয়ে খাব বলে নাকি?

মোক্ষদা গলা নামাইয়া বলে, গাল তোমায় আমি দিইনি বাছা—দিয়েছি বুঁচিকে।

কুসুমকে এ বাড়ির সকলে ভয় করে। এই বাস্তুভিটাটুকু ছাড়া হারু ঘোষের সর্বস্ব কুসুমের বাবার কাছে আজ বাঁধা আছে সাত বচ্ছর। একবার গিয়া কাঁদিয়া পড়িলেই সে দিবে নালিশ ঠুকিয়া, এরা সব তখন যাইবে কোথায়? তাই বলিয়া কুসুম যে সবসময় বাড়ির লোকগুলিকে শাসন করিয়া বেড়ায়, তা নয়। বরং সে অনেকটা নিরীহ সাজিয়াই থাকে। বকাবকি করিলে সবসময় কানেও তোলে না, নিজের মনে ঘরের কাজ করিয়া যায়। কাজ করিতে ভালো না লাগিলে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া তালবনে তালপুকুরের ধারে ভূপতিত তালগাছটার গুঁড়িতে চুপচাপ বসিয়া থাকে।

উনানে ডাল ভাত একটা কিছু চাপাইয়াই হয়তো যায়। বাড়ির লোকে তাহার অনুপস্থিতি টের পায় পোড়া গন্ধে।

মেজাজের কেহ তার হদিস পায় না। কতখানি সে সহ্য করিবে, কখন রাগিয়া উঠিবে, আজ পর্যন্ত তাহা ঠিকমতো বুঝিতে না পারিয়া সকলে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

পাড়ার লোক বলে, বউ তোমাদের যেন একটু পাগলাটে, না গো পরানের মা?

মোক্ষদা বলে, একটু কেন মা, বেশ পাগল,—পাগলের বংশ যে। ওর বাপ ছিল না পাগলা হয়ে দুবচ্ছর,—শেকল দিয়ে বেঁধে রাখত?

ঘরে ঢুকিয়া কুসুম প্রদীপ জ্বালিল। গাল ফুলাইয়া সবে সে শাঁখে তিনবার ফুঁ দেওয়া শেষ করিয়াছে, উঠানে শোনা গেল শশীর গলা।

বিছানার কাছে গিয়া কুসুম বলিল, সন্ধে হতে না হতে খোঁজ নিতে এসেছে মতি।

মতি কোনো জবাব দিল না। কুসুম আবার বলিল, ওলো মতি, শুনছিস? সন্ধেদীপ জ্বালতে না জ্বালতে দেখতে এসেছে,—দরদ কত!

ভারী জলচৌকিটা অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইয়া গিয়া সে দাওয়ায় পাতিয়া দিল। বলিল, জ্বর কমেছে, ঘুমোচ্ছে এখন।

মোক্ষদা বলিল, মতি আবার ঘুমোল কখন বউ? এই মাত্তর সাড়া পেলাম যে?

শশী বলিল, তোমার শাঁখের শব্দেও মতির ঘুম ভাঙল না পরানের বউ?—সে জলচৌকিতে বসিল, ঘরের ভিতরে এক নজর চাহিয়া বলিল, পরান বিকেলে গিয়ে বলে এল জ্বর নাকি এ বেলা খুব বেড়েছে?

কুসুম বলিল, মিথ্যে বলেছে ছোটোবাবু,—একটুতে অস্থির তো? জ্বর কই?

মোক্ষদা বলিল, কী সব বলছ তুমি আবোল-তাবোল, যাও না বাছা রান্নাঘরে।

কুসুম বিনা প্রতিবাদে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। মুখে কৌতুকের হাসি নাই, গাম্ভীর্যও নাই।

শশী বলিল, সকালে যে ওষুধ পাঠিয়েছিলাম, খাওয়ানো হয়নি?

মোক্ষদা বলিল, তা তো জানি না বাবা, দেখি শুধোই মেয়েকে।

রান্নাঘর হইতে কুসুম বলিল, ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে গো, হয়েছে। চেঁচামেচি করে মেয়েটার ঘুম ভাঙাচ্ছ কেন?

ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে মতি বলিল, আমি ওষুধ খাইনি মা।

মোক্ষদা চোখ পাকাইয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, শুনলে বাবা, দিব্যি কেমন মিথ্যে কথাগুলি বলে গেল বউ, শুনলে?

শশী একটু হাসিল, কিছু বলিল না। কুসুমের এ রকম সরল মিথ্যাভাষণ সে মাঝে মাঝে লক্ষ করিয়াছে। ধরা পড়িবে জানিয়া শুনিয়াই সে যেন এই মিথ্যা কথাগুলি বলে। এ যেন তাহার এক ধরনের পরিহাস। কালোকে সাদা বলিয়া আড়ালে গিয়া সে হাসে।

ঘরে গিয়া শশী মতিকে জিজ্ঞাসা করিল, কী কষ্ট হচ্ছে রে মতি?

মতি তাহা জানে না। সে আন্দাজে বলিল, গা ব্যথা কচ্ছে ছোটোবাবু, তেষ্টা পেয়েছে।

পিসিকে শান্ত করিয়া বুঁচি আসিয়াছিল, বলিল, আজ বড়ো কেশেছে ছোটোবাবু সারাদিন।

কানে নল লাগাইয়া শশী মতির বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। এ পরীক্ষায় মতির বড়ো লজ্জা করে, বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করিতে থাকে। স্টেথোস্কোপের নল বাহিয়া তাহা শশীর কানে পৌঁছায়, সে অবাক হইয়া বলে, নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে তোকে কে বলেছে মতি, জোরে জোরে নিশ্বাস নে!—বুঁচি আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়াছে, শশী মতির মুখের দিকে তাকায়।

ভাঙা লণ্ঠনের রাঙা আলোতে মতির রং যেন মিশিয়া গিয়াছে।

নিঃশব্দ পদে কুসুম যে কখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

বুকে ওর হয়েছে কী? অত পরীক্ষে কীসের?

একটু সর্দি বসেছে বলে মনে হচ্ছে পরানের বউ। গরম তেল মালিশ করে দিও।

কুসুম ভীরুকণ্ঠে বলে, সর্দি ঠিক তো ছোটোবাবু? পরীক্ষের রকম দেখে ভয়ে বুকে কাঁপন নেগেছে মা, ক্ষয় রোগেই বা ধরল।—ওলো মতি, বলিনি তোকে? বলিনি জ্বরগায়ে হাওয়ায় গিয়ে বসিস নে, ঠান্ডা লেগে মরবি?

শশী বাহিরে গিয়া একটু বসে। মোক্ষদা তখন সবিস্তারে তাহাকে শোনায তাহার আছাড় খাওয়ার বৃত্তান্ত। বলে, বউ আমাকে ঠেলে দিয়েছে বাবা, বউ নিয়ে হয়েছে আমার মরণ।—নিচু গলায় আবোলতাবোল অনেকক্ষণ মোক্ষদা বকে। হারু আজ মরিয়াছে দিন সাতেক, তার কথা উল্লেখ করিয়া সে এখন আর সুর করিয়া কাঁদে না, বারবার শুধু চোখ মোছে গলাটা ধরিয়া আসে : স্বামীর শোকে ভিজিয়া আসা গলায় থাকিয়া থাকিয়া নিন্দা করে সে কুসুমের,—শুনিয়া মনে হয় সবই বুঝি সত্য বলিতেছে। বুঁচি চুপ করিয়া শোনে, কথাটি বলে না, না দেয় সায়, না করে প্রতিবাদ। আর রান্নাঘরে শশীকে শোনাইযা কুসুম করে যাত্রার দলের গান, টানা গুনগুনানো সুরে, অস্পষ্ট, ভীরু গলায়। সত্যসত্যই পাগল নাকি কুসুম?

তারপর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কুসুম কোথায় যায় কে বলিবে।

শশী খানিক পরে বিদায় নেয়। হারুর বাড়ি কায়েতপাড়ার পথটার ঠিক উপরে নয়, দুপাশে বেগুনখেতের মাঝখান দিয়া হাত তিনেক চওড়া খানিকটা পথ পার হইয়া রাস্তায় পড়িতে হয়।

শশী তাড়াতাড়ি এই পথটুকু পার হইয়া যাইতেছিল, ডাইনে বেগুনখেতের বেড়ার ওপাশ হইতে কুসুম বলিল, ছোটোবাবু শুনুন!

শশী অবাক হইয়া বলিল, তুমি ওখানে কী করছ বউ? সাপে কামড়াবে যে?

কুসুম বলিল, সাপে আমাকে কামড়াবে না ছোটোবাবু, আমার অদেষ্টে মরণ নেই।

শশী হাসিয়া বলিল, কী আবার হল তোমার?

পরানের বউ বলে যে ডাকলেন আজ? পরানের বউ বললে আমার গোসা হয় ছোটোবাবু। পিসি বলত,—বুঁচির ছোটো পিসি, ও বছর যে সগ্যে গেল, এমনি গাল তাকে একদিন দিলাম—

আমাকেও না হয় দাও দুটো গাল।

তাই বললাম? হাঁ ছোটোবাবু, তাই বললাম? পূজ্য মানুষ আপনি, আপনাকে পুজো করে আমাদের পুণ্যি হয়—

গড়গড় করিয়া মুখস্থ বুলির মতো একরাশ তোষামোদের কথা কুসুম বলিয়া যায়, শুনিতে মন্দ লাগে না শশীর। কত বছর আজ সে কুসুমের এমনি পাগলামি দেখিতেছে। ওর এই সব খাপছাড়া কথায় ব্যবহারে একটি যেন মিষ্টি ছন্দ আছে।

বাড়ি যাও বউ, ভাত পোড়া লাগবে।

কাল আসবেন ছোটোবাবু, মতিকে দেখতে?

আসব। কেমন থাকে সকালে একবার খবর পাঠিয়ো, অ্যাঁ?

রোজ একবার এলেই হয়! জ্বরে ভুগছে মেয়েটা, দেখে তো যাওয়া উচিত? কদিন আসেননি বলে বাড়ির সবাই কত কথা বললে ছোটোবাবু, বললে, শশী আমাদের মস্ত ডাক্তার হয়েছে, না ডাকলে আর আসা হয় না। মতি কী বললে জানেন?—ছোটোবাবুর অহংকার হয়েছে!

শশী আগাইয়া যায়, বলে আমার কাজ আছে বউ, কাল এসে তোমার মিছে কথা শুনব।

মিছে কথা নয়, সত্যি মিছে নয় ছোটোবাবু!

শশী চলিয়া গেলে অন্ধকারে বেগুনখেতে দাঁড়াইয়া কুসুম একটু হাসিল। সামনে গাছের মাথার কাছে একটু আলো হইয়াছে। কুসুম জানে ওখানে চাঁদ উঠিবে। চাঁদ উঠিলে, চাঁদ উঠিবার আভাস দেখিলে কুসুম যেন শুনিতে পায়

ভিনদেশি পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম্ যৌবন।

কে সে কিশোরী, ভিনদেশি পুরুষ দেখিয়া যার লজ্জাতুর প্রেম জাগিত? সে কুসুম নয়, হে ভগবান, সে কুসুম নয়।

অন্ধকারে ঠাহর করিয়া দেখিয়া বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বলে, শশী না? ও বাবা শশী, তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি যে! ভুতো যেন কেমন করছে শশী। ওর মা কাঁদা-কাটা লাগিয়েছেন। তুমি এসে একটিবার দেখে যাও।

শশী বলে, চলুন। চলিতে আরম্ভ করিয়া বলে, বাবা বলেছিলেন, কতবার তো বাঁড়ুয্যে বাড়ি গেলি শশী, পয়সা-কড়ি দিয়েছে কিছু? দুটো একটা কলের টাকা না দিলে তো বিপদে পড়ি কাকা? কত মিথ্যে বলব বাবার কাছে? পয়সা-কড়ির ব্যাপার জানেন তো বাবার, একটি পয়সা এদিকে ওদিকে হবার যো নেই।

বাসুদেব লজ্জা পাইয়া বলেন, শশীর টাকা কালই পৌঁছিয়া দিয়া আসিবেন শশীর বাড়িতে, নিজে যাইবেন। শশী ভাবে, আজ নয় কেন? মুখে সে কিছু বলে না। বাসুদেবের বাড়ি কম দূর নয়। শ্রীনাথের দোকান ছাড়াইয়া রজনী সরকারের পাকা দালানের পাশ দিয়া বামুনপাড়া পর্যন্ত গড়ানো সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথের মাঝখান হইতে দক্ষিণ দিকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া পায়ে চলা যে সংকীর্ণ রাস্তাটুকু পোয়াটেক গিয়া মাঠের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে, তার শেষাশেষি। কদিন বৃষ্টি হয় নাই, এ বছরের মতো বর্ষা বোধ হয় শেষ হইয়াছে, পথের কাদা কিন্তু শুকায় নাই। জুতা হাতে করিয়া বাসুদেবের বাড়ি পৌঁছিয়া শশী পা ধুইল। বাসুদেবের ছোটো ছেলে ভুতোর বয়স বছর দশেক, সাত-আট দিন আগে গাছের মগডাল হইতে পড়িয়া গিয়া হাত-পা দুই ভাঙিয়াছিল। তারপর জ্বরে বিকারে অজ্ঞান হইয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। শশী তাহাকে সদর হাসপাতালে পাঠাইতে বলিয়াছিল, এরা রাজি হয় নাই। হাসপাতালের নামে ভুতোর মা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, ছেলেকে চৌকাটের বাহিরে নিলে সে বিষ খাইয়া মরিবে। তারপর শশীই প্রাণপণে ভুতোর চিকিৎসা করিতেছে, দিনে দুবার তিনবার আসে।

ভুতোর শিয়রে তার মা লক্ষ্মীমণি মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিলেন। বড়ো দুটি ছেলে, দুটি বিবাহিতা মেয়ে, তিনটি বউ ঘরের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বড়ো বউটি বিধবা, ঘোমটা দিয়া ভুতোকে সে বাতাস করিতেছিল। মায়ের পরে এ বাড়িতে দুরন্ত ছেলেটাকে সেই হয়তো ভালোবাসে সকলের চেয়ে বেশি,—দুচোখ দিয়া তাহার দরদর করিয়া জল পড়িতেছে।

ভুতোর অবস্থা দেখিয়া শশীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। ছেলেটা বাঁচিবে না এ সন্দেহ তাহার ছিল ; তবু দুপুরবেলা ওকে দেখিয়া গিয়া একটু আশা তাহার হইয়াছিল বইকী। এক বেলায় অবস্থাটা যে এ রকম দাঁড়াইবে সে তাহা ভাবিতেও পারে নাই। ছেলেটার সর্বাঙ্গে সে জড়াইয়া জড়াইয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়াছিল। নড়িবার উপায় তাহার নাই, এখন থাকিয়া থাকিয়া মুখটা শুধু বিকৃত করিতেছে। শশীর গলা এমনই মৃদু, এখন আরও মৃদু শোনাইল—একটু আগুন চাই সেঁক দেবার—গরম কাপড় যদি এক টুকরো থাকে?

বিধবা বউটি মালসায় আগুন আনিল। একটা আলোয়ান ভাঁজ করিয়া শশীর নির্দেশ মতো ভুতোর বুকে সেঁক দিতে লাগিল। শশী তাহাকে একটা ইনজেকশন দিয়া একটু অপেক্ষা করিল। বারবার চোখের ভিতরটা লক্ষ করিয়া দেখিল, নাড়ি টিপিল, তার পর নীরবে উঠিয়া আসিল। সকলে এতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া ছিল, শশীর উঠিয়া আসার ইঙ্গিতে ঘরে তাহাদের সমবেত কান্না একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

বিধবা বউটি পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া শশীর পথ রোধ করিয়া বলিল, না, তুমি যেতে পাবে না শশী, আমার ভুতোকে বাঁচিয়ে যাও! যাও আমার ভুতোকে বাঁচিয়ে! ও যে আমার জন্যে জাম আনতে গাছে উঠেছিল শশী!

শশী কী বলিবে? সে গম্ভীর হইয়া থাকে। তারপর পথ পাইলে বাহির হইয়া যায়। জুতা হাতে করিয়া সে নামিয়া যায় পথে। পায়ে-চলা পথটির শেষেও সে কান্নার শব্দ শুনিতে পায়।

শ্রীনাথ দাসের মুদি দোকানের সামনে বাঁশের বাতার তৈরি বেঞ্চিতে বসিয়া কয়েকজন জটলা করিতেছিল। বোধ হয় গল্পে মশগুল থাকায় বাসুদেবের সঙ্গে যাওয়ার সময় শশীকে তাহারা দেখিতে পায় নাই। এবার শ্রীনাথ দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিল, একটু বসে যান ছোটোবাবু,—টুলটা ছাড় দেখি নিয়োগীমশায়, ছোটোবাবুকে বসতে দাও।

পঞ্চানন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিল, কোথা গিয়েছিলে শশী?

শশী বলিল, বাসুদেব বাঁড়ুয্যের বাড়ি, ভুতো এইমাত্র মারা গেল।

বটে? বাঁচল না বুঝি ছেলেটা? তবে তোমাকে বলি শোন শশী, ভুতো যেদিন পড়ল আছাড় খেয়ে, দিনটা ছিল বিষ্যুদবার। খবর পেয়ে মনে কেমন খটকা বাধল। বাড়ি গিয়ে দেখলাম পাঁজি,—যা ভেবেছিলাম। ছেলেটাও পড়েছে—বারবেলাও হয়েছে খতম! লোকে বলে বারবেলা, বারবেলা কি সবটাই সর্বনেশে বাপু? বিপদ যত ওই খতম হবার বেলা। বারবেলা যখন ছাড়ছে, পায়ে কাঁটাটি ফুটলে দুনিয়ে উঠে অক্কা পাইয়ে দেবে।—নবীন জেলের বড়ো ছেলেটাকে সেবার কুমিরে নিলে, সেদিনও বিষ্যুদবার, সেবারও ছেলেটা খালে নামল বারবেলাও অমনি ছেড়ে গেল—গাওদিয়ার খালে নইলে কুমির আসে?

খালের কুমির শুধু নয়, ভুতোর কথায় ভূতের কথাও আসিয়া পড়িল। তারপর বাজারের সন্ন্যাসী, বাজার দর, একাল সেকালের পার্থক্য, নারী হরণ, পূর্ণ তালুকদারের মেয়ের কলঙ্ক, বিদেশবাসী গাঁয়ের বড়ো চাকুরে সৃজন দাস, এই সব আলোচনা। শশী কি এত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে যে এই সব গ্রাম্য প্রসঙ্গে তাহার মন বসিল না, শান্ত অবহেলার সঙ্গে নীরবে শুনিয়া গেল? তা তো নয়। শুধু আধখানা মন দিয়া সে ভাবিতেছিল, এতগুলি মানুষের মনে মনে কী আশ্চর্য মিল। কারও স্বাতন্ত্র্য নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি এক সুরে বাঁধা। সুখদুঃখ এক, রসানুভূতি এক, ভয় ও কুসংস্কার এক, হীনতা ও উদারতার হিসাবে কেউ কারও চেয়ে এতটুকু ছোটো অথবা বড়ো নয়। পঞ্চানন জমিদার সরকারের মুহুরি, কীর্তি নিয়োগী পেনশনপ্রাপ্ত হেড পিওন, শিবনারায়ণ গাঁয়ের বাংলা স্কুলের মাস্টার, গুরুগতির চাষ আবাদ—ব্যাবসা ইহাদের পৃথক,—মনগুলি এক ধাঁচে গড়িয়া

উঠিল কী করিয়া? স্বতন্ত্র মনে হয় শুধু ভুজঙ্গধরকে, বাজিতপুরে সে ছিল এক উকিলের মুহুরি, টাকার গোলমালে দুবছর জেল খাটিয়া আসিয়াছে। বেশি কথা ভুজঙ্গধর বলে না, ছোটো ছোটো কুটিল চোখের চাহনি চঞ্চল ভাবে এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, মনে হয় কী যেন সে মতলব আঁটিতেছে, গোপন ও গভীর। কীর্তি নিয়োগীর মাথা জুড়িয়া চকচকে টাক, একদিন পিওনের হলদে পাগড়িতে ঢাকা থাকিত, এখন টাকের উপর আলুর মতো বড়ো আবটি দেখিয়া হাসি পায়। ইহার প্রতি শ্রীনাথের শ্রদ্ধা গভীব, কেন সে কথা কেহ জানে না। কীর্তির কথাগুলি শ্রীনাথ যেন গিলিতে থাকে। কীর্তি একটি পয়সা বাহির করিয়া বলে, ও ছিনাথ, সাবু দিয়ো দিকি এক পয়সার।—শ্রীনাথ এক পয়সায় যতটা সাগু কাগজে মুড়িয়া তাহাকে দেয় তাহা দেখিয়া সকলে যেন ঈর্ষা বোধ করে, ভুজঙ্গধরের সাপের মতো চোখ দুটিতে কয়েকবার পলক পড়ে না। উপরে ঝোলানো কেরাসিনের আলোটাতে শ্রীনাথের দোকানে আলো মন্দ হয় না, দোকানের সাজানো জিনিসগুলিতে যেন একটি লক্ষ্মীশ্রী ছড়ানো থাকে। ছোটো ছোটো চৌকো কাঠেব খোপে চাল ডাল, একটা ময়দার বস্তা, বারকোশে বসানো তেলেব গাদ মাখা পাত্র, মুড়িমুড়কিব দুটি জালা, হরিণেব ছবি আঁটা দেশলাই-এর প্যাক, একদিকে কাচ বসানো হলদে টিনে সাগু বার্লি, গোল গোল লজেঞ্জ,—ভুজঙ্গধর চারিদিকে চোখ বুলায,—শ্রীনাথেব বসিবার ও পয়সা রাখিবাব চৌকো ছোটো চৌকিটি ভালো করিয়া দেখিবার ভূমিকাব মতো। সামনে পথ দিয়া আলো হাতে কেহ হাঁটিয়া যায়, কেহ যায় বিনা আলোতে, শ্রীনাথের একটি দুটি খদ্দের আসে। উপস্থিত একজন খদ্দেরকে সে ভুতোর মৃত্যু-সংবাদ শোনায়।—না, যে বিষয়েই আলোচনা চলুক ভুতোব কথাটা তাহাবা ভোলে নাই।

শশী উঠি-উঠি কবিতেছিল, এমন সময় সকলকে অল্পবিস্তব অবাক করিয়া এক হাতে ক্যাম্বিশের ব্যাগ, এক হাতে লাঠি, বগলে ছাতি, পায়ে চটি, গায়ে উড়ানি যাদব পণ্ডিত পথ হইতে শ্রীনাথের দোকানেব সামনে উঠিয়া আসিলেন। মানুষটা বুড়া, শরীরটা শীর্ণ, কিন্তু হাড় কখানা মজবুত।

বিদ্যা যাদবেব বেশি নয়, পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিও তাহার নাই, ধার্মিক ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিযাই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গৃহস্থ যোগী তিনি, সংসারী সাধক। স্পর্শ করিবার অধিকাব যাহাদের আছে দেখা হইলে পায়ের ধুলা নেয়, অপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। সাধনপথের কতগুলি স্তর যাদব অতিক্রম কবিযাছেন, কেহ জানে না, ভক্তি যাদের উচ্ছ্বসিত তারা সোজাসুজি সিদ্ধিলাভের কথাটাই বলে। যাদব নিজে কিছু স্বীকার করেন না, প্রতিবাদও করেন না। কায়েতপাড়ার পথের ধারে, যামিনী কবিরাজের বাড়ি ও শশীদের বাড়ির মাঝামাঝি একটি ছোটো একতলা বাড়িতে যাদব বাস করেন। এত পুরাতন, এমন জীর্ণ বাড়ি এ অঞ্চলে আর নাই। বাড়ির খানিকটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এককালে চারিদিকে বোধ হয় প্রাচীর ছিল। এখন ছড়ানো পড়িয়া আছে শ্যাওলা ধরা কালো কালো ইট। যাদব বাস না করিলে বাড়িটা অনেকদিন আগেই ভূতের বাড়ি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিত। স্ত্রী ছাড়া সংসারে যাদবের কেহ নাই। পাগলাটে স্বভাবের জন্য গ্রামের ছেলে বুড়ো যাদবের স্ত্রীকে পাগলদিদি বলিয়া ডাকে।

কয়েক দিন আগে যাদব কলিকাতায় গিয়াছিলেন। আজ তাঁহার ফিরিবাব কথা নয়। সকলে শশব্যস্তে প্রণাম করিয়া বসিতে দিল। পঞ্চানন জিজ্ঞাসা করিল, হঠাৎ ফিরে এলেন পণ্ডিত মশায়?

যাদব বলিলেন, গেঁয়ো মানুষ, শহরে মন টিকল না বাবা।

শ্রীনাথ উচ্ছ্বসিত ভাবে বলিল, আপনারও মন টেঁকাটেঁকি দেবতা!

এ কথায় যাদব হাসিলেন। উচ্ছ্বসিত ভক্তিকে গ্রহণ করবার পদ্ধতি তাঁহার এই। একে একে সকলের তিনি কুশল প্রশ্ন করিলেন। ভুতোর মৃত্যু-সংবাদে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা! কিন্তু বিশেষ বিচলিত হইলেন না। জীবন-মরণ যাঁহার নিকট সমান, দুরন্ত একটা বালকের মৃত্যুতে বিচলিত হওয়ার

কথাও তাঁর নয়। তবু শশীর মনে হইল, সাধারণভাবে আরও একটু ব্যথিত হওয়া যাদবের যেন উচিত ছিল। কানে না শুনিতে পান, একটা পরিবারে এখন যে বুকভাঙা হাহাকার উঠিয়াছে, যাদবের কি সে কল্পনা নাই? মিনিট দশেক বসিয়া যাদব উঠিলেন। বলিলেন, যাবে না কি শশী বাড়ির দিকে?

শশী বলিল, চলুন।

লাঠি ঠুকিয়া যাদব পথ চলেন। শশী জানে এত জোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জন্য। মরিতে যাদব কি ভয় পান,—জীবন-মৃত্যু যাঁর কাছে সমান হইয়া গিয়াছে? অথবা শুধু সাপের কামড়ে মরিতে তাঁর ভয়?

চলিতে চলিতে যাদব বলিলেন, তুমি তো ডাক্তার মানুষ শশী, চরক সুশ্রুত ছেড়ে বিলাতি বিদ্যে ধরেছ, কেটে ছিঁড়ে গা ফুঁড়ে মরা মানুষ বাঁচাও,—ব্যাপারটা কী বল দেখি তোমাদের? সত্যি সত্যি কিছু আছে না কি তোমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে?

শশী বলিল, আজ্ঞে আছে বইকী পণ্ডিত মশায়,—কারও একার খেয়ালে তো ডাক্তারি শাস্ত্র হয়নি। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক সারা জীবন পরীক্ষা করে করে সব আবিষ্কার করেছেন, নইলে জগৎ সুদ্ধ লোক—

যাদব বলিলেন, সূর্যবিজ্ঞান না জানা সব বৈজ্ঞানিক তো? আদি জ্ঞান যার নেই পরবর্তী জ্ঞান সে পাবে কোথায় শশী? যেমন তোমরা সব একালের ডাক্তার, তেমনি সব কবিরাজ—দৃষ্টিহীন অন্ধ সব। গাছের পাতার রস নিংড়ে ওষুধ করলে, গাছের পাতায় ওষুধের গুণ এল কোথা থেকে? সূর্যবিজ্ঞান যে জানে সে শেকড়-পাতা খোঁজে না শশী, একখানি আতশি কাচের জোরে সূর্যরশ্মিকে তেজস্কর ওষুধে পরিণত করে রোগীর দেহে নিক্ষেপ করে,—মুহূর্তে নিরাময়। মোটা মোটা বই পড়ে ছুরি কাঁচি চালাতে শিখে কী হয়?

মনে মনে শশী রাগে। গ্রাম্য মনের অপরিত্যাজ্য সংস্কারে সেও যাদবকে ভক্তি কম করে না, তাই সায় না দিলেও তর্ক সে করিতে পারে না। বাড়ির সামনে আসিয়া যাদব বলেন, কলকাতা থেকে আঙুর এনেছি, দুটি খেয়ে যাও শশী—মুখে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেও শশীকে যাদব কী স্নেহ করেন, স্নেহ ও বিদ্বেষ যার কাছে সমান? শশী বলিতে পারে না আঙুর খাওয়ার শখ তাহার নাই। যাদবের সঙ্গে ভিতরে যায়।

ডাইনে বাড়ির ভাঙা অংশের স্তূপ, তার পিছনে সাহাদের দশ বছরের পরিত্যক্ত ভিটা। ভারী কাষ্ঠের জীর্ণ কপাটে যাদব লাঠি ঠোকেন। ভিতর হইতে সাড়া লইয়া পাগলদিদি দরজা খুলিয়া বলেন, আজ ফিরলে কেন গো? শশী এয়েছ না কি সাথে? এসো, ভেতরে এসো।

মুখে একটাও দাঁত নাই, তোবড়ানো গাল, পাকা চুল,—পাগলদিদিকে যাদবের চেয়েও বুড়া দেখায়। পিঠটাও পাগলদিদির একটু বাঁকিয়া গিয়াছে। তবু, শীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহে ক্ষীণ প্রাণটুকু লইয়া পাগলদিদি ফোকলা মুখে অনবরত হাসেন,—এই ভাঙা বাড়ি, ডোবাজঙ্গল ভরা এই গাওদিয়া গ্রাম, এখানে তাহার বার্ধক্যপীড়িত জীবন, সব যেন কৌতুকময়—ঘনানো মৃত্যুর স্বাদে পাগলদিদি কৌতুকময়ী।

শশী বসিলে চিবুক ধরিয়া বলেন, বড়োকর্তা কদিন বাড়ি ছিল না জানতে না বুঝি ছোটোকর্তা? এলে না কেন গো? ডুরে শাড়িটি পরে, চুলটি বেঁধে বউটি সেজে যে বসেছিলাম তোমার জন্যে?

আঙুরগুলি যাদব ব্যাগে ভরিয়া আনিয়াছেন। বাহির করিয়া দেখা গেল, চাপ লাগিয়া অর্ধেক ফল গলিয়া গিয়াছে। ব্যাগে একটি জামা, দুখানা কাপড়, গামছা এই সব ছিল, আঙুরের রসে সব ভিজিয়া গিয়াছে। যাদব অপ্রতিভ হইয়া হাসেন। পাগলদিদি বলেন, দ্যাখো দাদা বুড়োর বুদ্ধি, ব্যাগে

ভরে ফল এনেছেন! কেন, গামছাখানা খুলে বেঁধে আনতে পারলে না?—পাগলদিদিও হাসেন, মুখের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া হাজার রেখার সৃষ্টি হইয়া যায়। আঙুর খাইতে খাইতে শশী পাগলদিদির মুখখানা নীরবে দেখিতে থাকে। রেখাগুলিকে তাহার মনে হয় কালের অঙ্কিত চিহ্ন—সাংকেতিক ইতিহাস। কী জীবন ছিল পাগলদিদির যৌবনে? শশী তখন জন্মে নাই। ন্যুব্জ বিশীর্ণ দেহটি যখন সুঠাম ছিল, মুখের টান করা ত্বকে যখন লাবণ্য ছিল, কেমন ছিল তখন পাগলদিদি—মুখের রেখায় আজ কি তাহা সে পড়িতে পারিবে?

গুছানো সংসার পাগলদিদির। উপুড় করা বাসনগুলি সাজানো, হাঁড়ি-কলসির মুখগুলি ঢাকা, আমকাঠের সিন্দুকটার গায়ে ধৌত পরিচ্ছন্নতা, পিলসুজে দীপটির শিখা উজ্জ্বল। ঘরে এখনও ধূপের মৃদু গন্ধ আছে। আর শান্ত—সব এখানে শান্ত। মৃদু মোলায়েম প্রশান্তি ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এ ঘরের আবহাওয়ার অমায়িকতা যেন নিশ্বাসে গ্রহণ করা যায়। ভাঙা হাটে যে বিষণ্ণ স্তব্ধতা ঘনাইয়া থাকে, এ তা নয়। এ ঘরে বহু যুগ ধরিয়া যেন মানুষের জ্বালা-করা বেদনার হল্লা প্রবেশ করে নাই। এ ঘরে জীবন লইয়া কেহ যেন কোনোদিন হইচই করিয়া বাঁচে নাই,—আজীবন শুধু ঘুমাইয়া এ ঘরকে কে যেন ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। বড়ো ভালো লাগে শশীর। সে তো ডাক্তার, আহত ও রুগ্‌ণের সঙ্গে তার সারাদিনের কারবার,—দিন ভরিয়া তাহার শুধু মাটি-ছোঁয়া বাস্তবতা,—শ্রান্ত মনে সন্ধ্যার জনহীন মন্দিরে বসার মতো বুড়োবুড়ির এই নীড়ে সে শান্তি বোধ করে। শুধু আজ নয়, এখানে আসিলেই তাহার মন যেন জুড়াইয়া যায়। অথচ আশ্চর্য এই, এই ঘরখানার এতটুকু আকর্ষণ বাহিরে সে বোধ করে না। এখানে না আসিলে সে তো বুঝিতে পারে না মনে তাহার জ্বালা বা অসন্তোষ আছে। এখানে আসিয়া যে সন্তাপ তাহার ধীরে ধীরে জুড়াইয়া আসে, এই ঘরের বাহিরে তাহার দিন সপ্তাহ মাসব্যাপী জীবনে তাহা এমনভাবে খাপ খাইয়া মিশিয়া থাকে যে, সন্তাপ সে টেরও পায় না।

তিন

মতির জন্য পাত্র দেখিতে গিয়া খালের ধারে বটগাছের তলে হারু ঘোষ অপঘাতে প্রাণ দিয়াছিল। গ্রামে কি মতির পাত্র মিলিত না? হারুর ছিল উচ্চ আশা। ছেলেবেলা হারু স্কুলে পড়িয়াছিল, বড়ো হইয়া হারু বড়োলোক হইয়াছিল। তারপর গরিব হইয়া পড়িলেও মনটা হারুর বিশেষ বদলায় নাই। গাওদিয়ার গোপ-সমাজ পরিহাস করিয়া তাহাকে বলিত ভদ্দরলোক। বিশেষ করিয়া বলিত নিতাই। নিতাইয়ের অবস্থা ভালো, চালচলনও তাহার অনেকটা ভদ্রলোকের মতো, তবু হারু তো তাহাকে খাতির করিত না। নিতাইয়ের এক ভাগনে আছে, তার নাম সুদেব। সুদেবের ঘরবাড়ি জমিজমা আছে, পেটে ইংরেজি বাংলা বিদ্যাও কিছু আছে, বয়সটা কেবল একটু বেশি, প্রায় ছত্রিশ। সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহ দিবার কত চেষ্টাই যে নিতাই করিয়াছিল বলিবার নয়। হারু রাজি হয় নাই। বাজিতপুরে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ পাত্রটি দেখিতে গিয়া তাই না অকালে হারু স্বর্গে গেল।

হারু নাই, হারুর ছেলে পরান বাপের মতো চালাকও নয়, গোঁয়ারও নয়। গাওদিয়ার গোপ-সমাজ মতির বিবাহের জন্য আবার একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরানকে তাহারা অনেক কথা বুঝায়। বলে, গাঁয়ের মেয়ে গাঁয়ে থাকাই তো ঠিক। জানাশোনা ঘরে দিলে মেয়ে সুখে থাকিবে। দুধ-বেচা গোপের ঘরেও তো বোনকে দিবার কথা তাহারা বলিতেছে না, সুদেবের ঘর তো বনেদি ঘরের মতো। কেন দোমনা হচ্ছিস বল তো পরান? বাজিতপুরের ছেলেটা তো ফসকে গেছে।

সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহ? রসালো ফলের মতো অমন কোমল রং যে মতির, প্রতিমার মতো অমন নিখুঁত মুখ? প্রস্তাবটা পরানের পছন্দ হয় না। কিন্তু অত লোকের কাছে স্পষ্ট না বলিবার মতো

মনের জোরও তাহার নাই। নিমরাজি হইয়া সে বলিয়াছে, বাড়িতে আর শশীর মত থাকিলে সে আপত্তি করিবে না।

শশীর মতামতের প্রশ্নটা তাহারা পছন্দ করে নাই। নিতাই হাসিয়া বলিয়াছে, ছোটোবাবু লোক ভালো। কিন্তু নিজের সমাজে হিতৈষী গণ্যমান্য লোক থাকতে ছোটোবাবুকে মুরুব্বি ঠাওরালে পরান? ঘরের কথায় পরকে ডাকলে?

আর একজন বলিয়াছে, ছোটোবাবু হরদম আসেন যান, না বটে?

এ কথাটা পছন্দ করে নাই পরান! দুপক্ষের অপছন্দ শেষ পর্যন্ত কীসে গিয়া ঠেকিত বলা যায় না। কিন্তু হারুর আকস্মিক মৃত্যুর পর পরান বড়ো দমিয়া গিয়াছিল। কলহ না করিয়া বাড়িতে অসুখের ছুতা দিয়া সে উঠিয়া আসিয়াছে।

মতির জ্বর কিন্তু কমিয়া গিয়াছে। বর্ষার গোড়ার দিকে তাহাকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছিল,—কয়েক দিন ভালো থাকিয়াছে, আবার কাঁপিতে কাঁপিতে পড়িয়াছে জ্বরে। শশীর দামি কুইনাইন জ্বরটা একেবারে ঠেকাইতে পারে নাই। এবার গা ফুঁড়িয়া কয়েকবার তাহাকে ওষুধ দিয়া শশী আশ্বাস দিয়াছে, আর জ্বর হইবে না। জ্বরে ভুগিয়া মতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে মনে হয় না। ম্যালেরিয়া ধরিবার আগে হঠাৎ সে মোটা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাঝে মাঝে জ্বরে পড়িয়া এটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মতির সুন্দর গড়নটি চর্বিতে ঢাকিয়া গেলে বড়ো আপশোশের কথা হইত।

এখনও প্রতি সপ্তাহে মতিকে শশী একটা করিয়া ইনজেকশন দেয়। সকালে বাড়িতে যে কজন রোগী আসে তাদের ব্যবস্থা করিয়া, কালো ব্যাগটি হাতে করিয়া সে যখন হারু ঘোষের বাড়ি যায়, হয়তো তখন বেলা হইয়াছে, সমস্ত উঠান ভরিয়া গিয়াছে রোদে। মতির ভীত শুকনো মুখ দেখিয়া শশী হাসিয়া বলে, এতবার দিলাম এখনও তোর ভয় গেল না মতি? কোন হাতে নিবি আজ? স্পিরিট দিয়া ঘষিলে মতির বাহুতে ময়লা ওঠে। শশী বলে, বড়ো নোংরা তুই মতি,—গায়ে সাবান দিতে পারিস না?

ইনজেকশন দিয়া শশী দাওয়ায় বসে। পরান বলে, একটা পরামর্শ আছে ছোটোবাবু। বিষয়টা মতির বিবাহ-সংক্রান্ত শুনিয়া শশী জাঁকিয়া বসিয়া একটা বিড়ি ধরায়। ছেলের ইশারায় মোক্ষদা সরিয়া আসে কাছে। বুঁচিও আসিয়া ছেলে কোলে কাছে দাঁড়ায়।

কুসুমকে দেখিতে না পাইয়া শশী মনে মনে আশ্চর্য হয়। পুবের ভিটার ঘরখানার ছায়া ঘরের মধ্যেই সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। পরানের কথা শুনিতে শুনিতে প্রতি মুহূর্তে শশী আশা করে—পুবের ওই ঘরের ভিতর হইতে হয়তো দুচোখে গাঢ় স্তিমিত ছায়া সঞ্চয় করিয়া কুসুম হঠাৎ বাহির হইয়া আসিবে,—পরমাত্মীয়দের এই সভার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিবে পরের মতো।

তার সাড়া পাইয়া কুসুম যে কলসিটা তুলিয়া লইয়া ঘাটে চলিয়া গিয়াছিল, শশী তাহা কেমন করিয়া জানিবে? পরানের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিলে কুসুম ভিজা কাপড়ে উঠানের রোদে পায়ের দাগ আঁকিয়া পুবের ঘরের ছায়ার মধ্যে ডুবিয়া যায়। রান্নাঘরে পোড়া ডালের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া যাওয়ার পরও ঘর হইতে সে আর বাহির হয় না।

মোক্ষদার বূঢ় বাক্যস্রোতে তারপর কিছুক্ষণের জন্য মতির বিবাহের সমস্যা ভাসিয়া যায়। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়া অপরাধী ডালের হাঁড়িটা উঠানে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতে আজ যে আবার ও প্রসঙ্গ উঠিবে সে সম্ভাবনা থাকে না। শশী ভাবে, সকলের কাছে কত বকাবকিই বউটা না জানি শুনিবে!

মোক্ষদা, বুঁচি, মতি সকলেই হইহই করে, ও ঘর হইতে মুমূর্ষু পিসি চেঁচায়, কী হল রে বুঁচি? কি হল রে মতি? চুপ করিয়া থাকে শশী। সকলকে চুপ করাইতে গিয়া পরান হল্লা আরও বাড়ায়।

কিন্তু কী নির্বিকার কুসুম! রাগের মাথায় ডালের হাঁড়িটা যে উঠানে ছুঁড়িয়া দিয়াছে, সে হাসিমুখে বাহিরে আসে! দাঁড়ায় শশীর সামনে। বলে, জ্বর এল না কি, দেখুন দিকি ছোটোবাবু।

শশী নাড়ি ধরিয়া বলে, জ্বর আসেনি বউ।

মাথা ধরেছে যে?

কতক্ষণ ধরে জলে ডুবিয়েছ তুমিই জান, মাথার দোষ কী?

কুসুম মাথা নাড়িয়া বলে, উহু, আমার ঠিক জ্বর আসছে, আমি গিয়ে শুলাম। যা লো মতি, আজ তুই বাঁধবি যা।

কুসুম ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে।

কিন্তু শুইয়া কেন থাকিতে পারিবে এই চঞ্চলা নারী? খানিক পরে উঠিয়া আসিয়া না বলিতেই পরানকে এক ছিলিম তামাক দিয়া সে অদূরে বসিয়া পড়ে। সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহে শশীর মত নাই শুনিয়া বলে, কেন গো ছোটোবাবু, সুদেব পাত্তর কী এমন মন্দ? পুরুষমানুষের আবার বয়েস— সতিন কাঁটা তো নেই? ঘরে পয়সা আছে লোকটার,—মেয়ে সুখে থাকবে।

শশী বলে, হারুকাকার অমত ছিল সেটা তো ভাবতে হবে বউ?

কুসুম বলে, তিনি সগ্যে গেছেন।

আর কিছু কুসুম বলে না। শশী তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, সুদেব লোক ভালো নয়, মতির সঙ্গে সুদেবকে মানায় না। কুসুম বোঝে কি না কে জানে,—মোক্ষদার খর দৃষ্টিপাতে মাথার ঘোমটা আর একটু টানিয়া দিয়া নিশ্চল প্রতিমার মতো বসিয়া থাকে। শশী বাড়ি যাওয়ার জন্যে উঠিলে সে আবার মুখ খোলে। বলে, পিসিকে একবার দেখে যান ছোটোবাবু, বুড়ি কাঁদতে নেগেছে।

শশী একটু লজ্জা পায়। মরণাপন্ন পিসিকে দেখিয়া যাওয়ার কথা প্রায়ই তাহার মনে থাকে না। পিসির মরণ এতদূর সুনিশ্চিত যে তার সম্বন্ধে করিবার এখন আর কিছুই নাই। তাই কি শশী ভুলিয়া যায় আজও পিসি বাঁচিয়া আছে?

বড়ো বাঁচিবার সাধ পিসির।

পিসি মরিলে যে কাঠ দিয়া তাহাকে পোড়ানো হইবে, তাহার ঘরেরই অর্ধেকটা জুড়িয়া সেগুলি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। মাথার দিকে ঘরের কোণে দাঁড় করানো পাটকাঠির বোঝা হইতে পিসি এখনও পচা পাটের গন্ধ পায়. এক আঁটি পাট ধরাইয়া পিসির মুখাগ্নি করিবে পরান। মাথার চুল পিসির অর্ধেক ঝরিয়া গিয়াছে, দেহের লোল চামড়ার তলে মাংস আছে কি না বোঝা যায় না। পিসি তবু বাঁচিবেই।

চুপি চুপি সে শশীকে বলে, ও বাবা শশী, বই দেখে ওষুদ দিয়ো বাবা, দামি ওষুদ দিয়ো! দামের জন্য ভেব না, বাবা, সেরে উঠি, ওষুদের দাম তোমার আমি মিটিয়ে দেব।

বলে, আমার যা কিছু আছে সব তোমাকে দিয়ে যাব, তুমি ভালো করে আমার চিকিচ্ছে করো।

তবু শশী প্রায়ই ভুলিয়া যায় পিসি বাঁচিয়া আছে।

ইনজেকশন দিবার সময় প্রত্যেকবার শশী মতিকে বলিয়াছে: আর তোর জ্বর হবে না মতি।

শশীর আশ্বাস সত্য হইলে এ বছরের মতো মতিকে ম্যালেরিয়া ছাড়িয়াছে। ওদিকে যামিনী কবিরাজের বউ, শশী যাহাকে সেনদিদি বলিয়া ডাকে, পড়িয়াছে জ্বরে।

যামিনী বিখ্যাত কবিরাজ। বহু দূরবর্তী গ্রামে তাহাকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। সিদ্ধির পাতা মিশাল দিয়া যামিনী যে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করে তাহা নিয়মিত সেবন করিলে বৃদ্ধের দেহে যুবার ন্যায় শক্তির সঞ্চার হয়। মরিয়া গেলেও যামিনীর মকরধ্বজ রোগীর দেহে জীবন আনিয়া দিতে

পারে। তারপর এই জীবনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যামিনীরই আদি ও অকৃত্রিম আবিষ্কার মহাকপিলাদি বটিকা সেবন করা বিধেয়। এই বটিকা প্রস্তুত করিতে তিনরাত্রি সময় লাগে। ইহা কখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে না। কারণ, তৈরি করিয়া রাখিলে এই মহাতেজস্কর ঔষধের গুণ সূর্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়া লয়। সুতরাং যামিনীর মকরধ্বজের তেজে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইলেও মহাকপিলাদি বটিকার অভাবে প্রাণটুকু যে সবসময় টিকিয়া থাকে, এমন নয়। কিন্তু সে অপরাধ কি যামিনীর? রোগীর কপাল! মহাকপিলাদি বটিকা তৈরি করিতে করিতে মৃত রোগী পুনরায় মরিয়া যাইবে বলিয়া যামিনী তাহাব বিখ্যাত ও বিশিষ্ট মকরধ্বজও ব্যবহার করে না। বলে, লাভ কি হবে বাপু? মহাকপিলাদি বটিকা তো প্রস্তুত নেই। রোগীকে না হয় বাঁচালাম, তার পর তিনদিন টেকাব কী দিয়ে?

মৃতকে যামিনীর এক লহমার জীবন দান কেহ কখনও দ্যাখে নাই। তবু লোকে বিশ্বাস করে। একজন দুজন নয়, অনেকে!

যামিনী কবিরাজের বউ কিন্তু কখনও স্বামীর ওযুধ খায় না। অসুখ হইলে এতকাল সে বিনা চিকিৎসাতেই ভালো হইয়াছে। এবার জ্বরে পড়িয়া শশীকে ডাকিয়া পাঠাইল।

গোপাল তখন বাড়িতে ছিল। শশীর হইয়া সে বলিযা দিল, বলগে যাচ্ছে,—তারপর শশীকে যাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

শশী বলিল, কেন, যাব না কেন?

গোপাল বলিল, কবে তোমার বুদ্ধি পাকবে, ভেবে পাই না শশী।

শশীও তাহার ভাবিযা পায না। সে চুপ করিযা রহিল।

তখন গোপাল বলিল, যামিনী খুড়ো অত বড়ো কবরেজ, সে থাকতে ডেকে পাঠানোব মানেটা বোঝ?

শশী বলিল, আজ্ঞে না।

যুবতি স্ত্রীলোক, নানা বকম কুৎসাও শুনতে পাই—

গোপালের মুখে এই কথা? লজ্জায় শশী সংকুচিত হইয়া গেল। মৃদুস্বরে সে বলিল, এ সব আপনার বানানো কথা বাবা।

গোপাল রাগ করিল না, বলিল, তোমার যে কী হয়েছে আজকাল বুঝতে পারি না শশী, তোমার ভালোর জন্যে একটা কথা কইলে তুমি আজকাল তর্ক জুড়ে দাও। সংসারে মানুষকে ভেবেচিন্তে কত সাবধানে চলতে হয় সে জ্ঞান তোমার এখনও জন্মেনি। এই তোমার উঠতি পসারের সময়, এখনই একটা বদনাম রটে গেলে—এও কি তোমায় বলে দিতে হবে? তুমি চিকিৎসার ভার নিলে বলাবলি করবে না লোকে যামিনী কবরেজ থাকতে তুমি ছেলেমানুষ তোমার কেন অত মাথাব্যথা? সবার বাড়িতে মেয়েছেলে থাকে, এর পর কে আর ডাকবে তোমায়?

শশীর রাগ হইতেছিল। কিন্তু শৈশব ও কৈশোরের এই যমটিকে ভয় করা তাহার সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, গোপালের তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টিপাতে সে চোখ নামাইয়া লইল। গোপাল আবার বলিল, যামিনী খুড়োর ইচ্ছেও নয় তুমি ওদের বাড়ি যাও।

শশীর নীরবতায় গোপাল খুশি হইয়াছে। বয়স্ক উপযুক্ত সন্তানকে বশ করা, জগতে এতবড়ো জয় আর নাই। আজকাল নানা ছোটো-বড়ো ব্যাপারে শশীর সঙ্গে গোপালের সংঘর্ষ বাধিতেছিল, —কলহ বিবাদ নয়,—তর্ক ও মতান্তর, আদেশ ও অবাধ্যতার বিরোধ। আজ তবে শশী বুঝিতে পারিয়াছে সাংসারিক বুদ্ধিতে বাপের চেয়ে সে ঢের বেশি কাঁচা, গোপাল এখনও তাহাকে পরিচালনা করিতে পারে।

গোপাল আরও অনেক কথা বলিল, শশী নীরবে শুনিয়া গেল। শেষে তাহার কঠিন মুখের ভাব দেখিয়া তাঁর কিছু বলা ভালো মনে না করিয়া গোপাল থামিল।

খাওয়াদাওয়াব পর শশী গেল যামিনী কবিবাজের বাড়ি।

শশীকে দেখিয়া যামিনী কবিরাজ খুশি হইল না। সদর বাড়িতে সে তখন মুখে মুখে দুটি ছাত্রকে একটা ওষুধের প্রস্তুত-প্রণালি শিখাইতেছিল, পাশের চালাটায় বুঝি সিদ্ধ হইতেছিল পাঁচন, গন্ধে চারিদিক ভবিয়া গিয়াছে। শশীকে দেখিয়া যামিনী চশমা খুলিয়া বলিল, কী মনে করে শশী? বোসো।

শশী বলিল, সেনদিদির অসুখ শুনলাম ঠাকুর্দা, একবার দেখা করে যাই।

অসুখ?—যামিনী হাসে, কার কাছে শুনলে? জ্বর বুঝি হয়েছিল একটু কাল, না রে কুঞ্জ? আজ অসুখ কোথা!

তবে বুঝি কোনো কাজে ডেকেছেন, বলিয়া শশী ভিতবে গেল।

সেনদিদি শুইয়াছিল, আচ্ছন্ন অসুস্থ মৃতকল্প সেনদিদি।

গায়েব উজ্জ্বল রং লাল হইয়া হাতের অনন্তের রঙেব সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সারা গায়ে আরও সব অস্পষ্ট চিহ্ন, শশী যা চেনে। শশীর মুখ শুকাইয়া গেল। শবতেব গোড়ায় এ রোগ সেনদিদি পাইল কোথায়? গাওদিয়া গ্রামে, কলিকাতা শহরে, দেশে বিদেশে কোথাও শশী যার মতো রূপসি দ্যাখে নাই, শুধু রূপের জন্যই হয়তো যে মিথ্যা কলঙ্ক কিনিয়াছে, এ কী রোগ ধবিয়াছে তাহাকে?

শশীর ডাক শুনিয়া যামিনী কবিরাজেব বউ চোখ মেলিয়া তাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এতদিনে এসেছ শশী?—আমি যে মরতে বসেছি শশী, কী অসুখ করেছে কিছু জানি না, জ্বরে অচৈতন্য হয়ে থাকি, গায়েব ব্যথা সইতে পাবি না—

আমি খবব পাইনি সেনদিদি।

কাকে দিয়ে খবব পাঠাব, কেউ কি আসে আমার কাছে!

সেনদিদি চোখ মেলিতে পারে না, চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। শশী বিছানায় বসে, সেনদিদির গায়ের তাপ পরীক্ষা করে, কী করিবে ভাবিয়া পায় না। যামিনী অসুখের কথা গোপন করিবাব চেষ্টা করিয়াছিল, এ পর্যন্ত চিকিৎসারও হয়তো কোনো ব্যবস্থা হয নাই। আজকাল তাহাব কী হইয়াছিল, সেনদিদির খবর লইত না কেন? এই মলিন দুর্গন্ধ চাদরে আজ কতদিন না জানি তাহাব সেনদিদি বিনা চিকিৎসায় পড়িয়া আছে, এতটুকু সেবা করিবারও কেহ থাকে নাই। শশী কিছু বঝিতে পারে না। যে রূপের জন্য পৃথিবীর লোক উন্মাদ, স্ত্রীর যে সৌন্দর্য মানুষ তপস্যা করিয়া পায় না, যামিনী তাই পাইয়াছে। বুড়া বয়সে সে তো স্ত্রীর দাস হইয়া থাকিবে! কী জন্য তাহার এই বিকৃত নিষ্ঠুর অবহেলা? কে জানে, হযতো সীতা আব হেলেন আব ক্লিওপেট্রাব মতো যার অসাধারণ রূপ থাকে তাকে ঘিরিয়া এমনি খাপছাড়া কাণ্ডই ঘটিতে থাকে জগতে!

খানিক পরে যামিনী ঘরে আসিল, মুখ ভার করিয়া বলিল, এখনও তুমি বসে আছ শশী? আমি ভাবলাম তুমি বুঝি চলে গেছ।

শশী বলিল, ঠাকুর্দা, বাইরে আসুন দিকি একবার। বাহিরে গিয়া বলিল, সেনদিদির অসুখ কি আপনি ধরতে পারেননি ঠাকুর্দা?

যামিনী কবিরাজ বলিল, হাসির কথা বললে বটে শশী, চল্লিশ বছর কববেজি কবছি, তিনটে জেলায় যামিনী কবরেজের নাম জানে না এমন লোক নেই, আমায় তুমি শুধোচ্ছ রোগ ধরতে পারিনি? একনজর তাকালে রোগ নির্ণয় হয়। ওঁয়ার হয়েছে ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া নয়, ঠাকুর্দা, বসন্ত।—শশী বলিল।

হ্যাঁ, বসন্ত! শরৎকালে বসন্ত!—বলিল যামিনী কবিরাজ।

বলিল বটে, যামিনীর মুখে কালি পড়িয়াছে কীসের? শশীর কাছে যামিনী যেন অভিনয় করিতেছে, একটা পাণ্ডুর ভয় আর কালো চিন্তার রাশিকে গোপন করিবার অভিনয়। শশী কড়াসুরে বলিল, আমি সেনদিদির চিকিৎসার ভার নিলাম ঠাকুর্দা। ছি ছি, আজ পর্যন্ত কিছুই করেননি?

খায় নাকি আমার ওষুদ?

শশী ঘরে গিয়া বসিল। কী ভাবিয়া যামিনীও ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শশী দারুণ বিপন্ন বোধ করিতেছিল। আর বিষণ্ণতা। কয়েক দিন আগে সাতগাঁয়ে সে একটি বসন্তের রোগী দেখিতে গিয়াছিল। তাহাকে শশী বাঁচাইতে পারে নাই। বাঁচাইবার চেষ্টাও সে করিতে পারে নাই, তাকে ডাকা হইয়াছিল একেবারে শেষ মুহূর্তে। সে পর্যন্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিল সাতগাঁর কবিরাজ যামিনীব পূর্বতন ছাত্র ভূপতিচরণ। শশীর হঠাৎ মনে পড়িয়াছে, সেই রোগীটি মারা যাইবার পব যামিনী হাসিয়া বলিয়াছিল, আমার ছাত্র যাকে ছাড়পত্র লিখে দিল তাকে বাঁচাবে শশী, আমাদের শশে?

শশী প্রাণ দিয়া সেনদিদির চিকিৎসা ও সেবা আরম্ভ করিল। অন্য রোগীরা তাহাকে ডাকিয়া পায় না। বাড়িতে কারও জ্বরজ্বালা হইলে চোখের পলকে পরীক্ষা শেষ করিয়া সে ওষুধ দেয়,—না বলিলে আর খবর নেয় না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলকে সে অবহেলা করে। যায় না হাবু ঘোষের বাড়ি, বিনা কাজে অথবা মতিকে ইনজেকশন দিতে। কুসুম ভাবিল, শশী বুঝি রাগ করিয়াছে। তালবনেব তালপুকুরে পদ্ম তুলিতে গিয়া মতি আশা করিতে লাগিল, ছোটোবাবু আজ নিশ্চয় আসবে, ছোটোবাবুকে একডালা পদ্ম দেব। কিন্তু কুসুমের মনে শশীব উপর রাগ কমিল না। মতির পদ্মফুলের বিচি দিয়া বাঁধা হইল তবকারি।

শুধু সেনদিদিব ব্যবস্থা করিতে হইলে শশী হয়তো চারদিকে তাকানোব সময় পাইত।—চিকিৎসা আরম্ভ কবিযা এ বাড়িতে গোপালের এবং ও বাড়িতে যামিনীব উপদেশ সমালোচনা ও বাধাদানেব বহরে সে বিপন্ন ও বিব্রত হইয়া রহিল। ব্যাপারটা সে ভালো বুঝিতে পারে না। সময় সময তাহার মনে হয়, তাহাব চিকিৎসায় ওদের শ্রদ্ধা নাই এই কথাটা এমনিভাবে প্রকারান্তরে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু চিকিৎসার আর কোনো ব্যবস্থাও তো নাই! ভালো হোক, মন্দ হোক তাব চিকিৎসাকে ছাঁটিয়া ফেলার মধ্যে যুক্তি আছে কোনখানে? আমার ওষুদ খায না, বলিযা যামিনী নিজে চিকিৎসা কবিতে বাজি নয়,—ওরা মারিয়া ফেলিতে চায় নাকি সেনদিদিকে? তাই বা কেন চাহিবে? তা ছাড়া যামিনীর এই লজ্জাকব পাগলামিতে গোপাল এ ভাবে সাহায্য করিতেছে কেন, তার স্বার্থ কী?

ব্যাপাব যত রহস্যময়ই হোক, শশী একা সেনদিদির তিনটি যমের সঙ্গে লড়াই কবিতে লাগিল। যামিনীকে সে জিজ্ঞাসা করে, বড়ো গোল শিশির ওষুধ কী হল ঠাকুর্দা?

যামিনী বলে, তিন দাগ ছিল না? খাইয়ে দিয়েছি। কী যে সব ওষুদ তোমার শশী,—সব ওষুদে হয় মদ, নয় সিরাপের গন্ধ!

শশী সভয়ে বলে, খাইয়ে দিয়েছেন? গোল শিশির ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছেন?

তা দিলাম বইকী? ছটফট করছিল দেখে ভাবলাম তোমার রুগি তোমার ওষুদ, দিই খাইয়ে!

শশী রাগ করিয়া বলে, রোগী আমার নয় ঠাকুর্দা, আমি চললাম। আপনাদের যা খুশি করুন।

সে একরকম চলিয়াই আসে। বাড়ির বাহিরে গিয়া গতি শ্লথ করিয়া দাঁড়ায়। মনে পড়ে সেনদিদির ভীরু কাতব চাহনি, একান্ত নির্ভর। শশী আবার ফিরিয়া যায়। বলে, ওটা যে গুটি বসাবার ওষুধ, সাতদিন আগে ও ওষুধটা দিয়েছিলাম, আপনি জানতেন না?

যামিনীর মুখ কয়েকদিন সম্ভবত দুশ্চিন্তাতেই শুকাইয়া পাংশু হইয়া গিয়াছে। সে চোখ মিট-মিট করিয়া বলে, আমি কবরেজ মানুষ, তোমাদের ওষুদের আমি কী জানব ভাই? আমি তো কিছুই জানি না?

জানেন না তো আমায় না বলে ওষুধ খাওয়ালেন কেন? আপনিই মারবেন ঠাকুর্দা সেনদিদিকে, গুটি পাকছে, এখন আপনি খাইয়ে দিলেন গুটি-বসানোর ওষুধ?

যামিনী কথা কয় না।

শশী একটু নরম হইয়া বলে, বড়ো অন্যায় করেছেন ঠাকুর্দা, আর যেন এমন করবেন না কখনও।

যামিনী বলে, আমার একটা ওষুদ খাইয়ে দেবে শশী, তাড়াতাড়ি যাতে গুটি পাকে?

শশী তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, খাইয়েছেন না কি কিছু? আপনার ওষুধ?

নাঃ, আমার ওষুদ খায় না।

তার মানে চেষ্টা করেছিলেন খাওয়াবার?

উদ্‌ভ্রান্ত যামিনী এবার খেপিয়া যায়।

যদি করে থাকি? হ্যাঁ হে শশী, যদি করেই থাকি? তোমার ও সব মদ আর সিরাপে আমি বিশ্বাস করি না বাপু! চিকিৎসা হচ্ছে! এই যদি তোমার বসন্তের চিকিৎসা হয়, পুঁথিপত্র খালে ভাসিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বসো গে যাও!

বলিতে বলিতেই যামিনী সাহস হারায়, তবু মরিয়ার মতো বলে, তুমি আর এসো না!

মাথা শশীও ঠিক রাখিতে পারে না, বলে গোড়া থেকে আপনি যা সব কাণ্ড করছেন ঠাকুর্দা, পুলিশ ডাকলে আপনার দশ বছর জেল হয়।

যামিনী বিবর্ণ মুখে বলে, কী করলাম আমি? চিকিৎসা হচ্ছে তোমার, আমি তো একটা বড়িও খাওয়াইনি আমার।

শশী আর কথা কাটাকাটি করে না। এ পাগলের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া লাভ কী?

এই কি কলহের সময় ঠাকুর্দা?

কলহ কে করছে বাপু!

জ্ঞান হইলে যামিনী কবিরাজের বউ বলে, ঘরে কে, শশী? কার সঙ্গে কথা কইছ?—চোখে সে দেখিতে পায় না, চোখ দুটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যামিনী ঘরে আসিয়াছে শুনিলে উতলা হইয়া ওঠে, ওকে যেতে বলো শশী, যেতে বলো ওকে, আমাকে ও বিষ খাইয়ে মারবে,—যাও না তুমি এ ঘর থেকে, চলে যাও না।

যামিনী চলিয়া গেলে বলে, বাঁচব তো শশী?

বাঁচবেন বইকী।

সেনদিদি খুশি হয়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। শশী কী জানে না, কী অসহ্য তাহার যাতনা? সেনদিদির সহাশক্তি দেখিয়া বিস্ময় মানে শশী। নালিশ নাই, কাতরানি নাই, মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞাসা করে বাঁচিবে কি না।

সেনদিদি বলে, এত ঘাঁটাঘাঁটি করছ তোমার তো ভয় নেই বাবা?

কীসের ভয়? ছমাস আগে টিকে নিয়েছি।

তখন সেনদিদি বলে, ধরতে গেলে তুমি তো আমার ছেলেই। পেটের ছেলের চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি শশী।

কথাটা শশীকে বিচলিত করিয়া দেয়। সেনদিদি যে তাকে ভালোবাসে সে তা জানে বারো বছর বয়স হইতে। কথাটা বলিবার ভঙ্গি তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখে। কেমন একটা বালকত্বের

অনুভূতি হয় এক অসুস্থা গ্রাম্য নারীর আবেগপূর্ণ কথায়। পেটের ছেলের চেয়ে ভালোবাসে? এ কথার অর্থ কী? সেনদিদিব তো ছেলে মেয়ে হয় নাই কখনও।

একদিন সেনদিদির শিয়রে সারারাত জাগিয়া ভোরবেলা বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির সামনে শিউলি গাছটাব তলায় মতিকে শশী ফুল কুড়াইতে দেখিল। শশী যায় না বলিয়া মতি বুঝি ব্যাপার বুঝিতে আসিয়াছে!

শিউলি গাছটা ঝাঁকিয়া ফুল ঝরাইয়া দিয়া শশী জিজ্ঞাসা করিল, তুই কবে টিকে নিয়েছিল রে মতি?

টিকে নিইনি তো?

নিসনি! কেন, টিকে নিতে কী হয়েছিল? দাঁড়া, আজ তোদের বাড়িসুদ্ধ সকলকে টিকে দিয়ে আসব। পাড়ায় বসন্ত হয়েছে খবর রাখিস?

মতি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, টিকে নিলে কী হবে? মা শেতলাব কৃপা হবার হলে হবেই গো ছোটোবাবু, হবেই।

তোর মাথা হবে।

শিশিবে এক পশলা বৃষ্টির মতো চারিদিক ভিজিয়া আছে। মতির বিবর্ণপাড় শাড়ি আধভেজা কাপড়ের মতো কোমল দেখাইতেছিল। শশীর মনে হয়, শাড়ির নমনীয় স্পর্শে মতি ভারী আরাম পাইতেছে। সকালবেলা রাত-জাগা চোখে মতিকে যেন তার বয়সের চেয়ে অনেক বড়ো মনে হইতে লাগিল। ওকে দেখিতে দেখিতে সকালবেলা বিড়ি টানাব আলস্য আরও মিষ্টি লাগিল শশীর।

মতি বলিতেছিল, বউ বলে আপনি সায়েব মানুষ, ঠাকুর-দেবতা মানেন না। সত্যি ছোটোবাবু?

না, সত্যি নয়। ঠাকুব-দেবতা খুব মানি।

শুনিয়া মতি যেন স্বস্তি পাইল।

বউ আপনার নামে যা তা বলে। .

অ্যাঁ? কী বলে?

মতি মুচকিয়া হাসিল, কত কী বলে!

শশী হাসিয়া বলিল, তুইও তো বলিস মতি। পরানের বউ হয়তো তোর কাছ থেকেই বলতে শিখেছে।

মতির মুখ শুকাইয়া গেল।

আমি আপনাব নামে বলি! আমি যদি আপনাব নামে কিছু বলে থাকি আমার যেন ওলাউঠা হয়। হয়—হয়—হয়, তিন সত্যি করলাম, ভগবান শুনো।

শশী অবাক হইয়া বলিল, তুই তো আচ্ছা রে মতি! সকালবেলা ফুল তুলতে তুলতে ওলাউঠাব নাম করছিস!

মতি এবার রাগ করিয়া বলিল, আমার যেন হয়!

রোদ উঠিলে মতি বাড়ি গেল। শশী ভাবিল, এমন গেঁয়ো স্বভাব, দেখতে তো গেঁয়ো নয়?

আর মতি ভাবিল, শেষের দিকে ছোটোবাবু আমাকে কী করে দেখছিল? আমাকে দেখতে দেখতে কী ভাবছিল ছোটোবাবু?

হারু ঘোষের বাড়ির সামনে বেগুনগাছগুলি এখন খুব সতেজ। কয়েকটা গাছে কচি কচি বেগুনও ধরিয়াছে। বড়ো ঘরের পাশ দিয়া পিছনের মাঠে তাকাইলে অনেক দূরে কুয়াশা দেখা যায়। দূরত্বই যেন ধোঁয়াটে হইয়া আছে, কুয়াশা মিছে। মতি তৃপ্তি বোধ করে। সকালবেলার সোনালি রোদে তাহার চোখের সীমানার গ্রামখানি দেখিতে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া নয়। প্রকৃতিকে, তাদের এই গ্রামের

প্রকৃতিকে, মতি এত বেশি করিয়া চেনে যে আকাশের রামধনু ছাড়া তাহার চোখ তাহার মন কোথাও রং খুঁজিয়া পায় না। নাকের সামনে কচি কিশলয়ের মৃদু হিন্দোল কোন কাঁচা মনকে দোল দেয় কে জানে, মতির মনকে দেয় না। সর্বাঙ্গের শুভ্রতায় তালগাছের রহস্যময় ছায়া মাখিয়া মাখিয়া তালপুকুরের গভীর কালো জলে হাঁস সাঁতার দেয়, তাদের গায়ে ঠেকিয়া লাল ও সাদা শাপলাগুলি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া ওঠে, চারিদিকের তীর ভরিয়া কলমিশাকের ফুলগুলি বাতাসে যেন কেমন করিতে থাকে। আকাশে ভাসে উজ্জ্বল সাদা মেঘ আর বন্য কপোতেব ঝাঁক। শালিখ পাখি উড়িবার সময় হঠাৎ শিস দেয়। অল্প দূরে কাতৌরা পাখির পাঠশালা বসে। বাতাসে থাকে কত ফুল, কত মাটি, কত ডোবার মেশানো গন্ধ।

মতি কিছু দ্যাখো না, কিছু শোনে না, কিছু শোঁকে না। তালপুকুরের নির্জনতাকে সে শুধু ভোগ করে গায়ে জড়ানো আঁচলটি কোমরে বাঁধিয়া। গা উদলা করিয়া দেওয়াতেও কেহ যে তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না ইহাতে মতির ভারী মজা লাগে।

সংসারের কাজ না করিলে কুসুম তাহাকে বকে। তালপুকুবের ধারে কাজ ফাঁকি-দেওয়া আলস্যটুকু মতি ভোগ করে ভবিষ্যতেব চিন্তা করিতে করিতে। সুদেবকে মনে মনে মরিবার আশীর্বাদ কবিয়া আরম্ভ না করিলে ভবিষ্যতেব ভাবনাটা তাহার যেন ভালো খোলে না!

মতির ভারী ইচ্ছা, বড়োলোকের বাড়িতে শশীর মতো ববের সঙ্গে তাব বিবাহ হয়। কাজ নাই, বকুনি নাই, কলহ নাই, নোংরামি নাই, বাড়ির সকলে সর্বদা পরিষ্কাব পরিচ্ছন্ন থাকে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, হাসে, তাস-পাশা খেলে, কলের গান বাজায়, আর,—আর বাড়ির বউকে খালি আদর করে। চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া বলে, লক্ষ্মী বউ, সোনা বউ, এমন না হলে বউ?

বলে, বাড়ি আলো হল!

স্বপ্ন মতির অফুরন্ত। মস্ত একটি ঘরের এক কোণে সে বসিয়া আছে। সর্বাঙ্গে তাহার ঝলমলে গহনা, পরনে ঝকঝকে শাড়ি। ঘোমটার মধ্যে চন্দনচর্চিত মতির মুখখানি কী রাঙা লজ্জায়! আনন্দে সে ছোটো ছোটো নিশ্বাস ফেলিতেছে আর শুনিতেছে ঘরের বাহিরে বড়োলোকের বাড়ির প্রকাণ্ড সংসারের কলরব। শশীর বোনেব মতো পাড়াব কে যেন একটি মেয়ে মতির সঙ্গে ভাব করিযা গেল। যামিনী কবিরাজের বউয়ের মতো সুন্দরী একটি মহিলা, মতির বোধ হয সে ননদই হইবে, পানের বাটা সামনে দিযা বলিল, পান সাজো, বউ। ও সোনা-বউ, পান সাজো।

তারপব কে বলিল, বউমাকে খেতে দে তোরা কেউ একজন।

যেই বলুক, তালপুকুরের ধারে প্রকৃতির মহোৎসব হইতে বাড়ি ফেরার সময় মতি আবার তীব্র ভাবে ইচ্ছা কবে সুদেব ব্যাটা মরিয়া যাক।

কুসুমেব সঙ্গে আজকাল প্রায়ই ঝগড়া বাধে মতির। সকলের অগোচরে মতিকে কুসুম শশীর কথা তুলিযা অন্যায পরিহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বলে, শরীর খারাপ লাগছে মতি? তাই চুপ করে বসে রয়েছিস? আহা, ষাট। ছোটোবাবুকে ডাকব? পরীক্ষে করে ওষুদ দেবে?

মতি বলে, কেন লাগতে এলি বউ? তোর আমি কী করেছি!

কুসুম বলে, চোখ ছলছল করছে। দেখলে ছোটোবাবুর বুক ফেটে যাবে।

মতি বলে, যমের অরুচি। মর্ তুই, মর্।

কুসুম তবু বলে, জানিস লো মতি,—রাতে তোর কথা ভেবে ছোটোবাবুর ঘুম হয় না। বসে বসে মালা জপ করে, মতি, মতি, মতি। সুদেবের সঙ্গে তোর নিকে হয়ে গেলে ছোটোবাবু তালপুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবে।

তুই তালপুকুরে ডুবে মর। মরে শাঁকচুন্নি হয়ে থাক।

মতি স্থান ত্যাগ করিতে যায়, কুসুমের সঙ্গে সে কথায় পারিবে কেন? কুসুম তাহাকে রেহাই দেয় না। খপ করিয়া মতির হাতটা সে ধরিয়া ফেলে। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অপলক চোখের তারা স্থির রাখিয়া কথাগুলিকে দাঁতে কাটিয়া কাটিয়া বলে, লজ্জা নেই তোর? এত বড়ো ধেড়ে মেয়ে তুই, লজ্জা নেই তোর? পেটে ভাত জোটে না, গয়লার মুখ্যু মেয়ে তুই,—ছোটোবাবুর তুলনায় তুই ছোটোলোক ছাড়া কী! অত তোর পাকামি কীসের? অমনি করিস বলেই তো বিরক্ত হয়ে ছোটোবাবু আর আসে না।

তারপব মতি কুসুমের হাত দেয় কামড়াইয়া। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দংশিত হাতখানা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কুসুম দাঁতের দাগগুলি ভালো করিয়া দ্যাখে।

কামড়ালি! আমাকে তুই কামড়ালি! দাঁড়া, তোর আমি কী করি দ্যাখ।

কী করিবে? কুসুম তাহাব কী করিবে? বুক দুরু দুরু করে মতির। ছোটোবাবুকে যদি বলিয়া দেয়!

মতির মনে হয়, সে কুসুমের হাতে কামড়াইয়া দিয়াছে শুনিলে ছোটোবাবু ভয়ানক রাগ করিবে।

খানিক পরেই সে কুসুমের আশেপাশে ঘোরাফেরা আরম্ভ করিয়া দেয়। এক সময় সাহস কবিয়া বলে, লেগেছে বউ? দেখি?

কুসুমের ক্ষমা নাই। সে ভ্যাঙাইয়া বলে, লেগেছে বউ? কামড়ে গিয়ে ন্যাকামি করতে এলেন।

মতি দাওযায় আসিযা খুঁটি ধরিযা দাঁড়ায। ভাবে বউ কী ভীষণ মেয়ে! ও ঠিক বলে দেবে।

পিসিব ঘরের খোলা দবজা দিযা পিসিকে দেখা যায়। পিসির আজকাল কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে গেলে গলায ফ্যাঁস ফ্যাঁস আওয়াজ হয় মাত্র, কিছুই সে বলিতে পারে না। মতিকে দেখিয়া সে হাতের ইশারায় তাহাকে কাছে ডাকে। মাথা উঁচু করিয়া বারবার ব্যাকুল ভাবে মুখের ফাঁকে আঙুল ঢুকাইয়া পিপাসা জানায। দেখিতে পাইয়াও মতি কিন্তু অনেকক্ষণ নড়ে না।

বলে, যাই গো যাই—অত ব্যস্ত কেন?

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করে, কে ডাকে লো মতি?

পিসি। জল খাবে।

চার

এবার কার্তিক মাসে পূজা। সেনদিদির সর্বাঙ্গে ব্রণগুলি পাকিয়া উঠিতে উঠিতে গ্রামে পূজার উৎসব শুরু হইয়া গেল। উৎসব সহজ নয়, গ্রামের জমিদার শীতলবাবুর বাড়ি তিনদিন যাত্রা, পুতুলনাচ, বাজি পোড়ানো, সাতগাঁর মেলা—পূজা তো আছেই। গ্রামবাসীর ঝিমানো জীবন প্রবাহে হঠাৎ প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, কেবল শশী এবার সেনদিদিকে লইয়া বড়ো ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হয় সপ্তমীর রাত্রে। যাত্রার দল তার আগেই গ্রামে হাজির হইয়া যায়। বায়না দিবার সময় শীতলবাবু অধিকারীকে বলিয়া দেন, দল নিয়ে দু-একদিন আগেই আসবে বাপু, এক রাত্রি বেশ করে ঘুমিয়ে রাস্তার কষ্ট দূর করে অভিনয় করবে।

এবার যে দলকে বায়না দেওয়া হইয়াছিল সে দল এ অঞ্চলের নয়। বিনোদিনী অপেরা পার্টির আদি আস্তানা খাস কলিকাতায়। বাজিতপুরের মথুরা সাহার ব্যাবসা উপলক্ষে কলিকাতা যাওয়া-আসা আছে। কিছুদিন আগে ছেলের বিবাহে এই দলটি সে কলিকাতা হইতে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিল। লোকমুখে দলের প্রশংসা শুনিয়া শীতলবাবু সেই সময় বায়না দিয়া রাখিয়াছিলেন।

কাল বিকালে বিনোদিনী অপেরা পার্টি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মস্ত দল, সঙ্গে অনেকগুলি বড়ো বড়ো কাঠের বাক্‌সো। দেখিয়া গ্রামের লোক খুশি হইয়াছে। দলের অধিকারী বি-এ ফেল, তবে দলে তাহার দুজন বি-এ পাশ অভিনেতা আছে শোনা অবধি সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

থেটার, অ্যাঁ?

উঁহু, যাত্রা। অপেরা পার্টির নাম যে?

তাই ভালো। যাত্রাই ভালো!

সাতগাঁর কাছারি বাড়িটা সাফ করিয়া যাত্রাওলাদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। দলের সকলের মশারি নাই, কুমুদের আছে। রাত্রে তার ঘুম মন্দ হয় নাই। সকালে উঠিয়া সে শশীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

শশী অবাক হইয়া বলিল, তুই! কুমুদ?

কুমুদ হাসিয়া বলিল, না রে, আমি প্রবীর।

শশী বুঝিতে পারে না--প্রবীর কী, প্রবীর?

গ্রামে বিনোদিনী অপেরা পার্টি এল, চারিদিকে হইচই পড়ে গেছে, খবর পাসনি?

তুই যাত্রাদলের সঙ্গে এসেছিস কুমুদ? তুই যাত্রা করিস?

কথাটা বিশ্বাস করিতে এত বিস্ময় বোধ হয়। কুমুদ বদলাইয়া গিয়াছে। মুখে আর সে জ্যোতি নাই। চুলে সেই অন্যমনস্ক বিদ্রোহ নাই। এত সকালেও কুমুদ কিছু প্রসাধন সারিয়া তবে দেখা করিতে আসিয়াছে। তবু, যতই বদলাক, এ তো সেই কুমুদ' মানের বই না দেখিয়া যে একদিন তাহাকে ক্লাসের কাব্যসঞ্চয়নে শেলির দুর্বোধ্য কবিতা বুঝাইয়া দিয়াছিল, মোনালিসার হাসির ব্যাখ্যা করিয়াছিল?

কুমুদ বলিল, করি বইকী যাত্রা। প্রবীর সাজি, লক্ষ্মণ সাজি, চন্দ্রকেতু সাজি, আরও কত কী সাজি। গলা ফাটিয়ে পার্ট বলি। সাতটা মেডেল পেয়েছি।

শশী অবাক হইয়া বলিল, আয়, ঘরে আয়। বসে সব বলবি চল।

কুমুদকে শশী তাহার ঘরে লইয়া গেল। ঘরে গিয়া আর একবার বলিল, অ্যাদ্দিন পরে তুই এলি কুমুদ! এতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা হল! কী আশ্চর্য!

তাহার বিছানায় বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কুমুদ বলিল, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তিন বছর ধরে বাংলাদেশের কত গ্রামে ঘুরেছি তার ঠিক নেই। এবার তোদের গ্রামে এলাম।

যাত্রাদলে ঢুকলি কেন?

সে এক ইতিহাস শশী। বাড়ি থেকে দিলে খেদিয়ে। নিলাম চাকরি। চাকরি থেকেও দিলে খেদিয়ে,—একদিন অন্তর আপিস গেলে কে রাখবে? ঘুরতে ঘুরতে বহরমপুরে বিনোদিনী অপেরা পার্টির যাত্রা শুনে অধিকারীর সঙ্গে ভাব জমালাম। অধিকারী লোক ভালো রে শশী, পরীক্ষা করে সতেরো টাকা মাইনে দিয়ে দলে নিলে। দু-চারটে সেনাপতির পার্ট করে গলা খুলল, খুব আবেগ-ভরে চেঁচাতে শিখলাম। এক বছরের মধ্যে মেন অ্যাক্টর। আশি টাকা মাইনে দেয়। মাসে আটটার বেশি পালা হলে পালা-পিছু পাঁচ টাকা করে বোনাস। দলে আমার খাতির কত!—কুমুদ হাসিল, গ্র্যান্ড সাকসেস, অ্যাঁ?

শশীও হাসিল, তুই শেষে যাত্রা করবি এ কথা ভাবতেও পারতাম না কুমুদ।

আমিও কি ভাবতে পারতাম?

তখন আকস্মিক কথার অনটনে শশী বলিল, আজ তুই এখানে খাবি ভাই, সারাদিন থাকবি।

কুমুদ বলিল, বেশ।

মনে মনে শশী ভারী খুশি হইয়াছিল। এতকাল পরে কুমুদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, শুধু এই জন্য নয়। কুমুদ নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া। কুমুদের সেই অন্যমনস্ক সরল ঔদ্ধত্য নাই, নিজেকে সংসারের আর সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে বড়ো মনে করিতে সে ভুলিয়া গিযাছে। এটুকু শশী প্রথম হইতেই টের পাইতেছিল। কুমুদের কাছে নিজেকে তাহার চিরদিন ছোটো মনে হইয়াছে, তুচ্ছ মনে হইয়াছে। কুমুদের অন্যায়ের ইতিহাসগুলি শুনিয়া পর্যন্ত ঈর্ষার সঙ্গে তাহার মনে হইযাছে এত সাহস এত মনের জোর এতখানি তেজ তাহার নাই, এ রকম অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভাবে জীবনটাই বৃথা গেল তাহার। আজ কুমুদের মৃদু অস্বস্তি, চেষ্টা করা সহজ ব্যবহার এবং একেবারে যাত্রার দলে অধঃপতন তাহাকে যেন শশীর চেয়েও নীচে নামাইয়া দিয়াছে। বন্ধুকে আর শশীর গুরুজন গুরুজন মনে হইতেছে না।

কুমুদ বলিল, তোর ঘরখানা বেশ সাজানো। গ্রামে থেকে গেঁয়ো বনে যাসনি দেখছি।—সে আবার একটু হাসিল, তাহার পূর্বের হাসির সঙ্গে তুলনা করিয়া এ হাসিকে শশীর মনে হইল ভীরু, অপরাধী হাসি,—কতকাল ধরে কারও বাড়িতে ঢুকিনি জানিস শশী? চার বছর। পাবিবারিক আবহাওয়াটা মুগ্ধ করে দিচ্ছে। বিয়ে করেছিস?

না করিসনি? তোর ঘর দেখে মনে হচ্ছিল বউ আছে। ঘব কে গুছিয়েছে বে, বোন? উঠানে যাকে দেখলাম?

ও বোন নয়। ভাগনি,—পিসির মেয়ের মেয়ে। বোন একটা আছে, ছোটো, আট বছর বয়স, গোছানোর বদলে বরং নোংরাই করে দিয়ে যায়। আমার খাটের তলাটা হল ওর খেলাঘর। তাকিয়ে দ্যাখ, পুতুলেরা সার সার ঘুমোচ্ছে। এইবার ঘুম ভাঙবে—খুকির আসার সময় হল। একটু চেষ্টা করে ভাব জমাস, ভারী চালাক মেয়ে, ভারী বুদ্ধি। পড়াচ্ছি কিনা, আমি জানি। চটপট শিখছে। সামনের বছর স্কুলে ভর্তি করে দেব।

শশী চিন্তিত হইয়া মাথা নাড়ে, দেব বলছি,—হবে কিনা ভগবান জানেন। বাবার এ সব পছন্দ নয়। হয়তো বলবেন, ছেলে লেখাপড়া শিখে হয়েছে অবাধ্য, মেয়ে কী হবেন ঠিক কী? স্কুলে-টুলে দিয়ে কাজ নেই বাপু—শেখা না, বাড়িতেই শেখা!

কুমুদ শশীর মুখের ভাব লক্ষ করিতেছিল, বলিল, বুঝিয়ে দিস আজকাল মেয়েদের স্কুলে না দিলে চলে না।

বুঝিয়ে? বাবাকে? বাবা সেকেলে মানুষ।

কথা বদলাইয়া বলিল, ঘর কে গোছায় বলছিলি? লোকের অভাব কী! এ হল বাংলাদেশ, একজন রোজগার করে, দশজনে খায়। ঘর গোছাবার লোকের অভাব নেই। তবে—বন্ধুকে শশী চোখ ঠারিল, নিজের ঘর আমি নিজেই গোছাই।

শশীকে যামিনী কবিরাজের বউয়ের কাছে যাইতে হইবে। এ কর্তব্য অবহেলা করিবার উপায ছিল না। বন্ধুকে খইয়ের মোয়া আর চন্দ্রপুলি খাওয়াইয়া শশী বিদায় লইল।

গ্রামে পর্দা-প্রথা শিথিল কিন্তু সে গ্রামেরই চেনা মানুষের জন্য। শশীর বাড়ির মেয়েরা সকাল বেলা অন্তঃপুরে পাক খায়। কুমুদ উৎসুক দৃষ্টিতে খোলা দরজা দিয়া প্রকাণ্ড সংসারটির গতিবিধি যতটা পারে দেখিতেছিল, খানিক পরে ছোটো একটি ছেলে আসিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া গেল। কুমুদ আহত হইয়া ভাবিল, আমি তো ওদের দেখিনি? ওদের কাজ দেখছিলাম যে আমি। সকলে মিলে কী রচনা করছে তাই দেখছিলাম।

জামাটি গায়ে দিয়া কুমুদ বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। একটি পরিবারের গোপন মর্ম-স্পন্দন দেখিয়া ফেলার অপরাধ একা একা অন্তঃপুরের একটা ঘরে বসিয়া সহ্য করা কঠিন।

বাড়ি হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় পড়িয়া কুমুদের চোখে পড়িল হারু ঘোষের বাড়ির পিছনে তালবনের ওপাশে উঁচু মাটির টিলাটির দিকে। সে সেইদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। জীবনে সে যত পুণ্য অর্জন করিয়াছে, তাব পাপের হিসাবটা আজ এখনকার মতো না ধরিয়া, তালবনের গভীর নির্জনতায় হঠাৎ তাহার পুরস্কাব কে দিল মানুষের বুদ্ধিতে তাহার বিশ্লেষণ নাই। হয়তো শশীর বাড়িব মেয়েবা অকাবণে তাহাকে যে লাঞ্ছনা দিয়াছিল জীবনের নিরপেক্ষ দেবতা ভোরের বাতাস পাখিব কলরব আর ঋজু তালগাছগুলিব প্রহরায় রক্ষিত যুগান্তের পুরাতন নিভৃত শান্তির উপলক্ষের ক্ষতিপূরণ করিলেন। এত সহজে সেন্টিমেন্টাল করিয়া দিতে পারে, একটি সুখী পরিবারের অন্তঃপুর ছাড়া পৃথিবীতে এমন স্থান যে আছে কুমুদ তাহা জানিত না। এও কি কুমুদ জানিত যে এই অহেতুকী আনন্দ তাহার মৃত্যুরই শেষ ভূমিকা?

তালপুকুরের ধাবে পৌঁছিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল, কী একটা রবারের মতো নরম জিনিসে পা পড়িয়াছে। চোখেব পলকে হলুদ রঙের নরম জিনিসটার মুখ মাটি হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার হাঁটুর কাছে কামড়াইয়া ধরিল। লেজের দিকটা জড়াইয়া গেল তাহার পায়ে।

কুমুদ জীবনে যত পাপ করিযাছে, পবিমাণ তার কম নয়, অল্প একটু পুণ্যের কয়েক মিনিটব্যাপী অসাধারণ পুবস্কাবের পব, এই তাহার শাস্তি। ঘাড় ধরিয়া সাপেব মাথাটা কুমুদ হাঁটু হইতে ছিনাইযা লইল।

সাপ! সাপ!

শুনিয়া আগে আসিল মতি, ভিজা শরীরে শুকনো কাপড়টা কোনোমতে জড়াইযা।

কুসুম ও ভাবে ছুটিতে পারে না। তাহার আসিতে দেরি হইল।

সাপ দেখিয়া মতি বলিল, ও তো ঢোঁড়া সাপ। জলে থাকে। ওর বিষ নেই।

কুমুদের মৃত্যুভয় প্রবল। কুসুম আসিয়া সায় না দেওয়া পর্যন্ত মতির কথা সে বিশ্বাস করিল না। বিশ্বাস করিয়াও হাঁটুর উপরে রুমাল দিয়া সজোরে বাঁধিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, শশীকে একবার ডেকে আনো খুকি, দেখুক। যদি বিষ থাকে? চেনো তো শশীকে? তোমাদের পাড়াতেই থাকে,—ডাক্তার।

কুসুম মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, যা লো খুকি, ছোটোবাবুকে ডেকে আন। তাহার হাসিটা কুমুদেব ভালো লাগিল না।

ছোটোবাবুর কে হন? খানিক পরে কুসুমের এ কথার জবাবে সে তাই সংক্ষেপে শুধু বলিল, কেউ না। বন্ধু।

ছোটোবাবু আমাদের বলতে গেলে একরকম আপনার লোক। দুবেলা আসেন।

এ কথা শুনিয়াও কুসুমকে হঠাৎ আত্মীয়া জ্ঞান করিয়া বসিবার মতো মনের অবস্থা কুমুদের ছিল না। সে বলিল, ঢোঁড়া সাপের বিষ থাকে না কেন?

সব সাপের কি বিষ থাকে? ঢোঁডা হল জলের সাপ। আমায় একবার কামড়েছিল। হয়তো ওই সাপটাই হবে! একদিন খুব ভোরে এই পুকুরে নাইছি, বেড়াতে বেড়াতে ছোটোবাবু এসে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলেন। এমনি সময় সাপটা এইখানে কামড়ে দিল,—কুসুম তাহার লিভারটা দেখাইয়া দিল, তাহার বোধ হয় ধারণা ছিল মানুষের হৃদয়ের অবস্থানটা ওইখানে, ছোটোবাবুকে বললাম, সাপে কামড়েছে ছোটোবাবু। শুনে ছোটোবাবুর মুখ যা হয়ে গেল!

কী হয়ে গেল?—কুমুদ কৌতূহল বোধ করিতেছিল।

শুকিয়ে গেল। ছাইবর্ণ হয়ে গেল।

সাপের কামড়ে তোমার কিছু হল না?

কুমুদ তুমি বলায় কুসুম রাগ করিয়া বলিল, কথা বলতে শেখোনি দেখছি তুমি। ভদ্দরলোক তো?

তারপর দুজনেই দমিয়া যাওয়ায় আর কথা হইল না। তালগাছগুলি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। একটা মাছরাঙা ঝুপ করিয়া তালপুকুরে আছড়াইয়া পড়িল।

দুপুরবেলাটা বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া বেলা পড়িয়া আসিলে কুমুদ বিদায় গ্রহণ করিল।

সকাল সকাল পালা শুরু হবে। যাবে তো শশী?

যাব বইকী! নিশ্চয় যাব।

হারুর বাড়ির পিছনে সাতগাঁ পর্যন্ত বিস্তারিত ধানের খেত। তালপুকুরের ধার হইয়া খেতের আল দিয়া কুমুদ সাতগাঁর কাছারি বাড়ি পৌঁছিল। তালপুকুরে সে মতিকে দেখিবার আশা করিতেছিল। কিন্তু যাত্রা শুনিতে যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত মতির পুকুরে আসার সময় ছিল না। কুসুম রাঁধিতেছিল। সন্ধ্যার আগেই খাওয়ার পাট চুকিয়া যাওয়াই চাই। মতি আজ বিনা বাক্যব্যয়ে তাহার সমস্ত হুকুম পালন করিয়া যাইতেছিল।

পরান সব বিষয়ে উদাসীন। সন্ধ্যার আবির্ভাবে তাহার বোন আর বউ যত ব্যস্ত হইয়া ওঠে, সে যেন ততই ঝিমাইয়া যায়। রান্নাঘরে বসিয়া কুসুমের সঙ্গে সে প্রথম একটু গল্প জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। গল্প করিবার সময় না থাকায় কুসুম তাহাকে আমল দেয় নাই ; দাওয়ায় বসে হুঁকা টানো গো না বাবু? মেয়েমানুষের আঁচল-ধরা পুরুষকে আমি দুচোখে দেখতে পারি না।— কুসুমের ভর্ৎসনায় চিরকাল পরানের খারাপ লাগে। তবে স্পষ্ট খারাপ লাগার ভাবটা এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের একটা উদাস বৈরাগ্য ও দেহের একটা ঝিমানো আলস্যে পরিণত হইয়া যায় যে রাগিবার অবসর প্রায়ই সে পায় না। মাঝে মাঝে কুসুমকে তাহার ভারী ছেলেমানুষ মনে হয়। চোদ্দো বছর বয়সে তার বউ হইয়া এতকাল কুসুমের শরীরটাই যেন বড়ো হইয়াছে, মনের বয়স বাড়ে নাই।

মোক্ষদাকে একখানা ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়া পরান জিজ্ঞাসা করে, তুমিও যাবে নাকি মা, যাত্রা শুনতে?

না, আমার আবার যাত্রা কী!

জোর করিয়া ধরিলে মোক্ষদা যাইতে রাজি আছে। কিন্তু এরা কেউ যাইতে বলিবেও না। আগে হইতেই মোক্ষদা তাহা জানে। তাই সাঁতরাদের বুড়ি পিসির সঙ্গে সে আগেই পরামর্শ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। তারা দুজনে যাত্রা শুনিতে যাইবে। বাড়ি আসিয়া মোক্ষদা তাহা হইলে বলিতে পারিবে, যাত্রা শুনিবার শখ তাহার একটুও ছিল না। কী করিবে, আরেকজন টানিয়া লইয়া গেল। জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

পরান বলে, ফরসা কাপড় পরে তুমি তবে যাচ্ছ কোথা?

সাঁতরাদের বাড়ি যাব বাবা। যদুর পিসি একবার ডেকেছে।

কুসুম ঝাঁ করিয়া সামনে আসিয়া পড়ে।

কাল যেয়ো মা, কাল যেয়ো। আমরা এখন বেরোব, তুমি চললে সাঁতরাদের বাড়ি। বাড়িতে তাহলে থাকবে কে?

মোক্ষদা তার কী জানে। যার খুশি থাক।

তোমরা যাবে যাত্রা শুনতে, বাড়ির ব্যবস্থা তোমরাই করো বাছা। আমি তার কী জানি? আমি বুড়োমানুষ সব ব্যাপারে আমাকে টান কেন? আমি আছি নিজের শতেক জ্বালায়।

কুসুম রাগিয়া বলে, জ্বালা বাপু সংসারে সবারই আছে। ঘরে বসে জ্বললেই হয়? এমন শত্রুতা করা কেন? আগেই জানি শেষকালেতে একটা ফ্যাকড়া বাধবে!

মোক্ষদা বোধ হয় একটু লজ্জা বোধ করে। হয়তো তাহার মনে হয় বুড়োমানুষের যাত্রা শুনিতে যাওয়ার জন্য এ কাণ্ড করা উচিত নয়। বাড়িতে থাকিতে রাজি হইয়া সে গুম খাইয়া বসিয়া থাকে।

রান্না শেষ করিয়া কুসুম স্বামীকে খাওয়ায়, তারপর ননদের সঙ্গে এক থালায় নিজে খাইতে বসে। পরান পেট ভরিয়া খায়, কুসুম আর মতির গলা দিয়া আজ ভাত নামিতে চায় না। ফেলা-ছড়া করিয়া কোনোরকমে তাহারা খাওয়া শেষ করে। দিনের আলো যত ম্লান হইয়া আসে মনের মধ্যে তাহাদের এই আশঙ্কা ততই প্রবল হইয়া ওঠে যে, ওদিকে বুঝি যাত্রা শুরু হইয়া গেল। মতিকে কাপড় পরিতে হুকুম দিয়া কুসুম হেঁসেল তুলিয়া ফ্যালে। পুকুরে যাওয়ার সময় এখন নাই। উঠানের এক কোণে ছাইফেলা আমগাছটির তলে বসিয়া বাসন কখানা কুসুম তাড়াতাড়ি মাজিয়া নেয়। এই সুবিধাটুকুর ব্যবস্থা সে সেই বিকালেই করিয়া রাখিয়াছে। দুকাঁখে দুটি কলসি বহিয়া কত জল তুলিয়া কুসুম যে আজ হাঁড়ি গামলা সব ভর্তি করিয়াছে!

মতি বলে, আমিও হাত লাগাই বউ, শিগগির হয়ে যাবে, অ্যাঁ?

না। মতি তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে এ বিশ্বাস কুসুমের নাই। এক মিনিটের কাজে মতি দশ মিনিট লাগাইয়া দিবে।

যা বললাম তাই কর তো তুই। কাপড় পরতেই তো তোমার দশ ঘণ্টা।

একসময় গোধূলি শেষ হওয়ার আগেই, কী করিয়া কাজ শেষ হয়। বাকি থাকে শুধু এটা আর ওটা, যা করিলেও চলে, না করিলেও চলে। কুসুমের তাড়ায় পরান ও মতি দুজনেই সাজ সমাপ্ত করিয়াছে। নিজে সাজিতে গিয়া ওদের দুজনকে দেখিয়া কুসুম এতক্ষণে একটু হাসিল। শার্টের উপর উড়ানি চাপানোয় পরানকে একেবারে বাবু বাবু দেখাইতেছে। আর ডুরে শাড়ি পরিয়া মতি হইয়াছে সুন্দরী। মতির হালকা অপরিণত দেহটিকে কুসুম হিংসা করে। মনে হয়, তাহার নিজের স্বাস্থ্য এতখানি ভালো না হইলেই যেন সে খুশি হইত। ডুরে শাড়ি তারও আছে বইকী। তবে আজকাল রঙিন লাইন দিয়া শরীর ঢাকিতে কুসুমের লজ্জা করে।

আসরে যখন তাহারা পৌঁছিল, যাত্রা আরম্ভ হইতে বিলম্ব আছে, চিকের আড়ালে জায়গার জন্য কলহ শুরু হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই। সকলেই চিক ঘেঁষিয়া বসিতে চায়, এগারো বছরের সদ্য পর্দা-পাওয়া মেয়ে হইতে তাহার পঞ্চাশ বছরের দিদিমা পর্যন্ত। এ সব বিষয়ে কুসুম ভারী ওস্তাদ। সকলকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া সেই যে সে চিকের কাছে প্রথম সারিতে একটা দশ ইঞ্চি ফাঁকের মধ্যে নিজেকে গুঁজিয়া দিল কেহ আর তাহাকে সেখান হইতে নড়াইতে পারিল না। মতি তাহার পিঠের সঙ্গে মিশিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছুঁচের পিছনে সুতা চলার উপমার মতো আগাইয়া আসিয়াছিল। কুসুমের পিঠ ঘেঁষিয়া সে একরকম চরণ দত্তের গৃহিণীর কোলের উপরেই বসিয়া পড়িল। চরণ দত্তের গৃহিণী তাহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করায় কুসুমের কোমরটা সে জড়াইয়া ধরিল প্রাণপণে।

কুসুম মুখ ফিরাইয়া চোখ রাঙাইয়া চরণ দত্তের গৃহিণীকে বলিল, মেয়েটাকে ঠেলছ কেন গা? কেন ঠেলছ? গাল দিলে ভালো হবে! সরে বোসো, জায়গা দাও। সবাই বসবে, সবাই দেখবে,—তোমার একার জন্যে তো যাত্রা নয়?

কুসুমকে মতির এত ভালো লাগিল! কুসুমের কাছে মতি এত কৃতজ্ঞতা বোধ করিল!

যাত্রা শুরু হওয়ার একটু আগে কুসুম বলিল, ওই দ্যাখ মতি, ছোটোবাবু।

দেখেছি।

এত লোক, এত আলো, এত শব্দ—মতির নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। পাটকরা মুগার চাদরটি কাঁধে দেওয়ায় শশীকে ভারী বাবু দেখাইতেছে। সে আসরে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মতি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। স্বয়ং শীতলবাবু তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন দেখিয়া শশীর সম্মানে মতিরও সম্মানের সীমা নাই।

শামিয়ানার তলা ভরিয়া গিয়া খোলা আকাশের নীচে পর্যন্ত লোক জমিয়াছে। দুজন স্থূলকায়া গৃহিণীর মাঝে পড়িয়া মতির গরম বোধ হইতেছিল। এদিকে একসময় বাজনা বাজিয়া ওঠে। কনসার্ট,—ঐকতান। শুনিলে এমন উত্তেজনা বোধ হয়! কিছু একটা উপভোগ্য ঘটিবার প্রত্যাশা। তারপর বাজনা থামিয়া যাত্রা শুরু হয়। ষোলোজন সখী আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করে। তাদের পরনে পশ্চিমা ঘাগরা।

মতি ফিসফিস করিয়া বলে, ব্যাটাছেলে সখী সেজেছে, না বউ?

সখীরা নাচিয়া গেলে প্রবেশ করেন জনা ও অগ্নিদেব। জনাকে দেখিয়া মতির সন্দেহ হয়। ও নিশ্চয় মেয়েমানুষ বউ! না?

তোর মাথা। চুপ কর, শুনতে দে।

প্রবীরের প্রবেশ দ্বিতীয় দৃশ্যে। পুত্রঘাতী অর্জুনকে যথাবিধি শাস্তি দিবার প্রতিজ্ঞামূলক গঙ্গাদেবীর এক-পৃষ্ঠাব্যাপী স্বগত-উক্তির পরেই। প্রবীরকে দেখিয়াই আসর মুগ্ধ হইয়া যায়। কী স্মার্ট সাজপোশাক, কী লালিত্যময় যৌবনমূর্তি, তলোয়ারটা কী চকচকে। কথা যখন সে বলে আসরে, একটা শিহরন বহিয়া গিয়া শ্রোতারা যেন পরম আরাম বোধ করে। জমিবে, প্রবীরেব পার্ট জমিবে। খাসা জমিবে। যেমন রাজপুত্রের মতো চেহারা, তেমনি চমৎকার গলা। প্রবীরের প্রিয়া মদনমঞ্জরীও আসরে আছেন। এত লোকের মাঝে এ যেন একান্ত নির্জন রাজোদ্যান এমনি নিঃসংকোচ নির্ভুল আবেগমথিত স্বরে প্রবীর তাহাকে ভালোবাসিতে থাকে। যাত্রার আসরে হাত ধরার অতিরিক্ত প্রেমস্পর্শ নিষিদ্ধ। সে জন্য প্রবীরের কোনো অসুবিধা আছে মনে হয় না। শুধু কথায়, শুধু অভিনয়ে, এতগুলি লোকের মনে সে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে তাহারা দুজন একদেহ একপ্রাণ।

অবাক হয় কুসুম আর মতি।

কুসুম বলে, ওলো, এ যে সেই লোকটা!

মতি বলে, কী সুন্দর করছে বউ? মনে হচ্ছে যেন সত্যি!

কুসুম একটু হাসে, যেন তোর সঙ্গেই করছে, না?

মতি জবাব দেয় না। শোনে।

প্রবীর বলে :

রাগ করিয়াছ?
কেন রাগ করিয়াছ অবোধ বালিকা?
কেন এত অভিমান? দুটি চোখে
কেন এ ভর্ৎসনা? মুখে মেঘ
নামিয়াছে, দুলে দুলে ফুলে ফুলে
উঠিতেছে বুক, দেখে মনে হয়
আমি যেন বকিয়াছি তোরে,
মন্দ বলিয়াছি।
এ গাম্ভীর্য, হাসিহীন এত কঠোরতা
ফুলে কি মানায়, সখি,
মানায় কুসুমে? আমি তোরে ভালোবাসি,
সত্য কহিয়াছি, প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি তোরে।
সাক্ষী নারায়ণ। সাক্ষী মোর হৃদয়ের—

মতির বুকের ভিতর সিরসির করে। কুসুম মনে মনে অধীর হইয়া ভাবে, বল না লক্ষ্মীছাড়ি, রাগ করিনি! মুখ ফুটে ও কথাটা তুই আর বলতে পারিস না? ধন্যি প্রাণ তোর!

রাত তিনটা অবধি যাত্রা শুনিয়া আসিয়া ঘুম ভাঙিতে পরদিন সকলেরই বেলা হয়। হয় না শুধু শশী আর পরানের। যামিনী কবিরাজের বউ রোগের বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সকাল সকাল উঠিয়া স্নান করিয়া শশী তাহার কাছে যায়। পরানের ক-বিঘা জমিব ফসল অবিলম্বে ঘরে না তুলিলেই নয়। নিজে উপস্থিত না থাকিলে সাতাশটা খেজুরগাছের রসও তাহার অর্ধেক চুরি হইয়া যাইবে।

তালগাছ ছাড়া আব কোনো গাছ পরান এবার জমা দেয় নাই। এবার সে নিজেই খেজুর রস জ্বাল দিযা গুড় করিবে। ডাঙা জমিতে এবার সে কিছু মূলারও চাষ করিবে স্থির করিয়াছে। শশী বলিযাছে, জমিতে হাড়েব সার দিলে মূলা ভালো হয়। দশ সের গুঁড়া হাড় পরান পরীক্ষার জন্য আনাইয়া লইযাছে। এখনও জমিতে দেওয়া হয় নাই। পরানের অনেক কাজ।

দুপুরে কুমুদ শশীব বাড়িতে আসিল। শশী বাড়ি ছিল না। গোপাল জানিয়াছে কুমুদ যাত্রা করে। কুমুদকে সে বাড়ির বেড়া পার হইতে দিল না। বাহিরের ঘরে বসাইয়া রাখিল।

দাবা খেলতে পাব হে?

আজ্ঞে না।

গোপাল তখন বাড়িব মধ্যে গেল ঘুমাইতে। কুমুদ, গতরাত্রের হাজাব নরনারীর হৃদয়জয়ী কুমুদ, নিজেকে পরিত্যক্ত বন্ধুহীন মনে কবিয়া গেল তালপুকুরের ধারে। সেখানে তাহার বন্ধু জুটিল মতি।

মতি কি মাঝে মাঝে তালপুকুরে কবিত্ব কবিতে আসে? নিঝুম দুপুবের অলস প্রহরগুলি ঘবে কি তাহার কাটে না? কে বলিবে! আজ কিন্তু সে বিশেষ দরকারেই তালপুকুরে আসিয়াছিল। পুকুরপাড়ে কাল সে কানের একটা মাকড়ি হারাইয়াছে। যাত্রা দেখার উৎসাহে কাল খেযাল থাকে নাই। আজ স্নানের সময় কানে হাত পড়িতে,—ওমা, মাকড়ি কোথায়? ভয়ে কথাটা সে কাহাকেও বলে নাই। দুপুরে সকলে ঘুমাইলে চুপিচুপি খুঁজিতে আসিয়াছে।

রূপা নয়, তামা নয়, সোনার মাকড়ি। কী হইবে?

মাকড়ি মতি পাইল না। পাইল কুমুদকে। উভয় পক্ষই কৃতার্থ হইয়া গেল। কুমুদ এ জগতেব রক্তমাংসের মানুষ নয়, রূপকথার রাজপুত্র, মহাতেজা, মহাবীর্যবান, মহা-মহা প্রেমিক। হ্যাঁ, কুমুদ মাটির পৃথিবীর কেহ নয়। পৃথিবীর সেরা লোক শশী; কুমুদ শশীর মতোও নয়। ছোটোবাবুর কথা মতি কি না জানে? ছোটোবাবু কী খাইতে ভালোবাসে তা পর্যন্ত। কুমুদ কী খায় কে তার খবর রাখে? শার্ট পরা কুমুদ হইল রাজপুত্র প্রবীর। শশী কে?

কী খুঁজছ খুকি?

মতি বলে। বলিতে মতির ভালো লাগে। সোনার মাকড়ি হারানো যেন বাহাদুরি কাজ। বলে, বাড়িতে জানলে মেরে ফেলবে।

মেরে ফেলবে? বাড়িতে তোমাকে খুব মারে নাকি?

এমনি মারে না। দামি জিনিস হারালে মারে। আজ আপনি কী সাজবেন?

রাবণ। কুমুদ হাসে।

হ্যাঁ, রাবণ বইকী রাবণ তো দেখতে বিশ্রী?

কুমুদ খুশি হইয়া বলে, লক্ষ্মণ সাজব।

মতি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করে, ঊর্মিলা কে সাজবে? কাল যে আপনার বউ সেজেছিল সে? আচ্ছা, ও তো ব্যাটাছেলে, অ্যাঁ?

কুমুদ বলে, ব্যাটাছেলে বইকী।

মতির সঙ্গে কুমুদও মাকড়ি খোঁজে। তালপুকুরের ভাঙাচোরা ঘাট হইতে তালবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পায়ে চলা পথের দুধারে।

বাড়ির কাছে পৌঁছিয়া যাওয়ার ভয়ে মতি বলে, ওদিকে নেই, আমি ভালো করে খুঁজেছি। ভাবে প্রবীর চলিয়া গেলে এখান হইতে বাড়ি পর্যন্ত সে নিজেই খুঁজিয়া দেখিবে। খুঁজিতে খুঁজিতে দুজনে আবার ঘাটে ফিরিয়া যায়।

মতি বলে, কোথায় পড়ে গেছে কে জানে! ও আর পাওয়া যাবে না।

না পেলে তোমায় মারবে, না? কে মারবে?

কে মারিবে মতি তাহার কী জানে? একজন কেউ মারিবে নিশ্চয়।

তবে তো মুশকিল।—কুমুদ চিন্তিত হইয়া বলে।

বলে, তোমার আর একটা মাকড়ি কই? দেখি, কী রকম?

অন্য মাকড়িটি মতি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। খুলিয়া দেয়। খুবই সাদাসিদে মাকড়ি, একটুকরা চাঁদের কোলে একবত্তি একটা তারা। তারার তলে চাঁদটা দোলে।

মাকড়ি হারিয়েছে কাউকে বোলো না খুকি।

কেউ টের না পাইলে মতি আপনা হইতে অবশ্যই বলিবে না। কিন্তু কেন?

কাল তোমাকে একটা মাকড়ি এনে দেব।

মতি অবাক হইয়া যায়।

পাবেন কোথায়?

কেন, গাঁয়ে তোমাদের গয়নার দোকান নেই?

কিনে আনবেন!—মতির মনে হয় মাকড়ি কেনার আগে প্রবীর তাকেই কিনিয়া ফেলিয়াছে?

তাহার মাকড়িটা পকেটে ভরিয়া কুমুদ চলিয়া গেলে, পুকুরঘাটে বসিয়া বসিয়া সে এই কথাটাই ভাবে। তাহাকে একটা মাকড়ি দেওয়া প্রবীরের কাছে কিছুই নয়। আরও কত মেয়েকে হয়তো সে অমন কত দিয়াছে। বেশি না থাক, যাত্রার দলে দুটো একটা মেয়েও কি নাই? তবু তাহাকেই মাকড়ি দিতে চাওয়ার জন্য প্রবীর কী ভয়ানক ভালো!

আজ তাহাদের যাত্রা শুনিতে যাওয়া বারণ। পরান নিষেধ করিয়া দিয়াছে। রোজ রোজ যাত্রা শোনা কী? একদিন শুনিয়া আসিয়াছে, আজ বাদ যাক, কাল আবার শুনিবে। পরান ওদের যাত্রা শুনিতে যাওয়া পছন্দ করে না। কেন করে না তার কোনো কারণ নাই। ওরা যাত্রা শুনিয়া বেলা দশটা পর্যন্ত পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাক আর না ঘুমাক, পরানের কিছুই আসিয়া যায় না। প্রতিদিন প্রদোষের আধ অন্ধকারে সে যখন বাহির হইয়া যায়, এ বাড়িতে কারও ঘুম ভাঙে না। তাহার সুখ-সুবিধার দিকে তাকানোর অভ্যাস এ বাড়িতে কাহারও নাই। এক বেলা ভাতের বদলে মুড়ি খাইয়া থাকিতে হইলে নালিশ করা পরানকে দিয়া হইয়া ওঠে না। তবু সে চায় না বাড়ির মেয়েরা যাত্রা শুনিতে যায়—পরপর দুদিন যাত্রা শুনিতে যায়।

তুমি যাবে না? না, নিজের বেলা ভিন্ন নিয়ম? কুসুম বলিল। সে রাগিয়াছে।

আমার সঙ্গে তোমার কথা কী? ব্যাটাছেলে নাকি তুমি?

তুমি গেলে আমিও যাব।

আমি যাব না তবে!—পরানও মাঝে মাঝে গোঁ ধরিতে জানে।

কুসুম বলে, তুমি যাও বা না যাও আমি কিন্তু যাব।

চুলোয় যাও।

মুখে যাই বলুক, কুসুম যাত্রা শুনিতে যাওয়ার কোনো আয়োজনই করিল না। পাড়ার অনেক বাড়ির মেয়েরা যাইবে। কুসুমও তাদের সঙ্গে যাইতে পারে। কিন্তু যাওয়ার চেয়ে না যাওয়ার মধ্যেই এখন রাগ ও অভিমান বেশি প্রকাশ পায় ; জিদও তাহাতেই বজায় থাকে বেশি। কুসুম তাই সারাটা দুপুর ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় বাজনার শব্দ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল মতি। প্রবীর আজ লক্ষ্মণ সাজিবে। কী রকম না জানি আজ দেখাইবে তাহাকে! পারিলে মতি একাই চলিয়া যাইত। দুবছর আগেও এমন সে গিয়াছে। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। দুবছরের মধ্যে সে যে কী ভয়ানক বড়ো হইয়া গিয়াছে ভাবিলেও মতির চমক লাগে। কিন্তু কী করা যায়? অমন করিয়া বাজনা বাজিতে থাকিলে ঘরেও তো টেকা অসম্ভব।

একসময় কুসুমকে সে বলিল, যাত্রা নাই শুনি, ঠাকুর দেখে আসি চল না বউ?

পরান দাওয়ায় বসিয়া অর্থসমস্যার কথা ভাবিতেছিল। সে ডাকিয়া বলিল, এদিকে শোন মতি, শুনে যা।

মতি কাছে আসিল . কী বলছিলি?

ঠাকুর দেখতে যাব।

ঠাকুর দেখতে যাবি? আচ্ছা, চল। একটু যাত্রাও শুনে আসবি অমনি।

পরান এমনিভাবে একরকম স্পষ্টই হার স্বীকার করিল। কিন্তু কুসুম আর যাইতে রাজি নয়। এখন খাওয়া দাওয়া সারিয়া পান সাজিয়া যাইতে যাইতে পালা শেষ হইয়া যাইবে না?

ঠাকুর পূজার বাদ্যি বাজছে। পালা শুরু হতে ঢের দেরি।—পরান উদাসভাবে বলিল।

মতি বলিল, চল না বউ? অমন করিস কেন?

কুসুম বলিল, গিয়ে বসবি কোথায়? তোর জন্যে জায়গা ঘুমোচ্ছে! সব্বাইয়ের পিছনে বসে যাত্রা শোনার চেয়ে ঘরে শুয়ে ঘুমানো ঢের ভালো।

পরান বলিল, ছোটোবাবুকে বললে -

ছোটোবাবুর নামোল্লেখে কুসুম আরও রাগিয়া বলিল, ছোটোবাবু কী করবে? জায়গা গড়িয়ে দেবে?

পরান বলিল, ছোটোবাবুর বাড়ির সবাই বাবুদের বাড়ির মেয়েদের জায়গায় বসে। নেটের পর্দা টাঙানো দেখিসনি মতি? বাবুদের বাড়ি ছোটোবাবুর খাতির কত। ছোটোবাবুকে বললে তোদের ওইখানে বসিয়ে দেবে।

কুসুম হঠাৎ শান্ত হইয়া বলে, না আমি যাব না।

তাহাকে আর কোনোমতেই টলানো যায় না। বাবুরা জমিদার, শশীরা বড়োলোক। ওদের বাড়ির মেয়েদের কত ভালো ভালো কাপড়, কত দামি দামি গয়না। একটা জবরজং লেস লাগানো জ্যাকেট গায়ে দিয়া তাঁতিবাড়ির কোরা কাপড় পরিয়া ওদের মাঝখানে (মাঝখানে তাহাকে বসিতে দিবে না ছাই, এক কোণে ঝির মতো বসিতে হইবে) গিয়া বসিলে দম আটকাইয়া যাইবে কুসুমের।

শেষ পর্যন্ত পরানের সঙ্গে মতি একাই গেল। শশীকে খুঁজিতে হইল না। সে বাড়িতেই ছিল। সে বলিল, তোর তো শখ কম নয় মতি! কিন্তু সঙ্গে গিয়া মতির বসিবার একটা ভালো ব্যবস্থা করিয়া দিতে সে আপত্তি করিল না। বরং নেটের পর্দার আড়ালে, যেখানে বাবুদের বাড়ির মেয়েরা বসে, মতিকে সেখানে বসাইতে পারিয়া সে বিশেষ গর্বই বোধ করিল।

শীতলবাবুদের বাড়ির মেয়েরা গায়ে সিল্কের ব্লাউজ দেয়, বোম্বাই শাড়ি পরে। শীতলবাবুর ভাই কলিকাতা-প্রবাসী বিমলবাবুর স্ত্রী-কন্যারা পায়ে জুতাও দিয়া থাকে। দুভায়ের পরিবারের নারীর

সংখ্যাও কি কম! সংসারে যেখানে যত টাকা, সেখানে তত নারী, সেখানে তত রূপ। মতি সংসারে এ নিয়ম জানিত না। সংসারের কোন নিয়মটাই বা সে জানে? কাঁচা মেয়ে সে, বোকা মেয়ে। প্রায় কুড়ি বর্গফিট পরিমাণ পরিষ্কার চাদরের উপর গাদা করা ঘষামাজা সাজানো-গোছানো স্বজাতির মধ্যে আসিয়া পড়ায় সে যেন দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল।

বিমলবাবুর স্ত্রী শুধোন, আমার মুখে কী দেখছ বাছা?

বিমলবাবুর মেয়ে বলে, তোমার চশমা দেখছে মা।

মতির বুকের ভিতর টিপ টিপ করে। তাহাকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে সম্মানের আসনেই, সামনের দিকে,—পিছনে আশ্রিত পরিজনদের মধ্যে নয়। শীতলবাবু নিজে মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, সামনে বসিয়ো। শশী ডাক্তারের বাড়ির মেয়ে।

কাল শশী ডাক্তারের বাড়ির মেয়েরা যত বিশ্রী করিয়াই হোক খুব সাজিয়া আসিয়াছিল, এর আজ এ কী বেশ! শীতলবাবু আর বিমলবাবুর বাড়ির মেয়েরা এইকথা ভাবিয়াছিল। তাহারা কাপড় চেনে, গয়না চেনে, নিজেদের ঘষে এবং মাজে। ও মেয়েটা, ধবিতে গেলে, রীতিমতো নোংরাই।

শীতলবাবুর পুত্রবধূ গতবার ছেলে হওয়ার সময় বাজিতপুরের সিভিল সার্জন আসিয়া পড়ার আগে শশীর হাতেই জীবন সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিছানায় শুইয়া শুইয়া নভেল পড়ার সে কী ভীষণ শাস্তি! যাই হোক, ছেলেটি ঝির কাছে দোতলায় এখন চোখ বুজিয়া ঘুমাইতেছে। সিভিল সার্জন করিয়াছিল কচু, ছেলেটা একরকম শশী ডাক্তারেরই দান বইকী? শীতলবাবুর পুত্রবধূ তাই এক সময় মতিকে কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, শশী ডাক্তার তোমার কে হয় গো?

কেউ না।

ওমা! কেউ না? এই রাত্রে তুমি পরের সঙ্গে যাত্রা দেখতে এলে?

পর কেন? দাদার সঙ্গে এসেছি।

তোমার দাদা কে? কাদের বাড়ির মেয়ে তুমি?

আমি ঘোষবাড়ির মেয়ে,—আমার বাবা স্বর্গীয় হারাণচন্দ্র ঘোষ।

কথাটা শীঘ্রই রটিয়া গেল। হারু ঘোষের মেয়েকে তাহাদের মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়ার স্পর্ধায় শশীর উপর শীতলবাবু আর বিমলবাবুর পরিবারের মেয়েরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। মতির কাছে যাহারা ছিলেন, তাহারা বাড়ির মধ্যে যাওয়ার ছলে উঠিয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অন্যত্র বসিলেন। হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিবার সুযোগ পাইয়াও মতির কিন্তু আরাম হইল না। অবহেলা অপমান বুঝিতে না পারার মতো বোকা সে তো নয়।

এদিকে শশী মাঝে মাঝে সাজঘরে যায়। কুমুদকে প্রশংসা করিয়া বলে, বেশ হচ্ছে কুমুদ। তুই কলকাতার থিয়েটারে গেলি না কেন?

কুমুদ খুশি হইয়া বলে, ভালো হচ্ছে? চোদ্দো বছর উপোস করতে হয়েছে ভাই। তবু এখনও বউদিকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারিনি। অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাদাকে রাজা করতে পারলে বাঁচি।

কুমুদ হাসে : খানিক পরে অশোকবন থেকে বউদিকে আনতে যাব—রাবণ বধ হতে বেশি দেরি নেই। সে সিনটা দেখিস! হ্যাঁরে, তোদের গাঁয়ে গয়নার দোকান আছে?

শশী বলিল, গয়নার দোকান! গয়নার দোকান কোথায় পাব? দুটো স্যাকরার দোকান আছে, ফরমাশ দিলে গয়না তৈরি করে দেয়। ছোটো ছোটো দুটো একটা গয়না সময় সময় তৈরি করে রাখে হয়তো, দোকান করার মতো কিছু নয়। গয়না কিনবি নাকি?

কিনব? আমি? কেন, গয়না কিনব কেন?

শশী একটু বিচলিত হয়। কুমুদ গয়নার দোকানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে কেন? তাও এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছে! কী ভাবিতেছে ও?

শশী ভাবে, সৃষ্টিছাড়া গোঁয়ার ছেলে, জগতে এমন কাজ নাই যা করে না,—ওই সব করিয়াই যেন সুখ পায়। কিন্তু গয়নার দোকানের খবর নেয় কেন? শশী আরও ভাবে যে খবর লইতে হইবে বিনোদিনী অপেরা পার্টি বাজিতপুরে অভিনয় করার সময় সেখানকার কোনো গয়নার দোকানে কিছু ঘটিয়াছে কিনা।

শশীর মনের মধ্যে সন্দেহটা খচখচ করিয়া বেঁধে বইকী! সে মনে করে বইকী যে আচ্ছা পাগল সে, এ কী কথা, এও কি কখনও হয়? তবু সে ভাবিয়া রাখে, বাজিতপুরের গয়না দোকানের গত দুমাসের কুশল কালই জানিবার চেষ্টা করিবে। এই অন্যায় কাজটা করিবার আগাম প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে রাত বারোটার সময় বাড়ি ফেরার আগে কুমুদকে সে পরদিন দুপুরে অহার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া যায়।

পরানকে বলে, মতিকে এবার বাড়ি নিয়ে যাও না পরান? কত রাত জাগবে?

পরানেরও ঘুম পাইয়াছে। সে বলে, যাবে কী!

কিন্তু মতিকে ডাকিবামাত্র চলিয়া আসে। আজ যাত্রা শুনিতে তাহার ভালো লাগিতেছিল না। যে কাঁচা মনে বিনা কারণেই সর্বদা আনন্দ ভরিয়া থাকে, যে কোনো একটা তুচ্ছ উপলক্ষে মনে যাহার উত্তেজিত সুখ হয়, শীতলবাবু আর বিমলবাবুর পরিবারের মেয়েরা যাত্রা শোনার উৎসাহ তাহার নষ্ট করিয়া দিয়াছে। মতি যেন চুরি করিয়া বাড়ি ফিরিল। তবু, কী সুন্দর ওই মেয়েমানুষগুলি! এক একজন যেন এক একটি ছবি।

হারু ঘোষ যেখানে বজ্রাঘাতে মরিয়াছিল, সেখানটা বিষাক্ত সাপের আস্তানা। হারু ঘোষের বাড়ির কাছে তালবনের সাপগুলির বিষ নাই। বিষ নাই? কুমুদকে যে সাপটা কামড়াইয়াছিল সেটার বিষ ছিল না। সেটা জলের সাপ, ঢোঁড়া সাপ। কিন্তু তালবনের সব সাপ কি জলের সাপ, সব সাপ কি ঢোঁড়া সাপ? কে বলিবে! মতি তাহা জানে না। শেষ পর্যন্ত তাহাকে স্বীকার করতে হয় যে, অন্য সাপ কামড়ালে হয়তো যেতেন মরে।

মতির দুকানে দুটি মাকড়ি দোলে। মাকড়ি দুটির চাঁদ দুটির কোলে একরতি তারা দুটিও দোলে। কুমুদ নিজের হাতে তাহাকে মাকড়ি পরাইয়া দিয়াছে। ওর মধ্যে একটা নূতন, ঝকঝকে, অন্যটা অনেক দিনের পুরানো, মলিন। এও একটা সমস্যার কথা বইকী! মতি যত বোকাই হোক,—আসলে, সে আর এমনকী বেশি বোকা?—এটুকু মতি খেয়াল করিয়াছিল! নূতন মাকড়ি দেখিলেই সকলে ধরিয়া ফেলিবে যে! সে বলিবে কী? কৈফিয়ত দিবে কী? রাজপুত্র প্রবীর, দুপুরবেলা তালপুকুরের ধারে মাকড়িটি নিজের হাতে তাহার কানে পরাইয়া দিয়াছে শুনিলে বাড়িতে তাহাকে আর আস্ত রাখিবে না। কুমুদ এ সমস্যারও মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। বাড়ি যাওয়ার আগে (বাড়ি যেন মতির কত দূর!) কান হইতে দুটা মাকড়িই মতি খুলিয়া ফেলিবে। রাত্রে তেঁতুল মাখাইয়া রাখিয়া দিয়া সকালে সোডা দিয়া মাজিলে দুটি মাকড়িকেই মনে হইবে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করা পুরানো মাকড়ি। জিজ্ঞাসা করিলে মতি বলিবে, সাফ করেছি। তেঁতুল দিয়ে আর সোডা দিয়ে। মতি এই কথা বলিবে। এই সত্য কথাটা।

কুমুদের বুদ্ধি দেখিয়া মতি অবাক হইয়া গিয়াছে।

—অন্য সাপে কামড়ালে মরে যেতাম? আমি মরে গেলে তুমি কী করতে?

আমি? আমি কী করতাম? কী জানি কী করতাম।

কাঁচা মেয়ে। একেবারেই কাঁচা মেয়ে। কিন্তু মনে মনে মতি সবই জানে। কী জানে না সে? সেদিন কুমুদ সাপেব কামড়ে মরিয়া গেলে সে কিছুই করিত না এক নম্বর মতি এটা জানে। দু নম্বব সে জানে, কুমুদ শুনিতে চায় সে মরিয়া গেলে মতি একটু কাঁদিত। মতি এত কথা জানে। সে কিছু করিত না এই সত্য কথা, আর সে যে একটু কাঁদিত এই মিথ্যা কথা, এর কোনোটাই যে বলিতে নাই, এও যদি মতি না জানিবে—মধ্যবর্তী ও জবাবটা দিয়া সে অজ্ঞতার ভান করিল কেন? তবু, যত হিসেবই ধবা যাক, মতি কাঁচা মেয়েই।

এখন যদি মরে যাই? কুমুদ বলে।

তাহলে আমি- -এখন যদি মরে যান? দুর, মরার কথা বলতে নেই।

কে জানে মতি এ সব শিখিল কোথায়! আপনা হইতেই শিখিয়াছে নিশ্চয়,—কথা বলিতে, কাপড় পরিতে, ভাত খাইতে শেখাব মতো। এ সব কেহ শেখায় না। কে শিখাইবে? এবং তারপর কুমুদ মতিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। আর ছেলেমানুষি প্রশ্ন নয়। তাহার নিজের কথা, আত্মীয়স্বজনেব কথা, তাহার গ্রামের কথা। মতি আগ্রহের সঙ্গে সকল প্রশ্নের জবাব দেয়। কখনও পালটা প্রশ্ন করে। কখনও বা আপনা হইতেই কুমুদকে অনেক অতিরিক্ত অবান্তর কথা বলে। তাহার সরল চাহনি একবারও কুটিল হইয়া ওঠে না। তাহাব নির্ভয় নির্ভরশীলতা কখনও টুটিয়া যায় না। না, মতির কোনো ভাবনা নাই। সে কিছু জানে না, কিছু বোঝে না, পৃথিবীর সবই তাহার কাছে অভিনব, অভিজ্ঞতার অতীত। কুমুদকে হাত ধরিতে দেওয়া উচিত কি অনুচিত সে তার কী জানে? ও সব কুমুদ বুঝিবে। রাজপুত্র প্রবীর বুঝিবে। মতিব বিশেষ লজ্জাও করে না। তবে, হঠাৎ চোখ নিচু করিয়া একটু সে যে হাসে সেটা কিছু নয়।

দিন ও রাত্রিব মধ্যে দুপুরের সময়ের গতি সবচেয়ে শিথিল। দুপুরেব অন্ত নাই। আকাশেব সূর্য কতক্ষণে কতটুকু সরিয়া তাহাদের গায়ে রোদ ফেলেন জানা যায় না। তাহারা উঠিয়া টিলাটার দিকে চলিতে থাকে। ওদিকে নিবিড় ছায়ার ছড়াছড়ি।

পাঁচ

যামিনী কবিবাজের বউ বাঁচিয়া উঠিয়াছে। ভগবানের দয়া, যামিনী কবিবাজের বউয়ের কপাল, শশীর গৌরব।

গোপাল ছেলের সঙ্গে আজকাল প্রায় কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যামিনী কবিরাজের বউ বাঁচিয়া উঠিয়াছে বলিয়া নয়, অন্য কাবণে। অন্তত সাধাবণ মানুষের তাই ধরিয়া লওয়া উচিত। ব্যাপাবটা হইয়াছিল এই। শশীর বেশ পসার হইয়াছে। বাজিতপুরেব সরকারি ডাক্তারকে ডাকিতে খরচ অনেক। অনেকে শশীকেই ডাকে। যামিনী কবিরাজের বউয়ের চিকিৎসার জন্য কয়েক দিন শশী দূরে কোথাও যাওয়া তো বন্ধ রাখিয়াছেই, তিন মাইল দূরের নন্দনপুরের কল পর্যন্ত ফিরাইয়া দিয়াছে। এই সময়টা যামিনী কবিরাজের বউ মরিতে বসিয়াছিল। গোপালের উসকানিতে যামিনী ঝগড়া করিয়া অপমান করিয়া শশীর আসা-যাওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া সফল হয় নাই। দূর গ্রামে রোগী দেখিতে পাঠাইতে না পারিয়া ছেলের উপর গোপাল খেপিয়া গিয়াছে। অথচ বাড়াবাড়ি করিবার সাহস তাহাদের ছিল না। শশীকে তাহারা দুজনেই ভয় করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। মনে পাপ থাকার এই একটা লক্ষণ। মনে হয়, সকলে বুঝি সব জানে। সাপ উঠিয়া পড়ার আশঙ্কায় কেঁচো খুঁড়িবার চেষ্টাতেও মানুষ ইতস্তত করে। আকাশে চাঁদ ওঠে, সূর্য ওঠে। পৃথিবীটা চিরকাল ঈশ্বরের রাজ্য। মানুষের এই বদ্ধমূল সংস্কার সহজে যাইবার নয়। হাজার পাপ করিলেও নয়।

এমনি করে তুমি, গোপাল বলিয়াছিল, পসার রাখবে? লোকে ডাকতে এলে যাবে না? মক্কেল ফিরিয়ে দেবে?

বলিয়াছিল, যামিনী খুড়ো কোনোদিন এতটুকু উপকার করবে যে ওর জন্য এত করছ? নিজের সর্বনাশ করে পরের উপকার করে বেড়ানো কোন দেশি বুদ্ধির পরিচয় বাপু?

আমার মার যদি ওমনি অসুখ হত?---শশী বলিয়াছিল। কেন বলিয়াছিল কে জানে!

তোমার মা তো বাপু বেঁচে নেই? কপাল ভালো, তাই আগে আগে ভেগেছেন। তোমার যা সব কীর্তি—যে কীর্তি সব তোমার ;—তুই উচ্ছন্ন যাবি শশী!

যামিনী কবিরাজের বউ বাঁচিয়া উঠিবার পর বিপজ্জনক গাম্ভীর্যের সঙ্গে গোপাল বলে, এইবার কাজকর্মে মন দাও শশী। যামিনী খুড়োর ইচ্ছে নয় তুমি আর ওদের বাড়ি যাও।

ঠাকুর্দাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

সর্বনাশ! শশী এ সব বলে কী?

তোমার ইচ্ছেটা কী শুনি? হ্যাঁ হে বাপু, মনে বাসনাটা তোমার কী? সব ছেড়ে ছুড়ে আমি কাশী চলে গেলে তুমি বোধ হয় খুশি হও? গুরুদেব তাই বলছিলেন। বলছিলেন, আর কেন গোপাল, এইবার চলে এসো। আমি ভাবছিলাম, শশীব একটু স্থিতি করে দিয়ে যাই, হঠাৎ সব ছেড়ে চলে গেলে ও কোনদিক সামলাবে। কিন্তু তুমি এ রকম আবম্ভ করলে আর একটা দিনও আমি থাকি কী করে?

গোপাল করিবে সংসাব ত্যাগ, গোপাল যাইবে কাশী! সম্মুখ যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া পিছন হইতে গোপালের এই ধরনের আকস্মিক আক্রমণ শশীর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, সে এতটুকু টলে না।

কী অন্যায় কাজটা করেছি আমি, তাই বলুন না।

কী করেছ? মুখে চুনকালি মেখেছ। সবাই কী বলছে তোমাব কানে যায় না—আমার কানে আসে। যামিনী খুড়োব বউয়েব অসুখে তোমার এত দরদ কেন? ডাক্তার মানুষ তুমি, একবার গেলে, ওষুদ দিলে, চলে এলে। দিনরাত রোগীর কাছে পড়ে থাকলে বলবে না লোকে যে আগে থাকতে কিছু না থাকলে-

এ সব আপনার বানানো কথা।

এ অভিযোগ সত্য বলিয়া গোপালের রাগ বাড়িয়া যায়। গোপাল ছেলের সঙ্গে কথা বলে না। একটি কথা নয়। বাহিরেব ঘরে ফরাশের উপর খাতাপত্র ছড়াইয়া বসিয়া গোপাল হিসাব দেখে,—খাতক, ঋণপ্রার্থী, পরামর্শপ্রার্থী ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে। শশী ঘরের ভিতর দিয়া পার হইয়া যাইবার সময় গোপাল হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া আড়চোখে ছেলের দিকে তাকায়। কথা বলিবে না, না বলুক, ছেলেকে গলার আওয়াজও সে শুনাইবে না কি? তা নয়। শশীকে দেখিলে গোপালেব ডাকিতে ইচ্ছা হয়, শশী শোন। এই ইচ্ছাটা দমন করিবার সময় গলা দিয়া গোপালের আওয়াজ বাহির হয় না। গোপাল বাক্যহারা হইয়া থাকে।

শশী বাহির হইয়া গেলে অনুগ্রহপ্রার্থীকে বলে, শুধিয়ে এসো তো যাচ্ছে কোথায়?

সে যদি আসিয়া বলে, যামিনী কবিরাজের বাড়ি,—গোপাল একদম খেপিয়া যায়।

ইয়ারকি? ইয়ারকি হচ্ছে আমার সঙ্গে?

অনুগ্রহপ্রার্থীর চোখে আর পলক পড়ে না।

যামিনী কবিরাজের বউয়ের গুটিগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে কার্তিক মাস কাবার হইয়া অগ্রহায়ণেরও কয়েক দিন লাগিয়াছে। তাহাকে দেখিলে এখন ভয় করে, করুণা হয়। সর্বাঙ্গের ছোটো ছোটো ক্ষতগুলি এখনও লালচে রঙের কদর্য কতগুলি গর্ত। সময়ে বার কয়েক চুমটি পড়িয়া পড়িয়া

ক্ষতের কতক দাগ অনেকটা মিলাইয়া আসিবে, কতক থাকিবে। কিন্তু যামিনী কবিরাজের বউয়েব রূপের খ্যাতি আর রহিল না। রূপই গেল নষ্ট হইয়া, রূপের খ্যাতি!

একটা চোখও তাহার নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই ক্ষতিটাই যামিনী কবিবাজের বউকে কাবু করিয়াছে সবচেয়ে বেশি। শুধু ক্ষতচিহ্নে ভরিয়া রূপ নষ্ট হওয়াটাও তাহার কাছে সহজ ব্যাপার নয়। রূপ তাহার তেত্রিশ বছরের আত্মীয়, তেত্রিশ বছরের অভ্যাস। একগোছা চুল কাটিতে মেয়েরা কাতর হয়, এ তো তাহার সর্বাঙ্গীণ সৌন্দর্য, আসল সম্পত্তি। তবু এটা তাহার সহ্য হইত। মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইতে পারিত যে আর কি তাহার ছেলেখেলার বয়স আছে? ছেলেভুলানো রূপ দিয়া এখন সে করিবে কী? কিন্তু চোখ কানা হইয়া যাওয়া! এ তো রূপ নষ্ট হওয়া নয়, এ যে কুৎসিত হওয়া কদর্য হওয়া! তাহাকে দেখিলে এবার যে লোকের হাসি পাইবে? তাহার অমন ডাগর চোখ!

চোখটা নষ্ট হয়ে গেল শশী। আমি কানা হয়ে গেলাম।

কী আর করবেন সেনদিদি? বেঁচে যে উঠেছেন—শশী সান্ত্বনা দেয়।

এর চেয়ে আমার মরাই ভালো ছিল শশী, যামিনী কবিরাজের বউ বলে।

বলে, দেখলে ঘেন্না হয়, না?

না না, ঘেন্না হবে কেন? ঘেন্না হয় না।

যামিনী কবিরাজেব বউকে দেখিলে শশীর দুঃখ হয়, ঘেন্না হয়তো হয না। না ঘেন্না হয় না। শশী সে বকম নয়।

কিন্তু সেনদিদিরি দাম যে কমিয়াছে তাতে সন্দেহ নাই। শশী অবশ্য বুঝিতে পারে না, সেনদিদির আকর্ষণ যতখানি কমিয়াছে সহানুভূতি দিয়া তাহাব ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। সেনদিদির হাসি আব দেখিবার মতো নয়, তাহাব একটি চোখে এখন আর গভীর স্নেহ রূপ নেয় না, তাহার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবার সাধ্য এখন আর কাহারও নাই। সেনদিদির মুখের কথা, তাহাব স্নেহ ও পক্ষপাতিত্ব আজ আর অমূল্য নয়। তাহার জন্য শশীর দুঃখ হয় কিন্তু শশীকে সে আর তেমনভাবে টানিতে পারে না।

প্রতিদিন সেনদিদিকে দেখিতে আসার সময় শশী আজকাল পায় না। আসিলেও, বেশিক্ষণ বসিবার তাহার উপায় নাই। যামিনী কবিরাজেব বউকে ভালো করিয়া শশীর পসার কয়েক দিনেই বাড়িয়া গিয়াছে। রোগীকে সে আর ফিরাইয়া দেয় না, দেখিতে যায়, পকেটে টাকা লইয়া বাড়ি ফেরে। একটা রাত্রি সে তো নন্দনপুরেই কাটাইয়া আসিল। যাতায়াতের খরচ আর দশ টাকা ভিজিট। গ্রামে দশটা রোগী দেখিলে দশ টাকা, একরাত্রে দশ দশটা টাকা পাওয়া সহজ কথা নয।

যামিনী কবিরাজেব বউ বলে, সেনদিদিকে ত্যাগ করলে না কি শশী?

না, সেনদিদি। রোগীর বড়ো ভিড়। আসবার সময় পাই না।

আঃ, বেঁচে থাকো বাবা, তাই হোক। আরও রোগী হোক, লক্ষপতি হও। ভগবানের কাছে, দিনরাত এই প্রার্থনা করছি।—যামিনী কবিরাজের বউ যেন কাঁদিয়া ফেলিবে। রোগা শরীর, আবেগে কান্নাই চলিয়া আসে।—বিয়ে করে সংসারী হও, দেশ জুড়ে তোমার নাম হোক, তাই দেখে যেন মরতে পাবি।

এক চোখের, কোটরে ঢুকানো তাহার একটিমাত্র ডাগর চোখের, নিরতিশয় মোহাচ্ছন্ন সজল দৃষ্টিতে শশীকে সে দেখিতে থাকে। যামিনীর চেলারা ওদিকে হামানদিস্তায় ঠকাঠক শব্দে গুল্ম গুঁড়া করে। যামিনী খায় তামাক। কাশে আর ভাবে। স্ত্রীর ঘরের চৌকাঠও সে ডিঙায় না। শশীর সঙ্গে কথা বলে না। ভাবনার তাহার অন্ত নাই। থাকার কথাও নয়। এই বয়সে,—বয়স তাহার ষাটের

উপরে গিয়াছে, মানুষের আর কত সহ্য হয়? কাণ্ড দ্যাখো, এতদিনের রূপসি বউটা এমন কুৎসিত হইয়াই বাঁচিয়া উঠিল যে চোখে দেখিলে মাথা ঘোরে! ভালো এক আপদ আসিয়া জুটিয়াছিল,—শশী। মানুষকে ও মরিতেও দিবে না?

গ্রামবাসী কিন্তু যামিনীর মুখে অন্য কথা শোনে।

শশীর চিকিৎসা? চিকিৎসাই বটে! অমনি চিকিৎসা হলে রোগীকে আর শিগগির শিগগির স্বর্গে যাবার ভাবনা ভাবতে হয় না। .মেরেই ফেলেছিল। বসন্তের চিকিৎসা ও কী জানে? কত ওষুধপত্র দিয়ে আমিই শেষে ...

বলে, চোখটা গেল কি সাধে? ওই লক্ষ্মীছাড়ার দু দাগ ওষুধ খেয়ে!

এ সব কথা গোপালের কানে যায়। গ্রামের অনেকে গোপালের কাছে গিয়া বলে যে যামিনী কবিরাজ আচ্ছা নিমকহারাম, গোপালের ছেলের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে। সংবাদটা বলিবার সময় অনেকে মনে মনে হাসে। গ্রামের লোকের অনুমানশক্তি প্রখর। সকালে আকাশে দিকে চাহিয়া তাহারা বলিতে পারে বিকালে বৃষ্টি হইবে। বিকালে যদি নেহাত বৃষ্টি না-ই হয় সে অপরাধ অবশ্য আকাশের। গোপাল যামিনী কবিরাজের বউ আনিয়া দিবার পর গ্রামের লোক চার-পাঁচ বছর ধরিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে পৃথিবীই মিথ্যা। অর্থাৎ সে অপরাধ গ্রামের লোকের অনুমানশক্তি ছাড়া জগতের আর সমস্ত কিছুর। তাই, যামিনী কবিরাজ সংক্রান্ত কোনো সংবাদ দিবার সময় গম্ভীর মুখে গোপালের দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহারা হাসে।

গোপালের রাগ হয়। সে যামিনীকে বলে, কী শুনছি খুড়ো? ছেলের নিন্দে কেন?

কার নিন্দে শশীর? যামিনী আশ্চর্য হইয়া যায়, আমি শশীর নিন্দে করব! এ কথা তোর বিশ্বাস হয় গোপাল?

ঘরে নিন্দে কর, আমার কাছে নিন্দে কর, কথা নেই। কিন্তু খবরদার, বাইরে যেন নিন্দে কোরো না খুড়ো।

কিন্তু যামিনী নিজেকে সামলাইতে পারে না। তাহার অসহ্য জ্বালা। সে ফের শশীর নিন্দা করিয়া বসে।

বলে, গাঁ-টাকে ও ছোঁড়া উচ্ছন্ন দেবে। ছোঁড়ার চুল ছাঁটার কায়দা দেখেছিস!

মাঝে মাঝে শশীকেও সে অপমান করে, শশী গায়ে মাখে না। আগে শশী কারও অপমান সহ্য করিত না, আজকাল তাহার এক প্রকার অদ্ভুত ধৈর্য আসিয়াছে। যামিনীর কথায় তাহার একেবারেই রাগ হয় না। সেনদিদির অসুখ উপলক্ষে ওর যে পরিচয় সে পাইয়াছে তাহাতে বুঝিতে তাহার বাকি থাকে নাই যে, সংসারে বদ্ধ পাগল ছাড়াও কম বেশি অনেক পাগল আছে : এক এক বিষয়ে মাথায় যাহাদের অত্যাশ্চর্য বিকার থাকে। যামিনীও তাদেরই একজন। ওর অর্থহীন অপমানে রাগ করিলে নিজেও সে এমনি পাগলের দলে গিয়া পড়িবে।

তাছাড়া, আর একদিক দিয়া শশীর মন শান্ত হইয়া স্থিতিলাভ করিয়াছিল। তাহার ইনটেলেক্‌চুয়াল রোমান্সের পিপাসা। যাহা চায়ের ধোঁয়ার মতো, জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছু নয়, চা-ও নয়। জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাসা-ভাসা ভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে এইখানে, এই ডোবা আর জঙ্গল আর মশা ভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়। একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রামে ডাক্তারি শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে এ জীবন শশীর যে ভালো লাগিতেছে, ইহাই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ। তারপর যাত্রাদলের অভিনেতা সাজিয়া কুমুদের আবির্ভাব। মোনালিসার কুমুদ, ভেনাস ও কিউপিডের কুমুদ, শেলি বায়রন হুইটম্যানের কুমুদ, পেগ খাওয়া waltz foxtrot নাচা, কুমুদ, নীলাক্ষীর প্রেমিক কুমুদ, তার চেয়ে বয়সে জ্ঞান বিদ্যায় বুদ্ধিতে

শ্রেষ্ঠ কুমুদ : যাত্রাদলের অভিনেতা সাজিয়া তাহার আবির্ভাব? এ কী ব্যর্থ যায়! শশীর মন শান্ত হইয়াছে, স্থিতিলাভ করিয়াছে। কেমন করিয়া হঠাৎ সে বুঝিতে পারিয়াছে কিডস্কিনের জুতাটা, আশ্চর্য শাড়িটা, বিস্ময়কব ব্লাউজটাই আসল। আর আসল তখনকার কুমুদের টাকাটা। তারপর তোমার চেহারা তো আছেই! সেটাও একটু দরকার আর দরকার বিশ্বজগৎকে একটু ডোন্ট কেয়ার করার ভাব। জমিল রোমান্স।

শশী এটা বুঝিয়াছে। কিন্তু হিসেব তো কম নয়? অতগুলি সমন্বয় তো তুচ্ছ নয়? এটাও শশী স্বীকার করে। স্বীকার করে যে ব্যাপারটা মন্দ নয়। মানুষের সভ্যতার খুবই অগ্রগতির পরিচয়, চমৎকার উপভোগ। লোভ কবিবার মতো। পাইলে সে লাভবানই হইত। কিন্তু বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনের মধ্যে অসন্তোষ পুরিয়া রাখিবার মতোও কিছু নয়।

শশী ইহাও বুঝিয়াছে যে জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই বীতি।

শশী তাই প্রাণপণে জীবনকে শ্রদ্ধা করে। সংকীর্ণ জীবন, মলিন জীবন, দুর্বল পঙ্গু জীবন, সমস্ত জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে সকলের চেয়ে বেশি।

কুসুমের সঙ্গে কিন্তু শশীর আর একদিন ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।

বাত্রে একদিন হঠাৎ কুসুমের পেটে ব্যথা ধরিয়াছিল। অসহ্য প্রাণঘাতী ব্যথা। শশীকে না ডাকিয়া উপায় ছিল না। রাত্রে, বিশেযত শীতের রাত্রে, ঘুম ভাঙিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিযা গিয়া ডাক্তারি করাটা শশীর এখনও ভালো রকম অভ্যাস হয় নাই। প্রথমে সে একটু বিরক্তই হইয়াছিল। পেটে ব্যথা! পেটে ব্যথার জন্য হাবু ঘোষের বংশে কে কবে ডাক্তার ডাকিয়াছে? একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দিলেই হইত! কিন্তু কুসুমের ব্যথার প্রতাপ দেখিয়া শশীর বিরক্তি টেকে নাই।

কলিক? কে জানে?

কী খেয়েছিলে পরানের বউ?

জবাব দিয়াছিল মতি।

বউ আজ কিছু খায়নি ছোটোবাবু। দাদার সঙ্গে ঝগড়া কবে সারাদিন উপোস করেছে। একাদশীব দিন এয়োস্ত্রী মানুষ কবল উপোস,—হবে না?

কথাটা সাংঘাতিক। একাদশীর দিন এই উপবাস করাব কথাটা। এমন কাজ করিবাব মতো বুকের পাটা কুসুম ছাড়া আব কারও হইত কিনা সন্দেহ।

কিছু খাওনি পরানেব বউ?

খেয়েছি। খাব না কেন? একটা মাছের আঁশ খেযেছি। কুসুম ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিয়াছিল।

তাহা হইলে একাদশীর দিন উপবাস করে নাই। ঝগড়ার কথাটাই সত্য, একাদশীর উল্লেখটা মতি অনর্থক করিযাছে। শশীর হঠাৎ রাগ হইয়া গিয়াছিল। কেন, কী বৃত্তান্ত না জানিয়া মতি অমন যা-তা মন্তব্য করে কেন? কিন্তু কুসুমের কী হইয়াছে? কলিক? পেটের ব্যথাটা বড়ো রহস্যময় অসুখ। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় নাই, সত্য কী মিথ্যা বুঝিবার উপায় নাই, থার্মোমিটার, স্টেথোস্কোপ কোনোটাই কাজে লাগে না। রোগী যা বলে, তাই সই। ব্যথাটা ডান দিকে বলিলে ডান দিকে, ঝিলিক দেওয়া ব্যথা বলিলে ঝিলিক দেওয়া ব্যথা, চনচনে একটানা ব্যথা বলিলে চনচনে একটানা ব্যথা। সন্দেহ করিবার জো নাই। কুসুমের বর্ণনা শুনিয়া শশী কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পরানকে সে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

খানিক পরে বাড়ি গিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল ওষুধ। নিজে আর ফিরিয়া যায় নাই।

এই হইল তাহার অপরাধ। পরদিন খবর লইতে গিয়া দ্যাখে কুসুম আগুন হইয়া আছে।

মরিনি। এই আপনার টাকা।

কুসুম সত্যসত্যই আঁচলে বাঁধা দুটি টাকা শশীর সামনে রাখিল। শশীর বুঝিতে বাকি রহিল না এই উদ্দেশ্যেই সে আঁচলে টাকা বাঁধিয়া ঘরের কাজ করিতেছিল।

মতি বলিল, তোর কী আস্পর্ধা বউ!

বুঁচি নাই। বুঁচি অনেকদিন আগে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গিয়াছে। সে থাকিলে অন্য কিছু বলিত। আরও কড়া, আরও ঝাঁজালো কিছু।

কুসুম শান্তভাবে বলিল, মা একলা গোয়াল সাফ করছে, যা তো মতি লক্ষ্মীটি, হাত লাগাবি যা। সুদেবের সঙ্গে তোর বিয়ের পরামর্শটা ছোটোবাবুর সঙ্গে করেনি। মা যেন গোয়াল ফেলে ছুটে আসে না বাবু। কাজ সেরে একেবারে চান করে আসবি। ছোটোবাবু বসবে।

কুসুম হুকুম দিতেও জানে। কেন জানিবে না? সকলে মিলিয়া তোষামোদ করিয়া গোরু কেনার জন্য তাহার অনন্তজোড়া বাগাইয়া লয় নাই? সেও ছাড়িবে কেন? মাঝে মাঝে ভয়ানক দরকারের সময়, শশীর সঙ্গে এখন সে যে কলহ করিবে এমনি দরকারের সময়, হুকুম তাহাকে সকলকে মানিতে হইবে।

মতি চলিয়া গেলে শশী বলিল, ওষুধ খেয়ে কাল তোমার পেটব্যথা কমেনি নাকি বউ?

ও ভারী ওষুদ! কটা এই টুকটুকু সাদা বড়ি,—ওষুদ না ছাই। নিজে একবার আসতে পারেননি? বড়ি খেয়ে ব্যথা যদি না কমত!

এর নাম অকৃতজ্ঞতা। ব্যথা তাহা হইলে কমিয়াছিল? রাত্রে একবার উঠিয়া আসিয়া দেখিয়া গিয়া ওষুধ দিল, ওষুধ খাইয়া ব্যথাও কমিল, তবু কুসুমের মন ওঠে নাই। শশী বিরক্তি বোধ করিল।

তোমার সব বিষয়েই একটু বাড়াবাড়ি আছে বউ।

কী আছে? বাড়াবাড়ি? হ্যাঁগো ছোটোবাবু, আছেই তো। তা যাই বলেন, এক ঘণ্টা ধরে বুক পরীক্ষা, ম্যালেরিয়া জ্বর হলে, আমি করি না।

সে বুক পরীক্ষা করিবে, সে কি ডাক্তার? কুসুমের মনটা শশীর বোধগম্য হয় না। পেটব্যথার জন্য কাল একঘণ্টা স্টেথোস্কোপটা ওর বুকে লাগাইয়া হৃৎস্পন্দন শুনিলে ও কি সুখী হইত? কুসুমের মাথাধরার চিকিৎসা বোধ হয় পা টেপা। সে ডাক্তার মানুষ, এ সব পাগলামিকে প্রশ্রয় দিলে তাহার চলিবে কেন?

টাকা পেলে কোথায় পরানের বউ?

যেখান থেকেই পাই, আপনার ভিজিট দিয়েছি, নিয়ে যান।

কোথা থেকে পেয়েছ না বললে নিতে পারি না, বউ।

কেন, চুরি করেছি ভাবেন না কি?

শশী ভাবিল, এই বেশ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। কুসুমের এই কথাটাকে পরিহাসে দাঁড় করাইয়া দিলেই সে হাসিয়া ঠান্ডা হইয়া যাইবে।

তা আশ্চর্য কী? চুরি না করলে টাকা তুমি পাবে কোথায়? রোজগার কর?

কুসুম বলিল, আমার বাপ ঢের রোজগার করে। তাই বলে আমরা কি আপনার তুল্যি? লোকের গলায় ছুরি দেওয়া পয়সায় আমরা বড়োলোক হইনি তাই আপনারা গরিব বলেন গরিব, চোর বলেন চোর!

শশী মুখ কালো করিয়া বাড়ি ফিরিল।

সারাদিন তাহার মন খারাপ হইয়া রহিল। নিজের চারিদিকে সে যে শিক্ষা ও সভ্যতার খোলটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছিল, কুসুম তাহাতে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে। কুসুমের কথা মিথ্যা নয়। হারু ঘোষের চেয়ে তাহাব বাবা কি একদিন গরিব ছিল না? লোকের গলায় ছুরি দিয়াই গোপাল যে পয়সা করিয়াছে এ কথারও প্রতিবাদ চলিবে না। গোপালের চেয়ে কুসুমের বাবা ঢের বেশি ভদ্রলোক। কুসুমকে তাহাব বাবা মধ্যে মধ্যে পত্র লেখে। গোপালের সাধ্য নাই অমন সুন্দর হস্তাক্ষরে ও রকম চিঠি লিখিতে পারে। ঠিকানায় কুসুমের নামটা বাংলায় লিখিয়া কুসুমের বাবা বাকিটা লেখে ইংরাজিতে। গোপাল এ বি সি ডি-ও চেনে না। অপমানটা করিবার সময় কুসুম হয়তো এই সব কথাও মনে রাখিয়াছিল।

গ্রামের লোকেরা তাহাকে যে ছোটোবাবু বলিয়া ডাকে ইহাতে শশীর গৌরব কিছু নাই। এটা উপাধি মাত্র, শুধু নাম। সম্মান নয়। গোপালের মক্কেলরা শিশুকালে আদর করিয়া তাহাকে ছোটোবাবু বলিয়া ডাকিত, ডাকটা কী করিয়া গ্রামে ছড়াইয়া গিয়াছে এবং টিকিয়া আছে। এ সব ভুলিয়া গিয়া সে কি অহংকারী হইয়া উঠিতেছিল? সকলের সঙ্গে ছোটোবাবুটির মতো ব্যবহার শুরু করিয়া দিয়াছিল?

শশীর আত্মসম্মান অত্যন্ত আহত হইয়া রহিল! সে ভাবিল, আমার রকম সকম দেখে কুসুম হয়তো মনে মনে হাসে। কুসুম হয়তো ভাবে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে এমনিই কবে মানুষ! বাপের চুরি-চামারির পয়সায় লেখাপড়া শিখে এত কেন?

কুসুম ক্ষমা চাহিতে আসিল দিন চারেক পরে। দুপুরবেলা, চুপিচুপি, চোরের মতো!

শশীর ঘরের পিছনে বাগান। বাগানে লিচু হয়, আম হয়, কাঁঠাল হয়, কপি হয়, নটে শাক হয়, তীব্রগন্ধী কাঁঠালি চাঁপা, লালবোঁটা শিউলি ফুল ফোটে। বাগান দিয়া আসিয়া ঘরের জানালার ফাঁকে ফিসফিস করিয়া কুসুম ডাকিল, ছোটোবাবু, শুনুন।

শশী ঘুরিয়া বাগানে গিয়া দাখে জানালার নীচে তাহার অত সাধের গোলাপ চারাটি কুসুম দুই পায়ে মাড়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া দিয়াছে।

গাছটা মাড়ালে কেন বউ? কীসে দাঁড়াচ্ছ দেখে দাঁড়াতে হয়!

শশীর সাধের ফুলের চারাকে হত্যা করিয়া শুরু করিলেও কুসুমের কাজ হইল। শশী তাহাকে ক্ষমা করিয়া ফেলিল ; —সমস্ত অপরাধ। আজ পর্যন্ত কুসুম তাহার কাছে যত অপরাধ করিয়াছে সব। কুসুম বলিল, চার রাত সে ভালো করিয়া ঘুমায় নাই। কথাটা শশী বিশ্বাস করিল। কুসুম অম্লানবদনে মিথ্যা বলে জানিয়াও বিশ্বাস কবিল। কারণ, কুসুমের মুখে কথাটার প্রমাণ ছিল এবং চোখে ছিল জল। কুসুম আরও বলিল, কয়েক দিনের মধ্যেই সে বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। তার বাবা ভুবনেশ্বর পত্র দিয়াছে। ছোটোবাবুকে রাগাইয়া চলিয়া যাইবার কথাটা ভাবিতে তাহার এমন খারাপ লাগিতেছিল। তাই ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে।

আমার এই স্বভাবের জন্য কেউ আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। মুখের আমার আটক নেই!

শশী জিজ্ঞাসা করিল, সেদিন রাত্রে তোমার কী হয়েছিল বলো তো? সত্যি বোলো।

পেট ব্যথা করছিল।

জিভ দেখি?

কুসুম সলজ্জভাবে জিভ দেখাইল।

জিভ তো পরিষ্কার।

জিভ পরিষ্কার হবে না কেন ছোটোবাবু?

না, জিভ অপরিষ্কার থাকিবার কোনো কারণ নাই। কুসুমের স্বাস্থ্য বাহিরের ফাঁকি নয়, ভিতরেও সে খুব মজবুত। কুসুমকে শশীর এই জন্যই ভালো লাগে। দশ বছরে একবার একরাত্রে শুধু একটু

পেটের ব্যথায় কষ্ট পায়, আর কোনো রাগ বালাই নাই। এই তো চাই। সব বাঙালিঘরের মেয়ের এ রকম স্বাস্থ্য হইলে জাতটা আজ ডুবিতে বসিত না, শশী এ কথাও ভাবে!

জানালা দিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর চাহিয়া কুসুম বলিল, আপনার ঘরটা একটু দেখে যাব ছোটোবাবু?

চলো না, সিন্ধু ওদের কাউকে ডাকি, অ্যাঁ?

না। আমি একাই দেখে যাই।

কুসুম একাই শশীর ঘর দেখিল। শশী জানিত এটা উচিত নয়। কিন্তু বারণও সে করিল না। ভাবিল, ওর যদি বদনামের ভয় না থাকে, আমার বয়ে গেল। আমি তো ডাকিনি।

শশীর ঘর দেখিয়া কুমুদ বলিয়াছিল, বেশ সাজানো ঘর। কিন্তু যাদুঘর মিউজিয়ামের মতো মানুষের শোবার ঘরে কী আর দেখিবার থাকে? বড়ো আলমারি দুটির পাঁচটি তাক। একটি আলমারিতে ঠাসিয়া বই ভরিয়াও কুলায় নাই, মাথার উপরে উঁচু করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। অপরটির উপরের তাক তিনটিতেও ডাক্তারি বই সাজানো, নীচের তাকে চকচকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি। কোনটা কী কাজে লাগে? কুসুম জিজ্ঞাসা করিল। কুসুমের যেন তাড়াতাড়ি নাই, যতক্ষণ খুশি শশীর ঘরে থাকিতে পারে। দেয়ালে কয়েকটা ছবি আর ফটো টাঙানো আছে, কুসুম অন্যমনস্কের মতো সেগুলি দেখিল। ফটোগুলি অধিকাংশই শশীর বাড়ির স্ত্রী-পুরুষের, কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। কুমুদের ফটোটা দেখিয়া কুসুম বলিল, সেই লোকটা, না? গত বৎসর শশী দেয়ালে এক গোছা ধানের শিষ টাঙাইয়া দিয়াছিল। দেখিয়া কুসুম ভারী খুশি। কাঠের বাক্‌সে কী আছে? ওষুধ? দেখি। ওই ছোটো আলমারিতে ওষুধ রাখিয়াছে, আবার বাক্‌সে কেন?

এ ঘরে আপনি একা শোন ছোটোবাবু?

একাই শুই।

তা, বউ আসতে আর দেরি কত! শিগগির বাপের বাড়ি চলে যাব ছোটোবাবু। আর আসব না।

আসবে না? সে কী? শশী অবাক হইয়া গেল।

কুসুম একটু ভাবিল। আসব, অনেক দেরি করে আসব। হয়তো ও বছর নয়তো পরের বছর, ঠিক কিছু নেই। আচ্ছা, যাই ছোটোবাবু।

শশী বলিল, কী করে যাবে? বাবা ওদিকের দাওয়ায় এসে বসেছেন। ঘুমিয়ে উঠলেন।

তবে? কুসুম জিজ্ঞাসা করিল। সে যে বিশেষ ভয় পাইয়াছে মনে হয় না। বিপদে কুসুম শান্তই থাকে। বিচলিত হয় না, দিশেহারা হয় না।

শশী বলিল, একটু বোসো। বাবা এখুনি বাইরের ঘরে চলে যাবেন।

তবে দরজাটা বন্ধ করে দিন। দেখতে পান যদি?

কে জানিত নিয়তি আজ গোপাল হইয়া ঘুম ভাঙিয়া ওদিকের দাওয়ায় বসিবে, আজ সাত বছর পরে।

পূজার পর গাওদিয়ার স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ভালো হয়। ম্যালেরিয়া কমিয়া আসে, কলেরা বন্ধ হয়, লোকের ক্ষুধা বাড়ে, মাছ দুধ সস্তা হয়। নিউমোনিয়া ও ইনফ্লুয়েনজায় কেবল দুই দশজন যা মারা যায়—সে কিছু নয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে খালের জল অনেক কমিয়া আসে। মাঘের শেষাশেষি ডোবা শুকাইয়া যায়। চৈত্র মাসে অনেক পুকুরে দু-এক হাত জল থাকে মাত্র। বৈশাখে বৃষ্টি না হইলে অধিকাংশ পুকুর শুকাইয়া ওঠে। তখন গ্রামে বড়ো জলের কষ্ট। শীতলবাবুর বাড়ির সামনের বড়ো দিঘিটার জল খাইয়া গাওদিয়া, সাতগাঁ আর উখারার লোক প্রাণধারণ করে। বাবুর দিঘিতে

বাবুদের বাড়ির লোক ছাড়া কাহারও দেহ ডুবানো নিষেধ। দারোয়ান লাঠি ঘাড়ে পুকুর পাহারা দেয়, শীতলবাবুর ছেলেরা ভাগনেরা আর কম বয়সি মেয়েরা দিঘি তোলপাড় করিয়া স্নান আরম্ভ করিলে লাঠিতে ভর দিয়া সে একগাল হাসে। ঘাট ছাড়া গ্রামের লোকের অন্য কোথাও কলসি ডুবানো বারণ। শীতলবাবুর বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্নান করিয়া গেলে দু-তিন ঘণ্টা পর্যন্ত ঘাটের কাছে জল কাদা হইয়া থাকে।

জল লইতে আসিয়া কেহ বলে : খোকাবাবুদের একটু সাবধানে স্নান করতে বলতে পার না দরোয়ানজি?

দরোয়ান বলে : দিঘি কিস্কো? তুমারা?

তা বটে, দিঘিটা বাবুদের বটে।

কিন্তু বৈশাখ মাস আসিতে এখনও দেরি আছে, বৈশাখ মাসে এ বছর খুব ঝড়বৃষ্টি হইবে কি না এখন হইতে তাই বা কে বলতে পারে? শীতকালটা গ্রামেব লোক সুখে কাটায়। কই, মাগুর, শোলমাছ প্রচুর পাওয়া যায়। যাদের ডোবা আছে, ডোবা শুকাইয়া আসিলে জল ছেঁচিয়া ঝুড়িখানেক মাছ পায়। তার মধ্যে খলসে আর ল্যাঠা মাছই বেশি।

এই খাল আর খালের চিকরি-কাটা দেশে ভালো রাস্তা নাই, কিন্তু শীতকালটা দেশে কাটাইবেন সংকল্প করিয়া বিমলবাবু সপরিবারে একটা মোটরগাড়ি সঙ্গে করিয়া গ্রামে আসিলেন।

বাজিতপুরে মোটরগাড়ি আছে। কিন্তু গাওদিয়ার মোটরগাড়ি!

কুসুম শশীকে বলে, সেবার কলকাতায় মোটরগাড়ি চড়েছি। বিয়ের আগে যে বার কলকাতায় গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে।

শশী বলে, তোমাব সে কথা মনে আছে?

কুসুম অবাক হইয়া বলে, বাঃ মনে থাকবে না? কতদিন আব হল? আট বছর কী ন বছব। আমার বয়স কত ভাবেন? পঁচিশ?

দূর! বাইশ বছব।

সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহের প্রস্তাব ভাঙিয়া গিয়াছে। কুসুম ইদানীং আর ও কথা উত্থাপনও করিত না। মতির বিবাহ হোক বা না হোক তাহাব যেন কিছুই আসিয়া যায় না। পরান যদি বা রাত্রে কোনোদিন কথাটা তুলিত, কুসুম হাই তুলিয়া বলিত তাহার কোনো মতামত নাই। কোনো দিন কিছু না বলিয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িত। এদিকে নিতাই তাগাদা দিতেছিল। এত বেশি তাগাদা দিতেছিল যেন বিবাহটা সুদেবের নয়, তাহার নিজের। শশীর সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করিয়া শেষে পরানকে বলিতে হইয়াছে, না সুদেবের সঙ্গে মতির সে বিবাহ দিবে না। নিতাই শান্তভাবে কথাটা গ্রহণ করিতে পারে নাই। লোভ দেখাইয়াছে, সদুপদেশ দিয়াছে, মেজাজ গরম করিয়াছে। কিন্তু, না, পরান রাজি নয়।

ছোটোবাবু বারণ করে দিয়েছে, অ্যাঁ? হারুদা মরলে তাকে কে পুড়িয়েছিল রে পরান? কাঁধ দিয়েছিল কে? ছোটোবাবু? ছোটোবাবু যখন বারণ করেছে, বাস, তবে আর কী, ছোটোবাবুর কথা বেদবাক্যি, বটে?

আমার নিজের বুদ্ধি নেই? মতির বিয়ে আমি শহরে দেব—ভদ্রঘরে।

এ কথাটা পরান না বলিলেও পারিত।

যাই হোক, তারপর সুদেব নিতাইয়ের নামে বাজিতপুরে মামলা রুজু করিয়াছে। অভিযোগ গুরুতর, গচ্ছিত ধন অপহরণ, বেআইনি আটক আর মারপিট। গায়ের জ্বালায় সুদেব নালিশ করিয়াছে বটে কিন্তু কিছু প্রমাণ করিতে পারিবে কি না সন্দেহ। নিতাই বিচক্ষণ সংযমী মানুষ। হঠাৎ কিছু করিয়া বসিবার লোক সে নয়, প্রমাণ রাখিয়া অপকর্ম সে কখনও করে না।

একদিন বাজিতপুর ফেরত নিতাইয়ের সঙ্গে শশীর রাস্তায় দেখা হইল। এই মামলার ব্যাপারে নিতাইকে অপরাধী সন্দেহ করিয়াও শশীর রাগ হইয়াছে সুদেবের উপর। নিতাই সুদেবের মামা, নিজের মামা। একেবারে মামলা না করিয়া আর কিছু তো সে করিতে পারিত? কোর্টে এখন মতির নামটা উঠিয়া পড়িবে। পরানকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে! সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার।

কিন্তু নিতাইয়ের সঙ্গে মামলার কথা শশী আলোচনা করিল না।

বলিল, তোমার কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে নিতাই।

দেব ছোটোবাবু, মাঘ মাসটা গেলেই শোধ করে দেব।

শশী চিন্তিত হইয়া বলিল, মাঘ মাস? আচ্ছা তাই দিও। কিন্তু লালির বাছুরটা তুমি পরানকে দিলে না যে? লালি দুধ বন্ধ করেছে শুনলাম?

লালির বাছুর পরানকে দেব কেন ছোটোবাবু?

কেন, লালিকে বেচবার সময় কথা হয়নি প্রথম বাছুরটা পরান পাবে?

না ছোটোবাবু, এমন কথা হয়নি, পরান মিছে বলেছে। লালিকে আমি কিনেছি হাবুদার ঠেঁয়ে, পরান কি জানে?

শশী উদাস ভাবে বলিল, যাক কথা না হয়ে থাকলে আর কী কথা? পরশু সের ছয়েক দুধ পাঠিয়ো [illegible]। বাড়িতে কী সব করবে বলছিল।

শশী চলিয়া যায়,—নিতাই ডাকিয়া বলিল, ছোটোবাবু, শোনেন। বাজিতপুরে জামাইবাবুকে দেখলাম। কাল বিয়ানে এ গাঁয়ে আসবেন। কোন জামাইবাবু? মেজো।

এ খবর শশী জানিত না। তাহাদের কোনো সংবাদ না দিয়া নন্দলাল গাঁয়ে আসিতেছে ইহাতে আশ্চর্যও সে হইল না। বিবাহের পরেই নন্দলাল শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দিয়াছে। কখনও চিঠি লেখে না, চিঠির জবাব দেয় না। বিন্দু প্রথম প্রথম চিঠি লিখিত, স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে, লুকাইয়া। নন্দলাল টের পাইবার পর বাপের বাড়ির সঙ্গে চিঠি লেখার সম্পর্কটুকুও তাহাকে তুলিয়া দিতে হইয়াছে। একবার সে যে দু-চারদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসিয়াছিল তাও স্বামীকে লুকাইয়া, ব্যাবসা উপলক্ষে নন্দলাল দিন পনেরো বোম্বে গিয়াছিল, সেই সময়। এমন ব্যাপার বেশিদিন গোপন থাকিবার নয়। বোম্বে হইতে ফিরিয়া একদিন নন্দলাল স্ত্রীকে বলিয়াছিল . গাওদিয়া গিয়েছিলে?

বিন্দু ভয়ে কাঁপিয়া একটু হাসিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, একদিনের তরে গিয়েছিলাম, মোটে একদিন। বাবার যা অসুখের কথা শুনলাম!—রাগ করেছ?

রাগ করেছ?—ভ্যাঙাইয়া, —ছোটোলোকের বাচ্চা!

গছাইয়া দেওয়া বউ, প্রাণভয়ে গ্রহণ করা বউ, লেখাপড়া, নাচ-গান কিছু না জানা বউ, জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি।

বিন্দুকে নন্দলাল ত্যাগ করে নাই কেন, কে বলিবে! হয়তো কর্তব্যজ্ঞান, হয়তো খেয়াল, হয়তো নির্বিবাদে ওকে লইয়া যা খুশি তাই করা যায় বলিয়া নন্দলালের কাছে বিন্দুর এক ধরনের দাম আছে,—কে বলিবে! বিন্দুকে নন্দলাল অত গয়না কাপড় দেয় কেন, সে আর এক রহস্য। বিন্দু কি ধার করা গহনা গায়ে দিয়া বাপের বাড়ি আসিয়াছিল? যাহা পায় নাই তাহাই পাইয়াছে এই অভিনয়টুকু করিয়া যাওয়ার জন্য? কে বলিবে! জীবনের অজ্ঞাত রহস্য গাওদিয়ার বিন্দুকে গ্রাস করিয়াছে, কলিকাতার অনামি রহস্য। কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার সময়ও শশী যাহা ভেদ করিতে পারে নাই। নন্দলাল একপ্রকার অপমানই করিত, কিন্তু শশী যাইতে ছাড়িত না। ভাইফোঁটার দিন কবার বিন্দু তাহাকে ফোঁটা দিয়াছে। বিন্দুর গা-ভরা গহনা সে দেখিতে পাইত না? না। অন্তঃপুরের দৈনন্দিন সাদাসিধে জীবন গহনার বোঝা বহিয়া বেড়াইতে বিন্দু ভালোবাসে না,—চোখের অবিষ্কার কানে শোনা

এই কৈফিয়ত শশীর কাছে মিথ্যা হইয়া যাইত। শশী ভাবিত, বিন্দু তবে সুখেই আছে? একটা ব্যাপার সে বুঝিত না। বাহিরের লোকের বুঝিবার মতো ব্যাপারও সেটা নয়। নন্দলাল ভিন্ন বাড়িতে বিন্দুকে রাখিয়াছে, বিন্দুকে একা। নন্দলালের পরিবার যে বাড়িতে পঁচিশ বৎসর বাস করিতেছে, বিন্দু সেখানে কতদিন বধূ-জীবন যাপন করিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে বিন্দু সে প্রশ্ন এড়াইয়া যায়, নূতন বাড়িতে কত দিন সে গৃহিণী হইয়া বাস করিতেছে তাও বলে না। ঝগড়াঝাঁটি হতে লাগল, তাই চলে এসেছি। —বিন্দু শুধু এই কৈফিয়ত দেয়। বলে, বেশ আছি স্বাধীন ভাবে। ওখানে এমন ঝগড়া করে! এবং বলিয়া এমন ভাবে হাসে সে মনে হয় যেন সত্যসত্যই বেশ আছে স্বাধীনভাবে। ঝি চাকরের অভাব নাই, সদরে একটা দরোয়ানও আছে। ঘরগুলি দামি আসবাবে ভর্তি, বাড়াবাড়ি রকমে ভর্তি। বিন্দুর জন্য নন্দলাল বিলাসিতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। সারা বাড়িতে এসেন্সের গন্ধ!

নন্দলাল তাহা হইলে বিন্দুকে ভালোবাসে? বিন্দুর বাড়িতে গিয়া কতদিন শশী দেখিয়াছে, বিন্দুর ভাব অমায়িক, বিন্দু সাদাসিধে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে নন্দলাল সে বেলা আসিবে না। আবাব কতদিন গিয়া দেখিয়াছে বিন্দু অমায়িক নয়, রহস্যময়ী। বিন্দু মহা সমারোহের সঙ্গে প্রসাধনে ব্যাপৃত হইয়া আছে, কথা বলার সময় নাই! এক ঘণ্টার মধ্যে নন্দলাল আসিবে।

জীবনের অজ্ঞাত রহস্য বিন্দুকে গ্রাস করিয়াছে বইকী।

পরদিন শশী খালের ঘাটে গেল। যে ঘাটে হারুর মৃতদেহের সঙ্গে এক নৌকায় সে একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়াছিল। সকালবেলা।

নন্দলাল আসিতেছে বাড়িতে শশী এ কথা প্রকাশ করে নাই। নন্দলাল কখনও তাহাদের বাড়ি যাইবে না। কিন্তু শশী অনেকদিন বিন্দুর কোনো খবর পায় নাই। নন্দলালের কাছে বিন্দুর খবরটা জানিবার জন্যই সে খালের ঘাটে আসিয়াছে! গ্রামের মধ্যে একান্ত পর উদ্ধত ভগ্নিপতিটির সঙ্গে আলাপ করা অসম্ভব।

শশীর মনে আর একটা ইচ্ছা ছিল। সে এক অসম্ভব কল্পনা। বিন্দুর বিবাহের ব্যাপারটা শশী জানে। কিন্তু সে তো আজকের কথা নয়, প্রায় ইতিহাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এতকাল নন্দলাল রাগ করিয়া ছিল, ভালো কথা, তাহার দোষ নাই, কিন্তু চিরজীবন অতীত ঘটনার জাবর কাটিয়া চলিয়া লাভ কী? নন্দলাল তো আজ অনায়াসে গোপালকে ক্ষমা করিয়া ফেলিতে পারে। মনে করিতে পারে যে জোর-জবরদস্তি নয়, সে নিজেই দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিন্দুকে বিবাহ করিয়াছিল? গোপালের অপরাধে রাগ করিয়া আছে নন্দলাল, আর মাঝে পড়িয়া শাস্তি পাইতেছে বিন্দু, এটা উচিত নয়।

বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দেওয়াটা বিন্দুর শাস্তি, শশী এই রকম মনে করে। নন্দলালকে সে আজ তাহাদের বাড়ি গিয়া উঠিতে অনুরোধ করিবে। আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিবে গোপাল আজ সাত বছর অনুতপ্ত হইয়া আছে, আর কেন ভাই, এবার মিটাইয়া ফেল।

তারপর নন্দলাল আসিল। সে আরও বুড়া হইয়াছে, আরও বাবু হইয়াছে। অবস্থার অনুপাতে হিসাব করিলে সঙ্গের চাকরটি কিন্তু তাহার চেয়েও বাবু। এইটুকু খাল বাহিয়া আসিতে দুজনের জন্য নন্দলাল নৌকা ভাড়া করিয়াছে দশজনের। হয়তো তাহার ডুবিয়া মরার ভয়, —কলকাতার বাবু!

খবর না দেওয়ার জন্য শশী কোনো অনুযোগ করিল না। বলিল, কলকাতা থেকে বেরিয়েছ কবে?

বিন্দু শশীর এক বছরের ছোটো। সেই হিসাবে নন্দলালের সে গুরুজন।

পরশু।

বিন্দু ভালো আছে?

ভালো থাকবে না কেন?

কী জবাব! নন্দলালকে সামনে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, শশীর কল্পনা নিভিয়া আসিতেছে। রাগ, প্রতিহিংসা এই সব যে মানুষের অবলম্বন, সহজে ও সব সে ছাড়িতে চায় না। ছাড়িলে বাঁচিবে কী লইয়া?

খবর পেলাম, আজ সকালে তুমি পৌঁছবে। বাবা বললেন, ঘাটে যা শশী, বাবুদের গাড়িটা নিয়ে যা, সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। নিজেও আসতেন, আমি বারণ করলাম। বাতে কষ্ট পাচ্ছেন, কতক্ষণ ঘাটে অপেক্ষা করতে হবে তারও কিছু ঠিক নেই। তুমি আসছ শুনে বাড়িতে হইচই পড়ে গেছে নন্দ।

নন্দলাল বলিল, হুঁ। মোটরটা কার?

শীতলবাবুর ভাই বিমলবাবুর। ওরাই জমিদার।

শীতলবাবু লোক কেমন?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী একটু বিস্মিত হইল।

বেশ লোক। খুব ধর্মচর্চা করেন। এখানে দাঁড়িয়ে কী হবে? তোমার চাকরকে বল, জিনিস গাড়িতে তুলুক। নৌকা ছেড়ে দাও, আমাদের নৌকায় ফিরে যাবে।

নন্দলাল মাথা নাড়িল,—আমি এ বেলাই ফিরব শশী। আর কাজ শেষ করে তোমাদের বাড়ি যাওযাব সুবিধে হবে কি না, —মানে, হয়তো সময় পাব না। না, হয়তো কেন, সময় পাব না।

শশী এ অপমানও হজম করিল।

আজ তোমাকে ফিরতে দিচ্ছে কে? সবাই আশা কবে আছে নন্দ।

আমাকে ফিরতেই হবে। বাজিতপুরে কাজ ফেলে এসেছি। শীতলবাবুর সঙ্গে দেখা করেই আবার নৌকা খুলব।

শীতলবাবুর কাছে তাহার কী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে নন্দলাল একটা ভাসাভাসা জবাব দিল যে বাজিতপুরে শীতলবাবুব কিছু জমি কিনিবে। কথা কহিতেও নন্দলালের যেন কষ্ট হইতেছিল। কেন, কী বৃত্তান্ত শশী তাহা কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। নিজেকে তাহার গোমস্তা মনে হইতেছিল নন্দলালের।

বেশ, কাজ থাকলে তোমায় আটকাব না। এ বেলাটা থেকে খাওয়া-দাওয়া করে বিকালে রওনা দিয়ো। বলিয়া শশী যোগ দিল, বাবা নিজে আসতেন নন্দ। আমি বারণ করলাম।

কিন্তু নন্দব সুবিধা হইবে না। সময় নাই।

তখন শশী বলিল, ও, আচ্ছা।

তাহার রাগ হইতেছিল, মনে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছিল। টিনেব চালাটার এক ধারে চণ্ডী ছোকরা কেরোসিন কাঠেব উপর রেকাবি-ভরা পান সাজাইয়া রাখিয়াছে, আর কয়েক প্যাকেট লাল নীল কাগজে মোড়া বিড়ি। চণ্ডী নিজে কাছে গিয়া হাঁ করিয়া বাবুদের গাড়িটা দেখিতেছে। গাওদিয়ায় মোটরগাড়ি!

নন্দ থাকিয়া থাকিয়া গাড়িটার দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু শশীর সঙ্গে এইমাত্র সে সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে, গাড়িটা আনিয়াছে শশী। নন্দলাল তাই বলিল, শীতলবাবুর বাড়িটা কতদূর?

গাঁয়ের শেষে।

তবে তো কম দূর নয়। ঘোড়ার গাড়ি-টাড়ি পাওয়া যায়? চাকরটাকে পাঠিয়ে দিই, ডেকে আনুক।

ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায় না। এই গাড়ি বাবুদের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, তুমি ইচ্ছে করলে যেতে পার। রসিকবাবুর বাগানের একটা গাছের দিকে শশী দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, এবার সে আবার চণ্ডীর দোকানের দিকে চাহিল।

নন্দ কী ভাবিল বলা যায় না, বলিল, সময় থাকলে তোমাদের বাড়ি যেতাম শশী।

সময় না থাকলে আর কথা কী?

সেইখানেই ইতি। নৌকায় গিয়া স্যুটকেস হইতে আয়না চিরুনি বাহির করিয়া নন্দ চুলটা ঠিক করিয়া লইল। পানেব কৌটা হইতে দুটা পান ও জর্দার কৌটা হইতে খানিকটা জর্দা মুখে দিল। গায়ের দামি আলোয়ানটা খুলিয়া রাখিয়া একটা তার চেয়ে দামি শাল গায়ে দিয়া মোটরে উঠিল।

এসো শশী। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

সেই যেন এতক্ষণে মোটরের মালিকানা স্বত্ব পাইয়াছে। তা, সেটা আশ্চর্য নয়। মোটরে চড়ার অভ্যাস নন্দলালের আছে, শশী তো চাপে গোরুর গাড়ি।

শশী বলিল, তুমি যাও। আমার এদিকে কাজ আছে!

কলিকাতা শহর! মোটরে চাপিয়া কলিকাতা শহর গাওদিযার দিকে চলিয়া গেল। বিন্দুকে নন্দ স্বতন্ত্র বাড়িতে বাখিয়াছে, দাস-দাসী দরোয়ান আব বিলাসিতাব ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। বিন্দুর বাড়ি যে পাড়ায়, সে পাড়াটাও ভালো নয়। নন্দ কি পাগল? পাগল হোক আর যাই হোক, ওকে তো সে অনায়াসে মারিতে পারিত। বৃষ্টিধারার মতো কিল চড় ঘুঁষি। কতক্ষণ আর সহিতে পারিত? পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নন্দ পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিত। অজ্ঞান অচৈতন্য নন্দ।

তবু, নন্দ হয়তো বিন্দুকে ভালোবাসে?

শীত জমিয়া আসে।

পৌষ-পার্বণ আসিয়া পড়িতে আর দেরি নাই। গ্রামে অবিরত ঢেঁকি পাড় দিবাব শব্দ শোনা যায়। আকাশে ববিব তেজ কমিয়াছে। মাঠে রবিশস্য সতেজ। মানুষেব গা ফাটিতে আরম্ভ কবিয়াছে। গায়ে যাহার মাটি বেশি, ঘষা লাগিলেই খড়ি উঠিয়া যায়। লেপ কাঁথা খোলা হইয়াছে, বেড়াব ফাঁকগুলিতে ন্যাকড়া ও কাগজ গোঁজা হইতেছে। মতি একবাব জ্বরে পড়ি-পড়ি কবিয়া পড়ে নাই। কুসুমের আর একবার পেটব্যথা হইয়া গিয়াছে। পরান একদফা গুড় চালান দিয়াছে। এবার তাহাব কিছু পাটালি গুড় করিবার ইচ্ছা। শশীর কাছে কিছু টাকা ধার করিয়া সে আরও প্রায় চল্লিশটা খেজুব গাছ লইয়াছে। লালীর বাছুরটা নিতাই একদিন যাচিয়া পরানকে ফেরত দিয়া গিযাছে।

ছোটোবাবুর জন্যে। নইলে বাছুর তুমি কখনও ফেবত পেতে না। এই কথা বলিয়াছে কুসুম। খেজুর গাছ কেনার জন্য শশীর কাছে পরানকে টাকা ধার করিতে দিতে কুসুমের অত্যন্ত অনিচ্ছা দেখা গিয়াছিল। সব সময় তাহার ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে মর্যাদা দিলে সংসার চলে না, এই যুক্তিতে, পরান তাহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। মোক্ষদার শরীরের অবস্থাটা কিছুদিন হইতে ভালো যাইতেছে না। শশীর বাড়িতে একটি আশ্রিতা মেয়ে, শশীর সে কী সম্পর্কে ভাইঝি হয়, ছেলে হওয়ার সময ঠান্ডা লাগিয়া নিউমোনিয়া হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাপাবটাতে শশী বড়ো ধাক্কা পাইয়াছিল। বাড়ির উঠানে সাময়িক ভাবে অতি কম খরচে কাঁচা বাঁশের সস্তা বেড়ার একটি ঘর তুলিয়া আঁতুড়ঘর করা হয়। চাল টিনের। ব্যাপাব চুকিলে টিনের চালাটি ছাড়া ঘরটিকে বিসর্জন করা হয়। মৃতা মেয়েটির বেলাতেও এই ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

এখন শশীর বাড়িতে এ প্রথা চিরন্তন। শশী নিজেও এমনি একটি কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মরে নাই। শশী পৃথিবীতে আসিয়াছিল উলঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া, এখন সে ডাক্তার। পসারওয়ালা ডাক্তার। এমন ব্যাপার সে ঘটিতে দিল কেন?

সে কি শুধু টাকার জন্য ডাক্তারি শিখিয়াছে? যেখানে যতটুকু কাজে লাগাইলে টাকা মেলে আপনার শিক্ষাকে সেখানে ঠিক ততটুকুই কাজে লাগাইবে? সমস্ত গ্রামকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইতে যাওয়া বৃহৎ ব্যাপার, ওটা না হয় সে বাদ দিল, কিন্তু নিজের গৃহে?

না, সে ডাক্তার নয়। ব্যাবসাদার। বাহিরে সে টাকা কুড়াইয়া বেড়ায়, বাহিরে সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার ভাড়া-করা সৈনিক ; গৃহে তাহার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মৃত্যুর আধিপত্য।

তারপর কয়েক দিন শশী বাড়িতে স্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কী দিয়ে দাঁত মাজছিস?

কয়লা দিয়ে।

নিমের দাঁতন দিয়ে মাজ।

তেতো যে? কয়লাব দাঁত কত সাদা হয়!

যে কয়লা দিয়া দাঁত মাজিত সে কিছুতেই নিমের দাঁতন ব্যবহার কবিতে বাজি হইল না।

শশী কি খেপিয়া গিয়াছে? দাঁত মাজিবে তাব মধ্যে এত কাণ্ড কেন!

মাটিতে ওকে মুড়ি দিলি যে কুন্দ? বাটি নেই!

বাটিতে দিলে এক খাবলায় সব খেয়ে ফেলবে যে! তখন ফের চেঁচাতে আবম্ভ করবে। ছড়িয়ে দিলাম খুঁটে খুঁটে অনেকক্ষণ খাবে।

কুন্দ সগর্বে ছেলেকে নিরীক্ষণ করে। নধর শিশু! শশীর চোখে লাগিয়াছে। একটু কোলে নিক না? শশী তাহাকে বোঝায়, বলে মুড়ির সঙ্গে ছেলে তোর জার্ম খাচ্ছে জানিস? পেটে কৃমি হবে, আমাশা হবে, কলেরা হবে--

কী সব অমঙ্গুলে কথা! কুন্দ বলে, বালাই ষাট! ভাবে, ও সব কিছু যদি হয় তো তোমার মুখেব দোষে হয়েছে জানব। ডাক্তার হযেছ বলেই তুমি যা তা বলবে না কি? বাছাব তুমি গুবুজন, ওর কপালে কথা তোমার ফলেও যেতে পারে, এ খেয়াল তোমার নেই।

কুন্দর ছেলে হামা দিয়া মাটি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুড়ি খাইতে থাকে দুবেলা; শশীব কথা কুন্দ বিশ্বাস করে না। দু আঙুলে একটি একটি মুড়ি মুখে দিবাব সময় ছেলেকে তাহার কী সুন্দব দেখায়!

শশী রাগ কবিয়া ধমক দিলে কুন্দ বলে, চুপ করুন শশীদাদা। ছেলে আপনাব নয়। মামা চোখ বুজলে আপনি বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবেন তা জানি।

বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবার কথাটা কোথা হইতে আসে শশী বুঝিতে পারে না। তবে অবাস্তব শোনায় না। কারণ, শশীব মতে, বাড়ি হইতে খেদাইয়া দেওয়ার উপযুক্ত কুন্দ ছাড়া আব কে আছে?

শশী বলে, পিসি কথা শোনো, ছেলেকে তোমার অত দুধ খাইও না। ওব সিকি দুধ হজম করার ক্ষমতাও যে ওর নেই!

পিসি ভাবে, হায়রে কপাল! বাড়িতে এত দুধের ছড়াছড়ি, আমার ছেলে একটু দুধ খায় এ কারও সয় না। কতটুকু দুধই বা ও খায়!

কী জানি কবে ছেলের দুধের বরাদ্দ কমিয়া যায় এই ভয়ে পিসি ছেলেকে আরও একটু বেশি দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করে। দুপুরবেলা শশী ঘরে ঘরে বলিয়া যায় ; ওঠো, উঠে পড়ো সবাই, ঘুমোতে হবে না! শীতকালের দুপুরে ঘুম কীসের?

সকলে একদিন দুইদিন সহ্য করে, হাসিমুখে উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বলাবলি করে : শশীর হয়েছে কী? এবার বাপু ওর একটা বিয়ে দেওয়া দরকার! কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাহারা বিদ্রোহ করে। যাদের বয়স কম ও স্বামী আছে তারা ভাবে, আমাদের মতো রাত জাগতে হলে দুপুরে ঘুমোই কেন বুঝতে! যাদের স্বামী নাই, তারা ভাবে : দুপুরবেলা না ঘুমিয়ে করব কী? সময় কাটবে কী করে? শশী যেন পাগল, স্বাস্থ্য দিয়ে আমাদের কী হবে! গিন্নিরা, যাদের বয়স হইয়াছে, তারা ভাবে

কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। দুপুরে না ঘুমুলে অম্বলের জ্বালা বোধ হয় একটু কমে। কিন্তু পেটে ভাতটি পড়লেই যে চোখ জড়িয়ে আসে, তার কী হবে?

গোপাল শুনিয়া বলে, ও কি শেষে বাড়িতেই ডাক্তারি বিদ্যে ফলাতে আরম্ভ করল না কি?

সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে শশী একবার বেড়াইয়া আসে। পাকা ঘরের অধিবাসীদের বলে, তোমাদের কাণ্ডখানা কী? দম আটকে মরবে যে সবাই! সব জানালা বন্ধ, বাতাস আসবে কোথা দিয়ে?

তাহারা হাসে ; জানালা খুলিলে ঠান্ডা লাগিবে না? একঘর বাতাস আগে এই কটি প্রাণী নিশ্বাস নিক, দম তো আটকাইবে তবে?

বেড়ার-ঘরের অধিবাসীদের শশী বলে : বেড়ার ফাঁক পর্যন্ত কাগজ দিয়ে বন্ধ করেছ। এর মধ্যে বাতাস দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে। একটা জানালা অন্তত খুলে দাও। কাল নইলে আমি সিলিং কাটিয়ে দেব, চাল আর বেড়ার মধ্যে যে ফাঁক আছে তাই দিয়ে পচা বাতাসটা তো বেরিয়ে যাবে!

কুন্দ বলে, খেমির মতো আমাদেরও নিমুনিয়া করিয়ে মারবেন নাকি শশীদাদা? কচি ছেলে নিয়ে কাঁচা ঘরে আছি, কত সাবধানে থাকতে হয় আপনি তার কী বুঝবেন। এ তো দালান নয়, পাকা ঘর তো আর আমাদের ভাগ্যে নেই যে—

প্রত্যেক কথায় কুন্দ এমনি নালিশ টানিয়া আনে। এই তাহার স্বভাব। বাড়ির লোকের স্বাস্থ্য ভালো করার চেষ্টা শশী ত্যাগ করিয়াছে। প্রথমটা ভয়ানক রাগ হইয়াছিল ; ক্রমে ক্রমে সে করিয়াছে জ্ঞানলাভ। সে বুঝিয়াছে, তার স্বাস্থ্যনীতি পালন করিতে গেলে জীবনের সঙ্গতি ওদের একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, অসুখী হইবে ওরা। রোগে ভুগিয়া, অকারণে মরিয়া ওরা বড়ো আনন্দে থাকে। স্ফূর্তি নয়,—আনন্দ,—শান্ত স্তিমিত একটা সুখ। স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে, ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য। ওরা প্রত্যেকে রুগ্ণ অনুভূতির আড়ত, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙা-গড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা : ভ্যাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলমি ফুল। সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।

শশী ভাবে। ভাবিয়া অবাক হয় শশী। কুমুদ একদিন এই ধরনের একটা লেকচার ঝাড়িয়াছিল, পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে কত বোকা এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য। কাপড়-মাপা গজ দিয়া আমরা নাকি আকাশের রং মাপি, জীবনের অবস্থার হিসাবে স্থির করি মনের সুখ-দুঃখ ; বলি মানুষ দুঃখী, আর রাগে গরগর করি। মিথ্যা তো বলে নাই কুমুদ, শশী ভাবে। চিন্তার জগতে সত্যসত্যই আমাদের স্তর-বিভাগ নাই। বস্তু আর বস্তুর অস্তিত্ব এক হইয়া আছে আমাদের মনে। কখনও কি ভাবিয়া দেখি মানুষের সঙ্গে মানুষের বাঁচিয়া থাকার কোনো সম্পর্ক নাই? মানুষটা যখন হাসে অথবা কাঁদে তখন হাসি-কান্নার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলি মানুষটাকে ; মনে মনে মানুষটার গায়ে একটা লেবেল আঁটিয়া দিই—সুখী অথবা দুঃখী। লেবেল আঁটা দোষের নয়। সব জিনিসেরই একটা সংজ্ঞা থাকা দরকার। কে হাসে আর কে কাঁদে এটা বোঝানোর জন্য দু-দশটা শব্দ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বটে। তার বেশি আগাই কেন? কেন পরিবর্তন চাই? নিঃশব্দ অশ্রু মুছিয়া আনিঁতে চাই কেন সশব্দ উল্লাস? রোগ শোক দুঃখ বেদনা বিষাদের বদলে শুধু স্বাস্থ্য বিস্মৃতি সুখ আনন্দ উৎসব থাকিলে লাভ কীসের?

আরও মজা আছে। লাভ না থাক, ক্ষতিই বা কী?

ভাবিতে ভাবিতে রীতিমতো বিহ্বল হইয়া যায় বইকী শশী! সে রোগ সারায়, অসুস্থকে সুস্থ করে। অথচ একেবারে চরম হিসাব ধরিলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায় ; রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না সারানো, সমান—রোগীর পক্ষেও শশীর পক্ষেও। এ সব ভাবিতে ভাবিতে কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে! রহস্যানুভূতির এ প্রক্রিয়া শশীর মৌলিক নয় ; সব মানুষের

মধ্যে একটি খোকা যে মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামিকে লইয়া সময়ে অসময়ে এমনি ভাবে খেলা করিতে ভালোবাসে।

একদিন শশী হারু ঘোষের বাড়ির অদূরে তালবনের ধারে মাটির টিলাটিতে উঠিয়াছিল। বর্ষার পর টিলাটি জঙ্গলে ঢাকিয়া যায়। জঙ্গল ভেদ করিয়া টিলার উপর উঠিবার কী দরকার ছিল শশীর? সূর্যাস্ত দেখিবে। দিগন্তের কোলে তরুশ্রেণি যে বাঁকা রেখাটি রচনা করিয়াছে তাহারই আড়াল হইতে দেখিবে সূর্যকে।

কী ছেলেমানুষি শখ! নিজের কাছে ছেলেমানুষ হইতে শশীর লজ্জা ছিল না। কেবল শখটি মিটাইতে গিয়া যে মূল্য তাহাকে দিতে হইল আগে জানিলে তাহাতে শশী রাজি হইত না। টিলার উপরে উঠিয়া পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া সে যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মন শান্তিতে ভরিয়া আছে। আগামী জীবনের যত ভালো মন্দ কাজ তাহাকে করিতে হইবে তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তিতে সহজ বিশ্বাস আছে, সাহস আছে। কিন্তু সূর্য ডুবিবার আগে শশী সহসা ভীত হইয়া পড়িল। ছেলেবেলায় মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়া এক একদিন তাহার যেমন ভয় করিত, তেমনি ভয়। শরীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যৎও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর বহু ঊর্ধ্বে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত। সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না, কিন্তু আর কখনও নিশ্বাস সে লইতে পারিবে না।

তারপর কয়েকদিন শশী খুব চিন্তিত ও বিষণ্ণ হইয়া রহিল।

ছয়

গ্রাম্য জীবনে আবার শশীর বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। মাঝখানে কিছুদিন সে যেন এখানে বাস করিয়াছিল অন্যমনস্কের মতো। আধখানা মন দিয়ে সব সময় সে তাহার কাম্য জীবনের কথা ভাবিত,—শিক্ষা, সভ্যতা ও আভিজাত্যের আবেষ্টনীতে উজ্জ্বল কোলাহলমুখর উপভোগ্য জীবন। এখানকার মশকদষ্ট মৃত্তিকালীন জীবন এই সান্ত্বনার জন্য শশীর সহ্য হইয়া আসিয়াছিল যে যখন খুশি গ্রাম ছাড়িয়া যেখানে খুশি গিয়া মনের মতন করিয়া জীবনটা সে আরম্ভ করিতে পারে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিপুলতা অবশ্য কমিয়া যায় নাই, শশীর স্বাধীনতাও হরণ করে নাই কেহ। তবু শশীর মনে হয় চিরকালের জন্য সে গ্রাম্য ডাক্তারের মার্কামারা হইয়া গিয়াছে,—এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহ এ জন্য দায়ি কুসুম। শশীর কল্পনার উৎস সে যেন চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বিদ্যুতের আলোর মতো উজ্জ্বল যে জীবন শশী কল্পনা করিত সে যাযাবরের জীবন নয়,—শশীর নীড়-প্রেম সীমাহীন। কল্পনার তাই একটি কেন্দ্র ছিল শশীর, এক অত্যাশ্চর্য অস্তিত্বহীনা মানবী, কিন্তু অবাস্তব নয় : শশীর ভাবুকতা উদভ্রান্ত হইতে জানে না। কুসুম যেন তাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে—সেই মহা-মানবীকে।

ছোটোবোন সিন্ধু আর মতি ছাড়া কারও সঙ্গ শশীর ভালো লাগে না। এত বড়ো গ্রামে শুধু এই দুটি তার প্রিয়তমা বান্ধবী। নীচে সিন্ধু পুতুল খেলা করে, খাটে বসিয়া শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে সে খেলা চাহিয়া দ্যাখে।

খুকি, বড়ো হয়ে তুই কী করবি?

পুতুল খেলব।

এই একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেবারে হালকা হইয়া যায়। জানালা দিয়ে সে বাহিরের দিকে তাকায়। জানালার নীচে সেদিন কুসুম যে গোলাপের চারাটি মাড়াইয়া দিয়াছিল, শশীর যত্নে সেটি আবার মাথা তুলিয়াছে।

মতি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে, আপনার সেই বন্ধুটি পত্র দিয়াছে?

কে রে মতি, কুমুদ? না দেয়নি—কেন?

এমনি শুধোচ্ছি।

এমনি শুধোবি কেন ও কথা?

সুন্দর যাত্রা করে যে!

তা বটে! সুন্দর যাত্রা করে বলিয়া কুমুদ পত্র দিয়াছে কি না মতির তা জিজ্ঞাসা করা চলে বটে। শশী হাসিয়া বলে, ওর পার্ট তোর খুব ভালো লাগত, নারে মতি?

আমার একার কেন, সবার লাগত। একটা যাত্রাগান দিন না ছোটোবাবু, দেবেন? কত টাকা নেয়? গম্ভীর মুখে শশীর হাসিকে মতি অগ্রাহ্য করে, বলে, আমার টাকা থাকলে ও দলটা ভাড়া করে আনতাম ছোটোবাবু, আমাদের বাড়ির সামনে শামিয়ানা খেঁচে আসর করে দিতাম, পালা হত সাতদিন।

মতি একটু গম্ভীর হইয়াছে আজকাল। কথা বলিতে বলিতে দুচোখে তাহার একটু ভীরু ঔৎসুক্য দেখা দেয়। কথা শেষ করিয়া কী যেন ভাবে মতি। শশী ভাবে, কে জানে হয়তো ধীরে ধীরে অবশ্যম্ভাবী আত্মচিন্তাই এবার আসিতেছে মতির। গ্রামের মেয়ে তো, নিশ্চিন্ত থাকিবার বয়সটা ইতিমধ্যে পার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে তাতে আশ্চর্য নাই।

একদিন বাসুদেব বাঁড়ুয্যে সপরিবারে গ্রামত্যাগের আয়োজন করিলেন। কলিকাতায় মেজোছেলে চাকরি করিত, সম্প্রতি সেজোছেলেও কোনো আফিসে চাকুরে হইয়াছে। জমিজমা নাই। গোপালের শত্রুতার জন্য কেহ টাকা ধার করিতে আসে না। আসিলেও গোপালের পরামর্শে সুদে আসলে গাপ করিতে চায়। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে আর কেন গ্রামে থাকা? এমন অনেক গিয়াছে। গ্রাম জুড়িয়া এখানে ওখানে পোড়ো ভিটা খাঁ খাঁ করে। খবর পাইয়া শশী দেখা করিতে গেল। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা হইতেছে দেখিয়া হঠাৎ কেমন রাগ হইয়া গেল শশীর। সে নিজে যখন গ্রামের পাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে চিরকালের জন্য, আর কারও যেন গ্রাম ত্যাগ করা অন্যায়।

আপনার কাছে কতগুলো টাকা পেতাম বাঁড়ুয্যেকাকা।

কলকাতা গিয়ে পাঠিয়ে দেব বাবা। কটা টাকা তো,—ছেলেরা মাসকাবারে মাইনে পেলে একটা দিনও দেরি করব না।

শশী মাথা নাড়িল, না, অনেকদিন পড়ে আছে টাকাটা, দিয়েই যান!

শশীর এত টাকার প্রয়োজন কীসের কে জানে! বিশ্রী একটা কলহ বাধিয়া গেল বাসুদেবের সঙ্গে। তার দুই ছেলে রুখিয়া আসিল। কোনো পক্ষেরই মান-অপমানের পার্থক্য রহিল না। তবু শশী ছাড়িল না,—ছোটো নোটবুকটিতে ভিজিট আর ওষুধের জন্য যত টাকার অঙ্কপাত করা ছিল, সমস্ত টাকা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইল। টাকাটা পকেটে পুরিয়া বলিল, দু-দুটো চাকরে ছেলে আপনার,—ডাক্তারের ফি দিতে মরেন কেন বাঁড়ুয্যেকাকা? কলকাতায় ডাক্তার ডেকে তার সঙ্গে যেন এ রকম করবেন না ককখনো, জুতো মেরে যাবে।

ফিরিতে ইচ্ছা হয় না শশীর,—অনেকক্ষণ ধরিয়া আরও তীব্র ভাষায় সকলকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হয়,—সে একটা কটু আনন্দের নিবিড় স্বাদ পায়। বাসুদেবের বিধবা বউটি, মৃত ভুতোকে বাঁচানোর জন্য একদিন যে শশীর পথ আটকাইয়াছিল, হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ায় শশী যেন চমকাইয়া

গেল। ভুতোর মৃত্যুর তিন মাস পরেও এ বাড়িব কাছাকাছি পথ দিয়া যাওয়াব সময় শশী এব বিনানো কান্না শুনিয়াছে। আজও সে কাঁদিতেছিল, নিঃশব্দে। আশ্চর্য নয়, যাব চিকিৎসায় ভুতো বাঁচে নাই সেই ডাক্তার আসিয়া ভিজিটের টাকার জন্য এমন কাণ্ড করিলে মন যার স্নেহকোমল সে তো কাঁদিবেই। পাংশু মুখে শশী পলাইয়া আসিল।

ভুতোর চিকিৎসার হিসেব সে যে ধরে নাই,—যে টাকা সে আদায় করিয়াছে তার প্রত্যেকটি পয়সা যে এ বাড়ির অন্য লোকের অসুখের চিকিৎসা করাব দরুন,—যাবা আজও সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া আছে,—বউটি একবারও তাহা ভাবিবে না। ভুতোর জন্য মন কেমন করিলে গাওদিয়ার শশী ডাক্তারকে স্মরণ কবিযা সে শিহরিয়া উঠিবে। হয়তো কোনোদিন শহরের প্রতিবেশিনীদের কাছে গ্রামের গল্প বলিবাব সময় আজিকার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিবে, গাঁয়ের ডাক্তারগুলো পর্যন্ত এমনি মানুষ দিদি, আমরা গাঁ ছেড়ে এসেছি কি সাধে?

কয়েক দিন পরে শশীব একবার কলিকাতা যাওযার প্রয়োজন ছিল,—কয়েকখানা বই ও কতকগুলি ওষুধ কিনিবে। একদিন পবান লজ্জিত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, কলকাতা যাবার বায়না নিয়ে মতি বড়ো কাঁদা-কাটা জুড়েছে ছোটোবাবু।

শশী অবাক হইয়া বলিল, কলকাতা যাবে? কার সঙ্গে?

বলছে আপনার সঙ্গে যাবে।

শশী হাসিয়া বলিল, তুমি বুঝি তাই আমাকে বলতে এসেছ, যদি নিয়ে যাই? তোমার বুদ্ধি নেই পরান। আমি যেতে পারি নিয়ে,—গাঁয়ের লোক বলবে কী?

শশী একা মতিকে লইয়া কলিকাতা যাইবে পরান সে কথা বলিতে আসে নাই। পরানও সঙ্গে যাইবে বইকী। মোক্ষদা বাবকয়েক গঙ্গাস্নানের ইঙ্গিত করিয়াছে,—এ সুযোগ বুড়ি ছাড়িবে মনে হয় না। সুতরাং কুসুমও যাইবে সন্দেহ নাই। মতির জন্য এবার ফতুর হইতে হইবে পরানকে,—এতগুলি মানুযের কলিকাতা যাওযা-আসাব খরচ কি সহজ! কিন্তু না গেলেও চলিবে না,—মতি দুদিন নাওয়া খাওয়া ছাড়িয়া কাঁদিয়াছে।

হঠাৎ ওর এত কলকাতা যাওয়ার শখ হল কেন? —শশী জিজ্ঞাসা কবিল।

পরান তা জানে না। মাথা নাড়িয়া জ্ঞানীর মতো সে শুধু বলিল, জানেন ছোটোবাবু, নাই দিয়ে দিয়ে কর্তা ওর মাথাটা খেয়ে গেছে।

নাই তুমিও ওকে কম দাও না পরান!

শশী মতিকে বুঝানোর চেষ্টা করিল। বলিল, কী চাস তুই আমাকে বল, কিনে আনব তোর জন্যে—কী করবি মিছামিছি কলকাতা গিয়ে? মতি ভীরু ও শান্ত, শশীর কথা সে চিরকাল মানিয়া আসিয়াছে,—আজ কিন্তু সে কোনো কথা কানে তুলিল না।

শেযে শশী রাগিযা বলিল, চল তবে, চল। তোকে কলকাতায় ফেলে রেখে আমরা চলে আসব। তখন টের পাবি।

নৌকা, স্টিমার, রেল, তবে কলিকাতা। সমস্ত পথ মতি অস্থিব, উত্তেজিত হইয়া রহিল! কুসুম চারদিক দেখিতে দেখিতে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে চলিল, কিন্তু মতির যেন নদীর বুকে, রেলপথের দুধারে দেখিবার কিছু মিলিল না। অতটুকু মেয়ে, জীবনে এই প্রথম দূরদেশে বেড়াইতে চলিয়াছে, চোখের পলকে পথ ফুরাইয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া যাওয়ার ভয়টাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তার একান্ত আগ্রহ দেখা গেল তাড়াতাড়ি কলিকাতায় উপস্থিত হইতে।

হয়তো সে ভাবিয়াছিল কলিকাতায় পা দেওয়া মাত্র কুমুদের দেখা মিলিবে,—তাকে শহরে অভ্যর্থনা করিয়া লইবে রাজপুত্র প্রবীর!

পথে একবার সে জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় আমরা কোথায় থাকব ছোটোবাবু? আপনার সেই বন্ধুর বাড়িতে?

শশী বলিল, খুব তাহলে যাত্রা শুনতে পারিস, না? যাত্রা শুনবার লোভে তুই কলকাতায় চলেছিস নাকি মতি? থিয়েটার দেখিস একদিন, দেখাব তোদের—যাত্রার চেয়ে সে ঢের ভালো।

পাঁচদিন তাহারা কলিকাতায় রহিল। যা কিছু দেখার ছিল শহরে দেখিয়া বেড়াইল। স্নান কবিল গঙ্গায়, পূজা দিল কালীঘাটে, ট্রামে চাপিয়া অকারণে ঘোরা-ফেরা করিল। কিন্তু কোথায় মতির রাজপুত্র প্রবীর? শশীর সে বন্ধু, এই শহরের কোথাও সে বাস করে। কিন্তু শশী একবার না করিল তার নাম, না আনিল তাকে ডাকিয়া। শহরের অফুরন্ত বিস্ময় অভিভূত করিয়া না বাখিলে মতির দুচোখ ভরিয়া হয়তো জল আসিত। শিয়ালদহের কাছে একটা হোটেলে তাহারা দুখানা ঘর ভাড়া করিয়াছে,—একটা ঘর শশীর একার। একদিন শশী তার এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাইযা আসিল। রাত্রে উঁকি দিয়া তার ঘর খালি দেখিয়া মতি ভাবিল শশী তবে নিশ্চয় কুমুদেব কাছে গিয়াছে,—সকালে দুজনে একসঙ্গে আসিবে। কুমুদ ছাড়া জগতে শশীর আর কোনো বন্ধু আছে বলিয়া মতি জানে না। পরদিন বেলা দশটা বাজিয়া গেল, সকাল হইতে মতি সিঁড়ি দিয়া হোটেলের সমস্ত লোকেব ওঠানামা চাহিয়া দেখিল, কিন্তু শশী অথবা কুমুদ কেহই আসিল না। পরানের সঙ্গে সেদিন তাদেব যাদুঘরে যাওয়ার কথা,—সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সারিয়া বাহির হওয়া দরকার,—মতি নড়িতে চায় না।

ছোটোবাবু আসুক?

ছোটোবাবু এ বেলা আসবে না মতি, এলে এতক্ষণ আসত।

ও বেলা যাদুঘর যাব দাদা, অ্যাঁ? এ বেলা বড্ড শীত।

পরানের চাদরটা গায়ে জড়াইয়া মতি ঠির ঠির করিয়া শীতে কাঁপে।

কুসুম বলে, মর তুই আহ্লাদি মেয়ে! ছোটোবাবু আজ মোটবগাড়ি চাপাবে না লো, পিত্যেশ করে থেকে করবি কি? দেরি হল বলে মোটর এল সেদিন, মোটবে ঢের পযসা লাগে। নাইবি তো নেয়ে ফ্যাল মতি, নয়তো ভাত দিয়েছি খাবি আয়।

যাইতে হইল মতিকে। জন্তু জানোয়ার দেখিয়া সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া সে দেখিল, ঘরে বসিয়া শশী চা খাইতেছে, —একা, কুমুদ নিশ্চয আসিয়াছিল, বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মতি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন ছোটোবাবু?

শশী বলিল, এই তো এলাম খানিক আগে। কোথা গিয়েছিলি,—যাদুঘব? কাল কিন্তু শেষ দিন মতি, পরশু আমরা ফিরে যাব।

মতির তাতে আপত্তি নাই। আর কলিকাতায় থাকিয়া কী হইবে?

পরদিন সন্ধ্যার সময় শশী বিন্দুর খবর আনিতে গেল। নন্দ থাকিলে রাগ করিবে, হয়তো অপমানও করিবে। করুক। সে জন্য বোনটা বাঁচিয়া আছে কি না এটুকু না জানিয়া বাড়ি ফেরা যায় না। গোপালের খেয়ালে জীবনে যারা দুঃখ পাইয়াছে তাদের জন্য শশীর মনে একটা অতিরিক্ত মমতা আছে। গোপালের কীর্তিতে নিজেকেও সে কেমন অপরাধী মনে করে। মনে হয়, তারও যেন দায়িত্ব ছিল।

পাড়াটা ভালো নয়। যে পথের শেষাশেষি বিন্দুর বাড়ি—সন্ধ্যার পর মানুষকে সে পথে হাঁটিতে দেখিলে চেনা লোক নিন্দা রটায়। তবে বিন্দুর বাড়িটা একটু তফাতে, —ভদ্রপাড়ার গা ঘেঁষিয়া! বাড়ির পুব দিকে খানিকটা জমি খালি পড়িয়া আছে। ইট সুরকির তলে সমাধি পাওয়া বিন্দু বোধ হয় ওই দিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

নন্দ বাড়ি ছিল না। বিন্দুকে শশী প্রায় আড়াই বছর পরে দেখিল। প্রায় তেমনি আছে বিন্দু। বিন্দুর ঘরের চেহারাও বিশেষ বদলায় নাই।

কেমন আছিস বিন্দু?

ভালো আছি দাদা, কবে এলে? সবাই ভালো আছে তো?

শশী হাসিয়া বলিল, বলব কেন? চিঠি লিখে খবর নিতে পারিস না?

বিন্দু বলিল, চিঠি লিখতে বড়ো আলসেমি লাগে দাদা!

শশী জানে এটা ফাঁকিব কথা। নন্দ চিঠি লিখিতে দেয় না। শশীকে খাবার দিয়া বিন্দু নানা কথা জিজ্ঞাসা কবিতে লাগিল। গাওদিয়া গ্রামটি সম্বন্ধে আজও বিন্দুর কৌতূহল আছে। কে বাঁচিয়া আছে, কে স্বর্গে গিয়াছে, চেনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে কার কার বিবাহ হইয়াছে, কার কটি ছেলেমেয়ে—শশীর মুখে এ সব খবব শুনিতে শুনিতে বিন্দুর চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

শশী বলিল এব মধ্যে তোর খোকা-খুকি কিছু হয়নি বিন্দু?

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। কিন্তু মুখে বলিল উলটা কথা।

মরে গেল যে?

মরে গেল? কবে মরে গেল?

আর বছব।

শেষবার দেখিতে আসিয়া শশীর মনে হইয়াছিল বিন্দুর বোধ হয় ছেলে হইবে। সে ছেলে হইয়া তবে মবিয়া গিয়াছে? বিন্দু দেয়ালের গায়ে রাধাকৃষ্ণের ছবিটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ শশীর মনে হইল শরীরটা বিন্দুব ঠিক আছে, কিন্তু মুখটা তাহার কেমন এক অদ্ভুত রকমের রোগা হইয়া গিয়াছে। মুখেব চামড়ার নীচেই যেন শুষ্কতা,—ত্বকে লাবণ্য শুষিয়া লইতেছে।

তোর অসুখ-বিসুখ করেছে না কি বিন্দু?

কীসেব অসুখ? বেশ আছি আমি।

বাহিরে গিয়া বিন্দু কোথা হইতে একপাক ঘুরিয়া আসিল।

ভালোই আছিস বিন্দু, অ্যাঁ?

আছি বইকী!

সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিস্ময়কর লাগে! এমন রহস্যময় মনে হয় বিন্দুর মুখের গোপন-করা বুড়োটে ভাব, বিন্দুর অবসাদক্লিষ্ট, নিরুত্তেজ কথা। বিন্দু তার বোন, পাতানো সম্পর্ক নয়। ছুরি দিয়া আঙুল কাটিয়া দিলে দুজনের যে বক্ত বাহিব হইবে তাহা এক, কোনো পার্থক্য নাই। অথচ বিন্দুকে সে একরকম চেনে না, বোঝে না।

শশী মমতাব সঙ্গে বলিল, অত দূরে বসলি যে? এদিকে আয়, এখানে বোস।

বিন্দু উদ্ধতভাবে বলিল, কেন?

শশী বলিল, আয়, সরে আয়, কটা কথা শুধোই তোকে।

ইতস্তত করিয়া বিন্দু কাছে আসিল। তার দুচোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

কাঁদিস কেন?

এ প্রশ্নে বিন্দু একেবারে ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোনোদিন তুমি আমাকে কাছে ডেকেছ! কেউ ডেকেছে!

শশী অবাক হইয়া যায়। কিছু বলিতে পারে না। এ বাড়িতে আসিয়া পরের মতো আধঘণ্টা বসিয়া সে চিরদিন বিদায় লইয়াছে, তা সত্য। কিন্তু কী করিতে পারিত শশী? কদাচিৎ অতটুকু সময়ের জন্য সে যে আসিত, তাতেই নন্দ পাছে রাগ করিয়া বিন্দুকে কষ্ট দেয় শশীর সে জন্য ভয় করিত। বিন্দুর মনে তাতে এত ব্যথা লাগিল, সেই নিরুপায় অনাদরে? বিন্দু তো কোনোদিন কিছু বলে নাই মুখ ফুটিয়া!

অনেক দিনের অভিমানে বিন্দু অনেকক্ষণ কাঁদিল। শেষে সে শান্ত হইলে শশী বলিল, তোর ব্যাপারটা কী খুলে বল তো বিন্দু?

কিছু না দাদা।

শশী বুঝাইয়া বলিল, আজ না বললে আর কোনোদিন বলতে পারবি না বিন্দু—অন্যদিন লজ্জা করবে। নন্দ খারাপ ব্যবহার করে?

হুঁ। আমাকে ভীষণ শাস্তি দিচ্ছে।

ভীষণ শাস্তি? নন্দ ভীষণ শাস্তি দিতেছে বিন্দুকে? বিন্দুর এমন বাড়ি, এত কাপড় গয়না, এত বিলাসিতার ব্যবস্থা!

নন্দ তোকে ভালোবাসে না বিন্দু?

বাসে। স্ত্রীর মতো নয়। —রক্ষিতার মতো।

অ্যাঁ? কীসের মতো?—শশী যেন বুঝিতে পারে। গাওদিয়ার বিন্দুকে গ্রাস-করা কলিকাতার অনামি-রহস্য শশীর কাছে স্বচ্ছ হইয়া আসে।

বিন্দু বলিল, দেখবে? উনি এলে কোন ঘরে বসেন দেখবে দাদা? চলো দেখাই।

শশীর দেখিবার সাধ ছিল না, হাত ধরিয়া বিন্দু তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল। ওদিকের বড়ো একখানা ঘরের তালা খুলিয়া সুইচ টিপিয়া বিন্দু আলো জ্বালিল।

কী সে তীব্র আলো! গোটা তিনেক বাল্‌ব ঘিরিয়া কাঁচের ঝাড় ঝলমল করে,—শশীর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল। দেয়ালে আট-দশটা অশ্লীল ছবি। মেঝে জুড়িয়া ফরাশ পাতা। তাতে কয়েকটা বড়ো বড়ো তাকিয়া। হারমনিয়াম, বাঁয়া তবলা এ সবও আছে।

বিন্দু বলিল, গান শিখিয়েছেন। উনি তবলা বাজান, আমি গান করি।

শশীর আর কিছু দেখিবার অথবা শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। সে মড়ার মতো বলিল, ও ঘরে চল বিন্দু।

বিন্দু শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না আসল জিনিস দেখে যাও।

ঘরে ছোটো একটি আলমারি ছিল। টানিয়া দরজা খুলিয়া বিন্দু বলিল, দ্যাখো।

শশী না দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিল। আলমারির তাকগুলি নানা আকারের নানা লেবেলের বোতলে বোঝাই হইয়া আছে।

নিজেকে শশীর অসুস্থ মনে হইতেছিল। এমন কাণ্ডও ঘটে সংসারে? কী শক্ত মেয়ে বিন্দু! এতকাল এ কথা সে চাপিয়া রাখিয়াছিল? ছেলে হইয়া মরিয়া না গেলে, স্নেহ করিয়া কাছে না ডাকিলে, আজও হয়তো সে কিছু বলিত না।

তুই খাস?

না খেলে ছাড়ছে কে দাদা? দ্যাখো, আমার একটা দাঁত বাঁধানো, —প্রথম দিন সাঁড়াশি দিয়ে দাঁত ফাঁক করে গলায় ঢেলে দিয়েছিল। তারপর থেকে নিজেই খাই।

এদিকের ঘরে আসিয়া শশী বলিল, জোর করে বিয়ে দেবার জন্যে, না?

বিন্দু বলিল, না। আমি হাবভাব দেখিয়ে ভুলিয়েছিলাম বলে।

কিন্তু তা তো তুই কবিসনি? তুই তখন কতটুকু!

ও তাই মনে করে দাদা।

বিন্দুর শুষ্ক চোখ এতক্ষণ জ্বলজ্বল করিতেছিল, আবার স্তিমিত সজল হইয়া আসিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কেন মিথ্যে তোমায় বললাম।

শশী ভাবিতেছিল, বিন্দুর কথায় চমকাইয়া গেল। এমন হতাশ হইযা গিয়াছে বিন্দু? ভাবিতে ভাবিতে শশীর মুখ কালো আর কঠিন হইয়া ওঠে। অন্যদিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, নন্দ আব কাউকে আনে,—বন্ধুবান্ধব?

বিন্দু বলিল, না না, ছি, ও সব বুদ্ধি নেই। যা শাস্তি দেবার নিজেই দেয়। তারপরে মৃদুস্বরে আবার বলিল, অসুখ-বিসুখ হলে খুব ভাবে দাদা, সেবাও করে।

শশী অনেকক্ষণ ভাবিল।

আমার সঙ্গে চলে যাবি বিন্দু?

বিন্দু উৎসুক হইয়া বলিল, কোথায়? কোথায় যাব তোমার সঙ্গে? শশী বলিল, কাল আমরা দেশে চলে যাই,—যাবি?

বিন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, যাব। চলো এখুনি বেরিয়ে পড়ি দাদা, হঠাৎ যদি এসে পড়ে?

বিন্দুর যেন এক মিনিটও সবুর সহিবে না। এতকাল এখানে সে কেমন করিয়া ছিল কে জানে! গাড়িতে শশী তাহাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিল।

পথের পাশে সাজানো দোকানের দিকে চোখ রাখিয়া বিন্দু বলিল, ভেবেছিলাম ক্ষমা করবে।

এতকাল পবে এ কী প্রত্যাবর্তন বিন্দুর? গহনা কই, কাপড় কই, মোটবহর কই? গ্রামের লোক অবাক মানিল। বিন্দুকে জ্বালাতনও কম কবিল না। ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য সকলেই উৎসুক। জেরায় জেরায় বাহিরে পুরুষদেব এবং ভিতবে মেয়েদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শশী আর বিন্দু নিজে ছাড়া কেহ কিছু জানিত না, কেহ কিছু জানিতেও পারিল না। তাই মুখে মুখে নানা কথা প্রচারিত হইয়া গেল।

সেনদিদিই বিন্দুকে যন্ত্রণা দিল সবচেয়ে বেশি। শশীকে অবাক করিয়া কিছুদিন হইতে সেনদিদি হামেশা এ বাড়িতে আসিতেছিল। গোপালের সঙ্গে তার যেন একটা সন্ধি হইয়াছে। কুর্তায় ভুঁড়ি ঢাকিয়া গোপাল তামাক টানে, অদূরে পিঁড়ি পাতিয়া বসিয়া সেনদিদি তার সঙ্গে করে আলাপ। সেনদিদির দাগি মুখ আব কানা চোখ দেখিয়া গোপালেরও যেন একটা রোগ আরাম হইয়া গিয়াছে। আজকাল সে প্রসন্ন, প্রশান্ত। গ্রাম্য রমণীর আবেগপূর্ণ মমতায় সেনদিদি শশীকে আকর্ষণ করিত বটে এবং লাবণ্যবতীর স্নেহ স্বভাবতই মানুষ একটু বেশি পছন্দ করে বলিয়া সে মমতা দামিও ছিল শশীব কাছে। কিন্তু এ কথা শশী কখনও বিশ্বাস করে নাই যে পড়ন্ত সূর্যের মতো শেষ যৌবনের অত্যাশ্চর্য রূপের অস্ত্রে ছেলেকে বশ কবিযা গোপালের উপব একটা উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের এতটুকু ইচ্ছাও সেনদিদির ছিল। গোপালের বাঁকা মন বাঁকা মানে খুঁজিত। তাই সেনদিদির বর্তমান শ্রীহীনতায় গোপালের প্রসন্নভাব শশী বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে না সেনদিদির আসা-যাওয়া। চিরকাল যে শত্রুতা করিয়াছে, ক্ষতি করিয়াছে অপূরণীয়, তার সঙ্গে বসিয়া সেনদিদি যে গল্প করিতে পাবে, শশীকে তা যেন অপমান করে। মাঝে মাঝে হাসির কথাও বুঝি বলে গোপাল, কারণ, সেনদিদির কুশ্রী মুখখানা অনিন্দ্য হাসিতে ভরিয়া যাইতেও দেখা যায়। শশী জানে, খুব অল্প বয়সে সেনদিদির ভার গোপালের ঘাড়ে পড়িয়াছিল। তারপর কত টাকার বিনিময়ে সেনদিদিকে গোপাল যামিনীর কাছে বিসর্জন দিয়াছিল

তাও শশী জানে—দেড়শো টাকা! গোপালের গ্রাম্য রসিকতায় সেই সেনদিদি আজ এমন অকুণ্ঠ হাসি হাসিতে পারে ভাবিলে গ্রামের উপরেই শশীর বিতৃষ্ণা যেন বাড়িয়া যায়।

বিন্দুকে সেনদিদি একদিন একাই প্রায় তিনঘণ্টা কোণঠাসা করিয়া রাখিল। বাক্যহারা মেয়েটাকে কত কথাই সে যে বলিল তার ঠিকঠিকানা নাই। বিন্দু বেশির ভাগ কথার জবাব পর্যন্ত দিল না। তাতে দমিবার পাত্রী সেনদিদি নয়। নিজে প্রশ্ন করিয়া নিজেই একটা পছন্দসই জবাব আবিষ্কার করিয়া বিন্দুর সম্বন্ধে নিজের কাল্পনিক জ্ঞানকে সে অবাধে আগাইয়া লইয়া গেল। মোট কথাটা দাঁড়াইল এই : নন্দ আর একটা বিবাহ করিয়া বিন্দুকে খেদাইয়া দিয়াছে। নন্দর তাহলে তিনটে বিয়ে হল—না দিদি? কী মানুষ নন্দ, অ্যাঁ? শশী বুঝি খবর পেয়ে আনতে গিয়েছিল? তাই তো বলি, হঠাৎ কেন শশী কলকাতা গেল! আমি কি জানি দিদি তোর এমন অদেষ্ট হয়েছে!

এমনই আবেগপূর্ণ মমতা সেনদিদির! কানা চোখ ভরিয়া তাহার অশ্রু টলটল করিতে লাগিল!

কুসুম যেদিন শশীর ঘর দেখিয়া গিয়াছিল তারপর নির্জনে কুসুমের সঙ্গে শশীর আর দেখা হয় নাই। একদিন ভোরবেলা সেই জানালা দিয়া কুসুম তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। শশী উঠিয়া দ্যাখে গোলাপের সেই চারাটিকে আজও কুসুম পায়ের তলে চাপিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁটা ফুটিবার ভয়ও কি নাই কুসুমের মনে?

আজও চারাটা মাড়িয়ে দিলে বউ? কত কষ্টে বাঁচিয়েছি সে বার।

ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটোবাবু, চারার জন্যে এত মায়া কেন? দরকার আছে, তবু ডাকতে আসতে হবে,—রাগ হয় না মানুষের?

শশী বলিল, কী দরকার বউ?

কুসুম বলিল, তালপুকুরে আসুন একবার বলছি।

শশী তালপুকুরে গেল। কনকনে শীতে তালগাছগুলি পর্যন্ত যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। পুকুরের অনেকখানি উত্তরে একটা তালগাছ মাটিতে পড়িয়াছিল, শশীকে কুসুম সেইখানে লইয়া গেল। নিজে তালগাছের গুঁড়িটাতে জাঁকিয়া বসিয়া হুকুম দিয়া বলিল, বসুন ছোটোবাবু, অনেক কথা, সময় নেবে বলতে।

শশী কিছু বলিল না। কুসুমের অনেকখানি তফাতে বসিল। কুসুম যেন একটু অবাক হইয়া গেল প্রথমে, তারপর হঠাৎ লজ্জায় মুখখানা তাহার লাল হইয়া উঠিল। বিন্দুর ব্যাপারটা শুনিবার জন্য কুসুম শশীকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছে। কৌতূহলের বশে এতক্ষণ তাহার খেয়ালও হয় নাই যে চুপিচুপি শশীকে এখানে ডাকিয়া আনিলে কতখানি উপযাচিকা অভিসারিকার মতো কাজ করা হয়।

তারপর বিন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কুসুম শশীকেও একটু অবাক করিয়া দিল। খেয়ালি কম নয় কুসুম। বিন্দুর কাহিনি শুনিবার জন্য এত কাণ্ড! ও কথা সে তো যেখানে খুশি বলিতে পারিত কুসুমকে!

ওর কথা শুনে কী করবে বউ?

কুসুম সবিস্ময়ে বলিল, আমাকে বলবেন না?

শশীর গোপন কথা কুসুমকে না বলার মতো সৃষ্টিছাড়া ঘটনা যেন আর নাই। জীবনে আজ প্রথম শশী কুসুমের প্রকৃতির একটা আশ্চর্য দিক আবিষ্কার করিয়া অভিভূত হইয়া গেল। একটি বালিকা আছে কুসুমের মধ্যে, মতির চেয়েও যে সবল, মতির চেয়েও নির্বোধ। সংসারকে দেখিয়া শুনিয়া কুসুমের যে অংশটা বড়ো হইয়াছে, এই বালিকা কুসুমটি তার আড়ালে বাস করে। সংসারকে যখন সে ভুলিয়া যায়, জীবনের যত দায়িত্ব, যত জটিলতা আছে, কিছুই যখন তাহার নাগাল পায়

না, তখন তাহার এই বিস্ময়কব দিকটা চোখে পড়ে। শশী বুঝিতে পারে, এতকাল কুসুমের যে সব পাগলামি সে লক্ষ করিয়াছে,—ওর শান্ত সহিষ্ণু ও গম্ভীর প্রকৃতির সঙ্গে যা কোনোদিন খাপ খাওয়ানো যায় নাই,—সে সব বহু দূর অতীতের ছেলেমানুষ কুসুমের কীর্তি,—কুসুমেব এখনকার পরিণত দেহমনে যার অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন।

বিন্দুর কথা ধীরে ধীরে শশী সব বলিয়া গেল। বলিতে বলিতে সে অন্যমনস্কও হইয়া গেল মাঝে মাঝে। কী রহস্যময়ী আজ তাহার মনে হইতেছে কুসুমকে! কুসুম যখন সেদিন দুপুরে তার ঘর দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন প্রথম শশীর মনে হইয়াছিল, গত কয়েক বছর ধরিয়া কুসুমেব যত খাপছাড়া ব্যবহাব সে লক্ষ করিয়াছে, সব তাহার মন ভুলানোর জন্য বয়স্কা রমণীর প্রণয়-ব্যবহাব। বড়ো দুঃখ হইয়াছিল সেদিন শশীর,—নিজের মনকে সে মহার্ঘ মনে করে, সে মন যেন বিকাইয়া গিয়াছিল কানাকড়ির দামে। শশী এখন তৃপ্তি বোধ করিল। তাই যদি হইত, কুসুমের সংস্পর্শে সে বছরের পর বছর কাটাইয়া দিয়াছিল, একদিনও সে কি টের পাইত না কুসুম কী চায়? একটি নারী মন ভুলাইতে চাহিতেছে এটুকু বুঝিতে কি সাত বছর সময় লাগে মানুষের? এই কুসুমের মধ্যে যে কুসুম কিশোরবয়সি, সে শুধু খেলা করিত শশীর সঙ্গে। শশী তো তোকে চিনিত না ; তাই ভাবিত, এত বয়সেও পাগলামি গেল না কুসুমের।

তালবন হইতে শশী সেদিন হালকা মনে বাড়ি ফিবিল।

কুসুমকে বিন্দুবও ভালো লাগিল। কুসুমের কৌতূহল মিটিয়াছিল। বিন্দুর কলিকাতাব জীবন সম্বন্ধে সে কোনো কথা তুলিল না। সাধারণ নিয়মে বিন্দু বাপের বাড়ি আসিয়াছে, এতে আশ্চর্য হওয়াব কিছুই নাই, এমনি ভাব দেখাইল কুসুম। বিন্দুর কাছে সে অনেক সময় আসিয়া বসে, নানা কথা বলিয়া বিন্দুকে ভুলাইয়া বাখিতে চেষ্টা কবে। ও-সব পারে সে। সত্যমিথ্যা জড়াইয়া জমজমাট উপভোগ্য কাহিনি বচনা করিতে কুসুম অদ্বিতীয়া। অপরূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার কৌশল সে জানে চমৎকার। বলে, শহর থেকে শখ করে গাঁয়ে তো এলে ঠাকুরঝি, মরবে ভুগে ম্যালেরিয়ায়। দুবার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর এলে বাপের বাড়িকে পেন্নাম কবে কর্তার কাছে ছুটবে তখন।

গোপাল রাগাবাগি কবিল,—শশীর সঙ্গে তার কলহ হইয়া গেল। চেঁচামেচি করিয়া সে বলিতে লাগিল যে এমন কাণ্ড জীবনে সে কখনও দ্যাখে নাই। স্ত্রীকে মানুষ নিজের খুশিমতো অবস্থায় রাখিবে এই তো সংসারেব নিয়ম। মারধোর করিলে বরং কথা ছিল। কিছুই তো নন্দ করে নাই! যা সে করিযাছে বিন্দুর তাতে ববং খুশি হওয়াই উচিত ছিল। স্ত্রীকে ভিন্ন বাড়িতে হিবা-জহরত দিয়া মুড়িয়া বাখিয়া চাকর দারোয়ান রাখিয়া দিয়া কেহ যদি নিজের একটা খাপছাড়া খেযাল মিটাইতে চায়, স্ত্রীব সেটা ভাগ্যই বলিতে হইবে। স্বামীর সে অধিকার থাকিবে বইকী! মদ খায় নন্দ? সংসারে কোন বড়োলোকটা নেশা করে না শুনি? তখন বলিলেই হইত, অত কষ্টে বড়োলোক জামাই জোগাড না করিযা একটা হা-ঘরেব হাতে মেয়েকে সঁপিয়া দিত গোপাল,—টের পাইত মজাটা!

কেন ওকে তুই নিয়ে এলি শশী! তোর এত কর্তালি করা কেন? ছেলেখেলা নাকি এ সব, আঁ? রেখে আয়গে,—আজকেই চলে যা।

তা হয় না বাবা। আপনি সব জানেন না,—জানলে বুঝতেন ওখানে বিন্দু থাকতে পারে না।

এতকাল ছিল কী করে?

সে কথা ভাবিলে শশীও কী কম আশ্চর্য হইয়া যায়!

গোপাল মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, গয়নাগাঁটি জিনিসপত্র কী করে এলি?

আনিনি বাবা

কেন, আননি কেন?

আমার কী ছিল যে আনব? আনলে চোর বলে জেলে দিত।

শুনিয়া গোপাল রাগিয়া উঠে!—জেলে দিত! গোপাল দাসের মেয়েকে অত সহজে কেউ জেলে দিতে পারে না। তোরা সব কটা ছেলেমানুষ কাঁচা বুদ্ধি তোদের। জীবনে তোরা ঢের কষ্ট পাবি, এই আমি বলে বাখলাম।

গোলমাল করার ফল হইল এই, শশীর সঙ্গে গোপালের আবার কথা বন্ধ হইয়া গেল। ছেলের সঙ্গে এ রকম মনান্তর গোপালের বাৎসল্যের জগতে মন্বন্তরের সমান,—বড়ো কষ্ট হয়। দিন যায়, কলহ মেটে না। গোপাল উশখুশ করে। ছেলে যেন আকাশের দেবতা হইয়া উঠিয়াছে,—নাগাল পাওয়া কঠিন। শেষে গোপাল নিজেই একদিন মরিয়া হইয়া শশীর ঘরে যায়। শশী মোটা ডাক্তারি বইটা নামাইয়া রাখিলে সেটা সে টানিয়া লয়, পাতা উলটায়, আর ছেলের এত মোটা বই পড়িবার অমানুষি প্রতিভায় সুস্পষ্ট গর্ব বোধ করে। বলে, যতক্ষণ বাড়িতে থাকো বই পড়ে সময় কাটাও—শরীর তোমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে শশী। এত পড়ো কেন, পরীক্ষা তো নেই? আগে তো এ রকম পড়তে না দিনরাত?

ডাক্তারকে সর্বদা নতুন বিষয় জানতে হয়। -শশী বলে।

যা তুমি জানো শশী, গাঁয়ে ডাক্তারি করার পক্ষে তাই ঢের!

শহরে গিয়ে যদি বসি কখনও—

কী বিচিত্র চক্র কথোপকথনের! বিন্দুর কথা আলোচনা করিতে আসিয়া কী কথা উঠিয়া পড়িল দ্যাখো! শহর? শহরে গিয়া ডাক্তারি করার মতলব আছে নাকি শশীর? তাই এত পড়াশোনা? গোপাল বিবর্ণ হইয়া যায়। এই গ্রামে এক কুঁড়েঘরে গোপালের জন্ম হইয়াছিল, এইখানে একদিন সে ছিল পরের দুয়ারে অন্নের কাঙাল। আজ সে এখানে দালান দিয়াছে, এক বেলায় তাব দাওয়ায় পাত পড়ে ত্রিশখানা। চারিদিকে ছড়ানো টাকা, ছড়ানো জমি জায়গা। ঘরে বাহিরে এখানে তাহার আদর্শ বাঙালি জীবনের বিস্তার। এইখানে মরিতে হইবে তাহাকে। শশী এখানে থাকিবে না, অনুসরণ কবিবে না তার পদাঙ্ক? গোপাল ব্যাকুল হইয়া বলে, ও সব সর্বনেশে কথা মনেও এনো না শশী।

শশী বলে, সময় সময় মনে হয় শহরে বসলে পয়সা বেশি হত—

ছাই হত! শহরে ঢের বড়ো বড়ো ডাক্তার আছে,—তুমি সেখানে পাত্তাও পাবে না শশী। এখানে মন্দ কী হচ্ছে তোমার? তাছাড়া ডাক্তারিতে পয়সা না এলেও তোমার চলবে। জমিজমা দেখবে, সুদ গুনে নেবে। ডাক্তারিতে কিছু হয় ভালো, না হয় নাই হবে। গাঁয়ে আর ডাক্তার নেই, অচিকিচ্ছেয় মরে গাঁয়ের লোক, সেটাও তো দেখতে হবে? —বড়ো তুই স্বার্থপর শশী।

গোপাল পালায়। কী বলিতে কী বলিয়া ফেলিবে, আবার হয়তো পনেরো দিন কথা বন্ধ থাকিবে ছেলের সঙ্গে। খানিক পরে গোপাল আবার শশীর ঘরে ফিরিয়া যায়। বলে চাবিটা ফেলে গেলাম নাকি রে?

শশী বলে, চাবি? ওই যে আপনার পকেটে চাবি?

চাবির ভারে কুর্তার পকেটটা ঝুলিয়াই আছে বটে। গোপাল অপ্রতিভ হইয়া যায়। পদে পদে জব্দ করে, কী ছেলে! খানিক সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তারপর করে কী, হঠাৎ অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে শশী, গাঁয়ে তোর মন টিকছে না কেন বল তো, গাঁয়ের ছেলে তুই?

মন টিকবে না কেন?

তবে যে শহরে যাবার কথা বলছিস?

ঠিক করিনি কিছু। কথাটা মনে হয় এই মাত্র।

শশীর শান্ত ভাব দেখিয়া নিজের উত্তেজনায় আরেক দফা অপ্রতিভ হয় গোপাল। ছেলে বড়ো হইলে কী কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তার সঙ্গে মেশা। সে বন্ধু নয়, খাতক নয়, উপরওলা নয়, কী যে সম্পর্ক দাঁড়ায় বয়স্ক ছেলের সঙ্গে মানুষের ভগবান জানেন।

একদিন নন্দর একখানা পত্র আসিল—বিন্দুর নামে। লিখিয়াছে, চিঠি পাওয়ার তিন দিনেব মধ্যে ফিরিয়া গেলে এ বারের মতো ক্ষমা করিবে। শশী আগুন হইয়া বলিল, ক্ষমা? তাকে কে ক্ষমা করে ঠিক নেই,—কোন সাহসে ক্ষমার কথা লেখে? তুই যেন ভদ্রতা করে চিঠির জবাব দিয়ে বসিস না বিন্দু।

• জবাব দেব না?

শশী অবাক হইয়া বলিল, জবাব দেবার ইচ্ছা আছে না কি তোর? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলি, চিঠিব জবাব দিবি কী বকম?

বিন্দু বলিল, দেব না দাদা।—দেব কি না জিজ্ঞেস করলাম।

এও জিজ্ঞেস করতে হয়?

বিন্দু ম্লানভাবে হাসিল, মনটা বড়ো নরম হয়ে গেছে দাদা—একেবারে সাহস নেই। নিজে নিজে কিছু ঠিক কবতে পারি না—নইলে দ্যাখো না, আগে কি পালিয়ে আসতে পারতাম না আমি?

একখানা চিঠি লিখিয়া নন্দ আর সাড়াশব্দ দিল না। শীতেব দিনগুলি তাড়াতাড়ি কাটিয়া যাইতে লাগিল। কুসুমের সঙ্গে শশীর কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা কবিবাব জন্য কোনো পক্ষেই যেন তাড়া নাই। তাছাড়া শশী বড়ো ব্যস্ত। শীতকালে গ্রামে অসুখ-বিসুখ কিছু কম থাকে বটে, সে শুধু অন্য সময়েব তুলনায়। কিছুদিন আগে বাজিতপুরের হাসপাতালের ডাক্তারেব সঙ্গে শশী আলাপ করিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতায় পড়িবার সময় ডাক্তারটিব সঙ্গে মুখচেনা ছিল শশীর। তাকে সে বলিয়া আসিয়াছিল, হাসপাতালে কোনো অসাধারণ রোগী আসিলে শশীকে তিনি যেন একটা খবর দেন,—শুধু বই পড়িয়া শেখা চলে না। মাঝে মাঝে শশী বাজিতপুরে যায়। বড়ো রকমের অপারেশন দেখিবার সুযোগ থাকিলে নিজের রোগীদের কথা ভুলিয়া দু-একদিন সেখানে থাকিয়াও আসে।

কুসুম নালিশ করে না। কী যেন হইয়াছে কুসুমেব। বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে নালিশ করিতে। এমন অন্যমনস্কতা মাঝে মাঝে আসে বইকী মানুষের অভ্যস্ত কাজেও যাতে ভুল হইয়া যায়!

ফাল্গুনের গোড়ায় হঠাৎ একদিন কুমুদ আসিয়া হাজির।

কদিন থাকতে দিবি শশী?

যদ্দিন থাকবি, —শশী খুশি হয়, সত্যি থাকবি?

থাকব বলেই এলাম। ভালো লাগলে থাকব।

শশী হাসিল, ভালো লাগার মতো কীই বা আছে গাঁয়ে? ডোবা জঙ্গল আর মুখ্যু মানুষ। ভালো না লাগলেও থাকিস কুমুদ কিছুদিন। সঙ্গীর অভাবে বড়ো চিন্তাশীল হয়ে উঠেছি।

কুমুদ বলিল, সঙ্গীর অভাব? বিয়ে কর না?

শশীর হাসি দেখিয়া কুমুদ গম্ভীর হইয়া বলিল, ঠাট্টা করছি না শশী, সত্যি তোর বিয়ে করা দরকার। শান্ত হিসেবি সাধারণ সংসারী মানুষ তুই। সাধারণ মানুষের জীবন যেমন হয় তোরও তেমনি হওয়া দরকার। অন্য রকম করে বাঁচতে গেলে তুই সুখী হতে পারবি না।

শশী বলিল, তুই তো এ রকম ছিলি না কুমুদ, এ সব কী পরামর্শ দিচ্ছিস?—আমার ঘরে থাকবি না, একটা ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা করে দেব তোকে?

কুমুদ বলিল, ভিন্ন ঘর হলে মন্দ হয় না শশী—দু-চার ঘণ্টা একা না থাকতে পারলে কি চলে?

কবিতা লিখিস, অ্যাঁ?

না। ঠিকমতো বাঁচতেই জানি না, কবিতা লিখব! লিখতে লজ্জা করে।

কুমুদ লজ্জায় কবিতা লেখে না এটা আশ্চর্য মনে হয়। জীবনে সে কী চায় আজও কি কুমুদ তাহা বুঝিতে পারে নাই? জীবনকে লইয়া আজও সে পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছে? কোন সাগরে মুক্তা আহরণ করিবে তারই অন্বেষণে সাত সাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে? এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নাই যে শান্ত আর বন্য কোনো মানুষই জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া সেই চিরন্তন স্থিতির খোঁজ পায় না, যা অপরিবর্তনীয় হইলেও চলে, যেখানে অভিনবত্ব কাম্য নয় মানুষেব। শশীর মতো জীবনকে কুমুদ আজ মন্থর করিতে চায় ; আর শশী প্রার্থনা করে কুমুদের অতীত দিনের উত্তপ্ত উচ্ছল জীবনের আবর্ত! সুখ যে তাতে বিশেষ হইবে না তা জানে শশী। তবু মন কেমন করে।

কুমুদ যে কেন গাওদিয়ায় আসিয়াছে শশী ঠিক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কত দিন থাকিবে তাই বা কে জানে। জিজ্ঞাসা করিলে কুমুদ সেই একই জবাব দেয় , যত দিন থাকতে দিবি। এ কথার কোনো মানে হয় না। সে যদি ছমাস একবছরও এখানে থাকিয়া যায়, শশী কী তাহাকে বলিবে যে এবার তুমি বিদেয় হও?

কুমুদের মধ্যে একটা নূতন পরিবর্তন এবার শশীর চোখে ধরা পড়িতেছিল। সেবার তাহার মুখে চোখে কথায় ব্যবহারে যাত্রাব দলে অধঃপতনের পরিচয় ছিল স্পষ্ট,—এবার সে যেন বহুদিন আগেকাব মতো কবি ও ভাবুক হইয়া উঠিয়াছে। কেবল পুরানো দিনের মতো এবার আর তাহার বিদ্রোহী উদ্ধত ভাব নাই। কী যেন সে ভাবে, কী এক রসালো ভাবনা, চোখের দৃষ্টি তাহাব হইয়া আসে উৎসুক এবং একান্ত বেমানানভাবে সেই সঙ্গে মুখে ফুটিয়া থাকে গভীর সন্তোষ। তা ছাড়া, গাওদিযার মাঠে ঘাটে ঘুরিয়া বেড়ানোর মধ্যে কী রস সে আবিষ্কার করিয়াছে সেই জানে,—সময় নাই, অসময় নাই, কোথায় যেন চলিয়া যায়।

একদিন শশী জিজ্ঞাসা করিল, বিনোদিনী অপেরার কী হল রে কুমুদ?

কুমুদ বলিল, ও দলটা ছেড়ে দিয়েছি। বৈশাখ মাসে সরস্বতী অপেরা বলে আরেকটা দলে ঢুকব,—কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে আছে। এরা মাইনে অনেক বেশি দেবে। এখনই যোগ দেবার জন্য ঝুলোঝুলি করছিল, কিন্তু পার্ট বলে বলে কেমন বিরক্তি জন্মে গেছে ভাই, তাই ভাবলাম কটা মাস একটু বিশ্রাম করেনি।

কে জানে এ কথা সত্য কী মিথ্যা। শশীর মনে একটা সন্দেহ উঁকি দিয়া যায়। সে ভাবে যে হয়তো বিনোদিনী অপেরা হইতে কুমুদকে বিদায় করিয়া দিয়াছে, কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া সে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে এখানে—সরস্বতী অপেরার কথাটাও বানানো : টাকাকড়ি কিছুই হয়তো কুমুদের নাই।

একদিন শশী বলিল আমায় গোটা পনেরো টাকা দিবি কুমুদ? হাতে নগদ টাকা নেই, একজনকে দিতে হবে।

কুমুদ তাহার স্যুটকেস খুলিল, এ কোণ ও কোণ হাতড়াইয়া বলিল, আমার মনিব্যাগ?

শশী ভাবিল, হুঁঃ এবার মনিব্যাগ তোমার চুরি যাবে! ছি কুমুদ, আমার সঙ্গে শেষে তুই ছলনা আরম্ভ করলি!

কিন্তু না, ব্যাগ আছে। জামা কাপড় নামাইয়া খুঁজিতেই ব্যাগটা বাহির হইয়া পড়িল। কুমুদ বলিল, তোর কাছে রাখতে দেব ভেবে একেবারে ভুলে গিয়েছি ভাই, চুরি গেলেই হয়েছিল আর কী! যা দরকার নিয়ে রেখে দে ব্যাগটা তোর কাছে।

ব্যাগটা হাতে কবিতে শশী লজ্জা বোধ করিল।

কত আছে?

কে জানে কত আছে। গুনে দ্যাখ।

তারপর একদিন পুকুর, ডোবা, জঙ্গলভরা গাওদিয়া গ্রামে কুমুদের আত্ম-নির্বাসনের কারণটা জানা গেল।

শশী বিবর্ণ হইয়া বলিল, এ সব তুই কী বলছিস কুমুদ, মতিকে বিয়ে করবি? ওইটুকু মেয়ে!

কুমুদ বলিল, বিশেষ ছোটো নয়। তাছাড়া, ছোটোই ভালো। বিয়েই যদি করব, ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করব কোন দুঃখে?

শশীর রাগ হইতেছিল। কেমন একটা জ্বালাও সে বোধ করিতেছিল, বলিল, তুই তবে এই জন্য এসেছিলি কুমুদ বন্ধুর বাড়ি, বিশ্রামের ছল করে?

কুমুদ বিস্মিত হইযা বলিল, বিচলিত হয়ে পড়লি যে শশী তুই? খুব কি একটা অন্যায় কাজ করতে বসেছি আমি? ছন্নছাডাব মতো ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম,—বিয়ে করে সংসারী হব এতে তোর খুশি হওয়াই তো উচিত।

বাংলাদেশে তুই আর মেয়ে পেলি না?

কেন, মতি কী দোষ করেছে?

ওইটুকু একটা মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে!

কুমুদ একটু হাসিল, তুই যে কার দিকে টানছিস বুঝে উঠতে পারছি না শশী। মতি মুখ্যু গেঁয়ো মেযে বটে, আমিও তো যাত্রার দলের সঙ!

কুমুদেব হাসি দেখিয়া শশী আরও বাগিয়া গেল। এ জগতে কিছুই যেন কুমুদের কাছে গুরুতব নয়, যখন যা খেয়াল জাগে খেলার ছলেই যেন তা করিয়া ফেলা যায়, জীবনে যেন মানুষের নিয়ম নাই, বাঁচিবার রীতি নাই। মনের রাগ চাপিয়া বিচারকের রায় দেওয়ার ভঙ্গিতে শশী বলিল, এ সব দুর্বুদ্ধি ছেড়ে দে কুমুদ, যাত্রাদলের সঙ সেজে থাকতে তোকে কে বলেছে? সরস্বতী অপেরায় ঢুকে আর কাজ নেই, ফিরে যা তোর কাকার কাছে। কাকার তোর অত বড়ো মাইকাব কারবার, একটা ভালোরকম কাজ তোকে তিনি দিতে পারবেন না? তখন সমান ঘরের কত ভালো ভালো মেয়ে পাবি, তোর উপযুক্ত সঙ্গিনী হতে পারবে। খেয়ালের বশে একটা গেঁযো মেয়েকে বিয়ে করে কেন জ্বলে মরবি আজীবন?

কুমুদ বলিল, কাকার দুটো গ্রেট ডেন কুকুর আছে জানিস?

শশী অবাক হইয়া বলিল, না।

কাকার বাড়ির গেটের ভেতরে ঢুকলে কুকুর দুটো তিনি লেলিয়ে দেবেন।

কথা হইতেছিল শশীর ঘরে,—সন্ধ্যার পর। ঘরে সাত টাকা দামেব একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। এত আলোতে পরস্পরেব মুখের দিকে চাহিতে তাদের যেন কষ্ট হইতে লাগিল। রাগ শশীর মনে বেশিক্ষণ টেকে না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, মতিকে তোর ভালো লাগল কুমুদ! বিশ্বাস হতে চায় না।

প্রথমে আমারও হয়নি। সেবার যখন চলে গেলাম, কে জানত ওর জন্যে আবার ফিরে আসতে হবে!

তারপর কুমুদ তালপুকুরের পাড়ে অবোধ গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে তার ভালোবাসার জন্ম-ইতিহাস ধীরে ধীরে শশীকে শুনাইয়া দিল। অতটুকু মেয়ে মতি, তার যে এমন একটি মন থাকিতে পারে

যাহাতে অতল স্নেহের সঞ্চার সম্ভব, তা কি কুমুদ জানিত? সরল মনের স্নেহ ছাড়া আর সবই যে ফাঁকি মানুষের জীবনে, মতি কুমুদকে এ শিক্ষা দিয়াছে। সত্য কথা বলতে কী শশী, এ অপূর্ব অভিজ্ঞতা কুমুদ তো কোনোদিন কল্পনাও করে নাই। শুনিতে শুনিতে শশীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। মতি? ওই একরত্তি নোংরা মেয়েটা গোপনে গোপনে এত ভালোবাসিয়াছে কুমুদকে? শশীর মনে হয় সব কুমুদের বানানো,—দিবা-স্বপ্ন, কল্পনা! মুখে মুখে গীতগোবিন্দের মতো যে মহাকাব্য কুমুদ রচনা করিয়া চলিয়াছে, মতি কি কখনও তার নায়িকা হইতে পারে?

সেদিন অনেক রাত্রি অবধি শশী ঘুমাইতে পারিল না। কুমুদের সঙ্গে মতির বিবাহ? কেমন করিয়া ইহা ঘটিতে দেওয়া যায়! চিরদিন কুমুদ ছন্নছাড়া যাযাবরের জীবনযাপন করিয়াছে, সাময়িক একটা নীড়প্রেম তার মধ্যে দেখা দিলেও এটা যে স্থায়ী হইবে বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া মতির মূর্খতা এবং গ্রাম্যতা অসহ্য হইয়া উঠিতে কুমুদের বোধ হয় ছমাস সময়ও লাগিবে না। কী উপায় হইবে মতির তখন? কুমুদ কষ্ট দিলে, ত্যাগ করিলে, নিরীহ বোকা মেয়েটার জীবন যে দুঃখে ভরিয়া উঠিবে কে তার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? একদা-প্রিয় বস্তুগুলি জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলাই যে স্বভাব কুমুদের।

পরদিন কুমুদকে সে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিল। বলিল, মতিকে তোর বেশিদিন ভালো লাগবে কেন কুমুদ?

মতিকে আমার চিরদিন ভালো লাগবে।

কী করে লাগবে তাই ভাবছি।

কুমুদ বলিল, শশী, তুই কি ভাবিস বিয়ের পরেও মতি এমনই থাকবে? ওকে আমি মনের মতো গড়ে তুলব না? খনি থেকে তোলা হিরের মতো ওকে আমি গ্রহণ করছি,—নিজে কাটব, ঘষব, মাজব, উজ্জ্বল করে তুলব। ওর মনের কোনো গড়ন নেই, তাই ওকে বিয়ে করতে আমার এত আগ্রহ। ওর মনকে আমি গড়ে নেব। আমার সঙ্গিনী হতে পারে, এমন মেয়ে জগতে নেই ভাই—সঙ্গিনী আমার সৃষ্টি করে নিতে হবে আমাকেই।

শশীর অর্ধেক মন সংসারী, হিসেবি, সতর্ক—এ সব বড়ো বড়ো কথা শুনিলে তার বিরক্তি জন্মে। মনের মতো গড়িয়া তুলিতে গেলে মানুষ যে মনের মতো হয় না, এটুকু জ্ঞান কি কুমুদের নাই? পরের চেষ্টায় মনের যে বিকাশ তাহা অস্বাভাবিক, অপ্রীতিকর। মতিকে ছাঁচে ঢালিয়া একটা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত জীবে পরিণত করিবার ধৈর্য কুমুদের থাকিবে কিনা সন্দেহ,—থাকিলেও, সেই পরিবর্তিত মতিকে কি তাহার ভালো লাগিবে? কী ভাবেই বা মতিকে সে গড়িয়া তুলিবে? লেখাপড়া গান-বাজনা ছবি আঁকা শুধু এই সব শিক্ষা তাকে দেওয়া সম্ভব—তার অতিরিক্ত আর কী করিতে পারিবে কুমুদ? মতির নিজস্ব সত্তাটুকু পর্যন্ত কুমুদ যদি তাকে দান করে, —স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে কী মূল্য থাকিবে মতির? কুমুদ এত জানে, এটুকু জানে না যে প্রিয়াকে মানুষ গড়িয়া লইতে পারে না! মেয়ের মতো যাকে শিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করা যায় তাকে বসানো চলে না প্রিয়ার আসনে?

ভাবিয়া শশী কিছু ঠিক করিতে পারে না। এক সময় সে খেয়াল করিয়া অবাক হয় যে মতির সঙ্গে কুমুদের ভালোবাসার খেলাটা তাহার বিশেষ খাপছাড়া মনে হইতেছে না,—ওদের বিবাহের কথাটাই তার কাছে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডের মতো ঠেকিতেছে। মতিকে নষ্ট করিয়া কুমুদ যদি চলিয়া যাইত, দুঃখের শশীর সীমা থাকিত না, তবু যেন মনে হইত অস্বাভাবিক কিছু ঘটে নাই, দুজনের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য তাহাদের তাহাতে দুদিনের নিন্দনীয় ঘনিষ্ঠতা ছাড়া আর কী সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে হওয়া সম্ভব? ওদের বিবাহ অবাস্তব, অর্থহীন।

এ চিন্তায় শশী লজ্জা পায়। মতির জন্য তার মনে বাৎসল্য মেশানো এক প্রকার আশ্চর্য মমতা আছে, মতিকে কুমুদের বউ হওয়ার অনুপযুক্ত মনে করিতে তাহার কষ্ট হয়। সেদিন বিকালে মতির সঙ্গে শশীর দেখা হইল। মতি একডালা কুমড়া ফুল লইয়া তাদেরই বাড়ি আসিয়াছিল। শশীকে যে কথাটা জানানো হইয়াছে, কুমুদ হয়তো মতিকে এ সংবাদ দিয়াছিল। শশীকে দেখিয়া মুখখানা তাহার রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর একটু হাসিল মতি, —হঠাৎ লজ্জা পাইলে এ বয়সে ঠোঁটে একটু হাসির ঝিলিক দিয়া যায়। মতির মুখখানা আজ শশীর অসাধারণ সুন্দর মনে হইল। সে ভাবিল, হয়তো কুমুদ ভুল করে নাই। হয়তো সত্যই একদিন সে মতিকে রূপে গুণে অতুলনীয়া করিয়া তুলিবে।

মতি চলিয়া গেলে কুমুদের এই শক্তিতে কিন্তু শশীর আর বিশ্বাস রহিল না। খনিগর্ভের হিরার মতোই বটে মতি,—তাকে একদিন অনুপমা ও জ্যোতির্ময়ী করিয়া তোলাও সম্ভব, কিন্তু কুমুদ তাহা পারিবে না। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিবার প্রতিভা আছে কুমুদের,—স্বপ্নকে সফল করিবার তপস্যা নাই। মতির মুখের পেলব ত্বকে দুদিনে সে দুঃখের রেখা আনিয়া দিবে।

মনটা শশীর খারাপ হইয়া থাকে। কুমুদের প্রতি সে বিতৃষ্ণা বোধ করে সীমাহীন। এই কি বন্ধুর কাজ,—বন্ধুর বাড়ি আসিয়া তাহার স্নেহের পাত্রীর সঙ্গে গোপনে ভালোবাসার খেলা করা? উপায় থাকিলে কুমুদকে সে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু কুমুদের কথা শুনিয়া আর তো মনে হয় না মতির কোনোদিকে আশা ভরসা আছে। কুমুদের সম্বন্ধে মতির উৎসুক প্রশ্ন, কুমুদকে দেখিবার আশায় মতির কলিকাতা যাওয়ার আগ্রহ, সব এখন শশীর মনে পড়িতে থাকে। প্রেম? কুমুদের জন্য এতখানি প্রেম জাগিয়াছে মতির বুকে? তা ছাড়া, হয়তো মতির বুকভরা প্রেমই শুধু নয়,—কুমুদকে বিশ্বাস নাই, জীবনটা কুমুদের আগাগোড়া অসংগতিতে পরিপূর্ণ।

কী করিবে শশী ভাবিয়া পায় না। এ ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চরম। সে যদি বলে হোক, তবেই এ বিবাহ হইবে,—পরানের কাছে কথাও পাড়িতে হইবে তাহাকেই। শশীর ইচ্ছা হয়, যাই ঘটিয়া থাক— কুমুদকে সে এই দণ্ডে দূর করিয়া দেয়। চিরদিনের জন্য বন্ধুত্বের অবসান হোক,—কুমুদ চলিয়া যাক তাহার যাযাবর জীবনযাপনে,—গাঁয়ের মেয়ে মতি থাক গাঁয়ে। চিরকাল মতি দুঃখ পাইবে জানিয়াও এ বিবাহ সে ঘটিতে দিবে কেমন করিয়া?

সন্ধ্যার পর কুসুমের সঙ্গে শশী এ বিষয়ে পরামর্শ করার সুযোগ পাইল। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছিল। ঘরের চালা যে জ্যোৎস্নার ছায়া ফেলিয়াছিল সেই ছায়ায় দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিবার পর শশী বলিল, একটা উপায় আছে বউ।

কী উপায়? —কুসুম জিজ্ঞাসা করিল।

আমি মতিকে বিয়ে করতে পারি।

এই উপায়! কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

শশী কিন্তু হাসিল না, বলিল, হাসির কথা নয় বউ। কুমুদের হাতে ওকে সঁপে দিতে সত্যি আমার ভাবনা হচ্ছে।

কুসুম গম্ভীর হইয়া বলিল, সে আপনি ওকে ছোটো বোনটির মতো ভালোবাসেন বলে। মেয়ে বোন এদের বিয়ে দেবার সময় মানুষের এরকম ভাবনা হয়।

শশী তবু বলিল, আমি যদি মতিকে বিয়ে করি—

যদি করেন! যদি!—তীব্র চাপা গলায় এই কথা বলিয়া কুসুম পরক্ষণেই আবার হাসিয়া ফেলিল, সংসারে অত যদি চলে না ছোটোবাবু। আপনি করবেন মতিকে বিয়ে! জীবনটা আপনার একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না?

তখন শশী বলিল, কুমুদ অবশ্য একেবারে অমানুষ নয়, রোজগার-পাতিও মন্দ করে না—

কুসুম বলিল, মতির ভাগ্যি ওকে কুমুদবাবুর পছন্দ হয়েছে! পড়ত গিয়ে কোন চাষার ঘরে,—দুবেলা চেলা কাঠের মার খেয়ে প্রাণটা ছুঁড়ির বেরিয়ে যেত। অনেক পুণ্যিতে এমন বর জুটছে ওর।

হোক তবে, তাই হোক। মতি কী বলে বউ?

কী বলবে? দিন গুনছে।

দিন গুনিতেছে মতি? গুনুক!

কুসুমের উপর রাগে শশীর মন জ্বালা করিতে থাকে। সেদিন প্রত্যূষে তালবনে কুসুমের মধ্যে যে সরলা বালিকাকে আবিষ্কার করিয়া সে পুলকিত হইয়াছিল, আজ সে কোথায় গেল? কী পাকা বুদ্ধি কুসুমের! কী নিখুঁত কৌশলে মতির বিবাহ সম্বন্ধে সে তার মনের মোড় ঘুরাইয়া দিল! দুদিন ভাবিয়া সে যা স্থির করিতে পারে নাই, আধঘণ্টার মধ্যে দুটা অচল যুক্তি দেখাইয়া কুসুম কত সহজে সব সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল। কুসুমের কাছে দাঁড়াইয়া মতির ভালোমন্দ সম্বন্ধে এমন সে নির্বিকার হইয়া উঠিল কীসে যে অনায়াসে বলিয়া বসিল, হোক তবে তাই হোক? তা ছাড়া, এ সব আজ কী বলিতেছে কুসুম?

এমনই চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।

গভীর দুঃখের সঙ্গে শশীর মনে হয়, এ কথা কুসুমের বানানো। মতিকে পাছে সে আবার নিজে বিবাহ করিয়া কুমুদের হাত হইতে বাঁচাইতে চায়, তাই কুসুম এই মন রাখা কথা বলিয়াছে। বলুক। সে তো কুমুদ নয়, তার জীবনে সবই অভিনয়। তবু, চাঁদের আলোয় চারিদিক আজ কেমন স্বপ্ন দেখিতেছে দ্যাখো। এ যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না কুসুমের কুটিলতার বিষে এমনি সময় এত কষ্ট পাওয়া তাহার ভাগ্যে ছিল। কিন্তু কেন সে দাঁড়াইয়া আছে, কেন সে চলিয়া যাইতে পারে না? কে জানে, হয়তো জীবনের বিতৃষ্ণা ও আত্মগ্লানি ভরা মুহূর্তগুলির আকর্ষণ তার কাছেই এত তীব্র? কুমুদ হয়তো ছুটিয়া পলাইত, বলিয়া যাইত, তুমি গোল্লায় যাও কুসুম? অথবা হয়তো নিজের আনন্দ দিয়া, এই জ্যোৎস্নার কবিতাটুকু ছাঁকিয়া লইয়া, এমনি স্থূল মুহূর্তগুলিকেও অপূর্ব করিয়া তুলিত?

কুসুম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু?

শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?

সাত

বিবাহের পর মতিকে লইয়া কুমুদ চলিয়া গিয়াছে।

কোথায় হনিমুনে! গাওদিয়ার গেঁয়ো মেয়ে মতি, তাকে লইয়া কুমুদ চলিল হনিমুনে, কিছু টাকা দে শশী।

পরানের কাছে এ ব্যাপারটা বড়ো দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছে। কনে-বউকে সঙ্গে করিয়া অনির্দিষ্ট ভ্রমণে বাহির হওয়া? এ কোন দেশি রীতি! মতিকে লইয়া গিয়া উঠিতে পারে এমন আত্মীয়স্বজন কুমুদের কেহ নাই পরান তাহা জানিত। সে আশা করিয়াছিল কুমুদ এখন সস্ত্রীক কিছুদিন শশীর বাড়িতেই বাস করিবে। তারপর মতির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া সংসার পাতিয়া বসিবে শহরে অথবা গ্রামে। রাতারাতি বোনটাকে লইয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল কুমুদ?

এ বিবাহে পরানের আনন্দ হয় নাই, শুধু শশীর মুখ চাহিয়া সে সম্মতি দিয়াছিল। চিরদিন সব ব্যাপারে শশীর উপরেই সে নির্ভর করিয়া আসিয়াছে। হোক সে গরিব গ্রাম্য গৃহস্থ, মতির সে

বন্ধুর সঙ্গে মজেছে। পড়ত গিয়ে কোন চাষার ঘরে, দুবেলা ঢেলা বাঁশের মার খেত। অনেক পুণ্যিতে ওর কপালে এমন বর জুটেছে।'

তখন শশী বলিল 'থাক তবে। তাই থাক। মতি কি বলে, বৌ?'

'কি বলবে? দিন গুনছে।'

মতি দিন গনিতেছে! গনুক।

এবং আকাশে আজ কৃষ্ণা প্রতিপদের চাঁদ আছে। কে বলিবে আজও পূর্ণিমা নয়। শিউলী গাছের তলে জ্যোৎস্নার ছায়া। মতির কথা শেষ হওয়া মাত্র কুসুম বলিয়াছে 'এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছা হয়, ছোটবাবু।' এই কথা বলিয়াছে কুসুম। নিষ্পলকের মুগ্ধ ধোঁয়াচ লাগানো ঠোঁটের নিঃসৃত এই কথা। কিন্তু এ কথা কুসুমের বানানো। তাকে খুশী করার জন্য বলিয়াছে। বলুক। সে তো কুমুদ নয়, তার জীবনে সবই অভিনয়! তার মাংসল শরীর হাতে মাটির সুধাপাত্রে তবু দেশী মদ।

তবু, সমস্ত ব্যাপারটা বড় নাটের সময়েই চাঁদের আলোয় কেমন স্বপ্ন দেখাইতেছে, দ্যাখো। এ যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। জীবনের বিতৃষ্ণা ও আত্মগ্লানি ভরা মুহূর্তগুলির আকর্ষণ বোধ হয় কেবল শশীর কাছেই এত তীব্র? কুমুদ বোধ হয় বুঝিয়া পাইত? কে বলিবে। হয়ত কুমুদ আপনার ছন্দ আপনার আনন্দ দিয়া, এই জ্যোৎস্নার কবিতাটুকু ছাঁকিয়া লইয়া, এমনি স্থূল মুহূর্তগুলিকেও মধুর করিয়া তুলিত। কুসুমের ব্যাকুল গাঢ় স্পর্শে কুমুদের হয়ত নিজেকে অসহায় মনে হইত না, বঞ্চিত মনে হইত না। কুসুমের উষ্ণ নিশ্বাসে হয়ত কুমুদের প্রাণ জুড়াইয়া যাইত।

কুসুম বলে 'আপনি ছুঁলেই আমার শরীর এমন করে কেন ছোটবাবু?'

শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?

পুতুলনাচের ইতিকথার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষাংশের পাণ্ডুলিপি

বড়ো ভাই, কুমুদের গুরুজন,—কিন্তু আগাগোড়া কী উদ্ধত অপমানজনক ব্যবহার কুমুদ তার সঙ্গে করিয়া গিয়াছে! শশীও এটা লক্ষ করিয়াছিল। রাগ তাহার কম হয় নাই। মতিকে যদি কুমুদ বিবাহ করিতে পারে, মতির দাদাকে সম্মান করিতে পারিবে না? কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে নাই কুমুদকে। শুধু তার সামনে পরানের সঙ্গে করিয়াছিল প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার,—কুমুদ যাতে দেখিয়া শিখিতে পারে। শশীর এ চেষ্টার বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। মতির আত্মীয়-পরিজনের প্রতি অসীম অবজ্ঞা দেখাইয়া মতিকে কুমুদ গ্রহণ করিয়াছিল।

মাঠে পরানের খেজুর রস জ্বাল হইতেছে। দুপুরে ছাড়া শশীর সময় হয় না বলিয়া পরান দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়া কাজের ক্ষতি করিয়া শশীর কাছে বসিয়া থাকে। চওড়া সবল কাঁধ দুটি যেন তাহার শ্রান্তিতে ঢালু হইয়া আসে। বলে, পত্র দেয় না কেন ছোটোবাবু?

শশী অপরাধীর মতো বলে, কী জান পরান, চিঠিপত্র লেখা কুমুদের অভ্যাস নেই। কলেজে পড়বার সময় ওর বাবা হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে লিখে ওর খবর নিতেন।

তাই বলে একবারটি জানাবে না কোথায় গেল, কোথায় উঠল, কী বিত্তান্ত? মা ইদিকে কাঁদাকাটা জুড়েছে।

কুমুদকে মনে মনে অভিশাপ দিয়া শশী বলে, আসবে পরান, পত্র আসবে। খবর না দিয়া কি পারে? আজ হোক কাল হোক খবর একটা দেবেই।

পরান কেমন এক প্রকার স্তিমিত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিয়া থাকে। নীরবে সে যেন কীসের নালিশ জানায়, মূক প্রাণীর মতো। শশীর অস্বস্তির সীমা থাকে না। হারু ঘোষের পরিবারের ভালোমন্দের দায়িত্ব শশীকে কেহ দেয় নাই, তবু চিরদিন ওদের মঙ্গল করিতে চাহিয়াছে বলিয়া আপনা হইতে দায়িত্ব যেন তাহার জন্মিয়াছে। কিন্তু কী মঙ্গল সে করিতে পারিয়াছে ওদের? তার দোষ নাই, তবু তারই জন্য কুসুম যেন কেমন হইয়া গেল। একটা খাপছাড়া বিপজ্জনক বিবাহ হইল মতির। হয়তো পরান আজ এ সব হিসেব করিয়া দেখিতেছে হয়তো তাদের অসমান বন্ধুত্বের ফলাফলে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে পরান,—ভীত হইয়া ভাবিতেছে ভালো করিতে চাহিয়া আরও না জানি কত মন্দ শশী তাদের করিবে!

শশী জানে, মুখ ফুটিয়া পরান কোনো বিষয়ে তাহাকে দোষী করিবে না,—শুধু বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে দুর্বোধ্য-রহস্য-দ্রষ্টা শিশুর মতো তার দিকে চাহিয়া থাকিবে। দীর্ঘদেহ নির্ভরশীল সরল লোকটির জন্য শশীর মন মমতায় ভরিয়া যায়। ভাবে যেমন করিয়াই হোক মতিকে সুখী করিতে কুমুদকে সে বাধ্য করিবে। মতি বদলাক, মতিকে কুমুদ যেমন খুশি গড়িয়া তুলুক,—তার মুখে চোখে উপচানো সুখের সঙ্গে পরানের পরিচয় ঘটা চাই।

শুধু মতির জন্য নয়, নানা দিকে শশীর চিন্তা বাড়িয়াছে। তার মধ্যে বিন্দুর সম্বন্ধে চিন্তাটা গুরুতর। দিন দিন বিন্দু যেন কেমন হইয়া যাইতেছে, ভুলিয়া থাকিতে পারিবে বলিয়া প্রকাণ্ড সংসারটা চালানোর ভার শশী মাসি-পিসির কবল হইতে ছিনাইয়া বিন্দুর হাতে তুলিয়া দিয়াছিল। বিন্দু জীবনে কখনও সংসার পরিচালনা করে নাই। সে কেন এ ভার বহন করিতে পারিবে? তাছাড়া বিন্দুর ভালোও লাগে নাই। সব ভার সে আবার একে একে মাসি-পিসিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। কাজ করিতে বিন্দুর আলস্য বোধ হয়। মানুষের সঙ্গ তাহার ভালো লাগে না। কথাবার্তা কারও সঙ্গেই সে বেশি বলে না, নিজের মনে চুপচাপ ঘরের কোণে বসিয়া থাকে। বসিয়া বসিয়া ঝিমায়। কত কাল অনবরত রাত জাগিয়া জাগিয়া সে যেন নিদ্রাতুরা হইয়া আছে এমনই ভাবে সর্বদা হাই তোলে অথচ ঘুমায় সে খুব কম। কিছু সে খাইতে চায় না, দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। আধমরা মানুষের মতো শিথিল নিস্তেজ ভঙ্গিতে সে দীর্ঘ দিবারাত্রি যাপন করে।

শশী ডাক্তার মানুষ, বিন্দুকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া সে জিভ দ্যাখে, হার্ট পরীক্ষা করে, শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে জেরা করে। তারপর সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, কিছু বুঝতে পারলাম না বাপু। গাঁয়ের ডাক্তার, পেটে তো বিদ্যে নেই তেমন! একটা ওষুধ দিচ্ছি কদিন খা, তারপর আবার পরীক্ষা করে দেখব।

বিন্দু বলে, উঁহু ওষুধ আমি খাব না!

শশী বলে, খাবি। মুখ দিয়ে না খাস, গা ফুঁড়ে দেব। বাপের বাড়ি এসে তুই যদি মরে যাস বিন্দু আমি থাকতে, আমার তাতে কী অপমান হবে বল দিকি?

বিন্দু কাঁদিয়া ফ্যালে। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলে, কী করব দাদা, মনে বল পাই না, দিনরাত হুহু করে জ্বলে, মনের মধ্যে।

শশী বলে, কাঁদিস না। আমার ওষুধ খেলেই মন ভালো হয়ে যাবে! বিন্দুর রোগ-নির্ণয় করা শশীর অসাধ্য মনে হয়। মনের মধ্যে দিন রাত হুহু করিয়া জ্বলে? কার জন্য জ্বলে, কেন? জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গেল বলিয়া মানুষ কি শোকে এমন নির্জীব মৃতপ্রায় হইয়া যায়। নন্দর প্রতি তীব্র বিদ্বেষই তো বিন্দুকে দুদিনে সুস্থ ও সবল করিয়া তোলার পক্ষে যথেষ্ট। বিদ্বেষ যদি নাও হয়, আকাশ-ছোঁয়া অভিমান বিন্দুকে নব-জীবন দিতেছে না কেন? নন্দ ক্ষমা করিবে এই আশায় অতগুলি বছর বিন্দু যে অবস্থায় কাটাইয়া আসিয়াছে তাহাতে আজ যদি নন্দর জন্যই বিন্দুর মন হাহাকার করে শশী তাহাতে বিস্মিত হইবে না। সংসারে এ রকম অদ্ভুত মেয়ে দু-চারটা থাকে। কিন্তু নন্দর জন্য মন কেমন করিলে বিন্দুর তো উচিত অস্থির চঞ্চল হইয়া থাকা, কাজ ও অকাজের ভানে ছটফট করা। এমন সে অলস ও অবসন্ন হইয়া আসিবে কেন,—তৈলহীন প্রদীপের মতো কেন সে নিভিয়া যাইতে থাকিবে?

একদিন বিন্দু বলিল, দাদা আলমারির চাবি দাও। বই নেব।

শশী বলিল, বাংলা বই তো বেশি নেই আলমারিতে। বই যদি পড়িস তো আনিয়ে দেব শহর থেকে।

আলমারিতে যা আছে তাই তো এখন পড়ি, শহর থেকে যখন আনিয়ে দেবে দিয়ো।

শশী চাবির গোছাটা তাহার হাতে দিল। আলমারি খুলিয়া একখানা বই বাহির করিয়া আবার বিন্দু আলমারি বন্ধ করিল বটে, চাবি ফেরত দিল না। বলিল, চাবি আমার কাছে থাক। তুমি তো বেড়াও রোগী দেখে, আরেকটা বই বার করতে হলে সারাদিন হয়তো তোমার দেখাই পাব না।

শশী বলিল, গোছাসুদ্ধ রেখে কী করবি? বইয়ের আলমারির চাবিটা খুলে নে।

বিন্দু বলিল, থাক না গোছাসুদ্ধই—ইচ্ছে হলে তোমার বাক্সো-প্যাঁটরা ঘেঁটেও তো সময় কাটাতে পারব দুদণ্ড? বাড়ি ছেড়ে কোথাও তো যাব না আমি, চাবির দরকার হলে আমায় ডেকো।

এমন সহজভাবে সে কথাগুলি বলিল যে শশীর মনে কোনো সন্দেহ আসিল না। হয়তো অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াও শশীর মনে পড়িল না ওষুধের আলমারিতে চার-পাঁচটা শিশির গায়ে লাল অক্ষরে বিষ লেখা আছে। বিন্দুকে সে যে কত দিন উৎসুক লোভাতুর দৃষ্টিতে ওষুধের আলমারির দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে খেয়াল করিলে তাও হয়তো শশীর মনে পড়িত।

সেদিন বিকালে মাইল পাঁচেক দূরে একটা গ্রামে শশী রোগী দেখিতে গিয়াছিল। গ্রামে ফিরিতে রাত প্রায় নটা হইয়া গেল। বাড়ির সামনে পৌঁছিয়াই অন্দরে একটা গোলমাল শশীর কানে আসিল। বাহিরের ঘরগুলি অন্ধকার, জনপ্রাণী নাই। কেবল সিন্ধু একা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কাঁদিতেছে। শশী ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে রে সিন্ধু?

সিন্ধু কাঁদিতে বলিল, মেজদি মরে যাচ্ছে দাদা।

ভিতরে যাইতে শশীর পা উঠিতেছিল না। বিন্দু মরিয়া যাইতেছে? কেন মরিয়া যাইতেছে? সিন্ধু গুছাইয়া তাকে কিছু বলিতে পারিল না। তবু ব্যাপারটা অনুমান করিতে শশীর দেরি হইল না। সন্ধ্যার সময় কী যেন বিন্দু খাইয়াছিল, তাই এখন মরিয়া যাইতেছে। শশীর বুকের ভিতরটা হিম হইয়া গেল। ডাক্তার মানুষ সে, এ রকম খবর পাইয়া জড়ভরতের মতো এখানে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়, এ সব শশী বুঝিতে পারিতেছিল, তবু খানিকক্ষণ সে নড়িতে পারিল না। বিন্দু বিষ খাইয়াছে? মরিতে চায় বিন্দু? পলকের জন্য শশীর যেন মনে হয় বিন্দুর এ ইচ্ছা সফল হইতে দিলে মন্দ হয় না। আলমারিতে কী বিষ ছিল শশী জানে, সন্ধ্যার সময় বিন্দু যদি তাহা খাইয়া থাকে ওকে সে বাঁচাইতে পারিবে। কিন্তু কী হইবে বাঁচাইয়া? বিন্দু ছেলেমানুষ নয়, জীবন সম্বন্ধে দুষ্প্রাপ্য অভিজ্ঞতা তাহার, ভাবিয়া চিন্তিয়া দুঃখের হাত এড়াইবার চরম পন্থাই সে যদি অবলম্বন করা ঠিক করিয়া থাকে, বাধা দেওয়া কি উচিত হইবে?

কপালের ঘাম মুছিয়া, বাহিরের বিস্তৃত অঙ্গন পার হইয়া কুন্দর ঘরের পাশ দিয়া শশী অন্দরের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু উঠানেই পড়িয়া আছে, নিজের বমির মধ্যে, বিস্রস্ত বসনে। বাড়ির সকলে এবং পাড়ার অনেকে চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শশীকে দেখিয়া সকলে কলরব করিয়া উঠিল। মুখরা কুন্দ সকলের কণ্ঠ ছাপাইয়া বলিল, ও শশীদাদা, কী কাণ্ড করছে বিন্দুদিদি দেখুন।

মদের তীব্র গন্ধ শশীর নাকে লাগিতেছিল, সে বিহ্বলের মতো জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে রে কুন্দ?

কুন্দ বলিল, বিকেল থেকে যা কাণ্ড বিন্দুদিদি আরম্ভ করেছিল, যদি দেখতে শশীদাদা! এই হাসে এই কাঁদে, এখুনি আবার গান ধরে দেয়—ভয়ে তো আমাদের হাত পা সেঁদিয়ে গেল পেটের মধ্যে। কী করেছে জানেন? আপনার ওষুধের আলমারি খুলে—

আর কিছু শুনিবার দরকার ছিল না। শশী বিন্দুর কাছে গিয়া বসিল। নাড়ি দেখিয়া কুন্দকে বলিল, এখানে এমন করে পড়ে আছে, ধুইয়ে মুছিয়ে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিতে পারলি না তোরা কেউ?

কুন্দ কৈফিয়ত দিয়া বলিল, ধরতে গেলে কামড়াতে আসে যে!

শশী বলিল, এখন তো হুঁশও নেই কুন্দ? এক কলসি জল নিয়ে আয়।

বিন্দুকে শশী স্নান করাইয়া দিল। তারপর কয়েকজনের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিল।

এও একটা কলঙ্ক বইকী!

কদিন গ্রামে খুব একচোট হইচই হইয়া গেল। ভদ্র-পরিবারের অন্তঃপুরে এ কী বিসদৃশ কাণ্ড। পুরুষ মানুষ মদ খায়, মাতলামি করে, বমি করিয়া ভাসাইয়া দেয়, লোকে নিন্দা করে কিন্তু আশ্চর্য হয় না। বাড়ির মেয়ে এমন বীভৎস ব্যাপারের নায়িকা হইতে পারে তা যে কল্পনা করাও যায় না! যারা উপস্থিত থাকিয়া বিন্দুর মাতলামি দেখিতে পায় নাই তারা আপশোশ করিয়া মরে,—সকলকে বিস্তারিত বর্ণনা শুনাইতে শুনাইতে প্রত্যক্ষদর্শীদের হয় সুখকর প্রাণান্ত।

সেদিন রাত্রে গোপাল থতোমতো খাইয়া গিয়াছিল, সারারাত্রি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া পরদিন সকালবেলা তাহার ক্রোধের আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিন্দুকে আনিবার অপরাধে শশীকে সে গালাগালি করিল অকথ্য, চিৎকার করিয়া বিন্দুকে সে বারবার বলিল দূর হইয়া যাইতে। এমন হতভাগা যে মেয়ে, গোপালের বাড়িতে তার একদণ্ডও ঠাঁই হইবে না। শশী নির্বাক হইয়া

রহিল. বিন্দু ঘরে খিল দিয়াছিল, সেও কোনো সাড়াশব্দ দিল না। সমস্ত সকালটা বাড়ি তোলপাড় করিয়া, একজন মুনিষকে খড়ম দিয়া পিটাইয়া, জামা চাদর লইয়া ছাতা বগলে গোপাল বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল, কলিকাতা যাইতেছে, কারণ গ্রামে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় নাই। ফিরিয়া আসিয়া বিন্দুকে যদি গৃহে দেখিতে পায় বাড়িঘরে গোপাল আগুন ধরাইয়া দিবে।

মেজাজটা শশীরও বিগড়াইয়া গিয়াছিল। বিন্দুর উপরে কিন্তু তাহার রাগ হইল না। দিন তিনেক বিন্দু ঘরের বাহিরে আসিল না,—দিবারাত্রি খিল দিয়া ঘরের মধ্যে নিজেকে নির্বাসিত করিয়া রাখিল। শুধু শশীর ডাকাডাকিতে বাহিরে আসিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া আসে, ঘাড় গুঁজিয়া দুটি ভাত মুখে দেয়, তারপর আবার ঘরে গিয়া খিল বন্ধ করে। কেহ কথা বলিলে জবাবও দেয় না, মুখও তোলে না। তিনদিন পরে কী মনে করিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল,—কুন্দর সঙ্গে সহজভাবে দুটি-একটি কথাও বলিল। কিন্তু মিশিতে পারিল না কারও সঙ্গে। এখানে আসিয়া অবধি যে রকম নির্জীব নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করিতেছিল তেমনি ভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

একটা অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে শশী ঘুরিয়া বেড়ায়, কর্তব্য কাজগুলি সম্পন্ন করে। এতদিন সে রোগীর পরিবারের আত্মীয়-বন্ধুর মতো রোগী দেখিয়াছে, ওষুধের সঙ্গে দিয়াছে আশ্বাস। এখন সে গম্ভীর মুখে রোগীর নাড়ি টেপে, সামান্য কারণে রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে। কোনো কথা একবারের বেশি দুবার বলিতে হইলে বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না।

সময়টা চৈত্র মাস। কড়া রোদে মাঠ ভাঙিয়া শশীর পালকি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়, হুহু করিয়া গরম বাতাস বহিতে থাকে। পালকির মধ্যে নিষ্ক্রিয় উত্তপ্ত অবসর শশী ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলে। বিন্দুর কথা ভাবে, কুসুম ও মতির কথা ভাবে। কুসুম ও মতির সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু ভাবিবার নাই। বিন্দুর কথা ভাবিয়া সে কূল-কিনারা দেখিতে পায় না। বিন্দুকে সে-ই নন্দর কবল হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছে,—ওর সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব তাহার। বিন্দু যে বীভৎস কীর্তি করিয়া লোক হাসাইয়াছে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অকথ্য দুর্নাম রটনা হইতেছে, এ জন্য শশী নিজেকে অপরাধী মনে করে। তারই দোষ। যে বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভ্যাস্তাইয়া যায়। একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। রূপসি সেনদিদির স্নেহ প্রিয় ছিল, কুরূপা সেনদিদিকে এড়াইয়া চলিবার ইচ্ছার জন্য তাই নিজেকে আজ অশ্রদ্ধা করিতে হয়! অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া মমতার বশে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিয়া হারু ঘোষের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল। তারপর যে দিন আপনা হইতে ওদের অভিভাবকের আসনটি সে পাইয়াছে, সেদিন চিনিতে পারিয়াছে কুসুমের মন, নষ্ট করিয়াছে মতির ভবিষ্যৎ। এবার বিন্দুর এই অবস্থা দাঁড়াইল। বিন্দুকে আনিবার সময় কত কল্পনাই সে করিয়াছিল!—ধীরে ধীরে বিন্দুর মনকে সুস্থ করিয়া তুলিবে, গ্রামের শান্ত আবেষ্টনীতে মনে ওর শান্তি আসিবে, তার স্নেহ যত্ন সাহচর্যে স্বামীহীনা নারীর যত রস ও আনন্দ জীবনে থাকা সম্ভব ক্রমে ক্রমে সব আসিবে বিন্দুর জীবনে : বই পড়িতে এবং ভাবিতে শিখাইয়া একটি অপূর্ব অন্তর্লোক ওর জন্য সে সৃষ্টি করিয়া দিবে। তা যে কতদূর অসম্ভব আজ আর বুঝিতে শশীর বাকি নাই।

ভাবিতে শশীর কষ্ট হয়, তবু ইহা সত্য যে শুধু নেশার জন্যই বিন্দু সেদিন মদ খাইয়াছিল, আর কোনো কারণে নয়। একদিন হয়তো সাঁড়াশি দিয়া দাঁত ফাঁক করিয়া তাহাকে নন্দর ও জিনিসটা গিলাইতে হইয়াছিল,—আজ মদ ছাড়া বিন্দুর চলে না। তা ছাড়া, শুধু মদের নেশা নয়, সাত বছর ধরিয়া নন্দ তাহাকে যে উত্তেজনাময় অস্বাভাবিক জীবন দিয়াছিল, সেই জীবনও বিন্দুর অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিপুল বিকারগ্রস্ত বিরহ তো শুধু নন্দর জন্য নয়,—লজ্জাকর বিলাসিতার জন্য, সংগীত ও উন্মত্ততার জন্য। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন স্তিমিত নিস্তেজ জীবন বিন্দুর সহিতেছে না

কী উপায় হইবে বিন্দুর? নন্দর কাছে ফিরিয়া যাইবে তাতেও লাভ নাই। যে বিকৃত অভ্যস্ত জীবনের জন্য বিন্দু মরিয়া যাইতেছে, সে জীবনে ফিরিয়া গেলেও তার সমস্যার মীমাংসা হইবে না। গায়ের জোরে ওই অস্বাভাবিক জীবনে বিন্দুর অভ্যাস জন্মানো হইয়াছে, তাই, গৃহস্থ-কন্যার একটি সংস্কারও তার মরিয়া যায় নাই। ওই অশান্ত উদ্দাম লজ্জাকর অবস্থায় দিন কাটাইতে না পারিলে তাহার চলিবে না, কিন্তু সে জন্য লজ্জায় দুঃখে অনুতাপে যন্ত্রণাও সে পাইবে অসহ্য। আকণ্ঠ মদের পিপাসার সঙ্গে বিন্দুর মনে মদের প্রতি এমন মারাত্মক ঘৃণা আছে যে নেশার শেষে আত্মগ্লানিতে সে আধমরা হইয়া যায়।

কী হইবে বিন্দুর?

বিন্দুর লজ্জা ভাঙিয়াছে। কোণঠাসা ভীরু জন্তুর একটা হীন সাহস জাগিয়াছে তাহার। রাত দুপুরে উঠিয়া আসিয়া সে দরজা ঠেলিয়া শশীর ঘুম ভাঙায়, ঘুমের ওষুধ চায়, মাথা ধরার প্রতিকার প্রার্থনা করে।

শশী বলে, চুপচাপ শুয়ে থাকবি যা, ঘুম আসবে। মাথা ধরাও কমে যাবে।

বিন্দু কাঁদিয়া বলে, না দাদা, দাও ঘুমের ওষুধ,—এত কষ্ট সইতে পারি না।

নিশুতি রাতে তাহার শীর্ণ কম্পিত শরীর আর জ্বলজ্বলে চোখের গাঢ় তৃষ্ণা শশীকে উতলা করিয়া তোলে। বুঝাইয়া সে পারিয়া ওঠে না। বিন্দু কোনো কথা কানে তোলে না—অবুঝ শিশুর মত ঘুমের ওষুধ চাহিতে থাকে।

শশী বলে, তোর এটুকু মনের জোর নেই বিন্দু?

বিন্দু বলে, মরে গেলাম আমি, মনের জোর কোথা পাব?

শশী একটা ওষুধ তৈরি করিয়া তাকে দেয়। বিন্দু সে ওষুধ মেঝেতে ঠেলিয়া ফেলে। শশীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, একটু ভালো ওষুধ দাও, একটুখানি দাও। দাও না একটু ভালো ওষুধ আমাকে?

ব্রান্ডির বোতল শশী বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল,—আলমারিতে রাখিতে সাহস পায় নাই। চাবির অভাবে কাঁচ ভাঙিয়া বোতলটা আয়ত্ত করা বিন্দুর পক্ষে অসম্ভব নয়। খানিকক্ষণ সে অবলুণ্ঠিতা বিন্দুর দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর বলে, পা ছাড়, দিচ্ছি।

ওষুধের গ্লাসে ঘুমের ওষুধ খাইয়া বিন্দু ঘুমাইতে যায়। শশী চুপ করিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে। কত যে মশা কামড়ায় তাহাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। শশী ভাবে, কেন সে এমন অক্ষম, এত অসহায়? শান্তি দিবে বলিয়া যাকে সে কুড়াইয়া আনিয়াছিল, রাতদুপুরে তাকে তার মদ পরিবেশন করিতে হয় কেন?

দিন দশেক কলিকাতায় থাকিয়া গোপাল ফিরিয়া আসিল। বিন্দুর সম্বন্ধে সে আর কোনো উচ্চবাচ্য করিল না, মনে হইল বিন্দুর সেদিনকার অপরাধ সে বুঝি ক্ষমাই করিয়া ফেলিয়াছে। শশী তাহাকে চিনিত, গোপালের শান্ত ভাবে সেই শুধু একটু চিন্তিত হইয়া রহিল।

দিন তিনেক নির্বিবাদে কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে শশীকে ডাকিয়া গোপাল বলিল, নন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছিল শশী।

দেখা হইয়াছিল হঠাৎ, পথে!—গোপাল যাচিয়া দেখা করে নাই। গোপালের মানসিক প্রক্রিয়াটা ধরিতে না পারিয়া শশী একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বিন্দু অনেক দিন এসেছে, নন্দ ওদিকে রাগারাগি করছে শশী,—দু-চার দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে বললে।

শশী স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, পাঠিয়ে দিতে বললে, না আপনি কথার ভাবে অনুমান করলেন?

গোপাল জোর দিয়া বলিল, বললে, পাঠিয়ে দিতে বললে। তুমি ওকে রেখে আসতে পারবে?

শশী বলিল, পারব।

কাল দিন ভালো আছে, কালকেই তবে রওনা হয়ে যাও।

তাই হোক। যাইতে যদি হয় বিন্দুকে, কাল গেলে কোনো ক্ষতি নাই। বিন্দুকে শশী কথাটা তখনই শুনাইয়া দিল। বিন্দু একটু হাসিল।

তাই চলো দাদা, সেই ভালো।

শশী বলিল, এমন জানলে তোকে আমি আনতাম না বিন্দু। শুধু কষ্ট পেলি, ওদিকে নন্দ রেগে রইল, কোনো লাভ হল না।

বিন্দু বলিল, লাভ হল বইকী দাদা! চলে না এলে কী করে বুঝতাম ওখানে ওমনি ভাবে থাকা ছাড়া আমাব গতি নেই? এবার আর কিছু না হোক, মুক্তির কল্পনা করে অযথা ব্যাকুল হব না। হয়তো এবার মনও বসবে। হয়তো এবার খুব সুখেই থাকব।

বিদায় নেওয়া ঠিক হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় বিন্দু এতদিন পরে গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখিল,—আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে মেলামেশা করিল। সেদিনকার কাণ্ডেব পর সকলেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে আজ বিন্দুর সংকোচ হওয়া উচিত ছিল। এ বাড়ির উঠানে নিজের বমির মধ্যে সে যে একদিন গড়াগড়ি দিয়াছিল, সকলের সঙ্গে হঠাৎ তাহাব অবাধ অকুণ্ঠ ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল না সে কথা বিন্দুর স্মবণ আছে। রান্নাঘরে কুন্দর ছেলেকে কোলে করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ সে সকলের সঙ্গে গল্প করিল, হাসিল পর্যন্ত। সে যেন স্বামীর গৃহে সহজ ও সাধারণ বধূজীবন যাপন করিয়া বহুদিন পবে বাপের বাড়ি আসিযাছে,—জীবনে তাহাব গ্লানি নাই, অস্বাভাবিকতা নাই, —মনভবা তাহাব নির্মল আনন্দ।

খবর পাইয়া পাডাসুদ্ধ মেয়েরা বিন্দুকে দেখিতে আসিল। অনেকে তাহাবা বিন্দুকে জন্মাইতে দেখিয়াছে। বিন্দু আজ তাদের কাছে আকাশের পরির চেয়েও রহস্যময়ী। অনেক দিন আগে একবার আসিয়া গ্রামকে সে চমকাইযা দিয়াছিল, এবারও দিয়াছে। আবার সে ফিরিযা যাইতেছে তাহাব অজ্ঞাত রহস্যময় প্রবাসে, তাদের গাঁয়ের মেয়ে বিন্দু। কুসুম এবং পরানও আসিল। কুসুম চুপিচুপি বিন্দুকে বলিল, বড্ড যে হাসিখুশি দিদি?

বিন্দু বলিল, বরেব কাছে যাব যে ভাই।—শীর্ণ মুখে সে অকথ্য হাসি হাসিল।

আবার কবে আসবে?

আর তো আসব না বউ।

পরান শশীকে বলিল, মতিদের খোঁজ করবেন ছোটোবাবু?

শশী বলিল, কবব বইকী। বৈশাখ মাস পড়ল না? বৈশাখ মাসে কুমুদ সরস্বতী অপেরায যোগ দেবে বলেছিল পরান। দলটাব ঠিকানা অবশ্য আমি জানি না, তবে খোঁজ পেতে কষ্ট হবে মনে হয় না।

খবর যদি পান ছোটোবাবু, মতিকে নিয়ে আসবেন। দুমাস হল গেছে, ছেলেমানুয তো, কাঁদাকাটা করছে হয়তো।

দুমাস হইয়া গিয়াছে? তাই তো বটে! পরানের মুখের দিকে শশী চাহিতে পারে না। দুমাস হইল মতি গ্রামছাড়া, এর মধ্যে একটা খবরও আসে নাই। টাকা চাহিয়াও কুমুদ যদি একখানা পত্র লিখিত! যদি দেখা হয়, কুমুদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে হইবে। বুঝাইয়া দিতে হইবে সে কত বড়ো দায়িত্বজ্ঞানহীন রাসকেল।

আচ্ছা, মতি তো একখানা চিঠি লিখিতে পারিত তাহার আঁকাবাঁকা অক্ষরে? কেন লিখিল না? কুমুদের সঙ্গে খেলা করিয়া সময় পায় না ? এ ক্ষমতা কুমুদের আছে,—মানুষকে সে আত্মভোলা

করিয়া দিতে পাবে। তা ছাড়া, হয়তো কুমুদ যেমন বিবরণ দিয়াছিল তেমনই অসম্ভব অবাস্তব ভালোবাসা সত্যসত্যই মতির বুকে আসিয়াছে, কাব্যে যেমন লেখে মিলনের তেমনই অতল উচ্ছল আনন্দে মতি বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়াছে? শশী একটু হাসে। মতিকে উপন্যাসের নায়িকার মতো ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে তো কম কল্পনাপ্রবণ নয়!

পরদিন বিন্দুকে সঙ্গে করিয়া শশী কলিকাতা রওনা হইয়া গেল। দিন এবং রাত্রি কাটিল পথে, কথা তাহাবা বলিল খুব কম। কে ভাবিয়াছিল এ ভাবে বিন্দুকে আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। বিন্দুর বাড়ির সেই ফরাশ-পাতা, তবলা তাকিয়া ও কুদৃশ্য ছবিতে সাজানো ঘরখানা শশীর মনে ভাসিয়া আসিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, তার আলমারিতে বোতলের পাশে লেবেল-আঁটা বিষের শিশি ছিল, বিন্দু কেন সেদিন বিষ খাইল না?

বেলা প্রায় দশটাব সময় তাহারা বিন্দুর বাড়ি পৌঁছিল। দারোয়ান খুব ঘটা করিয়া সেলাম করিল বিন্দুকে, বিন্দুব দাসী একগাল হাসিল। নন্দ নামিয়া আসিল, নির্লজ্জ অকুণ্ঠ নন্দ। হাসিমুখে শশীকে অভ্যর্থনা করিয়া সে বলিল, এসো এসো, আসতে আজ্ঞা হোক।

শশী বলিল, আসতে পারব না নন্দ। কাজ আছে।

বিন্দু মিনতি করিয়া বলিল, একটু বসে যাবে না দাদা?

কাজ আছে বিন্দু।

শশী নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবাব গাড়িতে উঠিয়া বসিল। বিন্দু তাহাকে আর নামিতে অনুরোধ কবিল না, শুধু বলিল, গাঁয়ে ফেরার আগে যদি সময় পাও, একবারটি খপব নিয়ে যেয়ো।

বিন্দু ভিতরে চলিযা গেল। শশীর গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিবে, গাড়োয়ানকে থামিতে বলিয়া নন্দ কাছে আগাইযা আসিল। শশীর মনে হইল নন্দ খুব রোগা হইয়া গিয়াছে, চোখে রাত-জাগার চিহ্ন।

খপর নিতে বোধ হয় আসবে না?—নন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

কী করে বলি? সময় পাব না হয়তো।—বলিল শশী।

নন্দ একটু ভাবিল, এলে ভালো করতে শশী। ওকে কাল বাড়ি নিয়ে যাব ভাবছি—মা ওরা সব যে বাড়িতে আছেন সেইখানে। এ বাড়িটা বেচে দেব। নতুন লোকেব মধ্যে গিয়ে পড়ে একটু হয়তো বিব্রত হয়ে পড়বে.—তুমি গিয়ে দেখা করলে ভালো লাগবে ওর—মন বসতে সাহায্য হবে।

শশী অবাক হইযা বলিল, বিন্দুকে বাড়ি নিয়ে যাবে?

নন্দ বলিল, তাই ভাবছিলাম। এখানে যখন থাকতে চায় না, বাড়িই চলুক! একবার তোমাব সঙ্গে চলে গেল, পবের বার যদি জন্মের মতো আমাকে ত্যাগ করে বসে? কী জান শশী, বুড়ো বয়সে এ সব হাঙ্গামা ভালো লাগে না। এখানে নিজের মনে কত আরামে ছিল,—ভিড় নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, সব বিষয়ে স্বাধীন। তা যদি ভালো না লাগে, চলুক তবে যেখানে থাকতে ভালো লাগবে সেইখানে—আমার কী? আমি কাজের মানুষ, কাজ নিয়ে থাকি নিজেব।

এ সুবুদ্ধি তোমার আগে হল না কেন নন্দ?

নন্দ হঠাৎ এ কথার জবাব দিতে পারিল না। তারপর ছেলেমানুষের মতো বলিল, আগে কী করে জানব যে পালিয়ে যাবে? বেশ তো হাসিখুশি দেখতাম।

শশী একবার ভাবিল, নন্দকে বুঝাইযা এ মতলব ত্যাগ করিতে বলে। সাত বছর ধরিয়া যে অন্যায় সে করিযা আসিয়াছে, আজ অসময়ে কেন তার প্রতিকারেব চেষ্টা? চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও নাই। ঘোমটা টানিয়া বিন্দু আজ এতকাল পরে শাশুড়ি ননদ সতিনের সংসারে নিরীহ

বধূটি সাজিতে পারিবে কেন? তা যদি পারিত, গাওদিয়ার উত্তেজনাহীন সহজ জীবন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিত না।

শেষ পর্যন্ত কিছু না বলাই শশী ভালো মনে করিল। নন্দর সঙ্গে এ আলোচনা করা চলে না।

গতবার কুসুমদের সঙ্গে করিয়া যে হোটেলে উঠিয়াছিল এবারও শশী সেইখানে গেল। কুমুদের দেখা পাইবার আশায় মতি যে এখানে আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল সে কথা শশীব মনে আছে। মতি? অতটুকু মেয়ে মতি? কী মন্ত্রই কুমুদ জানে, বেহিসাবি নিষ্ঠুর যাযাবর কুমুদ!

পরদিন শশী কুমুদেব খোঁজ করিল। একটা থিয়েটারের সাজ-পোশাকের দোকানে বিনোদিনী অপেরার ঠিকানা পাওয়া গেল,—সরস্বতী অপেরার সন্ধান কেহ শশীকে দিতে পারিল না। কুমুদ বলিয়াছিল, বিনোদিনী অপেরার সঙ্গে তাহাব সম্পর্ক চুকিয়াছে, ওখানে খোঁজ করিয়া লাভ হইবে কি না সন্দেহ। তবু শশী শেষবেলায় চিৎপুরে একটা বাড়ির দোতলায় অধিকারীর সঙ্গে দেখা করিল।

সদ্য-ঘুম-ভাঙা অধিকারী বলিল, কুমুদ? অঘ্রান মাস থেকে সে শালাকে আমরাও খুঁজছি মশায়। ভাঁওতা দিয়ে তিন মাসেব মাইনে আগাম নিয়ে সরেছে। দুদিন পরে শ্রীপুরের রাজবাড়িতে বায়না ছিল, একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে মশায়। অধিকারী আরক্ত চোখে কটমট করিয়া শশীর দিকে চাহিল, মশায়ের কী সর্বনাশটা করেছে শুনতে পাই?

শশী একটু হাসিল, সে কথা শুনে আর কী হবে? সরস্বতী অপেরার ঠিকানাটা বলতে পারেন?

সরস্বতী অপেরা? নামও শুনিনি।

এইখানে তবে ইতি, কুমুদকে খোঁজ করার? শশী চলিয়া আসিতেছিল, অধিকারী বলিল, কুমুদেব সঙ্গে আপনার দেখা হবে কি?

শশী বলিল, তা বলতে পারি না। হওয়া সম্ভব।

অধিকারী বলল, দেখা হলে একবার জিজ্ঞেস করবেন তো, এই কি ভদ্দর লোকের ছেলের কাজ?—আচ্ছা থাক, ও সব কিছু জিজ্ঞেস করে কাজ নেই, বাবুর আবাব অপমান জ্ঞানটি টনটনে। বলবেন যে অধর মল্লিক ও দুশো চারশো টাকার জন্যে কেয়াব করে না। পালাবার তোর কী দরকাব ছিল রে বাপু, অ্যাঁ? চাইলে ও কটা টাকা তোকে আর আমি দিতাম না,—তিন বছর তুই আমার দলে আছিস, ছেলেব মতো তোর পরে মায়া বসেছে!

গলাটা অধিকাবীর ধরিয়া আসিল, কে জানে শ্লেষ্মায় কি মমতায়! চোখ পিটপিট করিয়া বলিল, আমার ছেলেপিলে নেই, জানেন? একটা মেয়ে ছিল, বাপ বটে আমি, তবু বলি দেখতে শুনতে মেয়ের আমার তুলনা ছিল না মশায়—বং যাকে বলে আসল গৌর তাই। কুমুদের সঙ্গে বিয়ে দেব ভেবেছিলাম, তা ছোঁড়ার কি আর বিয়ে-টিয়ের মতলব আছে,—একদম পাষণ্ড। তাই না কেষ্টনগরের এক ডাকাতের হাতে মেয়ে দিতে হল, যন্ত্রণা দিয়ে মেয়েটাকে তারা মেরে ফেললে। সেই থেকে কী যে হল আমাব, সংসারে আর মন নেই,—দল একটা করেছি কেউ ডাকলে ডুকলে পালা গেয়ে আসি—কিছু ভালো লাগে না মশায়। আছি শতেক জ্বালায় আধমরা হয়ে, কুমুদ ছোঁড়া কি না ডুবিয়ে গেল আমাকেই,—ছোঁড়ার দেহে একফোঁটা দয়া-মায়া নেই। আমি হলে তো পারতাম না বাপু একটা শোকাতুর মানুষের ঘাড় ভেঙে পালাতে,—পারতাম না। ছোঁড়াটা কী!

বিস্ময়ে ও আবেগে অধিকারী শুধু মাথাই নাড়িল খানিকক্ষণ। তারপর আরও বেশি অন্তরঙ্গ হইয়া বলিল, আপনাকে খুলেই বলি দাদা, কুমুদ গিয়ে থেকে দলটা কানা হয়ে গেছে। খাসা পার্ট বলত,—বিশ বছর আছি এ লাইনে, অমনটি আর দেখিনি। দেখা হলে বলবেন, টাকা গেছে যাক,

আসুক, কাজ করুক, পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবার পাত্র অধর মল্লিক নয়! দশ বিশ টাকা মাইনে বেশি চায়, আমি কি বলেছি দেব না? ছোঁড়াটা কী!

দিন তিনেক শশী আরও কয়েকটা দলে কুমুদের খোঁজ করিল, কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। অনেক রোগী ফেলিয়া আসিয়াছে, বেশিদিন কলিকাতায় বসিয়া থাকিবার উপায় শশীর ছিল না। পরদিন সে গাওদিয়া ফিরিয়া যাইবে ঠিক করিল। বাকি জীবনটা কলিকাতায় বসিয়া মতির খোঁজ করিলে তো তার চলিবে না। গ্রামে ফিরিবার এই আভ্যন্তরিক তাগিদ সেদিন রাত্রে শশীকে একটু অবাক করিয়া দিল। শশীর ঘরখানা রাস্তার উপরে। অনেক রাত্রে চৌকির প্রান্তে জানালার ধারে সে বসিয়া ছিল। পথে তখন লোক চলাচল কমিয়াছে, দোকানপাট বন্ধ হইয়াছে। কাল তাহাকে গ্রামে ফিরিতে হইবে? একদিন গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া বৃহত্তর বিস্তৃততর জীবন গঠনের কল্পনা করিয়া সে দিন কাটায়, আর ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এক সপ্তাহ বাহিরে আসিয়া তাহার থাকা চলে না? কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, টাইফয়েড এবং আরও অনেক ছোটোবড়ো রোগে আক্রান্ত যাদের সে ফেলিয়া আসিয়াছে, একে একে তাদের কথা মনে পড়িলে আর একটা দিনও অকারণে কলিকাতায় বসিয়া থাকিবার সংকল্পে নিজেকে তাহার খেয়ালি, বর্বর মনে হইতেছে। কে জানে ওদের কে ইতিমধ্যে গিয়াছে মরিয়া, কার অবস্থা গিয়াছে খারাপের দিকে। ফিরিয়া গিয়া আবার ওদের রোগশয্যা পার্শ্বে বসিতে না পারিলে মনে তো স্বস্তি পাইবে না। এ কী বন্ধন, এ কী দাসত্ব?

শশীর রাগ হয়। এ দায়িত্ব সে মানিবে না, এত কীসের নীতিজ্ঞান? গ্রামে তো সে ফিরিবে না একমাসের মধ্যে,—সে কি মানুষের জীবন মরণের মালিক? যত দিন গ্রামে ছিল, যে ডাকিয়াছে চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে। এখন যদি রোগীরা তার চিকিৎসার অভাবে মরিয়া যায়, মরুক। তিন বছর আগে সে যখন ডাক্তারি পাশ করে নাই, তখন কী করিয়াছিল গাঁয়ের লোক? এখনও তাই করুক—শশী কিছু জানে না।

আট

একমাস গ্রামে না ফিরিবার প্রতিজ্ঞা দুদিনের বেশি টিকিল না শশীর। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে তার অসহায় বিপন্ন রোগীরা যে পথ চাহিয়া আছে।

বিন্দুর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা শশীর আর ছিল না। রওনা হওয়ার দিন বিকালে হঠাৎ অনিচ্ছা জয় করিয়া সে হাজির হইল নন্দর বাড়িতে। নন্দ বাড়ি ছিল। বিন্দু? না, বিন্দুকে এখনও এ বাড়িতে আনা হয় নাই।

নন্দ বলিল, ও বাড়ি যাব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। দেখা করবে তো চলো আমার সঙ্গে।

শশী বলিল, ও বাড়ি যাবার সময় হবে না নন্দ। আজ বাড়ি যাচ্ছি, সাতটায় গাড়ি।

আজকেই যাবে? বোসো, চা-টা খাও।

শশীর মনে কি এ আশা ছিল যে গাওদিয়ার বাড়িতে টিকিতে না পারিলেও নন্দর গৃহে গৃহিণী হইয়া বিন্দু থাকিতে পারিবে? বিন্দু আসে নাই শুনিয়া সে যেন বড়ো দমিয়া গেল। নন্দর বাড়িঘর দেখিয়া সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল। এখানে আগে সে কখনও আসে নাই,—নন্দর গৃহে বনেদিত্বের ছাপ যে এত স্পষ্ট ও প্রীতিকর এ ধারণা তাহার ছিল না। সেকেলে ধরনের ভারী নিরেট সব আসবাব, দরজা জানলায় দামি পুরু পর্দা, দেয়ালে প্রকাণ্ড কয়েকটা অয়েলপেন্টিং, এমনি সব গৃহসজ্জা নন্দর এই ঘরখানাকে একটি অপূর্ব গম্ভীর শ্রী দিয়াছে। অন্দর বোধ হয় বেশি তফাতে নয়,—কোমল গলার কথা ও হাসি শশীর কানে আসিতেছিল,—সে অনুভব করিতেছিল অন্তরালের

একটি বৃহৎ সুখী পরিবারের অস্তিত্ব। তারপর এক সময় সাত আট বছর বয়সের একটি সুশ্রী ছেলে কী বলিতে আসিয়া শশীকে দেখিয়া নন্দর গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কী সুন্দর তার দুটি কৌতূহলী চোখ! আর কী মায়া নন্দর চোখে!

গরমে যে ঘেমে উঠেছিস? বলিয়া নন্দ নিজে ছেলের জামা খুলিয়া দিতে শশী যেন অবাক হইয়া গেল। এ কি অসঙ্গতি নন্দ ও নন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে? তার এই পুরুষানুক্রমিক নীড়ে শান্তি আছে নাকি? এই গৃহের সীমাবদ্ধ জগতে কি সুখ ও আনন্দের তরঙ্গ ওঠে আর পড়ে?

নন্দর ছেলে চলিয়া গেলে শশী বলিল, বিন্দুকে বলেছিলে নন্দ, এখানে আসার কথা?

বলেছিলাম। সে আসবে না।

আসবে না?—ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। তবু শশী যেন নিভিয়া গেল।

চাকর তামাক দিয়া গিয়াছিল, নন্দর হাতের নলটা সাপের মতো দুলিয়া উঠিল, অন্যমনস্কভাবে সে বলিতে লাগিল, এমন জেদি মানুষ জন্মে দেখিনি শশী। কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। কী যে বিপদে আমি পড়েছি। স্বীকার করি কাজটা প্রথমে ভালো করিনি, রাগের মাথায় ঠিক থাকেনি দিগ্‌বিদিক,—কিন্তু সত্যি বলছি শশী, শেষের দিকে ওই আমাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, থামতে দেয়নি। স্পষ্ট করে আমি অবশ্য এতদিন বলিনি কিছু, মনটা আমার কদ্দুর বদলে গেছে আগে ভালো বুঝতে পারিনি শশী। এবার যখন গাওদিয়া চলে গেল হঠাৎ, সেই থেকে কেমন—

নন্দ হেন লোক, সেও আজ তামাক টানার ছলে কাশিল।

এখানে আনবার জন্য কত তোযামোদ করছি, কী আর বলব তোমাকে। কত বলছি যে আর কেন, চলো এবার ও বাড়িতে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে,—খোকার মা আজ এক বছর শয্যাশায়ী, তার ভালোমন্দ কিছু হলে এতবড়ো সংসার তো তোমারই। না, আমি আর একটা বিয়ে করতে যাব এই বয়েসে? তা শুনে এমন করে হাসে যেন ঠাট্টা করছি।

শশী বলিল, তোমার মুখে এ সব কথা হয়তো ঠাট্টার মতোই শোনায় নন্দ।

নন্দর ভাবপ্রবণতা ভাঙিয়া গেল। মুখে দেখা দিল মেঘের মতো বিরাগের ছায়া। হাতের নল নামাইয়া, চোখের ভুরু কুঁচকাইয়া সে বলিল, তুমি যদি পরিহাস করতে এসে থাক—

পরিহাস? তোমার সঙ্গে? এ রকম কাণ্ডজ্ঞানের অভাব না হলে তুমি এমন সব কাণ্ড করতে পার!

শশী আর বসিল না। তাহাকে আগাইয়া দিতে নন্দ উঠিয়া আসিল না, যে চা ও খাবার শশী স্পর্শ করে নাই সেদিকে চাহিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিল।

গ্রামে ফিরিয়া দিনগুলি এবার অপ্রীতিকর মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে কাটিতে তাকে। গরমে শরীরও কিছু খারাপ হইয়া যায় শশীর। এ বছর একেবারে বৃষ্টি নাই। গ্রামের শ্যামল রূপ রোদে পুড়িয়া একেবারে বাদামি হইয়া উঠিয়াছে। এটা কলেরার মরশুমের সময়, শ্মশানে ধূম লাগিয়াই আছে। বেশি খাটিতে হওয়ায় শশীর মেজাজ গিয়াছে আরও বিগড়াইয়া। স্নানাহারের সময় পায় না, অথচ তেমন পয়সা নাই। কলিকাতায় এ রকম পসার হইলে এতদিনে সে বোধ হয় লাখপতি হইয়া যাইত।

পরান আশা করিয়াছিল কলিকাতা হইতে শশী তাহাকে মতির খবর আনিয়া দিবে। শশী ফিরিয়াছে শুনিবামাত্র সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। শশী মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই। পরানও চুপচাপ খানিক বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গিয়াছিল। সেটা সকাল। তারপর দুপুরে আসিয়াছিল কুসুম। বলিয়াছিল, কেন যে মরছে ভেবে ভেবে! চুরি করে তো আর নিয়ে যায়নি বোনকে কেউ, সে গেছে সোয়ামির সঙ্গে, অত ভাবনা কীসের দিনরাত?—কী আনলেন আমার জন্যে?

তোমার জন্যে? কিছু আনিনি বউ।

কী ভুলো মন মাগো! কত করে যে বলে দিলাম আনতে?

শশী অবাক হইয়া বলিয়াছিল, কী আবার আনতে বললে তুমি? কখন বললে?

ওমা, বলিনি বুঝি? তা হবে হয়তো! বলব বলে বলিনি শেষ পর্যন্ত! কিন্তু না বললে কি আনতে নেই?

কী অকৃত্রিম ছেলেমানুষি কুসুমের, কী নির্মল হাসি! তারপব কয়েকদিন কুসুমের সঙ্গে দেখা হয় নাই, এই হাসি শশীর মনে ছিল। জোর করিয়া মনে রাখিয়াছিল। ভাপসা গুমোট, শুষ্ক ডোবা—পুকুর ভরা গ্রামের রুক্ষমূর্তি আর কলেরা রোগীর কদর্য সান্নিধ্য, এই সমস্ত পীড়নের মধ্যে কুসুমেব খাপছাড়া হাসিটুকু ভিন্ন মনে করিবার মতো আর কিছু শশী খুঁজিয়া পায় নাই।

কিছু ভালো লাগে না শশীর,—না গ্রাম, না গ্রামের মানুষ। শেষ রাত্রে ঢেঁকির শব্দে ঘুম ভাঙিযা যায়। তখন হইতে সন্ধ্যার নীববতা আসিবাব আগে কায়েতপাড়ার পথের ধারে বটগাছটার শাখায় জমায়েত পাখিব কলরব শুরু হওয়া পর্যন্ত, বন্য ও গৃহস্থ জীবনের যত বিচিত্র শব্দ শশীর কানে আসে, সব যেন ঢাকিয়া যায় যামিনীর হামানদিস্তার ঠকঠক শব্দে, আর গোপালেব গম্ভীর কাশির আওয়াজে। বাড়িতে মেয়েপুরুষ হাসে কাঁদে কলহ করে, বাহিরে যুবক ও বৃদ্ধেব দল তাস খেলে আড্ডা দেয়, চাষি মজুর গযলা কুমোব স্যাকরা জেলে দোকানি এবা ছাড়া অলস অকর্মণ্যতার অতিরিক্ত ভদ্র পেশা যাদেব আছে আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়। শ্রীনাথের দোকানেব লালচে আলোয কীর্তি নিয়োগিব মাথাব তেলমাখা আবটি চকচক করিতে দেখিলে, নৈশ আকাশেব তাবা ও চাঁদের আলোর দিকে চাহিতে শশীর লজ্জা করে। বাগদিপাড়ায জেলফেরত কয়েকজন বীবপুরুষ রাত দুপুরে পবস্পবের মাথা ফাটাইয়া দেয়, শশীর হাতের বাঁধা ব্যান্ডেজ তাহাদেব খোলা হয জেলেব হাসপাতালে। সুদেব বলিযা বেড়ায়, মতির বিবাহটা মিছে, ছল—শশী কর্তৃক মতিকে গাপ কবাব কৌশল মাত্র। --ভদ্দরপানা যার সঙ্গে বিয়ে হল মতির, কত টাকা সে খেয়েছে জানো ছোটোবাবুর ঠেয়ে? হয়তো বাজিতপুরে হয়তো আর কোথাও মতিকে শশী লুকাইয়া রাখিয়াছে,—গাঁয়ে যে শশী থাকে না, রোগী দেখিবার ছলে কোথায চলিয়া যায়, সুদেব ছাড়া আব কে তার অর্থ বুঝিবে! অন্ধকাব রাত্রে গোযালপাড়ার আট দশটা ছোকরা একদিন দুতিন গামলা গোবর-গোলা জল শশীর গায়ে ঢালিয়া দেয়,—গোয়ালপাড়ার গোবব অতি সুপ্রাপ্য। পরদিন গোপালের গোমস্তা বাকি টাকার জন্য সদরে নালিশ রুজু করিতে গিয়াছে খবর পাইয়া গোয়ালপাড়ার মোড়ল বিপিন অবশ্য আসিয়া কাঁদিয়া পড়ে,—গোটা কয়েক নিরীহ ছোকরাকে ধরিয়া আনিয়া কান মলায়, নাকে খত দেওযায়। তাতে মন শান্ত হওয়ার কথা নয়।

তারপর আছে সেনদিদি। অন্ধকারে চোরের মতো পলায়নপর অবস্থায় সামনে পড়িয়া থমকিয়া দাঁড়ানো যেন আজকাল তার বিশেষ একটা প্রিয় অভিনয়ে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অদূবে হুঁকার লাল আগুন হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়, খানিক পরে একেবারে অন্দরে শোনা যায় গোপালের গলা।

সেনদিদি নূতন একটা আবদার আরম্ভ করিয়াছে শশীর কাছে। গ্রামের একটি বৃদ্ধের চোখের ছানি কাটিয়া শশী সম্প্রতি তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। সেই হইতে সেনদিদি তাহাকে আর রেহাই দেয় না। বলে, ও শশী, দাও বাবা দাও, কেটে-কুটে ওষুদ দিয়ে যেমন করে হোক, দাও চোখটা আমার সারিয়ে।

শশী বলে, চোখ আপনার নষ্ট হয়ে গেছে সেনদিদি, ও আর সারবে না।

সেনদিদি ব্যাকুল হইয়া বলে, তুমি কেটে-কুটে দিলেই সারবে শশী, আমি তো জন্মান্ধ নই, অ্যাঁ? আমার জন্যে তোমার এত মায়া ছিল সে সব কোথায় গেল বাবা?

সেনদিদিকে বোঝানো দায়। কিছুই সে বুঝিতে চায় না। শশীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলে,—সবাই কানি বলে, আমার তো সয় না শশী। ওরে বাপরে, আমি কানি!

নিরুপায় শশী ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে, কাচের চোখ নেবেন সেনদিদি, নকল চোখ? দেখতে অবশ্য পাবেন না চোখে, তবে চোখটা আপনার আসল চোখের মতো দেখাবে, লোকে সহজে টের পাবে না।

কাচেরচোখ দিয়ে কী করব শশী! —বলিয়া সেনদিদি রাগিয়া ওঠে, তুমি ছাইয়ের ডাক্তার শশী, কিছু জান না তুমি চিকিচ্ছের! কর্তা যা বলে তা তো মিথ্যে নয় দেখছি তাহলে! তুমি চিকিচ্ছে করে চোখটা আমার খেয়েছ, অন্য কেউ হলে চোখ কি আমার নষ্ট হত! আজকে তুমি কাচের চোখ দিয়ে আমার ভোলাতে চাও? পাজি, হতভাগা, জোচ্চোর! মর তুই, মর!

শশী চুপ কবিয়া থাকে। কত ভালোবাসিত সেনদিদি তাকে, তার উপর কত বিশ্বাস ছিল। তবু শশী আর অবাক হয না। যে স্নেহ-মমতার ভিত্তি ভাবপ্রবণতা, তা যে বুদবুদের মতো অস্থায়ী শশী তা অনেক কাল জানে।

কদিন পরে সেনদিদি বলে, হ্যাঁ শশী, কাচের চোখ লাগালে টের পাবে না লোকে?

ভূমিকা নাই, সেদিনকার গালাগালির জন্য আপশোশ নাই, সোজা স্পষ্ট প্রশ্ন!

সহজে পাবে না,—টেব পেলেই বা কী এসে যায়? চোখটার জন্যে খাবাপ দেখাচ্ছে এখন, সেটা তো দেখাবে না।

কবে লাগাবে চোখ?

কাচের চোখের নামে সেদিন সেনদিদি খেপিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার আগ্রহ দ্যাখো! শশী শান্তভাবেই বলে, আমি তো পারব না সেনদিদি, আমার কাছে যন্ত্রপাতি নেই। বাজিতপুরে হবে কি না তাও জানি না। কলকাতা গিয়ে করাতে হবে, সময় লাগবে অনেক। আপনাব ভালো চোখটির সঙ্গে বংটং মিলিয়ে চোখ হয়তো তৈরি করেও নিতে হবে।

কবে নিয়ে যাবে কলকাতা?

এ কথা বলিতে সেনদিদির দ্বিধা হয না, সংকোচ হয় না! কত যেন দাবি তাহাব আছে শশীব উপর! প্রথমে শশীর রাগ হয়, তারপব মনে মনে সে হাসে। বলে, কবে যেতে পারব তা তো ঠিক নেই সেনদিদি। রোগী নিয়ে কী রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তো দেখতে পান? পুজোর আগে আমাব যাওয়া হবে কি না সন্দেহ, আর কারও সঙ্গে যান না?

সেনদিদি কাঁদোকাঁদো হইয়া বলে, আমার কে আছে শশী, কে আমাকে নিয়ে যাবে? আমি মরলে সবাই বাঁচে, কে আমার জন্যে এ সব হাঙ্গামা করবে? সময় করে একবারটি আমায় নিয়ে চল বাবা, চোখটা ঠিক করে আনি।

মুখের দাগ মিলাইয়া দিবার ওষুধও তাহাকে শশীর দিতে হয়। দুদিন না যাইতেই আসিয়া নালিশ জানায়, কই দাগ তো শশী মিলিয়ে যাচ্ছে না একটুও? কী রকম ওষুধ দিচ্ছ?

শশী ক্লান্তস্বরে বলে, যাবে সেনদিদি যাবে, বসন্তের দাগ কি এত শিগগির যায়?

যতদিন যায়, গ্রাম ছাড়িয়া নূতন জগতে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার কল্পনা শশীর মনে জোরালো হইয়া আসে। সে বুঝিতে পারিয়াছে জোর করিয়া সরিয়া না গেলে সে কোনোদিন এই সংকীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাইবে না। ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া চলিতে থাকিলে জীবন শেষ হইয়া আসিবে, তবু নাগাল মিলিবে না ভবিষ্যতের। তা ছাড়া জীবনে যে বিপুল ও মনোরম সমারোহ সে আনিতে চায় তাহা সম্ভব করিতে হইলে শুধু গ্রাম ছাড়িয়া গেলেই তাহার

চলিবে না, আত্মীয়বন্ধু সকলের সঙ্গে মনের সম্পর্কও তাহাকে ভুলিতে হইবে। এদের সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনের সুখ দুঃখের ঢেউ যদি তাকে নদীর বুকে মোচার খোলার মতো আন্দোলিত করে নূতন জীবনকে গড়িয়া তুলিবার শক্তি সে পাইবে কেন? যে আবেষ্টনীতে যে ভাবে সে বাঁচিতে চায় তার ব্যক্তিগত জীবনে তাহা বিপ্লবের সমান। এ বিপ্লব তাকে আনিতে হইবে একা, তারপর নবসৃষ্ট জগতে বাস করিতে হইবে একা,—সেখানে তো এদের স্থান নাই। বিন্দুর কথা ভাবিয়া সে যদি কাতর হইয়া থাকে, কুসুম গোপনে কাঁদে কি না আর মতি কোথায় গেল তাই ভাবে সর্বদা, সিন্ধুকে মনের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিল না ভাবিয়া ক্ষোভ করে, নিজের জীবনকে সে গুছাইবে কখন, কখন করিবে নিজের কাজ? যাদের সাহচর্য অশান্তিকর, যাদের সে কাছে চায় না, জীবনে সার্থকতা আনিতে হইলে নির্মমভাবে মন হইতে তাদের সরাইয়া দিতে হইবে।

যাদব বলেন, তা হবে না দাদা? বিবাগি হতে হলে মনে বিবাগ চাই। বাইশ বছর বয়সে এ গাঁয়ে এসে বাসা বাঁধলাম, কেউ জানে না কোথা থেকে এলাম কী বৃত্তান্ত। আমার সব ছিল শশী, বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব, চল্লিশ বছর কারও খবর রাখি না। বাপ মা মরেছে, খবরও পাইনি, শ্রাদ্ধও করিনি। ভাইবোন ছিল গোটাকতক, আছে না গেছে তাও জানি না। সে জন্য দুঃখ নেই শশী। নতুন ঘর বাঁধতে হলে পুরোনো খড়কুটো বাদ দিতে হবে না?

কষ্ট হয় না প্রথমে?—শশী বলে।

কদিন কষ্ট হয়? ভুলো মন মানুষের, দুদিনে ভুলে যায়। সহ্য হল না বলেই ছেড়ে এলাম না সকলকে?

পাগল দিদি হাসিয়া বলেন, সুখে শান্তিতে আছি এখেনে,—নয় গো?

চল্লিশ বছরের সুখশান্তি! কোন গ্রামে কী জীবন ছিল যাদবের কে জানে? বাইশ বছর বয়সে কীসের লোভে সে গৃহ ছাড়িয়াছিল? গৃহী সাধকের এই জীবন কি তখনও কাম্য ছিল যাদবের, দশটা গ্রামের ভয় ও শ্রদ্ধায় সকলের উপরের একটি আসন? তা যদি হয়, জীবনে তিনি অতুলনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া চারিদিকে নাম রটিয়াছে, পদধূলির জন্য সকলে লোলুপ।

ভালো করিয়া যাদবকে শশী কোনোদিন বুঝিতে পারে না। নিস্পৃহ নির্বিকার মানুষ, কারও প্রণাম গ্রহণ করেন না, ভক্তি-গদগদ কথা শুনিয়া অবিচলিত থাকেন, কত লোকে মন্ত্রশিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল, আজ পর্যন্ত একটি শিষ্যও করেন নাই। তবু, শশীর মনে হয়, প্রণাম যেন যাদব কামনা করেন। পদধূলি দেন না, আশীর্বাদ করেন না, পাষাণ দেবতার মতো উপেক্ষা করেন ভক্তিকে,—শশীর সন্দেহ জাগে লোকের মনে ভয় ও শ্রদ্ধা জাগানোর কৌশল এ সব। তবে তাতে কী আসিয়া যায়? মানুষের কাছে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকার অভ্যাস যে মিশিয়া আছে চল্লিশ বছরের সুখ শান্তির সঙ্গে। নির্লোভ সদাচারী শান্তিপূর্ণ নিরীহ মানুষ, মানুষের কাছে অপার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকিবার কামনাও পার্থিব কোনো লাভের জন্য নয়। ও যেন একটা শখ যাদবের, একটা খেয়াল।

পাগলদিদি আম কাটিয়া দেন শশীকে, একটা খোলা পুঁথির সামনে বসিয়া স্থূল শুভ্র উপবীতখানি যাদব আঙুলে জড়ান। দ্বিজত্বের এই চিহ্নটি শশী তাহার কখনও মলিন দেখিল না। শশীর দৃষ্টিপাতে যাদব হাসেন, পইতে কখনও মাজি না শশী।

মাজেন না?

না। ও কাজের বরাত দিয়েছি সূর্যকে।

সূর্যকে?—শশী সবিস্ময়ে বলে।

যাদব গম্ভীর মুখে বলেন, সূর্যকে। সূর্যবিজ্ঞান বিশ্বাস কর না তাই অবাক হও, নইলে এ তো তুচ্ছ! সূর্যবিজ্ঞান যে জানে তার উপবীত কখনও ময়লা হতে পারে? কী করি জান? স্নান করে উঠে রোজ একবার রোদে মেলে ধরি, ধবধবে সাদা হয়ে যায়। আজ খানিকটা বাদ পড়েছিল, কেমন ময়লা হয়ে আছে দ্যাখো—

যাদব পইতা মেলিয়া ধরেন, শশী লক্ষ করিয়া দ্যাখে রোদের পাশে ছায়ার মতো পইতার খানিকটা সত্যসত্যই নিষ্প্রভ, মলিন। সূর্যবিজ্ঞানে আর নিজের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় শশীর বিশ্বাস জন্মানোর জন্য কত যত্নে না জানি যাদব পইতার এই অংশটুকু পাতলা জল-মেশানো কালিতে ডুবাইয়াছেন, কালি যাতে বুঝা না যায়! শশীর হাসিও পায়, মায়াও হয়। তাকে অভিভূত করার জন্য এত ব্যাকুল প্রয়াস কেন যাদবের? অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাস করিলেও যাদবকে শ্রদ্ধা সে তো কম করে না!

যাদব বলেন, কত বললাম, শেখো, শশী শেখো, সূর্যবিজ্ঞানের ভূমিকাটুকু অন্তত শেখো, ওষুধের বাক্সো ঘাড়ে করে আর রোগী দেখে বেড়াতে হবে না। তা তো শিখলে না। যে বিজ্ঞানের ভিত্তিই মিথ্যে তাই নিয়ে মেতে রইলে। যাকে তাকে দেবার বিদ্যা এ তো নয়, সারা জীবনে একটি শিষ্য পেলাম না যাকে শিখিয়ে যেতে পারি। এদিকে সময় হয়ে এল যাবার। শুধু তুমি একটু শিখতে পার শশী, সবটা নয়, সবটা নেবার ক্ষমতা তোমারও নেই, শুধু ভূমিকাটুকু। তাই বা কজনে পায়? কায়মনোবাক্যে আজও তুমি ব্রহ্মচারী বলে—

বিব্রত, বিস্মিত শশী শুনিয়া যায়। এ ধরনের কথা যাদব মাঝে মাঝে বলেন, শশী সায়ও দেয় না, প্রতিবাদও করে না। যাদবের শান্ত ধূপগন্ধী ঘরে সে দুদণ্ডের জন্য জুড়াইতে আসে, তাকে এ সব অবিশ্বাস্য কাহিনি শোনানো কেন? সে কি শ্রীনাথ মুদি যে শুনিতে শুনিতে গদগদ হইয়া মুখে ফেনা তুলিবে?

শশীর অবিশ্বাস যাদব টের পান। শশীকে জয় করিবার জন্য তাঁর এত বেশি আগ্রহের কারণও বোধ হয় তাই।

বলেন, সূর্যবিজ্ঞান যে জানে, তার অসাধ্য কী? অতীত ভবিষ্যৎ তার নখদর্পণে। কবে কী ঘটবে জীবনে কিছুই তার অজানা থাকে না। মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত দশ-বিশ বছর আগে থেকে জেনে রাখতে পাবে।

পইতাটা যাদব আঙুলে জড়ান আর খোলেন। দুচোখ জ্বলজ্বল করে। সাধে কি ভীরু গ্রামবাসী ভয় করে যাদবকে! এমন জ্যোতিষ্মান চোখে চাহিয়া এমন জোরের সঙ্গে যাই তিনি বলুন, অবিশ্বাস করিবার সাহস কারও হওয়া সম্ভব নয়।

আপনি জানেন?—শশী জিজ্ঞাসা করে।

জানি না? বিশ বছর থেকে জানি।—বলেন যাদব।

হাসি পায় বলিয়া শশী ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, কবে?

যাদবও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, রথের দিন। আমি রথের দিন মরব শশী। কবে কোন সালের রথের দিন যাদব দেহত্যাগ করিবেন ঠিক হইয়া আছে, শশী আর সে কথা জিজ্ঞাসা করে না, কারণ কথাটা বলিয়াই যাদব হঠাৎ এমন ভীতভাবে স্তব্ধ হইয়া যান এবং পাগলদিদি এমনভাবে অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া ওঠেন যে শশী লজ্জা বোধ করে। অবিশ্বাসের পীড়নে উত্তেজিত করিয়া এমন অসাবধানে যাদবকে ও কথা বলানো তাহার উচিত হয় নাই। আর ছমাস এক বছরের বেশি গ্রামে শশী থাকিবে না এ কথা যাদব জানেন। তবু, তার মধ্যেই অসুখ-বিসুখ হইয়া যদি তিনি মরিতে বসেন আর শশীকেই তার চিকিৎসা করিতে আসিতে হয়, মরিতে বেচারির সুখ থাকিবে না!

কথাটা চাপা দিবার জন্য শশী অন্য কথা পাড়ে। বলে, জানেন পণ্ডিতমশায়, চলে আমি যাব ঠিক, কিন্তু কেমন ভয় হয় মাঝে মাঝে। শুধু শহরে গিয়ে ডাক্তারি করার ইচ্ছা থাকলে কোনো কথা ছিল না, এত বড়ো বড়ো কথা আমি ভাবি! বিদেশে যাব, ফিরে এসে কলকাতায বসব, মানুষের শরীর আব মনের রোগ সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণা করব, দেশ-বিদেশে নাম হবে, টাকা হবে—।

যাদব যেমন করিয়া সূর্যবিজ্ঞানের কথা বলিতেছিলেন, তেমনি ভাবে শশী এবার নিজের কল্পনার কথা বলে।

সেই হইল সূত্রপাত। রথের দিন দেহত্যাগ করিবার কথা যাদব যা বলিয়াছিলেন শশী জানে তা নেহাত কথার কথা, হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। হারু ঘোষের বাড়ি গিয়া কথায় কথায় পরানের কাছে এ গল্প সে কেন করিয়াছিল শশী জানে না। বোধ হয় কুসুমকে শোনানোর জন্য। যেখানে যা কিছু বিচিত্র ব্যাপার সে প্রত্যক্ষ করে পরানকে বলিবার ছলে কুসুমকে সে সব শোনানোর কেমন একটা অভ্যাস তাহার জন্মিয়া যাইতেছে।

তারপব কেমন করিয়া কথাটা যে ছড়াইয়া গেল। ছড়াইয়া গেল একেবারে দিগ্‌দিগন্তে। ঝোঁকের মাথায় শশীর কাছে যাদব যে অর্থহীন কথাটা বলিয়াছিলেন গ্রামে তাহা এমন আলোড়ন তুলিবে কে জানিত।

শশী বাজিতপুরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ছুটিয়া আসিল শ্রীনাথ। সত্যি ছোটোবাবু, দেবতা দেহ রাখবেন?

শশী বলিল, তুমি কি পাগল শ্রীনাথ? কথাব ছলে কী বলেছেন না বলেছেন—

শ্রীনাথ বলিল, কথার ছলেই তো বলবেন ছোটোবাবু, নইলে নিজে কি রটিয়ে বেড়াবেন! শুধু এই কথাটি আপনি বলেন ছোটোবাবু, নিজের মুখে দেবতা উচ্চারণ করেছেন কী রথের দিন দেহ রাখবেন?

শশী বলিল, বলেছেন বটে, কিন্তু কী জান—

হায় সব্বোনাশ!— বলিয়া শ্রীনাথ আকুল হইয়া ছুটিয়া গেল।

ব্যাপারটা যে এত বিরাট হইয়া উঠিবে তখনও শশী কল্পনা কবে নাই। নতুবা শ্রীনাথকে ডাকিয়া সে বলিযা দিত যে রথের দিন যাদব দেহ রাখিবে বলিয়াছেন বটে কিন্তু সে কোনো এক রথের দিন, আগামী রথ নয়, হাসপাতালে ভর্তি করিয়া দিবার জন্য একটি কঠিন অপারেশনের রোগীর সঙ্গে শশী বাজিতপুরে যাইতেছিল। রোগীটিব অবস্থা বড়ো শোচনীয়। হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত হইয়াছে কি না, পথেই যদি শেষ হইয়া যায় তবে বড়োই দুঃখের কথা হইবে, এই সব ভাবিতে ভাবিতে শশী অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল।

বাজিতপুরের সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে শশীর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি বদলি হইয়া যাইতেছেন। শশীকে সেদিন তিনি ফিরিতে দিলেন না। পরদিন গ্রামে ফিরিয়া কায়েতপাড়ার পথে লোকের ভিড় দেখিয়া শশী অবাক হইয়া গেল। যাদবের ভাঙা বাড়ির সম্মুখে অনেক লোক জমিয়াছে। যাদব বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন, পদধূলির জন্য সকলে কাড়াকাড়ি করিতেছে। সজল কণ্ঠে শ্রীনাথ করিতেছে হায় হায়।

একজন শশীকে বলিল, সামনের রথের দিন পণ্ডিতমশায় দেহ রাখবেন ছোটোবাবু।

সামনের রথের দিন? কে বললে এ কথা? শ্রীমুখে নিজেই বলেছেন। দূর গাঁ থেকে লোক আসছে ছোটোবাবু, খবর পেয়ে। শেতলবাবু এই মাত্তর ঘুরে গেলেন।

ওদিক দিয়া ঘুরিয়া শশী বাড়ির ভিতরে গেল। মেয়েরা দল বাঁধিয়া আসিতে শুরু করিয়াছিল, পাগলদিদি দরজা খোলেন নাই। শশীর ডাকাডাকিতে দুয়ার খুলিয়া দিলেন, কাঁদিয়া বলিলেন, ও শশী, এমন সর্বনাশ কেন করলি আমার, কেন রটালি ও কথা?

শশী বিবর্ণমুখে বলিল, আমি তো ও কথা রটাইনি পাগলদিদি!

পাগলদিদি বলিলেন, একদল লোক সঙ্গে নিয়ে শ্রীনাথ এসে কেঁদে পড়ল শশী, বলল তুই নাকি বলেছিস ওঁর নিজের মুখে শুনে গেলি এবার রথের দিন—

এবার রথের দিন? আমি তো বলিনি পাগলদিদি! পণ্ডিতমশায় স্বীকার করলেন?

পাগলদিদি সায় দিলেন।

শশী ব্যাকুল হইয়া বলিল, কেন তা করলেন? এ কী পাগলামি! পণ্ডিতমশায় বলতে পারলেন না এবারকার রথের কথা বলেননি?

কই তা বললেন? হাসিমুখে মেনে নিলেন। কী হবে এবার?

বাহিরের কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল, শশী দরজাটা ভেজাইয়া দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন দুর্বোধ্য মনে হইতেছিল শশীর! যাদবের সম্বন্ধে এ রকম একটা জনরব একেবারেই বিস্ময়কর নয়, মাঝে মাঝে তাঁর সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত কথা রটে। যাদব সমর্থন করিলেন কেন? মাথা তো খারাপ নয় যাদবের, পাগল তো তিনি নন! একদল লোক সঙ্গে করিয়া শ্রীনাথ আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল, অমনি কোনো কথা বিবেচনা করিয়া যাদব স্বীকার করিয়া বসিলেন যে আগামী রথের দিন তিনি স্বেচ্ছায় মরিবেন? এরকম স্বীকারোক্তির ফলাফলটা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না? কে জানে কী হইবে এবার! রথের দিন যাদব যদি না মরেন, মানুষের কাছে মিথ্যাবাদী হইয়া থাকিতে হইবে তাঁকে, তাঁর সিদ্ধিতে তাঁর শক্তিতে লোকের বিশ্বাস থাকিবে না,—যাদবের কাছে তাহা মৃত্যুর চেয়ে শতগুণে ভয়ংকর। মানুষের অন্ধ ভক্তি ছাড়া বাঁচিয়া থাকিবার আর তো কোনো অবলম্বন তাহার নাই! একথা যাদব কেন স্বীকার করিয়া লইলেন? বলিলেই হইত এ শুধু জনরব, ভিত্তিহীন গুজব। যাদবের কথা কে অবিশ্বাস করিত? রথের তো বেশি দিন বাকি নাই। সেদিন যাদব কেমন করিয়া মরিবেন? না মরিলে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন গ্রামে?

অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত যাদব বিশ্রামের জন্য ভিতরে আসিলেন। কয়েকটি ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আসিতেছিল, রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়া তাহাদের বাহির করিয়া করিযা কানি সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ভিড়ে, গরমে যাদব ঘামিয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিলেন, পাগলদিদি তাড়াতাড়ি পাখা আনিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন। ফোকলা মুখের চিরন্তন হাসিটি তাঁহার নিভিয়া গিয়াছে। দুচোখ ভরা জল—বার্ধক্যের স্তিমিত দুটি চোখ।

এ কী করলেন পণ্ডিতমশায়? স্বীকার করলেন কেন? ব্যাকুলভাবে শশী জিজ্ঞাসা করিল।

কেন করলাম? রথের দিন মরব যে আমি! বলিনি তোমাকে? শান্তভাবে জবাব দিলেন যাদব।

এবারকার রথের কথা তো বলেননি আমাকে?

বলেছিলাম বইকী। এবারকার রথের কথাই বলেছিলাম। তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন শশী? আমার কাছে কি জীবন মরণের ভেদ আছে? গুরুর কৃপায় সূর্যবিজ্ঞান যেদিন আয়ত্ত হল, যেদিন সিদ্ধিলাভ করলাম, ও পার্থক্য সেদিন ঘুচে গেছে শশী। এমনি হিসাবও যদি ধর, মরবার বয়েস কি আমার হয়নি?

শশী কাতর হইয়া বলিল, আমার জন্যেই এ কাণ্ড হল। আমার যে কী রকম লাগছে পণ্ডিতমশায়—

যাদব হাসিয়া বলিলেন, বাসাংসি জীর্ণানি ...

শশীর মনে পড়িতেছিল, সেদিন রাত্রির কথা, কলিকাতা ফেরত যাদব শ্রীনাথের দোকান হইতে সাপের ভয়ে যেদিন লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাড়ি আসিয়াছিলেন। জীবনের সেই ভীবু মমতা কোথায় গেল যাদবের? কোথা হইতে আসিল মৃত্যু সম্বন্ধে এই প্রশান্ত ঔদাস্য? যাদবের সম্বন্ধে সে কি আগাগোড়া ভুল কবিয়াছে? লোকে যে অলৌকিক শক্তির কথা বলে সত্যই কি তা আছে যাদবের? খানকয়েক ডাক্তারি বইপড়া বিদ্যায় হয়তো এ সব ব্যাপারের বিচার চলে না, হয়তো তার অবিশ্বাস শুধু অজ্ঞানতার অন্ধকার!

অনেক যুক্তিতর্ক অনুরোধ উপরোধেও যাদবকে শশী কিছুতেই টলাইতে পারিল না। আগামী রথের কথা বলেন নাই এ কথা তিনি কিছুতেই স্বীকার করিলেন না। শশী কোনো ক্ষতি করে নাই। কথাটা না রটিলেও রথেব দিন তিনি অবশ্যই দেহত্যাগ করিতেন। জনরব তুলিয়া দিয়া শশী যদি তার কোনো অসুবিধা করিয়া থাকে তা শুধু এই যে লোকে পদধূলির জন্য জ্বালাতন করিতেছে. আর কিছু নয়।

কিছুতেই এ মতলব ছাড়বেন না পণ্ডিতমশায়?

তাই কী হয শশী? বিশ বছর আগে থেকে এ যে ঠিক হয়ে আছে।

কই পাগলদিদি তো কিছু জানতেন না?

ওকে কি বলেছি যে জানবেন? সময় এগিয়ে এসেছে তাই কথায় কথায় সেদিন তোমায় বললাম। নইলে একেবারে সেই যাবাব দিন বলে বিদায় নিতাম।

শশী উদ্‌ভ্রান্ত মিনতিব সঙ্গে বলিল, মনের জোরে আপনি তো মরাব দিন পিছিয়েও দিতে পারেন? তাই বলুন না সকলকে? বলুন যে আপনার অনেক কাজ বাকি, তাই ভেবে-চিন্তে দুচাব বছর পিছিযে দিলেন দিনটা?

কথাটা বোধ হয় যাদবের মনে লাগে। উৎসুক দৃষ্টিতে তিনি শশীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকেন, শশীর মনে হয একটি ফাঁদে পডা জীব যেন হঠাৎ বেড়ার গাযে ছোটো একটি ফাঁক দেখিতে পাইযাছে। তাবপব আত্মসংবরণ করিযা যাদব মাথা নাড়েন।

লোকে হাসবে শশী, টিটকাবি দেবে।

বলিয়া তাড়াতাড়ি যোগ দেন, সে জন্যও নয়। যোগ-সাধন করে যে সব শক্তি পাওয়া যায়, ভগবানেব নিয়মকে ফাঁকি দেবার জন্য তার ব্যবহার নিষেধ শশী।

একে ওকে জিজ্ঞাসা কবিয়া সারা দিনেব চেষ্টায় শশী কিছু কিছু বুঝিতে পাবিল, বিনা প্রতিবাদে যাদব কেন জনরবকে মানিযা লইয়াছেন। কথাটা ছড়াইয়াছিল পল্লবিত হইয়া ভক্তদের মধ্যে অনেকে জানিত, যাদব বহুদিন হইতে শশীকে শিষ্য কবিবার চেষ্টা করিতেছেন, শশীর এ সৌভাগ্যে তাহারা হিংসা করিয়াছে। কাল কুসুম নাকি ব্যস্ত ও উত্তেজিত ভাবে বলিয়া বেড়াইয়াছিল যে স্নান করিয়া পাগলদিদিকে সে একবার প্রণাম করিতে গিয়াছিল, স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছে রথের দিন মরিবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য শশীকে যাদব পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এ সব ছাড়া আরও অনেক কথাই বটিয়াছিল। তবু, তখনও জনরবটা অস্বীকার করিবার উপায় হয়তো থাকিত যাদবের। বাজিতপুর যাওয়ার আগে শ্রীনাথকে শশী যা বলিয়া গিয়াছিল তাহাই যাদবের সবচেয়ে বড়ো বিপদের কারণ হইয়াছে। শশীর কথা সহজে লোকে অবিশ্বাস করে না। তা ছাড়া, যাদবের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়াই লোকে তাহাকে জানে। তবু, শশী গ্রামে থাকিলে যাদব হয়তো স্বীকার করিবার আগে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, বলিতেন, এরা কী বলছে শোনো শশী। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নাই। গ্রামে আলোড়ন তুলিয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল, তারপর সারা জীবনের চেষ্টায় গড়িয়া তোলা মানুষের

অস্বাভাবিক ভক্তি ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে, খানিকটা এই ভক্তি বাড়ানোর লোভে, যাদব জনমতের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন।

শ্রীনাথ আসিয়া সদলে কাঁদিয়া পড়িবার সময় যাদবের মনের ভাব কী রকম হইয়াছিল শশী কিছু কিছু অনুমান কবিতে পারে। রথের দিন মরিবার কথা শশীকে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সে কথা যাদবের স্মরণ ছিল। শশীর কথায় গ্রামের লোক কতখানি বিশ্বাস রাখে তাও তিনি মনে রাখিয়াছিলেন। শশী গ্রামে নাই শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন, এখন যদি তিনি অস্বীকার করেন যে আগামী রথের দিন মরিবার কথা শশীকে বলেন নাই, শশী গ্রামে ফিরিবামাত্র সকলে তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবে। হয়তো ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া কেহ বাজিতপুরে ছুটিয়া গিয়াও শশীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিবে। ব্যাপারটির গুরুত্ব শশী কিছু বুঝিতে পারিবে না, একবার সে যা বলিয়াছে আবার সেই কথাই বলিবে। লোকে তখন মনে করিবে, হয় শশী মিথ্যাবাদী—নয় যাদব নিজে।

আরও কত কী হয়তো যাদব ভাবিয়াছিলেন। হয়তো জনরবের পিছনে কীরূপ এবং কতখানি শক্তি আছে বুঝিতে না পারিয়া যাদবের ভয় হইযাছিল যে বিরোধিতা করিলে জীবন অপেক্ষা যাহা তাঁর প্রিয় তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হয়তো সমবেত মানুষগুলির উচ্ছ্বাস নেশার মতো আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল যাদবকে। ভাবিবার তাঁহার সময় থাকে নাই।

শশী কুসুমকে বলিল, মিথ্যে কথাগুলো বলে বেড়ালে কেন বউ?

কুসুম বলিল, বলতে কেমন ইচ্ছে হচ্ছিল ছোটোবাবু, তাই।

মাথাটা তোমার খারাপ নাকি সময় সময় তাই ভাবি বউ, অবাক মানুষ তুমি।

কয়েকটা দিন চলিয়া গেল। কলিযুগের ইচ্ছা-মৃত্যু মহাপুরুষ যাদবকে দেখিবার জন্য নিকট ও দূরবর্তী গ্রামের লোক কায়েতপাড়ার পথটিকে জনাকুল করিয়া রাখিল। মুড়ি চিঁড়া বেচিয়া শ্রীনাথ আর লোচন ময়রা বোধ হয় বড়োলোকই হইয়া গেল। শ্রীনাথ দুহাতে মুড়ি চিঁড়া বেচে, দুহাতে পয়সা লইয়া কাঠের বাক্‌সে রাখে, সর্বক্ষণ হায় হায় করে। কয়েক দিনে পাগলদিদি শীর্ণ হইয়া গেলেন। শশীর মনেও গুরুভার চাপিয়া আছে। রথের দিন কী হইবে সে বুঝিতে পারে না। সত্যই কি মনের জোরে যাদব সেদিন দেহত্যাগ করিতে পারিবেন? এ যে বিশ্বাস করা যায় না! না মরিলেই বা যাদবের কী অবস্থা হইবে?

যেখানে যায় শশী, এই কথাই আলোচিত হইতে শুনিতে পায়। যাদব মরিবেন বলিয়া অনেকেরই আপশোশ নাই, সাগ্রহে রথের দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছে। শশীর চুপ করিয়া থাকিতে হয়। মিথ্যার ভিত্তিতে যে এত বড়ো ব্যাপারটা গড়িয়াছে, মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এই জনমতের উৎস সে, কিন্তু এ গুজবকে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে শুকনো চালে আগুন ধরিয়াছে, কারও ক্ষমতা নাই আগুন নিভাইতে পারে। একটা অদ্ভুত অসহায়তার উপলব্ধি হয় শশীর। প্রাত্যহিক জীবনে যাদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না মানুষের, তাদের সমবেত মতামত যে কতদূর অনিবার্য একটা অন্ধ নির্মম শক্তি হইয়া উঠিতে পারে, আজ সে তাহা প্রথম বুঝিতে পারে।

যাদবের বাড়ি গিয়া শশী বসে, যাদবের ভাব লক্ষ করে। মনে হয় কী একটা তীব্র নেশায় যাদব আচ্ছন্ন, অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটা যেন তার কাছে ক্রমে ক্রমে পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে। বিশ্রাম করিতে কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে আসেন, তারপর আবার বাহিরে গিয়া দর্শনার্থীদের সামনে বসেন, মুখ দিয়া ফোয়ারার মতো ধর্ম ও দর্শন, যোগ ও সাধনার কথা বাহির হয়,—সে সব অপূর্ব বাণী শুনিয়া শশী অবাক মানে। কী এক অত্যাশ্চর্য প্রেরণা যেন আসিয়াছে যাদবের।

মুখের উপদেশ শুনিয়া অভিভূত হইয়া যাইতে হয়, এক অপরূপ আনন্দে অন্তর ভরিয়া যায়, এক অনায়ত্ত অধ্যাত্ম জগতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা জাগে অপরিসীম।

পাগলদিদি কাতরকণ্ঠে বলেন, এ কী হল শশী?

শশী চুপচাপ ভাবে। একদিন সে যাদবকে বলে, পণ্ডিতমশায়, রথের দিন আমাদের ছেড়ে যাবেন যদি ঠিক করেই থাকেন, এখানে থেকে কী করবেন? পুরী চলে যান না? রথের আসল উৎসব হয় সেখানে, এখানে তো কিছুই নেই। বাবুদের বথ সবচেয়ে বড়ো তাও তিন হাতের বেশি উঁচু হবে না। আপনাব পুরী যাওয়াই উচিত।

যাদবের যেন চমক ভাঙে।—পুবী যেতে বলছ?

শশীর ভয় হয় যে পুরী যাইতে বলার আসল অর্থ যাদব হয়তো বুঝিতে পারেন নাই। কত ভাবিয়া যাদবের সমস্যার এই সমাধান সে আবিষ্কার করিয়াছে! পুরী যান বা না যান যাদব, এত বড়ো দেশটা পড়িয়া আছে, পুরী যাওয়ার নাম করিয়া যেখানে খুশি তিনি চলিয়া যাইতে পারেন, বাস করিতে পারেন অজানা দেশে অচেনা মানুষের মধ্যে, রথের দিন না মরিলেও যেখানে তাঁহার লজ্জা নাই। স্পষ্ট করিয়া যাদবকে কথাটা বুঝাইয়া বলা যায় না। ভান তো যাদব শশীর কাছেও বজায় রাখিয়াছে। সে ইঙ্গিতে বলে, জিনিসপত্র নিয়ে পাগলদিদিকে সঙ্গে করে পুরীই চলে যান পণ্ডিতমশায়,—গাঁয়ের লোক হইচই করে যে কষ্টটা আপনাকে দিচ্ছে! শেষ সময়টা স্বস্তি পাচ্ছেন না। সেখানে কেউ আপনাব নাগাল পাবে না।

পাগলদিদি মেঝেতে এলাইয়া পড়িয়া ছিলেন, সহসা উঠিয়া বসেন। যাদব সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকেন শশীর দিকে। শশী আবার ইঙ্গিতে বলে, পুরী যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়ুন। তারপর পুরীই যে আপনাকে যেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই? অন্য কোনো তীর্থে যেতে চান, পথে মত বদলে তাই যাবেন। অচেনা লোকের মধ্যে শেষ কটা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবেন। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে শশী,—এ ছাড়া গাঁয়ের লোকেব হাত থেকে আপনাব রেহাই পাবার আর তো কোনো পথ দেখতে পাই না।

কী বলছ শশী? শেষকালে পালিয়ে যাব?—যাদব বলেন।

পালিয়ে কেন? তীর্থে যাবেন।—বলে শশী।

যাদব কী ভাবেন কে জানে, দপ করিয়া জ্বলিয়া ওঠেন আগুনের মতো। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলেন, আমার সঙ্গে তুমি পরিহাস করছ শশী, ঠাট্টা জুড়েছ! আমি ভণ্ডামি আরম্ভ করেছি ভেবে নিয়েছ, না? কোনোদিন আমাকে তুমি বিশ্বাস করনি, চিরকাল ভেবে এসেছ আমার সব ভড়ং,—লোক ঠকিয়ে আমি জীবন কাটিয়েছি! দুপাতা ইংরেজি পড়ে সবজান্তা হয়ে উঠেছ, এ সব তুমি কী বুঝবে? কী তুমি জান যোগসাধনের? তুমি তো ম্লেচ্ছাচারী নাস্তিক! স্নেহ করি বলে কখনও কিছু বলিনি তোমাকে,—উপদেশ দিয়ে ধর্মের কথা বলে বরং চেষ্টাই করেছি যাতে তোমার মতিগতি ফেরে। আসল শয়তান বাস করে তোমার মধ্যে, আমার সাধ্য কী কিছু করি তোমার জন্যে। যাও বাপু তুমি সামনে থেকে আমার, তোমার মুখ দেখলে পাপ হয়।

কে জানিত শশীকে যাদব এমন করিয়া বকিতে পারেন!

এ জগতে পাগলদিদির পর সে-ই তার সব চেয়ে স্নেহের পাত্র!

মুখ দেখিলে পাপ হয়! ম্লেচ্ছাচারী, নাস্তিক। মরণ অথবা অপযশের মধ্যে একটা যাকে বাছিয়া লইতে হইবে কদিনের মধ্যে, তাকে বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিতে যাওয়ার কী অপরূপ পুরস্কার! যাদবের তিরস্কারে শশী ছেলেমানুষের মতো দুঃখে অভিমানে কাতর হইয়া থাকে।

তবে কি যাদব সত্যই রথের দিন দেহত্যাগ করিবেন? মৃত্যুর ওই দিনটি যে তাঁহার নির্ধারিত হইয়া আছে, যোগের শক্তিতে বহুদিন হইতেই যাদব তবে তাহা জানিয়া রাখিয়াছিলেন? তা যদি হয় তবে সন্দেহ নাই যে সে ম্লেচ্ছাচারী নাস্তিক। এখনও তো তাহার বিশ্বাস হয় না যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় মরিতে পারে, মরিবার আগে জানিতে পারে কবে মরণ হইবে।

বিশ্বাস হয় না, তবু শশীর মনের আড়ালে লুকানো গ্রাম্য কুসংস্কার নাড়া খাইয়াছে। এক এক সময় তাহার মনে হয়, হয়তো আছে, বাঁধা যুক্তির অতিরিক্ত কিছু হয়তো আছে জগতে, যাদব আর যাদবের মতো মানুষেরা যার সন্ধান রাখেন। দলে দলে লোক আসিয়া যে যাদবের পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে, এদের সকলেরই বিশ্বাস কি মিথ্যা? সাধারণ মানুষের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু যদি নাই থাকে যাদবের মধ্যে, এতগুলি লোক কি অকারণে এমনই পাগল হইয়া উঠিয়াছে? দশ-বারো ক্রোশ দূরবর্তী গ্রাম হইতে সপরিবারে গৃহস্থ আসিয়াছে, বাসা বাঁধিয়া আছে গাছতলায়। কত নরনারীর চোখে শশী জল পড়িতে দেখিয়াছে। কায়েতপাড়ার পথে নামিয়া দাঁড়াইলেই মনে হয় এ যেন তীর্থ। সকল বয়সের যে সমস্ত নরনারী এদিক ওদিক বিচরণ করিতেছে, প্রাত্যহিক জীবনের হিংসা দ্বেষ স্বার্থপরতার সঞ্চিত গ্লানি তারা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে, ভুলিয়া গিয়াছে পার্থিব সুখের কামনা, লাভের হিসাব। হয়তো সাময়িক, ফিরিয়া গিয়া সংকীর্ণ জীবনের কদর্যতায় আবার সকলে মুখ গুঁজিয়া দিবে, তবু ওদের মুখের উৎসুক একাগ্রতা আজ তো মুগ্ধ করিয়া দেয়।

সকলে যাদবকে লইয়া ব্যাপৃত থাকায় শশীর সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হইয়াছে কুসুমের। সে উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে বলে, মুখ এত শুকনো কেন?

মনটা ভালো নেই বউ।

ওমা, কী হল মনের?

শশী বিরক্ত হইয়া বলে, তোমার কাছে অত কৈফিয়ত দিতে পারব না বউ।

কুসুম সগর্বে মাথা তুলিয়া বলে, কৈফিয়ত কেউ চায়নি আপনার কাছে। মুখ শুকনো দেখে মায়া হল, তাই জানতে এলাম অসুখ-বিসুখ হয়েছে না কি। সংসারে, জানেন ছোটোবাবু, যেচে মায়া করতে গেলে পদে পদে অপমান হতে হয়। আমি এদিকে চলে যাচ্ছি বাপের বাড়ি, কৈফিয়ত চাইব!

শশী নরম হইয়া বলে, গাঁয়ে এত বড়ো একটা ব্যাপার ঘটছে, দেখা হলে ও বিষয়ে তুমি কিছুই বল না,—শুধু আমার আর তোমার নিজের কথা। বলবার কি আর কথা নেই জগতে?

নেই? কত আজেবাজে কথা আছে সীমা নেই তার।

বলিয়া কুসুম হাসে। শশী বলে, হালকা ভাবটা একটু কমাও বউ। বাপের বাড়ি যাবে তা তো শুনছি ঢের দিন থেকে, যাওয়া তো হয় না।

কুসুম সপ্রতিভ ভাবেই বলে, যেতে যে পারি না।

তারপর বলে, যে সব মজার কাণ্ড গাঁয়ে। সত্তর বছরের একটা বুড়ো মরবে, তাই নিয়ে দশটা গাঁয়ের লোক হইহই করছে। বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব!

কুসুমের এ ধরনের কথাবার্তা শশীর যে খুব ভালো লাগিল তা নয়, তবু একা একা ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে যে বদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, খানিকটা খোলা বায়ু আসিয়া তা যেন কিছু হালকা করিয়া দিল। তাই বটে। এত সে বিচলিত হইয়াছে কেন একটা গ্রাম্য ব্যাপারে? মরেন তো মরিবেন যাদব, তার কী আসিয়া যায়? দুদিন পরে এ গাঁয়ে বাস করিবার স্মৃতিটুকু মনে আনিবার সময়ও কি থাকিবে তাহার?

বিকালে সেদিন শ্রীনাথ আসিয়া শশীকে ডাকিয়া গেল। পরদিন আসিলেন পাগলদিদি স্বয়ং। না গিয়া শশীর উপায় থাকিল না।

পাগলদিদি বলিলেন, তীর্থে যাবার কথা তো বলে এলি ভাই, গিয়ে কী হবে? দল বেঁধে গাঁয়ের লোক সঙ্গে যাবে। এত লোক দিনরাত পাহারা দিচ্ছে, সকলের নজর এড়িয়ে পালাবো কোথা?

একটু যেন গা-ছাড়া দিয়া উঠিয়াছেন পাগলদিদি, কোনো দিকে আশার আলো দেখিতে পাইয়াছেন কিনা কে জানে! মুখখানা খুব বিষণ্ণ কিন্তু শান্ত, ভয় ও উদ্‌বেগের ছাপটা মুছিয়া গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলেন, পালিয়ে গিয়েই বা কী হবে বল? ক বছর বা আর বাঁচব। বিদেশে নতুন লোকের মধ্যে কত কষ্ট হবে, মনে একটা আপশোশ থাকবে। অমন করে দুটো একটা বছর বেশি বেঁচে থেকে সুখটা কী হবে, তাই ভাবি। তার চেয়ে এ ভাবে যাওয়া ঢের বেশি গৌরবের।

শশী বলিল, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় যখন খুশি কেউ কি যেতে পারে দিদি?

ও যে সিদ্ধি লাভ করেছে রে পাগল! ওর অসাধ্য কিছু আছে?

পাগলদিদি বোধ হয় লুকাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিবামাত্র একদল নরনারী আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিল। শশীর সঙ্গে অতি কষ্টে বাড়িতে ঢুকিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভিড় পাগলদিদির সহ্য হয় না। তাঁহাকে দেখিবার জন্যও জনতা চেঁচামেচি করে কিন্তু তিনি কখনও বাহিরে আসেন না। তেল সিঁদুর হাতে করিয়া মেয়েরা তাহার রুদ্ধ দরজার সম্মুখ হইতে ফিরিয়া যায়।

যাদব ভিতরে আসিয়া বলিলেন, শশী এসেছ? সেদিন একটু বকেছিলাম বলে রাগ করে কদিন আর দেখা দিলে না ভাই? তোমার কথা ভাবছিলাম শশী। কত ক্ষতি করে গিয়েছিলে সেদিন, তোমার সে ধারণা নেই, মায়ার বশে কুপরামর্শ দিয়ে গেলে, থেকে থেকে কথাটা বিমনা করে দিয়েছে। সহজে তুচ্ছ তো করতে পারি না তোমার কথা!

অনেক কথা বলেন যাদব। তিনি তো চলিলেন, পাগলদিদিকে শশী যেন দেখাশোনা করে। এতকাল অসুখ-বিসুখ হইলে সূর্যবিজ্ঞানের জোরে আরোগ্য তিনিই করিয়াছেন, এবার হয়তো শশীর ওষুধ খাইতে হইবে।—শিখলে পারতে শশী সূর্যবিজ্ঞান। বামুনের ছেলে নও, মন্ত্রশিষ্য তোমাকে করতে পারি না, বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতে পারতাম। শিখবে? যাদব হাসিলেন।—আর তো শেখবার সময় নেই শশী!

রথের দুদিন আগে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল, সেদিনও সকালের দিকে কখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িল, কখনও মেঘলা করিয়া রহিল। আগের দিন সন্ধ্যা হইতে সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছিল, সারারাত্রি এক মুহূর্ত বিরাম হয় নাই। সকালবেলা নূতন নূতন লোক আসিয়া দল ভারী করিয়াছে, কীর্তন আরও জাঁকিয়া উঠিয়াছে। যাদব স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, সকলে ফুলের মালায় তাহাকে সাজাইয়াছে। পাগলদিদিও আজ রেহাই পান নাই, তার গলাতেও উঠিয়াছে অনেকগুলি ফুলের মালা। তবে তেল সিঁদুর দেওয়া সধবারা বন্ধ করিয়াছে। আজ যার বৈধব্যযোগ তাঁকে ও সব আর দেওয়া যায় না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে যাদবের বাড়ির সামনে আর কায়েতপাড়ার পথে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। গাওদিয়া, সাতগাঁ আর উখারা গ্রামের একদল ছেলে ভলান্টিয়ার হইয়া কাজ করিতেছে, উৎসাহ তাদেরই বেশি। বাঁশ বাঁধিয়া দর্শনার্থী মেয়ে-পুরুষের পথ পৃথক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভাঙা দাওয়ায় যাদবের বসিবার আসন। অঙ্গনে কয়েকটা চৌকি ফেলিয়া গ্রামের মাতব্বরেরা বসিয়াছেন। তাদের হুঁকা টানা ও আলাপ-আলোচনার ভঙ্গি উৎসব বাড়ির মতো,—যেন বিবাহ উপনয়ন সম্পন্ন করাইতে আসিয়াছেন। শীতলবাবু ও বিমলবাবু সকালে একবার আসিয়াছিলেন, দুপুরে আবার আসিলেন। বাবুদের বাড়ির মেয়েরা আসিলেন অপরাহ্নে। যাদব এবং পাগলদিদির তখন মুমূর্ষু অবস্থা।

শশী আগাগোড়া দুজনকে লক্ষ করিয়াছিল। বেলা এগারোটার পর হইতে দুজনেই ধীরে ধীরে নিস্তেজ ও নিদ্রাতুর হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া মনের মধ্যে তাহার আরম্ভ হইয়াছিল তোলপাড়। আরও খানিকক্ষণ পরে শশীর দিকে ঢুলুঢুলু চোখ মেলিয়া একবার মাত্র চাহিয়া যাদব এক অদ্ভুত

হাসি হাসিয়াছিলেন, পাগলদিদি তখন চোখ বুজিয়াছেন। যাদবের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল চটচটে ঘামে আর কালিমায়, চোখের তারা দুটি সংকুচিত হইয়া আসিয়াছিল। তিন-চার হাজার ব্যগ্র উত্তেজিত লোকের মধ্যে ডাক্তার শুধু শশী একা, সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তবু পলক সে ফেলিতে পারে নাই। যাদব ও পাগলদিদির দেহে পরিচিত মৃত্যুর পরিচিত লক্ষণগুলির আবির্ভাব একে একে চাহিয়া দেখিয়াছিল।

সকলে যখন টের পাইল যাদবের সঙ্গে পাগলদিদিও পরলোকে চলিয়াছেন, যাদবের আগেই হয়তো তাহাব শেষ নিশ্বাস পড়িবে, চারিদিকে নূতন করিয়া একটা হইচই পড়িয়া গেল। ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ একেবারে যেন খেপিয়া উঠিল! ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় এতক্ষণ সকলের দর্শন ও প্রণাম শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবেই চলিতেছিল, এবার আর কাহাকেও সংযত করা গেল না! যাদব আর পাগলদিদি বুঝি পিষিয়াই যান ভিড়ে। পাগলদিদির দুটি পা ঢাকিয়া গেল সিঁদুরে।

তারপর ছেলেদের চেষ্টায় জনতা ঠেকাইবার ব্যবস্থা হইলে শয্যা রচনা করিয়া পাশাপাশি দুজনকে শোয়ানো হইল। কায়েতপাড়ার সংকীর্ণ পথে কোনোবার রথ চলে নাই, শীতলবাবুর হুকুমে বেলা প্রায় তিনটার সময় বাবুদের রথটি অনেক চেষ্টায় যাদবের গৃহের সম্মুখ পর্যন্ত টানিয়া আনা হইল। পাগলদিদিকে কোনোমতে চোখ মেলানো গেল না, যাদব কষ্টে চোখ মেলিয়া একবার চাহিলেন। চোখের তারা দুটি এখন তাহার আরও ছোটো হইয়া গিয়াছে।

তারপর যাদবও আর সাড়া-শব্দ দিলেন না। সকলে বলিল, সমাধি। পাগলদিদি মারা গেলেন ঘণ্টাখানেক পরে, ঠিক সময়টি কেহ ধরিতে পারিল না। একটি ব্রাহ্মণ সধবা গঙ্গাজলে মুখের ফেনা ধুইয়া দিলেন। যাদবের শেষ নিশ্বাস পড়িল গোধূলিবেলায়।

শশীর স্পর্শ করিবার অধিকার নাই! তফাৎ হইতে সে ব্যাকুলভাবে বলিল, ওঁর মুখে কেউ গঙ্গাজল দিন।

সত্যি-মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা। যারা যাদব ও পাগলদিদির পদধূলি মাথায় তুলিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাদের মধ্যে কে দুজনেব মৃত্যুরহস্য অনুমান কবিতে পারিবে? চিরদিনের জন্য এ ঘটনা মনে গাঁথা হইয়া রহিল,—এক অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্যের স্মৃতি। দুঃখ যন্ত্রণার সময় এ কথা মনে পড়িবে। জীবন বৃক্ষ নীরস হইয়া উঠিলে এ আশা করিবাব সাহস থাকিবে যে খুঁজিলে এমন কিছুও পাওয়া যায় জগতে, বাঁচিয়া থাকার চেয়ে যা বড়ো। শোক দুঃখ, জীবনের অসহ্য ক্লান্তি এ সব তো তুচ্ছ, মরণকে পর্যন্ত মানুষ মনের জোরে জয় করিতে পারে। কত সংকীর্ণ দুর্বল চিত্তে যে যাদব বৃহতের জন্য, মৃদু হোক, প্রবল হোক, ব্যাকুলতা জাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শশী তাই ভাবে। যখন ভাবে, তখন আফিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম, বিন্দুর মতো ছোটো হইয়া আসা চোখের তারকা আর মুখে ফেনা উঠিবার কথা সে ভুলিয়া যায়।

বর্ষা আসিয়াছে। খালে জল বাড়িল, ডোবা পুকুর ভরিয়া উঠিল। চারিদিকে কাদা, ডাঙা পথে কোথাও যাওয়া মুশকিল। পালকি-বেহারাদের পা কাদায় ডুবিয়া যায়, খুব ধীরে ধীরে চলিতে হয়। এমনি বৃষ্টিবাদলের মধ্যে একদিন কুসুমের বাবা মেয়েকে লইতে আসিল। সেইদিন তালপুকুরের ধারে কুসুম কেমন করিয়া পড়িয়া গেল সেই জানে। বলিল, কোমরে চোট লাগিয়াছে আর হাতটা গিয়াছে ভাঙিয়া।

কী করে যাব, তোমার সঙ্গে? আমি তো যেতে পারব না বাবা! পুজোর সময় এসে আমায় নিয়ে যেয়ো।

কুসুমের বাবা অনন্ত আপশোশ করিয়া বলিল, কত কাল যাওয়া হয়নি, তোর মা কাঁদাকাটা করেন কুসি। দুটো দিন বরং দেখে যাই, ব্যথাটা যদি কমে।

কুসুম বলিল, দুচার দিনে এ ব্যথা কি কমবে বাবা? কোমরের ব্যথায় নড়তে পারি না। হাড়টাড় কিছু ভেঙেছে নাকি কে জানে!

হাতটা সত্যই মচকাইয়া গিয়াছিল। শশী আসিয়া পরীক্ষা করিবার সময় এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছে করে পড়নি তো বউ?

কী যে বলেন ছোটোবাবু! ইচ্ছে করে পড়ে কেউ কোমর ভাঙে?

হাতে তবে তোমার কিছু হয়নি, শুধু কোমর ভেঙেছে না?

হাতও ভেঙেছে।—কুসুম বলিল।

শশী হাতটা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, কই, বেশি ফোলেনি তো?

কুসুম রাগিয়া বলিল, আবার কী ফুলবে ছোটোবাবু, ফুলে কি ঢাক হবে?

পরদিন দুপুরবেলা আকাশ-ঢাকা মেঘে চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। শশী বসিয়াছিল নিজের ঘরে। গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইবার কথা ছিল, মেঘ দেখিয়া বাহির হয় নাই। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে জোরে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। পরক্ষণে আসিল কুসুম। হাতের ব্যথা সহিতে না পারিয়া ওষুধ লইতে আসিয়াছে।

শশী বলিল, হাতে এমন কী ব্যথা হল যে এই বৃষ্টি মাথায় করে ওষুধ নিতে এলে? এলেই বা কী করে? কোমর না তোমার ভেঙে গেছে?

কুসুম অস্পষ্টভাবে বলিল, কষ্ট করে এলাম।

কেন তা এলে? বিকেলে আমিই তো যেতাম।

সইতে পারি না ছোটোবাবু।

এবার শশী একটু বিবর্ণ হইয়া গেল। চিরকাল এমন ভাবে চলিবে না সে জানিত, একদিন ছেলেখেলায় আর কুলাইবে না। তবু, এমন বাদলায় কুসুম বোঝাপড়া করিতে আসিল? কুসুমকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাসা ভাসা হালকা ভাবের আড়াল দিয়া এই দিনটিকে এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা বড়ো নির্মম। কুসুম যে এতদিন সহ্য করিয়াছে তাই আশ্চর্য। যাই থাক তার মনে, কুসুমের কী আসিয়া যায়? সে কেন চিরকাল তার ভীরু নীরবতাকে প্রশ্রয় দিয়া যাইবে? দীর্ঘকাল ধরিয়া কুসুমের প্রতি নিজের অন্যায় ব্যবহার মনে করিয়া শশীর লজ্জা বোধ হইল।

মৃদুস্বরে সে বলিল, কিছু মনে কোরো না বউ, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কুসুম কথা বলিল না। শশী যেন তাতে আরও বিবর্ণ হইযা গেল। জানালা দিয়া ঘরে ছাঁট আসিতেছিল। উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া এতক্ষণে সে হঠাৎ অত্যন্ত বেখাপ্পা ভদ্রতা করিয়া বলিল, বোসো না বউ, বোসো ওইখানে।

কুসুম বসিল এবং বসিয়া যেন বাঁচিল। শশী আরও মৃদুস্বরে বলিল, অনেক দিন থেকে তোমায় কটা কথা বলব ভাবছিলাম বউ। বলি বলি করে বলতে পারিনি। বলা কিন্তু দরকার,—নয়? আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? বুঝেসুঝে করা দরকার। এক তো দ্যাখো পরান আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল ওর শুধু অপকারই করেছি। তবু, তাও আমি গ্রাহ্য করতাম না বউ। এই বৃষ্টিতে তুমি এলে, তোমার কাছে সরে বসতে না পেরে আমার যা কষ্ট হচ্ছে কারও মুখ চেয়ে আমি তা সইতাম না। কিন্তু আমি গাঁয়েই থাকব না বউ। আজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে, আর কখনও ফিরব না। এ রকম অবস্থায় একটু মনের জোর করে—

কুসুম হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, হাতে ব্যথা বলে ওষুধ নিতে এলাম, এ সব আমাকে কী শোনাচ্ছেন?

শশী থতোমতো খাইয়া গেল। তারপর শুষ্কস্বরে বলিল, কী বললে? ওষুধ নিতে এসেছ?

হাতটার ব্যথা সইতে পারি না ছোটোবাবু।

শশী ম্লান মুখে বলিল, হাতের ব্যথার ওষুধ তো জানি না বউ। মালিশের ওষুধ যা দিয়ে এসেছি তাই মালিশ করো গে।—কী করে যাবে এই বৃষ্টিতে?

কী করে এলাম?—বলিয়া কুসুম দরজা খুলিয়া বৃষ্টির মধ্যে নামিয়া গেল। চলন দেখিয়া মনে হইল না কাল সে কোমরে চোট পাইয়া শয্যাগত ছিল। শশীর মনে বর্ষার মতো বিষণ্ণতা ঘনাইয়া আসে। কুসুম শেষে এমন দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল। সে কত আশা করিয়াছিল কুসুম ধীর শান্তভাবে তার সমস্ত কথা শুনিবে, সমস্ত বুঝিতে পারিবে। কোথাও এতটুকু না-বোঝার কিছু না থাকায় তাদের দুজনের কারও মনে দুঃখ থাকিবে না, অভিমান থাকিবে না, লজ্জাও থাকিবে না। বোঝাপড়া শেষ হইবে গভীর অন্তরঙ্গতায়,—নিবিড় সহানুভূতিতে। তার বদলে এ কী হইল? ভাবিয়া ভাবিয়া শশীর মনে হইল, গ্রাম্য মন কুসুমের, কিছু তার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পরদিন পরানের কাছে সে খবর পাইল, কুসুমের হাত আর কোমরের ব্যথা কমিয়াছে, কাল সে বাপের বাড়ি যাইবে।

কদিন থাকবে বাপের বাড়ি?

বলছে তো পুজো পেরিয়ে আসবে। কদিন থাকে এখন।

তোমার কষ্ট হবে পরান।—শশী বলিল।

পরান গম্ভীর মুখে বলিল, কীসের কষ্ট, দুবেলা ভাত দুটো মা-ই ফুটিয়ে দিতে পারবে। ভেবে চিন্তে আমিই এক রকম পাঠাচ্ছি ছোটোবাবু। বাপের বাড়ি যেতে না পেলে মেয়েমানুষের মাথা বিগড়ে যায়।

রাত্রে কিছু ঠিক ছিল না, ভোর রাত্রে গোবর্ধন এবং আরও দুজন মাঝিকে তুলিয়া শশী বাজিতপুর যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একা বাজিতপুর যাইতে বড়ো নৌকা সে ব্যবহার করে না, ছোটো নৌকায় গোবর্ধন একাই তাহাকে লইয়া যায়। আজ তাহার বড়ো নৌকাটির প্রয়োজন হইল কেন কেহ বুঝিতে পারিল না। বিছানা পাতিয়া, জলের কুঁজো, বাড়ির তৈরি খাবার ভরা টিফিন ক্যারিয়ার, এক ডালা পাকা আম, চায়ের সরঞ্জাম, ওষুধের ব্যাগ প্রভৃতি নৌকায় তুলিয়া গোবর্ধন সব ঠিক করিয়া ফেলিল। শশী কিন্তু নৌকা খুলিল না। তীরে দাঁড়াইয়া টানিতে লাগিল সিগারেট।

রোদ উঠিবার পর কুসুমের ডুলি আসিল ঘাটে। সঙ্গে অনন্ত আর পরান। শশীকে দেখিয়া পরান বলিল, ছোটোবাবু যে এখানে?

শশী বলিল, বাজিতপুরে যাব পরান। তোমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমাদের ও ছোটো নৌকায় এদের গিয়ে কাজ নেই, বাজিতপুর পর্যন্ত আমার নৌকায় চলো। সেখানে ভালো দেখে একটা নৌকা ঠিক করে দেব।

তাই হোক। কারও আপত্তি নাই।

পরানকে ধরিয়া কুসুম শশীর নৌকায় উঠিল। তার তোরঙ্গ, বোঁচকা ও অন্য সব জিনিস তোলা হইলে শশী বলিল, তুমি ছই-এর মধ্যে বিছানায় বসবে যাও বউ। সামনের দিকে এগিয়ে বোসো তাহলে চাদ্দিক দেখে দেখে যেতে পারবে।

নয়

নৌকার দোলনে ঢুলিয়া ঢুলিয়া কুসুমের বাবার ঘুম আসে। কুসুম ছই-এর মধ্যে পিছনে হালের দিকে তাহার শোবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সে ঘুমাইয়া পড়িলে শশীকে ডাকিয়া বলিল, হঠাৎ আমাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দেবার শখ হল কেন শুনি?

বলিয়া মৃদু একটু হাসিল কুসুম।

শশী বলিল, তুমি ভাবছ কাজ নেই, না? তোমার জন্যে যাচ্ছি শুধু? উকিলের সঙ্গে দেখা করব।

মামলা আছে বুঝি?

মামলা তো দুটো একটা লেগেই আছে, সে জন্য নয়। কী কারণে যেতে লিখেছেন, জরুরি। তবে আজ না গেলেও চলত।

কুসুম একটু হাসিল।

আড়চোখে একবার বাপের দিকে চাহিয়া কুসুম বলিল, আমার জন্য এলেন আজ, না?

শশী বলিল, হ্যাঁ।

গভার সুখে কুসুমের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তবু নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখের সঙ্গেই বলিল, ভেবেছিলাম বাপেব বাড়ি গিয়ে কমাস থাকব, তা আর হবে না বুঝতে পারছি।

আশ্চর্য চরিত্র কুসুমের। এতক্ষণে শশী একটু লজ্জা বোধ করিল। সেদিন রহস্য সৃষ্টি করে নাই কুসুম। ওই রকম বাঁকা তার মনের কথা বলিবাব ধরন। সে কিছু বুঝিবে না, কিছু মানিবে না। কেন ভাবিয়া মরে শশী? সেদিন কুসুমের ব্যবহারের মানে ছিল শুধু এই। আরেক বিষয়ে শশী বিস্মিত হয। সেদিন সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কথা বলিয়াছিল। সে সম্বন্ধে কুসুমের কি বলিবার কিছু নাই? কথাটা সে বিশ্বাস করে নাই নাকি?

বাজিতপুরের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া শশী নামিয়া গেল। গোবর্ধনকে বলিয়া দিল, কুসুমকে বাপেব বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া বিকালে যেন নৌকা আনিয়া ঘাটে রাখে।

বাজিতপুরের সিনিয়র উকিল রামতারণবাবুর কাছে মকদ্দমা উপলক্ষে শশীকে মাঝে মাঝে আসিতে হয়, এবারও দেখা করিবার জন্য দিন তিনেক আগে তার একখানা চিঠি পাইয়া শশীর কোনো অসাধারণ প্রত্যাশা জাগে নাই। ব্যাপার শুনিয়া খানিকক্ষণ তাই সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল। দশটা গ্রামকে বিচলিত ও উত্তেজিত করিয়া যাদব মরিয়াছেন, কিন্তু আরও যে চমক তিনি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন সকলের জন্য, শশী তো তাহা ভাবিতেও পারে নাই।

গ্রামে একটি হাসপাতাল করার জন্য যা কিছু ছিল যাদবের সব তিনি দান কবিয়া গিয়াছেন। ব্যবস্থাব ভার শশীর, দায়িত্ব শশীর।

কী ছিল যাদবের? হাসপাতাল করার উপযুক্ত দান হিসেবে অত্যধিক কিছু নয়, যাদবের দান হিসেবে বিস্ময়কর, প্রচুর। হাজার পনেরো টাকার কোম্পানির কাগজ, বারো তেরো হাজার নগদ, আর যেখানে যাদব বাস করিতেন সেই বাড়ি ও জমি। এত টাকা ছিল যাদবের? পুরানো ভাঙা বাড়িটার স্যাঁতসেঁতে ঘরে যাদব ও পাগলদিদির সাদাসিদে ঘরকন্নার ছবি শশীর মনে পড়িতে লাগিল, কখানা বাসন, মাটির হাঁড়ি কলসি, কাঠের জীর্ণ সিন্দুক, গৃহসজ্জার অভাবজনিত দীনতা। তাও অপূর্ব ছিল সত্য, সে ঘরের পরিচ্ছন্নতা, ধূপগন্ধী শান্ত আবহাওয়া চিরদিন শশীকে অভিভূত করিয়াছে, কিছু টাকার ছাপ তো কোথাও ছিল না সেই গৃহী সন্ন্যাসীর গৃহে!

রামতারণের বয়স হইয়াছে। আদালতে যাওয়া তিনি অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছেন। ভোর চারটেয় উঠিয়া আহ্নিক করিতে বসেন,—মানুষটা ধার্মিক। বলিলেন, স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবেন এ রকম একটা খবর কানে এসেছিল, গুজব বলে বিশ্বাস করিনি। নইলে একবার দেখতে যেতাম। এখন আপশোশ হয়। কতবার পায়ের ধুলো দিয়েছেন, এত বড়ো মহাপুরুষ ছিলেন জানলে পরকালের কিছু কাজ করে নিতাম। এসেছেন গিয়েছেন, টেরও পাইনি কী জিনিস ছিল তার মধ্যে।

শশী বলিল, অনেকে সিদ্ধপুরুষ বলত।

তাই ছিলেন। এমন আত্মগোপন করে থাকতেন, বুঝবার কোনো উপায় ছিল না। আগে যদি জানতাম!

অনেক কথা হয়, অনেক আলোচনা, অনেক পরামর্শ। রামতারণের ছেলে, জামাই, মুহুরি, আমলারা চারিদিকে ঘিরিয়া আসিয়া স্তব্ধ বিস্ময়ে শশীর কথা শুনিয়া যায়। যাদবের দেহত্যাগেব বর্ণনা শুনিতে শুনিতে রামতারণ আবেগের সঙ্গে বলেন, মরছে সবাই, অমন মরণ হয় ক জনের? অসুখ নেই বিসুখ নেই, ইচ্ছা হল আর দেহ ছেড়ে আত্মা অনন্তে মিশিয়ে গেল।—তোমাব ডাক্তাবি শাস্ত্রে একে কী বলে শশী?

কী বলবে? কিছুই বলে না।

রামতারণ আরও আবেগের সঙ্গে বলেন, কোত্থেকে বলবে? ভারতবর্ষ ছাড়া জগতের কোথায় আছে এ জ্ঞান? ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। দুপাতা ইংরেজি পড়ে এ সব আমরা অবিশ্বাস করি, ফাঁকি বলে উড়িয়ে দিই—কই এবার বলুক দেখি কেউ কোথায় এতটুকু ফাঁকি ছিল? নিজে তুমি ডাক্তার মানুষ, আগাগোড়া দাঁড়িয়ে সব দেখেছ। দাও শশী, সমস্ত বিবরণটা লিখে কাগজে ছাপিয়ে দাও, পড়ে মতিগতি একটু ফিরুক মানুষের।

অল্পবয়স হইতে এ বাড়িতে শশীর আনাগোনা আছে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করিয়া এখানেই সে বিশ্রাম করিল। মৃত্যুর কয়েক দিন আগে শহরে আসিয়া যাদব শেষ উইল করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাণ ও মান বাঁচানোর জন্য পালানোর পরামর্শ দিয়া যেদিন শশী তার বকুনি শুনিয়াছিল, তারও পরে। মরিবার জন্য যাদব হয়তো সেই সময়েই মনস্থির করিয়াছিলেন, তাঁর আগে বোধ হয় নয়। শশী আজ সব বুঝিতে পারে। যে রকম অপূর্ব ও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল মরণ, মানুষ কি সে লোভ ছাড়িতে পারে? নিজে দাঁড়াইয়া সব সে দেখিয়াছিল আগাগোড়া, মরণ এবং কারণ চিরদিনের জন্য তারই মনে গাঁথা হইয়া রহিল।

তাকে জড়াইয়া গেলেন কেন? সে ম্লেচ্ছ নাস্তিক, শেষ পর্যন্ত সে অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যাদবের অলৌকিক শক্তিতে, তবু হাসপাতাল করার ব্যাপারে তারই হাতে সমস্ত কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া গেলেন। তাকে বিশ্বাসী করার জন্য কী ব্যাকুলতা ছিল যাদবের, শশীর সে কথা মনে পড়ে। মানুষটাব চরিত্রের কত আশ্চর্য দিক যে একে একে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। এই উইলের বিষয় তাকে কিছু না জানানো, এও এক অসাধারণত্ব যাদবের। জানাইয়া গেলে ভার গ্রহণ করিতে সে অস্বীকার করিতে পারিত না, তবু যে যাদব জানান নাই তার কারণ হয়তো আর কিছুই নয়,—এতগুলি টাকা তার অধিকারে রাখিয়া যাওয়ার জন্য যদি তার সহজ ব্যবহারের ব্যতিক্রম হয়? কৃতজ্ঞতায় হোক আর যে কারণেই হোক, মন-রাখা কথা যদি শশী বলে? শেষ কয়েকটা দিনে তাঁর যোগসাধনার ক্ষমতায় শশীর বিশ্বাস জন্মিলে যদি বুঝিতে না পারা যায় এ বিশ্বাস স্বতোৎসারিত, এর পিছনে আর কোনো পার্থিব বিবেচনার প্রেরণা নাই?

বিকালে গোবর্ধন আসিল। গ্রামে ফিরিতে হইয়া গেল রাত। শশীর কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট গোপাল বলিল, এত টাকা লোকটা পেল কোথায় রে, অ্যাঁ?

বড়োলোকের ছেলে ছিলেন বোধ হয়।

ওয়ারিশ থাকলে খবর পেয়ে তারা বোধ হয় গোলমাল করবে শশী, মামলা-মকদ্দমা না করে ছাড়বে না সহজে। তুই না বিপদে পড়িস শেষে।

আমার কীসের বিপদ? আমাকে তো দেননি টাকা! এ সব উইল সহজে ওলটায় না।

গোপাল অকারণে গলা নিচু করিয়া বলিল, কারও কাছে হিসাব নিকাশ দিতে হবে না তোকে?

শশী বলিল, টাকা পয়সার ব্যাপার, হিসাব নিকাশ থাকবে না? তবে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না কারও কাছে। আমার খুশিমতো তিনজন ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে কমিটি করব, তাঁরা শুধু আমাকে পরামর্শ দেবেন,—সব বিষয়ে কর্তৃত্ব থাকবে আমার।

এত খাটবি খুটবি, তুই কিছু পাবি না শশী?

হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে ইচ্ছা করলে কিছু মাইনে নিতে পারব।

সমস্ত রাত ভাবিয়া পরদিন গোপাল বলিল, দ্যাখ শশী, তুই ছেলেমানুষ, এ সব গোলমেলে ব্যাপারে তোর থেকে কাজ নেই,—এ সব নিয়ে থাকলে ডাক্তারি করবি কখন? হাঙ্গামা তো সহজ নয়! তার চেয়ে আমার হাতে ছেড়ে দে সব, আমি সব ব্যবস্থা করব। গাঁয়ে হাসপাতাল হবে, এত সব বয়স্ক বিচক্ষণ লোক থাকতে সব ব্যাপারে ছেলেমানুষ তুই তোর কর্তৃত্ব থাকলে সকলে চটে যাবে শশী, শত্রুতা করে সব পণ্ড করে দেবে। তুই সরে দাঁড়া।

শশী বলিল, তা হয় না।

হয় না? কেন হয় না শুনি? তুই বুঝি অবিশ্বাস করিস আমাকে?

শশী এবার বিরক্ত হইয়া বলিল, অবিশ্বাসের কথা কোথা থেকে আসে? আর কারোকে ভার দেবার অধিকার আমার নেই। আমি দায়িত্ব না নিলে গভর্নমেন্টের হাতে চলে যাবে।

গোপাল বোধ হয় কথাটা বিশ্বাস করিল না। পরদিন সে চলিয়া গেল বাজিতপুর। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উইলটা দেখে এলাম শশী। সব দায়িত্ব তোকে নিতে হবে কিন্তু কাজের কনট্রাকট তুই যাকে খুশি দিতে পারিস, তাতে কোনো বাধা নেই। তাই দে আমাকে। এজেন্ট করে নে আমায়।

শশী বলিল, কোথাও কিছু নেই আগে থেকে আপনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?

গোপাল বলিল, ব্যস্ত কী হই সাধে? তুই ছেলেমানুষ, কী করতে কী করে বসবি—

আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই করব।

একজন সৎকাজে যথাসর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছে, আর একজন তাতে কিছু ভাগ বসাইতে চায়। কিছু ভালো লাগে না শশীর। অসংখ্য দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে। এদিকে অবিশ্রাম বর্ষা নামিয়াছে। তাও অসহ্য। গ্রাম! কী শ্রীহীন কদর্য প্রকৃতির এই লীলাভূমি? বর্ষার নির্মল বারিপাতে গলিয়া হইল পাঁক, পচিয়া হইল দুর্গন্ধ। পালানোর দিন আরও কতকাল পিছাইয়া গেল কে জানে। কুসুম ফিরিবার আগে গ্রাম ছাড়িতে পারিলে হইত। আর সে উপায় নাই। দেশে এত গণ্যমান্য লোক থাকিতে যাদব শেষে এমন বিপদে ফেলিয়া গেলেন তাহাকেই!

যাদবের মহা-মৃত্যুর উত্তেজনা এখনও কাটিয়া যায় নাই, উইলের খবরটা প্রকাশ পাওয়া মাত্র আর একদফা উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল। শীতলবাবু শশীকে ডাকিয়া সব শুনিলেন, বলিলেন, পণ্ডিতমশাই বলে এবং তিনি স্বর্গীয় বলে শশী, নইলে আমি থাকতে আমার গাঁয়ে আমাকে ডিঙিয়ে হাসপাতাল দেবার স্পর্ধা কখনও সইতাম না। তা শোনো, তোমার ফন্ডে আমি হাজার টাকা চাঁদা দেব।

শশীর ফন্ড! টাকাগুলি যাদব যেন শশীর কল্যাণেই দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামের মান্যবরেরাও সদলে শশীর কাছে যাতায়াত শুরু করিলেন। শীতলবাবুর মতো মনে সকলের আঘাত লাগিয়াছে! এত

সব ধনী মানী বয়স্ক লোক থাকিতে এত বড়ো একটা ব্যাপারের সম্পূর্ণ ভার শশীকে দিয়া গেলেন, কী বিস্ময়কর কাণ্ড যাদবের! কী অপমান সকলের! অপমান বোধ করিয়াও তাহারা কিন্তু থাকিতে পারিলেন না দূরে, শশীকে ছাঁকিয়া ধরিলেন। তিনজনের বদলে অযাচিতভাবে পরামর্শদাতা ত্রিশজন সভ্যের কমিটিই যেন গড়িয়া উঠিল শশীকে ঘিরিয়া। আর গোপাল অবিরত ছেলের কানে মন্ত্র জপিতে লাগিল, পারবি না শশী তুই, পারবি না,—আমায় ছেড়ে দে সব।

যাদবের ভাঙা ঘরের চাবি গ্রামের জমিদার হিসাবে শীতলবাবুর কাছে জমা ছিল। একদিন দেখা গেল তালা ভাঙিয়া ঘরের জিনিসপত্র কে তছনছ করিয়াছে, এখানে ওখানে শাবল দিয়া করিযাছে গভীর গর্ত। ঘটিবাটি কয়েকটি যায় নাই দেখিয়া বোঝা গেল ঘরে ছ্যাঁচড়া চোর আসে নাই, আসিয়াছিল কল্পনা-প্রবণ অনুসন্ধিৎসু, –গুপ্তধনের সন্ধানে।

শ্রীনাথ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, মরবে ব্যাটারা, মরবে।—যে হাত দিয়ে শাবল ধরেছিল খসে খসে পড়বে ব্যাটাদেব।

আইন-ঘটিত হাঙ্গামাগুলি সহজে মিটিল না। সাধারণের উপকারার্থে দান করা অর্থের উপব একজন যুবকের অধিকার, উইলে স্পষ্ট লেখা থাকিলেও, আইনের চোখে কেমন কটু ঠেকিতে লাগিল। কোন পক্ষ হইতে ঠিক বোঝা গেল না, সম্ভবত আকাশ ফুঁড়িয়া গোপাল দাসের ছেলেটার পকেটে এতগুলি টাকা আসিবার সম্ভাবনায় গায়ে যাদের ধরিয়া গিয়াছিল জ্বালা, তাদের পক্ষ হইতেই তদ্‌বিরের ফলে, উইলের কয়েকটা গলদ বাহিব করিয়া উইল বাতিল করার চেষ্টাও হইল। অনুসন্ধান হইল অনেক, শশী বাজিতপুরে ছুটাছুটি করিল অনেকবাব, উইলের সাক্ষীদের অনেক জেরা করা হইল, তারপর বেওয়ারিশ যাদবের অর্থ ও সম্পত্তি দিয়া গাওদিয়া হাসপাতাল স্থাপন করিবার অধিকাব শশী পাইল। কমিটি গঠন করিবার সময় শশী পড়িল আরেক বিপদে। কাকে রাখিয়া কাকে আহ্বান করিবে? উইলে নির্দেশ আছে, মান্যগণ্য তিনজন বয়স্ক ভদ্রলোক। মান্যগণ্য বয়স্ক ভদ্রলোকের অভাব নাই, কিন্তু শশী যাদেব মানে, কমিটিতে আসিলে শশীকে তারা মানিবেন না, শশীব যাবা অনুগত তারা আসিলে অননুগতেরা অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিবে। শীতলবাবুকে অনুরোধ করিতে তিনি অস্বীকার করিলেন, রাগও করিলেন। শশী কর্তালি করিবে, গ্রামের জমিদার তিনি, তিনি শুধু দিবেন পরামর্শ? স্পর্ধা বটে শশীর।

শশী সবিনয়ে বলিল, আমি কেন, আপনিই সব বিষয়ে হেড থাকবেন।

উইলে তো কই তা লেখেনি বাপু?

অবস্থা বিবেচনা করিয়া শশী তখন বলিল, তবে থাক, ব্যস্ত মানুষ আপনি, এ সব হাঙ্গামায আপনার থেকে কাজ নেই। হাসপাতাল হলে যে স্থায়ী কমিটি হবে আপনাকে তো তার প্রেসিডেন্ট হতেই হবে। মাঝে মাঝে আমি আসব, উপদেশ নিয়ে যাব আপনার। আপনি সহায় না থাকলে এত বড়ো ব্যাপার আমি কেন সামলাতে পারব বলুন?

প্রেসিডেন্ট হতে হবে নাকি আমায়?

আপনি থাকতে আর কে প্রেসিডেন্ট হবে?—শশী যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।

তখন প্রীত হইয়া শীতল শশীকে খাতির করিয়া বসাইলেন, হুকুম দিলেন জলখাবার আনিবার। বলিলেন, আর কে কে থাকবে কমিটিতে?

শশী বলিল, কাকে নিলে সুবিধা হয় আপনিই যদি তা বলে দিতেন—

শীতল বলিলেন, আমাদের মুনসেফকে নাও না, উখারার সত্যহরিবাবুকে? আইনজ্ঞ মানুষ।

শশী বলিল, বলব ওঁকে। তাহলে দুজন হল, আপনি আর সত্যহরিবাবু। আর একজন চাই। সাতগাঁর হেডমাস্টার কেশববাবুকে নিলে কেমন হয়?

এমনি কৌশলে শীতলকে বশ করিতে পারায় এবার সহজেই যথারীতি কমিটি গঠিত হইল। শীতলের গৃহে সভ্যেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মতান্তরের যে আশঙ্কা শশীর ছিল, দেখা গেল সেটা প্রায় অমূলক। মতান্তরের ভয়টা তার চেয়ে ওদেরও বড়ো কম নয়। বিনয় ও নম্রতার মধ্যেও কোনো বিষয়ে শশীর দৃঢ়তা উঁকি দিলে শীতলও সে বিষয়ে আর প্রতিবাদ করেন না, সংঘর্ষ বাঁচাইয়া চলেন। সত্যহরি ও কেশব বৃদ্ধ, অত্যন্ত নিরীহ মানুষ। ঠিক হইল, ফন্ড খুলিয়া চাঁদা তোলা হইবে, যাদবের ভাঙা বাড়ি ও জমি বেচিয়া সাতগাঁ উখারা ও গাওদিয়ার সংযোগস্থলে হাসপাতালের জন্য জমি কেনা হইবে। শীতলের সভাপতিত্বে একদিন গ্রামে একটা সভা হইয়া গেল। সভায় নিজের বক্তৃতা শুনিয়া নিজেই শশী হইয়া গেল অবাক। কে জানিত সে এমন সুন্দর বলিতে পারে! সভায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল বটে কিন্তু শেষের দিকে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি নামায় উত্তেজনা একটু নরম হইয়া আসিল। ছেলেরা চাদরের প্রান্ত ধরিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য সভায় ঘুরিতে আরম্ভ করা মাত্র মেঘের অজুহাতে অনেকে বাড়িও চলিয়া গেল।

প্রথমে অনেক ভয় ভাবনা ছিল, এখন শশীর মন উৎসাহে ভরিয়া উঠিয়াছে। বড়ো কিছু করিবার জন্য যে আগ্রহ চাপা পড়িয়া তাহাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল, তারই যেন একটা মুক্তি হঠাৎ তাহার জুটিয়া গিয়াছে। সারাদিন জলকাদায় ছুটাছুটি করিয়া হিসাবের খাতাপত্র বগলে বাড়ি ফিরিয়া সে গভীর শ্রান্তি ও নিশ্চিন্ত তৃপ্তি অনুভব করে। জীবনে নতুনত্ব আসিয়াছে, বৈচিত্র্য আসিয়াছে। যাদবের কাছে সে বোধ করে কৃতজ্ঞতা। তার সম্বন্ধে গ্রামবাসীর মনে যে দ্রুত পরিবর্তন আসিতেছে তাতেও শশী এক উত্তেজনাময় আনন্দের স্বাদ পায়। এতদিন সে ছিল ডাক্তার, এবার যেন আপনা হইতে ছোটোখাটো একটি নেতা হইয়া উঠিতেছে। কাজের মানুষ বলিয়া গ্রামের ছেলেরা শশীকে এতদিন এড়াইয়া চলিত, এবার দল বাঁধিয়া আসিয়া কাজের নামে হইচই করার সুযোগ প্রার্থনা করিতেছে শশীর কাছে।—এই বর্ষায় গাঁয়ে গাঁয়ে শশীর নির্দেশমতো সকলে তাহারা চাঁদা সংগ্রহ করিতে ছুটিয়া গেল। উখারার পাশের গ্রামে কীসের সভা হইবে, ডাক আসিল শশীর, কিছু বলা চাই। শুধু তাই নয়, গ্রামের সামাজিক ব্যাপারের জটলায় জীবনে এবার প্রথম ছেলেমানুষ শশীর আহ্বান হইল, সে গিয়া পৌঁছানো পর্যন্ত সভার কাজ স্থগিতও রাখা হইল। যাঁরা বয়স্ক, শশীর বয়স যেন তাঁরা ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে শশী যোগ দিল না। সে জানে এ শুধু বার্ধক্যের অস্থায়ী আবেগ, যৌবনের সঙ্গে দুদিনের অন্ধ সন্ধি। আজ যে হুঁকা ও কাশির শব্দে মুখরিত সভায় তাকে সম্মানের আসন দেওয়া হইবে, কাল সেখানে তার জুটিবে টিটকারি।

এদিকে গোপাল কেমন যেন মুষড়াইয়া গেল। হাসপাতাল সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে শশী যে তাকে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দিল না তা যেন তাকে গভীরভাবে আঘাত করিল। উদ্ধত প্রকৃতি গোপালের, অভিমানী মন। শশী তার একমাত্র ছেলে। তার কাছে এমন ব্যবহার গোপাল কল্পনা করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে সে অবাক হইয়া শশীর দিকে চাহিয়া থাকে, কিছু যেন বুঝিতে পারে না। ছেলের মনেও শ্রদ্ধা বজায় রাখিতে হইলে নিজের জীবনকে যে বাপের পর্যন্ত শ্রদ্ধার উপযুক্ত করিয়া রাখিতে হয় এ শিক্ষা গোপালের ছিল না। অদৃষ্টকে দোষারোপ করিয়া সে তাই মনে মনে হায় হায় করে। অনুতাপও যেন আসে গোপালের। মাঝে মাঝে সে ভাবে সে যত অন্যায় করিয়াছে জীবনে এই তার শাস্তি!

একদিন সে শশীকে বলিল, জানিস শশী, অনেক পাপে ভগবান আমাকে তোর মতো ছেলে দিয়েছেন। তোর এত মহত্ত্ব কীসের তা কি আমি আর কিছু বুঝি না ভাবিস। আমার সঙ্গে রেষারেষি করিস তুই, আমাকে লজ্জা দেবার জন্য ন্যায়বান সেজে থাকিস!—মহত্ত্ব! বাপ পাপিষ্ঠ, উনি মহৎ! লজ্জা করে না শশী তোর?

গোপালের মুখ দেখিয়া শশী একটু ভীতভাবে বলিল, আপনাকে আমি কখনও সমালোচনা করি না বাবা।

অবিশ্বাস তো করিস!

শশী মৃদুস্বরে বলিল, কিছু বোঝেন না, যা তা ভেবে রাগ করেন। এতে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা তো কিছু নেই। আপনি যা বলছিলেন তা যদি করতাম, লোকে বলত না বাপ-ব্যাটায় মিলে হাসপাতালের টাকা লুটছে?

কথাটা সাময়িকভাবে গোপালের মনে লাগে। তবে গোপালের অভিযোগ তো শুধু যাদবের টাকাগুলি নাড়াচাড়া করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নয়। যত দিন যাইতেছে সে টের পাইতেছে, শশীর মনে, শশীর জীবনে তার স্থান আসিতেছে সংকুচিত হইয়া। শশী যে তাকে শুধু শ্রদ্ধা করে না তা নয়, সে জন্য আপশোশও যেন শশীর নাই। এইটুকুই গোপালকে পাগল করিয়া দিতে চায়।

গোপাল কত কী ভাবে। রাত্রে তার ঘুম হয় না। মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শশী তাহার তামাক টানার শব্দ শুনিতে পায়। সামান্য একটু সুবিধার জন্য মানুষের জীবন নষ্ট করিয়া যে মানুষটার এক মুহূর্তের জন্য কখনও অনুতাপ হয় নাই, গভীর ও অপরূপ এক হীনতা থাকার জন্য যার কঠোর কর্মঠ প্রকৃতি শুধু নিষ্ঠুরতায় গড়া, শশী কি তাকে ভাবপ্রবণ করিয়া তুলিল? সেনদিদির কাঁধে হাত রাখিয়া সে যখন শ্রান্ত গলায় বলে, জানিস সরোজ, ছেলেমেয়ের কাছ থেকে একদিনের তরে সুখ পেলাম না,—তখন কাছে উপস্থিত থাকিলে শশী বোধ হয় চমকিয়া যাইত। সেনদিদির কাঁধে হাত রাখিবার জন্য নয়, গোপালের মুখ দেখিয়া, গলার স্বর শুনিয়া। হয়তো সে বুঝিতেও পারিত কত দুঃখে কানা সেনদিদির কাছে গোপাল আজ সান্ত্বনা খুঁজিয়া মরে।

একদিন গোপাল একেবারে পাঁচশত টাকা শশীর হাতে তুলিয়া দিল।

কীসের টাকা?

হাসপাতালের ফন্ডে আমি দিলাম শশী।

শশী বলিল, মোটে পাঁচশো? লোকে কী বলবে বাবা?

কী আশা করিয়াছিল গোপাল, কী বলিল শশী! নোটগুলি গোপাল ছিনাইয়া লইল, আগুন হইয়া বলিল, কত দেব তবে? লাখ টাকা? দেব না যা এক পয়সা আমি!

শশীকে ঘিরিয়া যখন এমনি গোলমাল চলিতেছে একদিন আসিল কুসুম, কয়েক দিন পরে আসিল মতির খবর।

দশ

মতির কথা গোড়া হইতে বলি।

রাজপুত্র প্রবীরকে স্বামী হিসাবে পাইয়া মতির সুখের সীমা নাই। গ্রাম ছাড়িতে চোখে জল আসে, অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া একটা রহস্যময় ভীতি বুক চাপিয়া ধরে, তবু আহ্লাদে মেয়েটা মনে মনে যেন গলিয়া গেল। এইটুকু বয়সে এমন উপভোগ্য মন-কেমন-করা! স্টিমার ছাড়িলে জেটিতে দাঁড়ানো পরানকে ঘোমটার ফাঁকে দেখিতে দেখিতে ভিতরটা যখন তোলপাড় করিতে লাগিল আর চোখের জলে সব ঝাপসা হইয়া গেল, রাজপুত্র প্রবীর পাশে বসিয়া আছে অনুভব করার মধ্যেই তখন কী উত্তেজনা, কী আশ্বাস!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া আগে সে যে একবার কুমুদের খোঁজেই কলিকাতা আসিয়াছিল, মতি সে বিষয়ে কিছুই বলিল না। প্রথম এই শহরটা দেখাইয়া কুমুদ তাহাকে থ বানাইয়া দিতে চায় বুঝিয়া

মতি যথোচিত থ-ই বনিয়া গেল। একটু বোকার মতো কথা বলিতে লাগিল মতি, এটা কী ওটা কী জিজ্ঞাসা করিয়া কুমুদকে অস্থির ও আনন্দিত করিয়া তুলিল;—কী অনিন্দ্য মতির বানানো উচ্ছ্বাস!

কোথায় উঠব আমরা?

হোটেলে উঠব। কদিন হোটেলে থেকে, তোমায় সব দেখিয়ে শুনিয়ে বাসা-টাসা যদি করি তো করব, নয় তো বেড়াতে চলে যাব কোথাও। কেমন?

তাই হোক। যা খুশি ব্যবস্থা করুক কুমুদ, মতির কোনো আপত্তি নাই। নতুন বউ সে, স্বামী এখন যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে, তারপর সংসার পাতিয়া দিলে তখন শুরু হইবে গৃহিণীপনা। এখন তাহার কীসের দায়িত্ব, কীসের ভাবনা? নিজের সৌভাগ্যে মতি পুলকিত হইয়া থাকে। গাঁয়ের কোন মেয়ে তার মতো এমন ভাগ্যবতী? মনের মতো বরের সঙ্গে তো বিবাহ হয়ই না, শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথমে ঘোমটা দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, তারপর বাসন মাজে ঘর লেপে রান্না করে আর গালাগালি খায়! কত ভয়, কত ভাবনা, কত তারা পরাধীন। আর তার নিজের পছন্দ করা বর, বিবাহের পরেই এমন স্ফূর্তি করিয়া বেড়ানো, সব বিষয়ে স্বাধীনতা। হোটেলের ঘরখানা মতির পছন্দই হইল। রাস্তার দিকে দুটি জানালা আছে, ঝুঁকিলে দুদিকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। ঠিক সামনে একটা ছোটো গলি সোজা গিয়া পড়িয়াছে ওদিকের বড়ো রাস্তায়। সেখানে ট্রাম চলে। কুমুদের সাহায্যে বিছানা পাতিয়া মতি ঘর গুছাইয়া ফেলিল। হোটেলের চাকরকে দিয়া দুটি একটি দরকারি জিনিস আনানো হইল। তারপর মতি সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া আসিল, স্নানের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে কুমুদের প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা কী মজার ব্যাপার! হোটেলের বুড়ো উড়িয়া বামুন,—বেঁটে লিকলিকে বাদামি রঙের মানুষ সে, কিন্তু কথায় কাজে চটপটে,—ঘরে ভাত দিয়া গেল। নিজের থালায় ভাতের পরিমাণ দেখিয়া মতি বলিল, মাগো, কত ভাত দিয়েছে দ্যাখো আমাকে! আমার মতো সাতটার কুলিয়ে যাবে যে!

মেসে হোটেলে এমনি দেয়।

নষ্ট হবে তো? ডেকে বল না তুলে নিয়ে যাক?

হোক না নষ্ট, আমাদের কী?

তবু মতির মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। আহা, ভাত যে লক্ষ্মী, ভাত কী নষ্ট করতে আছে! খাইতে খাইতে আবার সে আপশোশ করিল। কুমুদ বলিল, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে দেখছি! একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে এত ভাবছ? ভাত নষ্ট হবে তাও হোটেলের ভাত, এ আবার মানুষের মনে আসে?

খাওয়া-দাওয়ার পর সিগারেট টানিতে টানিতে কুমুদ ঘুমাইয়া পড়িল। জ্বলন্ত সিগারেটটা তার প্রসারিত হাত হইতে মেঝেতে খসিয়া পড়িলে মতি সেটা কুড়াইয়া নিভাইয়া তুলিয়া রাখিল। অর্ধেকও পোড়ে নাই সিগারেটটা, ঘুম হইতে উঠিয়া কুমুদ আবার খাইতে পারিবে। তারপর গাড়ির কষ্টে মতিরও ঘুম আসিতে লাগিল। চৌকিতে কুমুদ এমনভাবে গা এলাইয়া শুইয়াছে যে পাশে জায়গা খুব কম। নতুন বউ সে, বরের পাশে শোওয়াই তো নিয়ম, না? নিয়ম বজায় রাখিতে না পারিয়া মতি দুঃখিত মনে মেঝেতে একটা কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। তিনটার সময় ঘুম ভাঙিল কুমুদের। মুখ হাত ধুইয়া জামাকাপড় পরিয়া সে মতিকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল, দরজা দিয়ে বোসো, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। কটা জিনিস কিনেই ফিরে আসব।

কুমুদ বাহির হইয়া গেলে মতির দরজায় খিল বন্ধ করিল। মিনিট পনেরো পরেই দরজায় ঘা পড়িতে খিল খুলিয়া সে বলিল, এর মধ্যে ফিরে এলে?

কিন্তু এ তো কুমুদ নয়! কুড়ি-বাইশ বছরের চশমাপরা একটা ছেলে। মতিকে দেখিয়া সেও যেন অবাক হইয়া গেল। ঘরের ভিতর একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া বলিল, এ ঘরে আমার একজন বন্ধু থাকত। ঘর ছেড়ে চলে গেছে জানতাম না।

মতি কিছু বলিতে পারিল না।

পরশু দিন দেখে গেলাম আছে, এর মধ্যে সে গেল কোথায়?

কেমন যেন চোখ ছেলেটার, কেমন তাকানোর ভঙ্গি। মতির ইচ্ছা হইতেছিল দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ওর বন্ধু যদি এ ঘর হইতে হঠাৎ উধাও হইয়া গিয়া থাকে, দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হয়তো ওর আছে? মতির ভয় করিতেছিল, জড়ানো গলায় সে বলিল, আমরা মোটে আজ সকালে এসেছি।

এমনি সময়ে হঠাৎ ম্যানেজার আসিয়া হাজির। বোধ হয় পাশেই কোনো মেম্বারের ঘরে ছিল।

কাকে খোঁজেন? এদিকে আসুন মশায়, সরে আসুন।

মতি দরজাটা এবার বন্ধ করিল। শুনিল ছেলেটা বলিতেছে, শ্যামলবাবুকে খুঁজছি।

শ্যামলবাবুকে? শ্যামলবাবু তেতলায় গেছেন একুশ নম্বরে। ..তার ঘরেই তো দেখলাম মশায় আপনাকে এতক্ষণ? ব্যাপারখানা কী বলুন দেখি? সারা দুপুরটা শ্যামলবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এখানে তাকে খুঁজতে এসেছেন?

মতি বুঝিতে পারিল, আশেপাশের ঘর হইতে দু-চারজন লোক বাহির হইয়া আসিয়াছে। একটা গোলমাল আরম্ভ হইয়া গেল। বুদ্ধঘরের ভিতরে মতি লজ্জায় ভয়ে কাঠ হইয়া রহিল। কোন দেশি ব্যাপার এ সব? কী মতলব ছিল ছেলেটার? এ কেমন জায়গায় কুমুদ তাহাকে একা ফেলিয়া রাখিয়া গেল?

একটু পরে গোলমালটা দূরে সরিয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া আসিল, তারপর একেবারে থামিয়া গেল। ঘণ্টাখানেক পরে দরজায় আবার ঘা পড়িতে মতির বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কে? হোটেলের চাকর জানিতে আসিয়াছে কিছু দরকার আছে কি না। মতি বলিল, না, কোনো দরকার নেই!

কুমুদ ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার পর।

কুমুদকে ব্যাপারটা বলিবার সময় মতির ভয় করিতে লাগিল যে শুনিয়া হয়তো সে রাগিয়া অনর্থ করিবে, খুন করিয়াই ফেলিতে চাহিবে সেই দুর্বৃত্ত ছেলেটাকে। কুমুদ কিন্তু শুধু একটু হাসিল। বলিল, ছেলেটা তো চালাক কম নয়!

চালাক? পাজি নয়, শয়তান নয়, লক্ষ্মীছাড়া নয়, শুধু চালাক?

এমন ভয় করছিল আমার! মতি বলিল।

কুমুদ বলিল, কীসের ভয়? খেয়ে তো ফেলত না? এত লোক রয়েছে চারিদিকে, ছল করে তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলে যাওয়ার বেশি সাহস কি আর হত ছোঁড়ার। হয়তো কার সঙ্গে বাজি-টাজি রেখেছিল, তোমার সঙ্গে কথা বলবে। অল্প বয়সের পাগলামি ও সব।

হয়তো তাই, তবু কুমুদ কেন তাহা বরদাস্ত করিবে? মনে মনে মতি বড়ো ক্ষুণ্ণ হইয়া গেল। শশী হইলে হয়তো এ রকম হাসিয়া উড়াইয়া দিত না ব্যাপারটা, ছড়ি হাতে ছোঁড়াটাকে ঘা কতক বসাইয়া দিয়া আসিত। মতির হঠাৎ মনে হয় কুমুদের এ যেন ভীরুতা। ব্যাপারটা সে যে হালকা করিয়া চাপা দিতে চায় তার কারণ আর কিছুই নয়, যদি গুরুতর হইয়া ওঠে, যদি তার কোনো অসুবিধা বা ক্ষতি হয় কুমুদের এই আশঙ্কা আছে। ছোটো ছোটো অপমান কি কুমুদ তবে হাঙ্গামার ভয়ে গ্রাহ্য করে না। এ বিষয়ে সে কী গাওদিয়ার কীর্তি নিয়োগীর মতো?

মতির জন্য কুমুদ একজোড়া জুতা কিনিয়া আনিয়াছিল। বিবাহের পর মতিকে এই তার প্রথম উপহার।

একে একে এই হোটেলেই সাত দিন কাটিয়া গেল। এর মধ্যে মতিকে কুমুদ একদিন দেখাইল সিনেমা আর একদিন লইয়া গেল গঙ্গাতীরে বেড়াইতে। কত কী সে বলিয়াছিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শহর দেখাইবে, আজ সিনেমা কাল থিয়েটার করিয়া বেড়াইবে, গৃহকোণে মুখোমুখি বসিযা থাকিবে কপোত-কপোতীর মতো। সে সব সংকল্প কোথায় গেল কুমুদের? তার অপরিমেয় আলস্যপ্রিয়তায় মতি অবাক হইয়া থাকে। কোথাও লইয়া যাওয়া দূরে থাক, মতিব সঙ্গে খেলা করিতেও তাব যেন পরিশ্রম হয়, অমন কোমল হালকা দেহ মতির তবু কুমুদের বুকে তার কতটুকু ক্ষণস্থায়ী আশ্রয়! শুইয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বই পড়ে কুমুদ, আলস্যের মধুর আরামে দিনে এক টিন সিগারেট খায়, ঝাঁ করিয়া মতিকে খানিক আদর কবিযা জানালা দিয়া পুরা দশ মিনিট চাহিযা থাকে বাহিরে, অন্যমনে শিস দেয়। বলে, চা করো মতি।

মতি বলে, কোথাও নিয়ে যাবে না আমাকে আজ?

কুমুদ বলে, কোথায় যাবে? কী আব দেখবার আছে কলকাতায়? একদিন থিয়েটাব দেখে, বাস, তাতেই অরুচি। তাবপর চলো না একদিন বেরিযে পড়ি, পুরী ওয়ালটেয়াব সব বেড়িযে আসি! এখানে ভদ্রলোকে থাকে? কলকাতা কী শহর, এ তো একটা বাজার! বাস্তায় বেরুলে মাথা ঘোরে।

কবে যাব পুরী-টুরির দিকে?

যাব যাব, ব্যস্ত কী!—কুমুদ হাসে, আঁচল ধবিয়া বিব্রত মতিকে কাছে টানিয়া বলে, একটা ঘরে শুধু আমরা দুজনে কেমন আছি! ভালো লাগে না মতি?

হুঁ, লাগে।

তাবপর ভয়ে ভয়ে · যা বই পড় সারাদিন।

তুমিও পড়বে মতি, তুমিও পড়বে।

বাস, তাবপব এক পেয়ালা চা খাইয়া কুমুদ আবার চিত! আবেগ মূর্চ্ছনার একটা সম্পূর্ণতা মতির কখনও পাইবার উপায় নাই! খানিক অন্যমনস্ক চিন্তা, এক পরিচ্ছেদ বই, দশ মিনিট মতি—এ যেন পালা কবা খেলা কুমুদেব, বৈচিত্র্য সৃষ্টি!

ভালোবাসার এত ক্রমশ মতির ভালো লাগে না। তবে ছোটোবড়ো সেবার সুযোগ মতিকে কুমুদ অফুরন্তই দিযাছে. মতি চা করে, খাবার দেয়, তৃষ্ণার জল জোগায়। দাড়ি কামানোর আয়োজন করে, ক্ষুর ধুইয়া সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখে, কুমুদের টেরিও মতিই কাটে, দিয়াশলাই সিগারেট প্রভৃতি জোগান দেয়। আরও কত কী মতি করে।

একদিন কুমুদ বলিয়াছিল, পা টা বড়ো কামড়াচ্ছে বউ।

কেন?

এমনি কামড়াচ্ছে। কেউ যদি একটু টিপে দিত!

মতি আবক্ত মুখে বলিয়াছিল, চাকরকে ডেকে বল না?

হোটেলের চাকর পা টিপবে? তবেই হয়েছে! দাও না, তুমিই একটু দাও না আস্তে আস্তে?

সেই হইতে দুপুরবেলা কুমুদের ঘুম পাইলে মতি তার পাও টিপিয়া দেয়। শহরের শব্দে তখন স্থানীয় একটু স্তব্ধতার চাপ পড়ে। এ সময়টা মতির মন ভারী খারাপ হইয়া যায়। কলের মতো এক হাতে কুমুদের পা টিপিতে টিপিতে অন্য হাতে তাহাকে চোখ মুছিয়া ফেলিতে হয়। নিজেকে কেমন বন্দিনী মনে হয় মতির। মনে হয়, কুমুদ তাকে চিরকাল এই ছোটো ঘরটিতে পা-টেপানোর জন্য আটকাইয়া রাখিবে, তার খেলার সাথি কেহ থাকিবে না, আপনার কেহ থাকিবে না, মাঠ ও আকাশ আর জীবনে পড়িবে না চোখে, বালি মাটির নরম গেঁয়ো পথে আর সে পারিবে না হাঁটিতে।

সাত দিন! মোটে সাত দিন সে এখানে কাটিয়াছে মতি?

তারপর একটি দুটি করিয়া কুমুদের বন্ধুরা আসিতে আরম্ভ করে। প্রতিদিন ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। আশ্চর্য সব বন্ধু কুমুদের! এ রকম লোক মতি জন্মে কখনও দ্যাখে নাই। আসিয়া দরজায় ঘা দেয়। কুমুদ বলে, কে?

আমি।

কুমুদ বলে, দরজা খুলে দাও মতি।

দরজা খুলিয়া মতি ঘরের কোণে সরিয়া যায়। সরাসরি ঘরে ঢুকিয়া কুমুদের বন্ধু বিছানায় বসে। প্রথমবার আসিয়া থাকিলে মতির দিকে চোখ পড়ায় খানিকক্ষণ তাকাইয়াই থাকে।

কোথায় পেলি?

কুমুদ শুইয়া থাকিয়াই জবাব দেয়, বউ।

বন্ধু হাসে। ফস করিয়া দিয়াশলাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরায়।

আরেক দফা মতিকে দেখিয়া বলে, চা করো দিকি বউদি? চিনি কম, কড়া লিকার।

এবং পরক্ষণেই কুমুদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হইয়া যায়। মতি গাঁয়ের মেয়ে, বন্ধু যে লোক ভালো নয় সে তা বুঝিতে পারে। তবু আর যে সে একবারও তার দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দ্যাখে না মতি তাতে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে, কুমুদের বন্ধু লোক যেমন হোক, ভদ্রতা জানে। এমন ভাব দেখাইতে পারে যেন এ ঘরে শুধু বন্ধু আছে, বন্ধুর বউ নাই!

সকলে এ রকম নয়। মতির সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টাও কেউ কেউ করে। কেউ ঘরে ঢুকিয়াই একেবারে বহুদিনের পরিচিত হইয়া উঠিতে চায়, কেউ ধীরে ধীরে পরিচয় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে,—কারও কতাবার্তা হয় কৃত্রিম, কারও সহজ ও সরল। বই-টই দু-একটা উপহারও মতি পায়। এই সব বন্ধুদের মধ্যে একজনকে মতির বড়ো ভালো লাগিল, মোটা জোবালো চেহারা আর শক্ত কালো একঝাড় গোঁফ থাকা সত্ত্বেও। তার নাম বনবিহারী।

জাঁকিয়া বসিয়া প্রথমেই সে ঠাট্টা করিয়া বলিল, খুকি বলব না বউদি বলব?

মতি বলিল, খুকি কেন বলবেন?

বনবিহারী যেন অবাক হইয়া গেল। কুমুদকে বলিল, কই রে, তেমন গেঁয়ো তো নয়? কথা বলার জন্যে সাধাসাধি করতে হল কই?

কুমুদ বলিল, লজ্জা একটু ভেঙেছে।

আরও কত কী ভাঙবে!—বলিয়া বনবিহারী হাসিল। মতিকে বলিল, অনেক দিনের বন্ধু আমি কুমুদের। বয়সের হিসাব ধরলে আমি তোমার ভাসুর হব, কিন্তু বয়সের কথাটা মনে রাখতে বউ আমাকে বারণ করেছে।

মতির লজ্জাও করে, হাসিও আসে।

বনবিহারী বলিল, কুমুদ তোমাকে হোটেলে এনে তুলেছে শুনে মাথাটা ফাটিয়ে দিতে এসেছিলাম। আমার স্ত্রীও এই ইচ্ছা অনুমোদন করেছেন। এখন তোমার অনুমতি পেলেই কাজটা করে ফেলতে পারি। দেব নাকি মাথাটা ফাটিয়ে?

কৌতুকে মতির চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বনবিহারী বলিল, বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে পেট চালাই, বাড়ি বলতে একটা ঘর আর একফোঁটা একটু বারান্দা। তবু সেটা বাড়ি, হোটেল তো নয়! এ রাসকেলের তাও খেয়াল থাকে না।

অসময়ে আসিয়া বনবিহারী অনেকক্ষণ বসিয়া গেল। আগাগোড়া কত হাসির কথাই যে সে বলিল। শেষের দিকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া মতি মাঝে মাঝে শব্দ করিয়াই হাসিয়া উঠিতে লাগিল। কুমুদকে একদিন সস্ত্রীক তার বাড়িতে যাওয়ার হুকুম দিয়া বনবিহারী সেদিন বিদায় হইল।

কুমুদ বলিল, হালকা লোক, ফাঁপা। পয়সার জন্যে আর্টকে জবাই করেছে. ছবি আঁকার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল, নাম হওয়া পর্যন্ত লড়াই করতে পারল না। মাসিকের পট আর বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে দিন কাটায়? সে জন্য আপশোশও নেই, এমন অপদার্থ।

বনবিহারীর অপরাধটা মতি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে ইচ্ছাও হয় না। কথার অন্তরালে স্নেহ ছিল বনবিহারীর, সমবেদনা ছিল। গ্রাম ছাড়িয়া আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গ ছাড়িয়া ছেলেমানুষ সে যে একটা অপবিচিত অদ্ভুত জগতে আসিয়া পড়িয়াছে, বনবিহারী ছাড়া কুমুদের আর কোনো বন্ধু বোধ হয় তাহা খেয়ালও করে নাই। দুদিন পবে সকালবেলা বনবিহারী আবার আসিল। না-যাওয়ার জন্য অনেক অনুযোগ দিয়া বলিল, চল কুমুদ, এখুনি যাই আজ, ওখানেই খাওয়া-দাওয়া করবি।

কুমুদ হাই তুলিয়া বলিল, যাব যাব, এত ব্যস্ত কেন?

বনবিহারীর মুখখানা এবার একটু গম্ভীর দেখাইল। সুর ভারী করিয়া সে বলিল, তোর ব্যাপারটা কী বল তো কুমুদ? আমাদের ওদিকে যাস না আজ ছমাস, যেতে বলায় আজ হাই উঠছে? সাত দিন তোর দেখা না পেলে আগে আমাদের ভাবনা হত। হঠাৎ যে ত্যাগ করলি আমাদের?

ত্যাগ? ত্যাগের স্বভাব আমাব নেই। এমনি হাই উঠছে—শ্রান্তিতে।

সাবাদিন শুয়ে থেকে শ্রান্তি! আব যেতে বলব না কুমুদ।

কী, দবকাব? কাল পরশুব মধ্যে একদিন হুস কবে হাজির হব দেখিস।

বনবিহারী এবার হাসিল. হযতো তার আগেই জয়া হুস করে এসে হাজিব হবে এখানে। কী শাস্তিটা তখন যে তোকে দেবে ভেবে পাচ্ছি না। খুকিকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে এক মাস হয়তো লুকিয়ে রেখে দেবে।

বনবিহারীর মুখে খুকি শব্দটা মতির ভালোই লাগে। তবু সে আবদার করিয়া বলিল, আবার খুকি কেন?

বনবিহারী চলিয়া গেলে কুমুদকে বলিল, চলো না যাই একদিন? অমন করে বলছেন!

কুমুদ মৃদু হাসিয়া বলিল, উনি কি আর বলছেন মতি, ওর মুখ দিয়ে আরেক জন বলাচ্ছেন! তার নাম জয়া, উনিব তিনি পত্নী।—যাব, ইতিমধ্যে একদিন যাব।

এদিকে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাবেলা কুমুদের সমাগত বন্ধুর সংখ্যা বাড়িতে থাকে, রীতিমত আড্ডা বসে। চৌকিতে কুলায় না। চৌকি কাত করিয়া রাখিয়া মেঝেতে বিছানা ও চাদর বিছাইয়া সকলে বসে। কেহ অনর্গল কথা বলে, কেহ থাকিয়া থাকিয়া প্রবল শব্দ করিয়া হাসে, কেহ গুনগুন করিয়া ভাঁজে গানের সুর। দেয়ালে ঠেস দিয়া শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত কেহ শুধু ঝিমায়। বিড়ি সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হইয়া ওঠে।

তাস খেলা হয। টাকা পয়সার আদান-প্রদান দেখিয়া মতি বুঝিতে পারে জুয়া খেলা হইতেছে।

মতির কান্না আসে। সহজভাবে সে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। লজ্জা করিতে কুমুদ তাহাকে বারণ করিয়াছে, কুমুদের বন্ধুরা একজন দুজন করিয়া আসিলে মতির বেশি লজ্জা করেও না। এ তো তা নয়। যে ঘর ছাড়িয়া এক মিনিটের জন্য তাহার বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই, একপাল বন্ধু জুটাইয়া সে ঘরে কুমুদ যদি সন্ধ্যা হইতে রাত এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দেয়, হাজার লজ্জা না করিলেও যে চলে না।

মতি চা জোগায়। বিকালে স্টোভ ধরায়, রাত বারোটার আগে সে স্টোভ ঠান্ডা হইবার সময় পায় না। বোধ হয় কুমুদের বলা আছে, সন্ধ্যার বন্ধুরা মতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। চা, পান প্রভৃতির প্রয়োজন পর্যন্ত কুমুদকেই জানায়। চা করিয়া পান সাজিয়াই মতির কর্তব্য শেষ, বিতরণ করিতে হয় না। এদিকে জানালায় গিয়া সে বসিয়া থাকে সমস্তক্ষণ। জানালার পাটগুলি ঘরের

ভিতরে খোলে, তারই আড়ালে মতি একটু অন্তরাল পায়। ওইখানে মাঝে মাঝে মতির রোমাঞ্চ হয়। ভয়ে সে কাঁদিতেও পারে না, ঘরে এত মানুষ। রাগে দুঃখে অভিমানে পাখি হইয়া মতির গাওদিয়া উড়িয়া যাইতে সাধ হয়। ক্রমে রাত্রি বাড়ে। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া আসে, সরু গলিটার ও মাথায় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত ট্রামগুলিকে আর যাইতে দেখা যায় না, তীব্র আলো নিভাইয়া পথের ও পাশের মনোহারি দোকানটি বন্ধ করা হয় আর দোকানটির ঠিক উপরের ঘরে মতিরই সমবয়সি একটি মেয়ে টেবিল চেয়ারে পড়া সাঙ্গ করিয়া শয়নের আয়োজন করে। দেখিয়া মতিরও ঘুম আসে।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে কুমুদ বলে, আগে বিছানা পাতবে? নামিয়ে দেব চৌকিটা? না, খেয়ে নেবে আগে?

মতি সাড়া দেয় না। উঠিয়া কাছে যাইবে তাতেও কুমুদের আলস্য। বলে, শোনো, শুনে যাও। রাগ হল নাকি? আহা, শোনোই না।

বেশিক্ষণ অবাধ্য হওয়ার সাহস মতির হয় না। কাছে গিয়া সে কাঁদিতে থাকে, বলে, এত লোক ঘরে এলে আমি এখেনে কেমন করে থাকি?

কুমুদ তাকে আদর করিয়া বলে, বন্ধুরা এলে কি তাড়িয়ে দিতে পারি মতি? ওরা তো জ্বালাতন করে না তোমাকে?

তখন মতি বলে যে কুমুদ তবে আর একটা ঘর ভাড়া নিক। কুমুদ বলে, ঘরের ভাড়া কি সহজ, অত টাকা কোথায়? মতি তখন জবাব দেয় টাকার যখন এমন অভাব জুয়া খেলে কেন কুমুদ? হোটেলে ঘর ভাড়া করিলে যদি বেশি টাকা লাগে, খুব সস্তায় ছোটোখাটো একটা বাড়ি ভাড়া নিলেই হয়! এখানে আর ভালো লাগিতেছে না মতির। আর তাও যদি না হয়, বন্ধুদের কারও বাড়ি গিয়া কুমুদ আড্ডা বসাক।

এত রাত পর্যন্ত তোমায় একা রেখে যাব? ভয় করবে না তোমার?

না, ভয় করবে না। ঘরে খিল দিয়ে থাকব।

এবার আর কুমুদ এমন যুক্তি দেখায় না মতি যা খণ্ডন করিতে পারে। প্রথমেই এমন সোহাগ করে মতিকে যে সে অবশ, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আসে। তারপর সে মতিকে বোঝায়। বলে, ভেঙেচুরে তোমায় গড়ে নেব বলিনি তোমাকে? বলিনি ঘর-সংসার পেতে বসবার আশা করো না? সে তো সবাই করে, রাস্তার মুটে থেকে রাজা মহারাজা পর্যন্ত। আমি তো সে রকম নই মতি। নিয়ম মেনে চলতে হলে দুদিনে আমি মুষড়ে মরে যাব। ভেসেভেসে বেড়াই, কাল কী হবে ভাবি না, যা ভালো লাগে তাই করি। আমার সঙ্গে থাকতে হলে কনেবউটি সেজে থাকলে চলবে কেন তোমার? বউ-মানুষ আমি, আমি এমন করে থাকব, অমন করে থাকব,---এ সব যদি তোমার মনের মধ্যে থাকে, আমার সঙ্গে তোমার তবে বনবে না। আমি রোজগার করে আনব আর ঘরের কোণে বসে তুমি রাঁধবে বাড়বে ছেলেমেয়ে মানুষ করবে,—কবে তো বলেছি তোমাকে তা হবার নয়? বউ তুমি নও, তুমি সাথি। অন্তত তাই তোমাকে হতে হবে। তোমার সম্বন্ধে সব বিষয়ে আমার যদি দায়িত্ব নিতে হয়, তুমি যদি ভার হয়ে থাকো আমার, তোমাকে তাহলে আমার একটুও ভালো লাগবে না মতি। তোমার জন্যে যদি আমাকে বদলে যেতে হয়, যে ভাবে দিন কাটাতে চাই তা না পারি, কী করে তোমাকে তাহলে রাখব আমার সঙ্গে?

মতি সভয়ে বলে, ত্যাগ করবে আমাকে?

কুমুদ হাসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলায়, বলে ভয় পেয়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে মতি। ভাবনার কী আছে? এক বচ্ছর আমার সঙ্গে থাকলে এমন করে বদলে যাবে যে আমাকে আর

বলে দিতে হবে না, যেখানে যে অবস্থাতে থাক তাতেই মজা পাবে। অভ্যাস নেই কিনা, তাই প্রথমটা অসুবিধা হচ্ছে। দুদিন পরে আর গ্রাহ্যও করবে না। তখন কী করব জান? ওদের আসতে বারণ করে দেব।

কেন?

বেশি দিন আমার কিছু ভালো লাগে না মতি। অনেক দিন পরে কলকাতা এলাম তাই একটু আড্ডা দিচ্ছি, বিতৃষ্ণা জন্মালো বলে।

দিন দুই পরে বনবিহারী একেবারে সস্ত্রীক আসিয়া হাজির হইল। জয়া একটু মোটা, তবে সুন্দরী। টকটকে রং, মুখখানা গোল, জমকালো চেহারা। চোখ দুটিতে ঝকঝকে ধারালো দৃষ্টি।

তুমি তো গেলে না, আমি ভাই তোমাকে তাই দেখতে এলাম। তোমার ব্যাপারটা কি কুমুদ? বিয়ে করে বউকে লুকিয়ে রাখলে? ওঁকে তো অন্তত পাঠালাম সাতবার, তবু কি একবার মনে পড়ল না জয়া বলে একটা জীব কৌতূহলে ফেটে পড়ছে? গাঁ থেকে বউ এনেছে শুনে অবধি অবাক মেনেছি।

ধারালো চোখে জয়া মতিকে দেখিতে থাকে। বলে, কচি বলে কচি, এ যে ধাঁধা লাগালে কুমুদ! আমার মেয়ে হলে ওকে যে ফ্রক পরিয়ে রাখতাম।—তাকায় দ্যাখো কেমন করে। এসো তো ভাই খুকি এদিকে, নেড়ে চেড়ে দেখি।

বাজিয়ে দেখবে না?—বনবিহারী বলিল।

কুমুদ বলিল, স্পিড একটু কমাও জয়া, ভড়কে যাবে। পুতুল তো নয়।

জয়া হাসিল, মায়া নাকি? শেষে মায়া করতেও শিখলে! মতির দিকে চাহিয়া বলিল, এসো না এদিকে, এখানে বোসো। প্রেজেন্ট কিন্তু আনিনি ভাই তোমার জন্যে, টাকায় কুলোল না। পরে কিনে দেব। খালি হাতেই ভাব করে যাই আজ।

সাধারণ একখানা শাড়ি পরনে, রানির যেন দাসীর বেশ। জয়ার বেশভূষা, কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি মতির কাছে অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। কুমুদের নাম ধরিয়া ডাকে গুরুজনের মতো, অথচ কথা বলে ফাজলামি করিয়া, এ কোন দেশি মেয়েমানুষ? প্রথম দেখাতেই জয়ার সম্বন্ধে মতির মনে একটা বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি হইয়া রহিল। কেমন একটা অদ্ভুত অনুকম্পার ভাব জয়ার, মতিকে দেখিয়া তার যেন হাস্যকর মনে হইতেছিল। ঘণ্টাখানেক বসিয়া জয়া চলিয়া গেল।

মতির মনে হইল, ঘরে যেন একঘণ্টা ধরিয়া ম্যাজিক হইতেছিল,—ভোজবাজি! কী বলিল জয়া, কেন হাসিল, অর্ধেক সময় মতি তা বুঝিতেই পারে নাই, শুধু কুমুদ ও জয়ার মধ্যে যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা আছে এটা টের পাইয়া বোধ করিয়াছে ঈর্ষা।

নাম ধরে ডাকল যে তোমার?

মতির প্রশ্নে কুমুদ কৌতুক বোধ করিল। আমরা বন্ধু যে মতি, অনেক দিনের বন্ধু।

মতি অবাক। মেয়েমানুষ বন্ধু? খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আচ্ছা ও যে তোমার সঙ্গে ও রকম করছিল, ওর স্বামী রাগ করবে না?

কী রকম করছিল? কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল।

মতি কথা বলিল না।

কুমুদ বলিল, তোমার মন তো বড়ো ছোটো মতি?

একটু পরে মতির চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া হঠাৎ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া কুমুদ বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল, ছিঁচকাঁদুনেও নও কম।

কুমুদের কাছে এমন কঠিন কথা মতি আর শোনে নাই। স্বামীর প্রথম ভর্ৎসনায় মতির চোখের জল শুকাইয়া গেল!

ম্যানেজার একদিন টাকা চাহিয়া গেল।

মতি কুমুদেব ব্যাগ ও বাক্সো-প্যাঁটরা হাতড়াইয়া দেখিয়া বলিল, মোটে সাত টাকা আছে।—টাকা বুঝি লুকিয়ে রেখেছ?

কুমুদ বলিল, আর টাকা কোথায় যে লুকিয়ে রাখব?

আর নেই? মতিব মুখ শুকাইয়া গেল।

কুমুদ হাসিয়া বলিল, সাত টাকা বুঝি কম হল মতি?

কী হবে তবে? কোথায় পাবে টাকা? হোটেলে টাকা দেবে কী করে? ভীত চোখে চাহিয়া থাকে মতি, বলে, রোজ তুমি জুয়া খেলে টাকা হেরে যাও, কেন খেল?

তাহার দুর্ভাবনার পরিমাণ দেখিয়া কুমুদের যেন মজা লাগিল। পাশে বসাইয়া বলিল, আমাব বউ হয়ে তুমি তুচ্ছ টাকার জন্য ভাবছ মতি? আজ সাত টাকা আছে আজ তো চলে যাক, কালেব ভাবনা কাল ভাবব। ব্যবস্থা একটা কিছু হয়ে যাবেই মতি, টাকার জন্য কখনও মানুষের বেঁচে থাকা আটকায় না।

উতলা মতি বলিল, সাত টাকায় কী করে চলবে?

দিব্যি চলবে। দেখই না কী করে চলে? চিরকাল এমনি করে চালিয়ে এলাম আমি জানি না? তুমি কেন ভাবছ? টাকার চিন্তা করার কথা তো তোমার নয়!

মতি তবু বলিল, হোটেলের টাকা দেবে কী করে? কাল যে দেবে বললে?

কুমুদ গভীর মমতায় ভীরু মেয়েটাকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, আবার ভাবে ও কথা? ঘ্যানঘ্যান করার স্বভাব গড়ে তুলো না মতি, গিন্নির মতো মুখ কোরো না। কাল যা দেব বলেছি কাল তার ভাবনা ভাবব, আজ কেন তুমি উতলা হয়ে উঠলে?

রাত্রে বন্ধুরা ফিরিয়া গেলে একমুঠা টাকা পয়সা কুমুদ বিছানায় ছড়াইয়া দিল। বলিল, দেখলে কোথা থেকে টাকা আসে? ভেবে তো তুমি মরে যাচ্ছিলে।

মতি বিষণ্ণভাবে বলিল, কালকে হেরে যাবে আবার। কীইবা হবে এ কটা টাকায়!

সিগারেট ধরাইয়া কুমুদ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে মতির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, এত অল্প বয়সে তোমার এত হিসাব হয়েছে আমি তা ভাবতে পারিনি মতি। টাকার দরকার তোমার তো এমন করে বুঝবার কথা নয়! ছেলেমানুষ তুমি, নিজে ফুর্তিতে থাকবে, কীসে কী হবে না হবে সে ভাবনা ভাবতে তোমার হবে বিরক্তি। তা নয়, টাকা কম পড়েছে বলে সারাদিন মুখ কালি হয়ে রইল! এত কচি ছিলে গাওদিয়ায়, এত পাকলে কখন? কিছুই যে সেখানে তুমি বুঝতে না মতি, যা বলতাম শিশুর মতো মেনে নিতে আর হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে মুখের দিকে? ঠকিয়েছিলে নাকি আমায়, ছেলেমানুষিব ভান করে?

মতি জবাব দিতে পারে না, কুমুদের অভিযোগ ভালো করিয়া বুঝিতেও পারে না, তার শুধু কান্না আসে। ছেলেমানুষির ভান করিত? সে কি এখনও ছেলেমানুষ নয়? টাকা নাই তাই টাকার কথা ভাবিয়াছে, তাতেই কি মানুষের ছেলেমানুষি ঘুচিয়া যায়। পরদিন টাকা চাহিতে আসিয়া ম্যানেজার খালি হাতে ঘুরিয়া গেল। টাকা থাকিতেও কুমুদ তাকে টাকা দিল না কেন মতি বুঝিতে পারিল না, ভয়ে কিছু বলিল না।

দিন সাতেক পরে সকালবেলা কুমুদ একটা অল্পদামি টিনের তোরঙ্গ কিনিয়া আনিল। মতিকে বলিল, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও মতি, বাড়ি ঠিক করে এলাম, খেয়ে দেয়ে বাড়িতে গিয়ে উঠব। এ শালার হোটেলে আর মন টিকছে না।

সদ্য ক্রীত টিনের তোরঙ্গটিতে কিছুই ভরা হইল না। কুমুদ বলি, ওটা খালি থাক মতি। বাকি জিনিস সমস্তই বাঁধিয়া ছাঁদিয়া গুছাইয়া নেওয়া হইল, কেবল একটি ফরসা চাদর পাতা রহিল চৌকিটাব উপরে, একটা বালিশও রহিল। আলনায় ঝুলানো রহিল ছেঁড়া একটা পাঞ্জাবি, একখানা পুরানো কাপড় ও একটা গেঞ্জি। তারপর কুমুদ চাকরকে পাঠাইয়া দিল গাড়ি ডাকিতে।

খবর পাইয়া ম্যানেজার ছুটিয়া আসিল। বলিল, চললেন নাকি কুমুদবাবু?

কুমুদ বলিল, স্ত্রীকে রেখে আসতে যাচ্ছি বাপের বাড়ি, কাল ফিরব বিকেলের দিকে। জিনিসপত্র রইল, একটু নজর রাখবেন ঘরটার দিকে।

ম্যানেজার বলিল, টাকা দেবেন বলেছিলেন আজ?

কাল দেব। কাল নিশ্চয় পাবেন।

আশেপাশেই রহিল ম্যানেজার। গাড়ি আসিলে এবং জিনিসপত্র তোলা হইলে কুমুদ যখন ঘরে তালা বন্ধ কবিল, ঘরের মধ্যে নতুন তোরঙ্গ, চৌকির বিছানা ও আলনাব জামা কাপড় দেখিয়া ম্যানেজাব একটু আশ্বস্ত হইল।

গাড়িতে উঠিয়া মতির মুখে কথা সরে না। কুমুদ মৃদুমৃদু হাসে। বলে, ভাবছ ম্যানেজাবকে ঠকালাম? টাকা দিয়ে যাব মতি।

কাল আসবে?

কাল কি আব আসব, হাতে টাকা হলেই আসব। মিছামিছি গোলমাল করত টাকার জন্য, তাই একটু কৌশল কবলাম, নইলে কাউকে আমি ঠকাই না মতি, দু-চাব মাসের মধ্যে টাকাটা একদিন ঠিক দিয়ে যাব।

ঘবঘব শব্দে গাড়ি চলে। কোথায় যাইতেছে তারা? আকাশ-পাতাল ভাবে মতি, কুমুদের কাছে থাকিয়া তার যেন বিপদের ভয় হয়, কুমুদ যেন ভয়ানক মানুষ। অনেকক্ষণ চলিয়া সরু একটা গলিব মধ্যে ছোটো একতলা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াইল। একটু পরেই দরজা খুলিল বনবিহাবী, জয়াও আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, মঙ্গলঘট স্থাপনের সময় পাইনি, বাড়িতে শাঁখ নেই, উলু দিতেও জানি না,—মাপ কোরো কুমুদ।

ছোটো বাড়ি, পাশাপাশি দুখানা শয়নঘর, সামনে একরত্তি একটু রোয়াক ও ছোটো উঠান, এ পাশে রান্নাঘর এবং তাব লাগাও পাযরার খোপের মতো একটি বাড়তি ঘর। উঠানে দাঁড়াইয়া মতিকে এদিক ওদিক চাহিতে দেখিয়া জয়া বলিল, বাড়ি বুঝি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

মতি দ্বিধাভাবে বলিল, মন্দ কী?

জয়া বলিল, যে তাড়াহুড়ো করে এলাম কাল বিকেলে! ঘরদোর এখনও সাফ পর্যন্ত কবা হয়নি। যাক, দুজনে হাত চালালে সব ঠিক করে নিতে আর কতক্ষণ।—আমি এ ঘরখানা নিয়েছি, এ ঘরে জানালা বেশি আছে একটা, মোটা মানুষ একটু আলো বাতাস নইলে হাঁপিয়ে উঠি। তোমার ঘরখানা একটু ছোটো হল। তা হোক! তুমি মানুষটাও ছোটো, নতুন সংসারে জিনিসপত্রও তোমার কম, ওতেই তোমার কুলিয়ে যাবে।

বাড়িঘর সাফ হয় নাই বটে, নিজের ঘরখানা জয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই গুছাইয়া ফেলিয়াছে। জিনিসপত্র নেহাত কম নয় জয়ার, তবে সবই প্রায় কমদামি। জিনিসের চেয়ে ঘরের ছবিগুলিই মতিব দৃষ্টি আকর্ষণ করিল বেশি। সব ছবিই হাতে আঁকা, ছোটো-বড়ো, বাঁধা-আবাঁধা, ওয়াটার কলার, অয়েল

পেন্টিং প্রভৃতি রং-বেরঙের অসংখ্য ছবিতে চারিটা দেয়াল এক রকম ঢাকিয়া গিয়াছে। খুব বড়ো একটা ছবি দেখিয়া মতি হঠাৎ লজ্জা পায়।

জয়া খিলখিল করিয়া হাসে, বলে উনি আমার উর্বশী-সতিন ভাই। আকাশ থেকে পৃথিবীতে নামছেন কিনা, বাতাসে তাই শাড়িখানা উড়ে গিয়ে পেছনের মেঘ হয়েছে। একজন সাতশো টাকা দর দিয়েছে, ও হাঁকে হাজার। আমি বলি দিয়ে দাও না সাতশোয়েই, সাতশো টাকা কী কম, আপদ বিদেয় হোক। আসলে ওর বেচার ইচ্ছেই নেই।

মতি বলিল, মুখখানা আপনাব মতো।

তাই তো হাজার টাকা দর হাঁকে!---জয়া হাসিল।

জয়ার সাহায্যে মতি ঘর গুছাইয়া ফেলিল। সামান্য জিনিস, জয়ার ঘরের সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজের ঘরখানা মতির খালি খালি মনে হইতে লাগিল, খেলাঘরের মতো ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু সেই দিন বিকালেই জিনিস আসিল। কোথা হইতে টাকা পাইল কুমুদ সেই জানে, হোটেলের পাওনা ফাঁকি দিক, কৃপণ সে নয়। টেবিল, চেয়ার, আলনা, বড়ো একটা তক্তপোশ আনিয়া সে ঘর বোঝাই করিয়া ফেলিল, নীল শেড দেওয়া সুন্দর একটি টেবিল ল্যাম্প ও মতির জন্য ভালো একখানা শাড়িও কিনিয়া আনিল।

এগারো

নতুন আশার সঞ্চারে মতির মন আবার মোহে ভরিয়া যায়। চৌকিতে সে সযত্নে বিছানা পাতে ; টেবিলে সাজাইয়া বাখে তাহার সামান্য প্রসাধনের উপকরণ ; কাপড় জামা কুঁচাইয়া গুছাইয়া রাখে আলনায়। টেবিল-ল্যাম্পে তেল ভরিয়া সন্ধ্যা হইতে না হইতেই জ্বালিয়া দেয়। বারবাব সলিতাটা বাড়ায় কমায়। কতখানি বাড়াইবে ঠিক করিতে পারে না।

আর বাড়াব? না কমিয়ে দেব? একটু কমিয়েই দি কী বল?

কুমুদ হাসিয়া বলে, থাক না, ওই থাক।

জয়াই এ বেলা রাঁধিয়াছে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর জয়ার জন্য ঘরে যাইতে মতির আজ প্রথম লজ্জা করিল। জয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিল, দাঁড়িয়ে কেন? ঘরে যাও।

তুমি আগে যাও দিদি।

কার ঘরে যাব, তোর? হাসির চোটে দাঁত মাজা হয় না জয়ার। মতি অবাক মানে। কী এমন রসিকতা যে এত হাসি! তারপর মুখ ধুইয়া মতির হাত ধরিয়া জয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল। বলিল, ঘরে আসতে বউ তোমার লজ্জা পাচ্ছে কুমুদ।

কুমুদ চিত হইয়া বই পড়িতেছিল। বলিল, তাই নিয়ম যে। বোসো।

না যাই, ঘুম পেয়েছে, বলিয়া জয়া সেই যে চেয়ারে বসিল আর ওঠে না। বসিয়া বসিয়া গল্প করে কুমুদের সঙ্গে। কী যে সে গল্প আগামাথা কিছুই মতি বুঝিতে পারে না, থাকিয়া থাকিয়া জয়ার মুখ হইতে ইংবাজি শব্দ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত করে। বন্ধু, জয়া কুমুদের বন্ধু! কুমুদ যখন রাজপুত্র প্রবীরের রূপ ধরিয়া গাওদিয়ায় উদয় হয় নাই তখন হইতে বন্ধু। ঈর্ষায় মতির ছোটো বুকখানি উদ্‌বেলিত হইয়া ওঠে। সন্ধ্যার আনন্দের আর চিহ্নও থাকে না।

হোটেলের বন্দী-জীবন ও কুমুদের বন্ধুদের আড্ডা হইতে মুক্তি পাইয়া মতি এখানে হাঁপ ছাড়িয়াছে ; এখন শুধু গাওদিয়ার জন্য মন কেমন করে। আশায় কচি মেয়েটা বুক বাঁধিয়াছে, স্বপ্ন তো সে কম

দেখিত না, সেগুলি যদি সফল হয় এবার। কিন্তু নিজেকে এখানেও সে মিশ খাওয়াইতে পরে না। আজন্মের অভ্যাস ও প্রকৃতি এখানেও ঘা খাইয়া আহত হয়। গাঁয়ের চেনা রূপ, চেনা মানুষগুলির কথা মনে পড়িয়া মতির চোখ ছলছল করে। কতদিন ওদের সে দেখিতে পায় নাই। সন্ধ্যার সময় পরান হয়তো মোক্ষদা ও কুসুমের সঙ্গে তার কথা বলাবলি করে। শশীও হয়তো কোনোদিন আসিয়া বসে। কবে কুমুদ তাহাকে গাওদিয়ায় লইয়া যাইবে কে জানে!

মতি বলে, এখেনে তো আমরা থির হয়ে বসলাম, এবার দাদাকে একটি পত্র দাও? কত ভাবছে ওরা।

কুমুদ বলে, এর মধ্যে ভুলে গিয়েছ মতি?

কী? কী ভুলে গিয়াছি?

আমায় বলনি গাওদিয়ার কথা ভুলে যাবে, কোনো সম্পর্ক থাকবে না গাওদিয়ার সঙ্গে? ভালো করে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিইনি বিয়ের আগে, আমার সঙ্গে আসতে হলে জন্মের মতো আসতে হবে? চিঠি লেখালেখি চলবে না, তাও বলেছিলাম মতি।

সেই কথা! তালবনের সেই অবুঝ বিহ্বল ক্ষণের প্রতিজ্ঞা! কুমুদ সে কথা মনে রাখিয়াছে? মতির বড়ো ভয় হয়। কুমুদ যা বলিয়াছিল তাই সে স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে তো তখন বুঝিতে পারে নাই রাজপুত্র প্রবীরের সঙ্গে থাকিলেও গাওদিয়ার জন্য কোনোদিন তাহার মন কেমন করিবে। নতুন জীবন, নতুন জগৎ, পুতুলের মতো কুমুদের হাতে নড়া-চড়া—এ কল্পনাতেই তার যে ভাবিবার বুঝিবার শক্তি থাকিত না। কুমুদ কী সে কথা আজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে নাকি?

মতি ক্ষীণস্বরে বলে, সে তো সত্যি নয়?

তাই বুঝি ভেবেছিলে তুমি, তামাশা করছি?

দিন কাটিয়া যায়। জীবনে আর কোনোদিন গাওদিয়ায় যাইতে পাইবে না ভাবিয়া মতির যখন কষ্ট হয় না, কাঁচা মনে তখন কম-বেশি আশা আনন্দের সঞ্চার হয়। শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব থাকিলেও জীবন এখানে মোটামুটি নিয়মানুবর্তী। আর মাঝে মাঝে কুমুদকে যতই ভয়ানক, নির্মম ও পর মনে হোক, কী একটা আশ্চর্য মন্ত্রে কুমুদ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। একটু নির্ভর শিখিয়াছে মতি। সে জানে আবোলতাবোল খরচ করিয়া যত নিঃস্বই কুমুদ হোক, টাকার জন্য কখনও তার আটকায় না। তা ছাড়া, চারিদিকে ধার করিয়া রাখিয়া কপর্দক-শূন্য অবস্থাতেই কুমুদ যেন সুস্থ থাকে। টাকা তাকে কামড়ায় ; ঘরে টাকা থাকিলে রাত্রে যেন তার ঘুম আসে না। তা ছাড়া, আরও একটা ব্যাপার মতি ক্রমে ক্রমে টের পাইয়াছে। তাহাকে ভাঙিয়া গড়িবার কল্পনাটা কুমুদ শুধু মুখেই বলিতে ভালোবাসে, কাজ কিছু করিবার তার উৎসাহ নাই। জীবনে আর কিছুই কুমুদ চায় না, যখন যা খেয়াল জাগে সেটা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলেই সে খুশি। নিয়ম, দায়িত্ব, ভালো-মন্দ, উচিত-অনুচিত এগুলি তার কাছে বিষের মতো। কথা-সর্বস্বও বটে কুমুদ। সে যখন বড়ো বড়ো কথা বলে, সায় দিয়া যাওয়াই যে যথেষ্ট, এটুকু জানিয়াও একদিকে মতি খুব নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তবে কুমুদের সেবা করিয়া করিয়া মতি বড়ো শ্রান্তি বোধ করে, জ্বালাতন হয়। এক এক সময় তাহার মনে হয় যে কুমুদের বুঝি সে বউ নয়, দাসী,— সিগারেট ধরানো হইতে পা টিপিয়া দেওয়া পর্যন্ত অসংখ্য সেবা করিবে বলিয়া অত ভালোবাসিয়া কুমুদ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। একটু খেলা চায় মতি, নিজের একটু আরাম বিলাস। কুমুদের জ্বালায় তা জুটিবার নয়।

আগ্রহের সঙ্গে মতি জয়া ও বনবিহারীর জীবনযাত্রা লক্ষ করে। জীবনকে ওরা এই ক্ষুদ্র গৃহাংশে আবদ্ধ করিয়াছে ; বাহির হইতে কোনোরকম বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা নাই। সারাদিন ছবি আঁকে বনবিহারী, শুধু ছবি বেচিবার জন্য বাহিরে যায়, বাকি সময় ঘরে বন্দী করিয়া রাখে নিজেকে।

কখনও স্বচ্ছলতা আসে, কখনও অভাব দেখা দেয়। টাকা পয়সা সম্বন্ধে বনবিহারী কুমুদের ঠিক বিপরীত। একটি পয়সা সে কখনও ধার করে না। এ বিষয়ে জয়া আরও কঠোর। দুটি পরিবার এক বাড়িতে বাস করিতেছে, কিন্তু তাদেব মধ্যে আলু-পটলের বিনিময়ও জয়া বরদাস্ত করিতে পারে না। একদিন জয়াকে বাড়তি তরকারি দিতে গিয়া মতি যা ঘা খাইয়াছিল, কোনোদিন ভুলিবে না।

নষ্ট হবে, ফেলে দেব, তবু নেবে না দিদি?

না রে, না। দেওয়া-নেওয়া আমি ভালোবাসি না।

আচ্ছা আচ্ছা, বেশ! আমি যদি কোনোদিন তোমার কাছে এক টুকরো নেবু পর্যন্ত নিই—

কে দিচ্ছে তোকে?

রাগ হইলে মতির গ্রাম্যতা প্রকাশ পায়। সে বলিয়াছিল, তোমার বড়ো ছোটো মন দিদি! অহংকারে ফেটে পড়ছ!

জয়া কিছু বলে নাই। একটু হাসিয়াছিল।

মতির রাগকে শুধু নয়, তাহার সমস্ত গ্রাম্যতা ও সংকীর্ণতাকেও জয়া হাসিয়া উপেক্ষা করে। সংকীর্ণতাও মতির এক বিষয়ে নয়। তারা আসিয়া পৌঁছিবার আগেই জয়া যে সুযোগ পাইয়া ভালো ঘরখানা বেদখল করিয়াছিল, মতির মনে সে কথা গাঁথা হইয়া আছে। সোজাসুজি কিছু না বলিলেও নিজের অজ্ঞাতে কতবার সে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। একই রান্নাঘর তাদের, পাশাপাশি উনান। মতি যেদিন ভালো মাছ-তরকারি রাঁধে, সেদিন রান্নাঘরের আবহাওয়া হইয়া থাকে সহজ। কিন্তু জয়া যেদিন রান্নার ঘটায় তাহাকে ছাড়াইয়া যায় সেদিন মতির অস্বস্তির সীমা থাকে না। সে যেন ছোটো হইয়া যায়। আড়চোখে আড়চোখে সে জয়ার রান্না তরকারির দিকে তাকায, মুখখানা কালো হইয়া আসে মতির। বনবিহারী জয়াকে বড়ো ভালোবাসে, যত নির্বাক ও নেপথ্য হোক সে ভালোবাসা, মতিরও বুঝিতে বাকি থাকে না। জয়ার কাছে তাই সে আকারে ইঙ্গিতে কুমুদের অসীম ভালোবাসা প্রমাণ করিতে চাহিয়া হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া বসে।

জয়া নীরবে হাসে।

হাসছ যে দিদি?

হাসব না? তুই যে হাসাস।

মতি গম্ভীর হইয়া বলে, অত হাসি ভালো নয়।

জয়ার সঙ্গে খাপ খায় না মতির। মেলামেশা আছে, গল্পগুজব আছে, প্রীতি যেন তবু জমে না। আত্মীয়ার মতো ব্যবহার করিয়াও জয়া যেন অনাত্মীয়া হইয়া থাকে, ছোটো বোনটির মতো তাহার প্রতি নির্ভর রাখিয়া মতি সুখ পায় না। মিলিয়া মিশিয়া যে দিনটা ভালোই কাটে, সেদিনও সন্ধ্যায় মৃদু ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয়, সবই তো আছে, ভালোবাসা কই? আসিবার সময় পথে ট্রেনে একটি বউয়ের সঙ্গে মতির গলায় গলায় ভাব হইয়াছিল, এও যেন তেমনই পথের পীরিতি। এত ঘনিষ্ঠতায় সমবেদনার আনন্দ কই? টাকা-পয়সার এবং আরও কয়েকটি সুবিধার জন্যই কি তারা একত্র বাসা বাঁধিয়াছে, আর কোনো সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে না তাদের মধ্যে? জয়ার দোষ নাই। কাঁচা মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে সে যা চায়, খানিকটা উচ্ছ্বাসভরা আদর মমতা, জয়া কেন তা দিতে পারিবে? তার শিক্ষা-দীক্ষা অন্য রকম। গেঁয়ো বলিয়া অবহেলা সে মতিকে করে না, রাঁধিতে শেখায়, চুল বাঁধিয়া দেয়, সদুপদেশ শোনায়, সান্ত্বনা দেয়। ভাবপ্রবণতা জয়ার নাই। মতি তাকে নিষ্ঠুর মনে করে।

তা ছাড়া জয়ার মনে একটা গভীর দুঃখ আছে। স্বামীর প্রতিভা তাহার অর্থাভাবে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। বিবাহ সে করিয়াছিল আর্টিস্টকে, যার ভবিষ্যৎ ছিল ভাস্বর, ঘর সে করিতেছে পটুয়ার। সমবেদনার প্রয়োজন জয়ার নিজেরও কম নয়। অথচ মতি তার এ দুঃখের স্বরূপ বোঝে না। একদিন

মতিকে বলিতে গিয়া তাহার বুঝিবার শক্তির অভাবে জয়া আহত হইয়াছে। বিপুল সম্ভাবনাপূর্ণ কত বড়ো একটা জীবন যে ঘরের পাশে পঙ্গু হইয়া আছে, মতির তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই জানিয়া মেয়েটার প্রতি একটু বিরূপ হইয়াছে বইকী জয়ার মন!

হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও কুমুদ ও তার সম্বন্ধে মতির ঈর্ষা ও সন্দেহটা কিছু কিছু জয়া যে টের পায় নাই এমন নয়।

বেপরোয়া কুমুদ যে জয়াকে কিছু কিছু ভয় করে মতি আজকাল তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। এখানে সে যে অনেকটা সংযত হইয়া আছে তা জয়ার জন্যই।

এমন বাঁকাভাবে মতি জয়াকে এই কথাটা শোনায় যে জয়া মনে মনে রাগ করে।

কী যে তুই বলিস! কেন, আমাকে ভয় করে চলবে কেন?

তোমাকে যেন সমীহ করে চলে দিদি!

কী করে তুই তা জানলি?

মতি সগর্বে বলে, আমি ও সব জানতে পারি দিদি, যত বোকা ভাব অত বোকা আমি নই।

জয়া বিরক্তভাবে বলে, তাই দেখছি।

হোটেলে বনবিহারী অল্প সময়ের জন্য যাইত, তখন তাকে মতির যে রকম মনে হইয়াছিল এখানে দেখিল সে একেবারেই অন্যরকম। ভয়ানক ব্যস্ত মানুষ, সময়ের সব সময়েই অভাব। ছবি আঁকিতে আঁকিতে শ্রান্তিও কি আসে না লোকটার! তুলিটি হাতে ধরাই আছে। প্রথমে মতির মনে হইয়াছিল সে বুঝি হাসি তামাশা খুব ভালোবাসে, হোটেলের ঘরে কী ভাবেই সে হাসাইত মতিকে! এখানে বনবিহারীকে তার মনে মনে হয় একটু ভোঁতা, একটু নিস্তেজ। তার কাছে স্বামীকে জয়া একদিন যে রকম প্রতিভাবনা তেজস্বী মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল, বনবিহারী সে রকম একেবারেই নয়। বরং তাকে ভীরুই বলা যায়। জয়াকে সে যে অন্তত খুব ভয় করে, কুমুদের চেয়ে বেশি, তাতে সন্দেহ নাই। এমন নিরীহ সাধারণ লোকটির সম্বন্ধে জয়ার ও রকম ধারণা কেন মতি বুঝিতে পারে না! খুব বড়ো কিছু করিতে পারিত বনবিহারী, দেশ-বিদেশে নাম ছড়াইত, কেবল দারিদ্র্যের জন্য পারিয়া উঠিল না,—মতির মনে হয় এই আপশোশ জয়া তৈরি করিয়াছে নিজে। ছবি আঁকিয়া মানুষ নাকি আবার বড়ো হয়!

প্রতিভা, আর্ট শিল্পীর প্রতিষ্ঠালাভ এ সব যে কী পদার্থ, মতির তা জানা নাই, তবু জয়া ও বনবিহারীর সম্পর্কের খাপছাড়া দিকটা সে বেশ উপলব্ধি করিতে পারে। তেজ যা আছে জয়ারই আছে, স্বামীকে সে মনে করে হইতে-পারিত লাট সাহেব! নিজের ক্ষমতার পরিচয় রাখিয়াও জয়ার ভয়ে বনবিহারী এতে সায় দিয়া চলে, নিপীড়িত বঞ্চিত সাজিয়া থাকে জয়ার কাছে। গরিব গৃহস্থকে স্ত্রীর কাছে রাজ্যচ্যুত রাজার অভিনয় করিতে হইলে যেমন হয় বনবিহারীরও তেমনি বিপদ হইয়াছে।

জয়া বলিয়াছিল, আমার যদি টাকা থাকত মতি! টাকার জন্য ওঁকে যদি ছবি আঁকতে না হত!

টাকার জন্যেই তো সবাই সব কাজ করে দিদি, করে না?

বাজে লোকে করে। যারা কবি আর্টিস্ট তাদের কি ও সব তুচ্ছ দিকে নজর দিলে চলে?

মতি একটু ভাবিয়া বলিয়াছিল, টাকা জমাও না কেন? হাতে টাকা এলেই যা করে সব খরচ কর, তোমার স্বভাবও ওর মতো দিদি।

জয়া বলিয়াছিল, তুই ও সব বুঝবি না মতি। শিল্পীর মন কত কী চায়, কিছুই জোগাতে পারি না! টাকা থাকলে তবু দুদিন স্বচ্ছলভাবে চালাই, কোনো খোরাক তো পায় না প্রতিভার।

মতি গিয়া কখনও পিছনে দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে বনবিহারীর ছবি আঁকা দ্যাখে। বনবিহারীর ছবিতে গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর, মানুষ, মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ সবই তার কেমন অদ্ভুত মনে হয়।

টের পাইয়া বনবিহারী ফিরিয়া তাকায়। তাকায় স্নেহপূর্ণ চোখে। বলে, সময় পেলেই তোমার একখানা ছবি এঁকে দেব খুকি!

ছবি চাই না।—মতি বলে।

কেন, রাগ হল কেন?

খুকি বলতে বারণ করিনি?

বনবিহারী হাসে। বলে, যদ্দিন তোমার খুকি না হয় খুকি ছাড়া তোমাকে কিচ্ছুটি বলব না বোন, কিচ্ছুটি নয়।

এদিকে মতির চোখে পড়ে জয়া ইশারায় ডাকিতেছে। কাছে গেলে জয়া গম্ভীর মুখে বলে, ছবি আঁকবার সময় ওঁকে বিরক্ত করিস না মতি।

মতি রাগিয়া ভাবে, ওঃ, একবার হুকুম শোনো মুটকির!

একদিন মতি তাহার হারটি খুঁজিয়া পায় না। শশীর উপহার দেওয়া হার, কী হইল সেটা। আগের দিন কুমুদ দোকানে কিছু টাকা দিয়াছে, বাড়িভাড়ার টাকা দিয়াছে জয়ার হাতে। মতির তা মনে পড়ে, তবু বাক্‌সো-প্যাঁটরা আনাচ-কানাচ সে পাতিপাতি করিয়া খোঁজে। তালপুকুরের ধারে একদিন তার কানের মাকড়ি হারাইয়াছিল, না বলিতে কুমুদ তাহাকে কিনিয়া দিয়াছিল নতুন মাকড়ি। আজ কি সে শশীর উপহার, তার বিবাহের অলংকার, তাকে না বলিয়া আত্মসাৎ করিবে?

হার হারাইয়াছে শুনিয়া জয়া অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। দুটি গরিব পরিবারের একসঙ্গে বাস করার এই একটা শ্রীহীন দিক আছে. একজনের দামি কিছু হারাইলে অন্যজনের মনে এই চিন্তাটা খচখচ করিয়া বিঁধিতে থাকে যে, কে জানে কার মনে কী ভাব জাগিতেছে! এ আর কে না জানে যে দারিদ্র্য সবই সম্ভব করিতে পারে?

খোঁজ মতি ভালো করে খোঁজ। কলতলায় পড়েনি তো? রান্নাঘরে?

মতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, গলায় পরিনি তো, বাস্‌কোয় ছিল। ও আর পাওয়া যাবে না দিদি!

কুমুদ ফিরিলে জয়াই তাহাকে খবরটা দিল। কুমুদ বলিল, হারাবে কেন? আমি বিক্রি করেছি।

সেকি কুমুদ? জয়ার চমক লাগিল।

কুমুদ বলিল, হার থেকে কী হত? টাকাটা কাজে লাগল।

মতি কাঁদিতেছিল। জয়া বলিল, টাকা কাজে লাগে, হার কি কাজে লাগে না কুমুদ?

কুমুদ বলিল, গয়না যে সব মেয়েমানুষের সর্বস্ব আমি তাদের দুচোখে দেখতে পারি না।

জয়া এবার রাগ করিয়া বলিল, মেয়েমানুষ বোলো না কুমুদ, ছেলেমানুষ বলো।

ছেলেমানুষ তো গয়না সম্বন্ধে আরও উদাসীন হবে।

জয়ার রাগ বড়ো আশ্চর্য। মুখে চোখে দেখা দেয় না, কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া ওঠে না, তবু টের পাওয়া যায়। সে বলিল, জগৎটা যদি তোমার মনের মতো হত কী করে তাতে বাস করতাম ভাবি। বাড়িভাড়ার টাকা না হয় পরেই দিতে? কুমুদ বলিল, তুমি বুঝি ভেবেছ বাড়িভাড়ার টাকা দেবার জন্যই আমি হার বিক্রি করেছি?

অনেকদিন থেকে তোমায় জানি কুমুদ, আমার কাছে হেঁয়ালি কোরো না। জয়া আর দাঁড়াইল না। সজল চোখে মতি চাহিয়া দেখিল যে জীবনে আজ প্রথম কুমুদের মুখ কালো হইয়া গিয়াছে!

তখন সকাল। সারাদিন মতি মুখভার করিয়া রহিল। কুমুদ তাহাকে একবারও ডাকিল না। বেলা পড়িয়া আসিলে মতির বুক ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। এ কী অবহেলা কুমুদের? গয়নার জন্য কত কষ্ট হইয়াছে তার মনে, ডাকিয়া দুটি মিষ্টিকথা পর্যন্ত সে তাকে বলিল না? দোষ স্বীকার করিয়া

একটি চুমু দিলেই সে তো ক্ষমা করিয়া ফেলিত! হয়তো হারটির জন্য এতটুকু দুঃখও আর তার থাকিত না।

সন্ধ্যার খানিক আগে কুমুদ হঠাৎ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, কলের নীচে মাথাটা পাতিয়া দিয়া মতিকে বলিল, বেড়াতে যাবে তো, কাপড় পরে নাও।

মতি বোয়াকে তাহার সাধের টেবিল ল্যাম্পটি সাফ করিতেছিল, কথা বলিল না। শুধু শেডটা নীচে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

মাথা মুছিতে মুছিতে কুমুদ আবার বলিল, কাপড় পরে নিতে বললাম যে মতি?

মতি সজলস্বরে বলিল, আমি যাব না।

চলো, থিয়েটার দেখাব।

না, বলিয়া মতি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু কুমুদের কাছে তাহার অভিমান টিকিবার নয়। সাজিয়া গুজিয়া কুমুদের সঙ্গে মতিকে থিয়েটারে যাইতেই হইল। সেইখানে, স্টেজে যখন মাতাল যোগেশ 'সাজান বাগান শুকিয়ে গেল' বলিয়া মতির বুকে কান্না ঠেলিয়া তুলিতেছে, কুমুদ তাকে খবরটা জানাইল।

এখানে চাকরি পেয়েছি মতি।

মতি মুখ ফিরাইয়া বলিল, কী বললে?

এই থিয়েটারে চাকরি পেয়েছি। একশো টাকা মাইনে দেবে।

যোগেশের সাজানো বাগানের শোক পলকে মতির কাছে মিথ্যা হইয়া গেল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল, এখানে তুমি পার্ট করবে? কবে করবে?

এ নাটকের পরে যে নাটকটা হবে, তাতে।

তারপর আর তো মতির মনে এতটুকু ব্যথা বা আপশোশ থাকে না। সব কুমুদের ছল, হোটেলের ঘরে বন্ধুদের আনা, ম্যানেজারকে ঠকানো, জয়ার সঙ্গে মাখামাখি, হার বিক্রি করা, সব কুমুদ তাকে পরীক্ষা করার জন্য করিয়াছে। ও সব খেলা কুমুদের। এতদিন মজা করিতেছিল তাকে লইয়া, এবার কুমুদ তাকে ঘিরিয়া তার কল্পনার স্বর্গটি রচনা করিয়া দিবে। আলোকোজ্জ্বল স্টেজের দিকে চাহিয়া যোগেশকে মতি আর দেখিতে পায় না, দ্যাখে রাজপুত্র প্রবীরের বেশে কুমুদকে। সুখে গর্বে মন ভরিয়া ওঠে মতির। বাড়ি ফিরিয়া জয়াকে খবরটা শোনাইতে মতির তর সয় না। জয়া শুনিয়া বলে এরকম চাকরি তো নিচ্ছে আর ছাড়ছে, কমাস টিকে থাকে দ্যাখ। এক কাজ করিস মতি, কুমুদকে লুকিয়ে কিছু কিছু টাকা জমাস।

মনে মনে মতি তা করিতে অস্বীকার করে। লুকাইয়া টাকা জমাইবে না কচু। কী দরকার? টাকার জন্য কুমুদের যে কোনোদিনই আটকাইবে না, এখন হইতে মতির তাহাতে অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। সাজ খুলিতে খুলিতে উত্তেজনায় মতির চোখ জ্বলজ্বল করে। সে বোধ করে একটা অভূতপূর্ব বেপরোয়া ভাব, কীসের হিসেব, ভাবনা কীসের? কে তোয়াক্কা রাখে কবে কীসে কী সুবিধা অসুবিধা হইতে পারে? কী প্রভেদ গয়না থাকা আর না থাকায়? কুমুদের যেমন তুলনা নাই, কুমুদের মতামতগুলিও তেমনি অতুলনীয়। তেজের সঙ্গে টাকা পয়সা রীতিনীতি লইয়া ছিনিমিনি খেলার চেয়ে আর কীসে বেশি মজা? তারপর যা হয় হইবে। কুমুদের বুকে মতি ঝাঁপাইয়া পড়ে। আহ্লাদে গলিয়া গিয়া বলে, ওগো শোনো, নাচগান শেখাবে আমায়, আজ যেমন নাচছিল? ঘরে খিল দিয়ে তোমার সামনে নাচব?

বলে, রোজ থেটার দেখিয়ো, রোজ। বিকেল বিকেল রেঁধে রেখে চলে যাব, আঁা?

বলে, বেচে দেবে তো দাও না, সব গয়না বেচে দাও। ফুর্তি করি টাকাগুলো নিয়ে।

ইস, কী নেশা দায়িত্বহীনতার, গা-ভাসানোর কী মাদকতা! এই তো সেদিন বিবাহ হইয়াছে মতির, গাওদিয়ার গেঁয়ো মেয়ে মতি, এর মধ্যে কুমুদের রোগটা তার মধ্যে সংক্রামিত হইয়া গেল? তবে, এ কথা সত্য যে বিবাহ বেশি দিনের না হোক সম্পর্ক কুমুদের সঙ্গে তার অনেক দিনের। তালপুকুরের ধারে সাপের কামড় খাওয়ার দিন হইতে ভিনদেশি এই কাঁচপোকা গাঁয়ের তেলাপোকাটিকে সম্মোহন করিয়া আসিতেছে।

কুমুদ খুশি হইয়া বলে, আজ তুমি যে এমন মতি?

মতি বলে,—

বিন্দে সুধায় আজকে তুমি এমন কেন রাই,
অধর-কোণে দেখছি হাসি, শ্যাম তো কাছে নাই?

কুমুদ বলে, মানে কী হল?

মতি বলে, বলি গো বলি—

রাই কহিলেন, ওলো বিন্দে, চোখের মাথা খেলি!
ওই চেয়ে দ্যাখ কদমতলে আমরা গলাগলি।

কুমুদ আবার বলিল, মানে কী হল?

মানে? আনন্দের নেশায় এতটুকু গেঁয়ো মেয়ে ছড়া বলিয়াছে, তারও মানে চাই? মানে তো মতি জানে না। অপ্রতিভ হইয়া সে মুখ লুকায়।

দিন পনেরো পরে নতুন নাটক আরম্ভ হইল। পর পর তিনরাত্রি মতি অভিনয় দেখিতে গেল। জয়াকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও একদিনের জন্য কুমুদের অভিনয় দেখাইতে সে লইয়া যাইতে পারিল না। কেবল বনবিহারী জয়াকে লুকাইয়া একদিন দেখিয়া আসিল। চুপিচুপি মতির কাছে প্রশংসা করিয়া বলিল যে অ্যাক্ট করাব প্রতিভা আছে কুমুদের।

অভিনয় না থাকিলে দুপুরে অথবা সন্ধ্যায় কুমুদ রিহার্সাল দিতে যায়। কুমুদ না থাকিলে জয়া রাত্রে মতির কাছে শোয়। ভোরে মতির ঘুম ভাঙে না। কুমুদ বাড়ি আসিয়া মুখের পেন্ট তুলিতে তুলিতে তাকে একবার ডাকে, স্নান করিয়া আসিয়া একবার ডাকে, তারও অনেক পরে মতি ওঠে। কুমুদকে চা করিয়া দেয় জয়াই। অনেক কিছুই করে জয়া মতির জন্য, তবু অনেক বিষয়ে পর হইয়া থাকে।

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল মতির, ঘরের কাজ করিয়া থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখিয়া, বেপরোয়া স্ফূর্তি ও গাওদিয়ার জন্য মনোবেদনায়, আর জয়াকে কখনও ঈর্ষা করিয়া কখনও ভালোবাসিয়া। জয়ার কাছে একটু লেখাপড়া শিখিতেও সে আরম্ভ করিয়াছে। যে নাটকে কুমুদ পার্ট বলে সাতদিনের চেষ্টায় সেখানা মতি পড়িয়াও ফেলিল। মনে আবার আকাশস্পর্শী আশার সঞ্চার হইয়াছে। কত কী কল্পনা করে মতি, গাওদিয়ার সেই পুরানো কল্পনার স্থানে নব নব কল্পনার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তা ছাড়া, এতদিনে আবার যেন নতুন করিয়া কুমুদকে সে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছে। মনে হয়, এই যেন আসল ভালোবাসা; গাওদিয়ার তালবনের ছায়ায় শুধু ছিল খেলা, এতদিনে রোমাঞ্চময় গাঢ় প্রেমের সম্ভাবনা আসিয়াছে। মাঝখানে কী হইয়াছিল মতির? মনটা কি তার অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল? কই, কুমুদের চুম্বনে এমন অনির্বচনীয় অসহ্য পুলক তো জাগিত না,—যেন কষ্ট হইত, ভালো লাগিত না। বসন্তকালে এবার কি জীবনে প্রথম বসন্ত আসিল মতির? কুমুদ যখন বই পড়ে কাজের ফাঁকে বারবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিয়াই কত সুখ মতির; কুমুদ যখন বাহিরে থাকে তখন দেহে মনে অকারণে কী এক অভিনব পুলক-প্রবাহ অবিরাম বহিয়া যায় : শিথিল অবসন্ন ভঙ্গিতে বসিয়া থাকিতে যেমন ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে চলাফেরা হাত-পা নাড়ার কাজ। বাসন মাজার মধ্যেও যেন রসের সন্ধান মেলে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যে যেন সুধা ছড়ানো আছে।

জয়া বলে, কী রে, কী হয়েছে তোর? চাউনি যেন কেমন কেমন, থেকে থেকে এলিয়ে পড়িস, গদগদ কথা বলিস,---ব্যাপারখানা কী?

কী হইয়াছে মতি নিজেই কি তা জানে? মূঢ়ের মতো একটু মাথা নাড়ে। জয়া হাসিয়া বলে, তোকে চৈতে পেয়েছে। কাব্য লেগেছে মতি।

তখন গেঁয়ো মেয়ে মতি জয়াকে কী একটা বুঝাইতে চাহিয়া বলে, মনটা উড়ুউড়ু করছে দিদি।

তাকেই চৈতে পাওয়া বলে।

জয়া একটু গম্ভীর হইয়া যায়। এক প্রকার নতুন দৃষ্টিতে সে যেন বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাকায় মতির দিকে। মতি একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বলে, তোমার কবছর বিয়ে হয়েছে দিদি?

দুবছর।

মোটে? অনেক বয়সে বিয়ে হয়েছে বল?

তোর তুলনায় অনেক বইকী। চল তো মতি তোর ঘরে যাই, কটা কথা জিজ্ঞেস করব।

কুমুদ কোথায় কী ভাবে মতিকে আবিষ্কার করিযাছিল সে কথা জানিতে জয়া কখনও কৌতূহল দেখায় নাই। আজ মতিকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় সব কথাই। গভীর ও গোপন যে সব কথা কারও কাছে কোনোদিন প্রকাশ করা চলিতে পারে বলিযা মতি ভাবিতেও পারে নাই। এতকাল পরে হঠাৎ জয়ার সমস্ত জানিবার আগ্রহ দেখিয়া মতি আশ্চর্য হইযা গেল। সংক্ষেপে, রাখিয়া-ঢাকিয়া যে বলিবে জয়া তাও করিতে দিল না। সত্যের উপরে আরও কিছু বাড়াইয়া বলিলেই সে যেন খুশি হয়।

তারপর জয়া বলিল, তবে তো কুমুদ তোকে সত্যিই ভালোবাসে মতি?

এমন করিয়া এ কথা বলিবার মানে? কুমুদ তাকে ভালোবাসে না, তাই ভাবিয়াছিল নাকি জয়া? মতি সগর্বে জয়ার দিকে তাকায়। ভুল তো ভাঙিল তোমার, কুমুদের অনেকদিনের বন্ধু? আর মতির সঙ্গে চালাকি করিতে আসিও না।

কুমুদ শেষে তোকে ভালোবাসল মতি? জয়া বলে।

মতি আহত হইয়া জবাব দেয়, বাসবে না তো কী? আমি ওর কত জন্মের বউ তা জান?

তাও জানিস মতি, জন্মে জন্মে তুই ওর বউ ছিলি? তুই অবাক করেছিস মতি। রূপগুণ বিদ্যাবুদ্ধি নাচগান দিয়ে কেউ যাকে বাঁধতে পারেনি তাকে তুই কাবু করলি, একফোঁটা মেয়ে! কম তো নোস তুই!

কে ওকে বাঁধতে পারেনি দিদি? সে কে? চেনো?

চিনি, তোকে বলব না।

বলো না দিদি বলো। পায়ে পড়ি বলো।

জয়া মৃদু বিপন্ন সুরে বলিল, বলে তোকে একটু কষ্ট দিতে সত্যি ইচ্ছা হচ্ছে মতি। তবু বলব না। কী করবি শুনে? তারা সব কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কে কী অবস্থায় আছে, কিছুই ঠিক নেই। তা ছাড়া তোর ভয় কী মতি? কেউ আর পারবে না ছিনিয়ে নিতে। ফিরে গিয়েছিল, একবার চলে এসে তোর জন্যে আবার ফিরে গিয়েছিল গাওদিয়ায়!

জয়ার ভাব দেখিয়া মনে মনে বড়ো ভয় পায় মতি, হঠাৎ কী হইল জয়ার? কুমুদকে যারা বাঁধিতে পারে নাই জয়াও কি তাদের একজন নাকি? তা যদি হয় তবে তো বড়ো কষ্ট জয়ার মনে! তাকে লইয়া কোন বুদ্ধিতে কুমুদ এখানে জয়ার সঙ্গে একত্রে বাস করতে আসিয়াছিল? জয়ার জন্য ক্রমে ক্রমে মতির মন মমতায় ভরিয়া যায়। হিংসার চেয়ে সমবেদনাই সে বোধ করে বেশি।

কদিনের মধ্যেই মতি বুঝিতে পারে জয়ার যা হইয়াছে তা সাময়িক নয়। সে যেন স্থায়ীভাবেই মুষড়াইয়া গিয়াছে। কাজে যেন উৎসাহ পায় না, প্রতিভাবান স্বামীর সুখ-সুবিধা ও আরামের ব্যবস্থা করিতে সব সময় ব্যাকুল হইয়া থাকে না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কী যেন একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়। মাঝে মাঝে মতি টের পায় কুমুদ ও তার মধ্যে প্রকাশ্য কথা ও ভাবের আদান-প্রদানগুলি জয়া নিবিড় মনোযোগেব সঙ্গে লক্ষ করিতেছে। কী আছে জয়ার মনে? এমন তার নজর দেওয়া কেন? ভয়ে মতির বুক টিপটিপ করে।

অবসর সময়ের, কখনও কাজ ফেলিয়াও, একটা বড়ো ক্যানভাসে বনবিহারী তুলি বুলায়। এই ক্যানভাসটিকে জয়া এতদিন গৃহ-দেবতার মতো যত্ন করিত, সাবধানতার সীমা ছিল না। এটি নাকি বিক্রির জন্য নয়, লোকের ফরমাশি নয়, প্রতিভার ফরমাশে প্রেরণার মুহূর্তগুলিতে বনবিহারী এতে রং দেয়; একদিন দেশবিদেশের এক্‌জিবিশনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ছবিটি চিত্রকরকে যশস্বী কবিবে। অত সব মতি বোঝে না। সে শুধু জানে সমস্ত ছবির মধ্যে এই ছবিখানা বিশেষ একটা কিছু, শেষ হইয়া গেলেই ছবিখানাকে উপলক্ষ করিয়া বড়ো বড়ো ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে। দিনের পর দিন জয়া ও বনবিহারীকে ছবিখানার বিষয়ে সে আলোচনা করিতে শুনিয়াছে। কদিন এ আলোচনাতেও জয়ার যেন প্রবৃত্তি ছিল না। অথচ মাঝে মাঝে ঢাকা তুলিয়া তীব্র তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সমাপ্ত-প্রায় ছবিখানার দিকে মতি তাহাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। জয়ার মতো ঈষৎ স্থূলকায়া এক রমণী কঙ্কালসার এক শিশুকে মাটিতে ফেলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে এক পলাতক সুন্দর দেবশিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া আছে—ছবিখানা এই। কোথায় কী অদ্ভুত আছে ছবিটিতে মতির চোখে তা কখনও পড়ে নাই, তবে সেটা সে নিজের চোখেব অপরাধ বলিয়া মানিয়া লইয়াছে। জয়াব কথা কে অবিশ্বাস করিবে যে এরকম ছবি পৃথিবীতে দু-চারখানার বেশি নাই?

কয়েকদিন পরে সকালবেলা এই ছবিখানাই জয়া ফ্যাঁসফ্যাঁস কবিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

তেমন কাণ্ড, জয়াব তেমন মূর্তি, মতি কখনও দ্যাখে নাই। কুমুদ বাড়ি ছিল না, বেলা তখন প্রায় দশটা। মতি রান্না প্রায় শেষ করিয়া আনিযাছিল। জযা সকাল হইতে ভযানক গম্ভীব হইয়াছিল, রাত্রে বোধ হয় স্বামীব সঙ্গে তার কলহ হইয়াছে। দু-একটা কথা বলিয়া জবাব না পাওয়ায় কথা বলিতে মতির আর সাহস হয় নাই। কিছুক্ষণ আগে ভাত চাপাইয়া জযা রান্নাঘরেব বাহিরে গিয়াছিল। হঠাৎ জয়া ও বনবিহারীর মধ্যে তীক্ষ্ণ কথার আদান-প্রদান মতির কানে আসিল। তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মতি দেখিল, বিশিষ্ট ছবিখানার সামনে তুলি হাতে আরক্ত মুখে বনবিহারী দাঁড়াইযা আছে। অদূরে জয়া। তার মুখও লাল, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

ফেলে দাও, ফেলে দাও ও-ছবি ছুঁড়ে। প্রেরণা! ছবি আঁকতে জানো না, তোমার আবার প্রেরণা! লজ্জা করে না প্রেরণার কথা বলতে?

জয়ার গলা রুদ্ধ হইযা আসিল। বনবিহারী রাগ চাপিতে চাপিতে বলিল, এতকাল পরে এ সব বলছ যে জযা?

এতদিন অন্ধ হয়েছিলাম যে, মুখেই যে তুমি বিশ্ব জয় করতে পার। বড়ো বড়ো কথা বলে ভুলিয়েছিলে আমায়—তুমি ঠগ, জোচ্চোর!

বনবিহারী ভীরু, এ কথা সহ্য করিবার মতো ভীরু নয়। সে বলিল, তা হতে পারি। এতদিন যদি অন্ধ হয়েছিলে, আজ দিব্যদৃষ্টি পেলে কোথায়? কে চোখ খুলে দিল শুনি? কুমুদ নাকি?

তারপরেই জয়ার বঁটিতে ক্যানভাসখানা ফালা ফালা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া বনবিহারী ঘরে ঢুকিয়া জামাটি হাতে করিয়া বাড়ির বাহির হইয়া গেল। জয়া ঘরে ঢুকিয়া বন্ধ করিল দরজা। বঁটিখানা তুলিবার সময় জয়ার বোধ হয় হাত কাটিয়াছিল, কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত রোয়াকে পড়িয়া রহিল।

এ সব কী ভীষণ দুর্বোধ্য ব্যাপার? মাথা খারাপ হইয়া গেল নাকি জয়ার? বাকি রান্না মতি সেদিন রাঁধিতে পারিল না। অনেকক্ষণ পরে জয়ার ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়া সে মৃদুস্বরে জয়াকে ডাকিল। বারকয়েক ডাকাডাকি করিতে ভিতর হইতে জয়া বলিল, যা মতি যা, বিরক্ত করিস না আমাকে।

কুমুদ ফেরা পর্যন্ত মতি চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া রহিল। সে বড়ো বিপন্ন বোধ করিতেছিল। এ সব জটিল খাপছাড়া ব্যাপার সে বুঝিতে পারে না ; স্বামী-স্ত্রীর কলহ খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এ কোন দেশি কলহ? জয়া যা বলিল, বনবিহারী যা বলিল, কী তার মানে? মতির মনে হইতেছিল এর মধ্যে কোথায় যেন তারও স্থান আছে, একেবারে জয়া ও বনবিহারীর মধ্যেই কলহটা সীমাবদ্ধ নয়। কী করিয়াছে সে, কী দোষ তার? কেহ যদি বলিয়া দিত মতিকে। অনেক বেলায় কুমুদ ফিরিয়া আসিল। ঘরে বসাইয়া চাপা গলায় মতি তাহাকে যতখানি পারে গুছাইয়া সব বলিল।

কুমুদ বলিল, তা হলেই সর্বনাশ মতি।

মতি ব্যাকুলভাবে বলিল, কীসের সর্বনাশ? কী হয়েছে? বলো না বুঝিয়ে আমায়? মাথা-টাথা ঘুরতে লেগেছে বাপু আমার।

কুমুদ বলিল, পরে বুঝিয়ে বলব মতি, ভালো করে আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কিছু। কী বিশ্রী গরম পড়েছে দেখছ? বাতাস করো দিকি একটু।

মতি আজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, নতুবা বাতাস করিবার জন্য বলিতে হইত না। ঠান্ডা হইয়া কুমুদ স্নান করিতে গেল। খাওয়া-দাওয়ার পর সটান বিছানায় চিত হইয়া আয়োজন করিল ঘুমের। মতি বলিল, দিদিকে ডাকবে না একবার?

এখন? রেগে দরজা দিয়ে আছে, কে এখন ওকে ঘাঁটাতে যাবে বাবা। মারতে আসবে আমাকে। যাও, খেয়ে এসো।

স্নান করিয়া মতি সবে খাইতে বসিয়াছে, জয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। রান্নাঘরে ঢুকিয়া কলস হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া খাইল।

মতি ভয়ে ভয়ে বলিল, তোমাদের ঝগড়া হল কেন দিদি?

জয়া বলিল, তুই ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষের মতোই থাক না মতি?

তারপর জয়া মতির ঘরে প্রবেশ করিল। মতির আর খাওয়া হইল না। উঠিতে ভয় করে, থালার সামনে বসিয়া থাকাও অসম্ভব। কৌতূহল মতি দমন করিতে পারিল না। উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়া বলিতেছিল, কুমুদ, এখানে তোমাদের আর থাকা হবে না। একশো টাকা মাইনে পাও, অন্য কোথাও থাকো গিয়ে, সুবিধামতো বাড়ি-টাড়ি আজকালের মধ্যেই দেখে নাও একটা।

কুমুদ বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল, বলিল, বোসো না জয়া। বসে কী হল খুলে বলো সব।

জয়া চেয়ারটাতে বসিল ; বলিল, বলাবলিতে লাভ নেই কুমুদ। তোমরা না গেলে, আমরা চলে যাব। কালের মধ্যেই যাব।

কুমুদ শান্তভাবে বলিল, বেশ তো, আমরাই উঠে যাব কাল। সেটা কিছুই কঠিন নয়। কিন্তু কী হয়েছে আমাকে না বললে সে কোন দেশি কথা হবে?

তোমাকে বলতে বাধা নেই কুমুদ। না বলে পারবও না। এখনি শুনবে? শোনো। বুঝবে কিনা জানি না কুমুদ। তুমি তো জানো আমি ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম? হঠাৎ জানতে পেরেছি তা সত্য নয়।

কীসে তা জানলে?

তোমাদের দেখে কুমুদ। তুমি তো ভালোবাসো মতিকে?

কুমুদ মৃদু একটু হাসিয়াই গম্ভীর হইয়া গেল, ঠিক জানি না জয়া। খুব সম্ভব বাসি। আরও কিছুদিন পরে হয়তো সঠিক জানা যাবে।

জয়া বলিল, না, তুমিও ওকে ভালোবাসো, ও-ও তোমাকে ভালোবাসে। কদিন আগে হঠাৎ আমার প্রথম এ সন্দেহটা হয়। আগে তো খেয়াল করিনি। তারপর কদিন তোমাদের লক্ষ করে আমি বুঝতে পেরেছি প্রেম সম্বন্ধে এতকাল আমার ধারণাই ভুল ছিল। আমি ওকে ভালোবাসিনি, ওর প্রতিভাকে ভালোবেসেছিলাম। কুমুদ, যেদিন এটা বুঝতে পারলাম সেইদিন কী দেখলাম জান? ওর প্রতিভাও ভুয়ো—সব আমার কল্পনা।

তোমার ভুলও তো হতে পারে?

জয়াব চোখের জল আসিতেছিল; তার কষ্টের পরিমাণটা সহজেই বোঝা যায়। অল্প একটু সামনে ঝুঁকিয়া সে বলিল, আর সব বিষয়ে মানুষের ভুল হতে পারে কুমুদ, ভুল-ভাঙার বিষয়ে কখনও ভুল হয় না। লজ্জায় দুঃখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কী করে এমন ভুল করলাম? এতকাল মিথ্যার মানস-স্বর্গ কী করে বজায় রাখলাম? কী আমার আত্মবিশ্বাস ছিল! মনে হত আমি ভিন্ন জগতে কেউ আমার মতো ভালোবাসতে পারেনি, আমার ভালোবাসাই সত্যি, আর সকলের ছেলেখেলা। খাঁটি একজন আর্টিস্টের ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন গেঁথে তার প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করে দুঃখের তপস্যা করছি ভেবে কত আত্মপ্রসাদ ছিল, সকলের ভোঁতা সাধারণ জীবনের কথা ভেবে মনে মনে কত হেসেছি। আমাব তৈরি মিথ্যা আমাকে তাই গুঁড়ো করে দিল। কী বল তুমি কুমুদ, মতির কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করছে! জানি না তুমি বুঝতে পারছ কি না—

বুঝতে পারছি বইকী। তবে কি জান, তোমার অনুভব করা আর আমার বোঝাব মধ্যে অনেক তফাত। কুমুদ একটু থামিল, তাই একটা কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। হেসে উড়িয়ে দিতে পার না?

জয়া সোজা হইয়া বলিল, তাই কি হয়? যা নিয়ে এতকাল বেঁচে ছিলাম, সব ভেঙে গেল।—চোখের পলকে জয়ার যেন ঝিম ধরিয়া যায়, মৃতের মতো দেখায় তাহাকে। তারপর সে বলিল, এটা খালি বুঝতে পারছি না, এতদিন এমন তেজের সঙ্গে কী করে নিজেকে ভোলালাম। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভুল মানুষের হয়! আমি তো বোকাহাবাও নই কুমুদ?

কুমুদ বলিল, কী জান জয়া, সবাই নিজেকে ভোলায়। খিদে তেষ্টা পেলে তা মেটানো, ঘুম পেলে ঘুমানো, এ সব ছাড়া জীবনটা আমাদের বানানো, নিজেকে ভোলানোর জন্য ছাড়া বানানোর কষ্ট কে স্বীকার করে? বেশির ভাগ মানুষের এটা বুঝবারও ক্ষমতা থাকে না। সারাজীবনে ভুলও কখনও ভাঙে না। বুঝতেই যদি না পারা যায়, ভুল আর তবে কীসের ভুল? কেউ কেউ টের পেয়ে যায়, তাদের হয় কষ্ট। জীবনকে যারা বুঝে, বিশ্লেষণ করে বাঁচতে চায় এই জন্য তারা বড়ো দুঃখী। বড়ো যা কিছু আঁকড়ে ধরতে চায় দেখতে পায় তাই ভুয়ো। এই জন্য এই ধরনের লোকের মনে জীবন থেকে বড়ো কিছু প্রত্যাশা থাকা বড়ো খারাপ—যত বড়ো প্রত্যাশা থাকে তত বড়ো দুঃখ পায়। তুমি জান আমি চিরদিন কী রকম খেয়ালি, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন, আজ এটা ধরি কাল ওটা ধরি, জীবনটা গুছিয়ে নেবার কোনো চেষ্টা নেই, সংসারের এতটুকু কাজে লাগবার জন্যে মাথাব্যথা নেই। এ রকম কেন হলাম কোনোদিন কারুকে বলিনি। অনেকদিন থেকে জানতাম। জীবনে বড়ো কিছু চাইতে গেলেই আমারও তোমার মতো অবস্থা হত জয়া, অনেক কিছু সংগ্রহ করে দেখতাম সব ভুয়ো। তার চেয়ে যখন যা ইচ্ছা হয় তাই চাই। জোর করে কিছুই চাই না—যা জোটে তাই গ্রহণ করি, কোনো প্রত্যাশা রাখি না। বড়ো লাভ হলে তাও অবহেলার সঙ্গে নিই। মতিকে ভালোবাসি

বলছিলে, কাল যদি ওব সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদ হয় দুদিনে সামলে উঠব। মতিকে দিয়ে আমি পা টেপাই জয়া!

পা টেপাও? বেশ কর। অদ্ভুত, খাপছাড়া কিছু না করলে তুমি বাঁচবে কেন? আমি যদি মতি হতাম—

অন্য কিছু করতে,—অদ্ভুত, খাপছাডা। বাঁচার আনন্দটাই যে খাপছাড়া জয়া, খাপছাড়া কিছু না করলে—

জয়া বলিল, হ্যাঁ। ও সব জানি। আর কিন্তু বক্তৃতা দিও না কুমুদ। ও বেলা বাড়ি দেখে এসে কাল তোমরা চলে যাও। চোখের সামনে তোমবা ভালোবাসবে আমি তা সইতে পারব না।

চোখের আড়ালেও পারবে না।

সে আলাদা কথা।

বলিয়া জয়া যেন হঠাৎ আশ্চর্য হইয়া গেল।—কী ভাবলে তুমি? কী ভেবে ও কথা বললে? তুমি নিশ্চয় জানো কুমুদ, ও ভাবে আমাকে তুমি কোনোদিন টানতে পারনি? ও রকম আকর্ষণ আমার কাছে তোমার কোনোদিন ছিল না?

কুমুদ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা জানি। সে রকম ইঙ্গিত করিনি জয়া। আমরা এসে তোমার ঘর ভেঙে দিয়ে গেলাম, তাই বলছিলাম চলে গেলেও আমাদের স্মৃতি তোমার অসহ্য ঠেকবে।

জয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া বলিল, কী চমৎকার তুমি বলতে পার কুমুদ!—ও মতি, আয় ঘরে আয়। শোন যত পারিস, এ সব কথা তুই বুঝবি না। আমরা একেলে-ধরা মানুষ, কত হেঁয়ালিই করি।

আবার বাড়ি বদলের হাঙ্গামা? জয়া তাদের এখানে তাকিতে দিবে না? না দিক। ভালোই। নতুন বাড়িতে তাবা সুখেই থাকিবে। বাগে মতি মুখ বার কবিয়া থাকে। কীসে কী হইল বেচারি এখনও তা বুঝিতে পারে নাই, কুমুদের ব্যাখ্যা করার পরেও নয়। জয়াকে সে শোনায়, কী অপরাধ করেছিলাম বাবা তোমার কাছে তুমিই জানো, ভালো করলে না দিদি, তাড়িয়ে দিলে ভালো করলে না। মনে রাখব। বলব সবাইকে।

কী বলবি?

তুমি কী বকম ভীষণ মানুষ তাই বলব, তোমার মনে এক, মুখে আর। কত ভালোবাসাই দেখাতে! গেল কোথায় সে সব? আমিও শক্ত মেয়ে আছি, নামটি যদি মুখে আনি তো মুখে যেন পোকা পড়ে।

নাম মুখে না আনলে সবাইকে বলবি কী করে?

মতি কাঁদোকাঁদো হইয়া যায়। আর কথা বলে না।

বনবিহাবী বিকালেই ফিরিয়া আসিয়াছিল, গম্ভীর বিষণ্ণ বনবিহারী। মতি দেখিল সকালবেলার কাণ্ডে ওদের কথাবার্তা বন্ধ হয় নাই। বনবিহারী খাওয়া-দাওয়াও করিল, জয়াকে কয়েকটা টাকাও দিল। তবে দুজনের মধ্যে যেন অপরিচয়ের ব্যবধান আসিয়াছে, বড়ো মন-মরা দুজনে। কোথায় বাসা ঠিক করিয়া সন্ধ্যার সময় কুমুদ ফিরিয়া আসিল। মতি বলিল, থিয়েটারে যাবে না আজ? কুমুদ বলিল, না।

পরদিন সকালে গাড়ি ডাকিয়া জিনিসপত্র তোলা হইল। জয়া কেবল একবার বলিল যে দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করিয়া গেলে ভালো হইত না? বনবিহারী কিছুই বলিল না। জয়ার কাছে বিদায় না লইয়াই মতি গটগট করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কুমুদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জয়া আসিয়া দাঁড়াইল দরজায়।

কুমুদ বলিল, আবার একদিন দেখা হবে জয়া।

জয়া বলিল, কে জানে হবে কি না।

খবর নেব নাকি মাঝে মাঝে?

নিয়ো। একা এসো।

মতির মনের গুমরানো আগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। একা এসো। কেন, জয়া কী ভাবিয়াছে তার সঙ্গে দেখা করিতে না আসিলে মতির মুখে ভাত রুচিবে না? গাড়ি ছাড়িলে সে কুমুদকে বলিল, ককখনো আসতে পাবে না তুমি খবর নিতে। আমাদের ও তাড়িয়ে দিলে!

কুমুদ কিছুই বলিল না। মতি আবার বলিল, ও কেমন স্বার্থপর তা প্রথম দিনেই জেনেছি। আমরা আসবার আগে দিব্যি কেমন ভালো ঘরখানা দখল করে বসেছিল।

ও সব তুচ্ছ কথা মনে রেখো না মতি।--কুমুদ বলিল।

এক বাড়ির তিনতলায় দুখানা ঘর কুমুদ ভাড়া করিয়াছিল, আলাদা একটি রান্নাঘরও আছে। একখানার বদলে দুখানা ঘর পাওয়া উন্নতির লক্ষণ, মতি খুশি হইল।

জয়াব জন্য কদিন এখানে মতির মন কেমন করিল। কতকগুলি বিষয়ে জয়ার উপরে সে নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল। তবে জয়ার কথা বেশি ভাবিবার অবসর মতির ছিল না। গাওদিয়ার কথাই সে ভুলিতে বসিয়াছে তাব অসীম মোহ ও আনন্দে। পার্থিব বিচার বিবেচনা, মানুষের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত, এ সব হইয়া গিয়াছে অপ্রধান, কুমুদের কাছে ছাড়া আর সব বিষয়ে সকল দাবি-দাওয়া হইয়া গিয়াছে তুচ্ছ।

এদিকে নূতন বাড়িতে আসিয়া কুমুদ আর থিয়েটারে যায় না। শুইয়া বসিয়া বই পড়িয়া সিগারেট টানিয়া দিন কাটায়। মতি একদিন কৈফিয়ত দাবি করিল,—থিয়েটাবে যাও না যে?

কাজ ছেড়ে দিয়েছি মতি।

কেন?

নাটক চলল না। বললে মাইনে কমিয়ে দেবে, তাই ইস্তফা দিলাম। ব্যাটারা নাটক নেবে যা তা, না চললে দোষ দেবে অ্যাক্টবের। থিয়েটারের চেয়ে যাত্রা ঢের ভালো মতি।

মতি চোখ বড়ো বড়ো করিয়া বলিল, তোমার পার্ট বলা ভালো হয় না বললে ওরা?

কথাটা তাই দাঁড়াল বইকী। নাটক যখন চলল না, নিশ্চয় পার্ট বলার দোষ। নাম-করা অ্যাক্টর তো নই যে দুটো একটা নাটক না চললেও খাতির করবে। ভালোই হয়েছে মতি, থিয়েটাবে থাকতে আমাব ইচ্ছে কবে না।

মতি মুখখানা পাকা গিন্নির মতো করিয়া বলিল, এবার কী করবে?

কুমুদ হাসিয়া বলিল, করব, যাহোক কিছু করব। সে জন্য ভাবনা কী? দরকার হলে গয়না দেবে না দু-একটা তোমার?

মতি বলিল, নিয়ো।

অম্লান-বদনে বিনা দ্বিধায় মতি এ কথা বলিল। আমাদের সেই গেঁয়ো মেয়ে মতি, কুমুদ চাকরি ছাড়িয়াছে শুনিয়া সে বিচলিত হইল না, গয়না দিবার কথায় মুখখানা হইল না ম্লান। কীসে এমন পরিবর্তন আসিল মতির? কুমুদ যাদুকর বটে। খেয়ালি উচ্ছৃঙ্খল যাযাবার কুমুদ, তবু মানুষকে বশ করার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার। জগতের রীতিনীতি নিয়ম-কানুন না মানুক, নিজের নিয়মগুলি সে নিষ্ঠার সঙ্গে মানিয়া চলে। তেজস্বিতা কম নয় কুমুদের, দুরন্ত তাহার চিত্তবৃত্তি। নিজের বাঁচিবার জগৎটি নিজের শক্তিতে গড়িয়া তোলাও সহজ পৌরুষের কথা নয়। কুমুদের কাছে মনোবেদনা ভোলা যায়, সে ভাবে না, কাঁদে না, দুঃখ দুর্দশাকে গ্রাহ্য করে না, হিসাবি সাবধানি মনেরও তার কাছে আরাম জোটে।

দিন যায়। আবির্ভাব ঘটে বর্ষার। ঘরের জানালা দিয়া, রেলিং দেওয়া সরু বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুধু ইটের অরণ্য চোখে পড়ে মতির, তবু তারও মধ্যে সে গাওদিয়ার ছাপ আবিষ্কার করে। দক্ষিণের দোতলা বাড়িটা ডিঙাইয়া কোনো এক বড়োলোকের বাগান চোখে পড়ে, সেখানকার পামগাছগুলি যেন ইঙ্গিতে মতিকে গাওদিয়ার তালবনের কথা জানায়। নীচে গলিতে উড়িয়ার মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিয়া মতির মনে পড়ে গাওদিয়ার বিপিন ময়রার দোকানের কথা, —গ্রাম্যবেশে অচেনা লোককে পথ দিয়া যাইতে দেখিলে গাওদিয়ার চেনা লোকের কথা মনে পড়ে। এখানকার আকাশে যে চিল ভাসিয়া বেড়ায়, তাদেরও গাওদিয়ার আকাশের চিলের মতো দেখায়। আকাশে মেঘ ঘনাইয়া বৃষ্টি নামাও গাওদিয়ার চির-পরিচিত বর্ষার নিখুঁত নকল।

একদিন সত্যসত্যই মতির গহনা লইয়া কুমুদ বেচিয়া আসে। কিছুক্ষণের জন্য মতির যে একটু খারাপ লাগে না তা নয়, প্রথমবার হারের জন্য যে রকম কান্না আসিয়াছিল সে রকম দুঃখ মতির একেবারেই হয় না। কুমুদ ফিরিয়া আসিতে আসিতে মৃদু অশান্তিটুকুও তাহার মন হইতে মুছিয়া যায়। আবদার করিয়া বলে, গয়না বেচলে আমার, কী আনলে শুনি আমার জন্যে?

কুমুদ বলে, কিছু আনিনি।

তা আনবে কেন, আনবে তো না-ই!

অভিমানে কুমুদের গলা জড়াইয়া ধরে মতি, বুকে মুখ লুকাইয়া ছলনাভরে মৃদু মৃদু হাসে। বিরাট শহরের কয়েক ফিট ঊর্ধ্বে এই ছোটো শহুরে ঘরখানায় অভিনেতা স্বামীর কণ্ঠলগ্না মতিকে দেখিয়া কেহ চিনিবে না সে গাওদিয়ার সেই মতি। বিপজ্জনক মানুষ কুমুদ, বাঁধন কাটিয়া কাটিয়া তার এতকাল জীবন কাটিল, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন নির্মম মানুষ সে, তারই পরে আজ মতির নিশ্চিন্ত নির্ভর দেখিলে চমক লাগে।

তখন কুমুদ বলে, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি মতি।

কই, দাও।

কুমুদ তাহাকে পকেট হইতে সেই হার বাহির করিয়া দেয়, আজ যে গয়না বেচিতে গিয়াছিল তাও ফেরত দেয়। নাটক করিয়া করিয়া কী নাটকই কুমুদ করিতে শিখিয়াছে! সহজভাবে সরলভাবে কোনো কাজ করা কুমুদের কুষ্ঠিতে লেখে না। আহ্লাদে মতির কথা জড়াইয়া যায়। এ তো শুধু গয়না পাওয়া নয়। আরও কত কী কুমুদ এই সঙ্গে তাহাকে দিয়াছে, তাহার অবোধ বালিকা বধূকে।

টাকা পেলে কোথায়?

বড়োলোক বন্ধুর কাছে ধার করলাম।

মতি হি হি করিয়া হাসে, ধার না ধার, ফেরত যা দেবে তা জানি!

কুমুদও হাসিয়া বলে, তার ঢের টাকা আছে। না দিই না দেব ফেরত, তার কিছু এসে যাবে না তাতে।

অন্য লোক দিয়া বিনোদিনী অপেরার অধিকারীর কাছে কুমুদ একটা খবর পাঠাইয়াছিল। দুদিনের মধ্যে কুমুদের ঘরে তাহার আবির্ভাব ঘটিল। ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, আচ্ছা লোক বটে তুমি যা হোক কুমুদ! কী বলে অমন করে পালিয়ে গেলে শুনি?—একেবারে পাত্তা নেই তোমার!

কুমুদ হাসিয়া বলিল, বসুন ঘোষমশায়, বসুন। ভালো আছেন? দলটা চলছে কেমন?

খাসা চলছে। তুমি যাবার পর দলের আরও উন্নতি হয়েছে।

কুমুদ বলিল, বেশ বেশ, শুনে বড়ো সুখী হলাম। বড়ো রেগেছেন আমার পরে না?

এ কথার জবাবে কুমুদকেই মধ্যস্থ মানিয়া অধিকারী বলিল, রাগ হয় কিনা তুমিই ভেবে দ্যাখো। আগাম অতগুলো টাকা নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেলে—

পালাব কেন ঘোষ মশায়, পালাইনি। কমাসের ছুটি নিয়েছিলাম, বিয়ে-টিয়ে করলাম কিনা। আজকালের মধ্যে একবার যাব ভাবছিলাম আপনার কাছে।

অধিকারী বিস্মিত হইয়া বলিল, বিয়ে করেছ নাকি? বিয়ে তাহলে তুমি করলে? —কথাটা সহজে সে যেন বিশ্বাস করবে না। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যদি করলে বাবু, আমার মেয়েটাকে করলে না কেন? আমার মেয়ে কী দোষ করেছিল শুনি?

কুমুদ চুপ করিয়া রহিল। অধিকারী খানিকক্ষণ একটু অন্যমনা হইয়া রহিল।

অমন মেয়ে পেতে না কুমুদ। দেখেছ তো বাপু তাকে। বলো তো তুমিই বলো, ও রকম মেয়ে সহজে মেলে। তাকে তোমার তখন মনে ধরল না! পাগল কী বলি সাধে!

অনেকক্ষণ বসিয়া অধিকারী অনেক কথা বলিল। একটা বোঝাপড়াও হইয়া গেল কুমুদের সঙ্গে। কুমুদ আবার বিনোদিনী অপেরায় যোগ দিবে। আগাম যে টাকাটা কুমুদ লইয়াছিল সেটা বাতিল হইয়া গেল, বিবাহের যৌতুক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া গেল সেটা। কুমুদের সঙ্গে তো আর পারা যাইবে না, অধিকারীর সর্বনাশ না করিয়া সে ছাড়িবে কি!

দলটা আবার ভালো করে গড়ে নিতে হবে কিন্তু বাপু তোমায়, শুধু পার্ট বললে চলবে না।

কুমুদ হাসিয়া বলিল, তাই কি চলে? দল ভালো না হলে আমার পার্টও জমবে কেন?

মুখভরা হাসি লইয়া অধিকারী সেদিন বিদায় হইল।

কুমুদ তো আবার যাত্রা করিবে, এ দেশ ও দেশ ঘুরিয়া রাজপুত্র প্রবীর সাজিবে। মতির কী হইবে? সে থাকিবে কোথায়? কার কাছে? এ বড়ো সহজ সমস্যার কথা নয়। কিন্তু মতির কোনো ভাবনা চিন্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। আনন্দের যে মাদকতায় সে মশগুল হইয়া আছে, ভাবনা চিন্তার ক্ষমতাও যেন তাহাতে ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিতেছে।

কুমুদ শেষে কথা তুলিল। বলিল, আমি যখন যাত্রা করতে যাব, তুমি কোথায় থাকবে মতি?

মতি ঘাড় কাত করিয়া বলিল, তুমিই বল না?

গাওদিয়া যাবে?

গাওদিয়া? মতির যেন চমক লাগে। গাওদিয়ার কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার আদেশ যে দিয়াছিল, সে আবার যাচিয়া সেখানে যাওয়ার কথা বলিতেছে! কুমুদের চোখে মতি চোখ মেলায়। কী খোঁজে মতি কুমুদের চোখে? পলকে পলকে কুমুদ খোলস বদলায়, আজ যা বলে কাল তা বাতিল করিয়া দেয়, তবু কী তার মধ্যে এমন একটা অপরিবর্তনীয়তা থাকা সম্ভব যার মৌলিকতা মতির মতো মেয়েকেও বিহ্বল করিযা দেয়?

গাওদিয়া যেতে বলছ?

তাই থাকো গিয়ে কমাস। আমি এদিকটা একটু গুছিয়েনি।

কী গুছোবে?

কুমুদ গম্ভীরভাবে বলে, দলটা গড়ে তুলব, টাকা পয়সা জমাব, সবই তো গুছোতে বাকি।

খুবই সুবিবেচনার কথা। তবু শুনিয়া মতির যেন কষ্ট হয়। এ ধরনের কথা কি মানায় কুমুদের মুখে? তিনমাস আগেও হয়তো কুমুদকে হিসাবি বিবেচক দেখিলে মতি খুশি হইত। এখন আর সে তা চায় না। তেমনই কুমুদই তার ভালো, যে বড়ো বড়ো কথা বলে, কাজের বদলে শুইয়া থাকে, ভালোবাসে তবু পা টেপায়।

কুমুদ বলে, এসে নিয়ে যাবার জন্য তোমার দাদাকে একখানা চিঠি লিখে দাও মতি।

তুমি লেখো না?

না, তুমিই লেখো।

মতি গম্ভীব মুখে বলে, তুমি তবে ঠিকানা লিখে দিয়ো, অ্যাঁ?

মতির এই চিঠির জবাবে পরান ও শশী দুজনেই কলিকাতা আসিল। শশীর আগমনটা শুধু মতিকে দেখিবার জন্য নয়, কাজ ছিল। কুমুদকে শশী অনেক কথা বলিবে ভাবিয়াছিল, কিছুই বলা হইল না। মতিকে দেখিয়া সে বাক্যহারা হইয়া গেল। এই মতি কি তার চোখের সামনে বড়ো হইয়াছিল গাওদিয়াব গ্রাম্য আবহাওয়ায়? এ যেন শশীর অচেনা মেয়ে, অজানা জগতে এতকাল বাস কবিয়া আজ প্রথম তাব সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্যাল ফ্যাল করিয়া হাবার মতো যে চাহিয়া থাকিত, জলে ধোয়া আলোব মতো কী স্নিগ্ধোজ্জ্বল তার চাহনি এখন! কী ভারী চলন মতির,কী রমণীয় তাব ভঙ্গিমা। মতিব অঙ্গুলি-হেলনও আজ যেন মধুর, অর্থময়। মনে হয়, তার দেহ মন যেন অহরহ কার আকর্ষণ ও আহ্বানের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত উদ্যত, উৎকর্ণ হইয়া আছে।

কুমুদ একান্তে বলিল, কী রকম দেখছিস শশী মতিকে?

ওকে তুই কী করেছিস কুমুদ?

কিছুই কবিনি। শুধু কথা বলেছি আর চুপ করে থেকেছি।

বিন্দুরও পরিবর্তন হইয়াছিল, এও পরিবর্তন। শশী ভাবিত হইয়া বলিল, গাওদিয়া পাঠাচ্ছিস, সেখানে থাকতে পাবরে কিনা ভাবছি কুমুদ।

এ তোর কী বকম ভাবনা শুনি? গাওদিয়ায় বড়ো হল, সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে না?

বিন্দুও গাওদিয়ায় বড়ো হইয়াছিল, সেখানে গিয়া থাকিতে পারে নাই। কিন্তু শশী আর কিছু বলিল না। সারাদিন সে বিমনা হইযা রহিল। মতির চোখে যখন বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়, কুসুমের চোখের সঙ্গে তখন সে তুলনা করে। এ আলো তাহার চোখে নাই। কুমুদের কাছে আজ আবার নিজেকে শশীর ছোটো মনে হইতে থাকে।

মতির সুখে আনন্দে উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, মতির পুলকমন্থর গতিশ্রী দেখিয়া মাঝখানে কুমুদের সম্বন্ধে যতটুকু অবজ্ঞা মনে আসিয়াছিল সব যেন আজ মুছিয়া যায়। কুমুদের জীবনের যা মূলমন্ত্র তাব সন্ধান শশী কখনও পায় নাই : আজ ওই বিষয়েই শশী চিন্তা করে। কী আছে কুমুদেব মধ্যে, দুর্বোধ্য গোপন সম্পদ, জীবনকে আগাগোড়া ফাঁকি দেওয়া সত্ত্বেও যাহা জীবনকে তাহার ঐশ্বর্যে ভবিয়া রাখিয়াছে?

এতকাল খবর না দেওয়ার জন্য পরান ও শশীব কাছে মতি প্রথমটা একটু সংকোচ বোধ কবিতেছিল, ও বিষয়ে কেহ অনুযোগ না দেওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথাটা ভুলিয়া গেল। পরান খুব রোগা হইযা গিয়াছে, তাহার বিষণ্ণ শুষ্ক মুখ দেখিয়া বড়ো মমতা হইতে লাগিল মতিব। বারবার সে জিজ্ঞাসা করিল কী অসুখ হইয়াছে পরানের। তারপর খুঁটিয়া খুঁটিয়া গ্রামের কথা, মোক্ষদা ও কুসুমের কথাও জানিয়া লইল। একটু সলজ্জ মতি, একটু সাহসী! একজনের বউ হিসাবে দাদা ও শশীর কাছে ধরিতে গেলে এই তার প্রথম দাঁড়ানো, নিজের বাড়িতে নিজের সংসাবে বাপেব বাড়ির সংবাদ জানিতে একটু গৃহিণীর মতো ভাব দেখানোর অধিকারও তার ন্যায্য। ভাদ্রমাসের গবম, পাখা লইয়া মতি ওদের বাতাস করিল, তৃষ্ণায় জোগাইল শীতল জল। মতির কাজ আজ কত নিখুঁত, কত কোমল তাহার সামান্য সেবা। অনেক যত্ন করিয়া মতি আজ রান্না করিল। খাইতে বসিয়া শশী প্রশংসা করিল রান্নার, পরান কিন্তু এক রকম কিছুই খাইল না। মতি অনুযোগ দিলে বলিল, গলায় একটা ঘা হয়েছে মতি, ঝোল তরকারি খেতে কষ্ট হয়।

গলায় ঘা হয়েছে? কেন?

মতির ব্যাকুল প্রশ্নে অবাক হইয়া শশী হাসিতে ভুলিয়া গেল। মনে যাব ভাব-সমুদ্র উথলিতে থাকে কারও গলায় ঘা হইয়াছে শুনিলে সেই শুধু, এমন ব্যাকুল হয়। পরান অত বোঝে না, সে একটু হাসিয়া বলিল, গলায় ঘা হয় কেন আমি কি তা জানি? ছোটোবাবু ডাক্তার মানুষ, ওঁকে শুধো।

মতি আরও ব্যাকুল হইযা বলিল, কী দিয়ে তুমি তবে ভাত খাবে? আগে কেন বললে না, তরকারিতে ঝাল কম দিতাম?

ঝাল কম দিলেও তরকারি খেতে পারি না মতি।

তবে দুধ খাও, দই খাও। মিষ্টি আনাই।

এবার পরানের চোখে জল আসিল। সে চাষা-ভুযা মানুষ, জীবনে কারও কাছে সে এমন মোলায়েম আদর পায় নাই।

পরানই মতির মনকে গাওদিয়ার দিকে টানিতেছিল বেশি করিয়া। গলায় ঘা হওয়ায় কিছু সে খাইতে পারে না, না খাইয়াই দাদার অত বড়ো প্রকাণ্ড শরীরটা শুকাইযা গিয়াছে। গাওদিয়া গিয়া এবার দাদাব খাওয়াব বিশেষ ব্যবস্থা করিবে,—নিজের সুখ সুবিধার সম্বন্ধে এমন উদাসীন পরান। কত কাজ কত সেবা যে শিখিয়াছে, কী রকম চালাক চতুর হইয়া উঠিয়াছে, সকলকে তাহা দেখাইবার লোভটাও মতির মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। সকলে অবাক হইয়া যাইবে। না জানি কী বলিবে কুসুম! গাঁয়েব মেয়েরা আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিবে, এতকাল সে কোথায ছিল, কী বৃত্তান্ত।

দুদিন পরে কুমুদকে যাইতে হইবে,—অনেক দূরে বিনোদিনী অপেরার আহ্বান আসিয়াছে। কী পার্ট করিবে কুমুদ? সেই রাজপুত্র প্রবীরের? আহা, মতি আর প্রবীরবেশী কুমুদকে দেখিতে পাইবে না, শুনিতে পাইবে না তার রোমাঞ্চকর বক্তৃতা। ভাবিয়া মুখ ম্লান করা ছাড়া আর কী করা যায়? মতি যে মেয়েমানুষ, বউ যে মতি। আহা, মানুষ যদি ইচ্ছামতো নিজেদের অদল বদল কবিতে পারিত, দরকার মতো মেয়েরা হইতে পারিত পুরুষ, পুরুষেরা হইতে পাবিত মেয়ে!

কুমুদ বলে, হচ্ছে মতি, আজকাল তা হচ্ছে।

কুমুদকে সবলে আঁকড়াইয়া ধবিয়া মতি বলে, যাঃ!

কুমুদ হাসে, বলে, কেন তুমি নিজেব চোখেই তো দেখে এসেছ। জয়া ছিল পুরুষ, বনবিহারী ছিল মেয়ে। নয়?

মতি হাসে না।

জয়াদিদিকে দেখতে যাবে না একবার?

যাব যাব, ব্যস্ত কী!

বলিয়া হাই তোলে কুমুদ।

আগামী বিরহের ছায়া ও গাওদিয়া ফিরিবার আগাম আনন্দের আলো, দুদিন ধবিয়া মতির মুখখানাতে খেলিয়া বেড়াইল। তারপর আসিল কুমুদের যাওয়ার দিন।

বিকালে গাড়ি কুমুদের যাওয়ার সময় আগাইয়া আসিলে মতি ভয়ানক উতলা হইয়া উঠিল। এত কষ্ট হইতে লাগিল যে মতি নিজেই সে জন্য আশ্চর্য হইয়া গেল। গাঁ ছাড়িয়া আসিবার সময়ও তাহার মন কাঁদিযাছিল সে কষ্ট তো এ রকম নয়? কষ্টই বা কেন? কী সে হারাইতে বসিয়াছে চিরদিনের জন্য? হয়তো পনেরো দিন, হয়তো একমাস কুমুদকে সে দেখিতে পাইবে না। তাতে কাতর হওয়ার কী আছে? মন তবু বোঝে না মতির। শশী ও কুমুদ গল্প করে, করুণ চোখে কুমুদের দিকে চাহিয়া মতির বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে।

শশী এক সময় বলিল, চল মতি, আমরা স্টেশনে গিয়ে কুমুদকে গাড়িতে তুলে দিই। যাবি?

হাঁ, না, মতি কিছু বলিল না। যাওয়ার আগে কাপড় পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। শশী বারবার বিস্মিত চোখে তাহার বিষণ্ণ মুখ, ছলছল চোখের দিকে চাহিতেছিল। এক অপূর্ব ভাবাবেগে সেও উতলা হইয়া উঠিতেছিল। সংসারে হয়তো এমন অনেকে আছে, মতির মতো এমন করিয়া ভালো হয়তো অনেকেই বাসে, কিন্তু মতি ইহা শিখিল কোথায়। অনুভূতির এমন গভীবতা তাহার আসিল কোথা হইতে?

এ যে ভাবপ্রবণতা নয়, কাঁচা মনের অস্থায়ী আবেগ নয়, বালিকা মতির বিরহ কাতরতায় এক অপূর্ব ধৈর্যের সমাবেশ দেখিয়া শশী তা বুঝিতে পারিয়াছিল।

স্টেশনে যখন তাহাবা পৌঁছিল তখনও আকাশ-ভরা রোদ। গাড়ি ছাড়িতে বিলম্ব ছিল। গাড়িতে ভিড় ছিল না, খানিকক্ষণ কামরার মধ্যে বসিয়া কুমুদের সঙ্গে কথা বলিয়া পরানকে ডাকিয়া শশী নামিয়া আসিল। বলিল, তোরা বোস, আমরা একটু ঘুরে আসছি।

ওবা চলিয়া গেলে মতি পাংশুমুখে কুমুদকে বলিল, তুমি যেও না। থাকতে পারব না, মবে যাব।

কুমুদ বলিল, স্টেশনে বিদায় দিতে এলে ও রকম মনে হয় মতি।

কাল থেকে এমনি হচ্ছে।

কাল থেকে হচ্ছে? কাল তো কিছু বলনি? আর হচ্ছে যদি হোক না,—এও তো কম মজা নয়!

মজা? সমস্ত পৃথিবী যে তার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে কুমুদ কি তা বুঝিতে পারিতেছে না, যে সব বোঝে? কুমুদেব নিষ্ঠুরতাকেও মতি ভালোবাসিতে শিখিয়াছিল, তবু আজ সে আহত হইল। পাশেব লাইনে একটা যাত্রী বোঝাই গাড়ি ছাড়িয়া গেল,—মতির মন তাহার চাকার তলে পিষিয়া যাইতেছে। আর সময় নাই, আর উপায় নাই। আর ফেরানো যায় না কুমুদকে। এ গাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার পর বুকটা ফাটিয়া যাইবে, তবু সে তা রদ করিতে পারিতেছে না। কেমন করিয়া কুমুদকে সে তার ব্যাকুলতা বুঝাইবে এখন? যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠিয়া কেউ কি ফেরে?

কুমুদেব দুটি পা ধরিয়া সে যে কাঁদিযা উঠিবে সে উপাযও নাই। গাড়ির লোকগুলি বোধ হয় হাঁ কবিযা তার দিকেই চাহিয়া আছে।

কুমুদ এ কথা ও-কথা বলে, চিরদিনের মতো ধীরস্থির অবিচলিত কুমুদ। মতিব কণ্ঠ রুদ্ধ হইযা আসিতে চায়, তবু প্রাণপণে সে কথার জবাব দেয়। মিনিটগুলি একে একে পার হইয়া যাইতে থাকে। গাড়ি ছাড়িবার অল্প আগে ফিরিয়া আসে শশী ও পরান। কী কুক্ষণেই ওদের মতি কলিকাতা আসিতে লিখিয়াছিল!

তারপর শশী বলে, চল মতি, আমরা নামি এবার।

মতি বলে, আপনারা নামুন,—আমি একটা কথা কয়ে নিয়ে নামছি।

মতির এই অস্বাভাবিক নির্লজ্জতায় শশী ও পরান স্তম্ভিত হইয়া যায়,—শশী যেন একটু রাগ করিয়াই গাড়ি হইতে নামে। প্রেম আসিয়াছে বলিয়া এত কী বাড়াবাড়ি অতটুকু মেয়ের!

কুমুদ মৃদুস্বরে হাসিয়া বলে, পাকা গিন্নির মতো করলে যে মতি? কী কথা বলবে?

বলছি দাঁড়াও,—আসছি।

বলিয়া কুমুদকে পর্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দিয়া মতি ল্যাভাটরিতে ঢুকিয়া গেল। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড নিশান দেখাইল, প্ল্যাটফর্মে শশী ও পরান অস্থির হইয়া উঠিল,—তবু মতি বাহির হইল না। গাড়ি ছাড়িলে গাড়ির সঙ্গে চলিতে চলিতে শশী বলিল, আমরা কেউ উঠব নাকি কুমুদ, পরের স্টপেজে ওকে নামিয়ে নেব?

কুমুদ বারণ করিয়া বলিল, না না, দরকার নেই। আমিই ব্যবস্থা করব শশী।

গাড়ি প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া গেলে মতি বাহির হইয়া আসিল। বলিল, এ কী হল? আমি যে নামতে পারলাম না?

কই আর পারলে?

কী হবে তবে?

কুমুদ হাসিয়া বলিল, কিছু হবে না মতি, বোসো। এ রকম ছলনা করলে কেন? বললেই হত সঙ্গে যাবে?

মতি বসিয়া বলিল, ওরা ছিল যে, গোলমাল করত।

গাড়ির সমস্ত লোক সকৌতুকে তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল, কারও তা খেয়াল ছিল না। গাড়ির গতি বাড়িতে বাড়িতে মতির মুখের বিবর্ণতা ঘুচিয়া যাইতেছিল। বার কয়েক সে জোরে জোবে নিশ্বাস গ্রহণ করিল।

কুমুদ বলিল, সঙ্গে তো চললে, কোথায় থাকবে কী করবে সে সব ভেবে দেখেছ?

কুমুদের মতো বেপরোয়াভাবে মতি বলিল, ওর আর ভাবব কী?

গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতিও আজ এলোমেলো পথের জীবনকে ববণ করিল—আমাদের গেঁয়ো মেয়ে মতি। হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে না—জীবনযাপনের প্রচলিত নিয়ম-কানুন ওদের পক্ষেও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। আজ সে কথা কিছুই বলা যায় না। পুতুলনাচের ইতিকথায় সে কাহিনি প্রক্ষিপ্ত—ওদের কথা এইখানেই শেষ হইল। যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব।

বারো

হাসপাতালের নব-নির্মিত গৃহটি দেখিতে ভারী সুন্দর হইয়াছে। ইটের উপরে লাল রং করা ছোটোখাটো ঝকঝকে সুশ্রী বাড়িখানা দেখিয়া আপশোশ হয় যে এটা না দেখিয়া যাদবের মবা উচিত হয নাই। সামনে কার্নিশের নীচে ইংরেজিতে বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা হইয়াছে—যাদব মেমোরিযাল হসপিটাল ; তবু লোকে মুখে বলিতে বলে শশী ডাক্তারের হাসপাতাল। যাদবকে যে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে তা নয়। যাদবের সঙ্গে হাসপাতালের সম্পর্কটা প্রত্যক্ষ-গোচর হইয়া থাকে নাই,—অথচ এদিকে শশীকেই সকলে হাসপাতালটি গড়িয়া তুলিতে দেখিয়াছে এবং এখন সে-ই সমাগত রোগীদের সযত্নে বিতরণ করিতেছে ওষুধ।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাব হাঙ্গামা শেষ হইয়াছে, শশীর যশ ও সম্মানের বৃদ্ধি স্থগিত হয় নাই। জনসাধারণের সমবেত মনটা চিরদিন একাভিমুখী, যখন যেদিক ফেরে সেই দিকেই সবেগে ও সতেজে চলিতে আরম্ভ করে। জনরবের তিলটি যে দেখিতে দেখিতে তাল হইয়া উঠে তার কারণও তাই। লোকমুখে ছোটো ঘটনা বড়ো হয়;—মানুষও হয়। শশী অসাধারণ কাজ কিছুই করে নাই, যাদব যে কর্তব্যভার তার উপরে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন সেটুকু কেবল ভালোভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। ফলটা হইয়াছে অচিন্তিতপূর্ব! নেতার আসনে বসাইয়া সকলে তাহাকে অনেক উঁচুতে তুলিয়া দিয়াছে। কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা করিয়া শশীর বলিবার ক্ষমতাটাও খুলিয়া গিয়াছে আশ্চর্য রকম। সভা-সমিতিতে এখন তাহাকে প্রায়ই বলিতে হয়, সকলে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শোনে। শশী আবেগের সঙ্গে কথা বলিলে সভায় আবেগের সঞ্চার হয়, হাসির কথা বলিলে আকস্মিক সমবেত হাসির শব্দে সভার আশেপাশের পশুপাখি চমকাইয়া ওঠে।

সময় সময় শশীর মনে হয় সে যে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছিল সেই জন্য গ্রামের জীবন এমন অসংখ্য বাঁধনে তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিযাছে। এই আকস্মিক জনপ্রিয়তা তাকে এখানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য। ভাগ্যের এটা পুরস্কার নয়, ঘুষ। এ তো সে চায় নাই, এ ধবনের সম্মান ও প্রতিপত্তি? জীবনের এই গম্ভীর বূপ তাকে কিছু কিছু অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে সত্য, কিন্তু এ ধরনের সার্থকতা দিয়া সে কী করিবে?

একদিন সকালবেলা পরান ডাক্তারখানায় আসিয়া হাজির। শুষ্ক-শীর্ণ মূর্তি, গলায় কম্ফর্টাব জড়ানো, দেখিলে দুঃখ হয়। দেখিয়া দুঃখ হইবার অবসর শশীর ছিল না, কত দায়িত্ব তাহাব, কত কাজ। শশীর মতো ডাক্তার বন্ধু থাকিতেও এমন রোগা হইয়া গিয়াছে পরান? কী হইয়াছে পরানেব? গলায় ঘা, খাইতে পারে না? সে তো অনেকদিন আগে হইয়াছিল, মতির চিঠি পাইয়া তাহাকে আনিতে কলিকাতা যাওযাব সময়। সে ঘা এখনও শুকায় নাই? শশী আশ্চর্য হইয়া যায়, বলে যে গলার ঘা এতদিন থাকিবার কথা নয়---সে যে ওযুধ দিয়াছিল পরান বুঝি তা ব্যবহার করে নাই? এতকাল সে ঘুমাইতেছিল নাকি?

হাসপাতালের ব্যস্ত-সমস্ত ডাক্তাবেব মতো ভাব শশীর— যেন তার কাছে এ সময় পরানের পর্যন্ত খাতির নাই! কথা বলিতে বলিতে সে একটা প্রেসক্রিপশন লিখিতে থাকে। রোগী যে খুব বেশি আসিয়াছে তা নয়, হাসপাতালের ভয় ভাঙিতে গ্রামেব লোকের কিছু সময় লাগিবে। জন-সাতেক পুরুষ রোগী শশীর টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, আর দবজাব বাহিরে ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছে একটি বউ, একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক, বোধ হয সে বউটিব শাশুড়ি, পিঠে এক হাত আর সামনে এক হাত দিয়া আধ-জড়ানো ভাবে বউটিকে ধবিয়া রাখিয়াছে। সম্ভবত দুজনেই পরস্পরের কাছে খুঁজিতেছে সাহস। এই তো কজন রোগী, পবানকে শশী বসিতে বলারও সময় পাইল না? পরানের পায়ে জুতা নাই, শার্টে ইস্তিরি নাই, চুলে টেবি নাই বলিয়া নয় তো? ঘরের কোণে বসিয়া মনে মনে বিশ্ব জয় করিবার সময় যে ছিল বন্ধু, যার প্রীতি স্মরণ করিয়া বাদল ঘন উতল দুপুরে কুসুমকে সে ঘব হইতে বিদায় দিয়াছিল, একটা এতটুকু হাসপাতাল সৃষ্টি করার গৌরবে তাকেই শশী আজ এমন অবহেলা করিবে নাকি! টেবিলেব এ পাশে একটা চেয়ার আছে, তাতে না হোক অনেকটা তফাতে যে টুলখানা আছে তাতে পরানকে শশী বসিতে দিক।

গলায় বড়ো যন্ত্রণা হয় ছোটোবাবু।

শশী মুখ তুলিয়া বলিল, এসো দেখি কাছে সরে। হাঁ করো।

চেয়ারে বসিয়া স্পষ্ট দেখা গেল না, দরজার কাছে আলোতে যাইতে হইল। ভালো করিয়া দেখিয়া শশী বলিল, ঘা-টা ভালো মনে হচ্ছে না পরান। এক কাজ কবো তুমি, একটু বোসো, এদের বিদেয় করে দিয়ে আবার দেখব।

টুলটার উপরে পরান বসিয়া রহিল। একে একে সমাগত রোগীদের দেখা শেষ করিয়া শশী হাসপাতালের দক্ষিণ কোণের ছোটো ঘরখানায় পরানকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এটা তার খাস কামরা। এই খাসকামরাটি উপলক্ষ করিয়া কমিটির সভ্যদের সঙ্গে শশীর একটু মনোমালিন্য হইয়াছিল। গাঁয়ের ছোটো একটা হাসপাতালের নগণ্য ও অবৈতনিক ডাক্তার, হাকিম-হুকিমের মতো তার আবার খাসকামরা কীসের? শশী কাবও কথা শোনে নাই। স্বার্থপরের মতো এই ঘরখানা সুন্দরভাবে সাজাইয়া লইয়াছে। শশীর মনের গতি কে অনুধাবন করিবে? কমিটির প্রাচীন সভ্যদের তো জানিবার কথা নয় যে হাসপাতালের বেগার-খাটা শশী ডাক্তার দরকারের সময় ছাড়াও হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে ভালোবাসিবে! বাড়িতে শশীর যে মন টেকে না এ কথা এ জগতে বোধ হয় শুধু টের পাইয়াছে গোপাল।

পরানের গলার ঘা শশী যত পরীক্ষা করে ততই তার মুখ গম্ভীর হইয়া আসে। বলে ঢোঁক গেলো পরান, ঢোঁক গেলো। কেন পারছ না? পারা তো উচিত। আচ্ছা, একটু জল খাও তবে। ঢোঁক গিলতে না পাবার মতো অবস্থা তোমার হয়নি পরান, ভয়ে পারছ না।

জল খাইয়া পরান একটু সুস্থ হয়। ঢোঁকও গেলে। একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, হঠাৎ কেমন ভয় হল ছোটোবাবু, প্রাণটা কেমন আঁকুপাঁকু করে উঠল।

শশী বলে, না খেয়ে না খেয়ে যা শুকিয়েছ প্রাণটাকে, আঁকুপাঁকু করবে না? রোজ একবার এসে দেখিয়ে যেও গলাটা, আজ ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটা ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি, বিকালে আর একবার নিজে লাগিয়ো।

তুলিতে করিয়া পরানের গলায় ওষুধ লাগাইয়া বলে, পারবে দিতে নিজে? না পার তো কাজ নেই, ও বেলা একবার যাবখন তোমাদের বাড়ি, লাগিয়ে দিয়ে আসব।

পরান বিদায় নেয়। খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া শশী তার লম্বা পা দুটির ছোটো ছোটো পদক্ষেপ চাহিয়া দেখে। তারপর টেবিলেব সামনে চেয়ার টানিয়া বসিয়া মোটা একটা ডাক্তারি বই খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া ভাবে, অন্য বই টানিয়া পাতা উলটায়, কী একখানা বই খুঁজিয়া লইতে সমস্ত বইয়ের নামের উপর চোখ বুলায়। তারপর অসময়ে ব্যস্তভাবে শশী আজ বাড়ি ফেরে। আলমাবি খুলিয়া একখানা বই লইয়া পড়িতে বসে।

বেলা পড়িয়া আসিলে হাসপাতালে যাওয়ার আগে সে পরানের বাড়ি গেল। অনেক দিন যায় নাই। অনেক দিন আর কত, দিন কুড়ি। অবস্থা বিশেষে তাও দীর্ঘকাল হইয়া উঠে। পবান বাড়ি ছিল না। মাঠে গিয়াছে। এখন রবিশস্য বুনিবার সময় দুর্বল শরীরেও মাঠে না গেলে তার চলে না।

কুসুম বলিল, বললাম যেও না, তবু গেল।

বলে গেছে শিগগির আসবে।

শশী বলিল, শিগগির আসবে। শিগগির আসবে বলে হাঁ করে বসে থাকব নাকি আমি? আমাব কাজ নেই?

কাজের মানুষ বুঝি একটুও বসে না? দুদণ্ড আয়েস করতে বসলে মনে খুঁতখুঁতানি ধবে, এ রোগ ভালো নয় ছোটোবাবু। চাকর তো নন কারও, অ্যাঁ?

শশী বলিল, বাড়ি খালি দেখছি? পরানের মা কই?

কুসুম উদাসভাবে বলিল, কে জানে কোথায় গেছে! বুড়ি যা পাড়া-বেড়ানি!

শশী সন্দিগ্ধভাবে বলিল, তুমি পাঠাওনি কোথাও, ছল করে?

আমি? আমি পাঠাব?—লজ্জায় মুখ লাল করিয়াও কুসুম একটু হাসিল, বলিল কী মানুষ বাবা! যদি পাঠিয়েই থাকি ছল করে, এমন স্পষ্ট করে সে কথা বলতে হয়! কী রকম বিচ্ছিবি লাগে শুনলে?

শশী বলিল, আজ তোমার কথা কিন্তু ভারী মিষ্টি লাগছে বউ!

মিষ্টি খেয়ে মুখটা আজ মিষ্টি হয়ে আছে।

শশী খুশি হইয়া বলিল, তোমার হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় বউ। লোকজনের ভিড়ে জ্বালাতন হই, তুমি ছাড়া এমন করে আমার কাছে আর কেউ হাসে না। আমার একটিও বন্ধু নেই বউ।

বউও নেই!—কুসুম নিখুঁত পরিপূর্ণ হাসি হাসিল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, ওর গলায় কী হয়েছে?

শশী বলিল, আজ বলব না, পরশু শুনো।

কেন, আজ বলতে দোষ কি?

নিজে আগে জেনে নিই ভালো করে, তবে তো বলব? দুধ ছাড়া ওকে আর কিছু খেতে দিয়ো না বউ।

আর কিছু খেতে পারলে তো দেব? দুধ খেতেও কষ্ট হয়।

পরানের প্রতীক্ষায় শশী আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কুসুম আর কথা বলিল না, হাসিলও না। প্রীতিপূর্ণ বাক্যের আদান-প্রদান আর কতক্ষণ রেশ রাখিয়া যায়? কুসুম উশখুশ করে। একবার উঠিয়া গিয়া উত্তরের ঘরে ঢোকে, বাহিরে আসিয়া আকাশে বেলার দিকে তাকায়, তারপর শশীর পাশ দিয়া বড়ো ঘরে ঢুকিবার সময় চাবির গোছাটা শশীর পিঠে ফেলিয়া দিয়া বলে, আহা লাগল?

এবার শশী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, আর বসবার সময় নেই বউ। পরান এলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ো।

কুসুম কোনোদিন রাগ করে না, আজ ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়া চাবির গোছটা কাঁধে ফেলিয়া মুখ কালো করিয়া বলিল, বসবারও সময় নেই, না?

শশী একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, হাসপাতালে রোগী এসে বসে আছে তা তো জানো?

কথাগুলি দুর্বোধ্য নয়, তবু মনে হইল কুসুম যেন চেষ্টা করিয়া মানে বুঝিতেছে। শশী যেন তার অচেনা, এমনই তাকানো কুসুমের।

সে তো রোজ থাকে।—কুসুম বলিল।

শশী বিব্রতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, বসতে বলো, বসছি। অমন খামোকা রাগ কোরো না বউ। সময়ে কাজ না করলে কাজ নষ্ট হয়, বসে গল্প করা পালায় না। তুমিও রইলে আমিও রইলাম—

সে তো ন বছর ধরেই আছি। এক আধ দিন নয়।

এ কথা বলিয়া চোখের পলকে কোথায় যে গেল কুসুম! না গেলে কী হইত বলা যায় না। এমন তো সে কখনও যায় না। প্রতি মুহূর্তে কিছু ঘটিবার প্রত্যাশা তাহার কখনও লয় পাইত না। আজ কী হইল কুসুমের, কেন সে হঠাৎ শশীকে এমন ভাবে ফেলিয়া চলিয়া গেল, তার রাগ দেখিয়া আজ যখন শশী আত্মহারা হইয়া উঠিতেছিল? শশীর বিবর্ণ মুখে ক্লেশের ছবি ফুটিয়াছে দেখিলে অন্তত উল্লাস তো জাগিত কুসুমের। এমন কখনও হয় নাই। তালবনের উঁচু টিলাটার উপর দাঁড়াইয়া একদিন সূর্যাস্ত দেখিবার সময় শশীর অন্তর বড়ো ব্যাকুল হইয়াছিল, অভূতপূর্ব ভাবাবেগে সে থর-থর করিয়া কাঁপিয়াছিল, আজ অপরাহ্ণ বেলায় গৃহচ্ছায়ায় একা দাঁড়াইয়া সে যেন তেমনই বিহ্বল হইয়া গেল অন্য এক ভাবাবেশে। এ তো গ্রাম শশী, খড়ের চালা দেওয়া গ্রাম্য গৃহস্থের এই গোবর-লেপা ঘর, যে রমণী কথা বলিয়া চলিয়া গেল গায়ে তার ব্লাউজ নাই, কেশে নাই সুগন্ধি তেল, তার জন্য বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই। ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ! জগতে সাগর-তরঙ্গ আছে।

হাসপাতালে ভিনগাঁয়ের লোক বসিয়া ছিল। শশীকে এখনই যাইতে হইবে! এখনই? কুসুমের কাছ হইতে আসিয়া এখনই ভিনগাঁয়ে যাইতে হইবে। কতগুলি কথা যে ভাবিয়া দেখিতে হইবে শশীর, একটু যে শান্ত করিতে হইবে মনটা।

কুড়ি টাকা দিতে হবে বাপু।

কুড়ি টাকা! ভিনগাঁয়ের লোকের চমক লাগে।

ঘ্যান ঘ্যান কোরো না। টাকা না দিতে পার হাতুড়ে দেখাওগে।

ভিনগাঁয়ের লোক অবসন্ন মন্থর পদে ভিনগাঁয়ে ফিরিয়া যায়। রোগীদের আজ ওষুধের সঙ্গে গাল দেয় শশী। এত রাগ কেন শশীর, এত নীচতা কেন? কথায় ব্যবহারে কেন এই অমার্জিত রুক্ষতা? সামনে দাঁড়াইয়া কে আজ ভাবিতে পারিবে শশীর মনে বড়ো চিন্তার আবির্ভাব হয়, জীবনকে বৃহত্তর ব্যাপ্তি দিবার পিপাসা সর্বদা জাগিয়া থাকে।

পরান আসিলে শশী বলে, যাব বলে দিয়েছিলাম, বাড়িতে ছিলে না যে?

পরান কৈফিয়ত দিয়া বলে, অত বেলা থাকতে যাবেন বুঝতে পারিনি।

শশী আরও রাগিয়া বলে, বেলা থাকতে যাব না তো কি অন্ধকার হলে যাব? অন্ধকারে কেউ গলার ঘা দেখতে পায়, না তাতে ওষুধ লাগাতে পারে? আজ কিছু হবে না, কাল সকালে এসো।

সকালে পরান আসিল না, বিকালেও নয়। আগের দিন বিকালে নিজের বিচলিত অবস্থা মনে করিয়া শশী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে কেন যে তার এ রকম পাগলামি আসে! সামনে যে মানুষ উপস্থিত থাকে তাকেই আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়, জিনিসপত্র ভাঙিয়া তছনছ করিয়া ফেলিবার সাধ যায়। নিজেকে তখন বড়ো অসুখী মনে হয় শশীর। মনে হয়, অনেক কিছু চাহিয়া কিছুই সে পাইল না। ঘর গোছানোর নামে যেমন ঘরখানা জঞ্জালে ভরিয়াছে, জীবনটা তেমনি বাজে কাজে নষ্ট হইল। কী লাভ হইবে তার•হইবে তার গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া, চিরকাল যদি সে এমন কিছু চাহিয়া যায় যাহা অবিলম্বে পাওয়া যায় না,. যার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে মনের উপভোগ করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে? শশীর সন্দেহ হয়, তার মাথায় বুঝি এক ধরনের গোলমাল আছে। ভবিষ্যতে যারা অন্য রকম ভাবে বাঁচিতে চায় বর্তমানকে তারা এ রকম নীরস, নিরর্থক মনে করে না। তার অভাব কীসের দুঃখ কীসের? সুস্থ সুন্দর শরীর তার, অর্থ ও সম্মানের তার অভাব নাই এবং আর কারও না থাক তার জন্য অন্তত একজনের বুক-ভরা স্নেহ। যতদিন এখানে আছে এ সব তো সে অনায়াসে উপভোগ করিতে পারে, জীবনে বজায় রাখিতে পারে মৃদু একটু রোমাঞ্চ। পরের বাড়ি থাকার মতো এখানে দিনযাপন করিয়া তার লাভ কী?

পরদিন সকালে সে পরানের বাড়ি গেল। না, পরান আজও বাড়ি নাই। মোক্ষদা দাওয়ায় বসিয়া ছিল, সে বলিল, গলার ঘা দেখাইতে পরান বাজিতপুরে গিয়াছে।

গ্রামে বাড়ির কাছে আছে শশী ডাক্তার, গ্রামে আছে শশী ডাক্তারের হাসপাতাল, গলা দেখাইতে পরান গিয়াছে বাজিতপুর। রাগে শশীর গা জ্বালা করিতে লাগিল। পরান তাকে এমন অপমান করিতে পারে, এ তো সে কল্পনাও করে নাই। একদিন একটু কড়া কথা বলিয়াছে বলিয়া তাকে ডিঙাইয়া বাজিতপুর যাইবে চিকিৎসার জন্য, স্পর্ধা তো কম নয় পরানের!

কুসুম রাঁধিতেছিল, আসিয়া জলচৌকি দিল। শশী বলিল, না, বসব না। মোক্ষদা বলিল, বোসো বাবা বোসো—বাড়ি এসে না বসে কি যেতে আছে? কত বললাম পরানকে, কাজে যাচ্ছিস বাজিতপুর যা, আমাদের শশী থাকতে আর কারোকে গলাটলা দেখাসনি বাপু, শশীর কাছে নাকি সরকারি ডাক্তার! তা ছেলে জবাব যা দিলে! মুখপোড়ার যত ছিষ্টিছাড়া কথা। বললে, ছোটোবাবু ব্যস্ত মানুষ, বিরক্ত হন, তাঁকে জ্বালাতন করে কী হবে মা?

আগে এ সব কথায় কুসুম মুচকি মুচকি হাসিত। আজ তার মুখে হাসি দেখা গেল না। বলিল, ছোটোবাবুর ওষুধে ঘা বেড়ে গেল কি না, তাইতো গেল বাজিতপুর।

মোক্ষদা চটিয়া বলিল, তাইতো গেল বাজিতপুর! তোকে বলে গেছে, তাইতো গেল বাজিতপুর! যা মুখে আসবে বানিয়ে বানিয়ে বলবি তুই? যা না মা রান্নাঘরে?

শশী সত্যসত্যই উদ্‌বিগ্নভাবে কুসুমের হাসি দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, এতক্ষণে সে হাসিল। বলিয়া গেল, বানিয়ে কেন বলব মা, তোমার ছেলেই তো আমাকে বলছিল। যা শুনেছি বললাম।

মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি লইয়া শশী বাড়ি ফিরিল। কী ভাবিয়াছে পরান? সেদিন যে ওষুধ দিয়াছিল তাতে পরানের গলার ঘা প্রথমে একটু বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়, তাতেই কি ভয় পাইয়া গেল পরান, আর তার চিকিৎসায় বিশ্বাস রহিল না?

দিনরাত্রি কাটে, মনে মনে শশী ছটফট করে। পরানের গলায় ক্যানসার হইয়াছে মনে হইয়াছিল শশীর, সেটা ঠিক কিনা জানিতে না পারিয়া তার স্বস্তি ছিল না। হয়তো নয়। হয়তো অবহেলা করিয়া

সাধারণ ক্ষতকেই পরান অতখানি বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। পরান আসে না, নিজে গিয়া তাকে যে শশী জিজ্ঞাসা করিবে বাজিতপুরের সরকারি ডাক্তার কী বলিল, তাও শশীর অভিমানে বাধে। কুসুমও যদি একদিন কোনো ছলে আচমকা আসিয়া হাজির হইত! কেন সে আসে না? সে যায় না বলিয়া যাওয়া আসায় সপ্তাহ মাসের ফাঁক তো এমন সে কত ফেলিয়াছে, তবু প্রায়ই কুসুমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইবার বাধা তো হয় নাই কখনও! একদিন খুব ভোরে বাড়ির সামনে রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইতেই শশীর চোখে পড়িল কুসুমও নিজের বাড়ির সামনে পথে দাঁড়াইয়া আছে। কুসুমও যে শশীকে দেখিতে পাইয়াছে তা বোঝা গেল। কই, হাতছানি তো দিল না কুসুম, আগাইয়া তো সে আসিল না? শশী একটু দাঁড়াইয়া রহিল। খোলা মাঠে বিলীন কায়েতপাড়ার নির্জন রাস্তাটি আজও শশীর জীবনে রাজপথ হইয়া আছে, যে তাকে যতটুকু নাড়া দিয়াছে এইপথে তাদের সকলেরই পড়িয়াছে পদচিহ্ন। তাদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু কুসুম, এ পথে আজ শুধু কুসুম হাঁটে।

আস্তে আস্তে শশী কুসুমের কাছে আগাইয়া গেল।

তোমায় দেখে দাঁড়িয়েছিলাম বউ, ভাবছিলাম কাছে যাবে।

আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি কাছে যাব?

তাতে কিছু দোষ আছে নাকি!—শশী হাসিল, কই, কথা শুধোবার জন্যে তালবনে আর তো আমায় ডাকো না বউ?

কী আর শুধোব? নতুন কিছু কী ঘটছে গাঁয়ে!

ঘটছে বইকী। অত বড়ো হাসপাতাল হল, কেমন চলছে হাসপাতাল, রোগীপত্র কেমন হচ্ছে, এ সব তো শুধোতে পাব? আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতূহল যেন কমে যাচ্ছে বউ।

এবার কুসুম মিষ্টি করিয়া হাসিল, ওমা, তাই নাকি? তা হবে হয়তো! একটা কমে একটা বাড়ে এই তো নিয়ম জগতের। আকাশের মেঘ কমে নদীর জল বাড়ে,—নইলে কি জগৎ চলে ছোটোবাবু?

বিবাদ হয় নাই, বিবাদ তাদের হইবার নয়, তবু কুসুমের সম্বন্ধে শশীর মনে ভয় ঢুকিয়াছিল যে ব্যবহার যেন তার কড়া হইয়া উঠিতেছে। তাতে ভয়ের কি আছে শশী জানে না, শুধু কষ্ট হইয়াছিল। এখন খুশি হইয়া শশী বলিল, কৌতূহল কমে কি বাড়ল?

কী জানি কী বাড়ল, একটা কিছু অবিশ্যি বেড়েছে।

পরানের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া শশী এই সব কথা বলিল কুসুমের সঙ্গে। এই দরকারটাই তার যেন বেশি ছিল। তারপর, চলিয়া আসিবার আগে সে পরানের খবর জানিতে চাহিল। গলারঘা কমিয়াছে পরানের।

কমিয়াছে? ভালোই হইয়াছে। বাজিতপুরের ডাক্তারের ওষুধেই তবে গলার ঘা কমিল পরানের? শশীর ওষুধে বাড়িয়া গিয়াছিল। পরানের এত বড়ো অন্যায় ব্যবহারের কথা শশী ভাবিতেও পারে না। বাড়াইবার সুযোগ দিয়া আর কমানোর সুযোগ দিল না, শশীর ওষুধে যে গলার ঘা তার বাড়িয়াছিল তাই হইয়া রহিল স্থায়ী সত্য! একদিনের জন্য ওষুধ লাগাইতে নাই বা আসিত পরান তার কাছে?

গলার ঘা ভালো হইয়া গিয়াছে পরানের। শরীর সারে নাই। অত বড়ো কাঠামো বলিয়া আরও তাকে রোগা দেখায়। একটা টনিক খাইলে পারে। একটু স্ট্রিকনিন দিয়া শশী তাকে এমন টনিক তৈরি করিয়া দিতে পারে যে এক মাসে চেহারা ফিরিয়া যাইবে,—রোগা শরীরে অত খাটে, মাসকুলার ফেটিগে স্ট্রিকনিন বড়ো উপকারী। বলিতে বাধে শশীর। কে জানে তার দেওয়া টনিক এক ডোজ খাইয়া শরীর আরও খারাপ হইয়াছে বলিয়া সে যদি আবার বাজিতপুরে সরকারি ডাক্তারের কাছে ছোটে!

শরীরের দিকে একটু তাকাও পরান।—এটুকু বলে শশী।

চাষা তো ছিলাম না ছোটোবাবু, চাষার কাজটা সইছে না।—বলে পরান, বলিয়া সে একটু হাসে, তাও বেশির ভাগ জমি শ্বশুরের কাছে বাঁধা।

শশী বলে, ছেলে তো নেই শ্বশুরের, তিনটি শুধু মেয়ে—যা আছে জামাইদের দিয়ে যাবে। জমিন তোমার নামে-মাত্র বাঁধা।

পরান প্রকাণ্ড হাই তোলে, বলে, শ্বশুরের ইচ্ছা এখানকার জমিজমা বেচে আমরা তার কাছে গিয়ে থাকি।

যাও না কেন?

তাই কি হয় ছোটোবাবু? গাঁ ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকব!

প্রতিধ্বনির মতো শোনায় কথাটা, যেন কার কথা কে বলিতেছে! কোনো বিষয়ে এমন জোরালো নিটোল সিদ্ধান্ত পরান তো কবিয়া রাখেনা! শশী যেন শুনিতে পায় কুসুমেব বাবা অনন্ত বলিতেছে, চল মা কুসি, এখানকার সব বেচে দিয়ে আমার ওখানে থাকবি চল তোরা, আর কুসুম জবাব দিতেছে, তাই কি হয় বাবা? গাঁ ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে তোমার ওখানে পড়ে থাকব?

শীত জমিবার আগে এবার যামিনী কবিরাজের কাশিটা চিরতরে থামিয়া গেল, দুদিনের জ্বরে বেচারি গেল মারা। পাঁচন সিদ্ধ করিবার কটাহ পড়িয়া রহিল, আলমারিতে শিশি বোতল টিনের কৌটাভরা নানারকম ওষুধ রহিল, বেড়ায় ঠেকানো রহিল হুঁকা,—বুড়া যামিনীর হৃৎস্পন্দন আব হামানদিস্তার ঠকঠক শব্দটাই গেল থামিয়া। খবর পাইয়া আসিল সেনদিদির দাদা কৃপানাথ,— সেও কবিরাজ। আসিল সে সপরিবারে, তামাক টানিতে লাগিল যামিনীর হুঁকায় আর আলমারি খুলিয়া দেখিতে লাগিল যামিনীর সঞ্চিত ওষুধ। মনে হইল, যামিনীব পাঁচন সিদ্ধ করা কড়াইটাতে আবাব হয়তো পাঁচন সিদ্ধ হইতে থাকিবে, যামিনীর হামানদিস্তায় আবার শব্দ উঠিবে ঠকঠক। কেবল সেনদিদি আব এ জীবনে সধবা হইতে পারিবে না।

তবে শোনা গেল, সেনদিদির নাকি ছেলে হইবে।

শুনিলে অবশ্য বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না, কিন্তু অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। এ তো কানে শোনা রটনা নয়, চোখে দেখা ঘটনা। সেনদিদির অমন রূপ কাড়িয়া, চোখ কানা করিয়া দেবতাব কী মমতা হইল যে সেনদিদিকে তিনি শেষে একটি ছেলে দিলেন? আহা, দিন! জীবনে মানুষের এটুকু ক্ষতিপূরণ না থাকিলে কি চলে! সন্ধ্যাবেলা শ্রীনাথ মুদির মেয়ে বকুলতলে পুতুল ফেলিয়া গেলে, ভোরবেলা সে পুতুল কুড়াইয়া কতকাল আর কাটিবে সেনদিদির।

ম্লান হইল শশী, একেবারে বিষণ্ন বিবর্ণ হইয়া গেল। মাথা নিচু করা বাক্যহীন স্তব্ধতায় সে মূক হইয়া রহিল। কেন, কী হইল শশীর, গাওদিয়ার নামকরা ডাক্তারের উদীয়মান তরুণ নেতার? সেনদিদি তাকে ছেলের মতো ভালোবাসিত, আর যে বাসে না তারও অকাট্য প্রমাণ কিছু নাই, আজ যদি ছেলের মতো ভালোবাসিবার জন্য নিজস্ব একটি ছেলে পায় সেনদিদি, তাতে শশী কেন বিচলিত হয়।

গোপাল সভয় জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁরে শশী, তোর তো অসুখ-বিসুখ হয়নি বাবা?

শশী বলে, না।

না হলেই ভালো। একটু সাবধানে থাকিস এ সময়।

শশী ডাক্তারকে গোপাল বলে সাবধানে থাকিতে! বলে সবিনয়ে, কৃপাপ্রার্থীর মতো। হয়তো গোপালের বলিবার কথা ওটা নয়। শশীর ম্লান বিষণ্ন মুখ দেখিয়া হয়তো গোপালের হৃৎপিণ্ডটা ধড়াস ধড়াস করে, সেই শব্দটা সে পৌঁছাইয়া দিতে চায় শশীর কানে। আর তো ছেলে নাই গোপালের, শুধু শশী।

বাজিতপুরে কী কাজ ছিল শশীর কে জানে, গ্রামের অসংখ্য কাজ ফেলিয়া হঠাৎ সে বাজিতপুরে চলিয়া যায়। সিনিয়ব উকিল রামতারণের বাড়িতে একটা দিন চুপচাপ কাটাইয়া দেয়, তারপর যায় সরকারি ডাক্তারের বাড়ি। সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে শশীর সম্প্রতি খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, বাড়িতে অতিথি হওয়ায় এবার ভদ্রলোকের ক্ষীণাঙ্গী, এক স্বামী ও দুই ছেলের সংসার লইয়া বিশেষরূপে বিব্রতা স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হইল। মানসিক বিপর্যয়ের সময় সংসারের এক একটি তুচ্ছ মানুষের কাছে আশ্চর্য সান্ত্বনা মেলে. কাজে অপটু, কথা বলিতে অপটু ভীবু ও নিরীহ এই মহিলাটি অতি অল্প সময়েব মধ্যে শশীকে যেন কিনিয়া ফেলিল। চা দিতে চা উছলাইয়া পড়িতেছে, ছেলে ধরিতে আঁচল খসিতেছে, আঁচল তুলিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে চুল, তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিবে যাইতে চৌকাটে হোঁচটও লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া বলে, আর পারি না বাবা!

সত্যই পাবে না। তবু জোড়াতালি দিয়া কোনোরকমে সবই সে করে। সে জন্য আড়ালও খোঁজে না, সব ত্রুটি-বিচ্যুতি তার প্রকাশ্য। এক ঘণ্টার মধ্যে মানুযের কাছে নিজের স্বরূপ মেলিয়া ধরে বলিয়াই বোধ হয় তাকে তার স্বামীরও ভালো লাগে. শশীরও লাগিল।

সুশীলা নাম। শশীকে কুলশীলের পরিচয় দিয়া বলিল, আমার মামাবাড়ি তেইশগাছা, আপনাদের গাঁ থেকে ছমাইল,-- মামাকে চেনেন? হরিশ্চন্দ্র নিয়োগী। আমি মামাবাড়ি গেছি সেই কোন ছেলেবেলায় —আর এই এবার এখানে এসে একবাব। আমার বাবা মুনসেফ ছিলেন কিনা, তাঁর সঙ্গে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতাম।

এখন কর্তার সঙ্গে বেড়ান।

তা নয়? এই তো ছমাস হল এসেছি এখানে, এর মধ্যে বলে কিনা বদলি হব!

পবদিন সকালে গ্রামে ফিরিবার জন্য শশী নদীর ঘাটে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা নৌকা ভাড়া কবিতে হইবে। ঘাটে কুসুমের বাবা অনন্তের সঙ্গে শশীর দেখা হইয়া গেল।

অনন্ত বলিল, ডাক্তারবাবু এখানে?

শশী বলিল, একটু কাজে এসেছিলাম। একটা নৌকো নিয়ে গাঁয়ে ফিরব।

অনন্ত বলিল, নিজের নৌকো আনেননি? আমিও গাওদিয়া যাচ্ছি ডাক্তারবাবু, আমার নৌকোতেই চলুন না? একটু তবে বসুন নৌকোয় উঠে, বাজার থেকে একজোড়া শাড়ি কিনে আনি ঝাঁ কবে মেয়েটার জন্যে।—আর হেই হানিফ, আন বাবা এদিকে সরিয়ে আন নৌকো, ডাক্তারবাবু উঠবেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে কুসুমের জন্য একজোড়া শাড়ি কিনিয়া অনন্ত ফিরিয়া আসিল। নৌকায় উঠিযা শশীর একটু তফাতে হাত পা মেলিয়া বসিয়া বলিল, মেয়ে যেতে লিখেছে ডাক্তাববাবু। লিখেছে, একেবারে বড়ো নৌকো নিয়ে এসে দুদিন এখানে থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরে যাব। আপনি আমার যা উপকার করলেন ডাক্তারবাবু, কী আর বলব।

শশী অবাক হইয়া বলিল, আমি আবার কি উপকার করলাম আপনার?

অনন্ত বলিল, মেয়ে কি আমায় লেখেনি ডাক্তারবাবু, আপনার পরামর্শে আমার কাছে গিয়ে থাকা ঠিক করেছে? যা মাথা পাগলা মেয়ে আমার, আপনার পরামর্শ যে শুনল তাই আশ্চর্য। বলছি কি আজ থেকে! সেই যে বার বেয়াই অপঘাতে মরল তখন থেকে মেয়ে জামাইকে তোযামোদ করছি, কাজ কি বাবু তোদের এত কষ্ট করে এখানে থাকার, আমার কাছে এসে থাক। জামাইয়ের মতামতের জন্যে ভাবিনি ডাক্তারবাবু, সে জলের মানুষ. মেয়ে রাজি হলে সেও রাজি হত। মেয়েই ছিল বেঁকে। বলত, শাশুড়ি আছে ননদ আছে, ওরা আমার বাপের বাড়ি গিয়ে থাকতে চাইবে কেন? বেশ ভালো কথা, ননদের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রইলাম। তখন রইল শুধু এক শাশুড়ি, সেও

অরাজি নয়—এবার তবে আয়? তাও না, দশটা ওজর দিয়ে মেয়ে আমার এখানকার মাটি কামড়ে রইল। নিতি অভাব, কী সুখে যে ছিল কে জানে।

তা ঠিক, কী সুখে কুসুম গাওদিয়ায় ছিল এতকাল? অনন্ত সম্পন্ন গৃহস্থ, তার গায়ের সাটিনের কোট আর কোমরে বাঁধা উড়নিই তা ঘোষণা করে। বাপের কাছে কুসুম পরম সুখে থাকিতে পারিত। এতদিনে কুসুমের তবে সুমতি হইয়াছে? শশীকে জানাইয়া সুমতিটা হইলে খুব বেশি ক্ষতি হইত না। তার পরামর্শে মতিগতি ফিরিয়াছে বাপকে এ কথা লিখিবার কী উদ্দেশ্য ছিল কুসুমের?

কোমরে বাঁধা উড়ানি ও কোটটা খুলিয়া রাখিয়া আরাম করিয়া বসিয়া অনন্ত বলিল, শ্রাবণ মাসে আগের বার যখন নিতে আসি, আপনার সঙ্গেই যেবার এলাম বাজিতপুর পর্যন্ত,—সেবার রাজি হয়েছিল। যেতে যেতে আবার মত পালটাল।

বড়ো ছেলেমানুষ পরানের বউ।—শশী বলিল।

অনন্ত বলিল, ছোটো মেয়ে, বড়ো দু বোনের বিয়ের পর ওই ছিল কাছে, বড্ড আদরে মানুষ হয়েছিল—একটু তাই খেয়ালি হয়েছে প্রকৃতি। সবচেয়ে ভালো ঘর বর দেখে ওর বিয়ে দিলাম, ওর অদেষ্টেই হল কষ্ট। সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।

শশী একটু হাসিয়া বলিল, তাঁকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম।

অনন্ত বলিল, তেমন করে চাইলে পাবেন বইকী, ভক্তের তো দাস তিনি।

নদী ছাড়িয়া নৌকা খালে ঢোকে, অনন্তের সঙ্গে এ-কথা ও-কথা বলিতে বলিতে খাপছাড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, পরান বুঝি সব বেচে দেবে? বাড়িঘর জমি-জায়গা?

অনন্ত বলিল, আমার কাছে গিয়ে থাকলে এখানে বাড়ি-ঘর রেখে কী করবে? তাড়াহুড়ো কিছু নেই, আস্তে আস্তে সব বেচব। কেউ কিনবে যদি আপনার জানা থাকে—

বলব, জানা থাকলে আপনাকে বলব।

কুসুম তবে সত্যই যাইবে চিরদিনের জন্য গাওদিয়া ছাড়িয়া? এত তাড়াতাড়ি করিবার কী দরকার ছিল! শশীও তো যাইবে, কুসুমের চেয়েও অনেক দূরদেশে, অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে। শশীর বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কুসুম কি গ্রামে থাকিতে পারিত না? হয়তো পরানের শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে চায়, যেখানে বিশ্রাম জুটিবে পরানের, অন্নচিন্তায় সে ব্যাকুল হইবে না, ভোর পাঁচটায় ভাঙা শরীর লইয়া ছুটিতে হইবে না মাঠে। কাজটা খুব বুদ্ধিমতীর মতোই করিতেছে কুসুম। তবু, শশীকে একবার কি সে বলিতে পারিত না? মতি ও কুমুদের ব্যাপারটা শুনিবার জন্য একদিন কত ভোরে কুসুম তাকে তালবনে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, এত বড়ো একটা উপলক্ষ পাইয়াও কুসুম কি তার পুনরভিনয় করিতে পারিত না? কথাটা বলিবার ছুতায় অসময়ে একবার কি সে আসিতে পারিত না শশীর ঘরে,—গোপাল উঠিয়া দাওয়ায় বসিয়া থাকিবে আর দরজা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ শশীর কাছে তাহাকে বসিয়া থাকিতে হইবে, এ রকম একটা প্রত্যাশা করিয়া? কুসুম রাগ করিয়াছে নাকি!

বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র গোপাল বলিল, কোথায় গিয়েছিলি শশী? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরশু থেকে তাঁবু গেড়ে বসে আছেন গাঁয়ে, দশবার তাঁর চাপরাশি তোকে ডাকতে এল, শীতলবাবু দুবেলা লোক পাঠাচ্ছেন। কোথায় গেলি, কবে ফিরবি তাও কিছু বলে গেলি না। যা যা ছুটে যা, দেখা করে আয় গে সায়েবের সঙ্গে। ভালো পোশাক পরে যা।

শশী বলিল, এতবেলায় বাড়ি ফিরলাম, খাব না দাব না ছুটে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যাব? কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

গোপালের উৎসাহ নিভিয়া গেল। বলিল, আমি কথা কইলেই তুই চটে উঠিস শশী।

শশী বলিল, চটব কেন, সকাল থেকে খাইনি কিছু, খিদে তেষ্টা তো আছে মানুষের?

খাসনি? সকাল থেকে খাসনি কিছু?—গোপাল ব্যস্ত হইয়া উঠিল, শিগগির স্নান করে নে তবে। ও কুন্দ, তোরা সব গেলি কোথায় শুনি? সকাল থেকে কিছু খায়নি শশী,—সব কটাকে দূর করব এবার বাড়ি থেকে।

বিকালে শশী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল। সাতগাঁর স্কুল, গাওদিয়ার হাসপাতাল সব শীতলবাবু তাহাকে দেখাইয়াছেন, শশীকে বসাইয়া অনেকক্ষণ হাসপাতালের সম্বন্ধে কথা বলিলেন। যাদবের মরণের ইতিহাসটা মন দিয়া শুনিলেন। এ বিষয়ে অদম্য কৌতূহল দেখা গেল তার। শশী নিজে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে? ব্যাপারটা নিজে তবে সে একটু ব্যাখ্যা করুক না? শশীর আজ কিছু ভালো লাগিতে ছিল না, তাছাড়া যাদবের ও পাগলদিদির মরণকে তার ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। চিরদিন শুধু তার মনে মনেই থাকিবে। তারপর এক কাপ চা খাওয়াইয়া হাসপাতালের ফান্ডে একশত টাকা চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ম্যাজিস্ট্রেট শশীকে বিদায় দিলেন। সেখান হইতে সে শীতলবাবুর বাড়ি গেল। কিছু না বলিয়া উধাও হওয়ার জন্য শশীকে একচোট বকিলেন শীতলবাবু, তারপর তিনিও এক কাপ চা খাওয়াইয়া শশীকে বিদায় দিলেন। তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে। শীতলবাবু সঙ্গে আলো দিতে চাহিয়াছিলেন, পকেটে টর্চ আছে বলিয়া শশী বারণ করিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত পথ একবারও সে টর্চের আলো ফেলিল না, অন্ধকারে হাঁটিতে লাগিল। হাসপাতালে নিজের ঘরে গিয়া সে বসিল। হাসপাতালের কুড়ি টাকা বেতনের কম্পাউন্ডার বোধ হয় আজ এ সময় শশীর আবির্ভাব প্রত্যাশা করে নাই, কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। প্রায় দুঘণ্টা পরে সে ফিরিয়া আসিল। শশী কিন্তু তাহাকে কিছুই বলিল না। হাসপাতালে ছটি বেড, তার মধ্যে দুটি মাত্র দুজন রোগী দখল করিয়াছে। তাদের দেখিয়া কম্পাউন্ডারকে তাদের সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া শশী বাড়ি ফিরিল। কী আজ বিগড়াইয়া গিয়াছে মন! বাসুদেব বাঁড়ুয্যের বাড়িটা অন্ধকার, সামনে সেই প্রকাণ্ড জাম গাছটা, যার ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া একটা ছেলে মরিয়াছিল। মরণের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শশীর, তবু সেই ছেলেটাকে আজও সে ভুলিতে পারিল না। চিকিৎসার ভুল হইয়াছিল কি? দেহের ভিতরে কি এমন কোনো আঘাত লাগিয়াছিল ছেলেটার, সে যাহা ধরিতে পারে নাই? আজ আর সে কথা ভাবিয়া লাভ নাই। তবু শশী ভাবে। গ্রামের এমন কত কী শশীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। এ জন্য ভাবনাও হয় শশীর। গ্রাম ছাড়িয়া সে যখন বহু দূর দেশ চলিয়া যাইবে, গ্রাম্য জীবনের এসব অসংখ্য ছাপ যদি মন হইতে তার মুছিয়া না যায়? চিন্তা যদি তার শুধু এই সব খণ্ড খণ্ড ছবি দেখা আর এই সব ঘটনার বিচার করায় পর্যবসিত হয়? শ্রীনাথের দোকানে একটু দাঁড়ায় শশী। কী খবর শ্রীনাথ? মেয়ের জ্বর? কাল একবার নিয়ে যেও হাসপাতালে, ওষুধ দেব। চলিতে চলিতে শশী ভাবে যে তার কাছে অসুখের কথাই বলে সকলে, ওষুধ চায়। বাঁধানো বকুলতলাটা ঝরা ফুলে ভরিয়া আছে : এত ফুল কেন? বাড়ির সামনে বাঁধানো দেবধর্মী গাছতলাটা সেনদিদি বুঝি আর সাফ করে না? বাড়িতে ঢুকিবার আগে শশী দেখিতে পায় পরানের বড়ো ঘরের জানালাটা আলো হইয়া আছে। বাপ আসিয়াছে বলিয়া কুসুম বোধ হয় আজ তার বড়ো ঝুলানো আলোটাতে তেল ভরিয়া জ্বালিয়া দিয়াছে।

মনটা কেমন করিয়া ওঠে শশীর। হয়তো পরশু, হয়তো তার পরদিন কুসুম গাঁ ছাড়িয়া যাইবে, আর আসিবে না।

তেরো

ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস শশীর কোনোদিন ছিল না। মনের হঠাৎ-জাগা ইচ্ছাগুলিকে চিরদিন সে সামলাইয়া চলিবার চেষ্টা করে। তবে এমন কতকগুলি অসাধারণ জোরালো হঠাৎ-জাগা ইচ্ছা মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে জাগিয়া ওঠে যে সে সব দমন করার ক্ষমতা কারও হয় না। সকালে উঠিয়া কিছুই সে যেন ভাবিল না, কোনো কথা বিবেচনা করিয়া দেখিল না, সোজা পরানের বাড়ি গিয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, একবার তালবনে আসবে বউ?

কুসুম অবাক। তালবনে? কেন, তালবনে কেন এই সকালবেলা?

এসো। কটা কথা বলব তোমাকে।

কথা বলবেন? হাসব না কাঁদব ভেবে পাই না যে ছোটোবাবু! জন্মবয়সে আজ প্রথম আমাকে যেচে কটা কথা বলতে এলেন, তাও তালবনে ডেকে! যান, আমি আসছি।

তালবনের সেই ভূপতিত তালগাছটায় শশী বসিয়া রহিল, এমনই সকালবেলা একদিন তাকে ডাকিয়া আনিয়া কুসুম যেখানে বসিয়া মতির কথা শুনিয়াছিল। খানিক পরে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা খেলাচ্ছলে মৃদু মৃদু শব্দে বাজাইতে বাজাইতে কুসুম আসিল। এত উৎফুল্ল কেন কুসুম আজ, কাল যে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবে? মুখখানা একটু তাহার ম্লান দেখাক, চোখে থাক গোপন রোদনের চিহ্ন? কথা শশী বলিতে পারিল না। নিজের মুখখানা ম্লান করিয়া কুসুমের ভাব দেখিতে লাগিল।

হাসব?— কুসুম জিজ্ঞাসা করিল।

কেন, হাসবে কেন?

কুসুম হাসিয়া বলিল, আমার হাসি দেখলে আপনার মন নাকি জুড়িয়ে যায়? তাই শুধোচ্ছি।

শশী বলিল, তামাশা করার জন্যে তোমায় এখানে ডাকিনি বউ।

আহা, তা তো জানি না! তামাশাই করলেন চিরকাল, তাই ডাকলে মনে হয় তামাশা করার জন্যেই বুঝি ডেকেছেন। বসি তবে। বসে শুনি কী জন্য ডাকলেন।

শশী বলিল, এ কথা কী করে বললে বউ, চিরকাল তোমার সঙ্গে তামাশা করেছি?

তামাশা নয়? তবে ঠাট্টা বুঝি?

শশী একটু রাগ করিয়া বলিল, তোমার কী হয়েছে বুঝতে পারছি না বউ।

কুসুম তবু হালকা সুর ভারী করে না। বলিল, কী করে বুঝবেন? মেয়েমানুষের কত কী হয়, সব বোঝা যায় না। হলেনই বা ডাক্তার! এ তো জ্বরজ্বালা নয়।

শশী জ্বালা বোধ করে। এ কি আশ্চর্য যে কুসুমকে সে বুঝিতে পারে না, মৃদু স্নেহসিঞ্চিত অবজ্ঞায় সাত বছর যার পাগলামিকে সে প্রশ্রয় দিয়াছিল। শশীর একটা দুর্বোধ্য কষ্ট হয়। যা ছিল শুধু জীবনসীমার বহিঃপ্রাচীর, হঠাৎ তার মধ্যে একটা চোরা দরজা আবিষ্কৃত হইয়াছে, ওপাশে কত বিস্তৃতি, কত সম্ভাবনা, কত বিস্ময়। কেন চোখ ছলছল করিল না কুসুমের? একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার নামে আছাড় খাইয়া তার কোমর ভাঙিয়াছিল, যদি বা শেষ পর্যন্ত গেল ফিরিয়া আসিল পনেরো দিনের মধ্যে। এখানে এমন ভাবে হয়তো এই তাদের শেষ দেখা, এ জীবনে হয়তো আর এত কাছাকাছি তারা আসিবে না, আর আজ একটু কাঁদিল না কুসুম, গাঢ় সজল সুরে একটি আবেগের কথা বলিল না? কুসুমের মুখে ব্যথার আবির্ভাব দেখিতে শশীর দুচোখ আকুল হইয়া ওঠে, অস্ফুট কান্না শুনিবার জন্য সে হইয়া থাকে উৎকর্ণ। কে জানিত কুসুমের দৈনন্দিন কথা বা ব্যবহারে মেশানো অসংখ্য সংকেত, অসংখ্য নিবেদন এত প্রিয় ছিল শশীর, এত সে ভালোবাসিত কুসুমের জীবন-ধারায় মৃদু, এলোমেলো, অফুরন্ত কাতরতা? চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে আর আজ এই তালবনে তার এত কাছে বসিয়া খেলার ছলে কুসুম শুধু বাজাইবে চাবি! কী অন্যায় কুসুমের, কী সৃষ্টিছাড়া পাগলামি!

পা দিয়া ছোটো একটি আগাছা নাড়িয়া দিতে ঝরঝর করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িল। শশীর মনে হইল কুসুমকে ধরিয়া এমনই ঝাঁকুনি দেয় যাতে তার চোখের আটকানো জলের ফোঁটাগুলি এমনিভাবে ঝরিয়া পড়ে এবং দুচোখ মেলিয়া সে তা দেখিতে পায়। কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, কথা বলবেন বলে ডেকে এনে চুপচাপ কেন ছোটোবাবু?

শশী বলিল, শুনলাম তোমরা নাকি গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছ, তাই শুধোতে ডাকলাম।

কুসুম অনায়াসে বলিল, পরশু যাব।

আমায় যে বলনি কিছু?

কখন বলব? আপনি কি আসেন?

শশী রাগিয়া বলিল, নাইবা এলাম? জান না কাজের ভিড়ে কত ব্যস্ত থাকি? মিথ্যে করে ভাঙা হাত দেখাতে বৃষ্টি মাথায় করে যেতে পার, এত বড়ো একটা খবর দেবার জন্যে একবার যেতে পারলে না?

এ কথায় ক্রোধের কী অপূর্ব ভঙ্গিই কুসুম করিল! দুহাতে মুখের দুপাশের আলগা চুলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিয়া এমন তীব্রদৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিল যে মনে হইল শশী যেন দুরন্ত অবাধ্য শিশু, এখুনি কুসুম তাকে একটা চড়চাপড় মারিয়া বসিবে। এমন তো ছিল না কুসুম! শশী কবে তাকে অপমান না করিয়াছে, কবে মান রাখিয়াছে তার অভিমানের, কবে এমন কথা বলিতে ছাড়িয়াছে যা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায় না? কোনোদিন রাগ সে করে নাই, ভর্ৎসনার চোখে চাহে নাই। আজ এই সামান্য অপমানে সে একেবারে ফুঁসিয়া উঠিল বাঘিনির মতো!

তবে কড়া কথা কিছু সে বলিল না, আত্মসংবরণ করিল। তার রাগের ভঙ্গি দেখিয়াই শশী একেবারে নিভিয়া গিয়াছে দেখিয়া, কে জানে কী আশ্চর্য কৌশলে, কথা বলার চিরন্তন রহস্যময় সুরটিও কুসুম ফিরাইয়া আনিল। বলিল, বাবা, কী ছেলেমানুষের পাল্লাতেই পড়েছি! মিথ্যে করে ভাঙা হাত দেখাতে একবার ছেড়ে একশো বার যেতে পারি ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প মাথায় করে, ও কথা বলবার জন্য যাব কেন?

শশী বলিল, পরানকে দিয়ে তো বলে পাঠাতে পারতে?

কুসুম বলিল, তাই বা কেন পাঠাব? যে খবর নেয় না তাকে খবর দেবার কী গরজ আমার? আমিই তো বারণ করলাম ওকে।

কাজের ভিড়ে আসতে পারিনি বলে আমি একেবারে পর হয়ে গেছি, না বউ?

পাগলাটে মানুষ আমি, তবু যাওয়ার দুদিন আগে আমাকে এখানে ডেকে আনা চাই, আজে-বাজে কথা বলে কান ঝালাপালা করা চাই! দশ বছর খেলা করেও কি সাধ মেটেনি? আমরা মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে এ সব খেলার মর্ম বুঝি না, কষ্টে মরে যাই।

এ কথার কোনো প্রতিবাদ নাই বলিয়া শশীর মুখে কথা ফোটে না। জুতার ভিতর হইতে পা বাহির করিয়া পায়ে ঘাসের শিশির মাখিতে মাখিতে নতমুখে সে মূক হইয়া বসিয়া থাকে।

এদিকে কুসুমের চোখে এতক্ষণে জল আসিয়া পড়িয়াছে। শশীর কাছে মনের আবেগকে এমন স্পষ্টভাবে চোখের জলে কুসুম কোনোদিন স্বীকার করে নাই। তবে সে বড়ো শক্ত মেয়ে, দুবার জোরে জোরে শ্বাস টানিয়া আর দুবার আঁচলে চোখ মুছিয়াই আবেগ সে আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল।

বলিল, এমন হবে ভাবিনি ছোটোবাবু। তাহলে কোনকালে গাঁ ছেড়ে চলে যেতাম।

কুসুম আর কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলিলে শশী যে হঠাৎ খ্যাপার মতো বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিত তাতে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কুসুমের এই অনুযোগগুলি তাকে দমাইয়া রাখিল। এ কথা সে ভুলিতে পারিল না যে এতকাল পরে ও ভাবে কুসুমের সমস্ত নালিশের জবাব

দেওয়া আর চলে না। মুখখানা শশীব একটু পাংশু দেখাইতেছিল। কী বলা যায় কুসুমকে, কী করা যায়! কে জানিত মোটে দুদিনের নোটিশে কুসুম তাকে এমন বিপদে ফেলিবে, তার গুছানো মনের মধ্যে এমন ওলোট-পালোট আনিয়া দিবে! কুসুমের কাছে বসিয়া থাকিলে, দুদিন পরে সে যে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে এই চিন্তার কষ্ট তরঙ্গের মতো পলকে পলকে অবিরাম উথলিয়া উঠিয়া তাকে এমন উতলা করিয়া তুলিবে, এ ধারণা শশীর ছিল না। কাল কথাটা শুনিয়া অবধি শশীর মনে নানা বিচিত্র ভাবধারা উঠিতেছিল, আজ সকালে সে সমস্ত যেন শুধু একটা কটু ক্লেশে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

কুসুমের যে শরীরটা আজ অপার্থিব সুন্দর মনে হইতেছিল তার সমস্তটা শশী জড়াইয়া ধরিতে পারিল না, হঠাৎ করিল কি, খপ করিয়া কুসুমের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কুসুম একটু অবাক হইয়া গেল। দুজনের মধ্যে ব্যবধান ছিল, হাতে টান পড়ার জন্যই বোধ হয় কুসুম একটু সরিয়াও আসিল কিন্তু কথা যা বলিল তা অপূর্ব, অচিন্তিত।

কতবার নিজে যেচে এসেছি, আজকে ডেকে হাত ধরা-টরা কি উচিত ছোটোবাবু? রেগে-টেগে উঠতে পারি তো আমি? বড়ো বেয়াড়া রাগ আমার।

শুনিয়া শশীব আধো পাংশু মুখখানা প্রথমে একেবারে শুকাইয়া গেল। কে জানিত কুসুমকে এত ভয়ও শশী করে? তবু কুসুমের হাতখানা সে ছাড়িল না। বলিল, রেগো, কথা শুনে রেগো। আমার সঙ্গে চলে যাবে বউ?

চলে যাব? কোথায়?

যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই চলো আজ রাত্রে।

কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, না।

শশী ব্যাকুলভাবে বলিল, কেন? যাবে না কেন?

কুসুম শুধু বলিল, কেন যাব?

শশী বোকার মতো, শিশুর মতো বলিল, কেন যাবে? কেন যাবে মানে কী কুসুম?

আজ নাম ধরে কুসুম বললেন!—বলিয়া ছোটো বালিকার মতো মাথা দুলাইয়া জ্বলজ্বলে চোখে শশীর অভিভূত ভাব লক্ষ করিতে করিতে কুসুম বলিল, কী করে যে শুধোলেন কেন যাব! আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়?

শশী অধীরভাবে বলিল, একদিন কিন্তু যেতে।

কুসুম স্বীকার করিয়া বলিল, তা যেতাম ছোটোবাবু, স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলেও ছুটে যেতাম। চিরদিন কী এক রকম যায়? মানুষ কী লোহায় গড়া যে চিরকাল সে এক রকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।

তার হাত ছাড়িয়া দিয়া শশী বলিল, তোমার রাগ যে এমন ভয়ানক তা জানতাম না বউ। অনেক বড়ো বড়ো কথা তো বললে, একটা ছোটো কথা তুমি কেন বুঝতে পার না? নিজের মন কি মানুষ সব সময়ে বুঝতে পারে বউ? অনেকদিন অবহেলা করে কষ্ট দিয়েছি বলে আজ রাগ করে তার শোধ নিতে চলেছ, এমন তো হতে পারে আমি না বুঝে তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তোমার পরে কতটা মায়া পড়েছে জানতে পারিনি? তুমি চলে যাবে শুনে এতদিনে আমার খেয়াল হয়েছে? তা ছাড়া তোমার কথাই ধরি, তুমি বললে মানুষ বদলায়—বেশ, আমি অ্যাদ্দিন তোমার সঙ্গে খেলাই করেছি, আজ তো আমি বদলে যেতে পারি বউ?

কী ব্যাকুল, উৎসুক আবেদনের মতো শোনায় শশীর কথাগুলি। কে জানিত কুসুমকে তাহার এমন করিয়া একদিন বলিতে হইবে। শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না কুসুমেব। শরীরটা যে শশীর ভালো নাই তার মুখ দেখিয়াই তা বোঝা যায়, হয়তো কুসুম মনে করে যে তার এই সকাতর দুর্বলতা সেই জন্যই। সে মৃদুস্বরে বলিল, এ কী বলছেন ছোটোবাবু? আমার জন্যে আপনার মন কাঁদবে?

শশী সরলভাবে বলিল, ভয়ানক মন কাঁদবে বউ। জীবনে আমি কখনও তাহলে সুখী হতে পারব না।

কুসুম ব্যাকুলভাবে বলিল, তা কি কখনও হয়? আপনার কাছে আমি কত তুচ্ছ, আমার জন্য জীবনে কখনও সুখী হতে পারবেন না! দুদিন পরে মনেও পড়বে না আমাকে।

শশী বলিল, এতকাল ধরে জড়িয়ে জড়িয়ে বেঁধেছ আর দুদিনে তোমাকে ভুলে যাব, তাই ভেবে নিলে তুমি?

শেষ পর্যন্ত কুসুম বলিল, আমার সাধ্যি কী ছোটোবাবু আপনাকে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধব?

শশী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, আজ ও সব বিনয় রাখো বউ। আজেবাজে বকার ধৈর্য আমার নেই। আমার কী হবে না হবে সে কথাও না। স্পষ্ট করে আমায় শুধু তুমি বুঝিয়ে দাও, চিরকাল আমার জন্যে ঘর ছাড়তে তুমি পাগল ছিলে আজকে হঠাৎ বিরূপ হলে কেন?

এ সব কথায় কলহ হয় ছোটোবাবু। যাবার আগে কলহ কি ভালো?

কলহ হবে না, বলো।

কুসুম ম্লান মুখে বলিল, আপনাকে কী বলব ছোটোবাবু, আপনি এত বোঝেন! লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো সুখ চাই না। বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকেব সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি—আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছে নেই! সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটোবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছি সেটা কী। কাকে ডাকছেন ছোটোবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।

কুসুম মরিয়া গিয়াছে। সেই চপল রহস্যময়ী, আধোবালিকা আধোরমণী, জীবনীশক্তিতে ভবপুর, অদম্য অধ্যবসায়ী কুসুম। শশী যে কেন আর কোনো কথা বলিল না তার কারণটা দুর্বোধ্য। বোধ হয় ভাবিবার অবসর পাইবাব জন্য। কুসুম তো আজ ও কাল এখানে আছে। বলিবার কিছু আছে কিনা সেটাই আগে ভাবিয়া দেখা দরকার।

মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাড়ির দিকে চলিতে আরম্ভ করিবাব সময় কুসুম শুধু বলিল, আপনি দেবতার মতো ছোটোবাবু।

বাড়ি ফিরিয়া শশী বুঝিতে পারে কল্পনার এমন কতগুলি স্তর আছে বিশেষ কোনো উপলক্ষ ছাড়া যেখানে উঠিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। এক একটা ঘটনা যেন চাবির মতো মনেব এক একটা দুয়ার খুলিয়া দেয়, যে দুয়ার ছিল বলিয়াও মানুষ জানিত না। এত বড়ো বড়ো কল্পনা শশীর, এত বিরাট ও ব্যাপক সব মনোবাসনা, একদিনে সব যেন পৃথক অনাবশ্যক হইয়া গেল,—শিশুর মনের বড়ো বড়ো ইচ্ছাগুলি যৌবনে যেমন যায়। রবার বসানো চাকা-যুক্ত গদিআঁটা ঠেলা গাড়িতে চাপার জন্য ছেলেবেলা কত কাঁদিয়াছিল শশী, কলিকাতায় মোটর হাঁকাইবার সাধ আজ তারই পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় যাইবে শশী? কী আছে গ্রামের বাইরে শশীর যা মনোহরণ করিতে পারিবে? একটা প্রকাণ্ড জড় পৃথিবী, অসংখ্য অচেনা মানুষ। কী পাইবে শশী সেখানে?

কুসুমের কথাগুলির অন্তরালে যত অর্থ ছিল ক্রমে ক্রমে শশী তা পরিষ্কার বুঝিতে পারে। একদিন দুদিন নয়, অনেকগুলি সুদীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তার জন্য কুসুম পাগল হইয়া ছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে

তার সে উন্মাদ ভালোবাসা নির্জীব হইয়া আসিয়াছে। হয়তো মরিয়াই গিয়াছে! কে বলিতে পারে? আজ এ ঘটনা শশীর কাছে যত ভয়ানক মনে হোক এই পরিণতিই তো স্বাভাবিক। গাঁয়ের মেয়ে ঘরের বউ কুসুম, মনোবাসনা কতদূর অদম্য হইয়া ওঠায় দিনের পর দিন নৈবেদ্যের মতো নিজেকে শশীর কাছে সে নিবেদন করিয়া চলিয়াছিল এখন শশী তা বুঝিতে পারে, কুসুমের অমন ভয়ানক উপবাসী ভালোবাসা যে এতকাল সতেজে বাঁচিয়া ছিল তাই তো কল্পনাতীতরূপে বিস্ময়কর। আপনা হইতে যে প্রেম জাগিয়াছিল আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে আবার তা লয় পাইয়াছে। শশীকে না দেখিয়া এখন কুসমেব দিন কাটিবে, শশীকে বাদ দিয়া কাটিবে জীবন।

কুসুমের পরিবর্তনে আশ্চর্য শশী তাই হয় না। ঘরে আগুন লাগিলে আগুন নেভে--বাহিরেরও, মনেরও। কুসুমের মনের আগুন কেন চিরদিন জ্বলিবে? নিজের ব্যাকুলতা শশীকে অবাক করিয়া রাখে। যখনই মনে হয় তার আর কিছুই করিবার নাই, জীবনে যত বড়ো অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারুক কুসুমকে আর কোনোদিন সে ভালোবাসাইতে পাবিবে না, কষ্টে শশী ছটফট করে। ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কুসুম মরিয়া গিয়াছে,—তারই চোখের সামনে, তারই অন্যমনস্ক মনের প্রান্তে। কী ছেলেখেলায় সে মাতিয়া ছিল যে এমন ব্যাপার ঘটিতে দিল?

ছেলেখেলাগুলি সবই বর্তমান আছে। হাসপাতালে গেল শশী, নাড়ি টিপিয়া হৃৎস্পন্দন শুনিয়া ওষুধ লিখিয়া দিল,--ফোঁড়াও কাটিল একটা। সাতগাঁয় রোগীও দেখিতে যাইতে হইল। কতকাল এ সব কর্তব্য শশী করিতেছে একদিন কি কলের মতো কাজগুলি করা যায় না? অন্যমনে কুসুমের কথা ভাবিতে ভাবিতে নাড়ি টিপিতে কেহ তো তাহাকে বারণ করে নাই, এত রাগ কেন শশীর, মরণাপন্ন রোগীকে এমন ধমক দেওয়া কেন? কী আপশোশ আজ শশীর মনে, কী আত্মধিক্কার। কারও তা বুঝিবার নয়। ধরিতে গেলে একদিক দিয়া এ তো ভালোই হইয়াছে শশী? ঘরেব বউ শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে ঘরেই রহিয়া গিয়াছে, রক্ষা পাইয়াছে নীতি ও ধর্ম। সত্যই এদিক দিয়া শশীর একটু ভালো লাগা উচিত ছিল। ভালোমন্দের অনেকদিনের পুরানো এ সব সংস্কাব তাব আছে বইকী, তবু, একবারও শশীর মনে হইল না একদিন অনেক ভণিতা করিয়া কুসুমকে যে কথাগুলি বুঝাইয়া বলিতে গিয়াছিল আজ প্রকারান্তবে তাই ঘটিয়াছে—শান্ত মনে বুঝিয়া শুনিয়া চারিদিক বিবেচনা করিয়া কুসুমকে সে যে আত্মসংযম অভ্যাস করিতে বলিয়াছিল, কিছু না বুঝিয়া শুনিযাই কুসুম এখন অনায়াসে তা পালন করিতে পারিবে।

পরদিন সকালে কুসুমকে এ বাড়িতে দেখা গেল। মেয়েদের কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছে আর কেহ হইলে হয়তো ভাবিয়া বসিত এ তার শশীকে দেখিতে আসার ছল, শশী তা ভাবিল না। নিজের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবনাগুলিকে শশী চিরকাল ভয়ানক সন্দেহেব সঙ্গে বিচার করে। তবু সে করিল কী, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকার বদলে নিজের ঘরে গিয়া সকলে কী ভাবিবে না ভাবিবে একেবারে অগ্রাহ্য কবিয়া ডাকিল, পরানের বউ, একবার শোনো।

কুসুম ঘরে আসিয়া বলিল, বিদায় নিতে এলাম ছোটোবাবু। দোষটোয যা করেছি মনে রাখবেন নাকি?

শশী বলিল, বাখব না? দোষগুণ, ভালোমন্দ, তোমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তুচ্ছ কথাটি পর্যন্ত কোনোদিন ভুলতে পারব না বউ।

কালকের চেয়ে শশীর আজকের প্রেম-নিবেদন ঢের স্পষ্ট। যেমন বলিল তেমনভাবে শশী যদি কুসুমকে মনে রাখে তবে সত্যসত্যই কী গভীরভাবে কুসুমকে সে ভালোবাসে?

কুসুম তাই কাঁদো কাঁদো হইয়া বলিল, এমন করে বললে আমার যে পায়াভারি হয়ে যায় ছোটোবাবু?

শশী বলিল, সত্যি কথা আমি সোজা ভাষাতেই বলি বউ—স্পষ্ট করে। ইশারা ফিশারায় বলা আমার আসে না।

যাওয়ার সময় বিপদ করলেন।—কুসুম বলিল।

নাই বা গেলে?—বলিল শশী।

কুসুমকে গাঁয়ে রাখিবার জন্য আজও চেষ্টা করিতেছে শশী, এ শশীকে যেন চেনা যায় না। এমন দীনভাব সে কোথায় পাইল, কোথায় শিখিল এমন কাঙালপনা? জানে, কুসুম থাকিবে না, থাকিলেও ভালোবাসিবে না, তবু উৎসুকভাবে শশী জবাবের প্রতীক্ষা করে। মানুষ যে মরিয়া বাঁচে না কী তার প্রমাণ আছে? শীতকালের বর্ষায় কখনও কি মরা নদীতে বান ডাকে না? নিজেকে হয়তো কুসুম বুঝিতে পারে নাই, কাল তালবনে মিথ্যা বলিয়াছিল!

কুসুম ভয়ে ভয়ে বলিল, থেকে কী করব ছোটোবাবু? তাতে আপনারও কষ্ট, আমারও কষ্ট। এ বয়সে আর কী কষ্ট সইতে পারব? গলায় দড়ি-টড়ি দিয়েই বসব হয়তো।

শশী না পারুক, ইশারায় মনের কথা কুসুম বেশ বলিতে পারে, অনেকদিন শশীকে ও ভাবে মনের কথা বলিয়া তার দক্ষতা জন্মিয়াছে। শশী বিবর্ণ হইয়া গেল। সভয়ে বলিল, না বউ না, ছি, ও সব কখনও কোরো না। ও সব নাটুকেপনা করতে নেই। গোড়ায় যদি বলতে, থাকার কথা মুখেও আনতাম না। এত যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে মন, বাপের বাড়ি গিয়েই থাক। বুঝে শুনেই তো কাজ করতে বলেছি তোমাকে গোড়া থেকে, চারদিক বিবেচনা করে।

কুসুম বলিল, তা না করলে অনেক আগেই গলায় দড়ি দিতাম ছোটোবাবু।—যাব এবার?

এ অনুমতি চাওয়ার কোনো কারণই শশী সেদিন খুঁজিয়া পাইল না।

এত কাণ্ড করিয়া কুসুম বাপের বাড়ি গেল। এই রকম স্বভাব কুসুমের। জীবনটা নাটকীয় করিয়া তুলিবার দিকে চিরদিন তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শুধু গ্রাম ছাড়িবার কল্পনা নয়, অনেক কল্পনাই শশীর নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, তবে গ্রামে বসিয়া থাকিবারও আর কোনো কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। হাসপাতালের কাজে বেশ শৃঙ্খলা আসিয়াছে, একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবার সে বিদায় গ্রহণ করিতে পারে। যাওয়ার কথা প্রকাশ করিলে ঘরে ও বাহিরে একটা হইচই বাঁধিয়া যাইবে, কৈফিয়ত দিতে দিতে, উপদেশ ও উপরোধ শুনিতে শুনিতে বাহির হইয়া যাইবে প্রাণ। এটা এড়ানো চলিবে না। সে তো কুসুম নয় যে যেদিন খুশি তল্পিতল্পা গুছাইয়া চলিয়া যাইতে চাহিলে এত বড়ো গ্রামের মধ্যে শুধু ব্যস্ত হইবে একজন।

হাঙ্গামার ভয়টাই যেন শশীকে নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখিল। মন তো ভালো থাকেই না, শরীরটাও খারাপ। উৎসাহ এবং জীবনীশক্তির রীতিমতো অভাব ঘটিয়াছে।

মাস দুই কাটিয়া গেল। সকালবেলা সূচনা হইয়া একদিন মাঝরাত্রে সেনদিদির অবশ্যম্ভাবী বিপদটি আসিয়া পড়িল।

সত্যই বিপদ। সেনদিদি বুঝি বাঁচে না।

অনেক বয়সে প্রথম সন্তান হওয়াটা হয়তো আকস্মিক সৌভাগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু সেটা বিপজ্জনকও বটে। গোপালের বোধ হয় এ আশঙ্কা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়া এ সময় দু-এক দিনের জন্যও সে কোথাও যাইত না, সর্বদা খোঁজখবর লইত। যামিনী কবিরাজের বৈঠকখানায় তার সর্বদা যাতায়াত,—যামিনী বাঁচিয়া থাকিতে শেষের দিকে কখনও যাইত না। সেনদিদির দাদা কৃপানাথ কবিরাজ বড়ো পোষ মানিয়াছে গোপালের কাছে। লোকটা চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়াছে ভালো কিন্তু প্রয়োগ জানে না, পসারও নাই। চরক সুশ্রুতের শ্লোক বলিবার ফাঁকে ফাঁকে সে গোপালের স্তব পাঠ করে কিনা কে জানে, গোপাল তাকে বিশেষ কৃপা করিয়া থাকে। তা না হইলে যামিনী কবিরাজের

বাড়িঘরে সপরিবারে বাস করিবার সৌভাগ্য তার বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারিত না, গোপাল সেনদিদিকে বলিত, এবার তাড়াও ওদের ; সেনদিদি ওদের বলিত, এবার তোমরা এসো। একটা গুরুতর মামলার শুনানি উপলক্ষে গোপাল আজ বাজিতপুরে গিয়াছিল। কোর্টে কাজ থাকিলে সেদিন গোপাল গ্রামে ফেরে না, আজ ফিরিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময়।

সেনদিদির খবরটা আসিল গোপাল যখন খাইতে বসিয়াছে,—শশীর সঙ্গে। খবরটা দিল কৃপানাথ স্বয়ং।

এই তো বিপদ দাদা। আপনাকে একবার যেতে হচ্ছে।

গোপাল শুষ্কমুখে কাতরভাবে বলিল, আমি গিয়ে কী করব হে?

কৃপানাথ বলিল, একবার যেতে হচ্ছে। একটা বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে—

বুদ্ধি পরামর্শ? বিপদে বুদ্ধি পরামর্শ দিতে যাওয়াটা দোষের নয়, গোপাল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। ধীর স্থির থাকবার চেষ্টা করে গোপাল কিন্তু চাঞ্চল্য চাপিতে পারে না। বাড়ির মেয়েরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মাথা হেঁট করিয়া শশী নীরবে খাইয়া যায়।

ও বাড়িতে গিয়ে কৃপানাথকে গোপাল কী পরামর্শ দেয় সেই জানে, খাইয়া উঠিয়া শশী ঘরে গিয়া বসিতে না বসিতে সে আবার আসিয়া হাজির হয়। বলে, তোমাকে একবার যেতে হবে শশী।

শশী বলে, আমাকে অনুগ্রহ করে তুমি বলবেন না।

অ্যাঁ? বলিয়া কৃপানাথ একটু থামে। শীর্ণ মুখখানা তাহার একটু লম্বাটে হইয়া যায়। ভাবিয়া বলে, আমি আপনার পিতৃবন্ধু—

শশী বলে, আপনি যান মশায়, আমার ঘুম পেয়েছে।

কৃপানাথ আবার একটু থামে। থতোমতো ভাবটা কাটিতে একটু সময় লাগে তার। তারপব সংস্কৃত শ্লোক বলার মতো গড়গড় করিয়া বিপদের কথা বলিয়া যায়, চোখ দুটো তাব ছলছল করে। শশী না গেলে সেনদিদি বাঁচিবে না, গেলেও বাঁচিবে কিনা ভগবান জানেন, তবু যতক্ষণ আশ কিনা তাই দয়া করে আপনি একবার চলুন শশীবাবু। গাঁয়ে আর ডাক্তার নাই, কৃপানাথ নিজে যদিও চিকিৎসক, এ সব হাঙ্গামার ব্যাপার সে বোঝে না, জ্বর-জ্বালা হয় পাঁচন-বড়ি দিয়া চোখের পলকে সারাইয়া দিবে, এ তো তা নয়। শশী ভিন্ন সেনদিদির এখন আর গতি নাই। শুনিতে শুনিতে শশীর মনে পড়ে সেনদিদির সেই বসন্ত হওয়ার ইতিহাস, অসময়ে সাতগাঁর একটি বসন্তরোগীর দেহের বীজাণু দু-মাইল মাঠঘাট বাড়িঘর ডিঙাইয়া সেনদিদির দেহে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, যামিনীর চেলা ছিল সাতগাঁর রোগীটার চিকিৎসক। সেদিন এ বাড়িতে গোপাল আর ও বাড়িতে যামিনী তাকে সেনদিদির চিকিৎসা করিতে দেয় নাই। কত যুক্তি তর্ক অপমান আস্ফালনের বাধা ঠেলিয়া সেনদিদিকে সে বাঁচাইয়াছিল,—এক রকম গায়ের জোরে। আজ আবার অন্য কারণে সেনদিদি মরিতে বসিয়াছে। আজ তার চিকিৎসা করিতে বাধা নাই, নিজে গোপাল ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। কেন ডাকিয়াছে? পুত্র বলিয়া এ ভাবে তাকে ডাকিবার অধিকার কে দিয়াছে গোপালকে? সেনদিদি মরুক বাঁচুক শশী কী গ্রাহ্য করে? অমন কত রোগী শশীর নিজের হাতে মরিয়াছে—সেনদিদি তো আজ শশীর রোগীও নয়। আর সমস্ত কথা সে যদি ভুলিয়াও যায়, যদি শুধু মনে রাখে যে সে ডাক্তার, মরণাপন্ন রোগীর আত্মীয় তাকে ডাকিতে আসিয়াছে, তবু না যাওয়ার অধিকার তার আছে। দেহ তার অসুস্থ দুর্বল, সমস্ত দিন খাটিয়া খাটিয়া সে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ডাক আসিলে সে ফিরাইতে পারে বইকী! তার কি বিশ্রামের দরকার নাই?

কৃপানাথ ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেলে আলোটা কমাইয়া শশী খাটে বসিয়া একটা মোটা চুরুট ধরাইল। আজকাল বিড়ির বদলে সে চুরুট খায়।

কুন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন শোবেন শশীদাদা? মশারি টাঙিয়ে দেব?

শশী বলিল, দে।

মশারির কোণ বাঁধিতে বাঁধিতে কুন্দ বলিল, সেনদিদিকে একবার দেখতে যাবেন না শশীদাদা?

শশী রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছিস নাকি কুন্দ?

কুন্দ থতোমতো খাইয়া গেল। তারপর কাঁদিয়া বলিল, দুটি খেতে পরতে দিচ্ছেন বলে আমি কথা কইলেই আপনি রেগে যান। কী করেছি আপনার আমি? এর চেয়ে আমায় তাড়িয়ে দিন শশীদাদা, আমি যেখানে হোক চলে যাই।

শশী নরম হইয়া বলিল, আজেবাজে কথা বলিস তাই তো রাগ হয়।

কুন্দর কান্না সহজে থামে না। সে কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, আজেবাজে কথা কখন বললাম, কখন ইয়ার্কি দিলাম? একবার চিকিৎসা করে ওকে বাঁচিয়েছিলেন, তাইতে বললাম দেখতে যাবেন কিনা। তাও দোষের হয়ে গেল।

শশী আরও নরম হইয়া বলিল, শরীরটা ভালো নেই কুন্দ, গা হাত পা ব্যথা করছে, কাঁদিস না। হাতের কাজটা চটপট শেষ কর দিকি, শুয়ে পড়ি।

রাত প্রায় বারোটার সময় শশীর দরজা ঠেলিয়া গোপাল আস্তে আস্তে ডাকিল, শশী? শশী ঘুমোলি?

অসুস্থ শরীরের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা এতক্ষণে শশীর ঘুমে পরিণত হইতেছিল, জাগিয়া সাড়া দিতে গোপাল দরজা খুলিতে বলিল। শশী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। গোপালের হাতে আলো ছিল, মেঝেতে সেটা নামাইয়া দিয়া সে বসিল খাটে। গোপাল স্তব্ধ, বিষণ্ণ, গম্ভীর, মনে হয় কথা সে কিছুই বলিবে না, নির্বাক আবেদনের ভঙ্গিতে এমনিভাবে মধ্যরাত্রে বসিয়া থাকিবে ছেলের ঘরে, ছেলের সামনে।

শশীই শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, আমার ঘুম পাচ্ছে।

গোপাল বলিল, ঘুম পাচ্ছে? তা পাবে বইকী, রাত কি কম হল! শরীরটাও তো তোমার ভালো নেই। একটা মানুষ মরে যাচ্ছে তাই, নইলে তোমায় ডাকতাম না শশী।

শশী চুপ করিয়া রহিল। গোপাল ব্যগ্রভাবে বলিল, যাবি না একবার? শুধু তো মরবে না শশী, কী যন্ত্রণাই যে পাচ্ছে!

শশী বলিল, বাজিতপুর থেকে ওরা ডাক্তার আনাল না কেন? বিকেলে লোক পাঠালে এতক্ষণে এসে পৌঁছত।

গোপাল বলিল, সে বুদ্ধি কারও হয়নি। তুই গাঁয়ে থাকতে বাজিতপুরে ডাক্তার আনতে লোক পাঠাবেই বা কেন? তোর চেয়ে তারা তো বেশি জানে শোনে না। ডাকলে তুই যে যাবি না, ওরা তা ভাবতেও পারেনি শশী। কৃপানাথ এখন আমার হাতে পায়ে ধরে কাঁদাকাটা করছে বাবা। তুই অপমান করে তাড়িয়ে দিলি তাই তোর কাছে আসতে আর সাহস পাচ্ছে না।

শশীর ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল, মান অপমান তো আমারও আছে বাবা।

গোপাল বলিল, না না, তোকে অপমান করেনি শশী। না বুঝে যদি একটা কথা বলে থাকে,—কথা গোপাল শেষ করে না। তারপর দুজনেই চুপ করিয়া থাকে। উশখুশ করে গোপাল, করুণ চোখে সে তাকায় শশীর দিকে, মেরজাই-এর ফিতাটা টান দিয়া খুলিয়া বুকটা উদলা করিয়া দেয়, খাইয়া উঠিয়া পান মুখে দিবার সময় পায় নাই, তবু হয়তো অভ্যাসে, হয়তো মানসিক চাঞ্চল্যে মুখের শূন্যতাটা পানের মতো বার কয়েক চিবাইয়া দেয়। বড়ো অদ্ভুত রকমের শ্রীহীন দেখায় গোপালকে।

গোপাল যে নিজেই তাহাকে অনুরোধ করিতে আসিতে পারিবে শশী এটা ভাবিতে পারে নাই। এত বেশি সেনদিদির জীবনের মূল্য গোপালের কাছে? একদিন ওর চিকিৎসা করিতে কেন তবে সে তাকে বাধা দিয়াছিল? গভীর দুঃখ ও লজ্জায় শশীর মন ভরিয়া গিয়াছিল, তবু সে মনে মনে

আশ্চর্য হইয়া গেল। বসন্ত যখন রূপ মুছিয়া লইয়া গেল সেনদিদির, তখন মমতা আসিল গোপালের, এমন গভীর অবুঝ স্নেহ!

তারপর শশী বলিল, যান, শোবেন যান আপনি। আমি যাচ্ছি ও বাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে।

গোপাল নিরুত্তরে উঠিয়া গেল। মুখ দিয়ে আর তাহার কথা বাহির করার মতো ক্ষমতা ছিল না। শশী তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়েছে, আজ যে কষ্ট দিল তার তুলনা হয় না। কৃপানাথ যখন ডাকিতে আসিয়াছিল তখন যদি শশী সেনদিদিকে দেখিতে যাইত, এ লজ্জাটা তবে গোপালের থাকিতে পারিত নেপথ্যে।

এ ভাবে যখন তাহাকে যাইতেই হইল, সেনদিদিকে বাঁচানোর চেষ্টাটা শশী বিশেষ সমারোহের সঙ্গেই করিয়া দেখিল। রাতদুপুরে এই বিপদগ্রস্ত বাড়িতে সে আরও একটা অতিরিক্ত বিপর্যয় আনিয়া ফেলিল। হুকুম দিয়া ধমক দিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অনেক জল গরম হইল, লোক পাঠাইয়া হাসপাতাল হইতে ওষুধ যন্ত্রপাতি ও কম্পাউন্ডারকে আনানো হইল, দেখিয়া কে বলিবে কিছুক্ষণ আগেও উদাসীন শশী সেনদিদিকে মরিতে দিতে প্রস্তুত ছিল! আবার তেমনই জিদ শশীর আসিয়াছে যার জোরে সেনদিদিকে আগে একবার সে বাঁচাইয়াছিল। সেদিন সে লড়িয়াছিল বাহিরের বাধার সঙ্গে, আজ কি শশীকে লড়িতে হইল অন্তরের বাধার সঙ্গে? মুমূর্ষু সেনদিদিকে দেখিয়াও কি শশীর মনের বিতৃষ্ণা মিলাইয়া গেল না? সব তো তারই হাতে, এ দুজনের মরণ বাঁচন! কী না করিতে পারে শশী? শুধু সেনদিদির নয়, সেনদিদির এই নবাগত চিহ্নের চিহ্নকেও তো সে চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে মুছিয়া দিতে পারে। কারও প্রশ্ন করাও চলিবে না কেন এমন হইল। শশী কি শুধু মানুষ বাঁচাইতে শিখিয়াছে, মারিতে শেখে নাই? অতি সহজে, অন্যমনস্ক অবস্থায় ভুল করার মতো করিয়াও, সে তা পারে। বাকি জীবনটা তাতে খুব কি আপশোশ করিতে হইবে শশীকে?

শেষ রাত্রে একটি ছেলে হইল সেনদিদির, ভোরবেলা সেনদিদি মরিয়া গেল। এত কম জীবনীশক্তি ছিল সেনদিদির, এত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল তার হৃৎপিণ্ড যে প্রথমে তাকে পরীক্ষা করিয়া শশীর বিশ্বাস হইতে চাহে নাই, সেনদিদিকে দেখিয়া কখনও মনে হয় নাই তার দেহযন্ত্রের আসল ইঞ্জিনটা এমন হইয়া গিয়াছে। তবু, শশীও ভাবিতে পারে নাই এ যাত্রা সে রক্ষা পাইবে না। ডাক্তার মানুষ সে, সেও যে ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না অজ্ঞান অবস্থা পার হইয়া সেনদিদির যখন শান্ত হইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করা উচিত ছিল হঠাৎ হাত পা কেন ঠান্ডা হইয়া আসিল।

শশী জানে এ রকম হয়, মানুষের দেহের মধ্যে আজও এমন কিছু ঘটিয়া চলে এ যুগের ধন্বন্তরিরও যা থাকে জ্ঞানবুদ্ধির অগোচর। এ তো মানুষের বানানো কল নয়। তবু শশীর রাতজাগা চোখের আরক্ত ভাব যেন বাড়িয়া গেল, অবসাদ যেন হইয়া উঠিল অসহ্য। আর কিছু করিবার ছিল না, বাড়ি গিয়া স্নান করিয়া শশী কড়া এককাপ চা খাইল, তারপর শুইয়া পড়িল। আসিবার সময় ও বাড়ির বাহিরে গোপালকে সে দেখিয়া আসিয়াছে।

চেনা ও জানা মানুষগুলির মধ্যে দু-চারজনকে শশী যেমন মরিতে দেখিয়াছে, তেমনই তাদের ঘরে দু-চারজনকে জন্ম লইতেও দেখিয়াছে : দু-চারজন মরিবে দু-চারজন জন্ম লইবে এই তো পৃথিবীর নিয়ম। তবু এ সব মরণ মরণে অভ্যস্ত শশী ডাক্তারকে বড়ো বিচলিত করে। যারা মরে তারা চেনা, স্নেহ ও বিদ্বেষের দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্ক তাদের সঙ্গে, যারা জন্মায় তারা তো অপরিচিত। এই কথা ভাবে শশী : সেনদিদি কি বাঁচিত, সে যদি অন্যভাবে চেষ্টা করিত, যদি অন্য ওষুধ দিত? শেষের দিকে সে যে ব্যস্তভাবে গোটা দুই ইনজেকশন দিয়াছিল রোগিণীর পক্ষে তা কি অতিরিক্ত জোরালো হইয়াছিল? হইয়া থাকিলেও তার দোষ কী? অনেক বিবেচনা করিয়া তবে সে ইনজেকশন দুটো দিয়াছিল, তা ছাড়া আর কিছুই তখন করিবার ছিল না। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে যা ভালো বুঝিয়াছে

তাই সে করিয়াছে, তার বেশি আর সে কী করিতে পারে? আজ পর্যন্ত সে যে অনেকগুলি প্রাণ রক্ষা করিয়াছে সেটাও তো ধরিতে হইবে?

গোপাল একেবারে মুহ্যমান হইয়া গেল। এমন পরিবর্তন আসিল গোপালের যে সকলের সেটা নজরে পড়িতেছে বুঝিয়া শশীর লজ্জা করিতে লাগিল। গোপাল চিরকাল ভোজন-বিলাসী এখন তার আহারে রুচি নাই, অমন চড়া মেজাজ কিন্তু মুখ দিয়া আর কড়া কথা বাহির হয় না। গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বাহিরের ঘরে ফরাশে বসিয়া তামাক টানে আর আবশ্যক অনাবশ্যক নথিপত্র ঘাঁটে, যেগুলি গোপালের কাছে এতকাল নাটক নভেলের মতো প্রিয় ছিল। মন হয়তো বসে না গোপালের, তবু এই অভ্যস্ত কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া সে সময় কাটানোর চেষ্টা করে। শশী আশ্চর্য হইয়া যায়। এ সব তার কাছে একান্ত খাপছাড়া লাগে। অপ্রত্যাশিত যত কিছু ঘটিয়াছে শশীর জীবনে তার মধ্যে গোপালের চরিত্রের এই বেমানান দিকটা সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়।

শশীর সঙ্গে কথাবার্তা গোপালের খুব কমই হয়। দুজনের দুটি জগৎ যেন এতদিনে একেবারে পৃথক হইয়া গিয়াছে। একদিন আচমকা গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সেনদিদি কীসে মরল শশী?

হার্ট খারাপ ছিল।

গোড়ায় বুঝি ধরতে পারনি?

গোড়াতেই ধরেছিলাম।

তবে মরল যে?

এ প্রশ্নে শশী হঠাৎ রাগিয়া গেল। বলিল, গোড়ায় রোগ ধরতে পারলেও মানুষ মরে।

গোপাল বলিল, ইনজেকশন দুটো আগে দাওনি বলে হয়তো—

এটুকু বলিয়া উৎসুকভাবে গোপাল খানিকক্ষণ শশীর মন্তব্যের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কী সত্য সে নির্ণয় করিতে চায় কে জানে! শশী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তার চিকিৎসার আগাগোড়াই হয়তো গোপাল জানিয়া লইয়াছে। কী ভাবিয়াছে গোপাল? চিকিৎসক পুত্রের সম্বন্ধে কী অকথ্য ভাবনা তার মনে আসিয়াছে? মুখখানা লাল হইয়া যায় শশীর। কিছু বলিতে ভরসা পায় না।

কৃপানাথ বলছিল সময়মতো দু-একদানা মৃগনাভি দিলে—

শশী এবার নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল। রাগও হয়, মমতাও বোধ করে শশী। বিষয়ী, সংসারী, প্রৌঢ়বয়সি মানুষ, তার এ কী ছেলেমানুষি। কুন্দ জিজ্ঞাসা করে, মামার কী হয়েছে শশীদাদা? একটু স্নেহব্যাকুল সুরেই জিজ্ঞাসা করে। কুন্দর ছেলেটির বড়ো কঠিন অসুখ হইয়াছিল, অনেক চেষ্টায় শশী তাকে ভালো করিয়া তুলিয়াছে। পাকা দালানে একখানা ঘরও দেওয়া হইয়াছে কুন্দকে, আর দেওয়া হইয়াছে সংসার পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব। মুখরা কুন্দ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কত সামান্য কামনা থাকে এক একটি স্ত্রীলোকের, যার অভাবে স্বভাবটি হইয়া ওঠে হিংস্র, খিটখিটে! শশীরও আজকাল মনে হয়, না, কুন্দর প্রকৃতি তেমন মন্দ নয়, মোটামুটি ভালোই মেয়েটা। নিজের কাজের চাপে আজকাল আর বেশি নজর দিবার সময় পায় না, কুন্দ যে সিন্ধুকে বেশ যত্নটত্ন করে তাতে শশী আরও খুশি হয়। কুন্দর প্রশ্নের জবাবে সে বলে, আমি জানি না কুন্দ।

কুন্দ বলে, আপনি বিয়ে-টিয়ে করলেন না, কাল আমার কাছে বড়ো দুঃখ করছিলেন।

শশী বলে, বাবা দুঃখ করছিলেন না তুই বাবার কাছে দুঃখ করছিলি?

কুন্দ একটু হাসিয়া বলে, আমরা দুজনেই করছিলাম।

শশী অবাক হইয়া তাকায় কুন্দর দিকে। এমন খাপসই আলাপ কুন্দ শিখিল কোথায়? হঠাৎ শশীর মনে হয় কুন্দ যেন বড়ো সুখী, ওর জীবনটা যেন আনন্দে পরিপূর্ণ। একটু ভাবপ্রবণ কুন্দ,

একটু ঈর্ষাপ্রবণও বটে, শাড়ি-গহনার লোভটাও বেশ একটু প্রবল, স্বামী তার গোপালের মুহুরিদের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে, তবু কুন্দ এত সুখী যে শখ করিয়া দুটো-একটা কৃত্রিম দুঃখ বানাইয়া সে উপভোগ করে, তার অভাব-অভিযোগগুলিও তাই। কুন্দর অস্তিত্ব এতকাল শশীর কাছে ছিল জড়বস্তুর মতো নিরর্থক, আজ ওর অর্থহীন জীবনে এমন সুখের সমাবেশ দেখিয়া সে যেন খানিকটা ভড়কাইয়া গেল। কী যেন করিয়া দিয়া গিয়াছে শশীকে কুসুম। সামনে আসিলেই মানুষের চোখে মুখে ব্যাকুল চোখে কী যেন শশী খোঁজে। মুখে হাস্যচ্ছটা দেখিলে, চোখে আনন্দের ছাপ দেখিলে শশীর মন জুড়াইয়া যায়। সজল চোখে ক্লিষ্ট কাতর মুখে যে দাঁড়ায় শশীর সামনে তাকে শশীর মারিতে ইচ্ছা হয়। হঠাৎ কুন্দকে বড়ো ভালো লাগে শশীর। সস্নেহে বলে, তোর কী চাই বল তো কুন্দ? খুব ভালো একখানা কাপড় নিবি? বেনারসি?

কুন্দ অবাক। বলে, হঠাৎ কাপড় কেন দাদা?

শশী গম্ভীর মুখে বলে, দেব, তোকে একখানা কাপড় দেব। এমনি দেব কুন্দ, মিছিমিছি।

মিছিমিছি কুন্দকে শশী কাপড় কিনিয়া দেয়, এদিকে আবির্ভাব ঘটে গোপালের গুরুদেবের। ভোলা ব্রহ্মচারী নামে তার খ্যাতি। সুপুষ্ট লোমশ দেহ, মাথা গোঁফদাড়ি ভ্রূ সব কামানো, হাতে কুচকুচে কালো একটি দণ্ড, গায়ে গেরুয়া, পায়ে গেরুয়া রং করা রবার সোলের ক্যাম্বিস জুতো। বছর পাঁচেক একে গোপাল একরকম ভুলিয়াই ছিল, হঠাৎ এমন ব্যাকুলভাবে স্মরণ করিয়াছে যে ভগবানকে করিলে হয়তো তিনিও দেখা দিতেন। সসম্মানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল গোপাল, স্বহস্তে পা ধোয়াইয়া দিল। অন্দরের একখানা ঘর আগেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে ভোলা ব্রহ্মচারীকে থাকিতে দেওয়া হইল। ব্রহ্মচারীকে শশী ভক্তি করিত, এ সময় হঠাৎ তাহার আগমনে বিশেষ খুশি না হইলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা প্রণাম করিল।

ব্রহ্মচারী দিন সাতেক রহিয়া গেলেন। এই সাতদিন এক মুহূর্তের জন্য গোপাল তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। কত প্রশ্ন গোপালের, কত ব্যাকুল নিবেদন! গোপালের অবহেলায় বাজিতপুরের কোর্টে একটা মামলা ফাঁসিয়া গেল। তা যাক, মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে, ও সব মামলা মকদ্দমা বিষয়কর্ম তার কাছে এখন তুচ্ছ। শুধু সেনদিদির জন্য তো নয়, আজ কতকাল হইল গোপালের মনে ভাবনা ঢুকিয়াছে, কীসের জন্য এ সব! কার জন্য সে এতকষ্টে অর্থসম্পদ সংগ্রহ করিতেছে! একটা মেয়ে আছে সিন্ধু, দুদিন পরে ওর বিবাহ দিলে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, তখন কে থাকিবে গোপালের? শশী? শশীর কাছে কোনো আশা ভরসাই সে রাখে না। বাপকে যে ছেলে ঘৃণা করে, তার কাছে কী প্রত্যাশা থাকে বাপের? ধরিতে গেলে সেই তো মনটা ভাঙিয়া দিয়াছে গোপালের।

এ বড়ো আশ্চর্য কথা যে কুসুমের মতো গোপালের মনটাও শশীই ভাঙিয়া দিয়াছে! এ দুজনের মনের মতো হইতে না পারার অপরাধটা শশীর এতবড়ো! ভাঙা মনটা লইয়া কুসুম সরিয়া গিয়াছে। গোপাল আজও হাল ছাড়ে নাই। ব্রহ্মচারীর কাছে মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া সে তফাতে যায়, ব্রহ্মচারী ডাকেন শশীকে।

বাবা শশী, তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান, তোমাকে বলাই বাহুল্য যে খেয়ালের চেয়ে কর্তব্য অনেক বড়ো।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাপকে ভক্তিশ্রদ্ধা করার চেয়ে বড়ো কর্তব্য ছেলের আর কী আছে?

ঠিক এমনিভাবেই বলেন ব্রহ্মচারী, এমনই ভূমিকাবিহীন কঠোর ভাষায়। কথাটা তাই বড়ো জোরালো হয়। শশী আহত হইয়া বলে, বাপের প্রতি ওটাই ছেলের প্রথম কর্তব্য বইকী। ছেলের মনের ওটা স্বাভাবিক ধর্ম বাবা, যুক্তিতর্কে বোঝানোর জিনিস নয়। বাপের স্বভাব মন্দ হলে ছেলে

হয়তো বড়ো হয়ে তাকে সমালোচনা করে কিন্তু যেমন বাপই হোক ছেলের মনের অন্ধ ভক্তিটা কিছুতেই যাবার নয়।

কম নয় শশী, গুরুকে সে গুরুর মতো বোঝায়। সাত-আট বছর আগে ভোলা ব্রহ্মচারীর কাছে গোপাল তাহার দীক্ষা দিয়াছিল, ওঁ স্থানে নমো বলিয়া গুরুর মন্ত্র কিছুদিন শশী জপও করিয়াছে,—তারপর কত পরিবর্তনই হইয়াছে শশীর!

সংক্ষেপে পরিচ্ছন্নভাবে তারপর অনেক জ্ঞানগর্ভ কথাই ব্রহ্মচারী বলেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনিয়া শশীও জ্ঞানগর্ভ জবাব দেয়। মনে মনে সে টের পায় যে গুরুর চেয়ে জ্ঞানটা তার অনেক বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু এটা সে প্রকাশ পাইতে দেয় না। শশীকে ব্রহ্মচারীর বড়ো ভালো লাগে। ছেলেব সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ গোপাল করিয়াছিল সমস্ত ভুলিয়া গিয়া, অনেক কালের সঞ্চিত বাঁধাধরা উপদেশগুলি নেপথ্যে রাখিয়া, নানা বিষয়ে শশীর সঙ্গে আলাপ করেন। ক্রমে ক্রমে মনে হয় অনেকগুলি বছব আগে তাদের মধ্যে যে গুরুশিষ্যের সম্পর্কটি স্থাপিত হইয়াছিল, আজ তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। ধর্মেব কথা নয়, ইহকাল পরকাল পাপপুণ্য সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর নয়, এবার তাদেব মুখোমুখি বসিয়া শুধু গল্প করা, অসমবযসি দুটি বন্ধুব মতো। দুটি দিন এখানে বাস করিতে না করিতে শশীব কাছে একটা মুখোশ যেন ভোলা ব্রহ্মচারীর খসিয়া গেল, ভিতরেব আসল মানুষটির সঙ্গে শিষ্যেব তিনি পরিচয ঘটিতে দিলেন। আপনভোলা সদাশিব মানুষ, অনেকটা যাদবের মতো, ঘটনাচক্রে তিনি ব্রহ্মচারী, সাধ করিয়া নয় —তারপর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে জীবনের দু-একটি ঘটনা ও সম্ভাবনার কাহিনি শশীকে তিনি শোনান। প্রথম-যৌবনে প্রথম সন্ন্যাসী-জীবনেব কথা, ঘরে যা মেলে নাই তাবই অন্বেষণে দেশে দেশে যাযাবর বৃত্তি। অনিশ্চিতেব সন্ধানে বাহির হওযাব এমনই সব কাহিনি চিরদিন শশীকে ব্যাকুল করে। তারও অনেক দিনের বাহির হওযার সাধ।

গোপালের অনুরোধে শশীর মনটি ঘরের দিকে টানিবাব চেষ্টা করিতে গিযা তার ঘর ছাড়ার প্রবৃত্তিকেই ব্রহ্মচারী উসকাইযা দিয়া গেলেন।

দিন সাতেক গুরুসঙ্গ করিয়া গোপাল যেন একটু গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। নিজের সঙ্গে কিছু সে একটা রফা করিযা ফেলিয়া থাকিবে, কারণ দেখা গেল কর্তব্য সম্পাদন ও শশীর প্রতি ব্যবহাব তার সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে।

বলে, হাসপাতালে রোগীপত্র কেমন হচ্ছে শশী?

শশী বলে, বাড়ছে দু-একটি করে।

গোপাল আপশোশ করিয়া বলে, বেগার খেটেই তুমি মরলে। মাইনে হিসেবে কিছু কিছু নাও না কেন? পরিশ্রমের দাম তো আছে তোমার, একটা লোক রাখলে তাকে তো দিতে হত?

শশী বলে, হাসপাতালের টাকা কোথায় যে নেব বাবা? সামান্য টাকার হাসপাতাল, আমিও যদি নিজের পাওনা গন্ডা বুঝে নিতে থাকি, হাসপাতাল চলবে কীসে?

তা না নিক শশী মাহিনা বাবদে কিছু, এখন সেটা আর আসল কথা নয় গোপালের কাছে, ছেলের সঙ্গে একটু সে আলাপ করিল মাত্র। এমনই নারীসুলভ একধরনের ছলনাময় ব্যবহার গোপালের আছে, শশীকে মাঝে মাঝে যা আশ্চর্য ও অভিভূত করিয়া দেয়। ভোলা ব্রহ্মচারীকে শশী কথার কথা বলে নাই, গোপালের প্রতি একটা অন্ধ ভয়-মেশানো ভক্তি আজও তার মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে—হয়তো চিরদিনই থাকিবে। গোড়ার দিকে অনেকগুলি বছর ধরিয়া তার মনের সমস্ত গাঁথনি যে গাঁথিয়াছিল গোপাল, সেগুলি ভাঙিতে পারিবে কে?

কায়েতপাড়ার পথ দিয়া চলিবার সময় এক একদিন শশী যামিনী কবিরাজের বাড়িতে শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পায়। কচিগলার কান্না। খুবই যেন কচি মনে হয় গলাটা শশীর, বিপিনের কি এত ছোটো

শিশু আছে? অনেক দূর চলিয়া গিয়াও অনেকক্ষণ অবধি কান্নার সুরটি শশীর কানে বাজিতে থাকে। নিজের এই ভাবপ্রবণতা ভালো লাগে না। যে শিশু জন্মিয়াছে সে মাঝে মাঝে কাঁদিবে বইকী! তাতে এতখানি বিচলিত হওয়ার কী আছে? নিজের বাড়িতেও এমন কান্না সে কত শোনে।

সেনদিদি মারা যাওয়ার মাস তিনেক পরে একদিন অনেক বেলায় শশী বাড়ি ফিরিয়াছে, এমনই কান্নায় রত একটি শিশুকে বুকে করিয়া কুন্দ শশীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সেনদিদির ছেলে শশীদাদা।

রোদের তেজে অস্নাত অভুক্ত শশীর মুখখানা শুকনো দেখাইতেছিল, আরও একটু পাংশু হইয়া সে বলিল, কার ছেলে বললি কুন্দ, সেনদিদির?

কুন্দ বলিল, হ্যাঁ। পেট থেকে পড়েই তো মাকে খেয়েছে রাক্ষস, কিপানাথ কবরেজের শালির কচি ছেলে আছে, তার মাই খেত। সে আজ চলে গেল কিনা, মামা তাই আমাকে এনে দিলেন। খুকির সঙ্গে আমার দুধ খাবে। মার মতো শেষে আমাকেও না খায়!

একগাল হাসিল কুন্দ, সেনদিদির কাঁথা জড়ানো ছেলেকে শশীর সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল, ওকে মানুষ করার জন্য সোনার হার পাব শশীদাদা। মামার মন আজকাল বড়ো দরাজ হয়েছে।

ওকে আনলে কে?

মামাই আনল। এমনই কাঁথা জড়িয়ে বুকের কাছটিতে ধরে। বাড়ির ছেলেমেয়েদেব কাছে ঘেঁষতে দেন না, পরের ছেলে কোলে নেবার মামার রকম দেখে হেসে বাঁচি না। আমায় কী বললেন জানেন?---ছেলেটা নিলাম রে কুন্দ আমি, মানুষ করতে পারবি? তোকে দশভরির হার গড়িয়ে দেব। আমি বললাম, দিন না মামা, আমাব ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হবে, এতে আর হাঙ্গামা কী?

শশী ঝাঁঝিয়া বলিল, কেন তুই এ ভার নিতে গেলি? এত গয়নাব লোভ তোব।

কুন্দ অবাক হইয়া বলিল, গয়নার লোভে বুঝি? অতটুকু মা মরা শিশু, কেউ না দুধ দিলে ও বাঁচবে কেন? ওর মামিটামি কারও কচি ছেলে নেই। সে কথা যদি বাদ দেন, মামা বললে আমি তো পারব না বলতে পারি না।

সন্দিগ্ধভাবে তাকায় কুন্দ, খানিক বোঝে খানিক বোঝে না। এতক্ষণ পরে শশী হঠাৎ জামা কাপড় ছাড়িতে আবম্ভ করিল। কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এত রাগলেন কেন শশীদাদা?

না, রাগিনি।

সেনদিদির ছেলে কান্না থামাইয়াছিল। কুন্দ তাকে একটা চুমো খাইল,---সস্নেহে, গৌরবের সঙ্গে। কে জানে কী দুষ্টামি আছে কুন্দর মনে! তারপর ছেলেকে আর একবার শশীর দিকে বাড়াইয়া দিযা বলিল, কী সুন্দর হয়েছে ছেলেটা দেখুন শশীদাদা, সেনদিদির মতো দেখতে হবে। মুখখানা দেখলে মায়া হয়, না?

শশী শ্রান্তভাবে বলিল, তুই যা তো কুন্দ। ঘেমে-চেমে হয়রান হয়ে এলাম, একটু বিশ্রাম করতে দে।

কার উপরে রাগ করিবে শশী, কাকে কী বলিবে? সেনদিদির ছেলে যে সুন্দর হইয়াছে তাতে সন্দেহ নাই, আশ্চর্যরকম সুন্দর হইয়াছে; সেনদিদির যে জমজমাট রূপ বসন্ত হরণ করিয়াছিল ছেলের মধ্যে যেন তার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে সুদ সমেত। এতটুকু ছেলে, কাঁচা সোনার মতো কী তার রং! ওর মুখ দেখিয়া গোপালের যদি মায়া হইয়া থাকে, মায়া করিয়া গোপাল যদি এই অনাথ শিশুকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া থাকে, তাতে কার কী বলিবার আছে? এ তো মহত্ত্ব, প্রশংসনীয় কাজ। ক্ষোভে দুঃখে এ জন্য এমন কাতর হওয়া তো শশীর উচিত নয়।

সেনদিদির ফুলের মতো শিশুকে দেখিয়া একটু কি মায়া হইল না শশীর? মায়া করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কি তার এমন ভাবে নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে কুসুম? গম্ভীর বিষণ্নমুখে শশী স্নান করিতে গেল, সেনদিদির ছেলেকে কোলে করিয়া কুন্দ অদূরে আসিয়া বসায় ভালো করিয়া খাওয়া পর্যন্ত হইল না শশীর। অল্পে অল্পে শরীরটা তাহার কিছু ভালো হইয়াছে, কী ক্ষুধাই আজ পাইয়াছিল!

সমস্ত দুপুরটা শশী নিঝুম হইয়া রহিল। এবার কিছু করিতে হইবে তাহাকে, আর চুপ করিয়া থাকা নয়। আর গরমিল চলিবে না। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে নিস্তেজ শয্যাশায়ী শশীর মনে অসংখ্য এলোমেলো ভাবনা বিস্ময়করভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে, কোমল মমতাগুলি আলগা ফুলের মতো ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া যায়। আগুনের আঁচে সরস বস্তুর শুকাইয়া ওঠার মতো নিজে সে রুক্ষ কঠোর প্রকৃতির মানুষ হইয়া উঠিতেছে এমনই একটা অনুভূতি শশীর হয়। একেবারে বেপরোয়া, নির্মম, অবিবেচক! কুসুমের জন্য মন কেমন করিত শশীর? বড়ো আকুলভাবে মন কেমন করিত? এত বড়ো উপযুক্ত ছেলের মর্যাদায় ঘা দিয়া সে মনকে কী করিয়া দিয়াছে গোপাল যে সেই মন-কেমন-করাকে আজ হাস্যকর মনে হইতেছে? সে যে বাড়িতে বাস করে অম্লানবদনে সেনদিদির ছেলেকে সেখানে গোপাল কেমন করিয়া আনিল? সেনদিদিকে মরোমরো জানিয়াও শশী যে তার চিকিৎসা করিতে যাইতে চাহে নাই গোপাল কি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে? শশীর অভিমান এতই তুচ্ছ গোপালের কাছে, সে কী ভাবিবে না ভাবিবে সেটা এতখানি অবহেলার বিষয়! শশীর কাছে তার একটু সংকোচ করিবারও প্রয়োজন নাই? ছেলের সম্বন্ধে এমনই ধারণা গোপালের যে সে ভাবিয়া রাখিয়াছে সেনদিদির ছেলেকে বাড়িতে আনিয়া পুত্রস্নেহে মানুষ করিতে থাকিলেও শশী চুপ করিয়া থাকিবে, গ্রাহ্যও করিবে না? কে জানে, গোপালই হয়তো গ্রাহ্য করে না শশী চুপ করিয়া থাক অথবা গোলমাল করুক।

পরদিন সকালে হাসপাতাল কমিটির মেম্বারদের কাছে শশী জরুরি চিঠি পাঠাইয়া দিল। শীতলবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যার পর কমিটির জরুরি সভা বসিল। শশী পদত্যাগ-পত্র পেশ করিল, ডাক্তারের জন্য বিজ্ঞাপনের খসড়া দাখিল করিল, প্রস্তাব করিল যে হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্ব কমিটির সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট শীতলবাবুর হাতে চলিয়া যাক।

কমিটির হতভম্ব সভ্যেরা প্রশ্ন করিলেন, কেন শশী, কেন?

শশী বলিল, আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

এবার আর দ্বিধা নয়, গাফিলতি নয়। অনিবার্য গতিতে শশীর চলিয়া যাওয়ার আয়োজন অগ্রসর হইতে থাকে। হাসপাতাল সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি শীতলবাবুকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেয়, টাকা পয়সার সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করে, আর ভবিষ্যতের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশও লিখিয়া দেয়। ডাক্তারের জন্য কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তার জবাবে দরখাস্ত আসে অনেকগুলি। কমিটির সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাদের মধ্যে কয়েকজনকে শশী দেখা করিতে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দেয়।

সকলে খুঁতখুঁত করে, কেহ কেহ হায় হায় করিতেও ছাড়ে না। কোথায় যাইবে শশী, কেন যাইবে, সে চলিয়া গেলে কী উপায় হইবে গাঁয়ের লোকের? পাশ-করা ডাক্তারের দরকার হইলে আবার কি তাহাদের ছুটিতে হইবে বাজিতপুর? সকলে কৈফিয়ত চায় শশীর কাছে, তার সঙ্গে তর্ক জুড়িবার চেষ্টা করে। শশী না দেয় কৈফিয়ত, না করে তর্ক। মৃদু একটু হাসির দ্বারা অন্তরঙ্গতাকে গ্রহণ করিয়া প্রশ্নকে বাতিল করিয়া দেয়।

তবু খবরটা প্রচারিত হওয়ার পর হইতে চারিদিকে এমন একটা হইচই শুরু হইয়াছে যে মনে মনে শশী বিচলিত হইয়া থাকে। কেবল ডাক্তার বলিয়া স্বার্থের খাতিরে তো নয়, মানুষ হিসাবেও মনের মধ্যে সকলে তাহাকে একটু স্থান দিয়াছে বইকী। সাধারণের ব্যাপারগুলিতে সে উপস্থিত থাকিলে

সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়, তার উপরে নির্ভর রাখিয়া সকলে নিশ্চিন্ত থাকে। এ তো অকারণে হয় না, কতবড়ো সৌভাগ্য শশীর, না চাহিয়া জনতার এই প্রীতি পাইয়াছে। এ তো শুধু সৎকার্যের পুরস্কার নয়। কী এমন সৎকাজটা শশী করিয়াছে? রাস্তাঘাটের সংস্কারের জন্য কোদাল ধরে নাই, ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য ডোবা পুকুরে কেরোসিন ছড়ায় নাই, নাইট-স্কুল খোলে নাই, গ্রাম-সমিতি ছাত্রসংঘ প্রভৃতি গড়িয়া তোলে নাই,—কিছুই করে নাই। তবু হয়তো এখন আশেপাশে দশটা গ্রামে শশীর চেয়ে বেশি প্রভাব আর কাহারও নাই। শশীকে যদি সকলে ভালো না বাসিবে এমনটা তবে হইবে কেন?

শশী তাদের ভালোবাসে না, শশীকে যারা ভালোবাসিয়াছে? গ্রাম ও গ্রাম্যজীবনের প্রতি মাঝে মাঝে শশী গভীর বিতৃষ্ণা বোধ করিয়াছে, ধরিতে গেলে আজ কত বছর এখানে তার মন টিকিতেছে না, তবু ক্ষতের বেদনার মতো স্থায়ী একটা কষ্ট শশীর মধ্যে আসিয়াছে, গ্রাম ছাড়িবার কথা ভাবিলে কেমন করিয়া উঠে মনটা। এখানে জন্ম শশীর, এইখানে সে বড়ো হইয়াছে। এই গ্রামের সঙ্গে জড়ানো তার জীবন। কুসুম ছিল বিদেশিনি, যেদিন শখ জাগিল নির্বিকার চিত্তে বিদায় হইয়া গেল—শশী কেন তা পারিবে? রওনা হওয়ার সময় চোখের কোণে জল পর্যন্ত আসিবে শশীর। নিশ্চয় আসিবে।

কুন্দ কাঁদে।—কেন শশীদাদা, কেন চলে যাচ্ছেন আমাদের ছেড়ে?

সেনদিদির ছেলের ভার লওয়ায় কুন্দর কাজ বাড়িয়াছে, তবু সে শশীর সেবা বাড়াইয়া দেয়। শশী যতক্ষণ বাড়িতে থাকে কোনো না কোনো ছলে কুন্দ বারবার কাছে আসে, ছলছল চোখে শশীর দিকে তাকায়, কত কী বলিতে চায় কুন্দ, সব কথা বলিতে সাহস পায় না।

কি রে কুন্দ, কী হল তোর? শশী বলে।

কুন্দ বলে, আপনার জন সবাইকে ফেলে চলে যাওয়া কি ভালো শশীদাদা?

কেউ কি তা যায় না কুন্দ? সকলে কি দেশে গাঁয়ে বসে থাকে?

যারা যায় পেটের ধান্দায় যায়, আপনার যাবার দরকার!

কার স্নেহের অভাবে এমন হু হু করিতেছে শশীর মন যে কুন্দর এটুকু মমতায় তার মোহ জাগে? মনে হয় আরও একটু মায়া করুক কুন্দ, আরও একটু কাতর হোক।

কাতর হইয়াছে গোপাল। একেবারে যেন আধমরা হইয়া গিয়াছে মানুষটা। নিজের বাড়িতে চোরের মতো বাস করে, ভীত করুণ চোখে তফাত হইতে শশীর চালচলন লক্ষ করে, অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শশীর মতলবাদির সন্ধান নেয়। সামনাসামনি শশীর সঙ্গে কথা বলিবার সাহসও গোপাল পায় না! কে জানে কী বলিতে কী বলিয়া বসিবে তার দুরন্ত অবাধ্য ছেলে! কোথায় যাইতে চায় শশী, কী করিতে চায়, সঠিক খবর কেহ গোপালকে দিতে পারে না, তবে ব্যবস্থা দেখিয়া সকলে অনুমান করে যে দু-চার দশদিনের জন্য সহজ সাধারণ যাওয়া নয়, যাওয়াটা শশীর যাওয়ার মতোই হইবে।

তারপর একদিন শশীর চিঠির জবাবে হাসপাতালের চাকরির জন্য দরখাস্তকারীদের মধ্যে একজন গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। নাম তার অমূল্য, শশীর সঙ্গে একই বছর পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। নাম শশীর মনে ছিল না, এখন দেখা গেল শশীর সে চেনা। অমূল্যর সঙ্গে আলাপ করিয়া শশীর ভালো লাগিল, তাছাড়া এই সামান্য চাকরির দাবি লইয়া উপস্থিত হইলে বন্ধুকে কে ফিরাইতে পারে? লোক বাছিবার আর প্রয়োজন রহিল না, কয়েকদিন পরে পরে যাদের আসিবার জন্য তারিখ দেওয়া হইয়াছিল, তাদের বারণ করিয়া চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল।

নিজের বাড়িতেই অমূল্যকে একখানা ঘর শশী ছাড়িয়া দিল। বলিল, যে কদিন আছি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে অমূল্য, রোগীদের চিনে সব বুঝেশুনে নেবে—এবার থেকে সমস্ত ভার

তোমার। গাঁয়ের যারা তোমায় ডাকবে তাদের অধিকাংশ বড়ো গরিব, ফি-টা তাচ্ছিল্য করতে শিখো। যার যা ক্ষমতা নিজে থেকেই দেবে, গাঁয়ের লোক ডাক্তার কবরেজকে ঠকাতে সাহস পায় না।

সঙ্গে করিয়া অমূল্যকে সে হাসপাতালে লইয়া গেল, নিজের চেয়ারের পাশে তার জন্য চেয়ার পাতিয়া দিল। একটু মোটা-সোটা মানুষ অমূল্য, ধীর শান্ত প্রকৃতি, কিন্তু উৎসাহের অভাব নাই। নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে সে শশীর কাজ লক্ষ করিয়া দেখিল, হাসপাতালের জিনিসপত্র বাড়িঘর দেখিয়া বেড়াইল, নিয়ম কানুনের বিষয়ে প্রশ্ন করিল। মনে হইল, এখন হইতেই সে যেন গভীর দায়িত্ব বোধ করিতেছে। শশী চলিয়া যাইবে আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না এ কথা শুনিবার পর এখানকার সমগ্র নূতনত্বের অন্ধকারে তার নিজের আলোটি জ্বালিবার অধিকার যেন তার জন্মিয়াছে। একটু সমালোচনাও অমূল্য করিল। এই নিয়মটা এমন হইলে ভালো হইত না শশী, এই ব্যবস্থার বদলে এই ব্যবস্থা? এ সব সুলক্ষণ, কাজকর্ম অমূল্য যে ভালোই করিবে তারই প্রমাণ, তবু মনে মনে শশীর অকারণে ক্ষোভ জাগিতে লাগিল। তার একটা রাজ্য যেন কে বেদখল করিতে আসিয়াছে—কত যত্নে কত পরিশ্রমে শশী যে গড়িয়া তুলিয়াছে তার এই হাসপাতাল, লোকে যে এটা শশী ডাক্তারের হাসপাতাল বলিয়া জানে! ফোঁড়া কাটা কখানা ছুরি আছে হাসপাতালে তাও শশীর গোনাগাঁথা। গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে জানিয়াও ধীরে ধীরে হাসপাতালটিকে বড়ো করিয়া তুলিবার কল্পনা সে তো কম করে নাই। দুদিন পরে এখানে কর্তৃত্ব করিবে অমূল্য, হয়তো উন্নতি হইবে হয়তো অবনতি হইবে, কিছুই শশী দেখিতে আসিবে না।

যাওয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন হইয়াছিল শশীর যে সে যেন ভুলিয়া গিয়াছিল কেহ তাহাকে যাইতে বলে নাই, নিজে সে সাধ করিয়া যাইতেছে, এখনও যাওয়া বন্ধ করিলে কেহ তাহাকে কিছু বলিতে আসিবে না। না গেলে তার যেন চলিবে না, যাইতে সে যেন বাধ্য। কে যেন গাঁ হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছে, থাকিবার তার উপায় নাই।

যাইতে ক্ষোভই বা কীসের শশীর? কতকাল ধরিয়া কতভাবে সে যে তার যাওয়ার কামনাকে পুষ্ট করিয়াছে! যাওয়ার আয়োজন শুরু করিবার সময় দ্বিধা না করিবার গাফিলতি না করিবার প্রতিজ্ঞাই বা কোথায় গেল শশীর? অমূল্যের মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধিকে দেখিয়াই মনটা এমন বিগড়াইয়া গেল? জীবনের বিপুল ব্যাপক বিস্তারের স্বপ্ন দেখিয়া যার দিন কাটিত এই তুচ্ছ গাওদিয়া গ্রামে এই ক্ষুদ্র হাসপাতালের মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাওয়ার কথা তো তার নয়!

অমূল্যকে দেখিয়া এবং সে কেন আসিয়াছে শুনিয়া গোপাল আরও ভড়কাইয়া গেল। আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। রাত্রে শশী খাইতে বসিলে কোথা হইতে আসিয়া নীরবে একখানা আসন আনিয়া নিজেই পাতিয়া গোপাল তার পাশে বসিল। পিসি ছুটিয়া জলের গ্লাস দিয়া অদূরে বসিতে যাইতেছিল, গোপাল বলিল, যা তুই ক্ষান্ত, পাকঘরে বসবি যা।

পিসি চলিয়া গেলে গোপাল বলিল, তুমি কোথায় যাবে, শশী?

শশী বলিল, প্রথমে আপাতত কলকাতা যাব।

গোপাল বলিল, তারপর পশ্চিম-টশ্চিম একটু ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরবে বুঝি? মাসখানেক লাগবে তোমার, না?

কলকাতা থেকে বিলেত যাব।

বিলেত? মুখে একগ্রাস ভাত তুলিয়াছিল গোপাল, সেটা গিলিতে গিয়া দম যেন আটকাইয়া আসিল।—বিলেত কেন?

শিখে-টিখে আসব।—শশী বলিল।

গোপাল ব্যাকুলভাবে বলিল, তাতে তো অনেক দিন লাগবে শশী—দু-তিন বছরের কম নয়! এতকাল আমি একা পড়ে থাকব গাঁয়ে?

শশী আশ্চর্য হইয়া বলিল, একা পড়ে থাকবেন?

না, একা নয়, ঘরভরা আত্মীয়-পরিজন থাকিবে গোপালের, গ্রামভরা থাকিবে শত্রু-মিত্র। তবু শশী না থাকিলে কী একাই যে সে হইয়া যাইবে এত বড়ো ছেলেকে কেমন করিয়া গোপাল আজ তা বোঝায়! এ জগতে আর কে আছে একা গোপালের অন্তর জুড়িয়া? হৃদয় তাহার কী রীতি পালন করিয়াছে গোপাল তা জানে না, এ জগতে একটা মানুষকে সে স্নেহ করিতে পারে নাই, নিজের মেয়ে কটাকে পর্যন্ত নয়, শুধু শশীর জন্য একা শশীর জন্য, উন্মাদ বাৎসল্য আজও বুক জুড়িয়া আছে। গাম্ভীর্য, ধীরতা সব খসিয়া যায় গোপালের, জড়ানো ভারী গলায় সে বলে, কেন যাবি বাবা? আমার ওপর রাগ করে? তোর তো আমি কিছুই করিনি!

শশী মৃদুস্বরে বলিল, জীবনের উন্নতি করতে যাব, এতে রাগের কী আছে?

একটু ভাবিয়া গোপাল বলিল, তিন-চার বছর পরে ফিরে এসে হয়তো আমায় আর দেখতেই পাবি না শশী।

তিন-চার বছর পরেও সে যে ফিরিয়া আসিবে না সে বিষয়ে শশী কিছু বলিল না। নীরবে ভাত মাখিতে লাগিল।

গোপাল আবার বলিল, বুড়ো হলাম, হঠাৎ একদিন যদি মরে যাই, তুইও কাছে না থাকিস, কে এ সব দেখবে শশী? সারাজীবন খেটেখুটে যা কিছু করেছি সব যে ছারেখারে যাবে।

শশী বলিল, আপনার যাকে খুশি সব দিয়ে দেবেন।

এ তো ছেলেমানুষি কথা হল শশী, রাগের কথা হল! বলিয়া গোপাল উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মিথ্যা আশা। প্রতিবাদ করিয়া কিছুই তো শশী বলিল না। ভিতরে ভিতরে একটা জ্বালা বোধ করিতেছিল গোপাল, কী অদ্ভুত বিকারগ্রস্ত সে সন্তান যার মনের নাগাল মেলে না? কী হইয়াছে বলুক না শশী, জানাক না ঠিক কী সে চায়। অনেক অধিকার ত্যাগ করিয়া ছেলের ইচ্ছায় গোপাল আজ সায় দিবে। নিজের অনিচ্ছার দিকে একেবারেই তাকাইবে না। উপযুক্ত হইয়া অবাধ্য হইয়াছে ছেলে, কী আর করিবে গোপাল, নীরবে সবই তাহাকে সহিতে হইবে। এই ধরনের কথা কিছু শশীকে সে বলে। তার কথায় এক প্রকার অদ্ভুত মিনতি ধ্বনিত হইতে থাকে। কী উগ্র ক্রোধ আর নিদারুণ ভয় আর গভীর দুঃখ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া গোপাল কথা বলিতেছে বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বড়ো বিপন্ন বোধ করে শশী, তবু ধরা-ছোঁয়া সে দেয় না। পিতাপুত্রে কী আলোচনা আজ শুরু হইয়াছে বুঝিতে কাহারও বাকি থাকে নাই, ঘরে ঘরে দরজার জানালার আড়ালে জড়ো হইয়া সকলে ওৎ পাতিয়া আছে, চড়া গলায় এদের কথা শুরু হইলে প্রাণ ভরিয়া শুনিবে। বাড়ির একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ আবহাওয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। কখন ঝড় উঠিবে ঠিক নাই।

ঝড় উঠিল সম্পূর্ণ অন্যদিক দিয়া। হঠাৎ সেনদিদির ছেলেকে কোলে করিয়া কোথা হইতে কুন্দ আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, খেয়ে উঠে একে একবার দেখবেন তো শশীদাদা, গাটা বড়ো গরম বোধ হচ্ছে।

শশী মুখ তুলিল না, কথা বলিল না। গোপাল বাঁ হাত বাড়াইয়া উদ্‌বিগ্ন কণ্ঠে বলিল, জ্বর হয়েছে নাকি? দেখি।—দ্যাখ তো শশী একবার গায়ে হাত দিয়ে? জ্বরই মনে হচ্ছে যেন।

শশী নিঃশব্দে ভাত ফেলিয়া চলিয়া গেল।

জ্বর হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য অতটুকু শিশুর গায়ে একবার হাত দিবার অনুরোধ। তার জবাবে অমন করিয়া উঠিয়া গেলে সে কাজের মানে গোপালের মাথাতেও ঢোকে বইকী। কুন্দর বিস্মিত দৃষ্টিপাতে লজ্জায় গোপালের গায়ে আজ কাঁটা দিয়া ওঠে। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম।

তারপর ভয়ানক ভাবে সে আত্মসংবরণ করে। অভ্যস্ত গলায় হুংকার দিয়া কুন্দকে বলে, দূর হ, সামনে থেকে দূর হ হারামজাদি।

বিনা দোষে এমন গর্জন কুন্দ সহিতে পারে না, প্রথমে সে বিহ্বল হইয়া গেল, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল নিজের ঘরে। দেখিতে দেখিতে বাড়ির কৌতূহলী মেয়েরা সেখানে গিয়া হাজির। কিছুদিন হইতে এ বাড়িব কাণ্ডকারখানায় সকলে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া যাইতেছে। সাহসী কুন্দই সম্প্রতি কর্তাদের একটু নেকনজরে পড়িয়াছিল, আজ তার দুর্দশায় সকলে অল্প-বিস্তর খুশি ও আশ্চর্য হইয়া গেল।

কেন রে কুন্দ, বকলো কেন রে তোকে?

কুন্দ কি সহজে সে কথা ফাঁস করে? ফোঁস ফোঁস করিয়া সকলকে সে চলিয়া যাইতে বলে, কেন বিরক্ত কবছ আমায়? অনেক তোযামোদে একটু ঠান্ডা হয় কুন্দ, তারপর গোপালের রাগের কারণটা ব্যক্ত করে। বলে, আমার যেমন পোড়া কপাল! সেনদিদির ছেলেটাকে শশীদাদার সামনে নিয়ে যেতে কতবার মামা বারণ করেছে, তা কথাটা একদম ভুলেই গেলাম। সাদাসিধে মানুষ বাবু আমি, ও সব ঘোর-প্যাঁচের কথা কী ছাই আমার মনে থাকে!

সকলে বলে, হ্যাঁলো কুন্দ, ও ছেলেকে আনার পর থেকে তাই বুঝি শশী এমন রেগে আছে, বাপের সঙ্গে কথা কয় না, বিবাগি হয়ে বেরিয়ে যাবে বলে?

•স তো কী? কুন্দ বলে।

একটু হাসে কুন্দ। কে জানিত তলে তলে এমন বাঁকা মন আমাদের ঠোঁট কাটা কুন্দব। বলে, এই ছেলেটাকে নিয়ে বাপ-ব্যাটার কত কী চলেছে তোমরা কি জানবে! টের পাই আমি। কী হয় দেখবার জন্যেই তো দুজনে একত্তর খেতে বসেছে দেখে ছেলেটাকে নিয়ে গেলাম। অমন গাল খাব তা ভাবিনি ছোটোমামি। আর এখনই হয়েছে কী, একে নিয়ে কী ভীষণ কাণ্ড হয় দেখো, যেমন তেমন মাযেব ছেলে তো নয় এ।

তার ওপরে মাই খাচ্ছে তোর, না রে কুন্দ? ও ছেলে দেবেই তো ঘরে আগুন!

জ্বব বোধ হয় একটু হইয়াছিল ছেলেটার, গোলাপি বর্ণ তাহার আরও লালিম হইয়া উঠিয়াছে, তাকাইলে চোখ ফেরানো যায না এমন আশ্চর্য সুন্দর শিশু, তাকে কেন্দ্র করিয়া এ বাড়িতে এত বড়ো একটা ঝড় উঠিবাব উপক্রম হইয়াছে এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। কুন্দর চারিদিকে সমবেত মায়েরা দুর্ভাগা ছেলেটাকে ঈর্ষা করে, বাৎসল্যে ব্যাকুলও হয়। এর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস কবিতে চাহে না, কী কঠোর মনটা শশীর, স্নেহলেশশূন্য অন্তঃকরণ!

সেদিন বাত্রে বিনিদ্র গোপাল কী সব ভাবিল সেই জানে, পরদিন সকালে কুন্দকে সে চালান করিয়া দিল তার খুড়শ্বশুরের বাড়ি রাজাতলায়, সঙ্গে গেল তার স্বামীপুত্র এবং সেনদিদির ছেলে।

কাজটা করিয়া গোপাল যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। রাগের কারণ দূর হইল, আর তো শশীব রাগ থাকিবে না? সেনদিদির ছেলে পৃথিবীতে আসিয়াছে বলিয়া শশী রাগ করে নাই, তাকে বাড়িতে আনা হইয়াছে বলিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এ অন্যায় আবদার শশীর, অসংগত ব্যবহার, তবু মাথা নিচু করিয়া গোপাল যখন তাহার অভিযোগের প্রতিকার করিল, বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে কি আর শশী পারিবে!

পরের মুখে খবরটা ঠিকমতো শশীর কানে পৌঁছিবে না আশঙ্কা করিয়া চোখ কান বুজিয়া নিজেই গোপাল তাহাকে শোনাইয়া দিল। বলিল, কুন্দকে আজ শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলাম শশী।

শশী বলিল, রাজাতলায়?

গোপাল বলিল, হ্যাঁ। যামিনীর ছেলেটাকেও ওর সঙ্গে দিয়ে দিলাম।

যামিনীর ছেলের প্রসঙ্গ উঠিলে শশী মুখ খোলে না। গোপাল আবার বলিল, কুন্দ এখন ওখানেই থাকবে। বলে দিয়েছি এখানে আসবার ওদের কোনো দরকার নেই।

শশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াই কাজটা সে যেন হাসিল করিয়াছে এমনিভাবে গলা নামাইয়া গোপাল আবার বলিল, আসল কথা কী জানিস বাবা, এক ঢিলে দুটো পাখি মেরেছি। কুন্দকেও সরালাম, পরের ছেলে ঘাড়ে করার দায় থেকেও রেহাই পেলাম। যা খুশি করুক গিয়ে এবার, আমি কিছু জানি না—কেঁদেকেটে চিঠি লেখে দু-চার টাকা পাঠিয়ে দেব, বাস, ফুরিয়ে গেল সম্পর্ক।

তাই যদি ইচ্ছা ছিল গোপালের, বিপিনের কাছ হইতে সেনদিদির ছেলের ভার গ্রহণ করিবার তার কী প্রয়োজন ছিল শশী তা জানিতে চায় না তাই রক্ষা, জবাব গোপাল দিতে পারিত না। শশীকে গোপাল ছাড়িতে পারে না, সেনদিদির ছেলেকে ফেলিতে পারে না, অনেক ভাবিয়া চারিদিক রক্ষা করার জন্য পাকা রাজনীতিকের মতো সে যে চাল চালিয়াছে তার সমর্থনের জন্য এ রকম দুটো একটা বানানো পাকা কথা না বলিলে চলিবে কেন! ছেলের সঙ্গে তর্ক করিয়া অখণ্ড যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য তো এ সব বলা নয়, এ শুধু তাকে জানানো যে হার গোপাল মানিয়াছে, ওরে পাথরের পুত্র-দেবতা, এবার তুই তোর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছাড়।

সেনদিদির ছেলেকে সরাইয়া নেওয়ার জন্য শুধু নয়, তাকে ধরিয়া রাখার জন্য গোপালকে এমন উতলা হইয়া উঠিতে দেখিলে হয়তো শশী মত বদলাইয়া ফেলিত, আবার হয়তো বাতিল হইয়া যাইত তাহার গ্রামত্যাগের কল্পনা। এখন বড়ো দেরি হইয়া গিয়াছে, মন তো শশীর কখন চলিয়া গিয়াছে দূরতর দেশে নবতব জীবনযাপনে, এখন শুধু বোঁচকা ঘাড়ে সেখানে পৌঁছানো বাকি—তাও দু-চারদিনেব মধ্যেই ঘটিবে।

সারাদিন গোপালের নিশ্চিন্ত প্রফুল্লভাব শশীকে পীড়া দিল। সে বুঝিতে পারিল গোপাল ধরিযা লইয়াছে তাদের মধ্যে সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে, দিনগুলি অতঃপর যেমন সহজভাবে কাটিতেছিল তেমনিভাবে কাটিতে থাকিবে। এমন একটা জটিল ব্যাপারের এত সহজে এ রকম মনোমত পরিণতি ঘটিবে গোপালকে ইহা বিশ্বাস কবিতে দেখিয়া আশ্চর্যও শশী কম হইল না। তাব কাছে কী প্রত্যাশা করে গোপাল? এমন আকুল আগ্রহে কেন সে তাকে ধরিয়া রাখিতে চায়? মতের তাদের কখনও মিল হইবে না, প্রতিদিন খুঁটিনাটি বাধিবে, স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা ভক্তির পাহাড়কে চাপা দিয়া স্তূপাকার হইয়া উঠিবে অশান্তির হিমালয়! তবু শশীকে গ্রামে বসিয়া এই আত্ম-বিরোধময় সংকীর্ণ জীবনযাপন করিতে হইবে? এত বড়ো বিপুলা পৃথিবী পড়িয়া থাকিতে তাদের দুটি বিরোধী ব্যক্তিত্বকে অর্থহীন অব্যবহার্য স্নেহের মোহে আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে এই ক্ষুদ্র গৃহকোণ?

সেনদিদির ছেলেকে বাড়িতে আনার জন্য মনে মনে শশীর যত বড়ো আঘাতই লাগিয়া থাক, গৃহত্যাগের কারণ হিসাবে আজ তা বহুগুণে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে যে গভীর দুঃখ জাগিয়াছে শশীর মধ্যে, ও ধরনের মানসিক বিতৃষ্ণার অজুহাত তার কাছে খাটানো চলে না, আরও বড়ো লোভ, আরও বড়ো আকর্ষণ থাকা দরকার হয়। অথচ গোপালের পক্ষে তা ধারণা করাও অসম্ভব। শশী চলিয়া গেলে তার যাওয়ার ওই একটি কারণের কথাই গোপাল জানিয়া রাখিবে—সেনদিদির ছেলেকে বাড়িতে আনা।

শীতলবাবু ডাকিয়াছিলেন। অমূল্যের সঙ্গে সন্ধ্যার পর শশী তার বাড়ি গিয়াছিল। অমূল্যকে জলটল খাওয়াইয়া শীতলবাবু সকাল সকাল ছাড়িয়া দিলেন, শশীকে ছাড়িলেন রাত্রির আহারের পর, অনেক রাত্রে। শীতলবাবু আরেক বিপদ হইয়াছেন শশীর, দুবেলা ডাকেন আর গেলেই কথায় কথায় পাগল করিয়া তোলেন শশীকে। বাড়ি ফিরিয়া শশী দেখিল আহারের স্থানে পাশাপাশি দুখানা আসন পাতা আছে এবং যে গোপাল আটটায় খাইতে বসে সে আজ তার প্রতীক্ষায় এগারোটা পর্যন্ত না খাইয়া বসিয়া আছে।

এত দেরি করলে যে শশী? চট কবে মুখহাত ধুয়ে এসো, বসে পড়ি আমরা।

শশী বলিল, আপনি বসুন, আমি খেয়ে এসেছি। শীতলবাবু না খাইয়ে ছাড়লেন না।

গোপাল ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, আজ রান্নার একটু আয়োজন করতে বলেছিলাম বাবা, ভাবলাম পরের ছেলে একটি বাড়িতে এসে আছে, আজ বাদে কাল চলে যাবে, একদিন একটু আয়োজনপত্র করি খাওয়াব। তুমি খেয়ে আসবে বাইরে থেকে, তা তো জানতাম না।

শশী জিজ্ঞাসা করিল, পরের ছেলে কে?

গোপাল বলিল, অমূল্যবাবুর কথা বলছি। আহা, ডেকেডুকে এনে চলে যেতে বললে বড়ো লাগবে বেচারির মনে।

শশী বলিল, অমূল্য চলে যাবে কেন? ওকেই তো হাসপাতালের কাজ দেওয়া হয়েছে?

গোপাল সভয়ে বলিল, তুই থাকলে ও আবার কী করতে থাকবে শশী, অ্যাঁ?

আমি পরশু রওনা হব ভাবছি।—শশী বলিল।

পরশু? গোপালের মুখে আর কথা ফুটিল না। শশী ঘরে চলিয়া গেলে সে একেবারে বাহিরের দাওয়ায় গিয়া অন্ধকারে কাঠের বেঞ্চিটাতে বসিয়া রহিল। একজন মুনিষ দাওয়ায় শয়নের আয়োজন করিতেছিল, সে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া দিল গোপালকে, তারপর মনিবের সামনে শুইয়া পড়িতে না পারিয়া বিছানো চাটাইটির উপরে উবু হইয়া বসিয়া শ্রান্তিবশত জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। আজ আবার ব্রহ্মচারীকে মনে পড়িতেছে গোপালের, সেনদিদির মৃত্যুর পর মনে যে গভীর বিষাদ ও বৈরাগ্য আসিয়াছিল, ব্রহ্মচারীর মুখে নীরস আধ্যাত্মিক কাহিনি শুনিতে শুনিতে এক আশ্চর্য উপায়ে তার সেটা কাটিয়া গিয়াছিল। আজ বড়ো অবসন্ন মনে হইতেছে নিজেকে। বিচিত্র কাণ্ডকারখানা ভরা দীর্ঘ জীবনটা আজ অকারণ, অর্থহীন মনে হইতেছে—কোনো কাজেই লাগিল না। শশীর জন্মের দিনটি হইতে তারই পানে চোখ রাখিয়া কত কল্পনাই গোপাল করিয়াছে।—যার ডগাটি আকাশে ঠেকিয়া প্রায় হইয়াছে আকাশ-কুসুম! লেখাপড়া শিখিয়া এ কী রীতিনীতি শিখিয়াছে শশী? বাগান বাড়ি জমিজমা ধনসম্পদ আত্মীয়পরিজন এত সব যে গোপাল একত্র করিয়াছে, এ কি তার নিজের জন্য? তার আর কতদিন বাকি। এ সব তুচ্ছ করিয়া শশী যদি চলিয়া যায়, সমস্ত জীবনটাই গোপালের ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?

এত রাত্রে সে একবার অমূল্যের ঘরে যায়। অমূল্যকে জাগাইয়া বলে, একটা কথা শুধোই বাবু তোমাকে। শশী পরশু চলে যাবে আমায় যে বলনি?

রাতদুপুরে ঘুমন্ত মানুষকে তুলিয়া গোপালের এই কৈফিয়ত দাবি করা অমূল্যকে ভড়কাইয়া দেয়। সে বলে, আমি জানতাম না, কবে যাবে শশী আমায় কিছু বলেনি।

গোপাল অসন্তোষের সুরে বলে, আর সব বললে, এ কথাটা বললে না? কী যেন মতলব ছিল বাবু তোমার তাই গোপন করেছিলে।

অমূল্য জিভ কাটিয়া বলে, আজ্ঞে না, সে কী কথা?

গোপাল বলিল, সে কী কথা! আমার ছেলে দেশছাড়া হবে চিরকালের জন্যে আর তুমি তার জায়গায় জেঁকে বসবে, বড়ো ভালো মতলব তোমার! ওঠো দিকি বাবু সুখশয্যা ছেড়ে, জিনিসপত্র চুপিচুপি গুছিয়ে নাও! তারপর চলো আমরা বিদেয় হই!

ডাকাতের মতো দেখায় গোপালকে, খুনে দাঙ্গাবাজের মতো শোনায় তার কথাবার্তা। অমূল্যের ঘরে যে বিচিত্র, নাটকীয় কথোপকথন চলে, কিছুই শ্রান্ত শশীর চেতনায় পৌঁছায় না, জীবন সম্বন্ধে যে অমন তীব্রভাবে সচেতন সে হইয়া থাকে পুতুলের মতো চেতনাহীন। তাকেই বাৎসল্য করে বলিয়া মধ্যরাত্রে গোপাল আজ যে বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করে, যে সব অদ্ভুত কথা বলে, তা দেখিলে ও শুনিলে একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া যাইত শশীর। চাপা গলায় খানিকক্ষণ অমূল্যের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়া গরম মাথাটা বোধ হয় একটু ঠান্ডা হয় গোপালের, সে ঘরে যায়।

পরদিন খুব ভোরে শশীকে সে ডাকিয়া তুলিল। শশী উঠিয়া দেখিল মুনিষের মাথায় বাক্সো বিছানা চাপাইয়া কোথায় যাইবার জন্য গোপাল প্রস্তুত হইয়া আছে।

গোপাল সহজভাবেই বলিল, পরশু তোর যাওয়া হয় না শশী, আমি আজ বাবার কাছে কাশী যাচ্ছি—সাত আটদিন আশ্রমে থাকব। একজনের বাড়ি না থাকলে চলবে না। আমি ফিরে এলে যা হয় করিস।

শশী বলিল, হঠাৎ কাশী যাবেন কেন?

গোপাল পালটা জবাব দিয়া বলিল, হ্যাঁরে শশী, চিরকাল সংসারের হাঙ্গামা নিয়ে হয়রান হয়ে এলাম, এখন তোরা বড়ো হয়েছিস, মনটন ব্যাকুল হলে সাতটা দিনের ছুটিও পাব না? এতটুকু আশাও তোদের কাছে আমার করা চলবে না?

শশী মৃদুস্বরে বলিল, তা বলিনি, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ যাচ্ছেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। কালও তো কিছু বলেননি আমাকে?

গোপাল দারুণ অভিমান করিয়া বলিল, না যদি থাকতে পারিস তো বল, যাওয়া বন্ধ করি। অদেষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে।

শশী বলিল, বেশ তো আসুন গিয়ে—কদিন পরে গেলেও আমার কোনো অসুবিধা হবে না। গোপালকে শশী প্রণাম করিল। সকাল বেলার স্বচ্ছ আলোয় দুজনের মুখ দেখিয়া মনে হইল না পিতাপুত্রে কোনোদিন কোনো সামান্য বিষয়েও মতান্তর ছিল, জীবনের গতি দুজনের বিপরীতগামী।

সেই যে গেল গোপাল আর সে ফিরিল না। সংসারী গৃহস্থ মানুষ সে, সমস্ত জীবন ধরিয়া ফল পুষ্প শস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুক ভরা সোনা রুপা, কতকগুলি মানুষের সঙ্গে পারিবারিক ও আরও কতগুলি মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক, দায়িত্ব, বাধ্য-বাধকতা প্রভৃতি যত কিছু অর্জন করিয়াছিল সব সে দিয়া গেল শশীকে, মরিয়া গেলে যেমন সে দিত। কুন্দ কয়েকদিন পরে ফিরিয়া আসিল। রাজাতলা হইয়া গোপাল সেনদিদির ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। কুন্দ সোনার হার কিনিবে বলিয়া দুশো টাকাও তাহাকে দিয়া গিয়াছে হয়তো ওটাই ছিল গোপালের শেষ বাধ্যবাধকতা।

কী আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়। গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে একে একে যাওয়ার আয়োজনগুলি সে বাতিল করিয়া দিল। দুমাসের মাহিনা পকেটে পুরিয়া অমূল্য ফিরিয়া গেল, গাঁয়ে থাকিতে হইলে হাসপাতালে প্রত্যেক রোগীর নাড়ি টিপিতে না পারিলে শশীর চলিবে কেন? কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বে জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়।

মামলা করিতে শশী বাজিতপুরে যায়, ফিরিবার পথে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় খালের ধারে বজ্রাহত একটা বটগাছ শুকনো ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাওদিয়ার ঘাটে গোবর্ধন নৌকা ভিড়ায়। নন্দলালের পাট জমা করা শূন্য চালাটা প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া শশীর মনে হয় নন্দলালের পাপ জমা করা বিন্দুর দেহটাও হয়তো এতদিনে এমনিভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা বাড়িঘর ডোবা পুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যারা ছিল। শ্রীনাথের দোকানের সামনে, বাঁধানো বকুলতলায়, কায়েতপাড়ার পথে। যামিনী কবিরাজের বাহিরের ঘরে হামানদিস্তার ঠকঠক শব্দ শশী আজও শুনিতে পায়, এ বাড়ির মানুষের ফাঁক মানুষ পূর্ণ করিয়াছে। যাদবের বাড়িটা শুধু গ্রাস করিতেছে জঙ্গলে, পরানের বাড়িতেও এখনও লোক আসে নাই। তার ও পাশে তালবন। তালবনে শশী কখনও যায় না। মাটির টিলাটির উপরে উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।

গ্রন্থপরিচয়

মানিক রচনাসমগ্রের অন্তর্গত গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণে, মূল পাঠের ক্ষেত্রে, গল্প বা উপন্যাসের শিরোনামসহ, সর্বত্র বাংলা আকাদেমি সম্মত বানান অনুসৃত হয়েছে। কেবল গ্রন্থ-উপন্যাসের চরিত্রনামের ক্ষেত্রে আদি বানানের রূপান্তর ঘটানো হয়নি। গ্রন্থপরিচিতির ক্ষেত্রে গল্পসংকলন ও উপন্যাসগুলির বানান প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থানুযায়ী অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

জননী ·

'জননী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রথম উপন্যাস। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স, ২০৩/১/১ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ + ২৮৪, দাম দুটাকা। জননী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম উপন্যাস যা কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি, গ্রন্থাকারেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশের তারিখ সজনীকান্ত দাস-প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ৭ মার্চ ১৯৩৫ অর্থাৎ ২৩ ফাল্গুন, ১৩৪১ (দ্রষ্টব্য : পরিচয় পৌষ ১৩৬৩) অতসী মামী প্রকাশের পাঁচমাস পূর্বে। জননী উপন্যাসের রচনাকাল সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না, তবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির অভিলেখাগারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রদত্ত জননী-র পাণ্ডুলিপির প্রচ্ছদপৃষ্ঠার শেষ পাতায় '১৩৩৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের কেমিস্ট্রী ল্যাবরেটারিতে' কথাগুলি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে। উপন্যাস রচনার সঙ্গে এই শব্দগুলির কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা কঠিন। উক্ত অতসী মামী গ্রন্থে মানিকের আসন্নপ্রকাশ জননী-র একটি বিজ্ঞাপন ছিল :

> বাংলার জননী-জীবনের অপূর্ব মৌলিক কাহিনী। সকল জন্মভূমি মৃত্তিকা, সকল জননী মানবী। মাটির মানুষের কাছে এই জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়, জননী বড় দেবীর চেয়ে। শ্যামাকে মানিকবাবু দেবী করেন নাই, জননী করিয়াছেন। কেবল শ্যামা নয়, পুস্তকটির প্রত্যেকটি চরিত্র আপনার চারিপাশে বিচরণ করে, কথোপকথনগুলি আপনি নিত্য শুনিতে পারেন, ঘটনাগুলি আপনার চোখের সামনে সংঘটিত হয়। মৃদু রহস্যের সুরে লেখকের নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গিতে বর্ণিত এই কাহিনীতে মানুষগুলি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। জননীকে কেন্দ্র করিয়া এ ধরনের ক্রন্দন-বিহীন বাস্তব উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আর নাই

জননী-র পাণ্ডুলিপি-প্রচ্ছদে লেখকের হস্তাক্ষরে উপন্যাসটি সম্পর্কে এই পরিচিতি-জ্ঞাপক কথাগুলি লিখিত আছে :

> জননী দেবী নন—মানবী। ['ভাল ও মন্দ মহত্ত্ব ও হীনতা' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে]। সাধারণ গৃহস্থ সংসারের এক জননীর চিত্র আঁকিতে গিয়া তাকে দেবী করিতে চাহিয়া মিথ্যা করিয়া দিব কেন? সকল জন্মভূমি মৃত্তিকা—সকল জননী মানবী। ['তবু জন্মভূমির পূজা করিতে মাটির পূজা করি না' লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে]। মাটির মানুষের কাছে তাই জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে বড়, জননী বড় দেবীর চেয়ে [মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ১৬]

জননী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠাটি [মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ১৫] থেকে দেখা যাচ্ছে, গ্রন্থপ্রকাশের সময় সূচনাটি পুনর্লিখিত হয় এবং প্রকাশিত উপন্যাসের অনেকখানি অংশ নতুন করে লিখে পাণ্ডুলিপিতে লিখিত অংশের সঙ্গে তা যুক্ত করা হয়। পাণ্ডুলিপির সূচনাপৃষ্ঠাটি উদ্ধৃত হল :

প্রথম পরিচ্ছেদ

> শেষ মূর্চ্ছা ভাঙিবার সময় সে এক মহামুক্তির আস্বাদ পাইল। দেহে যেন উত্তাপ নাই, স্পন্দন নাই, জীবন নাই, সবগুলি ইন্দ্রিয় অবশ বিকল হইয়া গিয়াছে হাল্কা বায়ুর মত, পুঞ্জীভূত কুঁকড়ানো কুয়াশার মত সে পৃথিবীতে সংলগ্ন হইয়া আছে। তাহার সমগ্র অস্তুত অস্তিত্ব ব্যাপিয়া এক তরঙ্গায়িত স্তিমিত বেদনা,—মৃদু অথচ অসহ্য, দুর্জ্ঞেয় অথচ চেতনাময়। চোখ খুলিবার চেষ্টা করিয়া পারিল না। জগতে আলো নাই, শব্দ নাই, চারিদিকে শুধু মুহুর্মুহু পরিবর্তনশীল রঙিন যবনিকা পরলে পরলে খুলিয়া যাইতেছে। একবার মনে হইল সে বুঝি মরিয়া গিয়াছে।

দুর্বোধ্য ব্যথা দিয়া কাঁপানো এই শূন্যময় অবস্থাটি তাহার মৃত্যুরই পরবর্তী জীবন। এই যে তাহার ভোঁতা ক্লান্তিকর কষ্ট হইতেছে, ইহা অশরীরী আত্মার যাতনা। তারপর তার মনে হইল একটা শ্বাসরোধী গাঢ় তরলতায় সে ডুবিয়া গিয়াছিল, এখন মরণশিথিল ধীর গতিতে ভাসিয়া উঠিতেছে. একটা বিস্মৃত অতীতকে, যুগযুগান্তের পুরাতন একটা হারানো ইতিহাসকে সে স্মরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সবই যেন তাহার মনে থাকিবার কথা কিন্তু কিছুই মনে নাই। সে ভাবিতে পারিতেছে না। একান্তভাবেই বর্তমানের এই অপরিচিত শূন্যতায় মন তাহার নিশ্চল হইয়া [আছে]। সে বুঝিতে পারে তাহার পরিচিত পুরাতন চিন্তাজগৎটি চারিদিকে ছড়াইয়া আছে। কিন্তু মনকে সে কোনোদিকেই সন্ধান করিতে পাঠাইতে পারিতেছে না। আনন্দ বিষাদ কৌতূহল অনুসন্ধিৎসা কিছুই কি তাহার নাই? সময়ের গতি তাহার ঠাহর হইতেছে না। প্রতিটি পলকের অন্তর্ধানে একটা অব্যক্ত শঙ্কার সঙ্গে মনে হইতেছে দীর্ঘ, সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গেল। সে আবার চোখ মেলিবার চেষ্টা করিল। তাহার মুখ দিয়া একটা অস্ফুট শব্দ বাহির হইল। ডান হাতটি তুলিবার চেষ্টা করিল। অল্প একটু উঠিয়া হাতটি শিথিল হইয়া পড়িয়া গেল। কি করিয়া মনে তাহার একটি সম্পূর্ণ প্রশ্নের সৃষ্টি হইয়াছে। উচ্চারণ করিতে গিয়া কেবল তাঁহার ঠোঁট দুটি কাঁপিয়া উঠিল, শব্দ বাহির হইল না।

তারপর একসময় সে চোখ মেলিয়া চাহিল। প্রথমটা কিছু বুঝিতে পারিল না। চোখের সামনে একটা সাদা দেয়াল। তাহাতে একটি শায়িত মানুষের ছায়া পড়িয়াছে। ছায়ার উপরে জানালাটা অর্দ্ধেক ভেজানো, ফাঁক দিয়া খানিকটা আকাশ ও কতগুলি তারা দেখা যায়। একটা গরম ধোঁয়াটে গন্ধ নাকে আসিতেছে। কাছেই কাদের কথা বলিবার মৃদু শব্দ শোনা যায়।

হঠাৎ তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঝাঁকানি দিয়া বিদ্যুতের মতো একটা তীব্র বেদনা সঞ্চালিত হইয়া গেল। সে পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু মনেও পড়িয়া গিয়াছে তাহার সব কথাই। উগ্রতম বেদনার মধ্যেও একটি অসম্বরণীয় প্রশ্ন তাহার সমস্তটুকু চেতনাকে আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে।

'কই? কোথায় গেল?'

কে যেন বলিল 'এই যে শ্যামা, এই যে। মুখ ফিরিয়ে তাকা হতভাগী।'

যে কথা বলিল সেই তাহার একখানা হাত তুলিয়া একটি নরম স্পন্দনের উপর রাখিল। জাগিয়া থাকার যেটুকু শক্তি শ্যামার হইয়াছিল তাও যেন আবার ঝিমাইয়া আসিল। তাহার হাতের তালুর নীচে কতটুকু একটা বুক ধুক্‌ধুক করিতেছে! এই মৃদুতম স্পর্শ, এই ক্ষীণতম স্পন্দন, এ যেন তাহার ঘুম-পাড়ানো নেশা। শ্যামার দুটি চোখ মুদিয়া আসিল।..

মুদ্রিত উপন্যাসের সূচনাভাগে শ্যামার সাত বৎসরের বিবাহিত জীবনের বর্ণনাসূত্রেই শ্যামার বিলম্বিত জননীত্বলাভ ও সন্তান-প্রসবের প্রসঙ্গ এসেছে। লক্ষণীয় যে, প্রসূতি শ্যামার জ্ঞানলাভের পরবর্তী চেতনা-বিকাশের সূক্ষ্ম বিবরণ মুদ্রিত উপন্যাসে সংক্ষিপ্ততর হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মুদ্রিত উপন্যাসে পরিবর্তন, সংস্কার, পরিবর্ধনের উদাহরণ ব্যাপক-হারে সংঘটিত হয়েছে দেখা যায়। লেখক-জীবনের প্রথম পর্বের একাধিক রচনা সম্পর্কেই এই ঘটনা লক্ষ করা যায়। মুদ্রণকালে লেখক তাঁর রচনার উৎকর্ষসাধনে অত্যান্ত যত্নশীল ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

লেখকের ব্যবহৃত একটি বাঁধানো খাতায় প্রাপ্ত লেখকের স্বহস্তলিখিত নোট থেকে দেখা যায়, জেনারেল প্রিন্টার্স-এর কাছ থেকে পনেরো শতাংশ হারে জননী-র ২য় সংস্করণ বাবদ লেখক ১৮৭ টাকা আট আনা গ্রন্থস্বত্ব পেয়েছেন। তারিখ ১৯৪৫-এর ২৬ মে। জননীর পরবর্তী প্রকাশের কাল ১৯৫০ ডিসেম্বর, বসুমতী সাহিত্য মন্দির কলকাতা থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'মানিক গ্রন্থাবলী'র প্রথম খণ্ডে। ১৯৬২ (শ্রাবণ ১৩৬৯) খ্রিস্টাব্দে মিত্রালয় কলকাতা কর্তৃক জননী স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১৯৭৬ জুনে বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড থেকে পরবর্তী নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে গ্রন্থাকারে জননী প্রকাশ করেছেন অঙ্কুর পুস্তকালয়, প্রথম সংস্করণ ডিসেম্বর ১৯৯০, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ১৯৯৫, প্রচ্ছদশিল্পী পূর্ণেন্দু পত্রী।

'মানিক রচনাসমগ্র'-য় জননী-র প্রথম সংস্করণের পাঠ গৃহীত হয়েছে, মুদ্রণ প্রমাদগুলি সংশোধিত হয়েছে এবং স্থানে স্থানে পাঠনির্ধারণের প্রয়োজনে পরবর্তী ১৩৬৯ শ্রাবণে প্রকাশিত মিত্রালয় সংস্করণের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

অতসী মামী

'অতসী মামী' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ ও প্রথম গল্পসংগ্রহ। গ্রন্থটির প্রথম প্রকাশকাল আগস্ট ১৯৩৫, আষাঢ় ১৩৪২ ; প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স, পৃষ্ঠা ৬ + ২৬৭, মূল্য দু টাকা। প্রথম সংস্করণে প্রকাশকাল উল্লিখিত হয়নি, পরবর্তীকালে এটি নির্ণীত হয়েছে।

প্রথম সংস্করণের অন্তর্গত গল্পগুলির সংখ্যা দশ, নাম যথাক্রমে : অতসী মামী, নেকী, বৃহত্তর-মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়াকপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসঙ্গম, আত্মহত্যার অধিকার।

. অতসী মামী গল্প লিখে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ-সংক্রান্ত একটি উল্লেখযোগ্য বিবরণ লেখক স্বয়ং বিবৃত করেছেন 'গল্প লেখার গল্প' শীর্ষক একটি কথিকায় (বেতার ভাষণ, ১২ মে ১৯৪৫ অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো কলকাতা কেন্দ্রে প্রচারিত, পরে জ্যোতিপ্রকাশ বসু সম্পাদিত বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক ১৩৫৩-এ প্রকাশিত 'গল্প লেখার গল্প' গ্রন্থে ও নিউ এজ কর্তৃক ১৩৬৪-তে প্রকাশিত 'লেখকের কথা' গ্রন্থে সংকলিত)। প্রাসঙ্গিক বিবরণ উদ্ধৃত হল :

বাংলা তেরোশ' পঁয়ত্রিশ সাল। কলেজে পড়ছি বি.এস.সি। অনার্স নিয়েছি অঙ্কে। অঙ্কের মতো এমন আর কি আছে? এত জটিলতায় এমন চুল চেরা নিয়ম! রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা তো অভিনব কাব্য—ছ্যাবলামি, ন্যাকামি হালকা ভাবপ্রবণতার চিহ্নও নেই।..

ক্লাশে বসে মুগ্ধ হয়ে লেকচার শুনি, লেবরেটরীতে মশগুল হয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি নতুন এক রহস্যময় জগতের হাজার সংকেত মনের মধ্যে ঝিকমিকিয়ে যায়!

একদিন কলেজের কয়েকজন বন্ধু সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছে।.

আলোচনা গড়াতে গড়াতে এসে ঠেকলো মাসিকপত্রের সম্পাদকদের বুদ্ধিহীনতা, পক্ষপাতিত্ব, দলাদলি-প্রবণতা ও উদাসীনতায়।

নামকরা লেখক ছাড়া ওরা কারুর লেখা ছাপায় না। দলের লেখক হলে ছাপায়—ব্যস। অন্য কেউ পাত্তা পাবে না।.

তর্কে আমার চিরদিনের বিতৃষ্ণা। অবিবেচক ছেলেটার অন্যায় মন্তব্যে বড় রাগ হলো।

বললাম, 'কেন বাজে কথা বকছো? ভালো লেখা কি এত সস্তা যে, হাতে পেয়েও সম্পাদকেরা ফিরিয়ে দেবেন? মাসিকগুলি তো পড়, মাসে ক'টা ভালো গল্প বেরোয় দেখেছো? সম্পাদকেরা কি পাগল যে ভালো গল্প ফিরিয়ে দিয়ে বাজে গল্প ছাপবে? ভালো দূরে থাক, চলনসই একটা গল্প পেলে সম্পাদকেরা নিশ্চয় সাগ্রহে সেটা ছেপে দেয়।' খানিক তর্কের পর প্রশ্ন হলো 'তুমি কি করে জানলে, প্রবোধ?

প্রবোধ? প্রবোধ আবার কে? পুরানো দিনের কথা বলার কি বিপদ! এখানে আবার বলে নিতে হবে যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল, অফিসিয়াল নাম ছিল শ্রী প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—মানিক নামে তাকে ডাকতো শুধু বাড়ির লোক।

. অনেক কথা কাটাকাটির পর বাজি রাখা হলো।..

বাজি হলো এই। আমি একটি গল্প লিখে তিনমাসের মধ্যে ভারতবর্ষ, প্রবাসী বা বিচিত্রায় ছাপিয়ে দেব।

ভাবতে লাগলাম কি নিয়ে গল্প লিখবো! প্রেমের গল্প? হ্যাঁ, প্রেমের গল্পই লিখতে হবে। বাংলা মাসিকের প্রায় সবগল্পই একরকম প্রেম নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লেখা হয়। একটা ছেলে আর একটা মেয়ে, তাদের প্রেম হলো, বিয়েতে বাধা পড়লো, বাধা কেটে মিলন হলো, এইরকম গল্প একটা লিখবো ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে! মন সায় দিল না। মন বলল, প্রেমের গল্প লিখতে চাও লেখো, কিন্তু পচা দুর্গন্ধ ছ্যাবলামির গল্প লিখো না—বাংলার ছেলেমেয়েগুলো যে গোল্লায় গেল এরকম গল্প পড়ে পড়ে।..

তখন মনে পড়লো পূর্ববঙ্গের এক স্বামী-স্ত্রীর কথা। বাস্তব জীবনে নাটকীয় প্রেমের চরম অভিজ্ঞতা ওদের দেখেই আমি পেয়েছিলাম। স্বামী বাঁশি বাজাতেন। বাঁশের বাঁশি নয়, ক্ল্যারিওনেট। প্রায় পায়ে ধরে তাঁকে আসরে বাজাতে নিয়ে যেতে হতো—গিয়েও খুশি হলে বাজাতেন, নইলে বাজাতেন না। বাড়িতে বাজাতেন—শুধু স্ত্রীকে শ্রোতা রেখে। বছরখানেক আমি শুনেছিলাম। বেশিক্ষণ বাজালে তাঁর গলা দিয়ে রক্ত পড়তো।

এদের অবলম্বন করে এক ঘোরালো ট্র্যাজিক প্লট গড়ে তুলে গল্প লিখলাম। নাম দিলাম 'অতসীমামী'। ভাবলাম, এই উচ্ছ্বাসময় গল্প, এই নিছক পাঠকের মন ভুলানো গল্প, এতে নিজের নাম দেব না। পরে যখন

নিজের নামে ভালো লেখা লিখবো, তখন এই গল্পের কথা তুলে লোকে নিন্দে করবে। এই ভেবে বন্ধু ক'জনকে জানিয়ে, গল্পে নাম দিলাম ডাকনাম-মানিক। কল্পনাশক্তি একটা ভালো ছদ্মনামও খুঁজে পেলো না।

বাংলামাসের মাঝামাঝি। বিচিত্রা আপিসে গিয়ে গল্পটা দিয়ে এলাম। কার হাতে জানেন? বন্ধুবর অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের হাতে। তিনি তখন বিচিত্রায় ছিলেন। আমি অবশ্য তখন চিনতেও পারিনি—পরিচয় হয় পরে।

তারপর দিন গুণছি। বিশ্বাস ঠিক আছে, তবু ভাবছি কবে গল্পটা পিয়ন ফেরত দিয়ে যায়।

একদিন সকালে ভাবছি, কলেজ যাব কি যাব না। একজন ভদ্রলোক বাড়িতে এলেন।

তিনি বিচিত্রার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

আমি অবশ্য চিনতাম না। নিজেই পরিচয় দিলেন। এবং আমার 'অতসী মামী' গল্পের জন্য পারিশ্রমিক বাবদ নগদ টাকা হাতে তুলে দিয়ে দাবী জানালেন, আর একটি গল্প চাই।

তারপর সব ওলোটপালট হয়ে গেল। সব ছেড়ে দিয়ে আরম্ভ করলাম লেখা।

গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে বিভিন্ন গল্পের সাময়িকপত্রে প্রকাশ সংক্রান্ত কিছু তথ্য পাওয়া যায় :

অতসী মামী	বিচিত্রা	পৌষ ১৩৩৫
নেকী	বিচিত্রা	আষাঢ় ১৩৩৬
বৃহত্তর-মহত্তর	বিচিত্রা	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৩৬ [দুই কিস্তিতে]
মাটির সাকী	বঙ্গলক্ষ্মী	আষাঢ় ১৩৩৮
সর্পিল	ভারতবর্ষ	মাঘ ১৩৩৮
পোড়াকপালী	প্রবাসী	আশ্বিন ১৩৩৯
আগন্তুক	অমৃত (মাসিক)	কার্তিক ১৩৩৯
আত্মহত্যার অধিকার	ভারতবর্ষ	পৌষ ১৩৪০

সাময়িকপত্রে গল্পগুলির প্রকাশের পর গল্পসংগ্রহে অন্তর্ভুক্তিকালে লেখক কিছু কিছু পাঠসংস্কার ঘটিয়েছিলেন। সংস্কারকালে গল্পগুলির শিল্পোৎকর্ষ-সাধনই লেখকের অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয়

অতসী মামী

মামার কাছে যতীনবাবু এবং তার বাঁশী বাজানোর যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ অথবা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড় আর ডিসেন্ট লুকিং একটা বাড়ীতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।

বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৫

মামার কাছে যতীনবাবুর এবং তার বাঁশি বাজানোর যে রকম উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনেছিলাম তাতে মনে হয়েছিল লোকটা নিশ্চয় একজন কেষ্টবিষ্টু গোছের কেউ হবেন। আর কেষ্টবিষ্টু গোছের একজন লোক যে বৈকুণ্ঠ বা মথুরার রাজপ্রাসাদ না হোক, অন্তত বেশ বড়ো আর ভদ্রচেহারা একটা বাড়িতে বাস করেন এও তো স্বতঃসিদ্ধ কথা।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ১২৯

এই প্রকার সংশোধনী আরও কয়েকস্থানে দেখা যায়। যথা :

অসুবিধেটা কি হে, এ্যাঁ? পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে। বলে অতসী আমার স্ত্রী নয়।...

বিচিত্রা, পৌষ ১৩৩৫

যতীন মামা ইংরেজিতে বললেন, Tut! Tut! তারপর বাংলায় যোগ দিলেন, কী যে বল ভাগনে! অসুবিধেটা কী হে, অ্যাঁ? পাড়ার লোকে তো বয়কট করেছে অপবাদ দিয়ে, তুমি থাকলে তবু কিছু কথা কয়ে বাঁচব। আমি বললাম, পাড়ার লোকে কী অপবাদ দিয়েছে মামা?

অতসী মামির দিকে চেয়ে যতীন মামা হাসলেন, বলব নাকি ভাগনেকে কথাটা অতসী? পাড়ার লোকে কী বলে জানো ভাগনে? বলে অতসী আমার বিয়ে-করা বউ নয়।—চোখের পলকে হাসি মুছে রাগে যতীন মামা গরগর করতে লাগলেন, লক্ষ্মীছাড়া বজ্জাত লোক পাড়ার, ভাগনে! রীতিমতো দলিল আছে বিয়ের, কেউ কি তা দেখতে চাইবে? যত সব—

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ১৩১

এই ধরনের আরও কিছু-কিছু সংশোধন আছে। অতসী মামীর হঠাৎ একদিন টাইফয়েড জ্বর শুরু হওয়ার পর যতীন মামা বাঁশিটি বেচে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন এবং ভাগনেকে বলেন, 'তাব মানে ডাক্তাব বোসকে আর একটা কল দিতে হবে।' বিচিত্রা-য় ডাক্তার বোসের স্থানে ডাক্তার রায়ের উল্লেখ ছিল। গল্পে লেখকের পরবর্তী জীবনে ভাগ্যপরিবর্তনের প্রসঙ্গে আছে—

"যথাসময়ে ভাগ্য আমার ঘাড ধরে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবেব কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। নানা কারণে আমাদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ল।" [মা রচনাসমগ্র পৃ: ১৩৯]

বিচিত্রা য ছিল : "বি এ পাশ করে বার হতে না হতে ভাগ্য আমার ঘাড ধরে যৌবনের কল্পনার সুখস্বর্গ থেকে বাস্তবের কঠোর পৃথিবীতে নামিয়ে দিল। ব্যবসা ফেল পড়ল।—বাবা মনের দুঃখে ইহলোক ত্যাগ করলেন।"...

গল্পে আছে . "আমার ছোটো বোন বীণার বিয়ে হয়েছিল ঢাকায়।" [মা রচনাসমগ্র পৃ: ১৪০] বিচিত্রা-য় এর সঙ্গে অতিরিক্ত বাক্য ছিল : "বীণার স্বামী তারক সেখানে কলেজের প্রফেসার।"

আর একটি পরিবর্তনের কথা অবশ্যই উল্লেখ্য। পত্রিকায় প্রকাশকালে গল্পটি এক, দুই, তিন— তিনটি অধ্যায়ে বা পরিচ্ছেদে বিভক্ত ছিল। গল্পের "কেবলই মনে হয় নেশাকে মানুষ এত বড়ো দাম দেয় কেন . ." [মা বচনাসমগ্র পৃ: ১৩৫] প্রভৃতি অনুচ্ছেদ থেকে দ্বিতীয় এবং মানিক রচনাসমগ্র ১৩৯ পৃষ্ঠায় "মানুষের স্বভাবই এই যখন যে দুঃখটা পায় তখন সেই দুঃখটাকেই সকলেব বড়ো করে দেখে ..." প্রভৃতি অনুচ্ছেদ থেকে তৃতীয় অধ্যায় বা পবিচ্ছেদ শুরু করা হয়। বর্তমানে মুদ্রিত গল্পে এইরূপ সংখ্যা চিহ্নিত উপরিভাগ নেই।

অতসী মামী গল্পটি বিচিত্রা-য় প্রথম প্রকাশের পূর্বে উক্ত পত্রিকা দপ্তরে লেখক-কর্তৃক গল্পটি জমা দিতে আসার সময লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, কল্লোল যুগ গ্রন্থে তার বিবরণ আছে [দ্রষ্টব্য · কল্লোল যুগ, ১৩৬৬ সং পৃ: ১৯৯]। মানিক তাঁব লেখক-জীবনের উত্তবকালে অতসী মামী সম্পর্কে তাঁর 'উপন্যাসের ধারা' প্রবন্ধে লিখেছেন ·

> অতিজানা অতিচেনা মানুষকে করেছিলাম অতসী মামীব নায়ক-নাযিকা। সত্যই চমৎকাব বাঁশী বাজাতেন চেনা মানুষটি, বেশী বাজালে মাঝে মাঝে সত্যই তাঁব গলা দিয়ে রক্ত পড়ত এবং সত্যই তিনি ছিলেন আত্মভোলা খেযালী প্রকৃতিব মানুষ। ভদ্রলোকেব বাঁশী বাজানো সত্যই অপছন্দ কবতেন তাঁব স্ত্রী। মাঝে মাঝে কেঁদে কেটে অনর্থ কবতেন। এব নাযক-নাযিকা জীবন্ত মানুষ উদ্ভটভাবে হলেও কাহিনীতে প্রতিফলিত হয়েছে মাটিব পৃথিবীব দুটি মানুষেব বাস্তব প্রেম।

আগন্তুক গল্পের পত্রিকাধৃত পাঠ পাওয়া গেছে। দুই পাঠে কিছু উৎকর্ষবাচক শব্দসংস্কার ব্যতীত দুই-একটি ক্ষেত্রে ঈষৎ পাঠগত পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যথা :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
[পত্রিকার পাঠে অনুপস্থিত।]	মুকুল সায দিযা বলিল, হ্যাঁ। কেমন আছ বসন্ত? চলে যাচ্ছে এক বকম' বলিয়া বসন্ত একটু নিস্তেজ হাসি হাসিল। মনটা কী রকম কবিতে লাগিল মুকুলেব। হাসি গল্প আড্ডা দিয়া অর্ধেক জীবন যাব সঙ্গে মন খুলিয়া হইহই করিয়াছে, আজ তার সঙ্গে শুধু ভদ্রতার সম্পর্ক। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২০৬
তার খোকাকে দেখিবার আগ্রহ নাই দাদার! অমৃত কার্তিক, ১৩৩৯, পৃ ২২৬	বাড়িতে পা দেওয়া মাত্র সকলের আগে তাব খোকাকে দেখিবার আগ্রহ নাই দাদার! মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২০৭
এদ্দিন পরে বড ভাইটা এল, একটা প্রণাম ট্রণাম কর? পৃ ২২৬	এদ্দিন পবে বড়োভাইটা এল, একটা পেন্নাম কব? মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২০৭

শশীমুখীর সঙ্গে সে বরাবর এমনি মধুব ব্যবহার করিয়াছে, কদাচ কলহ করে নাই। যদিই কখন একটু কথা কাটাকাটি হইয়া থাকে শশীমুখী কি আর সে কথা দাদাব কানে তুলিবে? পৃ ২২৭	মুকুল শুনুক, বুঝুক যে শশীমুখীর সঙ্গে সে বরাবর এমনি মধুর ব্যবহার করিয়াছে, কদাচ কলহ করে নাই। যদিই বা কখনও একটু কথা কাটাকাটি হইয়া থাকে শশীমুখী কি আর সে কথা দাদাব কানে তুলিবে? মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২০৮
মাসীব তুলনাটা শোনো দাদা! পৃ ২২৭	মাসির তুলনাটা শোনো দাদা! মাসির মেয়ের চেয়ে খোকা যে দেড় বছবের ছোটো! মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২০৯
জল চাহিতে সরবৎ আসিল, দাদাকে সরবৎ করিয়া দিতে পারিয়াই পটলি কৃতার্থ। পৃ ২২৮	আজ না চাহিতে শববত আসিল, দাদাকে শরবত কবিযা দিতে পাবিয়াই পটলি কৃতার্থ। মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২১০
সকলেব আগে ও মুকুলেব স্নেহকে বেচিয়াছিল, অনেক ভণিতা কবিযা পত্র লিখিয়াছিল যে মুকুলদা, বড কষ্টে আছি, আমায় পঁচিশটা করে টাকা দেবে?	সকলেব আগে চাবু মুকুলের স্নেহকে বিক্রয কবিযাছিল, অনেক ভণিতা কবিযা পত্র লিখিযাছিল যে মুকুলদা, বড়ো কষ্টে আছি, আমায় পঁচিশটা কবে টাকা দেবে মাসে মাসে? মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২১০

বৃহত্তর-মহত্তর গল্পটি সম্পর্কে উল্লেখ্য যে, যে মমতাদি চবিত্রের সংসার-জীবন ত্যাগের পরবর্তী ঘটনা এখানে বিবৃত হয়েছে। সম্ভবত সেই মমতাদি চরিত্রের পূর্ববৃত্তান্তই সরীসৃপ গ্রন্থভুক্ত মমতাদি গল্পে পাওয়া যায়। তাছাড়া অতসী মামী সংকলনভুক্ত গল্পগুলির মধ্যে আত্মহত্যাব অধিকার গল্পটি প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৪০-এ বঙ্গশ্রী পত্রিকায়। অতসী মামী-র প্রকাশকাল আষাঢ় ১৩৪২। সরীসৃপ গ্রন্থভুক্ত গল্পগুলির মধ্যে সরীসৃপ গল্পটির প্রকাশ বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪০ হলেও, উক্ত গল্পটি প্রথম গল্পসংকলন অতসী মামীর অন্তর্ভুক্ত হয়নি, এই তথ্যটিও উল্লেখযোগ্য।

দিবারাত্রির কাব্য

'দিবারাত্রির কাব্য' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ ও দ্বিতীয় উপন্যাস। প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট, কলকাতা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬ + ২০৪। দাম এক টাকা বারো আনা। গ্রন্থের প্রকাশকাল, সজনীকান্ত দাস-কর্তৃক ডিসেম্বর ১৯৩৫ বলে জানা গেছে। বঙ্গশ্রী পত্রিকার ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'একটি দিন' শিরোনামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নাতিদীর্ঘ আখ্যানটি প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে ওই সংখ্যারই সম্পাদকীয়-তে 'এই সংখ্যার কয়েকটি লেখা ও লেখক-প্রসঙ্গ' শীর্ষক রচনার অষ্টম অনুচ্ছেদে জানানো হয়েছিল :

"উদীয়মান কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'একটি দিন' গল্পটি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হইলেও একটি বৃহৎ গল্পের প্রথম অংশ মাত্র। এই জন্য 'অভিশাপ' উপন্যাসটি চৈত্র সংখ্যায় শেষ হইলেও বৈশাখে স্বতন্ত্র উপন্যাস শুরু হইল না; 'একটি দিনে'র পরবর্তী গল্পগুলিই পর-পর উপন্যাস হিসাবে প্রকাশিত হইবে।"

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সজনীকান্ত দাস তাঁর আত্মস্মৃতি ২য় খণ্ডে বঙ্গশ্রী সম্পাদনা প্রসঙ্গ আলোচনাসূত্রে দিবারাত্রি কাব্য সম্পর্কে এরূপ তথ্য জ্ঞাপন করেছিলেন :

'দ্বিতীয় বৎসরে একটি বিচিত্র উপন্যাস হস্তে তাঁহার [মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়] শুভাগমন ঘটিল। এই উপন্যাসের ক্রমপরিণতির কাহিনিও বিচিত্র।... লেখাটির পরিণতি সম্বন্ধে তখনও অব্যবস্থিত মানিক 'একটি দিন' নামীয় একটি সম্পূর্ণ ছোটগল্পের আকারে উপন্যাসটি উপস্থিত করিলেন। পড়িয়াই বলিলাম, করিয়াছ কি? একটা উপন্যাসের সম্ভাবনাকে এমনভাবে হত্যা করিবে? বিচলিত মানিক বিদায় লইলেন, আমি 'একটি দিন' সম্পূর্ণ গল্পাকারেই ছাপিয়া দিলাম (বৈশাখ ১৩৪১)। অনতিবিলম্বে মানিক 'একটি দিন'-এর উপসংহার 'একটি সন্ধ্যা' লইয়া উপস্থিত হইলেন। 'একটি সন্ধ্যা'-তেই শেষ হইল না। দুই সংখ্যা পরে সন্ধ্যা 'রাত্রি'-তে গড়াইল এবং আরও দুই সংখ্যা পরে 'রাত্রি'—'দিবারাত্রির কাব্য' হইল। এই উপন্যাসের নাম-পরিবর্তনে মানিকের মনের গঠনের ছাপ আছে।'

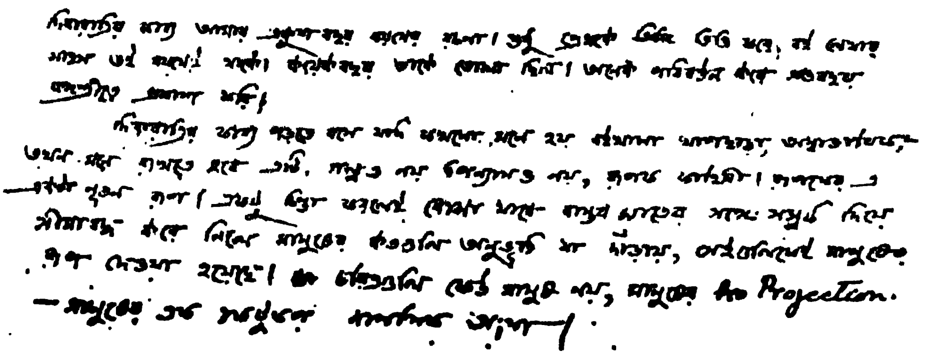
—যুগান্তর চক্রবর্তী, দিবারাত্রির কাব্য একটি উপন্যাসের জন্ম প্রবন্ধে উদ্ধৃত, এক্ষণ, ১২শ বর্ষ ১-২ সংখ্যা, পৃঃ ৪৫।

বঙ্গশ্রী পত্রিকার পরবর্তী জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'একটি সন্ধ্যা' নামে একই আখ্যানের দ্বিতীয় অংশটি প্রকাশকালে 'একটি সন্ধ্যা' শিরোনামের নিম্নে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'একটি দিন-এর পরবর্তী' কথাকটি উল্লিখিত। আষাঢ় সংখ্যায় পুনশ্চ 'একটি সন্ধ্যা' শিরোনামটি ব্যবহৃত, প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'পূর্বানুবৃত্তি' কথাটি ছিল।

বঙ্গশ্রী দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যায় (শ্রাবণ) 'রাত্রি' নামাঙ্কিত প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'পূর্বানুবৃত্তি' শব্দটিসহ একই আখ্যানের পরবর্তী অংশটি প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় (ভাদ্র) পুনশ্চ 'রাত্রি' নামাঙ্কিত প্রথম বন্ধনীর মধ্যে 'পূর্বানুবৃত্তি' শব্দটিসহ পরবর্তী আখ্যানাংশ প্রকাশিত হয়েছিল।

দিবারাত্রির কাব্য শিরোনাম তথা নামকরণটি প্রথম পাওয়া গেল আশ্বিন সংখ্যায়, যথারীতি প্রথম বন্ধনীতে 'পূর্বানুবৃত্তি' শব্দটিসহ। পর-পর কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের সংখ্যা তিনটিতেও দিবারাত্রির কাব্য শিরোনামটি 'পূর্বানুবৃত্তি' শব্দটিসহ ব্যবহৃত। পৌষ সংখ্যায় আখ্যানটি সম্পূর্ণ হয়, প্রকাশিত এই শেষ অংশটির শেষে 'সমাপ্ত' শব্দটির উল্লেখ ছিল।

ডি এম লাইব্রেরি প্রকাশিত গ্রন্থাকার সংস্করণের আখ্যাপত্রটিতে উপন্যাসটির নাম ছাপা হয়েছিল যেভাবে, তা লক্ষণীয়—প্রথম পঙ্ক্তিতে 'দিবারাত্রির কাব্য' ও কোলনচিহ্ন ব্যবহার করে দ্বিতীয় পঙ্ক্তিটিতে **'একটি বস্তুসঙ্কেতের কল্পনামূলক'** এবং তৃতীয় পঙ্ক্তিতে **'রূপক কাহিনী'** বেশ বড়ো হরফেই মুদ্রিত হয়েছিল। শিরোনামবিহীন ও তারিখহীন একটি ভূমিকা-ধরনের রচনায় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন :



দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের ভূমিকা রূপে লিখিত অংশের পাণ্ডুলিপি চিত্র

ডি এম লাইব্রেরি সংস্করণটির প্রকাশকালের একটি সম্ভাব্য ধারণা পাই প্রথম অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যটি থেকে—"অনেক পরিবর্তন করে গত বছর বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি"। 'গত বছর' বলতে ১৩৪১ বলা হয়েছে। 'বঙ্গশ্রী'তে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পৌষ সংখ্যা পর্যন্ত আখ্যানটি প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৪১ বঙ্গাব্দের পরের বছর অর্থাৎ ১৩৪২ বঙ্গাব্দকে দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসটির গ্রন্থাকারে প্রকাশকাল বলা যেতে পারে। সজনীকান্ত দাসও জানিয়েছেন গ্রন্থের প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৩৫।

ডি এম সংস্করণটি বঙ্গশ্রীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত আখ্যান থেকে বহুলাংশে পৃথক। যথা

বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসেব প্রথম পাঠ ও উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের পাঠ উভয়ের তুলনা করলে দেখা যায়, গ্রন্থ প্রকাশকালে লেখক একদিকে যেমন অজস্র ভাষা ও শব্দগত সংস্কার করেছেন, তেমনি নূতন অংশ যোজনা করেছেন, পত্রিকায় প্রকাশিত পাঠ বর্জনও করেছেন। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলিই এখানে গৃহীত হয়েছে, ছোটোখাটো শব্দসংস্কারগুলি এই ভূমিকায় দেখানো হয়নি।

দিবারাত্রির কাব্য [প্রথম ভাগ : দিনের কবিতা]

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
দোকানের মত ঘর সাজিয়েছিস কেন? সুপ্রিয়া অপ্রতিভ হযে গেল। বঙ্গশ্রী, বৈশাখ ১৩৪১, পৃ ৪৫৪	দোকানের মতো ঘর সাজিযেছিস কেন? [বাকি অংশ বর্জিত] মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৪৫
অনেকক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয়া বললে, 'আপনি মানুষ... [অস্পষ্ট] হেরম্ব বাবু। মানুষের মধ্যে অন্ততঃ ছিটেফোঁটা ভুলভ্রান্তি দুর্ব্বলতা থাকে। একদিন্ থাকবার জন্য এমন করে আপনার আসার দরকার কি ছিল? পাঁচ বছর খোঁজ নেননি , আর পাঁচ বছর নয় নিতেন না। পৃ ৪৫৫	অনেকক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয়া বলল, একদিন থাকবাব জন্য এমন করে আপনার আসার দবকাব কি ছিল? পাঁচ বছব খোঁজ নেননি, আরও পাঁচ বছর নয় না নিতেন। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৪৭
ডাবের জলে ডাবের শাঁসে জগতের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হয় চিরদিন এই থাকবে ওদের ধারণা ; জগতের ক্ষুধাও ওরা বুঝবে না, তৃষ্ণার প্রকৃতিও জানবে না এবং এই অজ্ঞানতার অন্ধকারের জন্য নিজেদের মনে করবে রহস্যময়ী, সৃষ্টির প্রহেলিকা। পৃ ৪৫৯	ডাবের জলে ডাবের শাঁসে জগতের ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর হয় চিরদিন এই থাকত ওদের ধারণা, জগতের ক্ষুধাও ওরা বুঝবে না, তৃষ্ণার প্রকৃতিও জানবে না। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৫১

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
বৃঢ়তার উত্তাপে বিনা বাক্যব্যয়ে গলতে আরম্ভ করে দিচ্ছে। পৃ ৪৬২	উত্তাপে বিনা বাক্যব্যয়ে গলতে আরম্ভ করে দিচ্ছে। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৫১
'বাঃ বেশ।' সুপ্রিয়া আর কথা খুঁজে পেল না। পৃ ৪৬২	আশ্চর্য মানুষ আপনি। সুপ্রিয়া আর কথা খুঁজে পেল না। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ১৫৫
আগাগোড়া স্ত্রীর মন জোগানোর এই স্ট্যাণ্ডার্ড বজায় রেখে অশোক দিন কাটায় পৃ ৪৬২	আগাগোড়া স্ত্রীর মন জোগানোর এই আদর্শ বজায় রেখে অশোক দিন কাটায় মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৫৫
অশোক অবাক হয়ে বললে, 'প্লেটের ওগুলি সবভাজা নাকি? আমি মনে করলাম ব্যাসন দিয়ে কুমড়ো ভেজেছিলে, বেশী হওয়ায় তুলে রেখেছ! তাই আর খেলাম না।' সুপ্রিয়া হেসে হেরম্বের দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনলেন?' পৃ ৪৬৩	[গ্রন্থে বর্জিত]
শরীর ভাল করার জন্য মদ খাও? পৃ ৪৬৩	শরীর ভালো করার জন্য ব্র্যাণ্ডি খাও। মা রচনাসমগ্র ১ পৃ ২৫৮
হেরম্ব রাজী হবে না। হেরে যাবার ভয় আছে। তবু সুপ্রিয়াকে পৃ ৪৬৪	হেরম্ব রাজি হবে না। তবু সুপ্রিয়াকে.. মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৫৮
সুপ্রিয়ার মুখ ম্লান। অশোক গম্ভীর। আকাশ ঢেকে মেঘ পৃ ৪৬৪	সুপ্রিয়ার মুখ ম্লান। আকাশ ঢেকে মেঘ মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৫৮
..ওর কথার কোন মানে নেই। খুনী পালাবে না? এই কথার পুনরাবৃত্তি ও খুনী পালাবে না? সুপ্রিয়া কোমরে দড়ি-বাঁধা, পায়ে শিকল-বাঁধা দাসী বটে, কিন্তু খুনী নয়। অশোককে সে কখনও খুন করবে না। হেরম্ব সেই থেকে করছে শুধু চালাকি। পৃ ৪৬৫	ওর কথার কোনো মানে নেই। [বাকি অংশ গ্রন্থে বর্জিত]
..তুমি তাকে বাড়াতে পার না, কমাতে পার না। স্ত্রীকে খুন করে.... ভাবে, এখনও ছেলেমানুষ,... আর একজনের প্রতি এই ভালবাসাকে,—ভালবাসাকে? বাজে কথা বলছি, এই মোহকে প্রবল স্থায়ী করে, দেওয়া মূর্খামি? পৃ ৪৬৫	..তুমি তাকে বাড়াতে পার না? স্ত্রীকে খুন করে...... ভাবে, এখনও ছেলেমানুষ,.... আর একজনের প্রতি এই ভালবাসাকে, এই মোহকে প্রবল আর স্থায়ী করে দেওয়া মূর্খামি? মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৫৯

দিবারাত্রির কাব্য [দ্বিতীয় ভাগ : রাতের কবিতা]

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
আনন্দের চোখে যে প্রশ্ন ছিল, তার জবাবটা তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪১, পৃ ৬৪৪	আনন্দের চোখে যে প্রশ্ন ছিল, হেরম্বের নির্বাক নিষ্ক্রিয় জবাবটা তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৬৬
মালতী হেরম্বের দিকে তাকাল, 'বাবার আদেশে একটু একটু খাই হেরম্ব।' পৃ ৬৪৫	মালতী হেরম্বের দিকে তাকাল, বাবার আদেশে একটু একটু খাই হেরম্ব। প্রথমে হয়েছিলাম বৈষ্ণব—ভক্তিমার্গ পোষাল না। এবার তাই জোরালো সাধনা ধরেছি। বাবা বলেন— মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৬৭
'আমার গুরুদেব। শ্রীমৎ স্বামী প্রবুদ্ধানন্দ।' পৃ ৬৪৫	আমার গুরুদেব। শ্রীমৎ স্বামী মশালবাবা। —নাম শোনোনি? দিবারাত্রি মশাল জ্বেলে সাধন করেন। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৬৭
'একজনকে বাড়িতে ডেকে এনে আসনে বসব! স্বার্থপর আর কাকে বলে? সন্ধ্যা হতেই বা আর দেরী কত?' অনাথ তার কথা কানে তুলল না। আনন্দকে বলল 'আমার আসন কে সরিয়েছে আনন্দ?' 'আমি জানিনে বাবা।' পৃ ৬৪৬	একজনকে বাড়িতে ডেকে এনে এমন নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারলে আসনে বসব? কে তোমার অতিথিকে আদর করবে শুনি? স্বার্থপর আর কাকে বলে। সন্ধ্যা হতেই বা আর দেরি কত, এ্যাঁ? অনাথ তার কথা কানে তুলল না। এবার আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, আমার আসন কে সরিয়েছে আনন্দ? আমি তো জানিনে বাবা? মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৬৮
মালতী বলে 'একটা বিষ পিঁপড়ে তাড়াতে তুমি ওর পায়ে হাত দিলে! প্রণাম কর আনন্দ।' এরকম ফল হবে জানলে হেরম্ব আনন্দের আঙ্গুল সভয়ে পরিহার করে যেত। অহিংস পিঁপড়েটির বদলে বিষাক্ত কাঠপিঁপড়ে উঠলেও চুপ করে থাকত। সে বলে 'থাক্, থাক্।' মালতী বলে 'থাক্ কি? তুমি বয়সে বড়, গুরুজন। ওর অকল্যাণ হবে না। প্রণাম কর আনন্দ।' আনন্দ অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়েছে। মাথাটা অল্প একটু নীচে নামিয়ে দুই করতল একত্র করে সে কপালে ঠেকায়। মালতী ওঠে রেগে। বলে 'ও আবার কি ঢং হল? প্রণাম করতে জানিসনে তুই, বয়সের তোর গাছ-পাথর নেই! পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কর আনন্দ। অত তোর বাহাদুরী কিসের?' আনন্দ গোঁ ধরে বলে 'ওই তো করলাম।' হেরম্ব বলে 'থাকনা মালতী বৌদি। ছেলেমানুষ লজ্জা পাচ্ছে।' তার আশঙ্কা হয় মেয়ের অবাধ্যতায় মালতী হয়ত রেগে আগুন হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে মালতীর দুঃখই উথলে উঠল। বঙ্গশ্রী, আষাঢ় ১৩৪১, পৃ ৭৫০	মালতী বলে, একটা বিষপিঁপড়ে তাড়াতে তুমি ওর পায়ে হাত দিলে। —আহা কী করিস আনন্দ, করিস নে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস নে। কুমারীর কাউকে প্রণাম করতে নেই জানিস নে তুই? আনন্দ হেরম্বকে প্রণাম করে বলল, তোমার ও সব অদ্ভুত তান্ত্রিক মত আমি মানি না মা। হেরম্বের আশঙ্কা হয় মেয়ের অবাধ্যতায় মালতী হয়তো রেগে আগুন হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে মালতীর দুঃখই উথলে উঠল। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৭৩

পত্রিকার পাঠ

অনাথ এবং মালতী এদের মধ্যে কাকে আশ্রয় করে আনন্দ বড় হয়েছে সঠিক না জানা অবধি স্বস্তি পাওয়া হেরম্বের পক্ষে অসম্ভব ছিল, এ জ্ঞান তার কাছে আজ এত বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। আনন্দের অন্তরে অন্ধকার, এর ক্ষীণতম সংশয়চিত্ত হেরম্বের সহ্য হচ্ছিল না। মালতীর আদেশেও তাকে প্রণাম করতে না চাওয়ার মধ্যে তার প্রতি আনন্দের যতটুকু অবজ্ঞা প্রকাশ পেল, হেরম্ব সেটুকু তাই খেয়াল করারও সময় পেল না। আনন্দ এখন তাকে যেচে অপমান করলেও তার বোধ হয় রাগ অথবা দুঃখ হত না। আনন্দের অকারণ ছেলেমানুষী ঔদ্ধত্যে তার দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে।

পৃ ৭৫০

এখানে যে রাত্রি আসছে তাকে মাটির পৃথিবী নিজের দেহ দিয়ে সৃষ্টি বিস্তার তার চেয়েও অনন্তগুণে বেশী। রাত্রির অন্ত নেই। ব্যাখ্যা শোন বৈজ্ঞানিক। মধ্যরাত্রিকে অবলম্বন করে কল্পনায় যতদূর খুশি চলে যাও, রাত্রির শেষ পাবে না। হয়ত এক সময় সূর্য্যকে তুমি দেখতে পাবে, পৃথিবীর পাশ কাটিয়ে সূর্য্য তোমার চোখে তারার মত ঝিকমিক করবে। কিন্তু পৃথিবীর এক পিঠে যে আলো ধরা পড়ে দিন হয়েছে অসীম শূন্যের শেষ পর্য্যন্ত তার অভাব কোথাও মেটেনি। রাত্রি, তাই যে শূন্যের শেষ নেই তার শেষে পৌঁছেছে। সেখানকার খবর তুমি রাখ না বৈজ্ঞানিক। সেখানে দিক নেই, ব্যাপ্তি নেই, সময় নেই, জড় নেই, শক্তি নেই। গোলাকার শূন্য আর মুখখোলা কাতকরা অঙ্কের চার তার পরিচয় নয়। সেখানে আছে দুটি ছাপ, মাটির পৃথিবীর কালো রাত্রির ছাপ, মাটির মানুষের শেষ কল্পনার ছাপ।

পৃ ৭৫১

'সব। শুধু বাবার কাছে জানিনি, মা আমাকে জল দিতে ডাকা পর্য্যন্ত ওই জানালায় দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে আপনার যত কথা হয়েছে সব শুনে ফেলেছি। আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন?'

আনন্দ চোখ তুলল। কিন্তু এখনো সে হেরম্বর দিকে তাকাতে পারছে না।

হেরম্ব বলল 'অনেক দিন। প্রায় দেড় বছর।'

পৃ ৭৫১

'আমি ভাবছিলাম এক বছরে পৃথিবীতে বুঝি কোটি কোটি লোক জন্মায়।' চকিত দৃষ্টি সরিয়ে বুকের কাছের কাপড়কে সে টেনে আলগা করে দিল। সমুদ্র থেকে জোর বাতাস

গ্রন্থধৃত পাঠ

অনাথ এবং মালতী এদের মধ্যে কাকে আশ্রয় করে আনন্দ বড়ো হয়েছে সঠিক না জানা অবধি স্বস্তি পাওয়া হেরম্বের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আনন্দের অন্তর অন্ধকার, এর ক্ষীণতম সংশয়চিত্ত হেরম্বের সহ্য হচ্ছিল না। মালতীর আদেশের বিরুদ্ধেও তাকে প্রণাম করার মধ্যে তার প্রতি আনন্দের যতটুকু শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল, হেরম্ব সেটুকু তাই খেয়াল করারও সময় পেল না। মালতীকে আনন্দ নকল করেনি শুধু এইটুকুই তার কাছে হয়ে রইল প্রধান! আনন্দের অকারণ ছেলেমানুষি ঔদ্ধত্যে তার দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৭৪

এখানে যে রাত্রি আসছে তাকে নিজের দেহ দিয়ে সৃষ্টি করছে মাটির পৃথিবী। পৃথিবী থেকে সূর্য যতদূর, মহাশূন্যে রাত্রির বিস্তার তার চেয়েও অনন্তগুণ বেশি। রাত্রির অন্ত নেই। মধ্যরাত্রিকে অবলম্বন করে কল্পনায় যতদূর খুশি চলে যাওয়া যাক, রাত্রির শেষ মিলবে না। পৃথিবীর এক পিঠে যে আলো ধরা পড়ে দিন হয়েছে, অসীম শূন্যের শেষ পর্যন্ত তার অভাব কোথাও মেটেনি।

মা রচনাসমগ্র ১, প ২৭৪

সব। শুধু বাবার কাছে জানিনি। মা জল দিতে ডাকা পর্যন্ত ওই জানালায় দাঁড়িয়ে মা-র সঙ্গে আপনার যত কথা হয়েছে সব শুনে ফেলেছি।

আনন্দ চোখ তুলল। কিন্তু এখনও সে হেরম্বর দিকে তাকাতে পারছে না।

শুনে কী মনে হল?

আনন্দ হঠাৎ জবাব দিল না। তারপর সসংকোচের সঙ্গে বলল, মনে হল খুব নিষ্ঠুরের মতো স্ত্রীর কথা বললেন। আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন?

হেরম্ব বলল, অনেকদিন। প্রায় দেড়বছর।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৭৫

আমি ভাবছিলাম এক বছরে পৃথিবীতে বুঝি কোটি কোটি লোক জন্মায়। মা-র কাছে রোজ যে সব...

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৭৫

পত্রিকার পাঠ

আসছিল। গায়েব কাপড় গায়ের সঙ্গে মিশে যেতে চায়। —'মাব কাছে বোজ যে সব .'

পৃ ৭৫১-৭৫২

'না দূর! সে বলা যায় না।'

'বল আনন্দ। লক্ষ্মী বলো।'

'লক্ষ্মী বললেন যে?'

'তোষামোদ করে বলেছি।'

'তোষামোদ না ছাই! আমাকে ছেলেমানুষ বানাচ্ছেন!'

আনন্দ হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে.

পৃ ৭৫৪

...তোব আব বিয়েব দবকাব নেই আনন্দ। বুঝলেন এবাব? হুঁ, আপনি নেহাৎ অভদ্র। মেয়েদেব সঙ্গে আলাপ কবতে জানেন না। আপনাব মত লোকেব সঙ্গে কোন মেয়েব কথা বলাই উচিত নয়। আপনি যদি এ বকম করেন আপনাব সঙ্গে তা হলে আমি—'

নিষ্ঠুব আনন্দেব সঙ্গে হেরম্ব

পৃ ৭৫৫

আনন্দ ইচ্ছা করলেই তার ভয়ানক ক্ষতি করতে পারে, তাব জীবনে অসহ্য দুঃখ এনে দিতে পারে, তাব সর্বনাশ কবতে পারে, কোন এক সময়ে এই আশঙ্কা তাব মনে এসেছিল এবং এখনো তা স্থায়ী হয়ে আছে।

পৃ ৭৫৫

...তার হৃদয়মনেব নিয়ন্ত্রণে ওব প্রচুব যথেচ্ছাচার সম্ভব হয়ে গিয়েছে।

জয়কে উপভোগ কবার ধৈর্য্য হেবম্বের ছিল না। সে মোলায়েম করে বলল 'বাগ কবলে নাকি!'

আনন্দ খুশি হয়ে বলল 'না'।

হেরম্ব সুব বদলে ক্ষুব্ধভাবে বলল 'একটুও রাগ করনি?'

'না রাগের কি আছে?'

'একটুখানি রাগ তুমি কবেছ আনন্দ, কি বল?'

আনন্দ হেসে বলল 'আমি একটু বাগ করলে আপনি যদি খুশি হন তবে না হয় করেছি।'

হেরম্ব অভিমানের অভিনয় করে বলল, 'থাক্, দরকার নেই তোমার রাগ করে। কোথায় ভাবছিলাম তুমি বাগ করলে তোমার দুটি হাত ধরে আদর করে রাগ ভাঙাব—

গ্রন্থধৃত পাঠ

না দূব! সে বলা যায় না।

হেরম্ব মৃদু হেসে বলল, প্রথম তোমাকে দেখে মনে হয়নি তুমি এত ভিরু। এটা তোমাব ভয় না লজ্জা, আনন্দ?

আনন্দ বলল, মানুষকে আমি ভয় কবিনে।

তবে তুমি ছেলেমানুষ—লাজুক।

ছেলেমানুষ? আমায এ কথা বললে অপমান করা হয তা জানেন? আনন্দ হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে.

মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২৭৯

তোব আব বিয়ের দরকাব নেই আনন্দ!

বলে আনন্দ হঠাৎ উদ্ধতভাবে হেরম্বকে আক্রমণ কবল, বলল, আপনি নেহাত অভদ্র। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ কবতে জানেন না।

মনে হয় সে বুঝি হঠাৎ উঠে চলে যাবে। হেরম্বের মুখেব দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সে মুখ ঘুবিয়ে নেয়। ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে।

নিষ্ঠুব আনন্দেব সঙ্গে হেরম্ব.

মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২৭৯

আনন্দ ইচ্ছা করলেই তাব ভয়ানক ক্ষতি করতে পারে, কোনো এক সময়ে এই আশঙ্কা তাব মনে এসেছিল এবং এখনও তা স্থায়ী হয়ে আছে।

মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২৮০

তাব হৃদয়মনের নিয়ন্ত্রণে ওর প্রচুর যথেচ্ছাচাব সম্ভব হয়ে গিয়েছে। [মধ্যবর্তী অংশ গ্রন্থে বর্জিত]

যতক্ষণ পাবে দেরি করে মালতীকে আসতে হল।

মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২৮০

পত্রিকার পাঠ

গ্রন্থধৃত পাঠ

আনন্দের হঠাৎ সঙ্কুচিত হয়ে তফাতে সরে যাবার রকমে হেরম্ব থেমে গেল। আনন্দ কণ্ঠস্বর অতিরিক্ত খারাপ করে বলল 'আপনার কথাবার্তার একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না?'

হেরম্ব, যার হৃদয়ে নারী-অভিজ্ঞতার ক্ষতগুলির মধ্যে কোন কোনটি হয়ত এখনো কাঁচা আছে, একেবারে নিভে গেল। আনন্দকে ও কথা সে বলতে গেল কেন? ওকে সে ভয় করে, একবার ওর প্রতি নিষ্ঠুর হয়ে এই ভয়কে জয় করবার তৃপ্তি সে পেয়েছে। কিন্তু তার ভীরুতা আনন্দের অপরাধ নয়। বার বার আনন্দের কাছে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দেবার অসঙ্গত ইচ্ছা তার অদম্য হয়ে উঠেছে কেন? এতে তার লাভের সম্ভাবনা কি আছে? আনন্দের কাছে তার পরাধীনতা কমবে? তাকে ব্যথা দেবার অব্যর্থ শক্তি আনন্দের পঙ্গু হবে? আনন্দও তাকে ভয় করবে?

চাঁদকে এখনো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বাড়ির পিছনে আকাশটা এখন লাল হয়ে উঠেছে। আলোকিত আকাশটি দেখতে দেখতে হেরম্বের মন হঠাৎ বিষাদের অন্ধকারে ভরে গেল। সে বুঝতে পারল হৃদয়ের দুর্বলতা লুকিয়ে আনন্দকে সে ঠকাতে চায়। চাঁদের আলো লেগে ত্বক জ্বালা করছে এই পালিশ একমাত্র যার মুখে মানায় রাগ ভাঙাবার ছলে তার হাত ধরতে চাওয়ার আর কোনো অর্থ নেই। আনন্দের কাছে সে হাল্কা বাহাদুরী করেছে মাত্র। ভাঙা ঘরে নুন দিয়ে ভাত খেয়ে যারা লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে বেড়াতে বার হয়, তাদের চেয়ে তার মন কোনদিক থেকেই উৎকৃষ্ট নয়। তারা বরং বড়াই করে অপরিচিত পথিকের কাছে, সে ছলনা করেছে আনন্দকে,—যাকে বাঁচাবার জন্য দরকার হলে সে পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর মৃত্যু চেয়ে ঈশ্বরের কাছে আবেদন জানাতে পারে।

নিজেকে হেরম্বের এত ছোট মনে হয় যে সে ভাবতে থাকে আবছা আলোয় আনন্দের আধোদেখা শান্ত দেহটিকে আলিঙ্গন করতে চাওয়ার পরিবর্তে সে যে শুধু ওর হাত ধরতে চেয়েছে সেই টুকুই বিস্ময়কর।

বুকের পাঁজর ঠেলে হৃদয় যেন বাইরে বেরিয়ে যেতে চায়, সমস্ত সাবধানতা ভুলে হেরম্ব এতজোরে শ্বাস গ্রহণ করল।

আনন্দ চমকে বলল 'ওকি? কি হল আপনার?'

'কিছু না আনন্দ।'

কিছু না! আপনার নিশ্বাসের শব্দে আমার গা পর্যন্ত সির সির করে উঠল, আপনি বলছেন কিছু না।'

আনন্দ তার হাত চেপে ধরল, 'কি হল বলুন। আপনাকে বলতে হবে। আমি বকেছি বলে? সত্যি? ওমা, কোথায় যাবো। এমন ছেলেমানুষ আপনি।'

পত্রিকার পাঠ

আনন্দ তাব হাত ছেড়ে দিল। আপন মনে সে খানিক হেসে নিল। হেবম্বেব পূর্ব্বকৃত অপবাধকে অনুকরণ করে বলল 'তাই বলুন। আপনি তাহলে পাকা বুড়ো নন? এখনো মিছি মিছি আপনাব কান্না আসে! এতক্ষণ আপনি আমাকে ঠকাচ্ছিলেন।'

আনন্দের এই অসাধারণ আত্ম-প্রতিষ্ঠায় মুগ্ধ হযে হেবম্বেব বিষাদ কমে এল। আগে থেকে আনন্দকে জানা না থাকলেও তার মনে হল, প্রাত্যহিক আনন্দ থেকে আজ সে পৃথক। মনোবৃত্তিগুলি ও' আজ যেবকম তীক্ষ্ণ ও সতেজ হয়ে আছে, কোন মেয়েব পক্ষেই এটা সাধাবণ অবস্থা হতে পারে না। না থেমে, না ভেবে, অজস্র সময না নিয়ে, তাদের পরিচযকে পক্ষীরাজেব পাখা দিযে এভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওযা প্রেবণার কাজ।

কিন্তু আনন্দ অনুপ্রাণিত হয়েছে কি দিয়ে? তাব আবির্ভাবে? নৃত্যে পরিতৃপ্ত যৌবন তাব হঠাৎ এতদিনেব তৃপ্তিকে কাটিয়ে উঠে নবতব সম্ভাবনার সন্ধান পেয়েছে বলে? অথবা শুধু আগামী নৃত্যেব কল্পনায?

এ প্রশ্নেব জবাব পেলে হেবম্বেব জীবনে সব প্রশ্নেরই যেন মীমাংসা হয়ে যেত।

যতক্ষণ পাবে দেরী কবে মালতীকে এবাব আসতে হল।

পৃ ৭৫৫-৭৫৬

গ্রন্থধৃত পাঠ

—

পত্রিকার পাঠ: তাব প্রকৃতির যে বহস্য, যে দুর্বোধ্যতা সম্মোহনশক্তিব মত মেয়েদের আকর্ষণ কবেছে, সুপ্রিয়ার ফিটেব অসুখ আব উমার আত্মহত্যা সম্ভব কবেছে, সে তবে এই?

পৃ ৩৬

গ্রন্থধৃত পাঠ: তার প্রকৃতির যে রহস্য, যে দুর্বোধ্যতা সম্মোহনশক্তিব মতো মেয়েদেব আকর্ষণ করেছে, সে তবে এই?

মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২৮২

পত্রিকার পাঠ: .এই রাবীন্দ্রিক বূপকটাই ছিল এতকালেব হেরম্ব।

পৃ ৩৬

গ্রন্থধৃত পাঠ: .এই বূপকটাই ছিল এতকালের হেবম্ব।

মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ২৮২

পত্রিকার পাঠ: মনে হচ্ছে আমার এ কষ্ট আর কিছুই নয়। এক মুহূর্তে তোমাকে যে আপন কবে পেলাম, এ তাব প্রেবণা। আমি যেন সৃষ্টি করছি! ঠিক কবে কিছুই বুঝতে পাবছি না।

পৃ ২০৫

গ্রন্থধৃত পাঠ: ঠিক করে কিছুই বুঝতে পারছি না।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৯৪

পত্রিকার পাঠ: হেরম্ব এখন তাও জানে। নিজেকে দান করে নিজের দেহটিকে দুর্লভ করার সস্তা কাবা আনন্দ নিজের অজ্ঞাতেই পবিত্যাগ কবেছে।

পৃ ২০৬

গ্রন্থধৃত পাঠ: হেবম্ব এখন অন্ত জানে।

[বাকি অংশ বর্জিত]

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৯৫

দিবারাত্রির কাব্য [তৃতীয় ভাগ : রাতের কবিতা]

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
আনন্দ কথা বলে না। আনন্দের বর্ষা-বিরাগে.. বঙ্গশ্রী, আশ্বিন ১৩৪১, পৃ ৩১৯	হেরম্ব কথা বলে না। আনন্দের বর্ষা-বিরাগে. মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ২৯৮
কিন্তু সবদিক দিয়ে অনাথের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য শিশু গোপালমূর্তির পূজারিণী মালতী তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে। পৃ ৩২১	কিন্তু সব দিক দিয়ে অনাথের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য মালতী তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০০
আচ্ছা, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাস? পৃ ৩২২	ভালোবাসো নাকি আমাকে? আনন্দের কণ্ঠস্বর হেরম্বকে চমকে দিল। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০১
প্রত্যেকটি ঝরে-যাওয়া ফুলের জন্য বোজ যেমন একটি করে ফুল ফোটে, প্রত্যেকটি মরে-যাওয়া ভালবাসার জায়গায় তেমনি একটি করে ভালবাসা জন্মায়। পৃ ৩২৩	প্রত্যেকটি ঝরে-যাওয়া ভালোবাসার জায়গায় আবার তেমনি একটি করে ভালোবাসা জন্মায়। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০২
আনন্দ মুহ্যমানার মত তাকিয়ে ছিল। বললে, 'না?' 'আমরা তো একদিন মরে যাব।' পৃ ৩২৩	আনন্দ মুহ্যমানের মতো তাকিয়েছিল। বলল, যাবে না? কেন যাবে? আমরা তো একদিন মরে যাব। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০৩
অনাথের এটুকু দুর্বলতা হেরম্ব কল্পনা করতে পারে। মালতী তাকে দিয়ে সেদিন কি ভালটাই যে কসিয়ে নেয় তাও সে সহজেই বুঝতে পারে। পৃ ৩২৪	অনাথের এটুকু দুর্বলতা হেরম্ব কল্পনা করতে পারে। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০৪
অচেনা পাখির লীলাচাঞ্চল্য। ক্ষুধাশীর্ণ দু'টি ভীরু কুকুর এই বনে ভালবাসতে এসেছে। মৃদু অমায়িক হাসি হেসে হেরম্ব সম্মতি জানায়, অস্ফুটস্বরে বলে, জয় হোক। পৃ ৩২৪	..অচেনা পাখির লীলাচাঞ্চল্য। [বাকি অংশ বর্জিত] মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০৪
তবু প্রাণপণে তারা কথা বলছে। এর চেয়ে সংসারে, অন্ততঃ ভালবাসার ব্যাপারে আটকা পড়েছে এমন একটি পুরুষ ও একটি নারীর মধ্যে, যদি এই নিয়ম প্রচলিত থাকত যে মন জানাজানি হয়ে যাবার পর, সেদিন তাদের প্রথম দেখা হবে সেদিন একজন হয় 'আয় সুপ্রিয়া' বলে আর একজনকে তৎক্ষণাৎ বুকে জড়িয়ে ধরবে নয়তো লাথি মেরে বলবে, বেরিয়ে যা—তাও যে অনেক ভাল ছিল। চিরকাল এমনভাবে মানুষ কত কথা বলতে পারে? পৃ ৫৩০	তবু প্রাণপণে তারা কথা বলছে। [পরবর্তী অংশ গ্রন্থে বর্জিত] চিরকাল এমনভাবে মানুষ কত কথা বলতে পারে? মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০৭

পত্রিকার পাঠ

অশোক নির্ম্মমভাবে হেসে বললে, 'তুমি কি বলতে চাও আমি নিয়মিতভাবে সুইসাইড় করবার চেষ্টা করছিলাম?'

'আমি কিছুই বলতে চাই না, তুমি চুপ কর।'

পৃ ৫৩২

গ্রন্থধৃত পাঠ

অশোক নির্মমভাবে হাসল। বলল, বিবেচনা করেই গলা বাড়িয়েছিলাম, কর্তব্যের খাতিরে। তুমি যা ভেবেছিলে তা একেবারেই সত্য নয়।

আমি, কিছুই ভাবিনি।

ভাবোনি? তবে যে ডাকাত ধরতে গেলেই বলতে জেনেশুনে প্রাণটা দিতে যাচ্ছি নিজের, খুন হতে যাচ্ছি সাধ করে? অমনি করে অমঙ্গল ডেকে আনতে বলেই তো আঙুল দুটো আমার গেল।

সুপ্রিয়া বিবর্ণ মুখে বলল, কী সব বলছ তুমি? চুপ করো।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩০৯

'তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না, সুপ্রিয়া।'

অবস্থা অতি সঙ্গীন, তাদের এই বর্ত্তমান অবস্থা। হেরম্ব সাংঘাতিক লোক, যাকে গুণ্ডা বলে প্রায় তাই। সুপ্রিয়া মৃত্যু-প্রার্থিণী। এই ধরনের বৈদ্যুতিক আবহাওয়াতে এক মুহূর্ত বাস করতে হেরম্ব আজকাল নিজেকে অবশ অসাড় মনে করে। যাকে সামনে পায় তাকেই তার মারতে ইচ্ছা হয়। কেন তাকে এভাবে পীড়ন করা?

সুপ্রিয়া কোনদিন কলহ করেনি, আজও করলে না। তার চোখে শুধু জল জল। হেরম্ব একটু নরম হয়ে বললে, 'তোকে মিথ্যাবাদী বলিনি, সুপ্রিয়া।'

'না'।

এই 'না'র মানে বোঝা কঠিন নয়। হেরম্ব যে মিথ্যাবাদী শব্দটা ব্যবহার করেনি তা সত্য।

'আমি শুধু বলছিলাম যে তুই বুঝতে পারিসনি। অশোক যে তোকে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়েছিল তার প্রমাণ কি?'

'ঝড়-বাদলে খোলা-ছাদে তোকে কাছে পেয়ে হঠাৎ মনের আবেগে—'

পৃ ৫৩৫

তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া কোনোদিন কলহ করেনি, আজও করল না। তার চোখে শুধু জল এল। হেরম্ব একটু নরম হয়ে বলল, তুই ইচ্ছে করে মিথ্যে বলছিস, তা বলছি না, সুপ্রিয়া। তুই বুঝতে পারিসনি।

আমি কিছুই বুঝতে পারি না।

হেরম্ব খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, ঝড়-বাদলে খোলা ছাদে তোকে কাছে পেয়ে হঠাৎ মনের আবেগে—

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩১৩

'টের পাচ্ছ না।

বঙ্গশ্রী, অগ্রহায়ণ ১৩৪১, পৃ ৬১৬

করেনি, জ্বালা টের পাচ্ছ না।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩১৪

আনন্দ চুপ করে শুয়ে রইল, হাত গুটিয়ে বসে হেরম্ব আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

১৩৪১, পৃ ৬১৭

আনন্দ চুপ করে শুয়ে রইল, হাত গুটিয়ে বসে রইল হেরম্ব। যে কোনো কারণেই হোক, আনন্দকে মালতী যে এমনভাবে মারতে পারে সে যেন ভাবতেই পারছিল না।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩১৪

হেরম্ব তাকে একটু খোঁচা দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারলে না। বললে, 'নাও যেতে পারেন, হয়ত কালকেই তিনি ফিরে আসবেন। আনন্দকে মিছামিছি মেরেছেন।'

মালতী অল্প একটু গরম হয়ে বললে, 'মিছামিছি! ওর বাবার ভাগ্যি কাল ওকে খুন করিনি। কে জানত পেটের মেয়ে এমন শত্তুর হবে!' দুহাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে মালতী সঙ্গে সঙ্গে একটু নরম হয়ে গেল, 'অদেষ্ট দেখেছ, হেরম্ব? আজ আমার জন্মদিন, জ্বালাতন করব, তাই পালিয়ে গেল।' মালতীর গাল আর চিবুকের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে আসছিল, রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল, 'একেবারে পাগল হেরম্ব, উন্মাদ! গেছে যাক, আজ দেখব

হেরম্ব বলল, নাও যেতে পারেন, হয়তো কালকেই তিনি ফিরে আসবেন। আনন্দকে মিছামিছি মেরেছেন।

মালতী অল্প একটু গরম হয়ে বলল, মিছামিছি! ওর বাবার ভাগ্যি ভালো ওকে খুন করিনি। কে জানত পেটে আমার এমন শত্তুর হবে!

হেরম্ব এবার বুঢ়কণ্ঠে বলল, কী শত্রুতা করল ভেবে পাই না। টাকা দশটা জোগাড় করে না দিলে কি তাঁর যাওয়া হত না? যে যেতে চায় অত সহজে তাকে আটকানো যায় না, মালতী বউদি।

মালতী বলল, তুমি ছাই বোঝ। টাকা জোগাড় করে দেওয়ার জন্য নাকি! আমাকে না জানিয়ে ও চুপ করে রইল

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
কাল দেখব, তারপর ঘরদোরে আমিও আগুন ধরিয়ে দেব। ওলো সর্ব্বোনাশী ছুঁড়ি, উঁকি মেরে দেখিস, কোন্ লজ্জায়? আয়, ইদিক আয়, হতভাগি।' পৃ ৬১৭	কোন হিসাবে? আমি টের পেলে কি সে যেতে পারত, হেরম্ব! দুহাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে মালতী আবার বলল, অদেষ্ট দেখেছ, হেরম্ব? আজ আমার জন্মদিন, জ্বালাতন করব, তাই পালিয়ে গেল। মালতীর গাল আর চিবুকের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে আসছিল, রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। —একেবারে পাগল, হেরম্ব, উন্মাদ। গেছে যাক, আজ দেখব কাল দেখব তারপর ঘরদোরে আমিও ধরিয়ে দেব আগুন।. ওলো সর্বনাশী উঁকি মেরে দেখিস কোন লজ্জায়? আয়, ইদিকে আয়, হতভাগি। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩১৫-৩১৬
হেরম্বের সবচেয়ে মুস্কিল হয়েছে এই যে, আনন্দের সংস্রবে এসে তার মন এমন দুর্ব্বল অথবা বিশ্বপ্রেমিক হয়ে উঠেছে যে, পৃ ৬১৮	হেরম্বের সবচেয়ে মুশকিল হয়েছে এই যে, আনন্দের সংস্রবে এসে তার মন এমন দুর্বল হয়ে উঠেছে মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩১৬
.সে অকথ্য দুঃখও সে দেয় না। 'তবু মাতালের মদই চাই। জলে তার তৃষ্ণা মেটে না। মদ খেয়ে মরাই তার ভাল। 'চল ফিরি।' পৃ ৬২১	..সে রকম অসহ্য দুঃখও সে দেয় না। তবু সেই দুঃখই তার চাই, তাকে পরিহার করা যাবে না। চল ফিরি। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩১৮
ওর সত্যি কোন উপায় নেই। আজকাল কি প্রার্থনা করি জানেন? সুপ্রিয়া আঁজলা করে সমুদ্রের জল তুলে বিবর্ণ সীঁথি ঘসে ঘসে ধুয়ে ফেললে। বাঁ হাতের আঙ্গুল থেকে আংটি ও কব্জি থেকে লোহা ও শাঁখা খুলে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। 'আমি যখন বেরিয়ে আসি, ওর একশ পাঁচ ডিগ্রি জ্বর। ও মরেই যাক্। শান্তি পাবে।' পৃ ৬২১	.ওর সত্যি কোনো উপায় নেই। [বাকি অংশ বর্জিত] মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩২০
বিচলিত হলে চলবে কেন? তুই নিজে যা বললি তার চেয়ে আমার কথাটা নিশ্চয় ভয়ানক নয়?' 'মিথ্যে বলে আপনার কথা ভয়ানক।' 'কেন মিথ্যে বুঝিয়ে দে। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইব।' পৃ ৬২১	বিচলিত হলে চলবে কেন? ওর ভালোমন্দের দায়িত্ব তোরও অনেকখানি আছে বইকী। [বাকি অংশ গ্রন্থে বর্জিত] মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩২০
'আমার কথাটা সেই জন্যই হয়ত মিথ্যা নয়, সুপ্রিয়া। অশোককে আমি যদি শিখণ্ডীর মত সামনে খাড়া করে না রাখি, তাতে তোর সুবিধা আছে বইকী।' সুপ্রিয়া ক্রন্দনবিমুখ আহত শিশুর মত মুখ ক' বললে, 'ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করার জন্য একথা যদি বলতেন, ফিরে গিয়ে এখুনি আমি বিষ খেতাম।' পৃ ৬২১	লড়াই বাধাচ্ছিস তুই : আমি লড়াই করতে চাইনি, সুপ্রিয়া। এই কঠোর কথায় সুপ্রিয়া ক্রন্দনবিমুখ আহত শিশুর মতো মুখ করে বলল, ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করার জন্য এ কথা যদি বলতেন, ফিরে গিয়ে আমি বিষ খেতাম। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩২০
হেরম্বকে আবিষ্কারের গৌরব থেকে বঞ্চিত করে আনন্দ একথা স্বীকার করলে, 'কেন তা হয়? আমার খুব ছোটো মন বলে?' বঙ্গশ্রী, পৌষ ১৩৪১, পৃ ৭৪৪	হেরম্বকে আশ্চর্য করে দিয়ে সহজভাবে আনন্দ এ কথা স্বীকার করল, কেন তা হয়? আমার মন ছোটো বলে' মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩২৩

পত্রিকার পাঠ

সুপ্রিয়ার সেই হাতে ভর দিয়ে শিথিল বসবার ভঙ্গি মনে পড়ে। আসন্ন সন্ধ্যায় সুপ্রিয়ার নির্ব্বাক গৃহপ্রবেশের পর অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে তার অন্তরের অমৃত-পিপাসাকে ছাপিয়ে যে কোটি ক্ষুধিত কামনার হাহাকার উঠেছিল, মাটির মানুষ হেরম্বকে এখনো তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

পৃ ৭৪৪

অঙ্গনে বিছানো একটুকরো রোদ আর তরুতলের ক্ষীণ ছায়ার সন্ধান পাওয়া যেত না। সুপ্রিয়াকে মনে করতে হলে সেই মন নিয়ে হেরম্বকে সহরের ধূলিভরা পথে পথে বেড়াতে হত।

পৃ ৭৪৬

কিন্তু এবারও আনন্দের নাচ হঠাৎ থেমে গেল। সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর টলে পড়ে গেল। হেরম্ব যখন তাকে তুলে সরিয়ে আনল আগুনের তাপে তার চুল অল্প অল্প ঝলসে গিয়েছে। আনন্দ আর্তনাদ করে উঠল, 'জ্বলে গেলাম, ছেড়ে দাও আমাকে।'

সবলে হেরম্বের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সে উদ্ধশ্বাসে ছুটে দরজা খুলে বাইরে চলে গেল। বাগানেও সে দাঁড়াল না। বাগানের সামনের রাস্তা অতিক্রম করে খোলা মাঠের উপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলল।

হেরম্ব ছুটতে ছুটতে বললে, 'কোথায় যাচ্ছ আনন্দ?'

আনন্দ ছুটতে ছুটতে জবাব দিলে, 'আমার শরীর জ্বলে যাচ্ছে, সমুদ্রে স্নান করব।'

'ফিরে এস আনন্দ। পুকুরে স্নান করবে। ঘরের মেঝেতে জল ঢেলে তোমার জন্যে আমি পুকুর তৈরী করে দেব। ফিরে এস।'

আনন্দ দাঁড়াল না। —'আমি সমুদ্রেই স্নান করব।'

'দাঁড়াও, আমিও আসছি আনন্দ। অত জোরে ছুট না।'

কিন্তু আনন্দ সাড়াও দিল না, দাঁড়ালও না।

হেরম্ব অক্ষম। সবদিক দিয়ে অক্ষম। দৌড়ের প্রতিযোগিতাতেও আনন্দ যে তাকে হার মানাবে তা কে জানত? হেরম্বের অনেক আগে নিজের হাল্কা শরীর নিয়ে আনন্দ সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লে। সমুদ্র তেমনি কলরব করছে। সমুদ্রের ঢেউ তেমনিভাবে তীরে আছড়ে পড়ছে। বিকালে সুপ্রিয়ার কাছে বসে হেরম্ব যেমন কলরব শুনেছিল, যেমন ঢেউ দেখেছিল।

ব্রেকার পার হয়ে যেখানে ঢেউ শুধু দোলায়, সেইখানে হেরম্ব আনন্দের নাগাল পেল।

'এমন করে পালিয়ে আসে? চল আনন্দ, এবার ফিরে যাই।'

'তুমি ফিরে যাও। আমার ঘুম পাচ্ছে। কেন বিরক্ত করতে এলে?'

হেরম্ব আনন্দকে ধরবার চেষ্টা করল। আনন্দ ডুব দিয়ে তার হাত ছাড়িয়ে কোথায় যে আবার ভেসে উঠল অন্ধকার উত্তাল সমুদ্রের বুকে হেরম্ব আর সন্ধান করে উঠতে পারল না।

পৃ ৭৫২

গ্রন্থধৃত পাঠ

সুপ্রিয়ার সেই হাতে ভর দিয়ে বসবার শিথিল ভঙ্গি মনে পড়ে। আসন্ন সন্ধ্যায় সুপ্রিয়া স্খলিত পদে তার পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করার পর অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে তার অন্তরের অমৃত পিপাসাকে ছাপিয়ে যে কোটি ক্ষুধিত কামনার হাহাকার উঠেছিল মাটির মানুষ হেরম্বকে এখনও তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩২৩

অঙ্গনে বিছানো একটুকরো রোদ আর তরুতলের ক্ষীণ ছায়ার যোগাযোগ আগের মতো আলোছায়ার খেলা সাঙ্গ হয়ে যেত না। সুপ্রিয়াকে মনে করতে হবে সেই মন নিয়ে, হেরম্বকে শহরের ধূলিভরা পথে বেড়াতে হত।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩২৫

কিন্তু এবারও অকস্মাৎ আনন্দের নৃত্য থেমে গেল। আগুনের আরও নিকটে সে থমকে দাঁড়াল। আগুন এখন তার মাথা ছাড়িয়ে আরও উঁচুতে উঠেছে, আনন্দকেও মনে হচ্ছে আগুনের শিখা। পরক্ষণে আনন্দ কাত হয়ে সেই বিপুল ব্যাপক যজ্ঞানলে ঢলে পড়ল।

হেরম্ব নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল। কিছু করার নেই। আনন্দ অনেক আগে মারা গেছে। শুধু চিতায় উঠবার শক্তিটুকুই তার বজায় ছিল।

মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৩২

উপন্যাসটির পূর্ব-উদ্ধৃত ভূমিকা-ধরনের লেখাটি ঔপন্যাসিক মানিক বন্দোপাধ্যায়ের হয়ে-ওঠার ও মানিকের শিল্পজিজ্ঞাসাব বিশিষ্টতাকে আভাসিত করেছে। লেখকের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ সংস্করণটির (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড প্রকাশিত, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬২ বঙ্গাব্দ) দ্বিতীয় মুদ্রণে (শ্রাবণ, ১৩৬৬) উক্ত ভূমিকার অনুচ্ছেদ দুটি অজ্ঞাতকারণে বর্জিত হয়েছে।

বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশকালে ছিল না এবং পরবর্তী আব-কোনো সংস্করণে নেই অথচ শুধু ডি এম সংস্কবণেই আছে উপন্যাসটির বিস্তারিত নামকরণ—'দিবারাত্রির কাব্য : একটি বস্তুসঙ্কেতের কল্পনামূলক রূপক কাহিনী. .।' উপন্যাসটির বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীর একান্ত নিজস্ব অভিনবত্ব ঘোষণার জন্যই হয়তো মানিক এই বিচিত্র পন্থাটি গ্রহণ করেছিলেন।

১৯৩৫-এর ডিসেম্বরে দিবারাত্রিব কাব্য প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বস্তুত রচনাকালের দিক থেকে দিবারাত্রির কাব্য-ই মানিকের প্রথম উপন্যাস। কিন্তু প্রকাশকালের দিক থেকে দিবারাত্রির কাব্য মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় গ্রন্থ, দ্বিতীয় উপন্যাস।

ধারাবাহিকভাবে বঙ্গশ্রী পত্রিকায় প্রকাশিত উপন্যাসটির 'আদি পাণ্ডুলিপি' 'অনেক পরিবর্তন'-এর আগে কোন চেহাবায় ছিল, তা জানা যায় ১৯৭৬ সালে এক্ষণ পত্রিকার দ্বাদশ বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত 'দিবাবাত্রিব কাব্য : আদি পাণ্ডুলিপি' থেকে।

দিবারাত্রিব কাব্যের সেই আদি পাণ্ডুলিপি যুগান্তর চক্রবর্তীর সৌজন্যে পরিশিষ্টরূপে মুদ্রিত হল।

ডি এম সংস্করণে উপন্যাসটির প্রত্যেকটি ভাগেবই কাহিনি-অংশ আরম্ভের আগের পৃষ্ঠায় নিম্নোক্ত উপস্থাপনায় সুবিন্যস্ত .

প্রথম ভাগ/দিনের কবিতা, দ্বিতীয় ভাগ/বাতের কবিতা, তৃতীয় ভাগ/দিবারাত্রিব কাব্য।

পত্রিকায় কোথাও কোনো কবিতা ছিল না। কিন্তু ডি এম সংস্কবণ থেকে তিনটি ভাগেবই কাহিনি-অংশের আরম্ভেব পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় একটি করে কবিতা সংযুক্ত হয়েছে এবং পববর্তীকালেও সেইগুলি বক্ষিত হয়েছে।

বঙ্গশ্রীতে প্রকাশিত পাঠের তুলনায় ডি এম সংস্করণেব পাঠে একটি-দুটি শব্দ ছাড়াও কোথাও কোথাও দুটি-একটি বাক্য ও বাক্যাংশের যোগ ও বিয়ো.াসহ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিন্যাসগত ঈষৎ পার্থক্য বিদ্যমান।

এক বা একাধিক বাক্যাংশ, কোথাও কোথাও দুটি-তিনটি বাক্য এবং কথোপকথন ও বর্ণনা অংশের কিঞ্চিৎ বিন্যাসগত পার্থক্য উপন্যাসের সামগ্রিক মেজাজ ও আবেদনকে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত করতে না পারলেও আদি পাণ্ডুলিপি ও বঙ্গশ্রীর মুদ্রিত পাঠের তুলনায় ডি এম সংস্করণ ও ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড প্রকাশিত সংস্করণ ও তার দ্বিতীয় মুদ্রণের উপসংহার-অংশগুলির মেজাজ ও আবেদনগত পার্থক্যকে উল্লেখযোগ. মৌলিক পার্থক্য বলেই মনে করার অবকাশ আছে। আদি পাণ্ডুলিপির উপসংহার-অংশের সঙ্গে বঙ্গশ্রীর উপসংহার অংশের পার্থক্য মূলত খুব বেশি নয়, কেন না দুটি ক্ষেত্রে সমুদ্রস্নান এবং সমুদ্রগর্ভেই আনন্দর আত্মসমর্পণ লক্ষণীয়। কিন্তু ডি এম সংস্করণ এবং ১৩৬২ বঙ্গাব্দের ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড সংস্করণ ও দ্বিতীয় মুদ্রণ মেজাজ ও আবেদনের দিক থেকে ভিন্নতর। বস্তুত শেষোক্ত দুটি উপসংহারেই আনন্দ আগুনের লেলিহান শিখাকেই চিতাসজ্জায় পরিবর্তিত করেছে।

এক্ষণে প্রকাশিত দিবারাত্রির কাব্য-এর আদি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ-সূত্রে, ভূমিকা ও টীকাভাষ্য অংশে সম্পাদক যুগান্তর চক্রবর্তী উপন্যাসটির বিবর্তন ও লেখকের রচনাবৈশিষ্ট্যগত গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি দান করেছেন। উক্ত তথ্যাদি লেখকের 'অব্যবস্থিচিত্ততা'কে 'অশিক্ষিতপটুতা' ঘটিত প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত বিশ্বাসের নিরসনে সহায়তা করে। অধ্যাপক চক্রবর্তীর প্রাসঙ্গিক অভিমত .

"মাসিক পত্রিকার পর পর দুটি সংখ্যার সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্যে, কোনো পূর্ব-পরিকল্পনা বা দীর্ঘতর প্রস্তুতি ছাড়াই, কাহিনীর এই ভিন্নমুখী ধারা কি কল্পনা করা সম্ভব, বিশেষত এমন একজন লেখকের পক্ষে যিনি তাঁর মূল গল্পের পরিণতি সম্পর্কে একমাস আগেও 'অব্যবস্থিত চিত্ত' ছিলেন এবং সম্পাদকের হাতে সম্পূর্ণ গল্পাকারেই লেখাটি দিয়ে বিচলিতভাবে বিদায় নেন? প্রতিভা অলৌকিক, এই ধারণায় বিশ্বাস থেকেও এমন আকস্মিকতাকে মেনে নেওয়া সহজ হয় না।"

[এক্ষণে প্রকাশিত যুগান্তর চক্রবর্তীর পূর্ব-উল্লিখিত প্রবন্ধ, পৃ ৪৬।]

উপন্যাসটির দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে শনিবারের চিঠিতে ১৩৫৩ বর্ষের কয়েকটি সংখ্যায় বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রদত্ত বিজ্ঞাপনে দিবারাত্রির কাব্য-এর যে উল্লেখ আছে তা সম্ভবত এই দ্বিতীয় সংস্করণ। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং কলকাতা থেকে ১৩৬২ বঙ্গাব্দে পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ১৩৭৪ থেকে ১৩৯৫-এর মধ্যেও প্রকাশনসংস্থা লেখাপড়া কলকাতা কর্তৃক অনেকগুলি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির সাম্প্রতিক ও সর্বশেষ প্রকাশক চিরায়ত প্রকাশন, তাদের পক্ষ থেকে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

'মানিক রচনাসমগ্র'-এ দিবারাত্রির কাব্য উপন্যাসের পাঠ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড-এর ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের ২য় মুদ্রণ নূতন সংস্করণ থেকে গৃহীত।

পুতুলনাচের ইতিকথা

'পুতুলনাচের ইতিকথা' মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাস (পদ্মানদীর মাঝি-উপন্যাসকে চতুর্থ স্থানে রেখে), এবং চতুর্থ মুদ্রিত গ্রন্থ। প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি, প্রকাশকাল ১৯৩৬। প্রথম সংস্করণ সম্পর্কে এর অতিরিক্ত তথ্য পাওয়া যায়নি। ডি এম লাইব্রেরি-র পক্ষ থেকে গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল কিনা এ বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পুতুলনাচের ইতিকথার দ্বিতীয় একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৭ সালে ১৩৫৪ কার্তিকে (১৯৪৭ অক্টোবর-নভেম্বর), প্রকাশক দ্য বুকম্যান-এর পক্ষে চিন্মোহন সেহানবীশ, ৮৭ চৌরঙ্গি রোড, পৃ ২৫৩, দাম পাঁচ টাকা। পরবর্তী সংস্করণের প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স। ষষ্ঠ মুদ্রণের (১৩৬৯) পর প্রকাশভবন কর্তৃক নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৭২ বঙ্গাব্দে। তদবধি উক্ত প্রকাশক কর্তৃক পুতুলনাচের ইতিকথা ১৪০৪ পর্যন্ত সতেরোবার মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমাবধি একই প্রচ্ছদচিত্র ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। প্রচ্ছদশিল্পী মাখন দত্তগুপ্ত।

'মানিক রচনাসমগ্র'-এ পুতুলনাচের ইতিকথা বেঙ্গল পাবলিশার্স কর্তৃক প্রকাশিত ১৩৫৯ (১৯৫২) সংস্করণের পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে লেখকের পরিবারের সৌজন্যে প্রথম সংস্করণের একটি কপি উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এই সংস্করণে যদিও উপন্যাসটি ৩৪৩ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হয়েছে, প্রথম আটটি পৃষ্ঠা এবং ৩৪১ ও ৩৪২ পৃষ্ঠা দুটি পাওয়া যায়নি। উভয় সংস্করণের ভাষাগত বা শব্দগত সংস্কার খুবই সামান্য এবং প্রায়শ অনুল্লেখযোগ্য। যথা :

ডি এম লাইব্রেরি প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ	বুকম্যান প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ	মা রচনাসমগ্র ১-এ গৃহীত সংস্করণ
কিন্তু আপনাব সমাজে হিতৈষী গণ্যমান্য লোক	কিন্তু নিজেব সমাজে হিতৈষী গণ্যমান্য লোক. পৃ ২৯	কিন্তু নিজেব সমাজে হিতৈষী গণ্যমান্য লোক .. মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৫২
সে থাকতে তোমাকে ডেকে পাঠানোব মানেটা বোঝ?	সে থাকতে ডেকে পাঠানোর মানেটা বোঝ? পৃ ৩২	সে থাকতে ডেকে পাঠানোব মানেটা বোঝ? মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৫৪
গোল শিশির সব ওষুদটা খাইয়ে দিয়েছেন?	গোল শিশির ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছেন? পৃ ৩৬	গোল শিশিব ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছেন? মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৫৬
এবকম অসাধাবণ ব্যক্তিত্বেব অভাবে জীবনটাই বৃথা হইয়া গেল তাহাব।	এবকম অসাধাবণ ব্যক্তিত্বেব অভাবে জীবনটাই বৃথা গেল তাহার। পৃ ৪৫	এ রকম অসাধাবণ ব্যক্তিত্বের অভাবে জীবনটাই বৃথা গেল তাহাব। মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৬২
হযত কর্তব্যজ্ঞান, হযত খেযাল, হযত শুধু শখ. হযত নির্ব্বিবাদে ওকে লইযা	হযত কর্তব্যজ্ঞান, হয়ত খেয়াল, হযত নির্ব্বিবাদে ওকে লইয়া . পৃ ৭৬	হয়তো কর্তব্যজ্ঞান, হযতো খেযাল, হয়তো নির্বিবাদে ওকে লইযা . মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৮০
বিন্দুব নিবুৎসাহ নিরুত্তেজ কথা।	বিন্দুব অবসাদক্লিষ্ট, নিবুত্তেজ কথা। পৃ ৯২	বিন্দুব অবসাদক্লিষ্ট, নিরুত্তেজ কথা। মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৯১
মুড়ি চিড়া বেচিয়া শ্রীনাথ আব লোচন মযবা বোধ হয় বড়লোকই হইয়া গেল। কয়েকদিনে পাগলদিদি শীর্ণ হইয়া গেলেন।	মুড়ি চিড়া বেচিয়া শ্রীনাথ আর লোচন ময়বা বোধ হয় বড়লোকই হইয়া গেল। শ্রীনাথ দু'হাতে মুড়ি চিড়া বেচে, দু'হাতে পযসা লইয়া কাঠের বাক্সে বাখে, সর্ব্বক্ষণ হায হায কবে, কয়েক দিনে পাগলদিদি শীর্ণ হইয়া গেলেন। পৃ ১৩৯	মুড়ি চিড়া বেচিয়া শ্রীনাথ আব লোচন মযবা বোধ হয বড়োলোকই হইয়া গেল। শ্রীনাথ দুহাতে মুড়ি চিড়া বেচে, দুহাতে পযসা লইয়া কাঠেব বাক্সে বাখে, সর্বক্ষণ হায হায় কবে। কয়েক দিনে পাগলদিদি শীর্ণ হইয়া গেলেন। মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৪২২
কুসুম তো আজ ও কাল এখানে আছে। বলিবাব কিছু যদি থাকে বলিবার সময় মিলিবে। বলিবার কিছু আছে কিনা সেটাই আগে ভাবিয়া দেখা দরকার।	কুসুম তো আজ ও কাল এখানে আছে। বলিবাব কিছু আছে কিনা সেটাই আগে ভাবিয়া দেখা দবকাব। পৃ ২২৬	কুসুম তো আজ ও কাল এখানে আছে। বলিবার কিছু আছে কিনা সেটাই আগে ভাবিয়া দেখা দবকাব। মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৪৭৫

এই জাতীয় শব্দসংস্কার উভয় পাঠে আরও কিছু দৃষ্ট হয়, বাহুল্যবোধে তা নির্দেশিত হল না। তবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত প্রথম পাঠের সঙ্গে পরবর্তী পাঠের বহু সংস্কার রূপান্তর ও সংশোধন লক্ষ করা গেছে, তারও উল্লেখযোগ্য কিছু উদাহরণ এখানে দেওয়া হল।

পত্রিকার ধারাবাহিক রচনায় লেখক-নামের পূর্বে শ্রী ব্যবহৃত হলেও গ্রন্থে তা বর্জিত হয়েছে, তাছাড়া 'ওষুদ', 'খপর', 'অদেষ্ট', 'হাবায়', 'উনির', 'সুন্দোর' প্রভৃতি শব্দ যথাক্রমে ওষুধ, খবর, অদৃষ্ট,

হাওয়ায়, ওনার, সুন্দর রূপলাভ করেছে। পত্রিকায় ছিল কিন্তু গ্রন্থে বর্জিত অথবা সংযোজিত এমন কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত হল :

পত্রিকার পাঠ	গ্রন্থধৃত পাঠ
চোর! এমন কড়া কথাগুলি কুসুম বলিল কেন? তার রাগ হইয়া গিয়াছিল। মাত্রা ঠিক রাখিতে পারিল না। আসলে ঝগড়াটা কুসুমের বানানো। কৃত্রিম। অন্তত প্রথম দিকটাতে তাই ছিল। কুসুম এই মতলব করিয়াছিল যে আজ শশীর সঙ্গে একটু ঝগড়া কবিলে কাল তাহার হাতে পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পাওয়া যাইবে। এই ধরনের নাটকীয় ব্যাপারগুলিব প্রতি কুসুমেব একটি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব আছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাগের মাথায় শশীকে বাপ তুলিয়া অপমান করিয়া বসিবে এ কি সে জানিত? শশী সুতরাং মুখ কালো কবিয়া বাড়ি ফিরিল।	চোর! শশী মুখ কালো করিয়া বাড়ি ফিরিল মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৭৫
চৈত্রেব শুকনো খটখটে ডোবায় বর্ষার জল জমা হইলে কোথা হইতে এইসব জীবনেব আবির্ভাব ঘটে, জগতের কোন বৈজ্ঞানিক তাহা বলিতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিকেরা কিই বা বলিতে পারে! চাঁদ কত দুরে আর ইঞ্জিন কি ভাবে চলে, শুধু এই। গ্রামের লোক, যাহাবা এইসব দুর্বোধ্য বহস্য ঈশ্বরের সাহায্যে এক মিনিটে সরল ও সহজবোধ্য কবিয়া দিতে পারে, গ্রামেব লোক তাই বিজ্ঞান ও কলকব্জাকে বড় ডরায়। কিন্তু গ্রামে এবাব কলকব্জা আসিল। এই নদী আব খালেব চিকরি-কাটা..	মাছই বেশি। এই খাল আব খালেব চিকবি-কাটা. মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৭৮
তাহার বহস্যানুভূতিব প্রক্রিয়া এই হিসাবে মৌলিক। এ সব অবান্তর কথা নয়। ধারণাতীতকে ধারণা করিবার বিশিষ্ট চেষ্টার ভিতব দিয়া ছাড়া মানুষের মনের চিরন্তন শিশুটিকে জানিবার আর কোন উপায় নাই। এবং এই খোকাটিকে না জানিলে মনের কবিকে, মনের কল্পনাকে, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতাকে, মনের পাগলামিকে চিনিবে কি করিয়া?	বহস্যানুভূতিব এ প্রক্রিয়া শশীব মৌলিক নয় সব মানুষেব মধ্যে একটি খোকা থাকে যে মনেব কবিত্ব, মনেব কল্পনা, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনেব পাগলামিকে লইয়া সময়ে অসময়ে এমনিভাবে খেলা করিতে ভালোবাসে। মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৮৪-৮৫
বড়োলোকই হইয়া গেল। কয়েকদিনে..	বড়োলোক হইয়া গেল। শ্রীনাথ দুহাতে মুড়ি চিঁড়া বেচে, দুহাতে পয়সা লইয়া কাঠেব বাক্সে বাখে, সর্বক্ষণ হায় হায় কবে। কয়েক দিনে .. [মা বচনাসমগ্র ১, পৃ ৪২০]
কে জানিত শশীকে যাদব এমন করিয়া বকিতে পারেন? মুখ দেখিলে...	কে জানিত শশীকে যাদব এমন কবিয়া বকিতে পাবেন। এ জগতে পাগল দিদির পর সেই যে তার সবচেয়ে স্নেহের পাত্র। মুখ দেখিলে...[মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৪২১]
চোখে দেখি না বলিয়া, কানে শুনি না বলিয়া ঈশ্বরকে অস্বীকার কবার মত, বোগে ভোগে বলিয়া আর লোকে কাঁদে বলিয়া মানুষকে আমরা বলি অসুখী। বলি তাতে দোষ নাই, কিন্তু পরিবর্তন কামনা করি কেন? মানুষের অস্তিত্ব সত্য : বিষ অথবা অমৃত কি দিয়া জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ফাঁকটা ভরাট হইয়া আছে অস্তিত্বের সঙ্গে পূর্ণতার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক কি?	মানুষটা যখন হাসে অথবা কাঁদে তখন হাসি-কান্নার সঙ্গে জড়াইয়া ফেলি মানুষটাকে : মনে মনে মানুষটাব গায়ে একটা লেবেল আঁটিয়া দিই সুখী অথবা দুঃখী। লেবেল আঁটা দোষের নয়। সব জিনিসেবই একটা সংজ্ঞা থাকা দরকার। কে হাসে আর কে কাঁদে এটা বোঝানোর জন্য দু-দশটা শব্দ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বটে। তার বেশি আগাই কেন? কেন পরিবর্তন চাই? নিঃশব্দ অশ্রু মুছিয়া আনিতে চাই কেন সশব্দ উল্লাস? রোগ শোক দুঃখ বেদনা বিষাদের বদলে শুধু স্বাস্থ্য বিস্মৃতি সুখ আনন্দ উৎসব থাকিলে লাভ কীসের? [মা রচনাসমগ্র ১, পৃ ৩৮৪]

এইরূপ উদাহরণের পরিমাণ নিতান্ত কম নয়।

পুতুলনাচের ইতিকথা-র দ্বিতীয় অর্থাৎ ১৯৪৭-এ প্রকাশিত বুকম্যান সংস্করণে গ্রন্থপরিচিতি হিসেবে পশ্চাদ্‌প্রচ্ছদে প্রকাশকের পক্ষ থেকে নিম্নরূপ বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল :

> পৃথিবীর এই বিরাট রঙ্গমঞ্চে মানুষ যেন শুধু পুতুল। কোন অদৃশ্য হাতের সুতোর টানাপোড়েনে মানুষ নাচে। কাঁদে, কথা বলে। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়াপথে তার জীবনের স্রোত বয়ে চলে না, মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি।
>
> যে সীমাহীন নীড়-প্রেমের স্বপ্ন দেখেছিল শশী, সে স্বপ্ন তার চুরমার হয়ে গেল কেন? তার প্রিয়জনের পদচিহ্নলাঞ্ছিত কায়েত পাড়ার সেই নির্জন রাস্তা শশীর জীবনে শুধু রাজপথ হয়েই রইল, কিন্তু সে পথে প্রিয়জনের আনাগোনার প্রয়োজন গেল ফুরিয়ে, তালবনের মাটির টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সূর্য্যাস্ত দেখবার সখ শশীর জীবনে সত্যিই কি আর আসবে না? দীর্ঘ ন-বছর ধরে প্রতিটি মুহূর্ত যে দুর্জয় প্রেমের জন্য কুসুমের দেহমন উদ্বেল হয়ে ছিল, সে মুহূর্ত যখন সত্যিই এল সেই চপল রহস্যময়ী কুসুম সেদিন আবিষ্কার করল সে আর বেঁচে নেই। অপরূপ সুন্দরী সেনদিদি, গোপাল, নন্দলালের পাপ-জমা করা দেহের অধিকারিণী বিন্দু, কুমুদ, মতি—এদের রহস্যঘন জীবনের অবগুণ্ঠন মোচন করবে কে? পুতুলনাচের ইতিকথা এই বিপর্যস্ত জীবন্ত পুতুলদের হাসিকান্নার মর্মান্তিক অভিনয় আর তাদের প্রেরণাহীন যান্ত্রিক জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কাগজে নোটবইয়ে বিভিন্ন মন্তব্য, কোনো ভাবনা, লেখার খসড়া ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। যুগান্তর চক্রবর্তীর সম্পাদনায় সেই অপ্রকাশিত লেখাগুলির কিছু অংশ, প্রাসঙ্গিক সূত্রনির্দেশসহ, নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত এক্ষণ পত্রিকা ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। লিখনগুলি বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মন্তব্য, পারম্পর্যহীন, কলাঙ্কহীন, লেখক-স্বাক্ষরিত এবং শিরোনামযুক্ত। তারই একটিতে আছে পুতুলনাচের ইতিকথা সম্পর্কে 'আত্মসমালোচনা'-শীর্ষক লেখকের নিজস্ব অভিপ্রায় ও বিষয়বস্তুর ভাষ্য :

> পুতুলনাচের ইতিকথা সম্পর্কে অনেক আলোচনা, সমালোচনা ও মতপ্রকাশ ঘটেছে। নবতম সংস্করণে বইটির পিছনে বিজ্ঞাপনাত্মক প্রচারমূলক কয়েক লাইন লেখাও দেওয়া হয়েছে।
>
> আমি কখনো প্রতিবাদও করিনি, প্রশ্নও করিনি। ঘরোয়া সমালোচনা, বইয়ের পিছনে একজন কাঁচা [বিজ্ঞাপন] বিশারদের ধাপ্পাবাজি ছাপানো—এসব কন্ট্রোল করতে পারতাম। কিন্তু করিনি। কন্ট্রোল না করে সাধারণ পাঠক এইসব বিভ্রান্তিমূলক প্রচার সত্ত্বেও বইটা কিভাবে নেয় জানা দরকার ছিল।
>
> আলোচনা, সমালোচনা, মতামত, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি এতকাল নীরবে অনুধাবন করে এসে এবার আমার আত্মসমালোচনা প্রকাশ করবার তাগিদ ও প্রয়োজন উপলব্ধি করেছি।
>
> বইটা নয়—বইয়ের নামটা বিভ্রান্ত করে দিয়েছে সমালোচক থেকে বইটা যাতে বেশি বিক্রি হয় সেই উদ্দেশ্যে বইয়ের পিছনের বিজ্ঞাপনটির লেখককে পর্য্যন্ত।
>
> পুতুলনাচের ইতিকথা? তবে আর কথা কি, মানিকবাবু মানুষকে পুতুল বানিয়েছেন, ভাগ্যের দাস বানিয়েছেন।
>
> এটা হল বিচারকদের রায়।
>
> যারা বিচার করে না, যারা আজ বিশ বছর ধরে বইটাকে জীবন্ত রেখেছে, তারা টের পায় এ বইখানা মানুষকে যারা পুতুলের মত নাচায় তাদের বিরুদ্ধে দরদী প্রতিবাদ।
>
> প্রচণ্ড বিক্ষোভ নয়, স্থায়ী দরদী প্রতিবাদ।
>
> শিশু পুতুলের সঙ্গে খেলা করে। শাস্ত্র ...য় না জানলেও সে জানে কোনটা পুতুল কোনটা মানুষ।
>
> সামন্ততান্ত্রিক অবস্থায় হাবুডুবু খেতে খেতেও এতগুলি মানুষ চেষ্টা করছে সে অবস্থাকে অতিক্রম করতে—কুড়ি বছর আগের বাংলা দেশে যখন সামন্ততন্ত্র প্রধানসমস্যা বলেই গণ্য হত না, তখন মানুষের সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ, কিছু মানুষের হাতে পুতুল হবার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ, স্লোগানের বদলে সাহিত্যসৃষ্টির মাধ্যমে রূপ নিয়েছে।
>
> আমি ভাবছি, হায়! যদি বইটার একটা ভূমিকা দিয়ে লিখে দিতাম মানুষকে কিভাবে পুতুল করা হয়েছে এটা তারই উপন্যাস—আমার বইখানার পিছনে হয়তো প্রচারক আমাকে ভাগ্যবাদী ঘোষণা করতেন না।
>
> কত বোকামিই করেছি।

পরিচয় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৯৩৬ সংখ্যায় 'পুতুলনাচ : মহলা থেকে মঞ্চ' নামক একটি প্রবন্ধে চিত্তরঞ্জন ঘোষ পুতুলনাচের ইতিকথা-র ভারতবর্ষে প্রকাশিত রূপের সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত পাঠাংশের পরিবর্তনগুলি চিহ্নিত করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন :

> এই মাজাঘষার পরেও দু-একটি জিনিস তাঁর চোখ এড়িয়ে গেছে। যেমন, কুসুমের বাবার নাম কখনো লেখা হয়েছে অনন্ত, কখনো ভুবনেশ্বর। কৃপানাথ কবিরাজকে বিপিন নামেও উল্লেখ করা হয়েছে। [দ্রষ্টব্য : পরিচয়, পৃ ৪১]
>
> উপসংহারে বলা যায়, পত্রিকার পাঠ থেকে বইয়ের পাঠের সংস্কারে দুটি দিকে মানিক বিশেষ নজর দিয়েছেন। (১) ভাষা, চরিত্র ইত্যাদির ক্ষেত্রে উপন্যাসের সৌকর্যসাধন। (২) নিয়তি, ঈশ্বর, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর চিন্তাগুলিকে স্পষ্টতর করার প্রয়াস।
>
> দুটি পাঠ পাশাপাশি রাখায়, আমরা মানিকের সৃষ্টিশীল মনের ভিতর-মহলে কিছুটা দৃষ্টিপাত করতে পারি, একমেটে বা দোমেটে থেকে রঙে-রূপে পুতুলের রূপান্তরটি কিছুটা প্রত্যক্ষ করতে পারি। মানিকের ইতিকথা পাঠের প্রাথমিক পদক্ষেপ এটি। [দ্রষ্টব্য : পরিচয়, পৃ ৫৪]

এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমিতে সংরক্ষিত পুতুলনাচের ইতিকথা-র পাণ্ডুলিপির সঙ্গেও প্রকাশিত উপন্যাসের বহুবিধ পরিবর্তন কৌতূহলজনক। পাণ্ডুলিপিতে হারু ঘোষের পুত্রবধূর এবং পরানের স্ত্রী কুসুমের যে চরিত্রটি আছে তার সঙ্গে শশীর প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। প্রকাশিত উপন্যাসেও তাই আছে। কিন্তু উপন্যাসে দেখি, নয় বছর অপেক্ষা করার পর শশীর কাছ থেকে যথোচিত সাড়া না পেয়ে, কুসুম তার পিতার সঙ্গে গাওদিয়া গ্রাম ত্যাগ করেছে। পাণ্ডুলিপিতে আছে কুসুম একটি পুত্রের জন্ম দিয়ে প্রসবকালীন জটিলতা ও শারীরিক দুর্বলতার ফলে মারা গেছে। কুসুমের সদ্যোজাত সন্তানকে নিয়ে এসে শশী তার সম্পর্কিত বোন কুন্দকে দিয়েছে তাকে মানুষ করার ভার ও তার বিনিময়ে কুন্দকে একটি কণ্ঠহার প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে।

প্রকাশিত উপন্যাসেও কুন্দ গলার হার পাওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়েছে কিন্তু সে প্রতিশ্রুতি পেয়েছে শশীর পিতা গোপালের কাছ থেকে যামিনী কবিরাজের স্ত্রী ও সেনদিদি নামে পরিচিত সুন্দরী মহিলার সন্তানকে পালন করার জন্যে। উপন্যাসে সেনদিদির এই জাতকটি গোপালেরই অবৈধ সন্তান, যার জন্মলগ্নেই সেনদিদির দেহান্ত হয়। পাণ্ডুলিপিতে সেনদিদির প্রসঙ্গ অল্পই আছে। তবে পাণ্ডুলিপিটি খণ্ডিত।

উপন্যাসে গ্রামের জমিদার শীতলবাবুর ভাই হিসেবে বিমলবাবুর সামান্য উল্লেখ আছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপিতে বিমলবাবুর এক অবিবাহিতা কন্যারও উল্লেখ আছে। এই মেয়েটির সঙ্গে শশীর কয়েকবার দেখা হয়। কারণ জমিদারের অনুরোধে শশী মেয়েটির চিকিৎসা করেছিল। এই সান্নিধ্যকে কেন্দ্র করে লেখক পাণ্ডুলিপিতে শশীর কিছু মানসিক চিন্তাতরঙ্গের উল্লেখ করেছেন, যা মুখ্যত ব্যাধিঘটিত। কিন্তু উপন্যাসে এ সব বর্জিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রথমাংশে নবীন নামের এক ধীবর ও তার বালক পুত্রের সামান্য উল্লেখ থাকলেও পাণ্ডুলিপিতে উভয়ের প্রসঙ্গই বিস্তৃততর। নবীন সেখানে দরিদ্র এক গ্রামবাসীর প্রতিনিধি, শশী তার চিকিৎসা করেছে, তার দারিদ্র্যে সাহায্যও করেছে। প্রকাশিত উপন্যাসে শশীর নাগরিক বন্ধু কুমুদ একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে কলকাতায় শশীর বিচারবুদ্ধি ও জীবনমনস্কতার সূক্ষ্মতর বোধ জাগিয়েছে। শশী তাকে শিক্ষকের সম্মান দিয়েছিল। প্রকাশিত উপন্যাসে কুমুদ প্রকৃতপক্ষে এক আত্মকেন্দ্রিক অন্তঃসারশূন্য, নাগরিক বিলাস ও চাকচিক্যে অভ্যস্ত। প্রতারণাপ্রবণ চরিত্র যদিও খুব বড়ো মাপের কোনো অপরাধ সে করেনি। উপন্যাসে কুমুদ গাওদিয়া গ্রামে এসেছে। গ্রামের মেয়ে ও পরানের বোন মতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ও তার যাত্রার রাজপুত্রের সাজে মতিকে মোহিত করেছে। মতিকে বিয়ে করে শহরে নিয়ে এসেছে কুমুদ। উপন্যাসে মতি-কুমুদ উপাখ্যানটি যথেষ্ট জরুরি। কারণ এর

ভিতর দিয়ে শশী-চরিত্রের প্রকৃত শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল রূপটি কুমুদের সঙ্গে প্রতিতুলনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কিন্তু পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী শশীর কলকাতার বন্ধু কুমুদ গ্রামে শশীর অতিথি হলে তার সেবা করেছে কুন্দ। কুমুদ ও মতির একটি স্বতন্ত্র কথাবৃত্ত পাণ্ডুলিপিতে খণ্ডিতাকারে আছে। এই জাতীয় বহু বৈষম্য সত্ত্বেও পাণ্ডুলিপি ও উপন্যাসের চরিত্রলিপি মোটামুটি একই। তবে উপন্যাসের একটি কেন্দ্রীয় ঘটনা যাদব চক্রবর্তীর উইলের শর্তানুযায়ী গাওদিয়া গ্রামে শশীর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার ঘটনা পাণ্ডুলিপিতে অনুপস্থিত। সব মিলিয়ে মনে হয় পাণ্ডুলিপির প্রথম পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ উপন্যাস রূপ পাওয়ার কালে ক্রমশ সংহততর ও আরও নিটোল প্লট হয়ে উঠতে পেরেছে।

পুতুলনাচের ইতিকথা-র একটি দ্বিতীয় খণ্ডের পরিকল্পনা ছিল লেখকের। পাণ্ডুলিপিতে তার প্রমাণ আছে। যদিও শেষ পর্যন্ত তা বাস্তবায়িত হয়নি। প্রস্তাবিত এই দ্বিতীয় খণ্ডের ছিন্ন একটি পৃষ্ঠার সূচনাংশ এইরূপ

> আবার সেই শশীর কাহিনী? গ্রামের ডাক্তার যে শশীর সমস্ত বড় বড় স্বপ্ন আর কল্পনা ঝলসে গিয়েছিল খালের ধারে বাজ-পড়া গাছটার মত? গ্রাম্য জীবনের সংকীর্ণ পরিসরে দায় আর দায়িত্বগুলি পালন করে যাওয়া ছাড়া জীবন থেকে মুছে গিয়েছিল আশা আনন্দের রঙ?
>
> কেন নয়।
>
> শশী তো আর পুতুল নয় মানুষ। অদৃশ্য শক্তি বা অন্য অন্য মানুষের আঙুলে বাঁধা সূতোর টানে সত্যই তো মানুষ অচেতন পুতুলের মত নাচে না। মানুষের বেলা ওই উপমা তো নিছক কথার কথা, অনেক কিছু জড়িয়ে অবস্থার চাপে বড় বেশী কাবু মানুষের অবস্থার নিছক একটা বর্ণনা মাত্র।
>
> নইলে শশীর কি দরকার ছিল বাপের ফেলে যাওয়া সংসারের দায়, হাসপাতালের দায়, গাঁয়ের চাষাভূষো মানুষগুলির কি চিকিৎসার দায় থেকে আরও অনেক রকম দায় ঘাড়ে নেবার—তার নিজের স্বপ্ন আর কল্পনাকে যা সার্থক করে না?
>
> পুতুলের কি দায়িত্বজ্ঞান থাকে।

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)—এর উদ্যোগে উপন্যাসটির ইংরেজি অনুবাদ The Puppets' Tale নামে প্রকাশিত হয় (১৯৬৮), প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমি। অনুবাদক শচীন্দ্রলাল ঘোষ ও সম্পাদক আর্তুর আইসেনবার্গ। উপন্যাসটি চেকভাষাতেও অনূদিত হয়েছিল। ইংরেজি অনুবাদ সম্পর্কে মন্তব্য আছে ·

'The Puppets' Tale' belongs to the mainstream of world literature in its sources of conflict . father against son; education against tradition ; village against city ; man against fate ; and the inexhaustible enigma of woman and man. In the context of Indian literature, 'The Puppets' Tale' is yet another outstanding example of the enormous, amalgamative power of India through the ages.'

অনুবাদকের অভিমতও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য .

'It is interesting to note that among the Bengali novels chosen for translation by UNESCO, two written by two contemporaries deal with life in the village—the present novel, Putul Nacher Itikatha (literally, 'Annals of the Dolls' Dance) by manik Bandyopadhyaya, and Pathe Panchali...by Bibhuti Bhusan Bandyopadhyaya. Although each is, in its own way, a great human document, it is difficult to conceive of a greater contrast in outlook and temperament. Manik's book is, so to say, a naturalist's report on the behaviour of human ants, while Bibhuti Bhusan's romantic paean to the unconquerable spirit of man in the face of all odds. Not that the latter took less note of the stark realities of life around him than the former ; but while Manik looked levelly about the horizon and saw the dusty earth and people ; the other looked up above the tree-line and beheld the stars.'

[গ্রন্থালয় প্রকাশিত মানিক গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ডের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী]

উল্লেখযোগ্য, উপন্যাসটির চেক, হাঙ্গেরীয় ও সুইডিশ ভাষাতেও অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়।

পুতুলনাচের ইতিকথা লেখকের অন্যান্য রচনার তুলনায় বোধ হয় সর্বাধিক ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। গুজরাটি (মাটিনা মহেল, অনুবাদক শ্রীকান্ত ত্রিবেদী, ১৯৫৩)। হিন্দি (কটপুতলিয়োঁকা ইতিহাস, অনুবাদ প্রবোধকুমার মজুমদার, ১৯৫৮)। তেলেগু (জীবনললিতা, অনুবাদক এম সুরি, ১৯৬০)।

সম্পাদকমণ্ডলী

পরিশিষ্ট

দিবারাত্রির কাব্য : আদি পাণ্ডুলিপি

সম্পাদনা যুগান্তর চক্রবর্তী

পাঠনির্দেশ

‘দিবারাত্রির কাব্য’র আদি পাণ্ডুলিপির মোট একচল্লিশটি পৃষ্ঠা, পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাক্রম অনুযায়ী, মুদ্রিত হল। পাণ্ডুলিপিটি ধারাবাহিকতাহীন এবং স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ-- শুরুর অংশ ও মাঝে-মাঝে অনেক পাতাই পাওয়া যায়নি। ধারাবাহিক বা বিচ্ছিন্ন প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রেই, মুদ্রিতপাঠের শুরুতে পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে।

পাণ্ডুলিপির ২-সংখ্যক পৃষ্ঠা এবং ৫০-৫১ পৃষ্ঠার শেষাংশ, প্রচুর পাঠভেদ-সহ, প্রচলিত ‘দিবারাত্রির কাব্য’র (লেখাপড়া সংস্করণ : ১৩৭৪) যথাক্রমে ১০৮-১০৯ এবং ৭০-৭৪ পৃষ্ঠার প্রাথমিক লিখন। বাকি পৃষ্ঠাগুলি উপন্যাসটির আদি পাঠ। আদি পাণ্ডুলিপি শুরু হয়েছে ৬৫-সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে।

পাণ্ডুলিপিটি অতিশয় জীর্ণ—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে এমনই জীর্ণ ও ছিন্নভিন্ন যে, পাঠোদ্ধার কঠিন। এরূপ তিনটি ক্ষেত্রে লাইন কয়েক উদ্ধার করা যায়নি। অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে, কিছু-কিছু অস্পষ্ট বা বিলুপ্ত শব্দ, অনুমানের উপর নির্ভর করে, [ ] বন্ধনীর ভিতর দেওয়া হল।

মুদ্রিত পাঠের বানান মূল পাণ্ডুলিপির অনুরূপ। শুধু অর্থবোধের সুবিধার জন্য যতিবিন্যাসের কিছু-কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে।

আদি পাণ্ডুলিপি

পৃ ২

আনন্দ হঠাৎ বেমানান শ্রান্তস্বরে বলে, 'কী বৃষ্টিই নেমেছে। সমুদ্রটা পর্য্যন্ত বোধ হয ভিজে গেল।'

হেরম্ব কথা বলে না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকে। বর্ষা নামলে ঘরে যদি মানুষের মন না বসে মন তবে নিরুপায়। অসহযোগী চিত্তে তার স্মৃতির আবির্ভাব হয়। সুপ্রিয়ার কাছে যাওয়ার সময় রাঁচি ও হাজারিবাগের মাঝামাঝি পথে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে সে এক অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছিল, একটি অতুল অচঞ্চল মৃত্তিকাসাগর। পথের সেই স্থানটির উচ্চতা কে যেন মেপে ঠিক করে রেখেছিল, দিগন্তপ্রসারী সমতলভূমি এত নীচে নয় যে ধোঁয়াটে দেখাবে, আবার এত কাছেও নয় যে বৃক্ষ বন্ধুরতা চোখে পড়বে। সুপ্রিয়ার চেয়ে পথে কুড়ানো সেই পার্থিব রূপের ছবিই হেরম্বের বেশী মনে পড়ে।

কয়েকটি বিশিষ্ট অবসরে সুপ্রিয়ার কথাও সে ভাবে। দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবৃত্তির মত সুপ্রিয়ার চিন্তা মাঝে মাঝে এক বিচিত্র কারণে তার প্রয়োজনীয় মনে হয়। সুপ্রিয়ার কথা মনে পড়ার আগে তার মধ্যে একটা আশ্চর্য্য মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে চলে। এই বাড়ী মন্দির ও বাগানের পরিধির ভিতরে সে যতক্ষণ থাকে পর্য্যায়ক্রমে তীব্র সতীক্ষ্ণ আনন্দ ও মূর্ছামগ গাঢ় বিষাদে ততক্ষণ সে এমনি আচ্ছন্ন থাকে যে তার সমগ্র চেতনা আনন্দ ও আনন্দের সম্পর্কিত ছোট বড় প্রধান অপ্রধান ঘটনাবলীকে সহজে অতিক্রম করে যেতে পারে না। পথে বেরিয়ে অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে সে যখন সহরের প্রান্তবর্ত্তী সাদা বাড়ীটির কাছে পৌঁছায় তখন থেকে সুরু করে তার মন ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সে স্পষ্ট বুঝতে পারে একটা কাল্পনিক রঙীন স্তিমিত আলোর জগত থেকে সে পৃথিবীর দিবালোকে নেমে আসছে। ধূলিময় গেরুয়া রঙের পথ, পথের জনতা, দুদিকের দোকান ও বাড়ীঘর তার কাছে ফোকাস-না-করা দূরবীণের দৃশ্যপট যেমন ঝাপসা হয়ে থাকে তেমনি অস্পষ্ট হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সব উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে। পৃথিবীতে সে যে একা নয়, শোণিত-সুরা সন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে জীবনের চিরন্তর ও অনভিনব সুখ দুঃখে বিচলিত হয়ে অসংখ্য নরনারী যে তাকে ঘিরে আছে।

[অসম্পূর্ণ বাক্যে পৃষ্ঠাটি শেষ হয়েছে, পরের পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি।]

পৃ ৫০-৫১

বাইরে। মানুষের স্তর বলতে আমি কি বোঝাতে চাই তোমাকে বুঝিয়ে বলি। আমার সামনে তুমি আছ আর তোমার থাকাটা আছে। তুমি একস্তরের, তোমার অস্তিত্ব আর এক স্তরের। তুমি উঠে চলে গেলেও তুমি যে এই সিঁড়িতে বসেছিলে এটা চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও একটা সত্যের সৃষ্টি হবে যে তুমি এখানে বসে নেই। এটাও তোমার অস্তিত্বের স্তরের সত্য, কিন্তু বিরুদ্ধধর্ম্মী। এ দুটো সত্যকে তুমি মেলাতে পার?'

'না। আমার মাথা ঘুরছে। তবে আমার মনে হচ্ছে অস্তিত্বের স্তরে যখন স্থান নেই তখন আমার থাকা না থাকাটাকে সিঁড়িতে বসে থাকা না থাকা বলে ধরা চলে না।'

হেরম্ব খুসী হয়ে বলে, 'কে বলে তোমার মাথা ঘুরছে। তুমি ঠিক বুঝতে পারছ। আচ্ছা স্থানকে যদি বাদ দিই? কোথায় কিভাবে এসব বাদ দিয়ে যদি ধরি তুমি আছ আর তুমি নেই এই দুটো সত্যকে?'

'কিন্তু আমি যদি আছি তা হলে আবার না থাকব কি করে?'

'তুমি সত্যই আছ?'

'নিশ্চয়। না থেকে যাব কোথায়?'

'তাই শুনতে চাচ্ছিলাম। কি করে যাবে কোথায় বললে? না থেকে? তোমার না থাকাটাও তা হলে মিথ্যা নয় আনন্দ?'

আনন্দ বিহ্বল হয়ে বলল, 'এ আবার কি হ'ল!'

'হল এই। তোমার থাকা তোমার না থাকার উপরে নির্ভর করে। ওর দুটোই সত্য।'

'তা হলে দুটো একস্তরের সত্য নয়।'

'না। কিন্তু দুটো সত্যই তোমার অস্তিত্বের। তোমার অস্তিত্ব হ'ল তুমি আছ এই সত্যটা—কিন্তু তোমার অস্তিত্বের স্তর ছাড়িয়ে অন্য এক স্তরে তোমার অস্তিত্বেরই একটা সত্য আছে। মানুষেরও তাই আনন্দ। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য আছে কিন্তু সেটা মানুষের জীবনে নেই। আবার মুস্কিল এই, এই উদ্দেশ্য যেখানে আছে সেখানে মানুষের জীবন নেই। বুঝতে পারলে?'

আনন্দ বলল, 'বুঝতে পারব? চোখে ধোঁয়া দেখছি—মাথা বন বন করে ঘুরছে, বুঝতে পারব কি করে? কোনোদিক দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এনে আপনি মানুষের সর্ব্বনাশ করে ছেড়েছেন এইটুকু শুধু বুঝতে পারছি।'

'তুমি তা হলে কি অন্ততঃ এটা বুঝতে পারছ তো?'

'কি? বোকা? রোমিও জুলিয়েটের প্রেম থেকে আমার বোকামিতে এসে পৌঁছেছেন। আর কেন, এইখানেই থেমে যান।'

'বেশ, থামলাম। কিন্তু তুমি আমাকে অবাক করে দিয়েছ আনন্দ। কোন দার্শনিক তত্ত্বের স্তর থেকে আমাকে কোথায় নামিয়ে নিয়ে এলে।'

আনন্দ মৃদু হাসল।

'নামানোই যে আমাদের ধর্ম্ম, তা জানেন না?'

[আনন্দের উল্লিখিত উক্তির সঙ্গেই ছিল নিম্নোক্ত অংশটি—পাণ্ডুলিপির আড়াই লাইন লেখা, নীল পেনসিলের লম্বা দাগ টেনে কেটে দেওয়া :

আকাশের চাঁদ গাছের কোকিল সব কবির মনে নামিয়ে নিয়ে আসি। আবার আমরাই কবিকে নামিয়ে দিই নরকে। আকাশের চাঁদ আর গাছের কোকিল তা হ'লে কোথায় পৌঁছোলো ভাবুন।

এরপর, পূর্বানুক্রমিক পরবর্তী অনুচ্ছেদ।]

কথা বলার উত্তেজনায় হেরম্বের সাময়িক বিস্মৃতি এসেছিল। শব্দের মোহ তার মন থেকে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দের মোহকে স্থানচ্যুত করেছিল। জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করে পুনরায় আনন্দের সান্নিধ্যকে পূর্ণভাবে অনুভব করে সে এই ভেবে বিস্মিত হয়ে রইল যে শ্রোতা ভিন্ন এতক্ষণ আনন্দ তার কাছে আর কিছুই ছিল না। শ্রবণশক্তি ছাড়া আনন্দের আর কোন বিশেষত্ব সম্বন্ধেই সে সচেতন ছিল না, আনন্দকে এতক্ষণ সে এমনি একটা সাধারণ পর্য্যায়ে অসঙ্গতভাবে ফেলে রেখেছিল। হেরম্ব এটাও বুঝতে পারে, তার কাছে আনন্দ জীবনের ব্যাখ্যা শুনতে ইচ্ছুক নয়। জীবন কি জীবনের উদ্দেশ্য আছে কি নেই, এসব তত্ত্বকথায় আনন্দের বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। অন্যসময় বিশ্লেষণ ওর ভাল লাগে কি না, জানবার উপায় নেই, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তার মুখের বিশ্লেষণ ওর কাছে শাস্তির মত লাগছে। তাকে থামিয়ে দিয়ে আনন্দ স্বস্তি পেয়েছে। সে জীবনের সুখ-দুঃখের কথা বলুক, প্রেমকে ব্যাখ্যা করুক, আনন্দ মন দিয়ে শুনবে কিন্তু সেইখানেই তার ধৈর্য্যের সীমা। সমস্ত অনুভূতির সমন্বয় করা জীবনের সমগ্রতাকে সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, ভাবতে চায় না।

তাই হোক। এই ভাল।

[অংশটি শুরু হয়েছে পূর্ববর্তী বাক্যের শেষ শব্দ দিয়ে— আগের পৃষ্ঠাটি নেই। বর্তমান অংশ পর্যন্ত পাণ্ডুলিপির পাঠ প্রচলিত গ্রন্থের সঙ্গে সম্পর্কিত।]

পৃ ৬৫-৬৬

প্রথমে শেষ অপরাহ্ণ তারপর গোধূলি তারপর সন্ধ্যা এবং রাত্রি। বিশেষভাবে সচেতন থাকিয়াও তিনটি সন্ধিক্ষণের একটিকেও হেরম্ব ধরিতে পারে নাই। গোধূলি যখন আসিল অপরাহ্ণ তখন নাই, সন্ধ্যাকে পাইয়া গোধূলির সন্ধান ভুলিতে হইল। সন্ধ্যাই রাত্রি।

জীবনও নাকি এইপ্রকার। প্রৌঢ় ব্যক্তিরা বলিয়া থাকেন।

এমনকি, পথ সংক্ষেপ করিতে গিয়া পথও শেষ পর্য্যন্ত তাহারা হারাইল। রাত্রিকালে শুধু একটা লণ্ঠন হাতে আকাশের অচেনা তারার নীচে মাঠের আল আর শুকনো ঝরনার জঙ্গল ও পাথর ভরা বুক দিয়া চলিতে চলিতে

পালকীর [না, গাড়ীর?] মালিক আর কেদারের চাপরাসির মত পাকা লোকেরও [?] দিকভ্রম হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

[উল্লিখিত অংশের পর, অতিজীর্ণ পৃষ্ঠাটির মার্জিনে লেখা লাইন কয়েক অংশ এমনই অস্পষ্ট যে পাঠোদ্ধার করা যায়নি।]

গাড়ী পাওয়া গেল না। গাড়ী চলিয়া যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরে তাহারা ষ্টেসনে পৌঁছিল।

সকলকে বখশিস দিয়া বিদায় করিয়া হেরম্ব কাঁকর বিছানো নির্জ্জন প্লাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া রহিল। চাপরাসিকে আটকানো যাইত, কিন্তু ও বেচারা মানুষ, আজ সকালেই সে সাত মাইল দূরে একটা গ্রামে সমন জারি করিতে গিয়াছিল, তারপর এই এগার মাইল পথ হাঁটিয়াছে। তাছাড়া রাতারাতি ওয়েটিং রুম তৈয়ারী করিবার ক্ষমতা হাকিমের চাপরাসিরও নাই।

সঙ্গে সতরঞ্চি আছে, ছোট একটা বালিশ আছে, খাবার আছে, জল আছে, আকাশের নীচেই রাতটা একরকম কাটিয়া যাইবে। তাহার ভাবনা কি?

সে আপিসের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর বয়সের একটি শীর্ণকায় যুবক টেবিলের উপর বিছানা বিছাইতেছিল, ফিরিয়া তাকাইল।

'কি চান?'

'আমার চাওয়ার হিসেব শুনলে ভড়কে যাবেন মশায়। তাতে কাজ নেই, এখানে বিড়ি চুরুট কোথায় পাওয়া যায় তাই শুধু আমায় বলে দিন।'

'গ্রামে যান।'

'গ্রাম কতদূর?'

'তা হবে, মাইল দেড়েক হবে।'

'বিড়ি কেনার জন্য এতরাত্রে অতদূর হেঁটে যাব?'

'আমি তার কি জানি?'

'একটু বসা যাক, কি বলেন?' বলিয়া আহ্বানের অপেক্ষা না করিয়াই সে একটা টুলে বসিয়া পড়িল। বলিল, 'বিপাকে পড়ে বিড়ি খুঁজছি মশায়, নইলে বিড়ি আমি ছুঁই না। অন্য সময় হলে আপনাকে হাভানা চুরুট খাওয়াতে পারতাম, জামাইবাবুর ক্যাম্পে তিন দিন আটকা পড়ে যাওয়ায় চুরুটগুলি ফুরিয়েছে। জামাইবাবুকে চেনেন বোধ হয়? সোনারতির হাকিম কেদারবাবু।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, চিনি বৈকি! বিড়ি খাবেন? নিন্।'

হেরম্ব হাসিয়া বলিল, 'একটা? একটাতে কি হবে মশায়—সারারাতের খোরাক যে।'

সে গোটাচারেক বিড়ি দান করিয়া ফেলিল। লজ্জিতমুখে বলিল, 'আর নেই। পয়েণ্টম্যান খেতে গেছে, ফিরে এলে আনিয়ে দেব।'

হেরম্ব একটা বিড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

'ভাল নয় বিড়ি।'

'স্থানীয় জিনিস, যা পাওয়া যায়।'

'কলকাতা গিয়ে আপনাকে এক হাজার মুখপোড়া বিড়ি পাঠিয়ে দেব—খেয়ে দেখবেন, এও বিড়ি, সেও বিড়ি। নামটি বলুনতো—' নোট বুক বাহির করিয়া হেরম্ব নাম টুকিয়া নিল, 'ঠিকানাটা কি হবে? বাবু অবিনাশচন্দ্র রায়, ষ্টেসন মাষ্টার, বাহাইডা, বি. এন. আর—ব্যস্? গিয়েই পাঠিয়ে দেব।'

অবিনাশ বলিল, 'বিড়ি তবু এখানে পাওয়া যায়, জর্দ্দারই অভাব।'

'জর্দ্দা খান নাকি?'

'আমি খাই না, ওসব কুঅভ্যাস করি নি। বাড়ীর মধ্যে খান।'

আপিসের পশ্চাদ্‌ভাগটা দেখাইয়া হেরম্ব বলিল, 'ওই বুঝি বাড়ীর মধ্যে?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'কে কে আছেন?'

'স্ত্রী। বড় সম্বন্ধি এসেছিলেন, তা কাল তিনি চলে গেছেন।'

'সুখেই আছেন, কি বলেন? অপর্যাপ্ত অবসর, নির্জ্জন নিঃশব্দ নীড়, শুধু প্রিয়া আর আপনি—চমৎকার, এ্যাঁ?'

'যাচ্ছেতাই।' বলিয়া অবিনাশ ফস্ করিয়া একটা বিড়ি ধরাইয়া ফেলিল।

'বাপের বাড়ী যাবেন মশায়, বাপের বাড়ী! এখানে ওর মন টেকে না। এসেছেন এদিকে সাতদিনও হয় নি।'

রাগে অবিনাশ গজ গজ করিতে লাগিল, 'এখানে কি সাধে বিছানা পাতছি, এই শক্ত টেবিলের ওপোর? দিনরাত ফোঁস ফোঁস করে কান্না আর সহ্য হয় না।'

'তা দিন না বাপের বাড়ী পাঠিয়ে? ছেলেমানুষ—'

'খুকী মশায় খুকী—কচি পটোল। ষোল বচ্ছর বয়েস তো হয়েছে এদিকে? আপনাকে কি আর বলব দাদা, আমার অসহ্য হয়েছে।'

বোঝা গেল কলহটা টাটকা, সম্ভবতঃ গাড়ী আসার আগেই ঘটিয়াছিল, এ গাড়ীতেই হয়ত বৌটির বাপের বাড়ী যাইতে হয়, গাড়ীর শব্দে বুকের মধ্যে কেমন করিয়া ওঠায় কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিয়াছিল খেয়াল থাকে নাই—অবিনাশ বড়ই অপমান বোধ করিয়াছে। গাড়ী পাশ করাইতে তাহাকে তখন প্ল্যাটফর্মে আসিতে হইয়াছিল, সুতরাং ঝগড়াটা না মিটিয়া অভিমানে পরিণত হইয়াছে। তাই আপিস ঘরে বিরহশয়নের ব্যবস্থা।

হেরম্ব বলিল, 'দেখুন, ওই বয়সে মেয়েদের বাপের বাড়ীর দিকেই টানটা বেশী থাকে। আমার বৌএর কথাই ধরুন, আমি বলি ভালবাসার কথা, সে তার বাপের

[অসম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যেই অংশটি এখানে শেষ হয়।]

পৃ ৮৪

হেরম্ব দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাহার গলা কাঁপিয়া গেল।

'তোমায় নিয়ে গিয়ে ওরা কি করেছিল?'

'নিয়ে তো যেতে পারে নি। মুখের কাপড়টা সরে যেতেই আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। মাঠ দিয়ে দুজন লোক যাচ্ছিল, তারা ছুটে এল। আমায় দড়াম করে ফেলে ডাকাতগুলি পালিয়ে গেল।'

হেরম্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তাই বল! অমন করে বলতে আছে? বুকের রক্ত শুকিয়ে উঠেছিল।'

আনন্দ এই ভালবাসা বুঝিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল।

হেরম্ব বলিল, 'তারপর কি হ'ল?'

'সেই দুজন লোক বাবার ভক্ত। ডাকাতদের একজনকে তারা চিনতে পেরেছিল, পুলিশে খবর দেবার জন্য বাবাকে তারা কত বল্লে, বাবা রাজী হল না। বলল, আমরা সন্ন্যাসী মানুষ, বিবাদ করা আমাদের উচিত নয়।'

'কিন্তু ওকি বিবাদ আনন্দ?'

'বাবা বড় শান্ত মানুষ, হাঙ্গামাকে বড় ডরান।'

সোজা প্রান্তর অতিক্রম করিয়া তাহারা চলিতেছিল, পাশাপাশি, বন্ধুর মত, আত্মীয়ের মত,—একজন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সহুরে ভদ্রসন্তান, অন্যজন কুলত্যাগিনী বিধবার ছেলে অথবা মেয়ে অথবা দুয়েরি সমন্বয়, কিশোর সন্ন্যাসী, একান্ত ছেলেমানুষ। হেরম্বের মন কেমন করিতে লাগিল। তার দিকের উন্মত্ত আবেগ অপরদিকে কোন সাড়াই যে জাগায় নাই হঠাৎ এটা তাহার খেয়াল হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে একতরফা প্রেমের দাম কমিয়াছে, আবেগে মন্দা পড়িয়াছে,—ঘোর স্বার্থপর মানুষের মন। সমস্ত জগৎ যাহাকে সেরা পাগলামী বলিয়া কীর্ত্তন করিবে এতক্ষণ অবাধে তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার তরে এইটুকু লাভ হইল যে তাহার উপস্থিতির সুযোগে আনন্দ মধ্যরাত্রে ঝরনার ধারে বেড়ানোর আনন্দ সংগ্রহ করিয়া নিল মাত্র, কাল তাহাকে স্মরণ রাখার প্রয়োজনও আর ওর থাকিবে না? কেনই বা থাকিবে? যাযাবরের জীবন যাপন করিতে করিতে তাহার মত কত মানুষের সঙ্গেই তাহার ভাব হইয়াছে—তাহার মত মুগ্ধ হইয়াছে সকলেই। তাহাকে আনন্দ বিশেষভাবে গ্রহণ করিবে কেন? হয়ত তাহার সঙ্গেই আনন্দ প্রথম মাঝরাত্রে ঝরনা দেখিতে চলিয়াছে, কিন্তু সেজন্য কিছু আসিয়া যায় না। এজন্য সে বড়জোর কেবল 'বেশ লোক', তার বেশী আর কিছুই নয়।

পৃ ৮৬-৯৪

ওকে বুঝিতে হইবে।

'আমি মরে গেলে তুমি কি কর আনন্দ?'

'আমি? আমি একটু কাঁদি।' এই বলিয়া আনন্দ হাসিয়া যোগ দিল, 'মিছিমিছি মবার কথা কেন বলছেন? কপালে লেখা না থাকলে কেউ মরে না!'

'কপালে লেখা আছে কি নেই কি করে জানলে?'

একটু ভাবিয়া আনন্দ আশ্চর্য্য হইয়া গেল,—'ঠিক্ তো!'

ঝবনার পবিষ্কার অংশে তাহাবা নামিয়াছিল, কিছুদুব হাঁটিবার পব ঝোঁপ জঙ্গল আবম্ভ হইল, আব খানিক দূরে গাছেব ডালে আব লতায় ঝরনাকে ঢাকিয়া দিযাছে।

'আব গিয়ে কাজ নেই আনন্দ।'

'আরও! ওব মধ্যে নিশ্চয় ভূত আছে!'

যেখানে নামিয়াছিল সেইখানে তাহারা ফিবিয়া আসিল। উপবে উঠিয়া আনন্দ বলিল, 'উঃ, পায়ে কাঁটা ফুটল!'

'দেখি?'

আনন্দ কাঁকবেব উপর বসিলে দেশলাই জ্বালিয়া হেরম্ব তাহাব পায়ে কাঁটা খুঁজিতে লাগিল। আনন্দকে স্পর্শ কবামাত্র তাহাব সর্ব্বাঙ্গ বোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

[পাণ্ডুলিপি দেখে বোঝা যায়, পৃষ্ঠাটি অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ পাতা।

নবম পরিচ্ছেদ

বেলা সাতটাব আগে হেবম্বের ঘুম ভাঙ্গিল না। তাহাব ঘুম কেহ ভাঙাইয়াও দিল না।

বাঁচিব গাড়ী চলিয়া গিয়াছে।

চোখ মেলিবার আগেই হেবম্ব টেব পাইল লোকজন অনেক আসিয়া জুটিযাছে। এবং বীতিমত বোদ উঠিয়াছে।

নির্ব্বাপিত ধুনীব সামনে মাতাজী ব্যাঘ্র চর্ম্মে আসীনা, পুণ্যস্তিমিত দুই আঁখি, মুখে অভয়-হাসা। সম্মুখে অর্দ্ধচক্রাকারে উপবিষ্ট কুড়ি বাইশটি নরনাবী। আনন্দ সেই পাথরটাতে চুপচাপ বসিয়া আছে। সে নবোদিত সূর্য্যকে দেখিতেছে, না মাতাজীর ছাই ও মাদুলি বিতরণ দেখিতেছে বুঝিবাব উপায় নাই।

হেরম্বকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া আনন্দ তাড়াতাড়ি কাছে আসিল। চুপিচুপি বলিল, 'আপনি মাব ভক্ত। সকলের আগে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করুন।'

'যদি না করি?'

'মা ভীষণ রাগ কববে।'

'এখনি প্রণাম কবব?'

'হ্যাঁ। ভোবে উঠেই গুবুমাকে প্রণাম করতে হয।'

'বোজ?'

'লোকজন থাকলে রোজ, নইলে ইচ্ছা হল করলেন, ইচ্ছা না হল না কবলেন, কিছু আসে যায না।'

'হুঁ' বলিয়া উঠিযা গিয়া হেরম্ব মাতাজীব পায়ের কাছে উপুব হইয়া পড়িল। মাতাজী মধুব কণ্ঠে বলিলেন, 'শুভ হোক। একরাত্রির সাধনার শ্রমেই বেলা পর্য্যন্ত ঘুমোলি বাবা? যাক্ যাক্, যেতে দে, ক্রমে সহ্য হবে। বেদেব চতুর্থ অধ্যায়টা আজ শেষ করতে হবে বাবা।'

বেদেব চতুর্থ অধ্যায আছে নাকি?

হেবম্ব সোজা হইয়া বলিল, 'যেমন আজ্ঞা কবেন।'

ভক্তমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া মাতাজী বলিলেন, 'বড় সুধীর, বড ভক্তিমান। অল্পদিনে সাধনমার্গে অনেকদুব এগিয়ে যাবে।'

বর্ষীয়সী এক বমণী কহিল, 'পাঁচটা পাশ করা ছেলে! কোন ভাগিমানীর বুক পুড়িয়ে নবীন সন্ন্যাসী হতে এসেছে কে জানে মা!'

'বৌটা চোখের জলে ভাসছে।'

একটি যুবতী বধূ পরপবুষকে এতটুকু লজ্জা না করিয়া ছয়মাসেব এক হৃষ্টপুষ্ট শিশুকে হেরম্বেব পায়েব কাছে শোয়াইয়া দিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাহার দুটি ছেলে হইয়াছিল, একবছরেব বেশী বাঁচে নাই। এই ছেলেটির জীবিত অবস্থাতেও সে তাই প্রতিনিয়ত তিন পুত্রের পুত্রশোক ভোগ করিতেছে—এতো মরিল বলিয়া। এখন, সাধু সন্ন্যাসীর আশীর্ব্বাদ কুড়াইয়া যদি বাঁচে।

মাতাজী বলিলেন, 'আশীর্ব্বাদ কর বাবা।'

হেরম্ব ছেলেটিকে কুড়াইয়া নিল। নাড়িয়া চাড়িয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবার ভান করিয়া বলিল, 'তোর এ ছেলে মরবে না যদি এক কাজ করিস।'

বৌটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'কি কাজ বাবা?'

'রোজ তেল মেখে স্নান করাবি, কমকম দুধ খাওয়াবি আর বেশী কোলে নিবি না।'

সে শিহরিয়া বলিল, 'অযত্ন করব বাবা?'

হেরম্ব তাহার চোখের উপরে ভ্রূকুটি করিয়া ছেলে নামাইয়া রাখিয়া ষ্টেসনের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল। খানিকদূর গিয়াছে, পিছনে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল আনন্দ ছুটিয়া আসিতেছে।

আনন্দের ছুটিবার ভঙ্গিটি বড় সুন্দর। পা যেন মাটিতে পড়ে না, হাত দুটি তালে তালে দোল খায়, রুক্ষ বাবরি চুল উড়িতে থাকে, সে যেন একটা কাঞ্চন চাঞ্চল্য, একটা গতি। কাছে আসিয়া আনন্দ হাঁপাইতে লাগিল। তার মুখখানি লাল হইয়া উঠিয়াছে।

একটু দম নিয়া একসঙ্গে হেরম্বকে সে অনেক কথা বলিল।

'এদিকে যাচ্ছেন কোথা? ঝরনায় মুখ ধুতে যাবেন বলে হাঁ করে বসে আছি, —সঙ্গে যেতাম, —আপনি এদিকে পালাচ্ছেন। আপনার গাড়ী তো চলে গেছে! যদি যেতে চান তো কাল সেই ভোরে! আমরা রাত্রের গাড়ীতে পুরী যাব।' বলিয়া প্রথম প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করিল, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

হেরম্ব বলিল 'যাচ্ছি একবার ষ্টেসনে। কাপড় জামা নিয়ে আসি।'

'মা বলছিল স্নান করে একেবারে গেরুয়া কাপড় পরবেন।'

হেরম্ব সবিস্ময়ে বলিল, 'তোমার মা কি আমাকে দলে ভেড়াতে চান নাকি?'

'আমি কি জানি?'

মাতাজীর অভিলাষ হেরম্ব কিছু কিছু টের পায় নাই এমন নয়। স্বামিজী কিছুই দ্যাখেন না, আপনার জপতপ নিয়া থাকেন, যত পাকা মেয়েমানুষই হন মাতাজী মেয়েমানুষই বটে। তাহাকে নানা প্রকার অসুবিধায় পড়িতে হয়। আনন্দ একান্ত শিশু, তাছাড়া যে কারণেই হোক তাহাকে মাতাজী এবং স্বামিজী পক্ষীশাবকের মত পক্ষপুটের আড়ালেই রাখিতে চান, বহির্জগতের সম্পর্কে সন্তানকে আসিতে দিতে তাহাদের যথেষ্ট আপত্তি। হেরম্বের মত একজন যুবককে সঙ্গী পাইলে মাতাজীর অনেক সুবিধা হইবে।

মাতাজী বোকা নন, তিনি ভাল করিয়াই জানেন সাধারণ ধর্ম্ম ভক্তিমান শিষ্যের মত হেরম্বকে পাওয়া যাইবে না, ধর্ম্মের খাতিরে কাহারো চেলা হইবার পাত্র সে নয়। আপনার লোকের মত, সঙ্গীর মত সে সঙ্গে থাকিতে পারে এইমাত্র। আনন্দ এবং উন্মুক্ত আকাশের নীচে এই যাযাবর জীবন যদি তাহাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিতে পারে তবেই সে থাকিবে, নহিলে কিছুই তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

এ সমস্তই হেরম্ব অনুমান করিয়াছিল। মাতাজীর মত ঝানু মেয়েমানুষ যে অকারণে সহসা তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিবেন নিজের স্নেহ আকর্ষণী শক্তি সম্বন্ধে হেরম্বের অতখানি ভুল ধারণা ছিল না। কালরাত্রে শুইয়া শুইয়া সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, ইহাদের ত্যাগ করিয়া যাওয়া অসম্ভব। মাতাজীর পাশে আনন্দ শুইয়াছিল, যতবার হেরম্ব চোখ মেলিয়া তাহাকে দেখিয়াছে, ততবারই তাহার মনে হইয়াছে যাওয়া সম্ভব নয়। কেনই বা যাইবে? কি আছে কলিকাতায়? মাতাজী যখন সঙ্গে রাখিতে চান, থাকাই সঙ্গত।

কিন্তু গেরুয়া সমস্যা তাহার মনে উদিত হয় নাই। মাতাজী যে আজই তাহাকে গেরুয়া পরাইতে চাহিবেন ইহা সে কল্পনাও করে নাই। গেরুয়ায় চমৎকার লজ্জা নিবারণ নয় [হয়?], বঙটাও স্নিগ্ধ, কিন্তু পুরোপুরি সন্ন্যাসী সাজা তাহার পক্ষে একটু কঠিন। যদি পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়? যদি কলিকাতায় একটি বিশিষ্ট পরিবারে খবর পৌঁছে যে হেরম্ব বিবাগী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুই আসিয়া যায় না অবশ্য, তবু—

গৃহী ভক্ত হিসাবে সঙ্গে রাখিতে মাতাজীর আপত্তি হইবে? সঙ্গে থাকার কথা উঠিলে বলিয়া দেখা যাইবে। মাতাজীর আপত্তি হওয়ার কারণ তো কিছু ভাবিয়া পাওয়া যায় না।

'আমার সঙ্গে ষ্টেসনে যাবে আনন্দ?'

'মাকে বলে আসি নি। যদি বকে?'

'বকবেন না। এসো।'

অবিনাশ খাতায় কি লিখিতেছিল, শশব্যস্তে উঠিয়া ঢিপ করিয়া আনন্দের পায়ের কাছে প্রণাম করিল। আনন্দ নমস্কার করিয়া বলিল, 'শুভমস্তু। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।'

হেরম্ব অনুমান করিল এটুকু মাতাজীর শিক্ষা।

অবিনাশ বলিল, 'কাজটুকু সেরেই মাতাজীকে প্রণাম করতে যাচ্ছিলাম, ছোটঠাকুর।—একেবারে অব্যর্থ ওষুদ দিয়েছেন! একেবারে অব্যর্থ!' হেরম্বের দিকে চাহিয়া 'জানেন দাদা, জানেন? রাত্রে বৌ কি বললে জানেন?'

হেরম্ব হাসি চাপিয়া বলিল, 'কি বললেন?'

'বললে, আর তোমার মনে কষ্ট দেব না, আর কাঁদব না, তুমি যা বলবে শুনব। শুধু তাই নয় দাদা! মাপ চাইল! বলল, আমায় মাপ কর!'

'বলল নাকি? আশ্চর্য্য তো!'

'প্রত্যয় হয় না মশায় সহজে! মাতাজীর মাদুলি—একেবারে অব্যর্থ। হাত জোর করে কাঁদ কাঁদ হয়ে কি করেই যে বললে দাদা, আমি বড্ড অপরাধ করেছি, আমায় মাপ কর, শুনলে থ হয়ে যেতেন!'

নারী নতি স্বীকার করিয়াছে তাহারি আনন্দে লোকটা ভরপুর! যেন ভয়ানক একটা কিছু কাণ্ড হইয়াছে। বৌ হাত জোর করিয়া মাপ চাহিয়াছে, স্বর্গ একেবারে হাতের মুঠায়!

বেশী বয়সে বিবাহ করিলে লোকে হাস্যকর রকম স্ত্রৈণ হয়, সেই হীন মনোবৃত্তি ইহার। ভালবাসা ও স্নেহের নামে নিজের বিকৃত পৌরুষের এ যে কি শ্রীহীন পরিচয় সে সংবাদ ইহারা রাখে না। খেলা নাই, হাসি নাই, জোরালো দাবী নাই, অল্পে বিদ্রোহ নাই, ব্যথা দিবার ও সহিবার ক্ষমতার মধ্যে প্রেমকে মধুর করিবার ধৈর্য্য নাই, শুধু আছে দাসত্ব! দুইটি নারী যেন স্বামীস্ত্রী হইয়াছে। একপক্ষ দয়া করিয়া ভালবাসিলেই অপরপক্ষ আত্মহারা।

যাহার দেহমন জয় করিয়া না নিলে কিছুই পাওয়া যায় না, তাহারি কাছে হাত পাতিয়া ভিক্ষা করা। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ।

অতএব ক্ষমাপ্রার্থী স্ত্রীর গর্ব্বিত স্বামী অবিনাশের প্রতি হেরম্বের কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হইল না। এ যদি বলিত বর্ষণক্লান্ত ভিজা আকাশে সূর্য্যের আলো ফুটিয়া ওঠার মত আমার চুম্বনে বৌএর চোখের জলে হাসি ফুটিয়াছিল, হেরম্ব খুসী হইত, ভাবিত, না, লোকটা নেহাৎ অপদার্থ নয়।

পরস্পরের হৃদয় জয় না করাটা [এক] শ্রেণীর স্বামীস্ত্রীর গর্ব্বের বিষয়। তা, সকলের কি হৃদয় থাকে?

আনন্দ বোধ হয় আজ পর্য্যন্ত ষ্টেসনের আপিসে ঢোকে নাই, তার কত বিস্ময়, কত প্রশ্ন। টেলিগ্রাফে কেমন করিয়া সংবাদ আসে? সংবাদ যখন আসে অবিনাশ যদি তখন ঘুমাইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয় কলিশন হয়? তাহার ঘুম ভাঙাইয়া খবর না দিয়া আগের ষ্টেসন হইতে গাড়ী ছাড়ে না? আশ্চর্য্য তো! আচ্ছা, টিকিট কোথায় ছাপা হয়? টিকিট যদি ফুরাইয়া যায়? টিকিটে তারিখের ছাপ দিবার যন্ত্রটা আনন্দ বুঝিয়া নিল। এত সহজ!

অবিনাশ গর্ব্বে আর বাঁচে না। যন্ত্রগুলি সেই যেন উদ্ভাবন করিয়াছে।

'মর্স এর কোডগুলি, জান ছোটঠাকুর, বড্ড কঠিন শেখা। কখ টখ কিছু নেই—শুধু ডাস্ আর ডট্। আরেক ষ্টেসনে ডাস্ আর ডট্ দিচ্ছে, আমি শুনে লিখে যাচ্ছি, ব্যস্।'

ফিরিবার পথে হেরম্ব বলিল, 'বলে গেলেই হল। কিছু জানে না লোকটা। কি হয় জান? টেলিগ্রাফের তার দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়, ওই যে যন্ত্র দেখলে টিকটিক করছিল? —ওর সঙ্গে বিদ্যুতের তারের যোগ আছে—'

রোদের তেজ বাড়িয়াছে। কিন্তু মাতাজীর কাছে লোকের ভীড় কমে নাই। হেরম্ব ঝরনায় গিয়া স্নান করিয়া আসিল। আনন্দ সঙ্গে গেল কিন্তু স্নান করিল না।

'আমি শেষরাত্রে স্নান করেছি।'

'অতরাত্রে শুয়ে শেষরাত্রে উঠেছিলে?'

'সন্ন্যাসীর চারটের সময় উঠতে হয়।'

'ঝরনায় এসেছিলে?'

'না, তাঁবুর মধ্যে। রাত্রে গ্রামের লোক জল দিয়ে গিয়েছিল।'

হেরম্ব সমস্যায় পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসে জল দিয়ে গেল?'

'কেন, আমাদের বড় বড় দুটো বালতি আছে, দ্যাখেন নি?'

বড় বড় দুটা বালতি আবার সম্পত্তি! ঝরনার স্রোতের মধ্যে বসিয়া মাথায় জল দিয়া দিয়া হেরম্বের মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছিল, আনন্দের জন্য টানটা আবার সতেজ হইয়াছে।

'বালতির জলে কি ভাল স্নান হয় আনন্দ?'

'মার সঙ্গে আবার স্নান করব যে।'

বালিব উপরে কি যেন আনন্দ লিখিতেছিল, হয়ত নিজের নাম, হয়ত হিজিবিজি দাগ। হেবম্বেব পকেট হাতড়াইয়া পেন্সিল বাহির করিয়া সে লেখনী করিয়াছে। সহসা হেরম্বের খুসীর সীমা রহিল না। কাল হইতে আনন্দ যে যাচিয়া সারাক্ষণ তাহার সঙ্গে থাকিয়াছে এ তো সে খেয়াল করে নাই!

তাহাকে আনন্দের ভাল লাগে, আনন্দ তাহার সঙ্গ চায়, আনন্দ তাহার অনুগত। শুধু তাই নয়, সকলের চোখেব আড়ালেই তাহাকে আনন্দর বেশী ভাল লাগে—তাহার সঙ্গে ঝবনায় আসিবে বলিয়া সে প্রতীক্ষা কবিয়া বসিয়াছিল সাবাটি সকাল।

মানুষ বলিয়া এমনি ঝরনার মত সঙ্কীর্ণ তাহার জীবন, তীবের বালুকায় আনন্দ আপন মনে খেলা জুড়িয়াছে। চোখ বুজিয়া এই গাঢ় নিশ্বাসবোধী সম্ভাবনাকে উপভোগ করা যায়। অন্তর আজ সৌখীন, —বিলাসী। আকাশে রৌদ্রে বায়ুস্তরে প্রান্তরে রসজ্ঞ উৎপল শয্যায় একি মাধুর্য্য!

হেবম্ব বলিল, 'আনন্দ, তুমি এত স্বতন্ত্র কেন?'

'আমি কি?'

সে বুঝিতে পাবে না। কতগুলি স্বাভাবিক অনুভূতি তাহাব নাই—কতগুলি শব্দ তাহার কাছে মৃত, অর্থহীন।

আস্তানায় ফিরিলে প্রসাদ মিলিল। এই মাঠের মধ্যে কোন দেবতা মাতাজীর পূজা গ্রহণ করিয়াছেন কে জানে, কিন্তু প্রসাদ অতি উত্তম। খাঁটি দুধ খাঁটি ক্ষীব, পাকা ফল, ঘৃতপক্ক লুচি।

স্বামিজীকে দেখা গেল না। কোন গাছতলায় তিনি ধ্যানে বসিয়া গিয়াছেন কে জানে।

দশটা এগারটা অবধি মাতাজীব কাছে লোকজনের যাতায়াত চলিল, তারপব স্থানটি নির্জ্জন হইলে হেবম্বকে ডাকিয়া মাতাজী বলিলেন, 'চাবখানা পুরীর টিকিটে কত লাগবে বাবা?'

হেবম্বকে ধরিয়া চাবখানা টিকিটই লাগিবে বটে, মাতাজীর বুদ্ধি কম তীক্ষ্ণ নয়। হেরম্ব যে তাহাদেব সঙ্গে পুবী যাইবে ইহাকে স্বতঃসিদ্ধের মত ধবিয়া নিয়া হেবম্বের যাওযাটা যৎপরোনাস্তি সহজ কবিয়া দিলেন।

'বলতে পারি না মাতাজী। ষ্টেসনে জানা যাবে।'

'থাক গে, ষ্টেসনে গিয়ে একেবারে কিনলেই হবে। গাড়ী তো নটায়।'

'একটা নিবেদন আছে মাতাজী।'

মাতাজী খেঁকাইয়া উঠিলেন, 'নিবেদন আছে! নিবেদন আছে! বলতে পারিস না?'

হেবম্ব হাসিযা বলিল, 'গেরুয়া না পবলে চলে না?'

'গেবুয়া না পবলে আমাব ভৈবব হবি কি কবে?'

'বাম বাম।'

'শালার নিষ্ঠা দ্যাখো! আচ্ছা যা গেবুযা ধাবণ করতে হবে না—তুই আমাব গৃহী ভক্ত।'

হেবম্ব খুসী হইয়া বলিল, 'মাতাজী লোক ভাল,—কেবল গালাগালিটা একটু কম দিলে—'

'মব্ মুখপোড়া, সাধু সন্ন্যাসী গাল দেয? তুই আমার ছেলে তুই আমাব বাপ তুই আমাব ভাতাব—তুই আমাব শালা!—তুই আমাব কেউ নস্।'

'বটে মাতাজী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ গো কর্ত্তা! দেহ তো কাদা রে—জল মাটি! দেহের সম্পর্ক আবাব সম্পর্ক কিসেব? দশমাস দেহেব মধ্যে ছিল বলে ছেলে ছেলে হয না বাপ আমাব—ছেলে আছে মনেব বাৎসল্যে। নিবি আমার দেহটা?'

'সংসাবী মানুষ, আমায় ওসব বলবেন [না] মাতাজী। আমার মন খারাপ হয়ে যায়।'

'কথাটা বোঝ তাহলে! তোবা দেহধর্ম্মী মানুষ—দেহই তোদেব ভগবান। তোদেব আত্মার চারিদিকে বক্তমাংসেব বেড়া। এমনি করে কি ভাল থাকতে হয় বে মাণিক আমার? এ তো মন্দ থাকাব বাড়া! ভোগ আব ত্যাগ যেদিন ইচ্ছাধীন কবতে পারবি সেইদিন জানবি একটু মনুষ্যত্ব জন্মেছে! সন্ধ্যা বাতটা যুবতী মেয়েকে নিযে দেহটা তোব লম্পট হয়ে রইল, বাকী রাতটা সেই মেয়ের বুকে শুয়ে নির্ব্বিকার চিত্তে ঈশ্বরকে ডাকলি, তবে না তুই মানুষ! খিদের জ্বালায় ছটফটাস্, পেটটা ভবল তো খাবাব কথা কে ভাবে? তোরা তাও ভাবিস্! পেটে জায়গা নেই—ঘাঁটো সব খাবারগুলি—আঘ্রাণ নেও। মেয়ে মানুষ দিবারাত্রি নিজেব কথা ভাবছে, তোরা কেন চব্বিশ ঘণ্টা মেয়েমানুষের কথা ভাবিস্?'

'কৈ, ভাবি না তো মাতাজী?'

'ভাবিস কি না তুই তাব কি জানবি মুখ্যু? সকালবেলা সেই সুন্দরী বৌটার দিকে একটিবারও তুই তবে তাকাস নি কেন? ওরে আমার আঁখি, তুমি সব দিকে তাকাও বাছা কিন্তু খবর্দ্দার ওদিকে তাকিও না, ওদিকে একটা সুন্দর মেয়েমানুষ আছে!' মাতাজী হাসিয়া উঠিলেন।

হেবম্ব বলিল, 'তা নয় মাতাজী। মেয়েটি কিছু মনে করবে বলে আমি তাকাই নি।'

'আমিও তো তাই বলছি রে। মেয়েটি মনে করবে, তার আত্মীয় মনে করবে, পাড়াপ্রতিবেশী মনে করবে, সংসারের সব লোক মনে করবে। শুধু তাকানো নয় বাবা, আরও হাজাব খুটিনাটিতে বিশ্রী কিছু মনে করবে বলে সংসারের লোক ওৎ পেতে আছে। মেয়েপুরুষের সম্পর্ক ওদের ধর্ম্মকর্ম্ম ধ্যান ধারণা—সদাই সচেতন হয়ে আছে, ভুলতে আর পারে না এক মিনিটের জন্যে। দূর দূব, সংসারে আবাব ভদ্রলোকে থাকে!'

'কিন্তু মাতাজী, কি নিয়ে মানুষ তবে সংসারে থাকবে?'

সংসার সম্বন্ধে স্থূল কথাটা মাতাজী মোটামুটি বোঝেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর দিবার সাধ্য তাহার নাই। কতগুলি বাজে বকিলেন মাত্র। স্বামিজী হয়ত কিছু বলিতে পারিতেন।

পৃ ৯৯-১০১

মাতাজী বলিলেন, 'পঞ্জিকায় শুধু সপ্তমী লিখেছে—আমাদের মতে কাল ছিল দিবা-সপ্তমী। চতুর্দ্দশ ভুবন থেকে চতুর্দ্দশ দেবতা সাতটি জোড় বেঁধে ওইদিন মর্ত্ত্যে আসেন। ভুবন চতুর্দ্দশাৎ দেবতাঃ চতুর্দ্দশঃ মর্ত্তমভিরমাতে দিবাসপ্তম্যাং তিথৌ। চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনূঢা কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে অমন দিনে বাড়ীর বাব হলে কি বক্ষা আছে? কি হয়? —না, চতুর্দ্দশী কন্যাযুতা গৃহহীনস্য বিনাশঃ। বাডী ছেড়ে বাব হওয়া গৃহহীন হওয়া ছাড়া কি মা।'

গৃহিণী সভয়ে বলিলেন, 'কি সর্ব্বনাশ! আব কবালী নচ্ছাব পাঁজি দেখে বললে যাত্রা শুভ।'

কর্ত্তা বলিলেন, 'শুধু কবালী কেন—আমিও দেখেছি, কাল আব আজ যাত্রা শুভ।'

গৃহিণী বলিলেন, 'তবে? পকেট পাঁজি নয়—আট আনা দামের ডিকটবি পাঁজি, তাতে কি মিথ্যা লিখবে?'

মাতাজী মৃদু মৃদু হাসিলেন, বলিলেন, 'পাঁজিতে মিথ্যে লিখবে কেন বাছা? কাল আব আজ যাত্রা প্রশস্ত—কিন্তু সবাই এব পক্ষে কি? তা নয়। চোদ্দবছরের আইবুড়ো মেয়ে সঙ্গে নিয়ে কাল যারা বাড়ী ছেড়ে বেরিয়েছে তাদেব একটা ভযানক বিপদ ঘটবেই। কি যোগাযোগ কি সংঘটন হয় সব কি পাঁজিতে লেখা থাকে? জানবে কোথেকে। অনেক তপস্যায ও বিষয়ে দিব্যজ্ঞান জন্মে মা, অনেক লুপ্ত শাস্ত্র উদ্ধাব কবে অধ্যয়ন কবতে হয। পাঁজিতে লেখা শুভদিনে যাত্রা করে কতলোকেব কত বিপদ ঘটেছে' সে কি অমনি ঘটে? কি কাবণে কাব পক্ষে শুভদিনও দারুণ অশুভদিনে দাঁড়াতে পাবে কে তা বলতে পারে। তা না হলে সংসারে এত শোকতাপ কেন? দৈবশক্তির কাছে অজ্ঞান মানুষ বড দুর্ব্বল বড অসহায়। ভাল ভেবে মানুষ কাজ কবে, কোথা থেকে মন্দ এসে পড়ে।'

গৃহিণী কয়টা শোক পাইয়াছিলেন কে জানে, শোকে অভিভূত হইয়া বলিলেন, 'তা সত্যি মা।'

একটি অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে উদাস নয়নে জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহাব দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মাতাজী কতক্ষণ স্তব্ধ বহিলেন, শেষে বলিলেন, 'আহারে, এই বয়সে মাযেব আমাব কপাল পুড়েছে! কি তুচ্ছ ত্রুটিতেই এমন দাগা তুই দিলি তারা? অজ্ঞান অবোধ সন্তানেব সঙ্গে এ তোব কেমন খেলা জননী?' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাতাজী একেবারে ধ্যানস্থ হইয়া পড়িবার উপক্রম কবিলেন।

গৃহিণী কাঁদিয়া বলিলেন, 'কি ত্রুটি হয়েছিল মা? কি জন্যে বাছার আমার এমন দশা হল?'

মাতাজীর দুই স্তিমিত নয়নে বিশ্বের করুণা জড়ো হইয়াছে,—সে খাঁটি জিনিষ, ছলনাব সঙ্গে তাহাব কোন সম্পর্ক নাই।

'হ্যাঁ মা, কুষ্ঠি মেলালি, শুভ লগ্নে কন্যা পাত্রস্থ কবলি, এতই যদি করলি উত্তব বাতাসটুকুকে আটকালি না কেন মা? যে দৈবী মায়াব নাড়ীনক্ষত্র জানে কেন তাব কাছ থেকে মাদুলি এনে মেয়েকে ধাবণ করালি না? আজ তোর মেয়ে স্বামী সোহাগিনী হয়ে থাকত!'

গৃহিণী বিহ্বলের মত বলিলেন, 'শ্রাবণ মাসে উত্তরে বাতাস কোথা থেকে এল মা? আমরা অজ্ঞান অন্ধ, বুঝিয়ে দিন মা আমাদের। আপনি সব জানেন—' বলিয়া গৃহিণী ঢিপ করিয়া মাতাজীর পায়ে প্রণাম করিলেন। কর্ত্তা বুড়ামানুষ, উত্তেজনায় তিনি কাঁপিতে লাগিলেন।

মাতাজী বলিলেন, 'শীতকালে যে উত্তবে বাতাস আসে সে দোষের নয় বাছা। হিমাদ্রিশিখরাসীনা পার্ব্বতী পরমেশ্বরী, বাবা মহাদেবেব রাজ্য থেকে যে বাতাস আসে তাতে কি কারো অমঙ্গল হয়? বর্ষাকালে বাতাস 'মেঘ-সংস্পর্শী'—সে বাতাসের কোন দিক নেই। উত্তরদিকের 'গবাক্ষ' কিনা জানালা হোক দরজা হোক, তাই দিয়ে যখন এ বাতাস দক্ষিণাভিমুখী গতি প্রাপ্ত হয়ে ঘরে ঢোকে তখনি গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।'

'মাগো! উত্তরদিকের একটা জানালা তো খোলাই ছিল! গরম বলে শ্রীনাথ সেই জানালার ধারেই তো বসে ছিল অনেকক্ষণ!'

হেরম্ব সভয়ে ভাবিল, কন্যার বৈধব্যের অপরাধ শেষে ইহাদের ঘাড়ে না চাপিয়া বসে মাতাজীর কল্যাণে!

মাতাজী বলিলেন, 'যজ্ঞের কাঠ বেছে দিস নি কেন মা? অশ্বত্থের ডাল পুড়লে যে যজ্ঞের আগুন চিতা হয়ে যায়!'

হেরম্ব ভর্ৎসনার সুরে বলিল, 'সে কি মাতাজী?'

'শাস্ত্রে অশ্বত্থকে জীব বলে মেনেছে জানিস? অশ্বত্থের ডালের সঙ্গে জীবিত প্রাণীর বিচ্যুত অঙ্গের কোন তফাৎ নেই। মৃত অঙ্গ যে আগুনে পোড়ে তাকেই চিতানল বলে।'

হেরম্ব চুপি চুপি বলিল, 'আর নয় মাতাজী—তিনটে প্রাণীর বুক ফেটে যাবে।'

খড়গপুরে নামিবার পূর্ব্বে মাতাজীর তিনটি মাদুলি পনের টাকায় বিক্রয় হইল। আর ভয় নাই। উত্তুরে বাতাস আসুক, যজ্ঞের আগুনে অশ্বত্থের ডাল পুড়ুক আর অজ্ঞাতসারে নির্ম্মম দেবতাদের কাছে যত অচিন্তনীয় অপরাধ সংঘটিত হোক, মাদুলির গুণে সব দোষ কাটিয়া যাইবে।

'বুড়োবুড়ীকে চরণে ঠাঁই দিতে হবে মা।'

সুতরাং একজোড়া শিষ্যও মাতাজীর সংগ্রহ হইল।

স্বামিজী আনমনে বলিলেন, 'সাবাস মালতী। দিন দিন তোমার মাথা সাফ হচ্ছে।'

'নইলে খেতে কি? সকালবেলা তো দশদশটা টাকা দাতব্য করে এলে! তুমি আর আমার টাকা পয়সায় হাত দিও না বাবু।'

'আমি তবে দেশে ফিরে যাই?'

মাতাজী আর কথা কহিলেন না।

মাতাজীর একজন শিষ্য আসিয়াছিলেন, নাম অমৃতবাবু। গৃহে পদার্পণের জন্য তিনি কাকুতি মিনতি করিলেন।

'রাত্রের এক্সপ্রেসে হুস্ করে পুরী পৌঁছে যাবেন মা। কষ্ট করে দরকার কি?'

'তাই যাওয়া যাবে। বৌমা কেমন আছে বাবা?'

অমৃত বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, 'অম্বলের অসুখটা সারছে না।'

'আচ্ছা, আনিস একবার সঙ্গে।'

'বাড়ী যাবেন না মা?'

'ওরে অমৃত, আমরা লোকালয়ে থাকি না এর মধ্যে ভুলে গেছিস বাবা!'

'ভুলি নি মা' সহরের বাইরে বাড়ী যে—মাঠের মধ্যে। খালি পড়ে ছিল, আপনাদের জন্য ঠিক করে রেখেছি মা। বাড়ীর মালিক হচ্ছেন সুরেনবাবু, ইঞ্জিনিয়ার—ধার্ম্মিক লোক।'

'বাড়ীতে কেউ থাকে না তো?'

'নাঃ, চাকরবাকর দু'একজন আছে।'

'চল তবে।'

আনন্দ একটু তফাতে হেরম্বের কাছে দাঁড়াইয়া হাই তুলিতেছিল। তাহারা যে গাড়ীতে আসিয়াছে অল্পক্ষণের মধ্যে তাহা ছাড়িয়া যাইবে। সম্মুখে একটা খালি ফার্স্টক্লাস কামরা, গাড়ী ছাড়ামাত্র নিদ্রাতুর আনন্দের হাত ধরিয়া

[শেষ বাক্যটি অসম্পূর্ণ—অংশটি এখানেই শেষ হয়।]

প ১০৫

কিছুক্ষণের জন্য পুকুরঘাটে গিয়া হেরম্ব অবাক মহা আনন্দে আনন্দ সমবয়সী একটি ছেলের সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি করিতেছে।

রাগ চাপিয়া হেরম্ব বলিল, 'কি করছ তোমরা?'

আনন্দ বলিল, 'আমরা পাঞ্জা লড়ছি।'

'এই ছোকরাটি কে?'

'ও ছোকরা নয়। ভাই অমৃতবাবুর ছেলে।'

বোঝা গেল পুরাতন বন্ধু। হেরম্ব ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিল, তাইত, আনন্দের জীবনের কুড়ি একুশটা বছর যে তাহার আয়ত্তে ছিল না। কতলোকের সঙ্গে ও বন্ধুত্ব করিয়াছে কে জানে। ছেলেমানুষ পাইয়া কত লোক হয়ত এমনি পাঞ্জা লড়ার ফিকিরে ওর সঙ্গে হাত কাড়াকাড়ি করিয়াছে। এমনি কত সমবয়সী যুবকের সঙ্গে হয়ত ওর ভালবাসা হইতেও বাকী থাকে নাই।

হেবম্বেব আবির্ভাব দুই বন্ধু পছন্দ করে নাই। অথবা হয়ত ঘাটের খেলা তাহাদেব শেষ হইয়াছিল। বৃহৎ বাগানের কোথায় যে তাহাবা লুকাইয়া পডিল হেরম্ব বুঝিতে পারিল না।

দুত্তোর, মবীচিকার পিছনে আব সে ছুটিবে না। খাইয়া উঠিয়া ষ্টেসনে হাজিব হইবে, তারপর প্রথম যে গাড়ী পাইবে তাহাতেই একদম কলিকাতা। কলিকাতায় বন্ধু আছে, কাজ আছে, সিনেমা আছে থিয়েটার আছে। সহজ সরল সুন্দব জীবন সেখানে। সকলেই পব, হৃদয়ের তাই অবাধ বিশ্রাম।

[পাণ্ডুলিপি অনুসারে, বর্তমান পরিচ্ছেদের শেষ পৃষ্ঠা।

পৃ ১১২-১১৬

হেবম্ব হাত জোড কবিল। মনে মনে বলিল .

হে ঈশ্বর, হে জগতপতি, হে আদিম কল্পনা অনাদি হৃদয়বহস্য, সর্ব্বাঙ্গে শীতল চন্দন লেপন কবিয়া যে আগ্নেয়গিরি শীতল হইতে চায়, তাহার ধ্বংসেব তুমি সীমা রাখিও না। তোমার আকাশে যেমন কবিয়া সূর্য্যেব চেয়ে বৃহৎ তাবকা নৈসর্গিক বিপর্য্যয়ে উল্কাবৃষ্টির মধ্যে নিভিয়া যায়, যেমন করিয়া তোমাব ধূমকেতু আসিয়া চলিয়া যায়, আমার সমাপ্তিতে তুমি তেমনি বিপুলতা দান কব। মৃত্যুকে আজীবন আস্বাদ করিতে কবিতে আমি যেন মবিতে পাবি।

হেবম্বেব চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। মন কিন্তু খানিক হাল্কা হইয়াছে। কাব উপরে যেন দারুণ অভিমান হইযাছিল, ঈশ্ববেব কাছে এমন করিয়া প্রার্থনা নিবেদন কবিয়া কাঁদিয়া সে অভিমান অনেকখানি গলিয়া গেল। এখন আনন্দেব মুখেব দিকে চাহিয়া চাহিয়া দৃষ্টি ক্লান্ত কবিয়া ফেলাও বোধ হয় সহিবে। নাভিগন্ধে পাগল হইয়া যে মৃগ ছুটিয়া আসিয়াছিল দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান হারাইয়া, পুষ্পগন্ধে খানিক বিশ্রাম পাইয়া সে অনেকটা সুস্থ হইয়াছে।

প্রাঙ্গণে নামিয়া পাথর বাঁধানো উঁচু চত্বরে বসিয়া নিজেকে হেরম্বেব বড়ই পুবাতন মনে হইতে লাগিল। বহুকাল কে যেন কি দিয়া তাহাকে বাবহার করিয়াছে। আনন্দের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্ক আছে কি না হেরম্ব তাহাই ভাবিয়া দেখিতেছিল, সবসী আসিযা কাছেই বসিল।

'এই যে আপনি।'

'বাঃ, আপনাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

মিথ্যা বলা হইল নাকি, আনন্দ সামনে নাই বলিয়া? কিন্তু হঠাৎ সরসীকে দেখিঁয়া সত্যই হেবম্বেব মনে হইয়াছিল সে বাঁচিয়াছে। বিদেশে দুঃখের দিনে পরমাত্মীয়ার দেখাই যেন মিলিয়া গেল।

সরসী বিশেষ খুসী হইল না। এবকম খোঁজা সে বুঝিতে পারে না।

'আমি ছিলাম বৃপাইকুডা, এখানে আমায় খুঁজছিলেন কি রকম?'

হেবম্ব সবিস্ময়ে বলিল, 'বৃপাইকুড়ায় ছিলেন তো এখানে এলেন কি কবে?'

সরসী-অস্ফুটস্বরে বলিল, 'কথার ভটচায্যি।'

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেখানে বসিয়া কথা বলিতে সবসী রাজী হইল না। তাহার শ্বশুরবাড়ীব সম্পর্কের একটি পরিবাব পুরীতে আসিয়া আছেন, বৌকে এরকম যার তাব সঙ্গে গল্প করিতে দেখিলে তাহাবা কি বলিবেন?

সরসীর চাকর গাড়ী ঠিক করিয়া খবর দিল। তাহাবা মন্দিরের বাহিরে আসিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

সরসী বলিল, 'তিন দিন হল এসেছি। অনেকদিন পুরী বেডিযে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, ওঁকে বলে ক'য়ে চলে এলাম। আপনাকে পুরীতে দেখতে পাব ভাবি নি।'

কথাটা অবশ্যই মিথ্যা। সরসীর আবার বেড়ানোব সখ। তাব যা কিছু সম্পত্তি সমস্তই আগে ভাগে দাম দিয়া ফেলিয়া সে বলে আপশোষে মরিয়া যাইতেছিল—একটা কানাকড়ির জিনিষও বেচারা পায় নাই।

কেদারেব চাপরাসি পার্সেল নিতে আসিয়াছিল অবিনাশের ষ্টেসনে। অবিনাশ তাহার কাছে হাকিমবাবুর শালার সন্ন্যাসীর দলে ভিড়িয়া পুরী যাওয়ার গল্প বলিতে ছাড়ে নাই। হেরম্ব কলিকাতা গেলে তার একহাজার মুখপোড়া বিড়ি জুটিত।

'বুঝলে চাপরাসি, মাতাজী হলেন সন্ন্যাসী ভৈরবী মানুষ, ওঁদের এতে কোন দোষ হয় না। বলতে কি, সাধনাব জন্য এসব ওঁদের দরকারই হয়। কিন্তু হেবম্ববাবুর একি কীর্ত্তি বলত! ওর দিদিমার বয়সী যে!'

চাপরাসির কাছে খবর শুনিয়া দিদি ভাবিয়া আকুল। সে তখন মাতাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়া সম্বন্ধে সরসীর কাছে পত্র লিখিয়া পাঠাইবে বলিয়া রাখিয়া দিয়াছে। পত্র খুলিয়া পুনশ্চ দিয়া লিখিল·

'হেরম্ব এখান থেকে কলকাতা চলে যাবে জানতে, তা না গিয়ে সে মাতাজীর সঙ্গে সন্ন্যাসী হয়ে পুরী চলে গেছে। বৌ আর খোকা মারা যাবার পর থেকে ও কিরকম হয়ে গিয়েছিল সেসব তোমায় বলেছি। কিন্তু ও যে এমন করে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে একথা স্বপ্নেও ভাবি নি। এমন [ভাগ্য ?] করে জন্মেছিলাম যে আমার একটি মাত্র ভাই... .'

পত্র পাইয়া মনে মনে সরসীর সে কি রাগ। বটে? সন্ন্যাসী হইয়া যাওয়া হইল আর এখানে বাবু দু'টা দিন থাকিতে পারিলেন না।

সেদিন সে গরুর দুধও জ্বাল দিল না, অশোককে ভাল করিয়া খাওয়াইলও না। পড়িয়া পড়িয়া খুব একচোট কাঁদিল।

অশোক বলিল, 'আরে! কাঁদ কেন?'

'এখানে থাকলে আমি মরে যাব।'

'কোথায় যাবে?'

'পুরী।'

'পুরী কি জন্য?'

'আমি সমুদ্র দেখব।'

অশোক চিন্তিত হইয়া বলিল, 'এখন কি ছুটি পাব? মাসকানেক পরে গেলে হবে না?'

সরসী বিছানায় উঠিয়া বসিল। বিবাহের পর আজ প্রথম তাহার মেজাজ খারাপ হইয়াছে।

'কাল যদি আমায় তুমি পুরী না নিয়ে যাও—'

পরদিন হইল না, তার পরের দিন যাওয়া হইল। একদিন দেরী করিতেও সরসীর ভয় হইতেছিল কিন্তু কি করে, অশোকের চাকরী যাওয়াটাও কম ভয়ের কথা নয়।

পুরী পৌঁছিয়া সরসী কিন্তু মাতাজীর ওখানে গিয়া উপস্থিত হইতে পারিল না, একটা খবরও পাঠাইতে পারিল না। এতদূর আসিয়া এইটুকু যাইতে তাহার লজ্জা করিতে লাগিল। মেয়েমানুষ কি অত সস্তা করিতে পারে নিজেকে?

সরসী সকাল বিকাল মন্দিরে হত্যা দিয়া রহিল, মন্দিরে না আসিয়া হেরম্ব যাইবে কোথায়? কিন্তু আকাশ ভাঙিয়া বৃষ্টিই শুধু আসে, হেরম্ব আসে না। বৃষ্টির মধ্যে গাড়ী করিয়া সরসী দুইবেলা মন্দিরে আসে, প্রবেশপথের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, আর মনে মনে বর্ষাকে অভিশাপ দেয়।

দেবতার দিকে পিছন ফিরিয়া বেলা কাটাইতে সরসী ভয় পায় না।

দুইদিকেই তার জ্বালা। হেরম্বের দেখা মেলে না, অশোকের কষ্টের সীমা থাকে না। একদিন সরসীর সঙ্গে মন্দিরে আসিয়াই অশোকের সর্দ্দিজ্বর হইয়া গিয়াছে, সে না পায় একটু সেবাযত্ন, না পায় সময়মত পথ্য।

অশোক বাড়ীতে শুইয়া থাকে, মন্দিরে তার জন্য সরসীর মন কাঁদে। তিনটা দিন তার বড় দুঃখেই কাটিয়াছে।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে সরসী বলিল, 'কই, সন্ন্যাসী হবার তো কোন লক্ষণ দেখছি না।'

'কে বললে আমি সন্ন্যাসী হয়েছি?'

'দিদি কেঁদে কেটে আমায় এই এত বড় এক চিঠি লিখেছেন। আপনি নাকি সন্ন্যাসী হয়ে কলকেতার বদলে পুরী চলে এসেছেন।'

'সন্ন্যাসী হতে যাব কোন দুঃখে? আমি এখানে বেড়াতে এসেছি।'

'বোনকে একখানা চিঠিও তো লিখতে হয়?'

আনন্দকে ভালবাসিবার হিড়িকে হেরম্বের নাওয়া খাওয়া ছিল না, বোনকে চিঠি লেখা! কিন্তু কত বড় অন্যায় হইয়া গিয়াছে কাজটা?

হেরম্ব লজ্জিত হইয়া বলিল, 'লিখি লিখি করে হয়ে ওঠে নি। এইবার লিখব।'

'আর লিখেছেন। আমি আপনার নাম দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছি যে এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, বিকালের গাড়ীতে কলকাতা ফিরছেন। বাবা, ওইটুকু ইংরেজীতে লিখতে একেবারে গলদঘর্ম্ম! বিদ্যে কত! ভুল যে কত করেছি—'

লিখিতে গলদঘর্ম্মই হোক আর যাই হোক সে যে ইংরাজী জানে হেরম্বকে এ খবরটা দিতে সরসীর বেশ লাগিতেছিল, খুব খানিকটা হাসিয়া নিয়া সে বলিতে লাগিল, 'আপনার নামটাই ভুল হয়ে গেছে! হেরম্বতে এইচ ই আর এ এম বি এ হতে তো? আমি লিখেছি এইচ এ—হরম্ব হয়ে গেছে!'

হেরম্ব ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, 'আপনি ও কথা লিখতে গেলেন কেন?'

'তাতে কি! ওরা মনে করবে পোষ্টাপিসের কেরানী ভুল করেছে।'

'সেজন্য নয়। দিদির সঙ্গে আমি জুয়াচুরি করি না।'

'অন্যসকলের সঙ্গে করেন?'

গাড়ী বাড়ী নয় বলিয়া সরসী বেশ কথা কহিতেছে। রূপাইকুড়ায় সে কি এমনভাবে আলাপ করিতে পারিত? তাহাদের সম্পর্ক হয়ত এতদিনে ওর মনের মধ্যে সহজ হইয়া আসিয়াছে। প্রেমালাপে তাই এত বাস্তবতার আমদানী।

পৃ ১১৯

কে যেন আঁচল ধরিয়া টানিয়া রাখিতে চায়। সে অশোকের মুখের দিকে তাকাইবে। অশোক ঘুমাইয়া আছে। কি সুন্দর ওর ঘুমন্ত মুখখানি। ও তার স্বামী, ও তার সর্ব্বস্ব। চাহিয়া থাকিতে থাকিতে সরসী দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়াছে, বুকে তার অসহ্য যন্ত্রণা হইতেছে। সরসী গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন দিতেছে, সরসী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাইতেছে, আজ সরসীর জহরব্রতের সূচনা। কাঁপিতে কাঁপিতে সরসী তাহার ঘরে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেমিজ খুলিবে।

অশোকের বাড়ীতে থাকিয়া তার বৌকে কাঁদানো চলে না।

শুনিয়া সরসী কাঁদিবার উপক্রম করিয়া বলিল, 'কেন, থাকবেন না কেন?'

'থাকা কি উচিত?'

'উচিত তো সবই। কি করে কি হবে তা হলে?'

হেরম্ব তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, 'বাড়ীতে অতিথি হওয়া ছাড়া আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।'

চোখের জলের মধ্যে সরসী হাসিল।

বাড়ী পৌঁছিয়া তাহারা দেখিল অশোকের জ্বর ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে। তার চোখ ভারি লাল, সে ছটফট করিতেছে। জ্বরের ঘোরে সে বোধ হয় নাকের নীচের ব্রণটা চুলকাইয়াছিল, চিবুক পর্য্যন্ত একটি রক্তের রেখা শুকাইয়া আছে।

সরসী যেন আধমরা হইয়া গেল। একমুহূর্তে তার মুখ শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গিয়াছে, তার যেন দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই।

'ওগো, তোমার কি হল গো?' বলিয়া সে ধপ করিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল, "তোমায় যে ভাল দেখে আমি মন্দিরে গিয়েছিলাম।'

আহা, দুঃখী মেয়েটির রকম দেখিলে চোখে জল আসে। এই কপালে বুকে হাত দিয়া জ্বর দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেছে, এই নিজের পরিচয় দিয়া ব্যাকুলভাবে স্বামীকে ডাকিতেছে, পরক্ষণে হতাশভাবে মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, 'পোড়াকপালীকে উনি আর চিনবেন না গো, চিনবেন না?'

তারপর রাগিয়া বলিতেছে—

'এখনো ডাক্তার এল না? কি করছেন আপনারা!'

বলিয়া অশ্রুপ্লাবিত মুখ তুলিয়া হেরম্বের দিকে চাহিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া ধরিতেছে।

হেরম্ব বিশ্রী মুখভঙ্গি করিয়া বলিতেছে, 'আসছে ডাক্তার—আসছে।'

[একাদশ পরিচ্ছেদ শেষ হতে আর একটি পৃষ্ঠাই বাকি ছিল।

পৃ ১২১-১৩৬

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

অশোক না হয় মরিবে, তাই বলিয়া প্রেমিককে অমন মরণাধিক অপমান সরসী কি বলিয়া করিল? হেরম্ব ভালবাসে না বলিয়া রক্ষা, ভালবাসিলে এ আঘাত কি সামলাইতে পারিত? সরসী অমন বুদ্ধিমতী মেয়ে হইয়া এ করিল কী? একটি সন্ধ্যায় সরসী যে তার অচেনা লক্ষ লক্ষ সাধারণ মেয়ের ভিড়ে হারাইয়া গেল ইহার উপায় সরসী কি করিবে?

আজ তিনদিন হেরম্ব আনন্দের মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে, তার অঙ্গ অবসন্ন, মন নিরুৎসাহ, সারাদিন তার হাই তোলা আর আলস্য। আনন্দ বেড়াইতে যাইতে চায়, হেরম্বকে কাকুতিমিনতি করে, কিন্তু বাহিরের পৃথিবীর ও পার্থিব জনতার সংস্পর্শে নেশা টুটিয়া যাইবার ভয়ে হেরম্ব ঘর ছাড়িয়া নড়ে না।

আনন্দব একাকী বাহিরে যাওয়া নিষেধ, সে অনুযোগ করিয়া বলে, 'এই বুঝি আমাকে আপনি ভালবাসেন?'

হেরম্ব বলে, 'তুমি যাও না আনন্দ, সমুদ্রের ধারে বালিতে গিয়ে খেলা কর। আমি জানালা দিয়ে তোমায় তাকিয়ে দেখব।'

'দূরে—অনেকদূরে,—' আনন্দব চোখ ছলছল করে, 'খুব দূরে যেতে না পারলে ভারি বেড়ানো! আমি যাব না।'

'না, যাও। লক্ষ্মী।'

'একা যেতে আমার ভাল লাগে না।'

'যাও, আমি কাল যাব। তুমি সমুদ্রের ধারে দাঁড়ালে জানালা দিয়ে দেখতে আমার বড় ভাল লাগে।'

শুনিয়া কপাল চাপড়াইয়া মাতাজী বলেন, 'যতো পাগল কি জোটে এসে আমার ভাগ্যে!'

স্বামিজী এখনো ফেরেন নাই। মাতাজীব বিশ্বাস, মিঙ্গে ভাগিয়াছে, আব আসিবে না। তিনি আবাব অল্পবিস্তব কারণ পান আরম্ভ কবিয়াছেন,—হেবম্ব বীতিমত প্রসাদ পাইতেছে।

'কারণ অতি উত্তম পদার্থ, মাতাজী।'

মাতাজী মুখ বাঁকাইয়া বলেন, 'আর মেয়েমানুষ?'

'হা হাঃ, মেয়েমানুষ কি পদার্থ? মেয়েমানুষ—' অর্থাৎ মেয়েমানুষ অপদার্থ, হেরম্ব এই রসিকতাটুকু করিতে চায়, কিন্তু মাতাজী কাপড় তুলিয়া জঙ্ঘা চুলকাইতে আবম্ভ কবিয়াছেন দেখিয়া আব সাহস পায় না, ওইখানে ইতি কবে। স্বামিজীব অনুপস্থিতিব চাপে মাতাজীর মুখ দিয়া আজকাল গলগল করিয়া যে গরল বাহির হয়, সে সহ্য করিবার ক্ষমতা হেবম্বেব নাই।

বলেন, 'তুই তো একনম্বর লম্পট, তোব আবাব লজ্জা কি?'

হেরম্ব ভাবে, জীবনে শুধু যে একবাত্রির জন্য তাহার পদস্খলন হইয়াছিল সে বার্তা মাতাজীকে শুনাইয়া দিবে নাকি? কিন্তু মাতাজী[ব] বক্তব্য যে বাক্যেব অর্থে নয় এইটুকু বুঝিবাব উদাবতায় কিছু না বলাই সে সঙ্গত মনে করে।

স্বামিজীব বিবহে মাতাজীর খেপিয়া যাওয়াব অধিক বিলম্ব নাই। একটি সুন্দরী বৌ স্বামীর সঙ্গে দীক্ষা নিতে আসিয়াছিল দিন দুই আগে, কারণের পাত্র নামাইয়া মাতাজী বলিয়াছিলেন:

'দীক্ষা নিবি? দূর! দূব!'

'অনেক আশা করে এসেছি মা, নিরাশ কববেন না।'

'মবণ তোদেব আশাব!'

'চবণে ঠাঁই দিতেই হবে মা।'

মাতাজীব সেকি বাগ!

'চিতায় ঠাঁই নিবি যা। দীক্ষা যে নিবি শালী, পরস্পবকে না ছুঁয়ে থাকতে পাববি তোবা? ভগবানেব নাম নিয়ে বলতে পাববি স্বামীকে ছুঁলে আমি যেন বিধবা হই?'

মেয়েটি স্বামীব হাত ধবিয়া চলিয়া গেলে মাতাজী গম্ভীব গলায় বলিলেন, 'জানিস হেবম্ব, ও মেয়েটার কপালে শীগগিব বৈধব্য আছে!'

মেয়েটিব আহত মুখভঙ্গি দেখিয়া মাতাজীর উপব হেবম্ব বিশেষ খুসী হয় নাই।

সে বলিল, 'একি মাতাজীর মনস্কামনা না ভবিষ্যৎ দৃষ্টি মাতাজী?'

শুনিয়া মাতাজী চটিয়া লাল!

'বেবো তুই আমার বাড়ী থেকে। দূব হ'। আমাব বাড়ী বসে আমাকে তুই গাল দিবি হাবামজাদা?'

তখন যে মধুর ব্যাপাব ঘটিল হেরম্ব জীবনে তাহা ভুলিবে না। বাব কয়েক ঠোঁট ফুলাইয়া আনন্দ কাঁদিতে আরম্ভ করিযা দিল।

মাতাজী সবিস্ময়ে বলিলেন, 'তুই কাঁদিস কেন লো ছুঁড়ি?'

না,

'ওকে বোকো না মা, উনি চলে যাবেন।'

সেখানে ইতি নয়, সেইখানে আদি। মাতাজীর ইঙ্গিত ছাড়াই হেরম্ব পানপাত্র তুলিয়া নিয়া ঢকঢক করিয়া সমস্তটুকুই গিলিয়া ফেলিল, গলায় আগুন লাগিলে, বুক পুড়িয়া গেলে, মাথা ঘুরিয়া উঠিলেও এখন তার আরাম। মাতাজীব কড়া মদ কি আব আনন্দের দেওয়া আনন্দের চেয়ে কড়া!

অথচ, হেরম্ব আগাগোড়াই জানে আনন্দের পক্ষে প্রেম অসম্ভব, অপ্রকৃত। এমন অনৈসর্গিক সম্ভাবনাকে স্বীকার করিয়া নিতে বাধিল না বলিয়া সে কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হইল না। সে যদি পাথরকে এমনভাবে ভালবাসিত, পাথরও যেন প্রতিদান দিত। আনন্দ পাথর নয়।

পাথরের চেয়ে নীরস হওয়াই অবশ্য আনন্দের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু হেরম্বের প্রেমের দাপটে স্বভাবকে অতিক্রম না করিয়া বেচারা পারে নাই।

বৃষ্টিবাদল শেষ হইয়া গিয়াছে, দুইবেলা সমুদ্রতীর নরনারীতে ভরিয়া যায়। ছোট ছেলেমেয়েরা ঝিনুক কুড়ায়, আর ঝিনুক কুড়ায় বৌ আর যুবতী মেয়েরা। তাহারা সকলেই ঝিনুক কুড়ায়। সমুদ্র এখন প্রশান্ত। ঢেউয়ের তালে নাচিতে নাচিতে জেলে ডিঙিগুলি তীরের আর দূরের মধ্যে আনাগোনা করে. তীরের কাছে ভীরু বাঙ্গালী মেয়ে স্নানের ছলে বালি মাখে, যারা একটু সাহসী, নুলিয়ার হাত ধরিয়া তারা খানিক আগাইয়া যায় এবং বড় ঢেউ আসিলে সঙ্গীকে সবলে জড়াইয়া ধরে।

জড়াইয়া ধরিবার শিক্ষাটা ওদের পুরাপুরিই হইয়া আছে।

সমুদ্রস্নান করিতে আনন্দ বড় ভালবাসে। নৃত্যের মত সাঁতারেও তার যেন স্বাভাবিক প্রতিভা আছে। সোনালী চিকন জলদেবতার মত স্বচ্ছ সুনীল জলে সে ডুব দেয়, তার পায়ের তলে সমুদ্রতলের বালি ঝিকমিক করে, ছোট মাছের ঝাঁক তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়। উপরে ভাসিতে ভাসিতে হেরম্ব নিশ্বাস রোধ করিয়া চাহিয়া থাকে।

ভাসিয়া উঠিয়া হাঁপ ছাড়িয়া আনন্দ বলে, 'তলা ছুঁতে পারলাম না, দম আটকে এল।'

হাত পা ছুঁড়িয়া মনের আনন্দে সে জল ছিটায়, লোনা জল মুখে গেলে ওয়াক্ ওয়াক্ করিয়া অত্যন্ত হাসে।

'ধরুন তো?' বলিয়া তরতর করিয়া সাঁতার দিয়া সে পালায়, হেরম্ব শত চেষ্টাতেও তার নাগাল পায় না।

তারপর হাত পা এলাইয়া দিয়া আনন্দ হাঁ করিয়া হাঁপায়, সে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বলে, 'কতদূর চলে এসেছি! ফিরব কি করে?'

হেরম্ব একঢোক লোনা জল গিলিয়া বলে, 'আমায় ধরে বিশ্রাম কর।'

'ইস্! ধরুন তো?'

আনন্দ তীরের দিকে সাঁতার দিতে আরম্ভ করে, কিন্তু শ্রান্ত শরীরে আর জোরে যাইতে পারে না। হেরম্ব পাশে পাশে তাহার সঙ্গে চলে। সে ভাল সাঁতার জানে না, হাত পা যেন ভাঙিয়া পড়িতে চায়। তবু সে বলে, 'আমায় ধর না আনন্দ?'

আনন্দ ম্লান হাসিয়া বলে, 'আপনি যে ছুঁতে বারণ করেছিলেন?'

সে যেন ঐতিহাসিক, তিনদিনের পুরানো কথা ভোলে নাই। ব্যাপারটা খুবই সাধারণ। হেরম্ব ঘরে শুইয়া ছিল, এমনি সময় চটাপট চটাপট শব্দে বাহিরে শিল পড়িতে আরম্ভ হওয়ায় আনন্দ আর আনন্দে আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ছুটিয়া ঘরে গিয়া হেরম্বের বুকে উপুর হইয়া পড়িয়াছিল।

তার বুকের চাপ লাগিয়াছিল হেরম্বের বুকে।

হেরম্ব বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আকস্মিক তীব্র [বেদনায় ?] আনন্দকে সে কি বলিয়াছিল তার স্মরণ নাই।

[এরপর আড়াই লাইন অংশ এমনই ছিন্নভিন্ন যে পাঠোদ্ধার অসম্ভব। পরের বাক্যটিও তাই মাঝখান থেকে শুরু হয়েছে।]

. চেয়ে তার আর বড় প্রমাণ কিছু হয় না। এ স্মৃতি আনন্দের হৃদয়ের নয়, মস্তিষ্কের ; এ প্রতিক্রিয়া অনুভূতির নয়, বুদ্ধির।

তারপর বিকালে সরসী আসিল। রাত জাগিয়া কাঁদিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া সে সারা হইয়া গিয়াছে। রুক্ষ চুলে জটা বাঁধিয়াছে, চোখের কোলে কালো দাগ পড়িয়াছে, ঠোঁট শুকাইয়া ফাটিয়া গিয়াছে।

বলিল, 'একজন অসহায়া মেয়েমানুষের হাতে অমন একটা রোগীকে ফেলে কি করে আপনি ডুব মেরে রইলেন হেরম্ব বাবু?'

লজ্জায় হেরম্ব মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

'পরেও অমন করতে পারত না।'

হেরম্ব যেন তার পর নয়।

হেরম্ব ভয়ে ভয়ে বলিল, 'অশোক একটু ভাল আছেন না?'

'কই আর আছেন?'

'চলুন, দেখে আসি।' বলিয়া আকস্মিক উৎসাহে হেরম্ব উঠিতে গেল। তাহাকে দমাইয়া দিয়া সরসী বলিল, 'আর দরকার নেই। ঢের লোক এসে গিয়েছে। আমার দাদা এসেছে, ওঁর ভাই এসেছে,—আপনি গিয়ে কি করবেন? কেউ যখন ছিল না তখন যদি একবার দু'বার দয়া করে যেতেন—'

কিছুতেই রেহাই দিবে না। হেরম্ব যে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়াছে তাহাতে সরসীর তৃপ্তি নাই। হেরম্ব নাকে খত দিলেও সে খুসী হইত কিনা সন্দেহ।

কারণ, হেরম্বের অপরাধের মার্জ্জনা নাই। তাহার মরণাপন্ন স্বামীর জীবনরক্ষার জন্য হেরম্ব কোন চেষ্টা করে নাই, সে যদি এজন্য সমস্ত জীবন ধরিয়া অনুতাপ করে তবু সরসী তাহাকে ক্ষমা করিবে না।

সমস্ত সময় ওই কথা নিয়া অনুযোগ দিয়া সরসী আধঘণ্টা খানেক রহিল। আনন্দকে পরিহাস করিয়া বলিল, 'ছোট ঠাকুরের রূপ যে দিন দিন উথলে উঠছে।'

ঈর্ষায় সরসীর মন জ্বালা করিতেছিল। সে আবার বলিল, 'ছোট ঠাকুর আজকাল মস্ত সন্নেসী। বিদ্বান বড়লোক শিষ্য দিবারাত্রি চরণে লুটিয়ে থাকে।'

আনন্দ অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে সরসীর অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করিতেছিল, সরসীকে সে পূর্ব্বেও দেখিয়াছে কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব যৌবন আজই প্রথম তাহার চোখে পড়িল। তাহার অনমিত উদ্ধত স্তনভার, তাহার ক্ষীণ কটি, তাহার স্থূল গভীর অনুঅঙ্গ সমস্ত আশ্চর্য্য, অতি আশ্চর্য্য।

যাওয়ার আগে সরসী মাতাজীকে প্রণাম করিল।

'যা বাছা তুই। জ্বালাসনে আমায়।'

'ওঁর বড্ড অসুখ মা।'

মাতাজী স্তিমিত হইলেন।

'কার রে?'

'ওঁর মা। বাঁচবার আশা নেই।'

মাতাজী সরসীর চিবুক ধরিয়া মুখ উঁচু করিয়া বলিলেন, 'কে তোকে এমন নিরাশ করেছে মা যে চোখের জলে বুক ভাসছে?'

'ডাক্তার বলেছে মা।'

'ডাক্তার ছাই জানে।'

মাতাজীর পায়ে লুটাইয়া সরসী ফুঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।—'আপনি ওঁকে বাঁচান, মা, ওঁকে আপনি বাঁচান।'

কারণ খাইয়া সমস্ত রাত্রি মাতাজী বেঁহুশ হইয়া পড়িয়া রহিলেন। আনন্দ কাঁদিয়া বলিল, 'মা মরে যাবে।'

হেরম্ব বলিল, 'কেঁদো না আনন্দ।'

'মা মরে যাবে।'

'মরবেন কেন? কেঁদো না। তোমার পায়ে পড়ছি, তুমি কেঁদো না আনন্দ।'

'আমার মা মরে যাবে। ওগো, আমার মা মরে যাবে।'

'আঃ, তুমি বড় অবাধ্য।'

না,

'আপনি ওঁকে বাঁচান, ওঁকে আপনি বাঁচান।'

হা হা, আনন্দ পরিহাস করিতেছে। বাঃ! মাতাজীর জন্য আনন্দের স্নেহও যে শুধু অভ্যাস এতদিনে তাহা বেশ বোঝা গেল। ইহার কাছে কি আশা করা যায়?

শুধু অকৃত্রিম ছলনা। হায়, প্রকৃতি!

সকালে উঠিয়া মাতাজীর খুব ব্যস্ততা দেখা গেল। হুড়হুড় করিয়া জল ঢালিয়া তিনি স্নান করিলেন, তারপর বাহিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আনন্দ বলিল, 'কোথায় যাচ্ছ মা?'

'মন্দিরে যাচ্ছি।'

হেরম্ব সন্দিগ্ধভাবে বলিল, 'হঠাৎ?'

মাতাজী কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন, 'মন্দিরে যাব তার আবার হঠাৎ কিরে ছোঁড়া?'

আনন্দ বলিল, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব মা।'

'না, তুমি বাড়ীতে থাকো, সোনা আমার।'

এই বলিয়া মাতাজী চটপট বাহির হইয়া গেলেন।

হেরম্ব সঙ্গে বাহির হইয়া বলিল, 'মন্দিরে পৌঁছে দেব মাতাজী?'

'কেন, আমি যেতে জানি না?'

'তবু—'

'ফিরে যা হেরম্ব, ফিরে যা। আমার স্বাধীন চলাফেরায় বাধা দিলে এমন শাস্তি পাবি, জন্মে ভুলবি না।'

'কি শাস্তি দেবেন মাতাজী?'

'আনন্দকে সঙ্গে নিয়ে যাব, তোকে নেব না। চোখের দেখাও দেখতে পাবি না।'

'মাতাজী, আর দুটো দিন থেকে যান। এ বড় আকস্মিক হল।'

মাতাজী হাসিয়া বলিলেন, 'হ্যাঁরে মুখ্যু, তুই না ভালবাসিস?'

হেরম্ব চুপ করিল এবং দাঁড়াইল। মাতাজী অগ্রসর হইয়া গেলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

পুরীতে আসিয়াই মাতাজী যে ধনী ভক্তটিকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন, তার নাম অক্ষয়। বৈকালে ব্যস্ত সময় হইয়া তিনি উপস্থিত হইলেন।

'সর্ব্বনাশের কথা, মাতাজী কোথায় গেলেন আজ হঠাৎ?'

'কোথায়?'

'আমি তো তাই জিজ্ঞাসা করছি। কাল আমার বাড়ী হোম করবেন, আর আজ উনি চলে গেলেন? ছোট শালাকে তুলে দিতে স্টেসনে গিয়েছিলাম, দেখি মাতাজী সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় বসে আছেন। সঙ্গে মোটাসোটা একজন সন্ন্যাসী—'

স্বামিজী বোধ হয়।

হেরম্ব বলিল, 'তারপর?'

'কোথায় যাচ্ছেন জিজ্ঞাসা করতে মাতাজী একেবারে খেঁকিয়ে, মানে, ধমকে উঠলেন। তা ধমকান, সন্তানের তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু আমি এখন কি করি? ছ'সাত শ' টাকার জিনিষপত্র কিনেছি, সব নষ্ট হবে নাকি?'

'মাতাজী ফিরে এলে হোম হতে পারবে।'

'অসম্ভব। এ যা হোম, কাল ছাড়া বারো বছরের মধ্যে আর দিন নেই।'

'অন্য কাউকে দিয়ে করান না?'

'মাতাজীর হোম অন্যে পারবে কেন?'

চারিদিকেই মাতাজী আটঘাট বাঁধিয়া গিয়াছেন। কি একখানা ব্রেন!

উঠিবার আগে অক্ষয় বলিলেন, 'মাতাজী দুশো টাকা আগাম দক্ষিণা নিয়েছেন, তা নিন, সেজন্য দুঃখ নেই, বরং আনন্দেরই কথা—সৌভাগ্য। কিন্তু হোম হবে না, বড় দাগা লাগল প্রাণে।'

আনন্দ সবিস্ময়ে বলিল, 'হোম না হলে প্রাণে দাগা লাগবে কেন?'

হেরম্ব বুঝাইয়া বলিল, 'মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ যে একজনের প্রাণে দাগা লাগলে অনেকের প্রাণে দাগা লাগে।'

'দাগা কি?'

'দাগা? দাগা হচ্ছে দাগ—পুড়ে গেলে যে দাগ থাকে তাই।'

আনন্দ বুঝিতে পারিল না কিন্তু গম্ভীর হইয়া বলিল, 'আগুনে পুড়লে ভীষণ জ্বালা করে—প্রাণে দাগা লাগলে প্রাণও বুঝি জ্বালা করে?'

'হ্যাঁ গো, করে। আগুনে পোড়ার চেয়েও বেশী জ্বালা করে।'

'সত্যি?'

আনন্দের আজ বেড়ানোর সাধ নাই। ঘরে বসিয়া থাকিতে আজ তাহার ভাল লাগিতেছে। রোগটা হেরম্বের এবং অবশ্যই সংক্রামক কিন্তু আনন্দের পক্ষে নয়, তাহার অসুখ মৌলিক।

সন্ধ্যার পর চাঁদ উঠিল। কত অপোগণ্ড শিশু নরনারী এই চাঁদের আলোয় পরস্পরের গালে চুমা দিতেছে কে জানে? মেয়েটির গলায় নকল মুক্তার মালা—তারই চিঠি পাওয়ার আনন্দে সাইকেল হইতে পড়িয়া ছেলেটির হাত ভাঙিয়াছে। হাঁটু কাটিয়া রক্তারক্তি। ওরা বাঁচিয়া থাক্। ওরা সাধারণ ওরা স্বাভাবিক, জগতে ওরা সব চেয়ে দামী। লৌহ ব্যবসায়ীর সংযম ওদের, দৃঢ়, কঠিন, নীরস;—বছরে একটির বেশী খোকাও নয়, খুকীও নয়।

একটু অধরসুধা খাইয়া আজ ওরা উপবাস করিবে, কারণ আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে। না, সেজন্য নয়, ক্ষুধা পায় নাই বলিয়া। কালের জন্য ওদের ভুঁড়ি-ভোজনের ব্যবস্থা।

হেরম্বের কপালের একটা শিরা দপ্ দপ্ করিতেছিল—ইঞ্চিখানেক ভিতরে, মগজ ঘেঁষিয়া। বিধবা মেয়ের মত আলোচালের ভাতের সঙ্গে জীবনের সমস্ত রঙ সে পেটের মধ্যে চালান করিয়া দিয়াছে, চোখে তাই সব যেন কেমন ঝাপসা ঠেকিতেছে।

একটা অবিশ্বাস্য সন্দেহজনক সঙ্কোচের সঙ্গে হেরম্ব ঘরে গিয়া আনন্দের কাছে বসিল। লণ্ঠনের লালাভ আলোয় আনন্দকে দেখা তাহার সহিল না। আলোটা সে কমাইয়া দিল।

আনন্দ বলিল, 'আচ্ছা, মা বাপ কখনো ছেলেমেয়ে ফেলে পালায়?'

'পালায় না বলেই এতদিন জানা ছিল।'

'আমায় ছেলেমেয়ের মধ্যে গণ্য করা যায় না। আমি কি করে জন্মালাম জানতে বড় ইচ্ছা করে।'

হেরম্ব সভয়ে চুপ করিয়া রহিল। আনন্দের ইঙ্গিতটাই এমন Vulgar যে তাহার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল।

'আমি নিজে যেমন খাপছাড়া আমার মা বাপও তেমনি। আমি যে সত্যি সত্যি কি, মানুষের মধ্যে আমার স্থান যে কোথায় ভেবে ভেবে, এইখানে'—আনন্দ নিজের বুক দেখাইয়া দিল, একদিন হেরম্বের গায়ে যে বুকের চাপ পড়িয়াছিল।—'এইখানে মাঝে মাঝে এমন যন্ত্রণা হয় কি বলব। মনে হয় কে যেন ফুটবলের মত আমায় পাম্প করছে।'

'মানুষের মধ্যে তোমার স্থান যদি নাই থাকে আনন্দ, সেজন্য কখনো তুমি ব্যথা পেও না। আমি মানুষ, আমার বুকে তোমার স্থান অক্ষয় হয়ে রইল।'

আনন্দ চুপ করিয়া রহিল।

হেরম্ব ব্যগ্রভাবে বলিল, 'আমার সান্ত্বনায় তোমার কি একবিন্দু শান্তিও লাভ হল না আনন্দ?'

'শান্তি কাকে বলে আমি জানি না।'

'আমিও জানি না। তবু মোটামুটি যে অর্থে কথাটা ব্যবহার করি তাও কি বোঝ না আনন্দ?'

'বুঝি, শান্তি মানে স্ফূর্ত্তির মত কিছু একটা হবে। না?'

হেরম্ব মাথা নাড়িল, বলিল, 'না। কিন্তু শান্তি চুলোয় যাক। আমাকে দিয়ে তোমার জীবনের ক্ষতি পূরণ হতে পারে না? আমায় নিয়ে বুকের যন্ত্রণাটা ভুলে থাকতে পার না আনন্দ?'

'কি করে ভুলব? যন্ত্রণা যে আপনি হয়।'

হেরম্ব ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল।

'আজও কি তোমার তেমনি যন্ত্রণা হচ্ছে?'

'কি জানি।'

'বুঝতে পারছ না?'

'না।'

'কি করলে তোমার আজ স্ফূর্তি হবে আনন্দ?'

'তা তো জানি না।'

'একটু কারণ খাবে?'

'দিন না?'

ভাঁড়ে করিয়া অল্প একটু কারণ দিতেই সে এক নিশ্বাসে গিলিয়া ফেলিল।

'আরো দিন।'

'আরও?'

আরও খানিকটা কড়া মদ খাইয়া আনন্দ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তারপর মাতালের মত হঠাৎ—

'আপনি খেলেন না?'

'আমার আজ দরকার নেই।'

'দরকার নেই কেন? আপনার আজ কি হয়েছে?'

'আমার? আমার কথা আর বলো কেন?'

আনন্দ দুচোখ বড় বড় করিয়া বলিল, 'আমাকে নিয়ে আজ রাত্রে আপনি কি যেন করবেন। কি করবেন বলুন না?'

হেরম্ব সাগ্রহে বলিল, আমার কাছে একা থাকতে তোমার ভয় করছে নাকি আনন্দ?'

'না'

'একটুও না?'

'না। কি করে ভয় করবে? ভয় কাকে বলে আমি তা জানিই না।'

তা বটে। আনন্দের ভয়ও নাই, ভালবাসাও নাই। জীবনে হারাইবার মত কি তাহার আছে? ওর ওই সুন্দর শরীর ঠাণ্ডা, মৃত মাংস দিয়া তৈরী। জন্মের পূর্ব্বেই ওর প্রত্যেকটি তন্তু মাটির অধিকারে। শ্বাস টানিয়া হেরম্ব আবার ঝিমাইয়া পড়িল। প্রেম বিষ নয়, মৃত্যু। মাতাজী জন্মের মত ইহাকে তাহার হাতে সঁপিয়া দিয়া গিয়াছেন, সৌভাগ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহার ভার বহিয়া ও ইহাকে সহিয়া কতদিন বাঁচা যাইবে তাহাই ভাবনা।

'আনন্দ, আজ নাচবে?'

'নাচব?—হ্যাঁ, নাচব।'

'বোসো তবে, আলোর ব্যবস্থা করি।'

কোথায় আলো? তিনটা লণ্ঠন, একটা টেবল ল্যাম্প, পাঁচটি মোমবাতি, দুটি ডিবরি, ও একটি মাটির প্রদীপ। সমস্ত বাড়ী খুঁজিয়া এতগুলি আলো আনিয়া ঘরের চারিদিকে জ্বালাইয়া দিয়া হেরম্ব চোখ মিট মিট করিয়া বলিল, 'ভালো আলো হল না।'

'বেশ হয়েছে। আর কত আলো চাই?'

না,

'দাঁড়াও, ধুনি জ্বালব।'

'ধুনি? এই ঘরের মধ্যে?'

'দোষ কি?'

রান্নাঘরের রোয়াকে কাঠ জমা করা ছিল, একবোঝা বহিয়া আনিয়া হেরম্ব বলিল, 'চারিদিকে আলো জ্বলছে, মাঝখানে ধুনি জ্বাললেই ভাল দেখাত। কিন্তু তাতে নাচের জায়গা থাকবে না।'

'খুব জায়গা থাকবে। কত জায়গা চাই?'

নাচ আরম্ভ করার জন্য আনন্দ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। নাচ পাইয়াছে, নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিলেই হয়, এত তার আয়োজন কিসের? সর্ব্বাঙ্গ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, হাত পা অকারণেই কাঁপে।

মেঝের মাঝখানে চিতার মত [করিয়া?] কাঠগুলি হেরম্ব সাজাইয়া দিল। কিন্তু শুধু কাঠ কতক্ষণে ধরিবে? ধুনিতে [?] তেল ঢালা নিষেধ, ঢালিলে ধুনি আর ধুনি থাকিবে না, চুল্লি হইয়া যাইবে।

আনন্দ এদিকে তাড়া দিতেছে, 'চটপট ধুনি [জ্বালান] না? কতক্ষণ লাগাবেন? কখন নাচব?'

'এই হল।'

আধটিন ঘি আনিয়া হেরম্ব কাঠের [উপর] ঢালিয়া দিল।

'বাবা, অত ঘি ঢাললেন? ভয়ানক আগুন হবে যে?'

'হোক না।'

আগুন ধরাইয়া দিতে ঘিয়ে ভেজা কাঠগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। এতক্ষণে হেরম্বের তৃপ্তি হইয়াছে। এমন না হইলে আগুন! এমন না হইলে আলো! ঘরের দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'নাচো, আনন্দ।'

'নাচি।'

এত আগুন, এত উত্তাপ, এমন সমারোহ! আনন্দ আজ তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাচ নাচিবে। যে নাচ কারো সামনে নাচিতে বারণ, যে সর্ব্বনাশা নাচের পর সে আধমরা হইয়া যায়, সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে আর ঘুম পায়।

হেরম্বকে ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া আনন্দ তার আলখাল্লা মেরজাই জাঙিয়া সব খুলিয়া ঘরের কোণে ছুঁড়িয়া ফেলিল। একটা ডিবরি কাত হইয়া তাহাতে আগুন ধরিয়া গেল কিন্তু সে তাকাইয়াও দেখিল না। কি নাচ সে নাচিবে সেই জানে, নগ্নতার সম্পূর্ণতার জন্য দক্ষিণ বাহুর রুদ্রাক্ষের অনন্তটি পর্য্যন্ত সে গায়ে রাখিল না।

হেরম্ব ভাবিপ্ত করিয়া বলিল, 'তুমি যে এত সুন্দর, তোমায় ভালবেসেও এতদিন আমি তা ধারণা করতে পারি নি আনন্দ। আমি ভেবেছিলাম আমার অনুভূতির সীমা তুমি ছাড়িয়ে যাও নি, এখন দেখছি তোমার রূপ আমাকে যতখানি উন্মত্ততা দিতে পারে, [আমি] তার সিকিও নিতে পারি নি। এইখানে এই মুহূর্ত্তে আমি যদি মরে যেতাম [শুধু] তাতে প্রমাণ হত তোমার রূপের কাছে আমার হৃদয় ছোট হয়ে যায় নি। আমি কিন্তু নালিশ করি না। আমার হৃদয় তৈরী করেছি আমি নিজে, তোমার রূপ দিয়েছেন কে? ভগবান! তোমায় দেখে আজ আমার ভগবানকে দেখার কাজ হয়ে যেত, যদি না—যদি না—'

'আঃ চুপ করুন।'

আনন্দ নাচ আরম্ভ করিল। এমন অদ্ভুত আরম্ভ হেরম্ব কখনো দ্যাখে নাই। সেই নির্জ্জন নিঃশব্দ প্রান্তরে ধুনির স্তিমিত আলোয় ইহাকে একবার সে নাচ আরম্ভ করিতে দেখিয়াছিল, স্তব্ধ নিষ্কম্প হইয়া দাঁড়ানোর পর কখন কোথা হইতে অতি ধীরে আনন্দের নাচ আরম্ভ হইয়াছিল বুঝিতেই পারা যায় নাই, এবার সে যেন আরম্ভ করিল

নৃত্যের ক্লাইম্যাক্স হইতে, চিত্তের উদ্দাম অশান্ত প্রকাশ যেখানে নিষ্ঠুর, অনাচারী, অসংযত। নিজেকে কেন্দ্র করিয়া পাক খাইতে খাইতে সে দ্রুতবেগে আগুনের চারিদিকে ঘুরিতেছে,—পৃথিবী যেভাবে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরে।

তারপর হেরম্বের মনে হইল আনন্দ যেন একটি বিচ্ছিন্ন অগ্নিশিখা,—সদ্য সদ্য জন্ম লাভ করিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। দুই বাহু বক্ষে ন্যস্ত, সর্ব্বাঙ্গে গতির স্বচ্ছ আবরণ, আগুনে মিশিয়া যাইবে বলিয়া আগুনের দিকেই সে হেলিয়া রহিয়াছে। হেরম্বের চোখে ধাঁধা লাগিয়া গেল, তার মস্তিষ্ক অসাড় হইয়া আসিতেছে।

নাচ থামিল হঠাৎ। আনন্দের আহ্নিক ও বৃত্তিক গতি উভয়ই দ্রুত মন্দীভূত হইয়া আসিল। শেষে গতি আছে কি না বোঝা গেল না। হাঁটু পাতিয়া বসিয়া আনন্দ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল। আগুনের খুব কাছেই। বাতাসে অগ্নিশিখা এদিকে হেলিতেই তাহার বুক্ষবাবরি চুল ঝলসাইয়া গেল। কিন্তু সে তাহা অনুভব করিতে পারিল কি না বোঝা গেল না।

তাহাকে বুকে তুলিয়া নিয়া হেরম্ব উঠানে খোলা আকাশের নীচে গিয়া দাঁড়াইল। আনন্দ কি হাল্কা। ফুলের মত কি আশ্চর্য্য কোমল তার স্পর্শ। আহা, বেচারা নিশ্বাসের জন্য হাঁপাইতেছে।

'এমন হল কেন আনন্দ?'

'কি জানি, আমি নাচতে ভুলে গেছি। কিছুতেই অনুদাত্তে নামতে পারলাম না। উঃ, উঃ, মাগো।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'হুঁ! সমস্ত শরীর আগুনের মত জ্বালা করছে।'

'আগুনের তাতে এরকম হয়েছে।'

'তা কেন হবে? ভেতর থেকে জ্বলছে যে—হাড়ের মধ্যে।'

'হাড়ের মধ্যে জ্বলছে?'

'হুঁ, সইতে পারছি না। বাবা বলতেন আমার হাড়ের মধ্যে মজ্জা নেই, বিষ আছে নাচলেই সে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হয়। কি করব, কিসে কমবে?'

তাহাকে বুকে নিয়া উঠানের ধূলার উপরে হেরম্ব বসিয়া রহিল। আনন্দ কিছুই বোঝে না। এ বিষ নয়, নাচিতে না পারার আপশোষ, আনন্দের পক্ষে যাহা মরণাধিক যন্ত্রণা। আর একবার নাচিতে পারিলেই তার সব জ্বালা কমিয়া যাইবে।

'আর একবার চেষ্টা করে দেখবে আনন্দ?'

'আর পারব না।'

হেরম্ব নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তবে ধুনি নিভিয়ে দিই?'

'দিন।'

'অতগুলি আলো রেখেই বা কি হবে?'

'সব নিভিয়ে দিন।'

আনন্দ নিজেই ধূলায় নামিয়া গেল। তার ঘামে হেরম্বের বুক ভিজিয়া উঠিয়াছে।

বালতি বালতি জল নিয়া হেরম্ব দূর হইতে আগুনের মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। আগুন কি সহজে নিভিতে চায়। আগুন গর্জ্জন করে, জল বাষ্পে পরিণত হয়, ছাই ওড়ে আর উৎকট দুর্গন্ধে ঘর ভরিয়া যায়। শেষ শিখাটি যখন পরাজয় মানিল, ঘর শ্মশানের মত কদর্য্য হইয়া উঠিয়াছে।

ছাই কয়লা আর পোড়াকাঠ। পোড়াকাঠ কয়লা আর ছাই।

বাহিরে আসিয়া হেরম্ব আনন্দকে দেখিতে পাইল না।

সে সভয়ে হাঁকিল, 'আনন্দ।'

আনন্দ সাড়া দিতে সে ছুটিয়া বাড়ীর বাহিরে গেল।

'কোথায় যাচ্ছ আনন্দ?'

'সমুদ্রে যাচ্ছি,—স্নান করব।'

'এত রাত্রে সমুদ্রস্নান চলে না আনন্দ। ফিরে এসো। বাড়ীতে ঠাণ্ডা মিষ্টি জল আছে তাতে স্নান করলে তৃপ্তি হবে। এসো, মানিক আমার, কথা শোনো।

'ওইটুকু জলে আমার স্নান হবে না।'

'তুমি যত জল চাও তুলে দেব। ঘরের নালা বন্ধ করে তোমার জন্য পুকুর তৈরী করে দেব। ফিরে এসো।'

'না। আমি সমুদ্রেই স্নান করব।'

'দাঁড়াও, তোমার আলখাল্লাটা গায়ে দিয়ে যাও।'

'আলখাল্লা দিয়ে কি হবে? ও গায়ে দিয়ে সাঁতার কাটা যায় না।'

'বেশ, কিছুই না নেও, আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'আসুন।'

সমস্ত আকাশ ইতিমধ্যে মেঘে ঢাকিয়া গিয়াছে। বর্ষাকাল, কদিন যে বৃষ্টি হয় নাই ইহাই আশ্চর্য্য। অন্ধকাব বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। এই অন্ধকারে তাহারা সমুদ্রে নামিয়া গেল। ব্রেকার পার হইতে হেরম্ব অনেক পিছাইয়া পড়িল। আনন্দের সঙ্গ সে যখন পাইল তীর হইতে তাহারা কতদূর চলিয়া গিয়াছে তাহাব ঠিক নাই।

'এবার ফিরি চল, আনন্দ।'

আনন্দ আলগোছে ভাসিতেছিল, বলিল, 'আমার বড় ঘুম পাচ্ছে।'

'বাড়ী গিয়ে ঘুমোবে। চলো ফিরে যাই। আমায় ধরো।'

আনন্দ কোন জবাব দিল না। হেরম্ব বড় বিবক্ত [বোধ] করে। তাহার এমন ঘুম পাইযাছে।

নিঃশব্দে ডুব সাঁতার দিয়া সে দূবে সবিয়া গেল।

পরিশিষ্ট

পরদিন বিকালে সমুদ্রতীরে দাঁড়াইয়া হেরম্ব সমুদ্রের দিকে চাহিযা ছিল, এমন সময় বিধবাব বেশে সবসী তাহাব পাশে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কাল উনি মাবা গেছেন। বাত্রে লোক পাঠিয়েছিলাম, আপনাকে বাড়ীতে পায নি। কোথায গিয়েছিলেন কাল?'

'কাল সমস্ত বাত সমুদ্রস্নান কবেছি।'

'মাগো, বলেন কি! সমস্ত রাত?'

'প্রায় সমস্ত বাত। শেষরাত্রে ঘণ্টা দুই এখানে ঘুমিয়েছিলাম।'

'জলের ধারে এই বালিতে?'

'হ্যাঁ।'

'কেন হেবম্ববাবু, কাল আপনাব কি হয়েছিল?'

... .. .

[এরপর পাণ্ডুলিপির শেষ পাতা, মাথার দিকটা কিছুটা ছেঁড়া—একটি লাইন, হেরম্বের উত্তর, বাদ গিয়েছে মনে হয়, যদিও বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।]

সবসী হেরম্বের একখানা হাত আয়ত্ত করিল।

কাঁদিয়া বলিল, 'কাল সত্যি একটা ভয়ঙ্কর রাত্রি গিয়েছে,—আমার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। ও হেরম্ববাবু, কেন আমি মবতে পুরী এসেছিলাম?'

সরসী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। অসহ্য শোকে তাহার ভিতবটা পুড়িয়া যাইতেছিল, সে গৃহস্থ মেয়ে, সে সংসাবী মেয়ে। তাহার অশ্রুর ছোঁয়াচ লাগিয়া হেরম্বেব চোখ দিয়াও টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আনন্দকে না দেখিয়া সে বাঁচিবে কেমন করিয়া?

অতঃপব এই দু'জন বিবহী ও বিরহিণী সমুদ্রের ধাবেধারে বহুদূর হাঁটিয়া গিয়া একান্ত নির্জ্জন ও অপেক্ষাকৃত গোপন একটি স্থান বাছিয়া নিযা বসিল,—সবসীর আত্মীয়েরা খুঁজিতে আসিলে মুস্কিল হইবে। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাবা সেখানে বহিল। সবসী অবশ্য তাহাব গহনা ও অন্যান্য দু'একটি দামী জিনিষ আনিতে একবাব বাড়ী যাইবে, বাকী জীবনটা তাহাবা অবশ্য স্বামীস্ত্রীর মতই বাস করিবে, কিন্তু মধ্যে তাহাদের যে শুধু কান্না পাইবে তাহা নয়, একের অগোচরে অপবজন ছটফট করিয়া কাঁদিবেও।

যদি তাহাবা বাঁচিয়া থাকে।

কিন্তু মবিয়া আব কি সুখ রহিল যে তাহারা বাঁচিয়া থাকিবে না? দুঃখে মানুষেব পরমায়ু বাড়ে। দুঃখী মানুষ সংসার না চাক, স্ত্রী ও সন্তান চায়। পৃথিবীর কোথাও ইহাব অন্যথা নাই।

আনন্দ বাঁচিয়া থাকিলে হেবম্ব বাঁচিত না। আনন্দের মৃত্যুতে তার মরণেব নেশা টুটিয়া গিয়াছে। কাল যে সে আনন্দেব সঙ্গে ডুবিয়া মবে নাই তাহাব কারণও তাই। আনন্দ ওভাবে মবিবে জানিলে সে আগেই আত্মহত্যা করিত। কিন্তু আনন্দকে ডাকিয়া সাড়া না পাইয়া সে যে অকথ্য যন্ত্রণা পাইয়াছিল তাবপর তাব নিজে নিজে মরা চলে না।

সরসীর কথা আলাদা। সে নাবী মাত্র।

সম্পাদকমণ্ডলী

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবনপঞ্জি

১৯০৮ জন্ম, ১৯ মে মঙ্গলবার। বঙ্গাব্দ ১৩১৫, ৬ জ্যৈষ্ঠ। জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকা শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান বাংলাদেশ ঢাকা, বিক্রমপুরের অন্তর্গত মালপদিয়া গ্রাম।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা নীরদা দেবী। পিতামাতার পঞ্চম পুত্র—পিতৃদত্ত নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকনাম মানিক।

পিতা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-বিভাগের গ্র্যাজুয়েট। সেটেলমেন্ট বিভাগের কানুনগো এবং শেষপর্যন্ত সাব-ডেপুটি কালেকটর পদে পিতার চাকুরির সূত্রে লেখকের বাল্য-কৈশোর ও ইস্কুলের শিক্ষাজীবন বিক্ষিপ্তভাবে অতিবাহিত হয় উড়িষ্যা, বিহার ও অখণ্ড বাংলার এক বিস্তৃত অঞ্চলে—প্রধানত দুমকা, আড়া, সাসারাম, সমগ্র মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন অংশ, কুমিল্লার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়া, বারাসত, কলকাতা, ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে।

১৯২৪ ২৮ মে, টাঙ্গাইলে মাতৃবিয়োগ।

১৯২৬ মেদিনীপুর জেলা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিতে বিশেষ কৃতিত্বসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

১৯২৮ বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ান মিশন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই এস্‌সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অঙ্কশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি এস্‌সি ক্লাসে ভর্তি হন। এই বছরেই কলেজের সহপাঠীদের সঙ্গে তর্কে বাজি ধরে প্রথম গল্প 'অতসী মামি' রচনা করেন এবং বঙ্গাব্দ ১৩৩৫-এর পৌষ-সংখ্যা (ডিসেম্বর ১৯২৮) 'বিচিত্রা'-পত্রিকায় তা ছাপা হয়। প্রথম গল্পের লেখক হিসাবে ডাকনাম 'মানিক' গ্রহণের কাহিনি নিজেই পরবর্তীকালে 'গল্প লেখার গল্প' নামক রচনায় বলেছেন।

(আকস্মিকভাবে প্রথম গল্পরচনার আগেই, কবিতা লিখে সাহিত্যচর্চা শুরু করেন ষোলো বছর বয়সে। এই কৈশোরক কবিতাচর্চার নিদর্শন প্রায় ১০০টি কবিতার সম্পূর্ণ একটি খাতা লেখকের ব্যক্তিগত কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায়।)

১৯২৯ 'বিচিত্রা'-পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় গল্প 'নেকি' (আষাঢ় ১৩৩৬) ও 'বাগান পূজা' (ভাদ্র ১৩৩৬)। প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য'র আদি রচনা এই বছরেই শুরু হয়। ক্রমে সাহিত্যচর্চায় আগ্রহ পারিবারিক মতবিরোধের কারণ হয়ে ওঠে—শেষপর্যন্ত কলেজের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে সাহিত্যকর্মেই সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৩৪ বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর বৈশাখ সংখ্যা 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকায় 'একটি দিন'-নামক বড়োগল্পের আকারে প্রথম উপন্যাস 'দিবারাত্রির কাব্য' শুরু হয় ; ক্রমে 'একটি সন্ধ্যা', 'রাত্রি', এবং শেষপর্যন্ত 'দিবারাত্রির কাব্য'-নামে ধারাবাহিক প্রকাশের পর পৌষ ১৩৪১-এ উপন্যাসটি সম্পূর্ণ হয়। একই বছরে 'পূর্বাশা'-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে শুরু হয় 'পদ্মানদীর মাঝি', কিন্তু 'পূর্বাশা'র প্রকাশ অসম্পূর্ণ থাকে।

১৯৩৫ পূর্ববর্তী বছরের ডিসেম্বর কিংবা বর্তমান বছরের জানুয়ারি, বঙ্গাব্দ ১৩৪১-এর পৌষ সংখ্যা থেকে, 'ভারতবর্ষ'-পত্রিকায় শুরু হয় 'পুতুলনাচের ইতিকথা'। এই বছরেই গ্রন্থকার হিসাবে লেখকের প্রথম আবির্ভাব। উপন্যাস 'জননী', প্রথম গল্পগ্রন্থ 'অতসী মামি', এবং গ্রন্থরূপে পরিমার্জিত ও রূপান্তরিত 'দিবারাত্রির কাব্য', পর-পর প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মার্চ, অগাস্ট ও ডিসেম্বর মাসে।

বর্তমান বছরেরই কোনো-এক সময়ে লেখক মৃগীরোগ বা Epilepsy-র আক্রমণে প্রথম আক্রান্ত হন—চিকিৎসার অতীত এই ব্যাধি ছিল তাঁর আমৃত্যু সঙ্গী।

১৯৩৬ একই বছরে প্রকাশিত হয় তিনটি উপন্যাস—'পদ্মানদীর মাঝি', 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ও 'জীবনের জটিলতা'।

১৯৩৭ একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'প্রাগৈতিহাসিক', লেখকের দ্বিতীয় গল্পগ্রন্থ। মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস লিমিটেড-এর পরিচালনাধীন মাসিক ও সাপ্তাহিক 'বঙ্গশ্রী'-র তৎকালীন সম্পাদক ছিলেন কিরণকুমার রায়। বর্তমান বছরের শেষভাগে টালিগঞ্জ, দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস শুরু ; পরবর্তী এগারো বছর, পিতা ও অপর তিন ভ্রাতার একান্নবর্তী সংসারে, উক্ত বাড়িতেই বাস করেন।

১৯৩৮ ১১ মে, ২৮ বৈশাখ ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, ময়মনসিংহ গবর্নমেন্ট গুরুট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং বিক্রমপুর পঞ্চসার নিবাসী প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা কমলা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় যথাক্রমে উপন্যাস 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ও গল্পগ্রন্থ 'মিহি ও মোটা কাহিনি'।

১৯৩৯ ১ জানুয়ারি থেকে 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকার সহকারী সম্পাদকের চাকরিতে ইস্তফা। প্রায় একই সময়ে, পরবর্তী ভ্রাতা সুবোধকুমারের সহযোগিতায়, 'উদয়াচল প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস' নামে ছাপাখানা ও প্রকাশনালয় স্থাপন।
বঙ্গাব্দ ১৩৪৫ মাঘ-সংখ্যা (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) 'পরিচয়'-পত্রিকায় 'অহিংসা' উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ শুরু (সমাপ্তি পৌষ ১৩৪৭)। অগাস্ট মাসে প্রকাশিত হয় চতুর্থ গল্পগ্রন্থ 'সরীসৃপ'।
বর্তমান বছরের শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'শহরতলি'—'শহরতলি' প্রকাশের মধ্য দিয়েই উক্ত পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সম্পূর্ণ উপন্যাস প্রকাশের রীতি প্রবর্তিত হয়।

১৯৪০ বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে লেখকের নিজস্ব প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর পঞ্চম গল্পগ্রন্থ 'বৌ', সম্ভবত এর পরেই প্রতিষ্ঠানটি উঠে যায়।
জুলাই মাসে প্রকাশিত হয় গ্রন্থাকারে 'শহরতলি' ১ম পর্ব। বঙ্গাব্দ ১৩৪৭ কার্তিক-সংখ্যা 'পরিচয়'-পত্রিকায় লেখক-সম্পর্কে প্রথম স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

১৯৪১ প্রকাশিত গ্রন্থ 'শহরতলি' ২য় পর্ব, 'অহিংসা' ও 'ধরাবাঁধা জীবন'—তিনটি উপন্যাস।

১৯৪২ শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্পূর্ণ উপন্যাস 'শহরবাসের ইতিকথা'। ১৫ মে তারিখে প্রকাশিত উপন্যাস 'চতুষ্কোণ'।

১৯৪৩ 'বঙ্গশ্রী'-পত্রিকা থেকে পদত্যাগের পর লেখকের দ্বিতীয় এবং শেষ চাকরিজীবন শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী কোনো-এক সময়ে—তৎকালীন ভারত সরকারের ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অরগানাইজার বেঙ্গল-দপ্তরে পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট-পদে তিনি যোগদান করেন এবং অন্তত বর্তমান বছরের শেষভাগ পর্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। এই সময় থেকেই অল ইন্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে যুদ্ধ-বিষয়ক প্রচার ও আরও নানাবিধ বেতার-অনুষ্ঠানে লেখক অংশ নেন।
সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয় ষষ্ঠ গল্পগ্রন্থ 'সমুদ্রের স্বাদ'।
বঙ্গাব্দ ১৩৫০ শারদীয় যুগান্তর-পত্রিকায় 'প্রতিবিম্ব'-নামক ছোটো একটি উপন্যাস—সম্ভবত একই বছরে, বা পরবর্তী বছর, উপন্যাসটি গ্রন্থরূপেও প্রকাশিত হয়।

১৯৪৪ ১৫-১৭ জানুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। ক্রমে এ-দেশের প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং বর্তমান বছরেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান। কমিউনিস্ট পার্টি ও পার্টির সাহিত্য-ফ্রন্টের সঙ্গে আমৃত্যু যুক্ত ছিলেন।
২৫-২৭ অগাস্টে অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ প্রগতি লেখক ও শিল্পী সম্মেলনে সাধারণ অধিবেশনের অন্যতম সভাপতি।
একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ, গল্পসংকলন 'ভেজাল'।

১৯৪৫ ৩-৮ মার্চে অনুষ্ঠিত ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। বর্তমান সম্মেলনে পুনরায় সর্বভারতীয় সংস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সংঘের বাংলা শাখার নাম হয় 'প্রগতি লেখক সংঘ' এবং এই সম্মেলন থেকে লেখক উক্ত সংঘের পরবর্তী বছরের অন্যতম যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন।
১২ মে তারিখে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে 'গল্প লেখার গল্প'-পর্যায়ে ভাষণদান।
অক্টোবর-ডিসেম্বরের বিভিন্ন দিনে, আঠারো-উনিশ শতকীয় বাঙালি সঙ্গীতকার-বিষয়ে পর্যায়ক্রমিক বেতার ভাষণ।
প্রকাশিত গ্রন্থ : গল্পগ্রন্থ 'হলুদপোড়া' এবং উপন্যাস 'দর্পণ'।

১৯৪৬ পর-পর প্রকাশিত হয় পাঁচখানি গ্রন্থ
ফেব্রুয়ারি-মার্চ, 'শহরবাসের ইতিকথা', উপন্যাস।
এপ্রিল-মে, 'ভিটেমাটি', নাটক।
মে-জুন, 'আজ কাল পরশুর গল্প', গল্পগ্রন্থ।
জুলাই-অগাস্ট, 'চিন্তামণি', উপন্যাস।
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 'পরিস্থিতি', গল্পগ্রন্থ।
১৬ অগাস্ট ও পরবর্তী কয়েকটি দিনের ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত টালিগঞ্জ অঞ্চলে, জীবন বিপন্ন করে সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও মৈত্রী প্রয়াসে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

১৯৪৭ প্রকাশিত গ্রন্থ তিনটি . উপন্যাস 'চিহ্ন' ও 'আদায়ের ইতিহাস' এবং গল্পগ্রন্থ 'খতিয়ান'।
ডিসেম্বরের শেষভাগে বোম্বাই-এ অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য শাখার সভাপতি।

১৯৪৮ দুটি গ্রন্থের প্রকাশ · 'ছোটোবড়ো' ও 'মাটির মাশুল'।

১৯৪৯ ৫ ফেব্রুয়ারি, টালিগঞ্জ-দিগম্বরীতলার পৈতৃক বাড়ি থেকে বরানগর, গোপাললাল ঠাকুর রোড-এর ভাড়াবাড়িতে উঠে আসেন এবং অবশিষ্ট জীবন সেখানেই বাস করেন।

৭ ফেব্রুয়ারি, লেখকের পিতা তাঁর টালিগঞ্জের নিজস্ব বাড়ি বিক্রয় করে দেন এবং ৪ ডিসেম্বর তারিখে স্থায়ীভাবে লেখকের কাছে চলে আসেন। আমৃত্যু তিনি লেখকের সঙ্গেই বরানগরের ভাড়াবাড়িতে বাস করেন—পুত্রের মৃত্যুর দুবছর পর মুমূর্ষু পিতা মারা যান।

এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ বার্ষিক সম্মেলনের সভাপতি। সংঘের পূর্বতন সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে লেখক এই সম্মেলনে সম্পাদকের রিপোর্ট পেশ করেন—'প্রগতি সাহিত্য'-নামক প্রবন্ধরূপে এই রিপোর্ট লেখকের মৃত্যুর পর প্রকাশিত তাঁর একমাত্র প্রবন্ধগ্রন্থ 'লেখকের কথা'য় (১৯৫৭) সংকলিত হয়েছে।

চলচ্চিত্রে 'পুতুলনাচের ইতিকথা'—২৮ জুলাই মুক্তি পায়।

একমাত্র গ্রন্থ 'ছোটোবকুলপুরের যাত্রী', গল্পগ্রন্থ।

১৯৫০ জুন থেকে অগাস্টের মধ্যে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'জীয়ন্ত', 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প' এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত 'মানিক-গ্রন্থাবলি' ১ম ভাগ।

১৯৫১ বর্তমান বছরের প্রায় শুরু থেকেই দারিদ্র্য এবং অসুস্থতায় ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকেন। 'পেশা', 'সোনার চেয়ে দামি' (১ম খণ্ড। বেকার), 'স্বাধীনতার স্বাদ' ও 'ছন্দপতন'—চারখানি উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৯৫২ আর্থিক সংকট চরমে ওঠে—তিন মাসের মধ্যে 'অন্তত পাঁচশত টাকা' সঞ্চয়ের লক্ষ্য নিয়ে সংসার-চালনার 'ত্রৈমাসিক প্ল্যান' নেন মে-জুলাই মাসে, যদিও তা 'প্ল্যান'ই থেকে যায়।

ফেব্রুয়ারি থেকে অক্টোবরের মধ্যে পাঁচখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'সোনার চেয়ে দামি' (২য় খণ্ড। আপোস), 'ইতিকথার পরের কথা', 'পাশাপাশি' ও 'সার্বজনীন' —চারখানি উপন্যাস এবং বসুমতী সাহিত্য মন্দির-কর্তৃক 'মানিক-গ্রন্থাবলি' ২য় ভাগ।

১৯৫৩ দারিদ্র্য এবং অসুস্থতার আক্রমণ অব্যাহত থাকে।

১ ১০ এপ্রিল, লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম বা শেষ বার্ষিক সম্মেলন।

প্রকাশিত গ্রন্থ 'নাগপাশ', 'আরোগ্য', 'চালচলন', 'তেইশ বছর আগে পরে'—চারখানি উপন্যাস, এবং দুটি গল্পগ্রন্থ, 'ফেরিওলা' ও 'লাজুকলতা'।

১৯৫৪ দারিদ্র্য, এবং অসুখ ও আসক্তির বিরুদ্ধে প্রাণপণ আত্মরক্ষার সংগ্রাম—আত্মরক্ষা এবং আত্মহনন ক্রমেই একাকার হয়ে যায়।

বর্তমান বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরির লেখায় ঘুরে-ফিরে দেখা দেয় একপ্রকার অতিপ্রাকৃত বা অতিলৌকিক প্রসঙ্গ।

প্রকাশিত গ্রন্থ দুটি উপন্যাস, 'হরফ' ও 'শুভাশুভ'।

১৯৫৫ স্বেচ্ছানির্বাচিত দারিদ্র্য এবং চিকিৎসাতীত ব্যাধির যুগপৎ আক্রমণে অস্তিত্বসুদ্ধ বিপন্ন হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত শুভানুধ্যায়ী লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, স্ত্রী চিকিৎসার জন্য ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি হন ২৭ মার্চ, চিকিৎসকদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেই নিজ দায়িত্বে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়ি চলে আসেন।

বিপর্যস্ত শরীর-মনের শেষ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা হয় লুম্বিনি পার্ক মানসিক চিকিৎসালয়ে—২০ অগাস্ট সেখানে ভর্তি হন এবং দু-মাস চিকিৎসাধীন থাকার পর ২১ অক্টোবর বাড়ি ফেরেন।

একমাত্র প্রকাশিত গ্রন্থ 'পরাধীন প্রেম', উপন্যাস।

১৯৫৬ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় উপন্যাস 'হলুদ নদী সবুজ বন'। বর্তমান বছরের গোড়া থেকেই ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রির আক্রমণে একাধিকবার আক্রান্ত হন এবং ২৫ জুন তারিখে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। জুন মাসেই প্রকাশিত হয় জীবিতকালের শেষ গল্প-সংকলন 'স্ব-নির্বাচিত গল্প'। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে, লেখকের জীবিতকালে সর্বশেষ প্রকাশিত উপন্যাস, 'মাশুল'।

২ ডিসেম্বর, সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নীলরতন সরকার হাসপাতালে নীত হন।

৩ ডিসেম্বর (বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ১৭ অগ্রহায়ণ), সোমবার অতি প্রত্যূষে উক্ত হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। নিমতলা শ্মশানঘাটে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

[অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: ডায়েরি ও চিঠিপত্র। ভূমিকা, টীকাভাষ্য ও সম্পাদনা: যুগান্তর চক্রবর্তী (১৯৯[illegible]) থেকে সংকলিত।]